ফাযায়েলে আমাল

মূল লেখক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়াহ, ফরিদাবাদ
খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

নজরে ছানী ও সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

মুরুব্বীগণের
দোয়া ও অভিমত

● আল্লাহ তায়ালার খাছ মেহেরবানী ও অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশিত হইল। জনাব মুফতী উবায়দুল্লাহ ছাহেব ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন অতঃপর মাওলানা হাফেজ যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবান আদ্যোপান্ত মূলের সহিত ইহাকে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মূলানুগ করিবার ব্যাপারে রাত্র–দিন যথেষ্ট মেহনত করিয়াছেন।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা উক্ত মেহনতকে আখেরাতের যখীরা হিসাবে কবুল করুন এবং বিশ্বের বাংলাভাষী সকল মুসলমানকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।
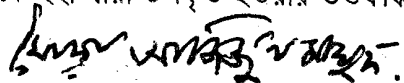
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাকরাইল মসজিদ)
৩৭৭–বি, খিলগাঁও আবাসিক এলাকা, ঢাকা–১২১৯

● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবখানির তরজমা বাংলাভাষায় পুরাপুরিভাবে করা হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও আদেশে মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার যথাযথ তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও পুরা উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন, আমীন।

(মাহমুদুল হক)
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবখানির মোকাম্মাল বাংলা তরজমা প্রকাশিত হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও হুকুমে তাঁহারই হেদায়াত মোতাবেক মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন, আমীন।

(সৈয়দ আজিজুল মকছুদ)
৬৫নং কুদরতে খোদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা (রহঃ) রচিত ঈমান আমল ও দাওয়াত–তবলীগের জজবা পয়দাকারী মশহুর কিতাব 'ফাযায়েলে আমাল' এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকার হযরত শায়েখ (রহঃ)এর দেওয়া মৌল নীতি ও দিকনির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি যে নীতিমালা দিয়াছেন তাহা হইল—

اسی طرح دوسرے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں پر اس کی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ
وہ ترجمہ کرتے وقت اصل مضمون کو نہ بدلیں اور نہ ہی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں۔ مقدمہ تبلیغی نصاب

হযরত হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর সরাসরি নির্দেশ, দিলি তামান্না ও ঐকান্তিক আগ্রহই কিতাবখানি তরজমার ক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাইয়াছে। ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বেও তিনি এই বলিয়া বিশেষ তাম্বীহ ও খাছ হেদায়েত দিয়াছেন যে, তরজমা এমন সরল সহজ হইতে হইবে যেন সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পড়িতে ও তালীম করিতে পারে।

আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবকে, তাঁহারা কাকরাইলের বর্তমান মুরুব্বীগণের মানশা মোতাবেক পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া মূল কিতাবের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন।

কাকরাইলের সকল আহলে শূরা, আকাবেরীন, অন্যান্য মুরুব্বিয়ান ও দোস্ত–আহবাবের নিকট আমি শোকর গুজার যে, তাঁহারা খাছ দোয়া ও তাওয়াজ্জুহ দ্বারা আমাকে হিম্মত দিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও ইহার জন্য আন্তরিক দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ পাক দোজাহানে তাঁহাদিগকে বহুত বহুত জাযায়ে খায়ের দান করুন ও দরজা বুলন্দ করুন। কিতাবখানির তরজমা ও প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল আহবাব আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক তাঁহাদেরকেও উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

পাঠকবর্গের খেদমতে সবিনয় আবেদন যে, কোনপ্রকার ভুল–ত্রুটি ধরা পড়িলে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি পেশ করিতেছি, তিনি যেন আপন দয়ায় কিতাবখানি কবূল করিয়া নেন এবং ইহাকে সকল উম্মতের আমল, হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবুল ফরমান।

—বিনীত অনুবাদক।

সূচীপত্র

ফাযায়েলে তবলীগ

বিষয়	পৃষ্ঠা

॥ ॥ ॥

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর। মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও যমানার ওলামা-মাশায়েখের উজ্জ্বল রত্ন (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) আমাকে তবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আয়াত ও হাদীস লিখিয়া পেশ করিতে আদেশ করেন। এইরূপ বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার মত গোনাহগারের জন্য গোনাহ-মাফী ও নাজাতের ওসীলা—এই আশায় দ্রুত রচনা করতঃ এই উপকারী কিতাবখানি খেদমতে পেশ করিতেছি। সেইসঙ্গে প্রত্যেক দ্বীনি মাদরাসা, দ্বীনি আঞ্জুমান, ইসলামী আদর্শে পরিচালিত স্কুল, প্রতিটি ইসলামী শক্তি বরং প্রত্যেক মুসলমানের নিকট আরজ করিতেছি যে, বর্তমানে দ্বীনের অবনতি যেভাবে দিন দিন বাড়িতেছে, বিধর্মীদের পক্ষ হইতে নয় স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষ হইতে দ্বীনের উপর যেভাবে হামলা হইতেছে, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের উপর আমল সাধারণ মুসলমানদের হইতে নয় বরং খাছ লোকদের এমনকি যাহারা আরও বিশিষ্ট তাহাদেরও ছুটিয়া যাইতেছে। নামায-রোযা ত্যাগ করার বিষয় কি বলিব যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রকাশ্য কুফর ও শির্কে লিপ্ত রহিয়াছে। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইল যে, তাহারা ইহাকে শির্ক ও কুফর বলিয়া মনে করে না। যাবতীয় হারাম, নাফরমানী ও অশ্লীলতার প্রচলন যেরূপ প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ্বীনের প্রতি বে-পরওয়া ভাব, বরং অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ যে পরিমাণ ব্যাপক হইতেছে তাহা কোন ব্যক্তির নিকট এখন আর অস্পষ্ট নয়। এইসব কারণেই বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম বরং সাধারণ আলেমগণের মধ্যেও লোকদের হইতে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়াইতেছে যে, দ্বীন এবং দ্বীনি বিষয়াবলী হইতে বিচ্ছিন্নতা দিন দিন আরও বাড়িতেছে। জনসাধারণ এই বলিয়া নিজেদেরকে অক্ষম মনে করিতেছে যে, তাহাদেরকে বুঝানোর কেহ নাই,

আবার আলেমগণও এই বলিয়া নিজেদেরকে নির্দোষ মনে করিতেছেন যে, তাহাদের কথা শুনিবার মত কেহ নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের 'বুঝানোর কেহ নাই' এই আপত্তি আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব। আইন না জানার আপত্তি কোন সরকারের নিকটই গ্রহণযোগ্য নয় ; আহকামুল হাকেমীনের দরবারে এই অহেতুক ওজর কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে। বরং গোনাহের পক্ষে ওজর পেশ করা গোনাহে লিপ্ত হওয়া হইতে আরও নিকৃষ্ট।

তদ্রূপ, আলেমগণের এই ওজর–আপত্তিও সঠিক নয় যে, 'আমাদের কথা শুনিবার কেহ নাই।' কারণ, যে সকল মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্বের দাবী আপনারা করিতেছেন, দ্বীন পৌঁছানোর জন্য তাঁহারা কি কোন কষ্ট ভোগ করেন নাই? তাঁহারা কি পাথরের আঘাত সহ্য করেন নাই? শত গালি ও কটুবাক্য শুনেন নাই? মুসীবত বরদাশ্‌ত করেন নাই? বরং সব ধরণের কষ্ট–তকলীফ সহ্য করিয়া শুধুমাত্র দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্ব অনুভব করিয়া মানুষের নিকট দ্বীন পৌঁছাইয়াছেন। কঠিন হইতে কঠিনতর বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও নেহায়েত স্নেহ–মহব্বতের সহিত তাঁহারা ইসলাম ও ইসলামের হুকুমসমূহ প্রচার করিয়াছেন।

সাধারণভাবে মুসলমানগণ দ্বীনের তবলীগকে ওলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে ; অথচ ইহা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার সম্মুখে অন্যায় কাজ সংঘটিত হইতেছে সরাসরি বাধা প্রদান করার শক্তি থাকিলে কিংবা ব্যবস্থা নিতে পারিলে বাধা প্রদান করা তাঁহার উপর ওয়াজিব। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ইহা ওলামাদের দায়িত্ব, তবুও যখন তাহারা স্বীয় দুর্বলতা অথবা কোন বাধ্য–বাধকতার কারণে এই দায়িত্ব পুরা করিতেছেন না অথবা তাহাদের দ্বারা পুরা হইতেছে না তখন এই দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর বর্তাইবে। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে গুরুত্বের সহিত তবলীগ এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহা এই সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা যাহা সামনের পরিচ্ছেদে আসিতেছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এমতাবস্থায় শুধু আলেমদের উপর ছাড়িয়া দিয়া কিংবা তাঁহাদের অবহেলা ও ত্রুটির কথা বলিয়া কেহ দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিবে না।

অতএব, সকলের নিকট আমার আবেদন যে, এই সময় প্রত্যেক মুসলমানকেই তবলীগে কিছু না কিছু অংশ নেওয়া উচিত এবং দ্বীন প্রচার ও হেফাজতের কাজে যে পরিমাণ সময়ই ব্যয় করা যায় উহা করা উচিত।

(কবির ভাষায়—)

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

অর্থাৎ, সময়-সুযোগ যতটুকু হাতে আসে উহাকে কদর করা উচিত, কারণ পরিণাম কি, তাহা কাহারও জানা নাই।

ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, তবলীগের জন্য বা সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধের জন্য পরিপূর্ণ ও যোগ্য আলেম হওয়া জরুরী নয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের যে কোন মাসআলা জানে তাহা অন্যদের কাছে পৌঁছাইবে। যখন তাহার সামনে কোন নাজায়েয কাজ হইতে থাকে যদি বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে, তবে উহাতে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব।

এই কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সাতটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছি।

ফাযায়েলে তবলীগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বরকতের জন্য আমি আল্লাহ্ তায়ালার বরকতময় কালাম হইতে কিছু আয়াত তরজমা সহ পেশ করিতেছি। এই আয়াতসমূহে সৎকাজে আদেশ করা সম্পর্কে তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইবে যে, আল্লাহর দরবারে এই কাজের এহ্তেমাম ও গুরুত্ব কত বেশী! যে কারণে নিজ কালামে পাকে বারবার বিভিন্নভাবে ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। তবলীগের ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে প্রায় ষাটটি আয়াত আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়িয়াছে। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে নাজানি এই বিষয়ে তিনি আরও কত আয়াত পাইবেন। সমস্ত আয়াত জমা করিলে কিতাব অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে পেশ করিতেছি ঃ

(1.) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ اِسْمُهٗ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (پ۲۴۔ رکوع ۱۹)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلاتے اور نیک عمل کرے، اور کہے کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں (بیان القرآن)

(১) ঐ ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে ও বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন।

(সূরা হা–মিম সিজদাহ, আয়াত ঃ ৩৩) (বয়ানুল কুরআন)

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকিবে, সে উপরোক্ত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত

হইবে। যেমন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) মুজেযা ইত্যাদির দ্বারা, ওলামায়ে কেরাম দলীল-প্রমাণের দ্বারা, মুজাহিদগণ তলোয়ারের দ্বারা, মুআয্যিনগণ আযানের দ্বারা আল্লাহর দিকে ডাকিয়া থাকেন।

মোটকথা, যে কোন ব্যক্তি কাহাকেও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে সেই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। চাই জাহেরী আমলের দিকে আহবান করুক কিংবা বাতেনী আমলের দিকে আহবান করুক, যেমন মাশায়েখ সূফীগণ মানুষকে আল্লাহর মারেফাতের দিকে ডাকেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ আরও লিখিয়াছেন—

قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন' দ্বারা এই আয়াতের মধ্যে এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মুসলমান হওয়ার কারণে গৌরবান্বিত হওয়া উচিত, ইহাকে ইজ্জত ও সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত এবং এই ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের সহিত উল্লেখও করা উচিত।

কোন কোন মুফাস্‌সির ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, ওয়াজ-নসীহত ও তবলীগ করার কারণে কেহ যেন নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে না করে ; বরং সে যেন ইহা বলে যে, 'সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে আমিও একজন।'

(২) وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(پ ٢٧۔ رکوع ٢)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیئے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔

(২) হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি লোকদেরকে নসীহত করিতে থাকুন, কেননা নসীহত মুমিনদেরকে ফায়দা পৌঁছাইবে। (সূরা যারিয়াত, আয়াত ঃ ৫৫)

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন শরীফের আয়াত শুনাইয়া নসীহত করা। কেননা এইরূপ নসীহত উপকারী হইয়া থাকে। মুমিনদের জন্য উপকারী হওয়া তো স্পষ্ট ; কাফেরদের জন্যও উহা উপকারী। এই হিসাবে যে, নসীহতের বরকতে তাহারা ইনশাআল্লাহ মুমিনদের মধ্যে দাখিল হইয়া উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

বর্তমান যুগে ওয়াজ-নসীহতের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; সাধারণতঃ শ্রোতার প্রশংসা লাভের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করা উদ্দেশ্য হইয়া গিয়াছে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য

ভাষা-পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা শিখে কিয়ামতের দিন তাহার ফরজ ও নফল কোন এবাদত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(٣) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

(پ ١٦ ـ رکوع ١٧)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی اس کے پابند رہئے ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے ۔

৩ হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার পাবন্দি করুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং রিযিক আপনাকে আমিই দিব আর উত্তম পরিণতি তো পরহেজগারীর জন্যই।

(সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১৩২)

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কাহারও রুজির অভাব দূর করিবার চিন্তা হইত তখন তাহাকে নামাযের তাকিদ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া এই কথা বুঝাইতেন যে, রিযিকের প্রশস্ততার ওয়াদা গুরুত্ব সহকারে নামায আদায়ের উপর নির্ভর করে।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উক্ত আয়াত শরীফে নামাযের হুকুম করার সাথে নিজেও যেন নামাযের পাবন্দি করে ইহার হুকুম এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে উপকার বেশী হয়। তবলীগের সাথে সাথে অন্যদেরকে যে জিনিসের হুকুম করা হয় নিজে উহার উপর আমল করিলে অধিক কার্যকরী হয় এবং অন্যদেরকেও আমলের প্রতি যত্নবান হওয়ার কারণ হয়। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস-সালামকে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। যাহাতে লোকদের জন্য আমল করা সহজ হয় এবং কাহারও যেন এই ভয় না থাকে যে, অমুক হুকুম কঠিন ; উহার উপর কিভাবে আমল করিব।

অতঃপর উক্ত আয়াতে রিযিকের ওয়াদা করার কারণ এই যে, সময়মত নামায আদায় করিতে গেলে অনেক সময় রুজি-রোজগার

বিশেষতঃ ব্যবসা ও চাকুরীর ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাথে সাথে সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন যে, ইহা আমার জিম্মায়। এইসব ওয়াদা দুনিয়াবী বিষয়সমূহের ব্যাপারে করা হইয়াছে। অতঃপর আখেরাতের ব্যাপারে আয়াতের শেষাংশে সাধারণ নিয়ম ও স্পষ্ট বিষয় হিসাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, আখেরাতের সুফল ও পুরস্কার তো একমাত্র পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্যই ; ইহাতে অন্য কাহারও অংশই নাই।

(٤) يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۞ (پ ۲۱ ۔ ع ۱۱)

بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ (بیان القرآن)

④ হে বৎস! নামায পড়িতে থাক, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে উহাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে ইহা হিম্মতের কাজ।

(সূরা লুকমান, আয়াত ঃ ১৭) (বয়ানুল কুরআন)

এই আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং যাবতীয় কামিয়াবীর চাবিকাঠি। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলিকেই বিশেষভাবে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছি। সৎকাজের আদেশ সম্পর্কে তো বলাই বাহুল্য ; উহা তো প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছি। নামায যাহা সকল এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ঈমানের পর যাহার স্থান সর্বাগ্রে উহার প্রতিও কি পরিমাণ অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। যাহারা নামায পড়ে না তাহাদের কথা বাদ দিলেও স্বয়ং নামাযী লোকেরাও উহার প্রতি পুরাপুরি গুরুত্ব দেয় না ; বিশেষ করিয়া জামাতের প্রতি। নামায কায়েম করা দ্বারা জামাতের সহিত নামায আদায় করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহা কেবল গরীবদের জন্য রহিয়া গিয়াছে ; ধনী ও সম্মানী লোকদের জন্য মসজিদে যাওয়া যেন একটি লজ্জার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর দরবারে। (কবি বলেন—)

ع آنچہ عار تست آن فخر من است

অর্থাৎ ঃ তোমার জন্য যাহা লজ্জার বিষয় আমার জন্য উহা গৌরবের বিষয়।

(৫) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (پ۴- ع۲)

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلاتے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

(৫) তোমাদের মধ্য হইতে একটি জামাত এমন হওয়া জরুরী ; যাহারা মঙ্গলের দিকে আহবান করিবে, সৎকাজে আদেশ করিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে তাহারাই পূর্ণ কামিয়াব হইবে।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১০৪)

আল্লাহ পাক এই আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের নির্দেশ দান করিয়াছেন। উহা এই যে, উম্মতের মধ্যে একটি জামাত বিশেষভাবে এই কাজের জন্য থাকিতে হইবে, যাহারা ইসলামের দিকে লোকদিগকে তবলীগ করিবে। এই হুকুম মুসলমানদের জন্য ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, এই বুনিয়াদি কাজকে আমরা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। অথচ বিধর্মীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। খৃষ্টানদের স্বতন্ত্র দলসমূহ দুনিয়াব্যাপী তাহাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই কাজের জন্য নির্ধারিত কর্মী রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল মুসলমানদের মধ্যেও কি এইরূপ নির্দিষ্ট কোন জামাত আছে? ইহার উত্তরে 'নাই' না বলিলেও 'আছে' বলাও মুশকিল। বরং কোন জামাত বা ব্যক্তি যদি এই কাজের জন্য দাঁড়ায়ও তবে সাহায্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের প্রশ্ন উঠাইয়া এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। অথচ এইকাজে সাহায্য ও সহানুভূতি করা এবং ত্রুটি–বিচ্যুতি থাকিলে উহার সংশোধন করাই ছিল প্রকৃত হিতকামনা। পক্ষান্তরে, নিজে কোন কাজ না করিয়া যাহারা করে তাহাদের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠানো কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখারই নামান্তর।

(৬) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ

تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے (نفع رسانی) کے لئے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط
(پ۴ - ع۲)

کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔
(بیان القرآن و ترجمہ عاشقی)

(৬) তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদিগকে বাহির করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করিয়া থাক এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১১০, বয়ানুল কুরআন ও তরজমায়ে আশেকী)

মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত—এই কথা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতেও এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতেও শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইঙ্গিতে ইহার কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত এই জন্য যে, তোমরা 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করিয়া থাক।

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফে 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার'কে ঈমানের পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ ঈমান হইল সকল এবাদতের মূল ; ঈমান ব্যতীত কোন ভাল কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈমানের ব্যাপারে তো পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মতও শরীক রহিয়াছে ; কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীকে সমস্ত নবীগণের অনুসারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে উহা একমাত্র আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার, যাহা এই উম্মতের স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ। আর যেহেতু ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য নয় সেইজন্য সাথে সাথেই শর্তস্বরূপ উহাকেও উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার' বিষয়টি উল্লেখ করা, আর যেহেতু উহাই এখানে আলোচনার বিষয় কাজেই উহাকে আগে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'এই উম্মতের জন্য স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ চিহ্ন' হওয়ার অর্থ হইল বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে এই কাজ করিতে হইবে ; শুধুমাত্র চলাফেরার মধ্য দিয়া কিছু তবলীগ করিয়া নিলে যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এইরূপ সংক্ষিপ্ত তবলীগ তো পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যেও পাওয়া যাইত।

যেমন— فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে অন্যান্য দ্বীনি কাজের মত স্বতন্ত্র কাজ মনে করিয়া এই কাজে মশগুল হওয়াই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

(৭) لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

(پ۵ رکوع ۱۴)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (وبرکت) نہیں ہوتی مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں (اور اس تعلیم وترغیب کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں اُن کے مشوروں میں البتہ خیر وبرکت ہے) اور جو شخص یہ کام (یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کریگا (نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے) اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

(৭) "সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শের মধ্যে কোন খায়ের (বরকত) নাই, তবে যাহারা দান-খয়রাত বা কোন নেক কাজ কিংবা মানুষের পরস্পর সংশোধনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে (এবং এই তালীম ও তারগীবের জন্য গোপনে চেষ্টা-তদবীর ও পরামর্শ করে) তাহাদের পরামর্শের মধ্যে অবশ্যই খায়র-বরকত আছে। আর যাহারা (ভাল কাজে উৎসাহ প্রদানের) এই কাজ (লোভ-লালসা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করে, তাহাদিগকে আমি অতি সত্বর বিরাট পুরস্কার দান করিব।" (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৎকাজে আহ্বানকারীদের জন্য বিরাট পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পুরস্কারকে বিরাট বলিয়াছেন, উহার কি কোন সীমা থাকিতে পারে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল করা হইয়াছে যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত মানুষের প্রত্যেক কথা তাহার জন্য বোঝা হইবে।

আরও বহু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না যাহা নফল নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি হইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই! বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, মানুষের মধ্যে পরস্পর

ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া। কেননা, পরস্পর কলহ নেকীসমূহকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়, যেমন ক্ষুর চুলকে সাফ করিয়া দেয়।

পরস্পর কলহ-বিবাদ মিটানোর বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে আরও বহু জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেইগুলি উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হইল, সৎকাজে আদেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া সম্ভব হয় পরস্পর কলহ বিবাদ মিটানোর ব্যাপারে অবশ্যই যেন চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে উপরে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীসের তরজমা দেওয়া হইল। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল হাদীস বর্ণনা করা উদ্দেশ্যও নয় ; সম্ভবও নয়। ইহা ছাড়াও কিছুটা অধিক পরিমাণে আয়াত ও হাদীস যদি জমা করা হয়, তবে ভয় হয় যে, এইগুলি পড়িবে কে, আজকাল এইসব বিষয় পড়ার জন্য কাহারই বা অবসর আছে আর কাহার নিকটই বা সময় আছে। কাজেই শুধু এই বিষয়টি দেখানোর জন্য এবং আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বেশী গুরুত্বের সহিত এই তবলীগের কাজের প্রতি তাকীদ করিয়াছেন আর না করিলে কত কঠোর সাবধানবাণী ও ধমকি প্রদান করিয়াছেন— নিম্নে কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে ঃ

(১) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ (رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والنسائى كذا فى الترغيب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے۔ اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে, যদি হাত দ্বারা বন্ধ করিবার

শক্তি রাখে তবে উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। যদি এই পরিমাণ শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিবে। যদি এই ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে। আর ইহা হইল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।(তারগীবঃ মুসলিম, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

অন্য হাদীসে আছে, যদি তাহার জবান দ্বারা বন্ধ করিবার শক্তি থাকে তবে জবান দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে নতুবা অন্তরে উহাকে ঘৃণা করিবে। ইহাতেও সে দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্তরে উহাকে ঘৃণা করে সেও ঈমানদার বটে কিন্তু ইহা হইতে নিম্নে ঈমানের কোন স্তর নাই।

এই বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এখন উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারেও দেখা উচিত। আমাদের মধ্যে কতজন লোক এইরূপ আছে যে, কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখিয়া উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয় অথবা শুধু জবান দ্বারা উহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় অথবা দুর্বল ঈমান হিসাবে কমপক্ষে অন্তরে উহাকে ঘৃণা করে কিংবা ঐ কাজ হইতে দেখিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করে। নির্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করুন কি হইবার ছিল আর কি হইতেছে !

(۲) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْقَائِمِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ نِ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَّلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا (رواه البخارى والترمذى)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑنے والا ہے اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرعہ سے (مثلاً) جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے (طبق) کے حصہ میں ہوں جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے ہیں اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لئے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے ہی حصہ میں

یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کرلیں گے کہ وہ جانیں ان کا کام جانیں ہمیں اُن سے کیا واسطہ تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔

(২) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখার ভিতরে রহিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মত যাহারা এক জাহাজের যাত্রী এবং লটারীর মাধ্যমে জাহাজের শ্রেণী নির্ধারিত হইয়াছে। কিছুলোক উপর তলায় আছে আর কিছু লোক নীচতলায় আছে। নীচতলাবাসীদের পানির প্রয়োজন হইলে উপর তলায় যাইয়া পানি আনিতে হয়। যদি তাহারা ইহা মনে করে যে, আমাদের বারবার যাওয়া-আসার কারণে উপর তলাবাসীদের কষ্ট হয়, অতএব আমরা যদি আমাদের অংশে অর্থাৎ জাহাজের নীচ দিয়া সমুদ্রে একটি ছিদ্র করিয়া লই, তবে পানি এইখানেই পাওয়া যাইবে ; উপর তলাবাসীদের কষ্ট দিতে হইবে না। এমতাবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি নীচতলার আহমকদিগকে এই কাজে বাধা না দেয় আর মনে করে যে, তাহাদের কাজ তাহারা বুঝিবে তাহাদের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক ; তাহা হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইবে এবং উভয় দল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহাদিগকে বাধা দেয় তবে উভয় দল ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। (বুখারী, তিরমিযী)

একদা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক্‌কার ও পরহেজগার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, পাপকাজ যখন অতিমাত্রায় হইবে।

বর্তমানে চতুর্দিকে মুসলমানদের অধঃপতন ও বরবাদীর গীত গাওয়া হইতেছে ইহার আওয়াজ তোলা হইতেছে এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য নূতন নূতন পথ ও পন্থার প্রস্তাব পেশ করা হইতেছে। কিন্তু (আধুনিক শিক্ষার ভক্ত) কোন নব্য চিন্তাধারার লোক তো দূরের কথা কোন পুরাতন চিন্তাধারার আলেম লোকেরও এই দিকে নজর যায় না যে, প্রকৃত

চিকিৎসক দয়ার নবী কি রোগ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং কি চিকিৎসা বাতলাইয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হইতেছে। এই জুলুমের কি কোন সীমা আছে যে, যাহা রোগ উৎপত্তির কারণ ; যে কারণে রোগ দেখা দিয়াছে উহাই চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। (অর্থাৎ দ্বীন ও দ্বীনের বিধানসমূহকে উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া চিন্তাধারার মাধ্যমে দ্বীনের উন্নতি কামনা করা হইতেছে)। এমতাবস্থায় এই রোগী আগামীকালের পরিবর্তে আজই মারা যাইবে না, তো কি হইবে?

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

মীর ! দেখ, কত সরল ! যে ডাক্তারের ঔষধে অসুস্থ হইয়াছে তাহার পুত্রের নিকট হইতেই ঔষধ লইতেছে।

(۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ اَنَّهٗ كَانَ الرَّجُلُ یَلْقَی الرَّجُلَ فَیَقُوْلُ یَا هٰذَا اِتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ بِهٖ فَاِنَّهٗ لَا یَحِلُّ لَكَ ثُمَّ یَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰی حَالِهٖ فَلَا یَمْنَعُهٗ ذٰلِكَ اَنْ یَّكُوْنَ اَكِیْلَهٗ وَشَرِیْبَهٗ وَقَعِیْدَهٗ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ الی قوله فَاسِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰی یَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهٗ عَلَی الْحَقِّ اَطْرًا۔ (رواہ ابوداؤد والترمذی کذا فی الترغیب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر ایسا نہ کر لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا (یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرماں برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیئے) پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لُعِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سے فَاسِقُوْنَ تک پڑھیں اس کے بعد حضور

نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ اَمر بِالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ظالم کو ظلم سے روکتے رہو، اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔

(৩) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে শুরু হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সময় কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করিত ও বলিত, দেখ আল্লাহকে ভয় কর এইরূপ করিও না। কিন্তু তাহাদের না মানা সত্ত্বেও উপদেশদাতাগণ পূর্ব সম্পর্কের কারণে তাহাদের সহিত খানাপিনা ও উঠাবসা আগের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এইরূপ হইতে লাগিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের একের অন্তরকে অন্যের সহিত মিলাইয়া দিলেন অর্থাৎ নাফরমানদের অন্তর যেইরূপ ছিল তাহাদের সহিত সম্পর্কের কারণে নেক লোকদের অন্তরও ঐরূপ করিয়া দেওয়া হইল। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার সপক্ষে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইতে فٰسِقُوْنَ পর্যন্ত। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব জোর দিয়া হুকুম করিলেন যে, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক। তাহাকে সৎপথে টানিয়া আনিতে থাক। (তারগীব ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন ; আবেগের সহিত উঠিয়া বসিয়া গেলেন এবং কসম খাইয়া বলিলেন ঃ তোমরা যে পর্যন্ত তাহাদেরকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া না রাখিবে সেই পর্যন্ত মুক্তি পাইবে না।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া বলিয়াছেন ঃ তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক এবং সত্যের দিকে টানিয়া আনিতে থাক। না হয় তোমাদের অন্তরকেও ঐরূপ মিলাইয়া দেওয়া হইবে যেইরূপ তাহাদের করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে যেইভাবে অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে বনী ইসরাঈলের উপর।

ইহার সপক্ষে কুরআনের আয়াত এইজন্য তেলাওয়াত করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাহাদের উপর লা'নত করিয়াছেন এবং

উহার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা 'অসৎকাজে একে অপরকে নিষেধ করিত না'।

আজকাল সকলের সাথে তাল মিলাইয়া চলাকে প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া মনে করা হয়। পরিবেশের সাথে তাল মিলাইয়া কথা বলাকে উন্নত চরিত্র ও নৈতিক উদারতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বরং যে ক্ষেত্রে সৎকাজে আদেশ ইত্যাদি ফলদায়ক হইবে না বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়ত চুপ থাকার কিছু অবকাশ থাকিবে কিন্তু হাঁর সাথে হাঁ মিলানোর অবকাশ নাই। আর যে ক্ষেত্রে ফলদায়ক হইতে পারে যথা আপন সন্তান, পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের ক্ষেত্রে অন্যায় দেখিয়া চুপ থাকাকে কিছুতেই চারিত্রিক উদারতা বলা যায় না ; বরং যে চুপ থাকিবে সে শরীয়ত ও সমাজ উভয় দৃষ্টিতেই অপরাধী।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশী ও বন্ধু মহলে প্রিয় ও প্রশংসনীয় হয় (বেশী সম্ভাবনা যে,) এইরূপ লোক মুদাহিন হইবে (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তাল মিলাইয়া চলে)।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কোন গোনাহের কাজ গোপনে করা হয় উহাতে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যদি কোন গোনাহের কাজ প্রকাশ্যে করা হয় এবং লোকেরা উহাকে বন্ধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বন্ধ করে না তবে উহার ক্ষতিও ব্যাপক হয়।

এখন প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারেই চিন্তা করিয়া দেখুক কত গোনাহের কাজ তাহার জানা মতে এমন করা হইতেছে যেগুলিকে সে বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছে। ইহার চাইতেও বড় জুলুমের কথা এই যে, আল্লাহর কোন বান্দা উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা করিলে তাহার বিরোধিতা করা হয়, তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয় এবং সাহায্য করার পরিবর্তে তাহার মোকাবেলা করা হয়। فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ('জালেমগণ অতি শীঘ্রই জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।')

(৪) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يُّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت وقوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے

وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا (رواه ابوداؤد وابن ماجة وابن حبان والاصبهانى وغيرهم كذا فى الترغيب)

پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যদি কোন কওম বা জামাতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং ঐ কওম বা জামাতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে উক্ত গোনাহ হইতে বাধা না দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাহাদের উপর আল্লাহর আজাব আসিয়া যায়।

(তারগীব ঃ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ইস্‌বাহানী)

হে আমার মুখলেস বুযুর্গ এবং ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতিকামী বন্ধুগণ ! ইহাই হইল মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্রমবর্ধমান অবনতির কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরিচিত ও সমপর্যায়ী লোকদেরকে নহে বরং আপন পরিবার–পরিজন, সন্তান–সন্ততি অধীনস্থ ও ছোটদের প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখুন তাহারা কি পরিমাণ প্রকাশ্য গোনাহের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে ; আর আপনারা নিজেদের প্রভাব–প্রতিপত্তি দ্বারা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছেন কিনা। বাধা দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিন বাধা দেওয়ার এরাদাই বা করেন কিনা। অথবা এই আশঙ্কা আপনার মনে আসে কিনা যে, আমার প্রিয়পুত্র কি করিতেছে। যদি সে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় কাজ করে বা অপরাধও নহে শুধু সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক সভা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, তবে আপনিও উহাতে জড়াইয়া পড়ার ভয়ে চিন্তিত হইয়া যান। তাহাকে শাসন করা হয় এবং নিজে নির্দোষ ও দায়মুক্ত থাকিবার জন্য বিভিন্ন রকম তদবীর করা হয়। কিন্তু আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তায়ালার নাফরমানের সাথেও কি সেই আচরণ করা হয় যাহা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নগণ্য সরকারী অপরাধীর সাথে করা হয়।

আপনি ভাল করিয়া জানেন—আপনার প্রিয়পুত্র দাবা খেলায় আসক্ত ও তাসখেলায় ডুবিয়া থাকে, কয়েক ওয়াক্তের নামায ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আফসোস ! কখনও আপনার মুখ হইতে ভুলেও এই কথা বাহির হয় না যে, বেটা ! কি করিতেছ? ইহা তো মুসলমানের কাজ নয়। অথচ তাহার সহিত খানাপিনাও ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম ছিল, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بکجا.

দেখ উভয় পথের মধ্যে কত দূরত্ব কত পার্থক্য !

এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে, যাহারা ছেলের উপর এইজন্য নারাজ যে, ছেলে অলস ও ঘরে বসিয়া থাকে ; চাকরির চেষ্টা করে না অথবা দোকানের কাজে মনোযোগ দেয় না ; কিন্তু এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে যাহারা ছেলের উপর এই জন্য নারাজ হয় যে, সে জামাতে নামায আদায় করে না কিংবা নামায কাজা করিয়া দেয়।

বুযুর্গ ও বন্ধুগণ ! দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা যদি শুধু আখেরাতের জন্যই ক্ষতিকর হইত তবুও ইহা হইতে বহু দূরে সরিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সর্বনাশ তো এই যে, যে দুনিয়াকে আমরা কার্যতঃ আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি, সেই দুনিয়ার ধ্বংসও দ্বীনের প্রতি এই উদাসীনতার কারণেই হইতেছে। চিন্তা করুন—এই অন্ধত্বের কি কোন সীমা আছে?

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

অর্থাৎ, এই দুনিয়াতে যাহারা অন্ধ থাকিবে তাহারা আখেরাতেও অন্ধ থাকিবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭২)

আসল কথা হইল, যেন এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি—

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তর ও তাহাদের কানের উপর সিল–মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর পর্দা পড়িয়া আছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৭)

(৫) رُوِیَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا قَالَ يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِي

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ (کلمۂ توحید) لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ) کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے. صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے

اللهِ فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ. (رواه الاصبهانى ترغيب)

بے پرواہی واستخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے.

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ কালেমায়ে তাওহীদ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ইহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার করিতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব ও বালা–মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করা হয়। সাহাবীগণ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন ঃ প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় আর উহাকে বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় না। (তারগীব ঃ ইস্‌বাহানী)

এখন আপনিই একটু ইনসাফ করিয়া বলুন, বর্তমানে আল্লাহর নাফরমানীর কি কোন সীমারেখা আছে? এবং উহাকে বাধা দেওয়ার অথবা বন্ধ করার কিংবা কিছুটা কমাইয়া আনার কি কোন চেষ্টা চলিতেছে? নিশ্চয়ই না। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় মুসলমান যে জগতের বুকে টিকিয়া আছে ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহমাত্র। নতুবা আমরা আমাদের ধ্বংসের জন্য কোন্ কাজটি করিতে বাকী রাখিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়াবাসীর উপর যদি আল্লাহর আজাব নাযিল হয় এবং সেখানে কিছু দ্বীনদার লোকও থাকেন, তবে তাহাদেরও কি কোন ক্ষতি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ফরমাইলেন ঃ দুনিয়াতে তো সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু আখেরাতে তাহারা গোনাহগারদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। অতএব, ঐ সমস্ত লোক যাহারা নিজেদের ধর্ম–কর্মের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া লোক সমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে বসিয়া রহিয়াছেন তাহারা যেন ইহা হইতে বে–ফিকির না থাকেন। কেননা, খোদা না করুন, যদি পাপের ব্যাপকতার কারণে কোন আজাব আসিয়া পড়ে তবে তাহাদিগকেও উহার স্বাদ ভোগ করিতে হইবে।

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت کدہ پر

فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُولُ لَكُمْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلَا اُجِيْبَ لَكُمْ وَتَسْأَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ (رواه ابن ماجة وابن حبان فی صحیحه كذا فی الترغیب)

تشریف لائے تو میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، حضورؐ نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سُننے کھڑی ہوگئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں حضورؐ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آجائے کہ تم دُعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سُوال کرو اور سُوال پورا نہ کیا جائے تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمھاری مدد نہ کروں"۔ یہ کلمات طیبات حضورؐ نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

(৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ আনিলেন, আমি তাঁহার চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও সাথে কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া ওযু করিয়া মসজিদে তশরীফ নিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে তশরীফ রাখিলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন ঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা এমন সময় হয়ত আসিয়া পড়িবে যখন তোমরা দোয়া করিবে কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না, তোমরা সওয়াল করিবে কিন্তু উহা পূরণ করা হইবে না, তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব না।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র কথা কয়টি বলিয়া মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন।

(তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

এই বিষয়টির প্রতি যেন ঐ সকল লোক বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, যাহারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য দ্বীনি বিষয়সমূহে অবহেলা ও শিথিলতার উপর জোর দিয়া থাকেন। কেননা, এই হাদীসেই প্রমাণ রহিয়াছে যে, মুসলমানদের সাহায্য একমাত্র দ্বীনের মজবুতীর উপরই নির্ভর করে।

বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। নচেৎ তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা এমন জালেম বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দিবেন, যে তোমাদের বড়দের সম্মান করিবে না, তোমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করিবে না। ঐ সময় তোমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ দোয়া করিবেন কিন্তু উহা কবুল হইবে না, তোমরা সাহায্য চাহিবে কিন্তু সাহায্য করা হইবে না। তোমরা ক্ষমা চাহিবে কিন্তু ক্ষমা করা হইবে না।

স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ পাকও তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ৭)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেহই জয়লাভ করিতে পারিবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন, তবে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারে? আর মুমিনদের একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৬০)

'দুররে মান্‌সূর' কিতাবে তিরমিযী শরীফের সূত্রে হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর স্বীয় আজাব নাযিল করিয়া দিবেন। তখন তোমরা দোয়া করিলেও দোয়া কবুল হইবে না।

আমার বুযুর্গ বন্ধুগণ ! এখানে পৌছিয়া প্রথমে চিন্তা করুন, আমরা

আল্লাহ তায়ালার কি পরিমাণ নাফরমানী করিতেছি তখন বুঝে আসিয়া যাইবে যে, কেন আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে এবং কেনই বা আমাদের দোয়া কবুল হইতেছে না। আমরা কি উন্নতির বীজ বপন করিতেছি, না অবনতির।

(٧) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِیَ الدُّنْیَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَیْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَکَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ حُرِمَتْ بَرَکَةَ الْوَحْیِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِیْ سَقَطَتْ مِنْ عَیْنِ اللّٰهِ ۔
(کذا فی الدر عن الحکیم الترمذی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری اُمت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جلّ شانہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

(৭) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালি–গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে। (দুরর ঃ হাকীম তিরমিযী)

হে জাতির উন্নতিকামী বন্ধুগণ ! ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতির জন্য তো সকলেই চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু উহার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে সেইগুলি অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। যদি আসলেই আপনারা আপনাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকার রাসূল মনে করিয়া থাকেন তাঁহার তালীমকে সত্যিকার তালীম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তবে কি কারণে যে জিনিসকে তিনি রোগের কারণ বলিতেছেন ; যেইসব জিনিসকে তিনি রোগের মূল বলিতেছেন উহাকেই আপনারা রোগের চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন ?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,

'কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার খাহেশ ঐ দ্বীনের অধীন না হইবে যাহা আমি লইয়া আসিয়াছি।' কিন্তু আপনাদের অভিমত হইল, ধর্মের বাধাকে মাঝখান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে আমরাও অন্যান্য জাতির মত উন্নতি করিতে পারি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

(پ۲۵ - ع ۳)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اُس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اُس کا کچھ حصّہ نہیں۔

(بیان القرآن)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাহার ফসলে উন্নতি দান করিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে দুনিয়া হইতে সামান্য কিছু দিব কিন্তু আখেরাতে তাহার কোন অংশই নাই।

(সূরা শূরা, আয়াত ঃ ২০)(বয়ানুল কুরআন)

হাদীস শরীফে আছে, যে মুসলমান আখেরাতকে নিজের লক্ষ্যবস্তু বানাইয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরকে ধনী বানাইয়া দেন এবং দুনিয়া অপদস্থ হইয়া তাহার নিকটে হাজির হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আপন লক্ষ্যবস্তু বানাইয়া লয় সে বিভিন্ন রকমের পেরেশানীতে লিপ্ত হয় আর দুনিয়া হইতে যতটুকু তাহার ভাগ্যে নির্ধারিত হইয়াছে উহার চাইতে অধিক সে পাইতেই পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও, আমি তোমার অন্তরকে চিন্তামুক্ত করিয়া দিব এবং তোমার অভাব দূর করিয়া দিব। আর যদি তাহা না কর তবে তোমার অন্তরকে শত শত পেরেশানী দ্বারা ভর্তি করিয়া দিব এবং তোমার অভাবও দূর করিব না।

ইহা তো হইল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের কথা। আর আপনাদের অভিমত হইল, উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা এইজন্য পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে যে, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হয় মোল্লারা উহাতে বাধার সৃষ্টি করে। আপনারাই একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখুন—এই মোল্লারা যদি এতই লোভী হইয়া থাকে, তাহা হইলে

আপনাদের উন্নতি তো তাহাদেরই খুশী ও আনন্দের কারণ হইবে। কেননা আপনাদের ধারণা মতে তাহাদের রুজি যখন আপনাদের দ্বারাই আসে, তখন যে পরিমাণ পার্থিব উন্নতি ও সচ্ছলতা আপনাদের হইবে উহা তাহাদেরও উন্নতি ও সচ্ছলতার কারণ হইবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এইসব স্বার্থপর (?) মোল্লাগণ আপনাদের বিরোধিতা করেন। নিশ্চয়ই কোন অপারগতার কারণে বাধ্য হইয়া তাহারা দুনিয়ার লাভকে বিসর্জন দিতেছেন এবং আপনাদের মত দরদী বন্ধুদের হইতে দূরে সরিয়া যেন নিজেদের দুনিয়া নষ্ট করিতেছেন।

বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করিয়া দেখুন—যদি এই মোল্লাগণ এইরূপ কোন কথা বলেন, যাহা কুরআন পাকেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, তবে শুধুমাত্র জিদ ও হিংসার বশবর্তী হইয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া সুস্থ জ্ঞানেরই শুধু বিপরীত নয় বরং ইসলামের শানেরও খেলাফ। কারণ, এই মোল্লারা যতই অনুপযুক্ত হউন না কেন ; যখন তাহারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিস্কার বাণীসমূহ আপনাদের নিকট পৌঁছাইতেছেন তখন এইগুলির উপর আমল করা আপনাদের উপর ফরজ ; অমান্য করিলে অবশ্য জবাবদেহী করিতে হইবে। চরম পর্যায়ের বোকা মানুষও এই কথা বলিতে পারে না যে, সরকারী আইনের এইজন্য কোন পরোয়া করি না যেহেতু ঘোষণাকারী একজন মেথর ছিল।

আপনাদের জন্য ইহাও বলা উচিত নয় যে, এই মৌলবীরা ধর্মীয় কাজে সীমাবদ্ধ থাকার দাবী করা সত্ত্বেও সর্বদা দুনিয়ার মানুষের নিকট সওয়াল করিয়া থাকেন। কেননা, আমার যতটুকু ধারণা—প্রকৃত আলেম কখনও নিজের জন্য সওয়াল করেন না, বরং যিনি যে পরিমাণ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তিনি হাদিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ অমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। হাঁ, কোন দ্বীনি কাজের জন্য সওয়াল করিলে তিনি নিজের জন্য সওয়াল না করার যে সওয়াব পাইতেন তাহা অপেক্ষা ইনশাআল্লাহ বেশী সওয়াবের ভাগী হইবেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, দ্বীন-ইসলামে বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগী হওয়ার কোন শিক্ষা নাই বরং ইহাতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিকে সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনেই বলিয়াছেন ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি

হইতে রক্ষা কর।

উক্ত দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে এই আয়াতের উপর খুবই জোর দেওয়া হয় ; যেন পুরা কুরআন শরীফে আমলের জন্য শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই নাযিল হইয়াছে। অথচ সর্বপ্রথম তো আয়াতটির ব্যাখ্যা অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত ছিল। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, শুধুমাত্র শাব্দিক তরজমা দেখিয়াই নিজেকে কুরআনের আলেম মনে করা মূর্খতার শামিল।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ও তাবেয়ীন হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার কল্যাণের অর্থ হইল সুস্বাস্থ্য ও প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ নেক বিবি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ এলেম ও এবাদত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ পবিত্র মাল। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, নেক সন্তান ও মখলুকের প্রশংসা। হযরত জাফর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, স্বাস্থ্য, যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক, আল্লাহর কালামের অর্থ বুঝিতে পারা, শত্রুর উপর জয়লাভ করা এবং নেক লোকের সঙ্গ লাভ করা।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াত দ্বারা যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার উন্নতি উদ্দেশ্য হয়—যেমন আমারও মন ইহা চায়—তবু লক্ষ্য করার বিষয় হইল এই আয়াতে উহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিতে বলা হইয়াছে ; দুনিয়ার মধ্যে লিপ্ত হইতে বা উহার মধ্যে পরিপূর্ণ মত্ত হইতে বলা হয় নাই। আর আল্লাহর দরবারে চাওয়া—চাই ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের ব্যাপারেই হউক না কেন—ইহা তো সরাসরি দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ দুনিয়া হাসিল করিতে এবং দুনিয়া কামাই করিতে কে নিষেধ করে? অবশ্যই হাসিল করুন এবং খুব আগ্রহ সহকারে হাসিল করুন ; আমাদের কখনও এই উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়ার মত উপকারী ও লাভজনক বস্তুকে আপনি ছাড়িয়া দিন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হইল, যতটুকু চেষ্টা-পরিশ্রম দুনিয়ার জন্য করেন উহা হইতে বেশী না হইলেও কমপক্ষে উহার সম পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা দ্বীনের জন্য করুন। কেননা, আপনারই কথা অনুসারে উক্ত আয়াতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে। নতুবা আমার প্রশ্ন হইল যে কুরআনে উক্ত আয়াত রহিয়াছে সেই কুরআনেই এই আয়াতও রহিয়াছে, যাহা এই কিতাবে কিছু পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ—

(১)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ

ইহা ছাড়াও এই বিষয় সম্পর্কিত আরও অন্যান্য আয়াত পেশ করা হইল ঃ

(২)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○ (پ ۱۵ - ع ۳)

(৩)

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ (سورة ال عمران ركوع ۲)

(৪)

مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ○ (پ ۴ - ع ۶ آل عمران)

(৫)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ○ (پ ۵ - نساء)

(৬)

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ (سورة انعام ع ۴ پ ۷)

(৭)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

(৮)

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (سورة انفال ع ۹ پ ۱۰)

(৯)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○ (سورة توبه ع ۶ پ ۱۰)

(১০)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (سورة هود ع ٢ پ ١٢)

(১১)

وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ پ ١٣

(১২)

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ (پ ١٤ سوره نحل ع ١٤)

নিম্নে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক তরজমা দেওয়া হইল ঃ

(১) যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাহার ফসল বৃদ্ধি করিয়া দেই আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে উহা হইতে কিছু অংশ দান করি ; আর আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই।

(সূরা শূরা, আয়াত ঃ ২০)

(২) যাহারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া চায়, আমি দুনিয়াতেই তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা এবং যতখানি ইচ্ছা দিয়া থাকি। অতঃপর তাহার জন্য যে জাহান্নাম তৈরী রাখিয়াছি উহাতে সে পর্যুদস্ত ও অপদস্থ হইয়া প্রবেশ করিবে। আর যাহারা আখেরাত চায় এবং উহার জন্য ঈমান সহকারে যথার্থ চেষ্টাও করে তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা রক্ষা করা হইবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১৯)

(৩) উহা দুনিয়াবী জীবনের ভোগ–সামগ্রী মাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে সুন্দর পরিণাম। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৪)

(৪) তোমাদের মধ্যে কেহ দুনিয়া চায় আবার কেহ আখেরাত চায়।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৫২)

(৫) আপনি বলিয়া দিন, দুনিয়ার চীজ–আসবাব অতি তুচ্ছ। আর যাহারা আল্লাহকে ভয় করে তাহাদের জন্য আখেরাতই উত্তম।

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৭)

(৬) দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং

পরহেজগারদের জন্য আখেরাতই উত্তম। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৩২)

(৭) যাহারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা ও তামাশার বস্তু বানাইয়াছে, তাহাদেরকে আপনি ত্যাগ করুন। বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবন তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। (সূরা আনআম , আয়াত ঃ ৭০)

(৮) তোমরা দুনিয়ার মাল-মাত্তা চাও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পছন্দ করেন আখেরাত। (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৬৭)

(৯) তোমরা কি আখেরাতকে বাদ দিয়া দুনিয়ার জীবন লইয়া সন্তুষ্ট আছ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৩৮)

(১০) যাহারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে আমি এখানেই তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া দেই এবং তাহাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। আখেরাতে তাহাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নাই আর এখানে তাহারা যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবকিছুই ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে। (সূরা হূদ , আয়াত ঃ ১৫)

(১১) তাহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লইয়া আনন্দে মাতিয়াছে ; অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জিন্দেগী অতি তুচ্ছ।(সূরা রা'দ, আয়াতঃ ২৬)

(১২) তাহাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট আজাব। কেননা, তাহারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়াকে পছন্দ করিয়াছে। (সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ১০৬, ১০৭)

উপরোক্ত আয়াতগুলি ছাড়াও আরও অনেক আয়াত এমন রহিয়াছে যেগুলির মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতকে পরস্পর তুলনা করা হইয়াছে। এখানে সমস্ত আয়াত পেশ করা উদ্দেশ্য নয় এবং প্রয়োজনও নাই। কেবল নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়া দেওয়া হইল। এ সম্পর্কীয় কুরআনের সমস্ত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, আখেরাতের মোকাবেলায় যে সমস্ত লোক দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তাহারা চরম পর্যায়ের ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে।

যদি দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে আপনি সামলাইতে না পারেন, তবে তো শুধু আখেরাতই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। দুনিয়ার জীবনে মানুষ পার্থিব প্রয়োজন ও জরুরতের খুবই মুখাপেক্ষী—এই কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু শুধু এই কারণে যে, মানুষের পায়খানায় যাওয়া খুবই জরুরী ইহা ছাড়া উপায় নাই ; সেইজন্য দিনভর সেখানে বসিয়া থাকিবে ইহা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মানিয়া লইবে না।

আল্লাহ তায়ালার হেকমতের প্রতি গভীর দৃষ্টি করিলে এই কথা বুঝা

যাইবে যে, পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি জিনিসের একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ; আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নামাযের ওয়াক্তসমূহ যেভাবে বন্টন করা হইয়াছে উহাতে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্ধেক সময় বান্দার হক। যাহাকে সে নিজের আরাম-আয়েশের জন্যও ব্যবহার করিতে পারে কিংবা জীবিকা অর্জনেও খরচ করিতে পারে। আর বাকী অর্ধেক আল্লাহর হক। এমতাবস্থায় আপনার উক্তি অনুযায়ী দ্বীন ও দুনিয়াকে যখন সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে, তখন দিবা-রাত্রির অর্ধেক সময় দ্বীনের কাজে এবং বাকী অর্ধেক সময় দুনিয়ার কাজে খরচ হওয়া উচিত। নতুবা দুনিয়ার ব্যস্ততায় যদি অর্ধেকের বেশী সময় রুজি রোজগারে কিংবা আরাম-আয়েশে খরচ করা হয়, তবে এই কথা নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আপনার উক্তি অনুযায়ী ইনসাফের কথা ইহাই হয় যে, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্য হইতে বার ঘন্টা দ্বীনের জন্য খরচ করা হইবে ; তাহা হইলেই দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই হক আদায় হইবে এবং এই কথা বলা যাইবে যে, ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই তালীম দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এইসব বিষয় এখানে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য সংক্ষেপে কেবল ইশারা করা হইল মাত্র।

এই পরিচ্ছেদে তবলীগ সম্পর্কীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সেইসব হাদীস হইতে মাত্র সাতটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। কারণ, যাহারা আমল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য সাতটি কেন একটি হাদীসই যথেষ্ট। আর যাহারা মানিবে না তাহাদের জন্য এই আয়াতের মর্ম যথেষ্টের উপর অতিরিক্ত। فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ('শীঘ্রই জালেমরা জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।')

পরিশেষে একটি জরুরী আরজ—বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, 'ফেৎনার যুগে যখন কৃপণতা বৃদ্ধি পাইবে, মানুষ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তি ও নফসের অনুসরণ করিবে, দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিবে, প্রত্যেকে নিজের অভিমতকেই শুধু পছন্দ করিবে ; অন্য কাহারও কথা মোটেও শুনিবে না—তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের সংশোধনের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করার হুকুম দিয়াছেন।' কিন্তু বুযুর্গ মাশায়েখগণের মতে এখনও সেই সময় আসে নাই। কাজেই যাহা কিছু করিবার এখনই সময় থাকিতে করিয়া লওয়া উচিত।

কারণ আল্লাহ না করুন দেখিতে দেখিতে সেই সময় হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইয়া যাইবে আর তখন কোন প্রকার এসলাহ ও সংশোধন সম্ভব হইবে না। সেইসঙ্গে শেষোক্ত এই হাদীসটিতে যে দোষগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি হইতেও বিশেষভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত। কেননা, এই দোষগুলিই হইল যাবতীয় ফেতনার দরজা। এইগুলির পর শুধু ফেতনাই ফেতনা হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এই দোষগুলিকে ধ্বংসকারী দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী ফেতনা হইতে হেফাজত করুন, আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সতর্ক করা উদ্দেশ্য, আর উহা এই যে, বর্তমান যুগে তবলীগের কাজে যেরূপ অবহেলা করা হইতেছে এবং ব্যাপকভাবে মানুষ এই কাজ হইতে একেবারে গাফেল হইয়া যাইতেছে, অনুরূপভাবে কোন কোন লোকের মধ্যে একটি বিশেষ রোগ এই দেখা দিয়াছে যে, যখনই তাহারা ওয়াজ–নসীহত, লেখা, বক্তৃতা ও তালীম–তবলীগ ইত্যাদি কোন দ্বীনি দায়িত্বের কাজ আরম্ভ করে তখনই তাহারা অন্যের ফিকিরে এমন ব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিজের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। অথচ অপরের সংশোধনের তুলনায় নিজের সংশোধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। অন্যকে নসীহত করিবে অথচ নিজে গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে—এইরূপ করা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

মেরাজের রাত্রিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোক দেখিতে পান, যাহাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। তিনি তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহারা আপনার উম্মতের ঐ সকল ওয়ায়েজ ও বক্তা, যাহারা অন্যদেরকে নসীহত করিত কিন্তু নিজেরা ঐ নসীহতের উপর আমল করিত না। (মিশকাত শরীফ)

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিছুসংখ্যক জান্নাতী লোক কোন কোন জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমরা এইখানে কিভাবে পৌঁছিলে অথচ আমরা তো তোমাদের কথার উপর আমল করিয়াই জান্নাতে পৌঁছিয়াছি। তাহারা বলিবে, আমরা তোমাদিগকে নসীহত করিতাম কিন্তু

নিজেরা আমল করিতাম না।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, বদকার আলেমদের প্রতি জাহান্নামের আজাব অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে। মূর্তিপূজকদের আগেই তাহাদিগকে আজাব দেওয়া হইতেছে বলিয়া তাহারা যখন আশ্চর্যবোধ করিবে তখন তাহারা উত্তর পাইবে যে, জানিয়া–শুনিয়া অপরাধ করা আর না জানিয়া অপরাধ করা সমান হইতে পারে না।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজে আমল করে না, তাহার ওয়াজ–নসীহত উপকারী হয় না। এই কারণেই বর্তমান যুগে প্রতিদিন জলসা–জলূস ও ওয়াজ–নসীহত হইতেছে, বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ–নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু সবই বেকার ও নিষ্ফল সাব্যস্ত হইতেছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
(ع-٥)

کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ پڑھتے ہو کتاب کیا تم سمجھتے نہیں
(ترجمہ عاشقی)

অর্থাৎ "তোমরা কি অন্য লোকদিগকে সৎকাজে আদেশ করিতেছ এবং নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইতেছ অথচ তোমরা কিতাব পড়িয়া থাক, তোমরা কি বুঝ না?" (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৪৪)(তরজমায়ে আশেকী)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান ঃ

مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ (ترغيب عن البيهقي وغيره)

قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک چار سوال نہ کر لیے جاویں. عمر کس مشغلہ میں ختم کی. جوانی کس کام میں خرچ کی. مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا. اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا.

"কেয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজ জায়গা হইতে আপন কদম বিন্দুমাত্রও হটাইতে পারিবে না—এক. জীবন কোন্ কাজে শেষ করিয়াছ? দুই. যৌবন কি কাজে ব্যয়

করিয়াছ? তিন. ধন–দৌলত কিভাবে উপার্জন করিয়াছিলে এবং কি কি কাজে খরচ করিয়াছিলে? চার. স্বীয় এলেমের উপর কতটুকু আমল করিয়াছিলে?"

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বড় সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয় এই বিষয়ে যে, না জানি কেয়ামতের দিন আমাকে সকলের সামনে ডাকিয়া এই প্রশ্ন করা হয় যে, যতটুকু এলেম শিখিয়াছিলে উহার উপর কতটুকু আমল করিয়াছ। (তারগীব ঃ বাইহাকী)

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী জানিতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত মখলুকের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি ফরমাইলেন, খারাপের প্রশ্ন করিও না ভালর কথা জিজ্ঞাসা কর ; নিকৃষ্টতম আলেমগণই হইল নিকৃষ্টতম মখলুক।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এলেম দুই প্রকার—এক প্রকার যাহা শুধু জবান পর্যন্তই সীমিত থাকে ; অন্তরে কোনরূপ আছর করে না, কিয়ামতের দিন এইরূপ এলেম ঐ আলেমের বিরুদ্ধে কঠিন প্রমাণস্বরূপ হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার এলেম যাহা অন্তরে আছর করিয়া থাকে এবং ইহাই উপকারী এলেম।

মোটকথা, জাহেরী এলেমের সাথে সাথে বাতেনী এলেমও হাসিল করিতে হইবে যাহাতে এলেমের গুণে অন্তরও গুণান্বিত হয়। আর যদি এলেম অন্তরে আছর না করে, তবে এই এলেমই কিয়ামতের দিন আলেমের বিরুদ্ধে সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তুমি এলেম অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ?

আরও বহু হাদীসে এই অবস্থার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ ভাইদের খেদমতে আমার আরজ—তাঁহারা যেন সর্বপ্রথম নিজেদের জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের ফিকির করেন। তাহা না হইলে, খোদা না করুন এই সমস্ত ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়িয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে এই অধম গোনাহগারকেও জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের তওফীক দান করুন ; কারণ, নিজ হইতে অধিক বদ আমলওয়ালা আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আল্লাহ যদি একমাত্র তাঁহার অপার মেহেরবানীতে আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদেও একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুবাল্লিগ ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। যাহা নিতান্ত জরুরী। আর তাহা এই যে, অনেক সময় তবলীগের কাজে সামান্যতম অসাবধানতার কারণে লাভের সহিত ক্ষতিও শামিল হইয়া যায়। এইজন্য অতি জরুরী হইল যে, এই ক্ষেত্রে সাবধানতার সবকয়টি দিকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বহু লোক তবলীগের জোশে আসিয়া অন্য মুসলমানের মর্যাদাহানি করিতেও পরোয়া করে না। অথচ মুসলমানের ইজ্জত একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ. (رواه مسلم وابوداود وغيرهما ترغيب)

جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہٗ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন করিয়া রাখেন এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যে পর্যন্ত সে আপন ভাইয়ের সাহায্য করে।" (তারগীব ঃ মুসলিম, আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ حَتّٰى يَفْضَحَهٗ بِهَا فِيْ بَيْتِهٖ. (رواه ابن ماجه ترغيب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہٗ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہٗ اس کی پردہ دری فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ–ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ–ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন। আর যে

ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেন, এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেন।" (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ)

মোটকথা, বহু হাদীসে এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগগণের জরুরী কর্তব্য হইল, মুসলমানদের দোষ–ত্রুটি গোপন করা। ইহা হইতে আরও অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হইল মুসলমানদের ইজ্জতের হেফাজত করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও তাহাকে সাহায্য করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন সময় সাহায্য করিবেন না যখন সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইবে।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা।

এমনিভাবে অনেক রেওয়ায়াতে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ ভাইগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিবেন যে, অসৎকাজে নিষেধ করিতে গিয়া যেন নিজের পক্ষ হইতে কাহারও দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করা না হয়। যে দোষ–ত্রুটি গোপনে জানা যাইবে গোপনেই যেন তাহা নিষেধ করা হয় আর যাহা প্রকাশ্যে করা হয় উহার নিষেধও প্রকাশ্যে করা চাই ; তবে বাধা দেওয়ার সময় ইজ্জতের হেফাজতের ব্যাপারে যথাসাধ্য ফিকির অবশ্যই রাখিতে হইবে। নতুবা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের আশঙ্কাই বেশী।

মোটকথা, অসৎকাজে নিষেধ অবশ্যই করিতে হইবে, কেননা এ সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উল্লেখ করা হইল সেইগুলি অত্যন্ত কঠোর। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে গিয়া অন্যের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পন্থা এই যে, প্রকাশ্য অন্যায়ের প্রতিকার যেমন নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্যে করা হইবে, তেমনি খুবই খেয়াল রাখিতে হইবে—যে গোনাহ অন্যায়কারীর পক্ষ হইতে প্রকাশ না পায় উহা নিষেধ করিতে গিয়া নিজের পক্ষ হইতে যেন এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করা হয় যাহার দরুন উহা প্রকাশ হইয়া যায়।

তবলীগের আদবের মধ্যে ইহাও একটি আদব যে, নম্রতা অবলম্বন করিবে। খলীফা মামুনুর রশীদকে কোন ব্যক্তি কঠোর ভাষায় নসীহত করিলে তিনি বলিলেন, নম্রভাবে নসীহত করুন। কেননা, আল্লাহ পাক

আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ)কে আমার চাইতে অধম ফেরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন নম্রভাবে নসীহত করিতে বলিয়াছিলেন ঃ

قُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

অর্থাৎ, তোমরা তাহাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে, হয়ত সে নসীহত কবুল করিয়া নিবে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ৪৪)

এক যুবক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে জেনার অনুমতি দিয়া দিন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ রাগান্বিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুবককে ডাকিয়া আরও কাছে আনিলেন এবং বলিলেন, দেখ তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, কোন ব্যক্তি তোমার মায়ের সহিত জেনা করুক? সে উত্তরে বলিল আমার জীবন আপনার উপর কোরবান হউক, ইহা কখনও হইতে পারে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে না যে, কেহ তাহার মায়ের সহিত জেনা করুক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কেহ তোমার মেয়ের সহিত জেনা করুক? সে উত্তরে বলিল আমার জান আপনার উপর কোরবান হউক, আমি ইহা কখনও পছন্দ করি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঠিক এইভাবেই অন্য কোন লোকও পছন্দ করে না যে, তাহার মেয়েদের সহিত জেনা করা হউক। এইভাবে বোন, খালা, ফুফুর বিষয়ও উল্লেখ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের বুকের উপর হাত রাখিয়া দোআ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! তাহার অন্তরকে পবিত্র করিয়া দিন, গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং লজ্জাস্থানকে গোনাহ হইতে হেফাজত করুন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে জেনার চাইতে ঘৃণিত তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না।

মোটকথা, কাহাকেও বুঝানোর সময় দোয়া, চেষ্টা, নসীহত ও নম্রতার সহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বুঝাইবে যে, তাহার স্থলে কেহ আমাকে নসীহত করিলে আমি নিজের জন্য কিরূপ ব্যবহার পছন্দ করিতাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদেও মোবাল্লিগগণের খেদমতে একটি জরুরী বিষয় আরজ করিতেছি—তাঁহারা যেন নিজেদের বয়ান ও লেখনীকে পরিপূর্ণ এখলাসের গুণে গুনান্বিত করেন। কেননা, এখলাসের সহিত অল্প আমলও দ্বীনী এবং দুনিয়াবী ফলাফলের দিক দিয়া অনেক বড়। আর এখলাসবিহীন আমল না দুনিয়াতে কোন উপকার পৌঁছায় না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন পুরস্কার পাওয়া যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

(مشكوٰة عن مسلم)

حق تعالیٰ شانہٗ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں.

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছূরত ও সম্পদ দেখেন না; তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? তিনি উত্তর করিলেন, এখলাস। 'তারগীব' নামক কিতাবের অনেক রেওয়ায়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

আরও এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশের গভর্নর বানাইয়া পাঠাইতেছিলেন, তখন তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন ঃ "দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে। কেননা, এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।"

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলের মধ্যে শুধু ঐ আমলই কবুল করেন যাহা একমাত্র তাঁহার জন্যই করা হয়।

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ فَهُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهٗ

(مشكوٰة عن مسلم)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি অংশীদারীর ব্যাপারে সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে–নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী। (অর্থাৎ দুনিয়ার শরীকরা অংশীদারীর মুখাপেক্ষী ও ইহাতে সন্তুষ্ট হয় ; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ শরীকবিহীন একক স্রষ্টা ; কাহারও পরোয়া করি না—এবাদতের মধ্যে কাহারো অংশীদারিত্ব পছন্দ করি না।) যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাহার মধ্যে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিয়া লয়, আমি উহাকে তাহার শরীকের সোপর্দ করিয়া দেই।" অন্য রেওয়ায়াতে আছে—আমি উহা হইতে মুক্ত হইয়া যাই। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এক ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে ঃ যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন তাহার আমলের সওয়াব ও পুরস্কার তাহারই নিকট হইতে চাহিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর ব্যাপারে সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে–নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ
مَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ
مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ۔
(مشکوٰۃ عن احمد)

جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ
مشرک ہوجاتا ہے اور جو شخص ریاکاری
سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہوجاتا ہے
جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ
مشرک ہوجاتا ہے۔

"যে ব্যক্তি লোক–দেখানোর জন্য নামায পড়ে সে মুশ্‌রিক হইয়া যায়, যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে সে মুশরিক হইয়া যায়, যে লোক দেখানোর জন্য দান–খয়রাত করে সে মুশরিক হইয়া যায়।"

(মিশকাত ঃ আহমদ)

মুশরিক হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে এই সমস্ত আমল করিল, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাহাদিগকে সে শরীক করিল। এমতাবস্থায় এই আমলগুলি আল্লাহ তায়ালার জন্য রহিল না বরং যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করিল তাহাদের জন্য হইয়া গেল।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ

قیامت کے دن جن لوگوں کا اوّل وہلہ
میں فیصلہ سنایا جاوے گا ان میں سے

فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ
حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ
وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ
جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ
فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ
فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ
عَلَّمَهٗ وَ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ
فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ
الْعِلْمَ وَ عَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيكَ
الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ
تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ
عَالِمٌ وَ قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ
قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ
فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ
فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ
الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ
نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ
فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ
تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ
فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ
فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ
قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ
عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ۔

ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بُلا کر اوّلاً
اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں
گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کو پہچانے
گا اور اقرار کرے گا اس کے بعد سوال کیا
جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا۔
وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لئے جہاد کیا
حتیٰ کہ شہید ہوگیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ
ہے یہ اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر
کہیں گے سو کہا جا چکا اور جس غرض
کے لئے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔
اس کے بعد اُس کو حکم سُنا دیا جاوے گا
اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنّم میں
پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم
بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور
قرآن پاک حاصل کیا۔ اُس کو بُلا کر اس پر
جو انعامات دنیا میں کئے گئے تھے اُن کا
اظہار کیا جاوے گا اور وہ اقرار کرے گا۔
اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ
ان نعمتوں میں کیا کیا کام کئے وہ عرض کرے
گا کہ تیری رضا کے لئے علم پڑھا اور لوگوں
کو پڑھایا قرآن پاک تیری رضا کے لئے
حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے
تو نے علم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم
کہیں، اور قرآن اس لئے حاصل کیا تھا کہ
لوگ قاری کہیں سو کہا جا چکا (اور جو غرض
پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی)

(مشکوٰۃ عن مسلم) اس کے بعد اس کو بھی حکم سُنا دیا جاوے
گا اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنّم میں پھینک دیا جاتے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی
ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وُسعتِ رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا۔ بُلایا
جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ
ان انعامات میں کیا کارگذاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مَصرف خیر ایسا نہیں
جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد
ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ سب اس لئے کیا گیا کہ لوگ فیّاض کہیں۔ سو کہا جا چکا۔ اس
کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنّم میں پھینک دیا جائے گا۔

“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সমস্ত লোকের ফয়সালা শুনানো হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন ঐ শহীদও হইবে যাহাকে ডাকিয়া আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ঐ সমস্ত নেয়ামত স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা হইয়াছিল। নেয়ামতসমূহ দেখিয়া সে চিনিতে পারিবে এবং স্বীকার করিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই সকল নেয়ামতের দ্বারা তুমি কি করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করিয়াছি ; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে—তুমি মিথ্যা বলিয়াছ ; লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিবে এইজন্যই সবকিছু করিয়াছ। সুতরাং তাহা তো বলা হইয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করিয়াছিলে উহা হাসিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ আলেমেও হইবে যে নিজে এলেম শিখিয়াছে, অন্যকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন পাক হাছিল করিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া দুনিয়াতে যে-সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল স্মরণ করানো হইবে। সে স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে—এইসব নেয়ামত পাইয়া তুমি কি কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজে এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাক হাছিল করিয়াছি। উত্তর হইবে—তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; বরং লোকে তোমাকে আলেম বলিবে এইজন্য এলেম শিখিয়াছ এবং লোকে তোমাকে ক্বারী বলিবে এইজন্য কুরআন পড়িয়াছ ; আর তাহা বলা হইয়াছে (অর্থাৎ শিখা ও শিখানোর যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া

গিয়াছে)। অতঃপর তাহাকেও হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় ঐ ধনী ব্যক্তিও হইবে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা রিযিকের প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছেন এবং সবরকম ধন-সম্পদ দিয়াছেন। তাহাকে ডাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হইবে এবং স্বীকারোক্তির পর জিজ্ঞাসা করা হইবে—এই সমস্ত ধন-সম্পদ পাইয়া তুমি কি আমল করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, এমন কোন উত্তম স্থান নাই যেখানে খরচ করিলে আপনার সন্তুষ্টি লাভ হয় আর আমি খরচ করি নাই। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এইজন্য তুমি এইসব করিয়াছ। সুতরাং উহা বলা হইয়াছে অতঃপর তাহাকেও হুকুম অনুযায়ী জাহান্নামে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে।" (মিশকাত ঃ মুসলিম)

অতএব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী যে, মুবাল্লিগগণ নিজেদের সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী, দ্বীনের প্রচার এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণকে মূল উদ্দেশ্য হিসাবে সামনে রাখিবেন। ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনকে অন্তরে মোটেও স্থান দিবেন না। যদি কখনও এইরূপ খেয়াল অন্তরে আসিয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ 'লা-হাওলা' ও 'এস্তেগফার' দ্বারা এই অবস্থা দূর করিয়া লইবেন। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী ও তাঁহার প্রিয় মাহবূবের ও তাঁহার পাক কালামের ওসীলায় অধম গোনাহ্‌গারকে এখলাসের তাওফীক দান করুন এবং পাঠকবৃন্দকেও দান করুন ; আমীন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। বর্তমান যমানায় আলেমগণের প্রতি যে শুধু খারাপ ধারণা বা তাহাদেরকে অবহেলা করা হয় তাহাই নহে ; বরং বিরোধিতা ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও সব রকম ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা হইতেছে। বস্তুতঃ দ্বীনের জন্য এহেন পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, মারাত্মক ও ক্ষতিকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়াতে যে-কোন দলে ভালর মধ্যে মন্দও রহিয়াছে তেমনি আলেমগণের মধ্যেও সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এইখানে দুইটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে লক্ষ্যণীয়। একটি হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আলেমকে অসৎ বলিয়া নিশ্চিতরূপে

জানা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা উচিত নহে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ○

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার প্রকৃত অবস্থা জানা নাই, সেই বিষয়ে তুমি মন্তব্য করিও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর এ সবের ব্যাপারে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৬)(বয়ানুল কুরআন)

আর শুধু এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, কথা বল্‌নেওয়ালা হয়ত অসৎ আলেম হইবে—তাহার কথাকে যাচাই না করিয়া বাদ দিয়া দেওয়া আরও অধিকতর জুলুম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে এত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, ইহুদীরা তওরাত কিতাবের বিষয়বস্তু আরবীতে নকল করিয়া শুনাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইহাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলিও না বরং এই কথা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন আমরা উহা বিশ্বাস করিয়াছি। অর্থাৎ যাচাই না করিয়া কাফেরের বর্ণনাকেও সত্য বা মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছি যে, আমাদের মতের বিপরীতে যদি কেহ কোন কথা বলে, তবে বল্‌নেওয়ালার হক ও সত্য হওয়ার সঠিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাহার কথা ও বক্তব্যকে নীচু করার জন্য তাহার ব্যক্তিত্বের উপর হামলা করা হয়।

দ্বিতীয় জরুরী বিষয়টি হইল, খাঁটি–হক্কানী ওলামায়ে কেরামও যেহেতু মানুষ ; তাহারা নিষ্পাপ নহেন—নিষ্পাপ হওয়া তো আম্বিয়ায়ে কেরামেরই বৈশিষ্ট্য, কাজেই তাহাদের ভুল–ত্রুটির জন্য তাহারাই দায়ী থাকিবেন। আর ইহা তো আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার—তিনি সাজা দিবেন বা মাফ করিয়া দিবেন ; বরং বেশী সম্ভাবনা ইহাই যে, ইনশাআল্লাহ তাহাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফই হইয়া যাইবে। কেননা, কোন দয়ালু মনিবের গোলাম যখন নিজের কাজ–কর্ম ছাড়িয়া মনিবের কাজে মশগুল হইয়া যায় এবং মনে–প্রাণে উহাতেই লাগিয়া থাকে তখন মনিব সাধারণতঃ তাহাকে মাফ করিয়াই থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য দয়াবান আর কে হইতে পারে ! কিন্তু তিনি যদি তাঁহার ন্যায়বিচারের

খাতিরে শাস্তিও দেন তবে উহা তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার ; কিন্তু এইসব কারণে লোকদের মনে আলেমগণের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা, ঘৃণা পয়দা করা, তাঁহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখার চেষ্টা করা, মানুষের জন্য বেদ্বীন হইয়া যাওয়ার কারণ হইবে। যাহারা এইরূপ করে তাহাদের জন্য আজাব রহিয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ
إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ
حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ
وَلَا الْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي
السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

تینوں اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ کا
اعزاز ہے، ایک بوڑھا مسلمان۔ دوسرا
وہ محافظ قرآن جو افراط تفریط سے خالی
ہو۔ تیسرا منصف حاکم۔

(ترغیب عن ابی داؤد)

অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে সম্মান করার অর্থ আল্লাহ তায়ালাকেই সম্মান করা—এক, বৃদ্ধ মুসলমান। দ্বিতীয়, কুরআনের ঐ রক্ষক যে কম–বেশী করে না। তৃতীয়, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (তারগীব ঃ আবু দাউদ)

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُبَجِّلْ
كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ
عَالِمَنَا۔

(ترغیب عن احمد والحاکم وغیرهما)

وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے،
ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے۔ ہمارے علماء
کی قدر نہ کرے وہ ہماری اُمت میں سے
نہیں ہے۔

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, আমাদের আলেমদের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নহে। (তারগীব ঃ আহমদ, হাকিম)

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ
لَا يَسْتَخِفُّ بِهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ
ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَذُو الْعِلْمِ
وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ۔

(ترغیب عن الطبرانی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے
والا منافق ہی ہو سکتا ہے (نہ کہ مسلمان)
وہ تینوں شخص یہ ہیں) ایک بوڑھا مسلمان
دوسرا عالم۔ تیسرا منصف حاکم۔

অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে একমাত্র মুনাফেক ছাড়া আর কেহই হেয় মনে করিতে পারে না—এক, বৃদ্ধ মুসলমান ; দুই, আলেম ; তিন, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। (তারগীব ঃ তাবারানী)

কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল করা হইয়াছে, 'আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে আমার সবচাইতে বেশী ভয় হয়—এক, তাহাদের দুনিয়াবী উন্নতি বেশী হইতে থাকিবে, যাহার কারণে তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা সৃষ্টি হইবে। দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে কুরআন শরীফ এত ব্যাপক হইয়া যাইবে যে, প্রত্যেকেই উহার মতলব বুঝিতে চেষ্টা করিবে। অথচ কুরআনের অনেক অর্থ ও মতলব এমনও রহিয়াছে যাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানে না। আর যাহারা এলেমে গভীর ও পরদর্শী তাহারাও এইরূপ বলে যে, এই সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে, আমরা ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও একীন রাখি। (বয়ানুল কুরআন) অর্থাৎ গভীর এলেমের অধিকারী পারদর্শী ব্যক্তিরাও কেবল সত্যতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যান ; অধিক কিছু বলিতে সাহস করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের কিছু বলিবার কী অধিকার থাকিতে পারে ! তৃতীয় বিষয় হইল, ওলামায়ে কেরামের হক নষ্ট করা হইবে ; তাহাদের সহিত বে-পরোয়া আচরণ করা হইবে।' 'তারগীব' নামক কিতাবে এই হাদীসখানা 'তাবারানী'র সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই ধরণের বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

বর্তমান যুগে ওলামা এবং দ্বীনি এলেম সম্পর্কে যে সমস্ত শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' কিতাবে সেইগুলির অধিকাংশকে কুফরী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে মানুষ এইসব হুকুম হইতে একেবারে গাফেল। সুতরাং এই ধরণের শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে অনেক বেশী সাবধান থাকিতে হইবে। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, বর্তমান যুগে হক্কানী আলেম একেবারেই নাই—যাহাদেরকে আলেম বলা হয় তাহারা সকলেই ওলামায়ে ছূ বা অসৎ আলেম, এই কথা বলিয়াও তো আপনারা দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন না। কেননা, অবস্থা যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর এই ফরজ দায়িত্ব আসিয়া যায় যে, হক্কানী আলেমগণের একটি জামাত তৈরী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এলেম শিখাইতে হইবে। কেননা, সমাজে আলেমগণের জামাত বর্তমান থাকা ফরজে কেফায়াহ্। একটি জামাত এই কাজে নিয়োজিত থাকিলে সকলের

ফরজ দায়িত্ব আদায় হইয়া যাইবে, নতুবা সমগ্র দুনিয়াবাসীই গোনাহ্গার হইবে।

সাধারণতঃ একটি অভিযোগ এই করা হইয়া থাকে যে, ওলামাদের মতবিরোধ সর্বসাধারণকে ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ কথাটি এক পর্যায়ে সহীহ্ হইতে পারে ; কিন্তু আসল কথা এই যে, ওলামায়ে কেরামের এই মতবিরোধ আজকের নহে, পঞ্চাশ বা শত বৎসরের নহে ; বরং ইসলামের স্বর্ণযুগ এমনকি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জুতা মোবারক আলামতস্বরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে দিয়া এই ঘোষণা করিতে পাঠাইলেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পথে হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক। কিন্তু তবুও হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার বুকের উপর এত জোরে দুই হাতে আঘাত করিলেন যে, বেচারা প্রায় চিৎ হইয়া পিছন দিকে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন পোষ্টার প্রচার করা হয় নাই এবং কোন সভা হইয়া ইহার প্রতিবাদে কোন রেজুলেশনও পাস হয় নাই।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর মধ্যে হাজারো মাসায়েল মতবিরোধপূর্ণ রহিয়াছে। চার ইমামের নিকট সম্ভবতঃ ফেকার শাখাগত এমন কোন মাসআলা নাই যাহাতে কোন মতভেদ হয় নাই। চার রাকাত নামাযের মধ্যে নিয়ত হইতে সালাম ফিরানো পর্যন্ত প্রায় দুই শত মাসায়েলে চার ইমামের মধ্যে মতবিরোধ আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে। আরও অধিক না-জানি কত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মতবিরোধপূর্ণ এতসব মাসায়েলের মধ্যে মাত্র 'রফে ইয়াদাইন' (অর্থাৎ উভয় হাত উঠানো), জোরে 'আমীন' বলা ইত্যাদি দুই-তিনটি মাসআলা ছাড়া অন্য কোন মাসআলা না শুনা যায়, না সেইগুলির জন্য কোন পোষ্টার ছাপা হয়, না কোন প্রতিবাদ বা বিতর্ক সভা হইতে দেখা যায়। কারণ, সাধারণ মানুষ এইসব মতভেদপূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে মোটেও পরিচিত নহে। বরং ওলামায়ে কেরামের এখতেলাফ রহমতস্বরূপ এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ কোন আলেম যদি প্রমাণ সহকারে কোন ফতওয়া প্রদান করেন এবং এই প্রমাণ অন্য কোন আলেমের দৃষ্টিতে সঠিক না হয়, তবে শরীয়ত মোতাবেক তিনি

ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য। ভিন্নমত প্রকাশ না করিলে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলাকারী সাব্যস্ত হইবেন এবং গোনাহগার হইবেন।

আসল কথা এই যে, যাহারা আমল করিতে চায় না তাহারাই এই ধরণের অহেতুক ও বেহুদা অজুহাতকে বাহানা বানাইয়া থাকে। নতুবা ডাক্তারদের মধ্যে সর্বদাই মতভেদ হইতেছে, উকিলদের মধ্যেও মতভেদ হইতেছে ; কিন্তু এই মতভেদের কারণে কেহ ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করানো এবং উকিলের মাধ্যমে মামলা–মোকাদ্দমা চালানো বাদ দেয় না। অথচ কী মুসীবত যে, কেবল দ্বীনি ব্যাপারে আলেমগণের এখতেলাফকেই বাহানা বানানো হয়। সত্যিকার অর্থে যাহারা আমল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জরুরী কর্তব্য হইল, যে আলেমকে ভাল মনে হয় ; সুন্নতের অনুসারী মনে হয় তাহার কথা অনুযায়ী আমল করিবে, অন্য কাহারও উপর অনর্থক আক্রমণ ও কটুবাক্য বলা হইতে বিরত থাকিবে। শরীয়তের দলীলসমূহ বুঝার এবং এইগুলির পর্যায়ক্রম ঠিক রাখার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদের জন্য ওলামায়ে কেরামের এখতেলাফে দখল দেওয়ার কোন অধিকার নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, অযোগ্য লোকদের নিকট হইতে এলেমের কথা নকল করা এলেমকে ধ্বংস করারই নামান্তর। কিন্তু যেখানে বদ্‌দ্বীনি এই পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট হুকুমসমূহের সমালোচনা করা প্রত্যেকেই নিজের অধিকার বলিয়া মনে করে, সেখানে বেচারা আলেমগণের আর ধর্তব্য কোথায়? কাজেই দোষারোপ যতই করা হইবে তাহা কমই হইবে। وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ("আর যাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তাহারাই প্রকৃত জালিম।")

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট ও সম্পূরক। পাঠকবৃন্দের খেদমতে এই পরিচ্ছেদে একটি জরুরী আরজ হইল এই যে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখা এবং তাঁহাদের খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়া দ্বীনের কাজে শক্তি বৃদ্ধি ও খায়ের–বরকতের কারণ হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْاَمْرِ   کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے

الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهٖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ۔ (الحديث رمشكوٰة ص۴۱۹)

والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دُنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رَطْبُ اللّسان رکھا کر۔

আমি কি তোমাকে দ্বীনের কাজে শক্তি বৃদ্ধিকারী জিনিসটি বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়াবী হাসিল করিতে পার? উহা হইল আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণকারীদের মজলিস। আর যখন তুমি একাকী থাক তখন তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত রাখ।

(মিশকাত ঃ পৃষ্ঠা ৪১৯)

তবে এই বিষয় যাচাই করিয়া নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, প্রকৃত আল্লাহওয়ালা কাহারা? আল্লাহওয়ালাদের পরিচয় হইল, সুন্নতের অনুসরণ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মতের হেদায়েতের জন্য নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন এবং পবিত্র কুরআনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(پ۳ ع ۱۲)

آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمھارے سب گناہوں کو معاف کردیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں

(بیان القرآن)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ৩১) (বয়ানুল কুরআন)

সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারী হইবে সে-ই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা। আর যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসরণ হইতে যত দূরে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য হইতেও তত দূরে।

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত

মহব্বতের দাবী করে অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করে সে মিথ্যুক। কেননা, এশ্‌ক ও মহব্বতের কানূন ও নিয়ম হইল, যাহার সহিত মহব্বত হয় তাহার ঘর, দরজা, দেওয়াল, উঠান–আঙ্গিনা, বাগান এমনকি তাহার কুকুর ও গাধার সহিতও মহব্বত হয়। (কবি বলিতেছেন—)

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

অর্থ ঃ আমি যখন লায়লার শহরের উপর দিয়া যাই তখন আমি এই দেওয়াল ঐ দেওয়ালকে চুম্বন করিতে থাকি, বস্তুতঃ শহরের ঘর–বাড়ী আমাকে পাগল করে নাই বরং আমাকে পাগল করিয়াছে ঐ সকল লোকদের মহব্বত যাহারা এই শহরে বাস করে।

অন্য এক কবি বলিতেছেন ঃ

تَعْصِى الْإِلٰهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ وَهٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْفِعَالِ بَدِيْعٌ
لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهٗ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

অর্থ ঃ তুমি আল্লাহর মহব্বতের দাবী করিতেছ অথচ তুমি তাঁহার নাফরমানী করিয়া থাক—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। যদি তুমি নিজ দাবীতে সত্যবাদী হইতে তবে অবশ্যই তুমি তাঁহাকে মানিয়া চলিতে। কেননা, প্রেমিক সর্বদাই তাহার মাহবুবকে মানিয়া চলে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিন্তু যে অস্বীকার করিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'যে অস্বীকার করিয়াছে' এ কথার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে মানিয়া চলিবে সে জান্নাতে যাইবে আর যে নাফরমানী করিবে সে অস্বীকারকারী।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ পর্যন্ত মুসলমান হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত তাহার ইচ্ছা ও খাহেশ আমার আনীত দ্বীনের অধীন না হয়। (মিশকাত)

আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের দাবীদারগণ নিজেরাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হইতে অবাধ্য—তাহাদের সম্মুখে যদি বলা হয় যে, ইহা সুন্নতের খেলাফ ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা–বিরোধী, তবে যেন তাহাদিগকে

বর্শা দ্বারা আঘাত করা হয়। কবি বলেন ঃ

خلافِ پیمبر کسے رہ گزید　　　　کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থ ঃ যে কেহ নবীর পথ ছাড়িয়া অন্য পথ গ্রহণ করিবে, সে কখনও গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। মোটকথা এই যে, যাচাইয়ের পর যদি কাহারও আল্লাহওয়ালা হওয়া সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে তাহার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, তাহার খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়া, তাহার এলেম দ্বারা উপকৃত হওয়া—ইহা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এবং দ্বীনেরও তরক্কীর কারণ।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ কর, তখন উহা হইতে কিছু আহরণ করিয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগান কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এলেমের মজলিস।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, লোকমান (আঃ) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—ওলামায়ে কেরামের খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়াকে জরুরী মনে কর, উম্মতের তত্ত্বজ্ঞানী লোকদের বাণীসমূহ মনোযোগ সহকারে শুন। কেননা, জ্ঞান ও হেকমতের নূর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুর্দা দিলগুলিকে এমন জিন্দা করিয়া দেন যেমন মুর্দা জমিনকে মুষলধার বৃষ্টির দ্বারা জিন্দা করিয়া থাকেন। আর উম্মতের তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারাই যাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ; অন্য কেহ নহে।

আরও এক হাদীসে আছে, জনৈক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের জন্য উত্তম সঙ্গী কে? এরশাদ ফরমাইলেন, যাহাকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাহার কথায় এলেমের তরক্কী হয় এবং যাহার আমলের দ্বারা আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। 'তারগীব' নামক কিতাবে এই রেওয়ায়াতগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাঁহারাই যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (پ۱۱ ع۴)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو (بیان القرآن)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১১৯)(বয়ানুল কুরআন)

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, 'সত্যবাদীদের' দ্বারা এখানে সূফী মাশায়েখগণকে বুঝানো হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি তাহাদের খাদেম হইয়া যায় তখন তাহাদের তরবিয়ত ও বুযুর্গীর বদৌলতে সে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়া যায়। শায়খে আকবার (রহঃ) লিখিয়াছেন, যদি তোমার কাজ-কর্ম অপরের ইচ্ছার অধীন না হয়, তবে তুমি সারাজীবন সাধনা করিয়াও মনের খাহেশাত হইতে ফিরিতে পারিবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তি পাইয়া যাও যাহার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়, তখনই তাহার খেদমতে লাগিয়া যাও। তাহার সম্মুখে তুমি মুর্দার মত হইয়া থাক যাহাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলিতে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। তাহার হুকুম পালনে জলদি কর, তিনি যে জিনিস হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক, তিনি যদি পেশা গ্রহণ করিতে হুকুম করেন তবে গ্রহণ কর কিন্তু ইহা তাহার হুকুমের কারণে গ্রহণ কর ; তোমার পছন্দের কারণে নয়, তিনি বসিতে হুকুম করিলে বসিয়া পড়। অতএব ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, কামেল শায়েখ তালাশ করিতে তুমি সচেষ্ট হও। তাহা হইলেই তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কোন জামাত যখন কোন মজলিসে বসিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয় তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয় এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের পবিত্র মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। একজন আশেকের জন্য ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হইতে পারে যে, স্বয়ং মাহবুবের মজলিসে তাহার আলোচনা হইবে।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যাহারা এখলাসের সহিত আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিতে থাকে, তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন।

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোকেরা কিয়ামতের দিন আফসোস করিবে।

হযরত দাঊদ (আঃ) এই দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে তোমার যিকিরকারীদের মজলিস ছাড়িয়া গাফেলদের মজলিসে

যাইতে দেখ, তবে তুমি আমার পা ভাঙ্গিয়া দিও। (কবি বলেন—)

جب اس کی صوت وصورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے
مرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھیں کور ہو جانی

অর্থাৎ, তাহার মধুর কণ্ঠস্বরই যদি আমার কানে না পৌছিল, তাহার সুন্দর চেহারাই যদি আমার চোখে না পড়িল তবে বধির ও অন্ধ হওয়াই ভাল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে সকল মজলিসে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা হয় সেইগুলি আসমানবাসীদের নিকট এইরূপ আলোকোজ্জ্বল দেখায় যেরূপ দুনিয়াবাসীদের নিকট আকাশের তারকাগুলি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একবার বাজারে যাইয়া লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া রহিয়াছ অথচ মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হইতেছে। লোকেরা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিল কিছুই বন্টন করা হইতেছে না। ফিরিয়া আসিয়া সকলেই বলিল, সেখানে তো কিছুই নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা সেখানে কি হইতেছিল? লোকেরা বলিল, কিছু লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল আর কিছু লোক তেলাওয়াতে মশগুল ছিল। তিনি বলিলেন, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) এইরূপ অনেক রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হুকুম করা হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ
عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا
قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ
وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○ (پ ١٥ - ع ١٦)

اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے
ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے
رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی
کے لئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگانی
کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں
ان سے ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص
کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের সাথে আবদ্ধ রাখুন যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন রবের এবাদত শুধু তাহার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে এবং দুনিয়ার জিন্দেগীর জাঁক–জমকের আশায় আপনার নজর যেন তাহাদের উপর হইতে সরিয়া না যায় আর আপনি ঐ লোকের কথা মানিবেন না যাহার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের খাহেশের উপর চলে এবং তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। (সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ২৮)

বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইজন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যাহাদের মজলিসে বসিবার জন্য স্বয়ং আমাকেও আদেশ করা হইয়াছে। উক্ত আয়াতে অপর একটি দলের কথাও বলা হইয়াছে যে, যাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল, যাহারা খাহেশাতের উপর চলে, যাহারা সীমা অতিক্রম করে, তাহাদের অনুসরণ যেন না করা হয়। এখন ঐসব ব্যক্তি, যাহারা দ্বীন দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কাজে কাফের ফাসেকদের অনুসরণ করিয়া চলে, মুশরিক–নাসারাদের প্রতিটি কথা ও কাজের উপর জীবন উৎসর্গ করিতেছে তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তাহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে।

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی — کیں رہ کہ تو میروی بترکستان است
مراد ما نصیحت بود و کردیم — حوالت با خدا کردیم و رفتیم

"হে বেদুঈন পথিক! আমার ভয় হইতেছে তুমি কাবা শরীফে পৌছিতে পারিবে না; যে পথ তুমি ধরিয়াছ উহা কাবার পথ নহে বরং তুর্কিস্থানের পথ।"

"আমার কাজ ছিল তোমাকে নছীহত করা; উহা আমি করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমাকে আমি আল্লাহর সোপর্দ করিয়া বিদায় নিলাম।"

وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلاَّ الْبَلاَغ

বিনীত নির্দেশ পালনকারী
মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী
মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম
৫ই সফর, ১৩৫০, মোতাবিক ঃ ২১শে জুন ১৯৩১
সোমবার রাত্র।

ফাযায়েলে নামায

সূচীপত্র

।।।।।

نَحْمَدُهٗ وَنَشْكُرُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهِ الْحُمَاةِ لِلدِّيْنِ الْقَوِيْمِ وَبَعْدُ فَهٰذِهٖ اَرْبَعُوْنَةٌ فِيْ فَضَائِلِ

الصَّلٰوةِ جَمَعْتُهَا اِمْتِثَالًا لِاَمْرِ عَمِّيْ وَصِنْوِ اَبِيْ رَقَّاهُ اللّٰهُ اِلَى الْمَرَاتِبِ الْعُلْيَا وَوَفَّقَنِيْ وَاِيَّاهُ

لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى ـ اَمَّا بَعْدُ

খুতবা ও ভূমিকা

বর্তমান যমানায় দ্বীনের ব্যাপারে যে গাফলতি ও অবহেলা করা হইতেছে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নামায—যাহার সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ঈমানের পর সমস্ত ফরজ এবাদতের মধ্যে ইহাই হইল সবচাইতে অগ্রগণ্য এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইহারই হিসাব লওয়া হইবে ; এই নামাযের ব্যাপারেও চরম অবহেলা ও উপেক্ষা করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বেশী আফসোসের বিষয় এই যে, দ্বীনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী কোন কথা মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছিতেছে না এবং দ্বীন পৌঁছাইয়া দেওয়ার কোন পন্থাই ফলপ্রসূ হইতেছে না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথা খেয়ালে আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছাইবার চেষ্টা হউক, যদিও ইহাতে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাও আমার মত অল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অপারগতার জন্য যথেষ্ট। তবুও আশা এই যে, যাহাদের মন-মস্তিষ্ক দ্বীনের বিপরীত কিছু চিন্তা করে না এবং দ্বীনের বিরোধিতা করে না, এই পাক এরশাদসমূহ তাহাদের উপর ইনশাআল্লাহ জরুর আছর করিবে। হাদীসের পবিত্র বাণীসমূহ এবং খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে তাহাদের ফায়দা ও উপকারের আশা রহিয়াছে। এই পন্থায় কাজ করিলে যে কামিয়াব হওয়া যাইবে—এই বিষয়ে অনেক দোস্ত আহবাব খুব আশাবাদী। ফলে, এই পন্থায় কাজ করিবার জন্য মুখলিছ দোস্তগণের বিশেষ অনুরোধও রহিয়াছে।

এই কিতাবে শুধু নামায সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ

করিতেছি। ইতিপূর্বে যেহেতু কেবল তবলীগ তথা দ্বীন পৌঁছানোর হাদীস সম্বলিত 'ফাযায়েলে তবলীগ' নামক অধমের একটি কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই তবলীগের সিলসিলায় দ্বিতীয় কিতাব হিসাবে ইহার নাম 'ফাযায়েলে নামায' রাখিতেছি। তওফীক দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাঁহারই উপর ভরসা এবং তাঁহারই দিকে রুজু হইতেছি।

নামাযের ব্যাপারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায় ঃ ১. যাহারা মোটেই নামায পড়ে না। ২. যাহারা নামায পড়ে বটে ; কিন্তু জামাআতের সাথে নামায পড়ার এহ্‌তেমাম করে না। ৩. যাহারা নামায পড়ে এবং জামাআতের সাথেই পড়ে ; কিন্তু বে-পরওয়াভাবে অবহেলার সাথে অসুন্দরভাবে নামায পড়ে।

এই কিতাবে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের উপযোগী বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি অধ্যায় করা হইয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ তরজমা সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তরজমা সুস্পষ্ট এবং সহজ-সরল হওয়ার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ; শাব্দিক তরজমার প্রতি বেশী খেয়াল করা হয় নাই। আর যেহেতু নামাযের প্রতি তবলীগকারী অধিকাংশ আলেমও হইয়া থাকেন এইজন্য হাদীসের হাওয়ালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলেমদের জন্য আরবীতে দেওয়া হইল ; সাধারণ লোকদের ইহাতে কোন ফায়দা নাই। অবশ্য যাহারা তবলীগের কাজ করেন, তাহাদের অনেক সময় এইসব হাওয়ালার দরকার হইয়া পড়ে। তরজমা ও ফায়দাসমূহ উর্দূ ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফাযায়েলে নামায

প্রথম অধ্যায়
নামাযের গুরুত্ব

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামায ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে হাদীস শরীফে যে সমস্ত ধমক ও শাস্তির কথা আসিয়াছে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নামাযের ফযীলত

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ
وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ۔ (متفق عليه)
وقال المنذري في الترغيب رواه
البخاري ومسلم وغيرهما عن
غير واحد من الصحابة۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے اول
لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا یعنی
اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
اور رسول ہیں اسکے بعد نماز کا قائم کرنا زکوٰۃ ادا
کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত (মাবূদ) আর কেহ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

এই পাঁচটি জিনিস ঈমানের প্রধান ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ আরকান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফে ইসলামকে একটি তাঁবুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহা পাঁচটি খুঁটির উপর কায়েম হইয়া থাকে। কালেমায়ে শাহাদাত তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির মত। অপর চারিটি আরকান চারি কোণের চারিটি খুঁটির মত। যদি মধ্যবর্তী খুঁটি না থাকে তবে তাঁবু দাঁড়াইতেই পারিবে না। আর যদি মধ্যবর্তী খুঁটি ঠিক থাকে এবং চারি কোণের যে কোন একটি খুঁটি না থাকে, তবে তাঁবু দণ্ডায়মান থাকিবে সত্য কিন্তু যে কোণের খুঁটি না থাকিবে, সেই কোণ দুর্বল হইবে এবং পড়িয়া যাইবে।

এই পবিত্র এরশাদ শোনার পর নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ইসলামের এই তাঁবুকে আমরা কতটুকু কায়েম রাখিয়াছি এবং ইসলামের এমন কোন রোকন রহিয়াছে যাহাকে আমরা পুরাপুরিভাবে ধরিয়া রাখিয়াছি। ইসলামের এই পাঁচটি রোকন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনকি এইগুলিকেই ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি বলা হইয়াছে। মুসলমান হিসাবে প্রত্যেকেরই এই সবগুলি বিষয়ের এহতেমাম করা একান্ত জরুরী। তবে ঈমানের পর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করিলেন, নামায। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্‌ আমল? তিনি বলিলেন, পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্‌ আমল? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসে ওলামাদের এই কথার দলীল রহিয়াছে যে, ঈমানের পর নামাযের স্থানই হইল সর্বাগ্রে। ইহার সমর্থন ঐ সহীহ হাদীস দ্বারাও হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ। অর্থাৎ নামাযই হইল সর্বোত্তম আমল, যাহা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য হাদীসেও অধিক পরিমাণে এবং বিস্তারিতভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে নামাযই হইল সর্বোত্তম আমল। যেমন জামে সগীর কিতাবে হযরত ছাওবান, হযরত ইবনে ওমর, হযরত সালামাহ, হযরত আবূ উমামাহ, হযরত উবাদাহ (রাযিঃ) এই পাঁচজন সাহাবী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে 'সময় মত নামায পড়াকে

সর্বোত্তম আমল' বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর ও উম্মে ফরওয়া (রাযিঃ) হইতে 'আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়াকে সর্বোত্তম আমল' বর্ণনা করা হইয়াছে। (জামে সগীর) বস্তুতঃ সব হাদীসের উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য প্রায় একই।

(٢) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ یَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَیْنِ مِّنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ یَتَهَافَتُ فَقَالَ یَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَیُصَلِّی الصَّلٰوةَ یُرِیْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (رواه احمد باسناد حسن كذا فى الترغيب)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اس کے پتے اور بھی گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابوذر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اسکے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں

(২) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার শীতকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তশরীফ আনিলেন, তখন গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি গাছের একটি ডাল ধরিলেন, ফলে উহার পাতা আরও বেশী করিয়া ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে আবূ যর! মুসলমান বান্দা যখন এখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য নামায পড়ে তখন তাহার গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন এই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে।

(তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ শীত মৌসুমে গাছের পাতা এত বেশী ঝরিয়া পড়ে যে, কোন কোন গাছে একটি পাতাও থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ হইল, এখলাসের সহিত নামায পড়ার ফলও এইরূপ যে, নামায আদায়কারীর সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায় ; একটিও বাকী থাকে না।

তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসের

কারণে ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, নামায ইত্যাদি এবাদতসমূহের দ্বারা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে ; কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এইজন্য নামায আদায়ের সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে তওবা ও এস্তেগফারও করা চাই—ইহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি আপন দয়া ও অনুগ্রহে কাহারও কবীরা গোনাও মাফ করিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা।

(৩) عَنْ اَبِیْ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ
مَعَ سَلْمَانَؓ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَاَخَذَ
غُصْنًا مِنْهَا يَابِسًا فَهَزَّهٗ حَتّٰى
تَحَاتَّ وَرَقُهٗ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا عُثْمَانَ
اَلَا تَسْئَلُنِیْ لِمَ اَفْعَلُ هٰذَا قُلْتُ
وَلِمَ تَفْعَلُهٗ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ
بِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَاَنَا مَعَهٗ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
وَاَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهٗ
حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهٗ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ
اَلَا تَسْئَلُنِیْ لِمَ اَفْعَلُ هٰذَا قُلْتُ
وَلِمَ تَفْعَلُهٗ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا
تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى
الصَّلٰوتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ
كَمَا تَحَاتَّ هٰذَا الْوَرَقُ وَقَالَ
اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى
لِلذّٰكِرِيْنَ ؕ

(رواه احمد والنسائی والطبرانی
ورواة احمد محتج بهم فی
الصحيح الا علی بن زيد كذا

ابو عثمانؒ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی
اللہ عنہ کیساتھ ایک درخت کے نیچے تھا
اُنہوں نے اس درخت کی ایک خشک
ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اُس
کے پتے گر گئے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ
ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں
کیا میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا اُنہوں
نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے
تھا آپؐ نے بھی درخت کی ایک خشک
ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس
ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے پھر حضورؐ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں
کہ میں نے اس طرح کیوں کیا میں نے
عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا۔ آپؐ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح
سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا
ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی
گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں پھر آپؐ
نے قرآن کی آیت اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ
تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر
نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور

فی الترغیب) رات کے کچھ حصّوں میں بیشک نیکیاں
دُور کردیتی ہیں گناہوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے۔

(৩) আবূ উসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাযিঃ)এর সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুকনা ডাল ধরিয়া নাড়া দিলেন। ফলে উহার পাতা ঝরিয়া পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন আপনি এইরূপ করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি একবার নবী করীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি গাছের নীচে ছিলাম, তিনিও গাছের একটি শুকনা ডাল ধরিয়া এমনভাবে নাড়া দিলেন যে, উহার পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িল। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালমান! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ না, কেন আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন আপনি এইরূপ করিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, যখন কোন মুসলমান ভালভাবে ওযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে, যেমন এই সকল পাতা ঝরিয়া যায়। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

অর্থাৎ দিনের উভয় অংশে এবং রাতের একাংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয়। ইহা নছীহত কবূলকারীদের জন্য নছীহত।

(সূরা হূদ, আয়াত ঃ ১১৪) (নাসাঈ, আহমদ, তাবরানী)

ফায়দা ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) যে আমল করিয়া দেখাইলেন, উহা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশ্‌ক ও মহব্বতের সামান্যতম নমুনা মাত্র। যখন কাহারও সহিত মহব্বত হয়, তখন তাহার প্রতিটি আচরণ ভাল লাগে এবং প্রতিটি কাজ ঐভাবে করিতে ইচ্ছা হয় যেভাবে প্রিয় ব্যক্তিকে করিতে দেখে। যাহারা ইশ্‌ক ও মহব্বতের স্বাদ পাইয়াছেন তাহারা ইহার আসল রহস্য ভালভাবে জানেন। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদসমূহ বর্ণনাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত আচরণসমূহও নকল করিতেন যাহা হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করার সময় করিয়াছিলেন। মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করা এবং উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি এত বেশী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বেও বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়টিকে সগীরা গোনাহের সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন, যেমন ইতিপূর্বে জানা গিয়াছে। কিন্তু হাদীস শরীফে সগীরা কিংবা কবীরার কোন উল্লেখ নাই ; শুধু গোনাহের কথা উল্লেখ আছে। আমার পিতা (হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহঃ) তালীমের সময় এই বিষয়টির দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, ইহা মুসলমানের শান হইতে অনেক দূরের বিষয় যে, তাহার জিম্মায় কোন কবীরা গোনাহ থাকিবে। প্রথমতঃ তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হওয়াই অসম্ভব ; আর যদি হইয়াও যায়, তবে তওবা না করিয়া সে শান্তি পাইবে না। মুসলমানের মুসলমানি শান তো ইহাই যে, যদি তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হইয়া চোখের পানি দ্বারা উহাকে ধৌত করিয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনে শান্তি ও স্থিরতা আসিতে পারে না। অবশ্য সগীরা গোনাহ এইরূপ যে, অনেক সময় উহার প্রতি খেয়াল যায় না। ফলে জিম্মায় থাকিয়া যায়। যাহা নামায ইত্যাদির বরকতে মাফ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত নামায পড়িবে এবং নামাযের আদব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায আদায় করিবে, সে নিজেই না জানি কতবার তওবা ও এস্তেগফার করিবে। ইহা ছাড়া নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতুর শেষে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী'–র মধ্যে তো খোদ তওবা ও ইস্তেগফার রহিয়াছেই।

এই সমস্ত রেওয়ায়াতে উত্তমরূপে ওযূ করার জন্যও হুকুম করা হইয়াছে। যাহার অর্থ এই যে, ওযূর আদব ও মুস্তাহাবসমূহকে ভালভাবে জানিয়া যত্নসহকারে আমল করা।

উদাহরণ স্বরূপ—যেমন ওযূর একটি সুন্নত হইল মিসওয়াক, যাহার প্রতি সাধারণতঃ গাফলতি করা হয়। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে নামায মিসওয়াক করিয়া পড়া হয়, উহা ঐ নামায হইতে সত্তর গুণ উত্তম যাহা বিনা মিসওয়াকে পড়া হয়। এক হাদীসে আছে, তোমরা মিসওয়াকের এহতেমাম করিতে থাক ; ইহাতে দশটি উপকার আছে ঃ ১. মুখ পরিষ্কার করে ২. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয় ৩. শয়তানকে রাগান্বিত করে ৪. মিসওয়াককারীকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন এবং

ফেরেশতাগণও মহব্বত করেন ৫. দাঁতের মাড়ী মজবূত করে ৬. কফ দূর করে ৭. মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে ৮. পিত্তরোগ দূর করে ৯. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে ১০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

সর্বোপরি মিসওয়াক করা সুন্নত। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, মিসওয়াকের এহ্‌তেমাম করার মধ্যে সত্তরটি উপকার রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত নসীব হয়। কিন্তু মিসওয়াকের বিপরীতে আফিম সেবনে সত্তর প্রকারের ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলতসমূহ বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামতের দিন ওযূর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে এবং ইহার দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আপন উম্মতকে চিনিতে পারিবেন।

(۱۴) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی ورواه ابن ماجه من حدیث عثمان کذا فی الترغیب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہؓ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضور نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔

(৪/১) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির দরজার সম্মুখে একটি নহর প্রবাহিত থাকে, যাহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তাহার শরীরে কি কোন ময়লা বাকী থাকিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কিছুই বাকী থাকিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এইরূপ যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহূ উহার বদৌলতে গোনাহসমূহ মিটাইয়া দেন। (তারগীব ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

(٤/٢) عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ۔
(رواه مسلم كذا فى الترغيب)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو۔ اس میں روزانہ پانچ دفعہ غسل کرے۔

(৪/২) হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেমন, কাহারও দরজার সম্মুখে একটি নহর আছে, যাহার পানি প্রবহমান এবং খুব গভীর, উহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।

(তারগীব ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ প্রবাহিত পানি নাপাকী ইত্যাদি হইতে পাক হয় এবং পানি যত বেশী গভীর হইবে ততই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে। এই জন্যই হাদীস শরীফে উহার প্রবাহিত হওয়া এবং গভীর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর যত বেশী পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল করিবে তত বেশী শরীর পরিষ্কার হইবে। এমনিভাবে আদবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নামাযসমূহ আদায় করা হইলে গোনাহ হইতে পবিত্রতা হাসিল হয়। বিভিন্ন সাহাবী হইতে আরো কতিপয় হাদীসে এই একই ধরণের বিষয় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এক নামায হইতে অপর নামায পর্যন্ত যে সমস্ত সগীরা গোনাহ হয়, তাহা নামাযের বরকতে মাফ হইয়া যায়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যেমন কোন এক ব্যক্তির একটি কারখানা আছে, যেখানে সে কাজ করে, ফলে তাহার শরীরে কিছু ধূলিবালি ও ময়লা লাগিয়া যায়। ঐ ব্যক্তির বাড়ী ও কারখানার মাঝখানে পাঁচটি নহর রহিয়াছে। যখন সে কারখানা হইতে ঘরে ফিরে, তখন প্রতিটি নহরে সে গোসল করে। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এই যে, যখনই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, তখন নামাযের মধ্যে দোয়া-এস্তেগফার করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু উহা পুরাপুরি মাফ করিয়া দেন।

এই ধরণের উদাহরণ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু গোনাহ-মাফীর ব্যাপারে নামাযকে অনেক শক্তিশালী প্রভাব দান করিয়াছেন। যেহেতু উদাহরণ দ্বারা কোন কথা একটু ভালভাবে বুঝে আসে, এই জন্য বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মর্মকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই রহমত, অসীম ক্ষমা, দয়া, পুরস্কার এবং অনুগ্রহ হইতে যদি আমরা উপকৃত না হই, তবে কাহার কি ক্ষতি হইবে? ক্ষতি আমাদেরই হইবে। আমরা গোনাহ করি, না-ফরমানী করি, আল্লাহর হুকুমের সীমা লংঘন করি, আদেশ পালনে ত্রুটি করি, যাহার পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল যে, অনন্ত শক্তিমান ন্যায়বিচারক বাদশাহর দরবারে অবশ্যই আমাদের শাস্তি হইত এবং কৃতকর্মের কারণে ভোগান্তি হইত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর উপর কুরবান হই যে, তিনি আমাদিগকে তাহার না-ফরমানী ও অবাধ্যতার ক্ষতিপূরণ করিয়া নেওয়ার পথও বলিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা ইহা হইতে উপকৃত না হই তবে তাহা আমাদেরই বোকামী। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী তো দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি শুইবার সময় এই এরাদা করে যে, আমি তাহাজ্জুদ পড়িব কিন্তু রাত্রে চোখ খুলিল না, তবুও সে উহার সওয়াব পাইবে এবং নিদ্রা সে মুফতে পাইয়া গেল। (তারগীব) আল্লাহ পাকের এই মেহেরবানী ও দয়ার কি কোন পরিসীমা আছে? আর যে দাতা এইভাবে দান করিয়া থাকেন তাহার দান না লওয়া কত বড় মাহরূমী এবং কত বড় ক্ষতি !

(٥) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ فَزَعَ اِلَى الصَّلٰوةِ۔ (اخرجه احمد وابوداؤد وابن جرير كذا فى الدر المنثور)

حضرت حذیفہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔

(৫) হযরত হুযাইফাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (দুররে মানসূর ঃ আবূ দাউদ, আহমদ)

ফায়দা ঃ নামায আল্লাহ তায়ালার বড় রহমত, এইজন্য প্রত্যেক পেরেশানীর সময় নামাযে মনোনিবেশ করা যেন আল্লাহর রহমতের দিকেই ঝুকিয়া পড়া। আর আল্লাহর রহমত যখন কাহারও অনুকূল ও সাহায্যকারী হয়, তখন সাধ্য কি যে, কোন পেরেশানী বাকী থাকিবে? অনেক রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যাহারা প্রতিটি কদমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিলেন, তাঁহাদের ঘটনাবলীতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, যখন ধূলিঝড় শুরু হইত, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন এবং ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ হইতে বাহির হইতেন না। এমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও এই অভ্যাস ছিল যে, যে কোন মুসীবতের সময় তাঁহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) একবার সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি উট হইতে নামিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাই করিয়াছি যাহা আল্লাহ তায়ালা করিতে হুকুম করিয়াছেন। অতঃপর কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৫৩)

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ভাই কুছামের ইন্তেকালের খবর পাইলেন। রাস্তার এক পার্শ্বে যাইয়া উট হইতে নামিয়া দুই রাকআত নামায পড়িলেন এবং আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিলেন। তারপর উটে সওয়ার হইয়া কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

(সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৪৫)

আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহর সাহায্য হাসিল কর সবর ও নামাযের মাধ্যমে এবং নিঃসন্দেহে এই নামায অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে যাহাদের অন্তরে খুশু রহিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন নহে। খুশূর বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আসিতেছে।

তাহারই সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের কোন একজনের ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া তিনি সেজদায় পড়িয়া গেলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন যে, যখন তোমরা কোন দুর্ঘটনা দেখ, তখন সেজদায় (অর্থাৎ নামাযে) মশগুল হইয়া যাও। উম্মুল মোমেনীনের ইন্তেকালের চাইতে বড় দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে। (আবূ দাউদ)

হযরত উবাদাহ (রাযিঃ)এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি উপস্থিত লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের সকলকে আমার মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করিতে নিষেধ করিতেছি। যখন আমার রূহ বাহির হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেকেই ওযূ করিবে এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওযূ করিবে। অতঃপর মসজিদে যাইবে এবং নামায পড়িয়া আমার জন্য আল্লাহর কাছে গোনাহ–মাফীর দোয়া করিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৫৩)

অতঃপর তোমরা আমাকে কবরের গর্তে পৌঁছাইয়া দিবে।

হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর স্বামী হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) অসুস্থ ছিলেন। একবার তিনি এমনই বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন যে, সকলেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিল। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) উঠিলেন এবং নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন। তিনি নামায হইতে ফারেগ হইলে হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) হুঁশ ফিরিয়া পাইলেন। লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অবস্থা কি মৃত্যুর মত হইয়া গিয়াছিল? লোকেরা আরজ করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিল এবং আমাকে বলিল, চল, আহকামুল হাকেমীনের দরবারে তোমার ফয়সালা হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তৃতীয় একজন ফেরেশতা আসিল এবং সেই দুইজনকে বলিল, তোমরা চলিয়া যাও, ইনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে একজন যাহাদের তকদীরে সৌভাগ্য ঐ সময়ই লিখিয়া

দেওয়া হইয়াছে যখন তাঁহারা মায়ের পেটে ছিলেন। এখনও তাঁহার দ্বারা তাঁহার সন্তানগণের আরও অনেক উপকার হাসিল করা বাকী রহিয়া গিয়াছে। ইহার পর হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) এক মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতঃপর ইন্তেকাল করেন। (দুররে মানসূর)

হযরত নযর (রাযিঃ) বলেন, একবার দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া হযরত আনাস (রাযিঃ)র খেদমতে হাজির হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় কখনও কি এইরূপ অবস্থা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, খোদার পানাহ! হুযূরের যমানায় তো সামান্য জোরে বাতাস বহিলেই আমরা মসজিদে দৌড়াইয়া যাইতাম আর মনে করিতাম, নাজানি কেয়ামত আসিয়া গেল। (আবূ দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের উপর কোন রকম অভাব-অনটন দেখা দিত, তখন তাহাদেরকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○ (سورة طٰهٰ . ع ٨)

অর্থাৎ (হে রাসূল) আপন ঘরওয়ালাদেরকে নামাযের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহ্তেমাম করুন। আপনাকে রুজি উপার্জনে লাগাইতে চাই না ; রুজি তো আপনাকে আমিই দিব।

(সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১৩২)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কাহারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, উহা দ্বীনি প্রয়োজন হউক বা দুনিয়াবী ; উহার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে হউক বা কোন মানুষের সাথে হউক—তাহার উচিত যেন সে খুব ভাল করিয়া ওযূ করে অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং দুরূদ শরীফ পড়ে। অতঃপর নিম্নবর্ণিত দোয়া করে—ইনশাআল্লাহ তাহার প্রয়োজন নিশ্চয়ই পূরা হইবে। দোয়া এই—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ. سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের প্রয়োজন নামাযের মাধ্যমে চাওয়াই নিয়ম। পূর্ববর্তী লোকগণের যখন কোন সমস্যা দেখা দিত, তখন তাহারা নামাযের দিকেই মনোনিবেশ করিতেন। যাহারই উপর কোন মুসীবত আসিত, তৎক্ষণাৎ নামাযের দিকে রুজূ হইতেন।

বর্ণিত আছে যে, কুফা নগরীতে একজন কুলি ছিল, যাহার উপর মানুষের খুব আস্থা ছিল। বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীদের মালপত্র টাকা পয়সা ইত্যাদিও আনা-নেওয়া করিত। একবার সে সফরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? কুলি বলিল, অমুক শহরে। লোকটি বলিতে লাগিল, আমিও যাইব। আমার পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হইলে তোমার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়াই চলিতাম। তোমার জন্য কি সম্ভব যে, এক দীনার ভাড়ার বিনিময়ে তুমি আমাকে খচ্চরে চড়াইয়া নিবে? কুলি ইহাতে রাজী হইল, লোকটি সওয়ার হইয়া গেল। পথিমধ্যে একটি দ্বিমুখী রাস্তা পড়িল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌দিকে যাইতে চাও। কুলি সর্বসাধারণ লোক যে পথে চলে সেই পথের কথা বলিল। লোকটি বলিল, এই ভিন্নপথটি নিকটবর্তী হইবে এবং জানোয়ারটির জন্যও সুবিধাজনক হইবে। কারণ ইহাতে প্রচুর ঘাসের ব্যবস্থাও আছে। কুলি বলিল, আমি এই রাস্তা দেখি নাই। লোকটি বলিল, আমি বহুবার এই রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। কুলি বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহারা এই পথেই চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটি একটি ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে শেষ হইয়া গেল এবং সেখানে অনেক লাশ পড়িয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সওয়ারী হইতে নামিয়া কোমর হইতে খঞ্জর বাহির করিয়া কুলিকে কতল করিতে উদ্যত হইল। কুলি বলিল, এইরূপ করিও না। মালপত্র এবং খচ্চরই তোমার উদ্দেশ্য, কাজেই এইসব তুমি লইয়া যাও ; আমাকে কতল করিও না। লোকটি কুলির এই কথা মানিল না বরং কসম খাইয়া বলিল যে, আগে তোমাকে মারিব অতঃপর এইসব লইব। কুলি অনেক অনুনয় বিনয় করিল, তথাপি ঐ জালেম কোন কিছুই মানিল না। কুলি বলিল, আচ্ছা আমাকে শেষ বারের মত দুই রাকআত নামায পড়িতে দাও। সে রাজী হইল এবং উপহাস করিয়া বলিল, জলদি পড়িয়া লও ; এই মুর্দা লোকগুলিও এইরূপ আবেদন করিয়াছিল কিন্তু নামায তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। কুলি নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। আল-হামদু শরীফ পড়ার পর কোন সূরা তাহার মনে আসিতেছিল না। ঐ দিকে জালেম

দাঁড়াইয়া তাড়া দিতেছিল যে, জলদি নামায শেষ কর। এই দিকে মনের অজান্তেই কুলির জবান হইতে এই আয়াত বাহির হইল ঃ

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ (সূরা নমল, আয়াত ঃ ৬২)

সে এই আয়াত পড়িতেছিল আর কাঁদিতেছিল। এমন সময় চকচকে লোহার টুপি পরিহিত একজন আরোহী সামনে আসিল। সে বর্শা মারিয়া সেই জালেম লোকটিকে হত্যা করিল এবং যেখানে লোকটি মরিয়া পড়িল, সেইখান হইতে আগুনের শিখা উঠিতে লাগিল। উক্ত নামাযী বে-এখতিয়ার সেজদায় পড়িয়া গেল। আল্লাহর শোকর আদায় করিল। নামাযের পর আরোহী ব্যক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহর ওয়াস্তে এইটুকু বলুন যে, আপনি কে? কিভাবে আসিলেন? আরোহী বলিল, আমি أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ এর গোলাম, এখন তুমি বিপদমুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। এই বলিয়া আরোহী চলিয়া গেল।

(নুযহাতুল-মাজালিস)

প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই বড় দৌলত যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়াও দুনিয়ার বহু মুসীবত হইতেও নাজাতের কারণ হয়। আর দিলের শান্তি তো লাভ হইয়াই থাকে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দুই রাকআত নামায পড়ার মধ্যে অধিকার দেওয়া হয়, তবে আমি দুই রাকআত নামায পড়াকেই গ্রহণ করিব। কেননা, জান্নাতে প্রবেশ করা তো আমার নিজের খুশীর জন্য আর দুই রাকআত নামায হইল আমার মালিকের খুশীর জন্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, বড়ই ঈর্ষার পাত্র ঐ মুসলমান, যে হালকা পাতলা হয় (অর্থাৎ যাহার পরিবার পরিজনের বোঝা কম হয়) আর যথেষ্ট পরিমাণে তাহার নামায পড়িবার সুযোগ হয়, জীবিকার ব্যবস্থা কোনরূপে জীবন-যাপনের মত হয়, আর উহারই উপর সবর করিয়া জীবন পার করিয়া দেয়, আল্লাহর এবাদত ভাল করিয়া করে, মানুষের নিকট অপরিচিত থাকে, শীঘ্র মৃত্যুবরণ করে, পরিত্যক্ত সম্পত্তিও বেশী নাই, কান্নাকাটি করার লোকও তেমন কেহ নাই। (জামে সগীর)

এক হাদীসে আসিয়াছে, নিজের ঘরে নামায বেশী করিয়া পড়, ঘরে খায়ের-বরকত বৃদ্ধি পাইবে। (জামে সগীর)

٦ عَنْ اَبِیْ مُسْلِمٍ التَّغْلَبِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰی اَبِیْ اُمَامَةَ وَهُوَ فِی الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ یَا اَبَا اُمَامَةَ اِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِیْ مِنْكَ اَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ غَسَلَ یَدَیْهِ وَوَجْهَهٗ وَمَسَحَ عَلٰی رَأْسِهٖ وَاُذُنَیْهِ ثُمَّ قَامَ اِلٰی صَلٰوةٍ مَّفْرُوْضَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ فِیْ ذٰلِكَ الْیَوْمِ مَا مَشَتْ اِلَیْهِ رِجْلَاهُ وَقَبَضَتْ عَلَیْهِ یَدَاهُ وَسَمِعَتْ اِلَیْهِ اُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ اِلَیْهِ عَیْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهٖ نَفْسُهٗ مِنْ سُوْءٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُهٗ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا۔

ابومسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ جل شانہٗ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوتے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دفعہ سنا ہے

(رواه احمد والغالب على سنده الحسن وتقدم له شواهد فى الوضوء كذا فى الترغيب قلت وقد روى معنى الحديث عن ابى امامة بطرق فى مجمع الزوائد)

(৬) আবু মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। আমি আরজ করিলাম যে, আমার নিকট এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই এরশাদ শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে অতঃপর ফরজ নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ দিনের ঐ সমস্ত গোনাহ যাহা চলাফেরার দ্বারা হইয়াছে, যাহা হাতের দ্বারা করিয়াছে, যাহা কানের দ্বারা হইয়াছে, যাহা চক্ষু দ্বারা করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত গোনাহ যেগুলির খেয়াল তাহার অন্তরে পয়দা হইয়াছে সবই মাফ

করিয়া দেন। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কয়েক বার শুনিয়াছি। (তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টিও কয়েকজন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত উসমান, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আনাস, হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী, হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রাযিঃ) প্রমুখ হইতে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে শব্দের কিছুটা পার্থক্য সহ এই একই বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।

যে সমস্ত বুযুগার্নে দ্বীনের কাশ্‌ফ হইয়া থাকে তাহারা গোনাহ দূর হইয়া যাওয়ার বিষয়টি অনুভবও করিয়া থাকেন। হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ওযূর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝিতেন যে, ইহার সহিত কোন্ গোনাহ ধুইয়া যাইতেছে।

হযরত উসমান (রাযিঃ)এর একটি রেওয়ায়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও নকল করা হইয়াছে যে, কেহ যেন (নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়) এই কথার দ্বারা ধোকায় না পড়িয়া যায়। অর্থাৎ নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার উপর ভরসা করিয়া গোনাহে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস যেন কেহ না করে। কেননা, আমাদের নামায ও অন্যান্য এবাদতের যে অবস্থা, সেইগুলি যদি আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া কবূল করিয়া নেন, তবে উহা তাহার অসীম রহমত ও মেহেরবানী ছাড়া কিছুই নয়। নতুবা আমাদের এবাদতের অবস্থা তো আমরা নিজেরাই ভাল জানি। যদিও নামাযের মধ্যে এই শক্তি রহিয়াছে যে, ইহাতে গোনাহ মাফ হয়, কিন্তু আমাদের নামায সেই উপযুক্ত কিনা তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। আরেকটি কথা এই যে, 'আমার মাওলা অসীম দয়ালু ও মেহেরবান ; তিনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন' এই কথা মনে করিয়া গোনাহ করা খুবই লজ্জার ব্যাপার। ইহা তো এমনই হইল যে, কোন ব্যক্তি নিজের পুত্রগণকে বলিল, যে কেহ অমুক কাজ করিবে আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিব। নালায়েক পুত্রগণ পিতার মাফ করিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার নাফরমানী করিতে লাগিল।

(৭) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٌّ مِّنْ قُضَاعَةَ اَسْلَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُشْهِدَ اَحَدُهُمَا

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اُن میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہوگئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال

وَاٰخِرَ الْاٰخِرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَاَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهٗ رَمَضَانَ وَصَلّٰى سِتَّةَ اٰلَافِ رَكْعَةٍ وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلٰوةَ سَنَةٍ.

ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا اُن شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اُونچا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا اُن کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی اُن کے زیادہ ہوتے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں اُن کی بڑھ گئیں۔

ابتدائے حدیث کا ترجمہ (marginal, partly legible)

(رواه احمد باسناد حسن ورواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والبيهقى كلهم عن طلحة بنحوه اطول منه وزاد ابن ماجة وابن حبان فى اخره فلما بينهما اطول ما بين السماء والارض كذا فى الترغيب ولفظ احمد فى النسخة التى بايدينا او كذا وكذا ركعة بلفظ او وفى الدر اخرجه مالك واحمد والنسائى وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقى فى شعب الايمان عن عامر بن سعد قال سمعت سعدا و ناسا من الصحابة يقولون كان رجلان اخوان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احدهما افضل من الاخر فتوفى الذى هو افضلهما ثم عمر الاخر بعده اربعين ليلة الحديث وقد اخرج ابوداؤد بمعنى حديث الباب من حديث عبيد بن خالد بلفظ قتل احدهما ومات الاخر بعده بجمعة الحديث)

(৭) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক গোত্রের দুইজন সাহাবী একসঙ্গে মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জেহাদে শহীদ হইয়া গেলেন আর দ্বিতীয় জন এক বৎসর পর মারা গেলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যিনি এক বৎসর পর মারা গিয়াছিলেন তিনি সেই শহীদের আগেই জান্নাতে

প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করিলাম যে, শহীদের মর্তবা তো অনেক উঁচু ; তাহারই তো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা! এই বিষয়টি আমি নিজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম কিংবা অন্য কেহ আরজ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়াছে, তোমরা কি তাহার নেকীসমূহ দেখিতে পাও না যে, তাহা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে? এক বৎসরে তাহার পূর্ণ একটি রমযান মাসের রোযাও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ছয় হাজার রাকাতের অধিক নামাযও তাহার আমলনামায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (তারগীব ঃ আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ বৎসরের সব কয়টি মাসই যদি ঊনত্রিশ দিনের ধরা হয় এবং প্রতি দিনের শুধু ফরজ ও বিতরের নামায মিলাইয়া বিশ রাকআতেরই হিসাব করা হয়, তবু বৎসরে ছয় হাজার নয়শত ২০ রাকআত নামায হয়। আর যে সব মাস ত্রিশ দিনের হইবে প্রত্যেকটিতে বিশ রাকআত করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। উহার সহিত যদি সুন্নত ও নফল নামাযসমূহকে গণনা করা হয়, তাহা হইলে তো আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

ইবনে মাজাহ শরীফে এই ঘটনাটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত তালহা (রাযিঃ) যিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন তিনি নিজে বর্ণনা করিতেছেন যে, একটি গোত্রের দুইজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একসাথে হাজির হইলেন এবং একসাথেই তাহারা মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী। তিনি এক জেহাদে শহীদ হইয়া গেলেন। আর অপরজন এক বৎসর পর ইন্তেকাল করিলেন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো রহিয়াছি এবং ঐ দুইজন সাথীও সেখানে আছেন। এমন সময় ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিল যাহার এক বৎসর পর ইন্তেকাল হইয়াছিল আর শহীদ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর আবার ভিতর হইতে একজন আসিয়া শহীদ ব্যক্তিকে ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল। আর আমাকে বলিল, তোমার এখনও সময় হয় নাই ; তুমি ফিরিয়া যাও। পরদিন সকালে আমি লোকজনের নিকট স্বপ্নের আলোচনা করিলাম। সকলেই ইহাতে আশ্চর্য হইল যে, শহীদের অনুমতি পরে হইল কেন? তাহার তো আগেই অনুমতি হওয়া উচিত ছিল। লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া এই বিষয়টি আরজ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি

আছে! লোকেরা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী লোক ছিল এবং সে শহীদও হইয়াছে, অথচ অপরজন জান্নাতে তাহার আগে প্রবেশ করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আগে প্রবেশ করিয়াছে, সে কি এক বৎসরের এবাদত বেশী করে নাই? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন, সে কি পূরা এক রমযান মাসের রোযা বেশী রাখে নাই? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই রাখিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন, সে কি এক বৎসরে নামাযের মধ্যে এতো এতো সেজদা বেশী করে নাই? সকলেই উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো দুই জনের মধ্যে আসমান–যমীন পার্থক্য হইয়া গেল।

এই ধরণের ঘটনা আরও কয়েকজন সাহাবীর সহিত ঘটিয়াছে। আবূ দাঊদ শরীফে অন্য দুইজন সাহাবীর এই ধরণের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর ব্যবধান ছিল মাত্র আট দিন। দ্বিতীয় জনের ইন্তেকাল সাত দিন পর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করেন। আসলে আমাদের ধারণাই নাই যে, নামায কত দামী জিনিস। ইহাতে অবশ্যই কোন তাৎপর্য রহিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চোখের শীতলতা ও শান্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের শীতলতা ও শান্তি কোন মামুলী জিনিস নহে ; বরং তাহা পরম ভালবাসা ও মহব্বতেরই আলামত বুঝায়।

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, দুই ভাই চল্লিশ দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাহাদের মধ্যে যিনি আগে মারা গিয়াছেন তিনি বুযুর্গ ছিলেন। এইজন্য লোকেরা তাহাকে প্রাধান্য দিতে লাগিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বিতীয় ভাই কি মুসলমান ছিলেন না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই মুসলমান ছিলেন, তবে সাধারণ পর্যায়ের ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, চল্লিশ দিনের এবাদত উক্ত ব্যক্তিকে কোন্ পর্যায়ে পৌছাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ নামাযের উদাহরণ হইল, একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহরের মত, যাহা কাহারো বাড়ীর দরজার নিকট প্রবাহিত রহিয়াছে এবং সে উহাতে দৈনিক পাঁচবার করিয়া গোসল করিয়া থাকে, তবে তাহার শরীরে

কি কোন ময়লাই থাকিতে পারে? অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কি জান, তাহার ঐ সমস্ত নামায যাহা সে পরে পড়িয়াছে উহা তাহাকে কোন্ মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

(৮) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَيَقُوْلُ يَا بَنِيْ اٰدَمَ قُوْمُوْا فَاطْفِئُوْا مَا اَوْقَدْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا فَاِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَيَنَامُوْنَ فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ وَّمُدْلِجٌ فِيْ شَرٍّ (رواه الطبراني في الكبير كذا في الترغيب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے (گناہوں کی بدولت) اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ چنانچہ (دیندار لوگ) اُٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اُنکے گناہوں کی (صبح سے ظہر تک کی) مغفرت کر دی جاتی ہے اسی طرح پھر عصر کے وقت پھر مغرب کے وقت پھر عشاء کے وقت (غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے) عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں (زنا کاری بدکاری چوری وغیرہ) کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں (نماز وظیفہ ذکر وغیرہ) کی طرف چلنے لگتے ہیں۔

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, হে আদমের সন্তানগণ! উঠ এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা (নিজেদের গোনাহের কারণে) নিজেদের উপর জ্বালাইতে শুরু করিয়াছ তাহা নিভাও। অতএব (দ্বীনদার লোকেরা) উঠে, ওযূ করে এবং যোহরের নামায পড়ে। যদ্দরুণ তাহাদের (সকাল হইতে যোহর পর্যন্ত) গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আছরের সময়, মাগরিবের সময়, এশার সময়, মোটকথা প্রত্যেক নামাযের সময় এরূপ হইতে থাকে। এশার নামাযের পর লোকজন ঘুমাইয়া পড়ে। অতঃপর অন্ধকারে কিছুসংখ্যক লোক মন্দ কাজে (অর্থাৎ জেনা, চুরি ও বিভিন্ন

অন্যায় কাজে) লিপ্ত হইয়া যায় আর কিছু সংখ্যক লোক সৎকাজে (অর্থাৎ নামায, ওজীফা ও যিকিরে) মশগুল হইয়া যায়। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ হাদীসের কিতাবসমূহে অধিক পরিমাণে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী করিয়া নামাযের বদৌলতে গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। নামাযের ভিতরেই যেহেতু এস্তেগফার রহিয়াছে, তাই ছগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনা–ই মাফীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, গোনাহের উপর আন্তরিকভাবে লজ্জিত হইতে হইবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ

(সূরা হুদ, আয়াত ঃ ১১৪)

৩নং হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হযরত সালমান (রাযিঃ) একজন বড় মশহুর সাহাবী। তিনি বলেন, যখন এশার নামায শেষ হইয়া যায়, তখন সমস্ত মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এক দল যাহাদের জন্য এই রাত্রি নেয়ামত ও কল্যাণকর হয়, যাহারা এই রাত্রিকে নেকী উপার্জনের অপূর্ব সুযোগ বলিয়া মনে করেন। অতএব লোকেরা যখন আরাম আয়েশ ও ঘুমে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ইহারা নামাযে মশগুল হইয়া যান। সুতরাং ইহা তাহাদের জন্য সওয়াব ও নেকীর রাত্র হইয়া যায়। দ্বিতীয় দল, যাহাদের জন্য রাত্র চরম মুসীবত ও আজাব স্বরূপ হয়। তাহারা রাত্রের নির্জনতা ও অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া বিভিন্ন গোনাহের কাজে মশগুল হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রাত্র তাহাদের জন্য মুসীবত ও বরবাদীর কারণ হইয়া যায়। তৃতীয় দল, যাহারা এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহাদের জন্য না মুসীবত, না উপার্জন, না কিছু গেল, না কিছু আসিল।

(দুররে মানসূর)

(৭) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنِّي افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کرلیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو اُن کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل

فِي عَهْدِي وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي. — کرونگا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اسکی کوئی ذمہ داری نہیں۔

(کذا فی الدر المنثور بروایت ابی داؤد وابن ماجۃ وفیہ ایضًا اخرج مالک و ابن ابی شیبۃ واحمد وابوداؤد والنسائی وابن ماجۃ وابن حبان والبیہقی عن عبادۃ بن الصامت فذکر معنی حدیث الباب مرفوعًا باطول منہ)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করিবে আমি তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে এই নামাযসমূহ আদায় করিবে না, তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দুররে মানসূর ঃ আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ এই নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি না করে ; বরং উত্তমরূপে ওযূ করিয়া সময় মত খুশু ও খুযুর সহিত নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। আর যেই ব্যক্তি এইরূপ করিবে না, তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই—তাহাকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। নামাযের কত বড় ফযীলত যে, ইহার এহতেমাম করিলে বান্দা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও জিম্মাদারীর মধ্যে দাখেল হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, যদি কোন সাধারণ সরকারী লোক কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি কাহাকেও কোন প্রকার আশ্বাস দেয় অথবা কোন দাবী পূরণের জিম্মাদারী নেয় কিংবা কোন বিষয়ে জামিন হয়, তবে সেই ব্যক্তি কত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয় এবং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ ও ভক্ত হইয়া যায়। অথচ এইখানে মামুলী একটি এবাদত যাহাতে তেমন কোন কষ্টও নাই উপরন্তু সকল বাদশাহের বাদশাহ ওয়াদা করিতেছেন। এতদসত্ত্বেও ইহার প্রতি আমরা উদাসীন ও গাফেল। ইহাতে কাহার কি ক্ষতি ; নিজেরই দুর্ভাগ্য এবং নিজেরই ক্ষতি।

(১০) عَنِ ابْنِ سَلْمَانَ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهٗ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهٗ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْوَادِيْ قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلٰثَمِائَةِ اُوْقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ.

(اخرجه ابوداؤد وسكت عنه المنذري)

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مالِ غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے اور خرید وفروخت شروع ہوگئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا، اتنے میں ایک صحابی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضورؐ نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں تین سو اُوقیہ چاندی نفع میں بچی حضورؐ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں انہوں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل۔

(১০) একজন সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন যুদ্ধে খায়বর জয় করিলাম, তখন লোকেরা তাহাদের গনীমতের মাল বাহির করিল। যাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সামান-পত্র এবং যুদ্ধবন্দী ছিল। অতঃপর বেচা-কেনা শুরু হইয়া গেল। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে লাগিল) এমন সময় একজন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকের এই ব্যবসায় আমার এত বেশী লাভ হইয়াছে যে, সমস্ত জামাতের মধ্যে আর কাহারও এই পরিমাণ লাভ হয় নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পরিমাণ লাভ করিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সামান খরিদ করিতেছিলাম এবং তাহা বিক্রয় করিতেছিলাম। ইহাতে আমার তিনশত উকিয়া লাভ হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি

তোমাকে সবচাইতে লাভ জনক জিনিস কি উহা বলিয়া দিবো? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকআত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ চল্লিশ দেরহামে এক উকিয়া হয় এবং প্রায় চার আনাতে এক দেরহাম হয়। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী তিন হাজার রুপী হইয়াছে। ইহার মোকাবেলায় দোজাহানের বাদশাহের এরশাদ হইল, ইহা আর তেমন কি লাভ! প্রকৃত লাভ হইল যাহা চিরকাল বাকি থাকিবে ; কোন দিন শেষ হইবে না। বাস্তবিকই যদি আমাদের ঈমান এইরূপ হইয়া যাইত এবং দুই রাকআত নামাযের তুলনায় তিন হাজার টাকা আমাদের নিকট কোনই মূল্য না রাখিত, তবেই আমরা জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিতাম। আসলে নামায এমনই এক মূল্যবান সম্পদ। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চোখের শীতলতা ও তৃপ্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া এরশাদ করিয়াছেন এবং ওফাতের সময় সর্বশেষ ওসিয়ত যাহা করিয়াছেন উহাতে নামাযের এহতেমামের হুকুম করিয়াছেন। (কান্‌যুল উম্মাল)

বিভিন্ন হাদীসে উহার ওসিয়ত উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক হইতে ঠিকভাবে শব্দও উচ্চারিত হইতেছিল না ; তখনও তিনি নামায ও গোলামের হক সম্বন্ধে তাকীদ করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও নকল করা হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল নামাযের তাকীদ এবং গোলামের হক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার হুকুম। (জামে ছগীর)

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজ্‌দ অভিমুখে জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গণীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা বড় আশ্চর্য হইল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় কামিয়াবী এবং এত মাল–সম্পদ লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও কম সময়ে ও এই মাল ও গনীমত অপেক্ষা অধিক মাল ও গনীমত উপার্জনকারী জামাতের কথা বলিয়া দিব? তাহারা ঐ সকল লোক, যাহারা ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্য উঠা

পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকে। সূর্য উঠিবার পর (যখন মাকরূহ সময় অর্থাৎ প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া যায় তখন) দুই রাকআত (ইশরাকের) নামায পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী ধন-সম্পদ উপার্জনকারী।

বিখ্যাত বুযুর্গ সূফী হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন যে, আমি পাঁচটি জিনিস তালাশ করিয়াছি এবং তাহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। (১) রুজীর বরকত চাশ্‌তের নামাযে। (২) কবরের জ্যোতি তাহাজ্জুদ নামাযে। (৩) মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে। (৪) সহজে পুলছেরাত পার হওয়া রোযা ও ছদকার মধ্যে। (৫) আরশের ছায়া নির্জনতার মধ্যে। (নুয্‌হাতুল-মাজালিস)

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায সম্পর্কে বহু তাকীদ এবং নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই সবগুলিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও বরকতের জন্য কিছুসংখ্যক হাদীসের শুধু তরজমা পেশ করা হইল।

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে।

(২) নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

(৩) মানুষ ও শির্‌কের মধ্যে একমাত্র নামাযই হইল বাধা ও অন্তরায়।

(৪) ইসলামের আলামত হইল নামায। যে ব্যক্তি দিলকে ফারেগ করিয়া সঠিক সময় ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায পড়িবে সে প্রকৃত মু'মিন।

(৫) আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নামাযের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস ফরজ করেন নাই। যদি উহা হইতে উত্তম আর কোন জিনিস ফরজ করিতেন, তবে ফেরেশতাগণকে সেই কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন। ফেরেশতাগণ দিবা-রাত্রি কেহ রুকুতে আর কেহ সেজদায় আছেন।

(৬) নামায দ্বীনের খুঁটি।

(৭) নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয়।

(৮) নামায মুমিনের নূর।

(৯) নামায শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

(১০) যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে পুরাপুরি মনোযোগ দেন। যখন সে নামায হইতে মনোযোগ সরাইয়া

নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও মনোযোগ সরাইয়া নেন।

(১১) যখন কোন আসমানী বালা নাযিল হয়, তখন তাহা মসজিদ আবাদকারীদের হইতে সরিয়া যায়।

(১২) কোন কারণে যদি মানুষ জাহান্নামে যায়, তবে তাহার সেজদার জায়গাকে আগুন স্পর্শ করিবে না।

(১৩) আল্লাহ তায়ালা সেজদার জায়গাগুলিকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(১৪) সব চাইতে পছন্দনীয় আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ নামায যাহা সময় মত আদায় করা হয়।

(১৫) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাহার সকল অবস্থার মধ্যে এই অবস্থায় দেখিতে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন যে, মানুষ সেজদায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কপাল মাটিতে ঘষিতেছে।

(১৬) সেজদার অবস্থায় মানুষ আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করে।

(১৭) নামায বেহেশতের চাবি।

(১৮) মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও নামাযী ব্যক্তির মধ্য হইতে পর্দাসমূহ সরিয়া যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাশি ইত্যাদির মধ্যে মশগুল না হয়।

(১৯) নামাযী ব্যক্তি শাহানশাহের দরজায় খটখটাইতে থাকে, আর স্বাভাবিক নিয়ম হইল, দরজা খটখটাইতে থাকিলে তাহা খুলিয়াই যায়।

(২০) দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা।

(২১) নামায দিলের নূর, যে ব্যক্তি নিজের দিলকে নূরানী বানাইতে চায় সে যেন নামাযের দ্বারা বানাইয়া লয়।

(২২) যে ব্যক্তি ভাল করিয়া ওযূ করে অতঃপর খুশু–খুযূ সহকারে দুই রাকআত অথবা চার রাকআত ফরজ কিংবা নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের গোনাহসমূহের জন্য মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন।

(২৩) জমিনের যে অংশের উপর নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালাকে ইয়াদ করা হয় সেই অংশটি জমিনের অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করে।

(২৪) যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন দোয়া করে, সঙ্গে সঙ্গে হউক বা কোন কারণে দেরীতে হউক আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া অবশ্যই কবূল করিয়া নেন।

(২৫) যে ব্যক্তি নির্জনে দুই রাকআত নামায আদায় করে, যাহা আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর কেহ জানিতে না পারে, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তির পরওয়ানা পাইয়া যায়।

(২৬) যে ব্যক্তি একটি ফরজ নামায আদায় করে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার একটি দোয়া কবূল হইয়া যায়।

(২৭) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এহতেমামের সহিত আদায় করিতে থাকে, রুকু সেজদা ওযূ ইত্যাদি এহতেমামের সহিত উত্তমরূপে পুরাপুরিভাবে আদায় করিতে থাকে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায় এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়।

(২৮) মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের এহতেমাম করিতে থাকে, শয়তান তাহাকে ভয় করিতে থাকে। আর যখন সে নামাযে গাফলতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার উপর শয়তান সাহস পাইয়া যায় এবং তাহাকে বিপথগামী করার লোভ করিতে থাকে।

(২৯) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩০) নামায প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তির কুরবানীস্বরূপ।

(৩১) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩২) যে সকালবেলায় নামায পড়িতে যায়, তাহার হাতে ঈমানের ঝাণ্ডা থাকে। আর যে বাজারে যায় তাহার হাতে শয়তানের ঝাণ্ডা থাকে।

(৩৩) যোহরের নামাযের আগে চারি রাকআত নামাযের সওয়াব এমন যেমন তাহাজ্জুদের চারি রাকআত নামাযের সওয়াব।

(৩৪) যোহরের পূর্বে চারি রাকআত নামায তাহাজ্জুদের চারি রাকআতের সমান বলিয়া গণ্য হয়।

(৩৫) মানুষ যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহর রহমত তাহার দিকে মনোযোগী হয়।

(৩৬) শ্রেষ্ঠতর নামায হইল মধ্যরাত্রির নামায, কিন্তু এই নামায আদায়কারীর সংখ্যা অনেক কম।

(৩৭) আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যতদিনই বাঁচিয়া থাকুন না কেন একদিন আপনাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, আর যাহাকে ইচ্ছা ভালবাসুন না কেন একদিন আপনাকে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইতে হইবে, আর ভাল-মন্দ যে আমলই আপনি করুন না কেন উহার বদলা অবশ্যই পাইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই যে,মুমিনের শরাফত ও বুযুর্গী তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে এবং মুমিনের ইজ্জত ও সম্মান অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

(৩৮) শেষ রাত্রের দুই রাকআত নামায সমস্ত দুনিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ। কষ্টের আশংকা না হইলে আমি ইহা উম্মতের উপর ফরজ করিয়া দিতাম।

(৩৯) তাহাজ্জুদ নামায অবশ্যই পড়। কেননা, ইহা নেক বান্দাদের তরীকা এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। তাহাজ্জুদ গোনাহ হইতে বিরত রাখে এবং গোনাহ মাফ হওয়ার উপায়। ইহাতে শারীরিক সুস্থতাও লাভ হয়।

(৪০) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে আদমসন্তান! দিনের শুরুতে তুমি চারি রাকআত নামায আদায়ে অক্ষম হইও না। আমি সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া দিব।

হাদীসের কিতাবসমূহে নামাযের ফযীলত ও নামাযের প্রতি উৎসাহদান প্রসঙ্গে বহু হাদীসের উল্লেখ রহিয়াছে। চল্লিশের সংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে এই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইল। যাহাতে চল্লিশ হাদীসের বিশেষ ফযীলত হাসিল করিবার জন্য কেহ এইগুলি মুখস্থ করিয়া লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই এক বিরাট সম্পদ যে, ইহার মর্যাদা একমাত্র সেই ব্যক্তিই রক্ষা করিতে পারে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই নামাযের স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। নামাযের এহেন মর্যাদার কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে আপন চোখের শীতলতা বলিয়াছেন আর এই স্বাদের দরুনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের অধিকাংশ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া দিতেন। আর এই কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় বিশেষভাবে নামাযের জন্য ওসিয়ত করিয়াছেন এবং এহতেমামের সহিত উহা আদায় করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস শরীফে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে ঃ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, নামাযের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, সমস্ত আমলের মধ্যে আমার নিকট নামাযই সবচেয়ে প্রিয় আমল।

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি মসজিদে নববীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। আমি আগ্রহের সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, তিনি একশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু যখন তিনি একশত আয়াত পাঠ করিয়া রুকু করিলেন না তখন আমি মনে করিলাম, দুইশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু সেখানেও তিনি রুকূ করিলেন না। তখন আমি মনে করিলাম, সূরা শেষ করিয়া রুকূ করিবেন। কিন্তু যখন সূরা শেষ হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার 'আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ' পড়িলেন অতঃপর সূরা আলি-ইমরান শুরু করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে মনে করিলাম যে, সূরায়ে আলি-ইমরান শেষ করিয়া তো অবশ্যই রুকূ করিবেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাও শেষ করিলেন এবং তিনবার 'আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ' পড়িয়া সূরায়ে মায়েদা শুরু করিয়া দিলেন। অতঃপর এই সূরা শেষ করিয়া রুকূ করিলেন। রুকূর মধ্যে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়িতে থাকিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর সেজদায় যাইয়াও পূর্বের মত 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়িতেছিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে আনআম শুরু করিয়া দিলেন। আমি আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িবার হিম্মত করিতে পারিলাম না। অবশেষে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। প্রথম রাকআতে প্রায় পাঁচ পারা হইয়াছে। তদুপরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়াও একেবারে ধীরে ধীরে তাজবীদ ও তারতীলের সহিত—প্রত্যেক আয়াতকে তিনি পৃথক পৃথক করিয়া তেলাওয়াত করিতে অভ্যস্থ ছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের রাকআত কতই না লম্বা হইয়াছিল! এইসব কারণেই নামায পড়িতে পড়িতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারক ফুলিয়া যাইত! কিন্তু যে জিনিসের স্বাদ একবার অন্তরে স্থান করিয়া লয় উহাতে কষ্ট ও পরিশ্রম করা কঠিন মনে হয় না।

আবূ ইসহাক সুবাইহী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একশত বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি আফসোস করিতেন, হায়! বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে এখন আর নামাযের স্বাদ পাই না ; দুই রাকআতে শুধুমাত্র সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলি-ইমরান এই দুইটি

সূরা-ই পড়িতে পারি—ইহার বেশী পড়িতে পারি না। উল্লেখ্য যে, এই দুইটি সূরা পৌনে চার পারার সমান।

মুহাম্মদ ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কুফা নগরে আমার একজন প্রতিবেশী ছিল। তাহার একটি ছেলে দিনের বেলায় সব সময় রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত ও ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠে মশগুল থাকিত। ছেলেটি শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছিল যে, শরীরে হাড্ডি ও চামড়াটুকুই বাকী ছিল। তাহার পিতা একদিন আমাকে ছেলেটিকে বুঝাইতে বলিলেন। অতঃপর আমি একদিন আমার বাড়ীর দরজায় বসিয়া ছিলাম ; সে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলে আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে আসিল এবং সালাম দিয়া আমার নিকট বসিল। আমি আমার কথা আরম্ভ করিতেই সে বলিতে লাগিল, চাচা! আপনি হয়তো আমাকে পরিশ্রম কম করিবার পরামর্শ দিবেন। চাচাজান! আমি এই মহল্লার কয়েকজন ছেলের সহিত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে বেশী এবাদত করিতে পারে। তাহারা চেষ্টা ও মেহনত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে। যখন তাহাদের ডাক আসিল, তাহারা অতি আনন্দের সহিত চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আমার আমল প্রতিদিন দুইবার তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া থাকিবে, কাজেই উহাতে কম হইলে তাহারা কি মনে করিবে! চাচাজান! ঐ সকল যুবকরা বড় সাধনা করিয়াছে। এই বলিয়া সে তাহাদের মেহনত-মুজাহাদার বিবরণ দিতে লাগিল। বিবরণ শুনিয়া আমরা হতভম্ভ হইয়া গেলাম। অতঃপর সেই ছেলে উঠিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন আমরা শুনিলাম যে, এই ছেলেটিও দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। আল্লাহ তাহার উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন। বর্তমান অধঃপতনের যুগেও আল্লাহর এমন সব বান্দা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময়ই নামাযের মধ্যে কাটাইয়া দেন এবং দিনের বেলায় দ্বীনের অন্যান্য কাজ তালীম তবলীগ ইত্যাদির মধ্যে মনোনিবেশ করেন।

হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী (রহঃ)এর নাম শুনে নাই হিন্দুস্থানে এমন কে আছে—তাঁহারই একজন বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ লাহোরী (রহঃ) একদিন বলিয়া উঠিলেন, বেহেশতে কি নামায হইবে না? কেহ উত্তর করিল, বেহেশতে নামায কেন হইবে, উহা তো আমলের বদলা দেওয়ার স্থান, আমল করার স্থান নয়। ইহা শুনিয়া তিনি আ-হ্ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায় আফসোস! নামায

ছাড়া বেহেশতে কিভাবে সময় কাটিবে। বস্তুতঃ এইসব লোকের ওসীলাতেই দুনিয়া কায়েম রহিয়াছে এবং তাঁহারাই সার্থক জীবন লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাঁহার মাহবুব বান্দাদের ওসীলায় এই অধমের প্রতিও যদি কিছুটা রহমতের দৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার সীমাহীন রহমতের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়।

এখানে একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) মুনাব্বেহাত কিতাবে লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ঃ এই দুনিয়াতে তিনটি জিনিস আমার প্রিয়—খুশবু, নারী আর নামাযে আমার চোখের শীতলতা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—আপনার চেহারা মুবারক দেখা, আমার অর্থ–সম্পদ আপনার জন্য খরচ করা এবং আমার কন্যা আপনার বিবাহে রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং পুরাতন কাপড় পরিধান করা।

হযরত উসমান (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমারও তিনটি জিনিস প্রিয়—মেহমানের খেদমত, গরমের দিনে রোযা রাখা এবং দুশমনের উপর তলোয়ার চালানো।

এমন সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা পাঠাইয়াছেন। অতঃপর বলিলেন যে, আমি (জিবরাঈল) যদি দুনিয়াবাসীদের একজন হইতাম তবে কি পছন্দ করিতাম, বলিব কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বলুন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, পথহারাদের পথের সন্ধান দেওয়া, গরীব এবাদতকারী লোকদেরকে মহব্বত করা এবং সন্তান–সন্ততিওয়ালা গরীব লোকদেরকে সাহায্য করা। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন—জান–মালের শক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্রন্দন করা এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছবর করা।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) 'যাদুল-মাআদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, নামায রুজী আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, রোগ-ব্যাধি দূর করে, অন্তরকে শক্তিশালী করে, চেহারার নূর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে, অলসতা দূর করে, অন্তর খুলিয়া দেয়। নামায রূহের খোরাক, দিলকে নূরানী করে, আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে রক্ষা করে, আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে, শয়তানকে দূর করিয়া রাখে, রহমানের সহিত নৈকট্য সৃষ্টি করে। মোটকথা দেহ এবং আত্মার সুস্থতা রক্ষার জন্য নামাযের বিশেষ দখল ও আশ্চর্যজনক তাছীর রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট দূরীকরণ ও দোজাহানের যাবতীয় কল্যাণ সাধনে নামাযের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিবরণ

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায না পড়ার উপর কঠিন কঠিন আজাব ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসই বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উম্মতের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মহব্বতের উপর কুরবান হইয়া যাওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্নভাবে বারবার আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার নামের ধারক বাহক উম্মত যেন নামাযের ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি না করে। কিন্তু আফসোস আমাদের অবস্থার উপর যে, হুযূরের এই পরিমাণ এহতেমাম সত্ত্বেও আমরা নামাযের প্রতি কোন গুরুত্বই দেই না। আবার নিজেদেরকে নির্লজ্জভাবে হুযূরের উম্মত ও তাহার অনুসারী এবং ইসলামের একমাত্র স্বত্বাধিকারী মনে করিয়া থাকি।

(১) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ۔ رواه احمد ومسلم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور

وَقَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ۔ کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

(ابوداؤد والنسائی ولفظہ لیس بین العبد وبین الکفر الا ترک الصلٰوۃ والترمذی ولفظہ قال بین الکفر والایمان ترک الصلٰوۃ وابن ماجۃ ولفظہ قال بین العبد وبین الکفر ترک الصلٰوۃ کذا فی الترغیب للمنذری وقال السیوطی فی الدر الحدیث جابر اخرجہ ابن ابی شیبۃ واحمد ومسلم وابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجۃ ثم قال واخرج ابن ابی شیبۃ واحمد وابوداؤد والترمذی وصححہ والنسائی وابن ماجۃ وابن حبان والحاکم وصححہ عن بریدۃ مرفوعًا العہد الذی بیننا وبینہم الصلٰوۃ فمن ترکہا فقد کفر)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মানুষকে কুফরের সহিত মিলাইয়া দেয়। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে যে, বান্দা এবং কুফরকে মিলানোর বস্তু একমাত্র নামায ছাড়িয়া দেওয়া। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হইল নামায ত্যাগ করা। (তারগীব)

ফায়দা ঃ এইরূপ বর্ণনা আরও কতিপয় হাদীসে আসিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে জলদি নামায পড়িয়া লও। কেননা নামায ত্যাগ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, মেঘের কারণে নামাযের ওয়াক্তের খবর হইল না এবং নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাকেও নামায ত্যাগ করা বলিয়াছেন। কত বড় কঠিন কথা যে, আল্লাহর নবী নামায ত্যাগকারীর উপর কুফরের হুকুম লাগাইতেছেন। যদিও ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসে 'নামায ত্যাগ করা'র অর্থ 'নামাযকে অস্বীকার করা' বুঝাইয়াছেন, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম ও গুরুত্ব এত অপরিসীম যে, যাহার অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত ও মর্যাদার সামান্যতম অনুভূতিও থাকিবে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে এবং তাহার নিকট ইহা অত্যন্ত মারাত্মক বলিয়া মনে হইবে। ইহা ছাড়া বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের অভিমতও এই যে, বিনা ওজরে জানিয়া শুনিয়া নামায ত্যাগকারী কাফের। ইমামগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ

ও ইবনে মুবারক (রহঃ)এরও অভিমত ইহাই বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। (তারগীব)

(২) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِّعْتُمْ اَوْ حُرِّقْتُمْ اَوْ صُلِّبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدِيْنَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ فَاِنَّهَا سَخَطُ اللهِ وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا رَاْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا.

حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں کی ہیں جن میں سے چار یہ ہیں اوّل یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاویں یا تم جلا دیئے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیئے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔

(الحديث رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلوة باسنادين لا باس بهما كذا في الترغيب وهكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه اليهما في المشكوة برواية ابن ماجة عن ابن ابي الدرداء نحوه)

(২) হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার প্রিয় হাবীব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারটি এই— (১) তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় অথবা তোমাকে শূলিতে চড়ানো হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না ; কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যায়। (৩) আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী করিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। (৪) শরাব পান করিও না। কেননা, ইহা যাবতীয় পাপ কাজের মূল। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতেও এইরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওছিয়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহর সাথে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার কোন জিম্মাদারী নাই। তৃতীয়তঃ শরাব পান করিওনা। কারণ ইহা সকল পাপকাজের চাবি।

(۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَوْصَانِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ بِعَشْرِ کَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰہِ شَیْئًا وَّاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَیْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَھْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلٰوۃً مَّکْتُوْبَۃً مُّتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوۃً مَّکْتُوْبَۃً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْہُ ذِمَّۃُ اللّٰہِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّہٗ رَأْسُ کُلِّ فَاحِشَۃٍ وَاِیَّاكَ وَ الْمَعْصِیَۃَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِیَۃِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰہِ وَاِیَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ ھَلَكَ النَّاسُ وَاِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰی اَھْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْھُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْھُمْ فِی اللّٰہِ ۔

حضرت معاذ رض فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ ١۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ٢۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ ٣۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ ۴۔ شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ ۵۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالی کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ ٦۔ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ ٧۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے (جیسے طاعون وغیرہ) تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ ٨۔ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ ٩۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ ١٠۔ اللہ تعالی سے ان کو ڈراتے رہنا۔

(رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر واسناد احمد صحیح لو سلم من الانقطاع فان عبد الرحمن ابن جبیر لم یسمع من معاذ کذا فی الترغیب والیھما عزاہ السیوطی فی الدر ولم یذکر الانقطاع ثم قال واخرج الطبرانی عن امیمۃ مولاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کنت اصب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ فدخل رجل فقال اوصنی فقال لا تشرك باللہ شیئا وان قطعت اوحرقت ولا تعص والدیك وان امراك ان تخلی من اھلك ودنیاك فتخلہ ولا تشربن خمرا فانہ مفتاح کل شر ولا تترکن صلوۃ متعمدا فمن فعل ذلك فقد برأت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ)

(৩) হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়ের ওসিয়ত করিয়াছেন ঃ

(১) আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে কতল করা হয় কিংবা আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

(২) পিতামাতার নাফরমানী করিও না ; যদিও তাহারা তোমাকে স্ত্রী অথবা সমুদয় ধন–সম্পদ ত্যাগ করিতে বলেন।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার কোন জিম্মাদারী থাকে না।

(৪) শরাব পান করিও না। কারণ, ইহা যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ কাজের মূল।

(৫) আল্লাহ তায়ালার না–ফরমানী করিও না। কারণ, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযিল হয়।

(৬) জেহাদ হইতে পলায়ন করিও না ; যদিও তোমার সকল সাথী মারা যায়।

(৭) যদি কোন এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়ে (যেমন প্লেগ ইত্যাদি), তবে সেখান হইতে পলায়ন করিও না।

(৮) নিজ পরিবারের লোকদের জন্য সাধ্যমত খরচ করিও।

(৯) তাহাদের উপর হইতে শাসনের লাঠি হটাইও না।

(১০) তাহাদিগকে আল্লাহর ভয় দেখাইতে থাকিও।

(তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ লাঠি না হটানোর অর্থ হইল, সন্তানরা যাহাতে বে–ফিকির না হইয়া যায় যে, পিতা যখন শাসন করিতেছেন না বা মারধর করিতেছেন না, কাজেই যাহা ইচ্ছা করিতে থাকি। অতএব শরীয়তের সীমার ভিতর থাকিয়া কখনও কখনও মারধর করা চাই। কেননা, মারধর ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের শাসন হয় না। আজকাল প্রথম অবস্থায় সন্তানদেরকে মহব্বতের জোশে শাসন করা হয় না। পরবর্তীতে যখন তাহারা বদ অভ্যাসে পাকা হইয়া যায় তখন কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ সন্তানকে মন্দকাজ হইতে বাধা না দেওয়া ও মারধর করাকে মহব্বতের খেলাফ মনে করা তাহার সহিত মহব্বত নহে বরং শক্ত দুশমনী। এমন বুদ্ধিমান কে আছে যে কষ্ট পাইবে মনে করিয়া আপন সন্তানের ফোঁড়ার অপারেশন করায় না? বরং ছেলে যতই কান্নাকাটি করুক, চেহারা বিকৃত করুক, ভাগিয়া যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, অপারেশন করাইতেই হয়।

বহু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, সন্তানকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের হুকুম কর এবং দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়ার দরুন মারপিট কর। (দুররে মানসূর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, বাচ্চাদের নামাযের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ এবং তাহাদিগকে ভাল কথা ও ভাল অভ্যাস শিক্ষা দাও। হযরত লোকমান হাকীম (আঃ) বলিয়াছেন, পিতার মারধর সন্তানের জন্য এমন যেমন ক্ষেতের জন্য পানি। (দুররে মানসূর) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সন্তানকে শাসন করা আল্লাহর রাস্তায় এক ছা' (অর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ সদকা করা হইতেও উত্তম। (দুররে মানসূর) এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে পরিবারের লোকদের শাসনের উদ্দেশ্যে ঘরে চাবুক লটকাইয়া রাখে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোন পিতা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সমতুল্য পুরস্কার আর কিছুই দিতে পারে না। (জামে সগীর)

(٤) عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعٰوِيَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهٗ وَمَالَهٗ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔

(رواہ ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب زاد السیوطی فی الدر والنسائی ایضا قلت ورواہ احمد فی مسندہ)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে-ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল, তাহার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল। (তারগীব ঃ ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির কারণে—তাহাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার মধ্যে মশগুল থাকার কারণে নামায নষ্ট করা হয়। কিংবা ধন-সম্পদ কামাইয়ের লোভে নষ্ট করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামায নষ্ট করার পরিণতি এমনই যেমন সন্তান-সন্ততি ও মাল-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল এবং সে একা রহিয়া গেল। অর্থাৎ এই অবস্থায় যত বড় ক্ষতি ও লোকসান হয়, নামায ছুটিয়া গেলেও তদ্রূপ হয়। অথবা ঐ অবস্থায় যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও মনে ব্যথা হয়, নামায ছুটিয়া গেলে তদ্রূপ হওয়া চাই। যদি কোন বিশ্বস্থ

ব্যক্তি কাহাকেও এই মর্মে সাবধান করিয়া দেয় এবং তাহার বিশ্বাসও হয় যে, এই পথে ডাকাতরা লুটতরাজ করে, রাত্রে যাহারা এই রাস্তা দিয়া যায় ডাকাতরা তাহাদেরকে কতল করিয়া দেয় এবং মালামাল লুট করিয়া নেয়, তবে এমন বীরপুরুষ কে আছে যে রাত্রিবেলায় এই পথে যাইবে। রাত্রে তো দূরের কথা দিনের বেলায়ও এই পথে যাওয়ার সাহস করিবে না। অথচ আল্লাহর প্রিয় সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এক দুইটি নহে বরং বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আফসোস! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার দাবীও আমরা আমাদের মিথ্যা জবানে করি ; কিন্তু তাঁহার এই পবিত্র বাণীর কী প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে।

(٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو ۲ نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔

(رواه الحاكم وقال حنش هو ابن قيس ثقة وقال الحافظ بل واه بمرة لانعلم احد اوثقه غير حصين بن نمير كذا فى الترغيب زاد السيوطى فى الدر الترمذى ايضا و ذكر فى اللآلى له شواهد وكذا فى التعقبات و قال الحديث اخرجه الترمذى وقال حنش ضعيف ضعفه احمد وغيره والعمل على هٰذا عند اهل العلم فاشار بذٰلك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله اه)

(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একসঙ্গে পড়িল, সে কবীরা গোনাহের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটিতে প্রবেশ করিল।

(তারগীব ঃ হাকিম, দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন কাজে বিলম্ব করিও না।

প্রথম ঃ নামায, যখন উহার সময় হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ঃ জানাযা, যখন উহা তৈয়ার হইয়া যায়।

তৃতীয় ঃ অবিবাহিতা নারী, যখন তাহার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়া যায়। (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও) অনেক লোক যাহারা নিজদিগকে

দ্বীনদারও মনে করে এবং নামাযের পাবন্দি করে বলিয়াও মনে করে, তাহারা সফর অথবা দোকান বা চাকুরী ইত্যাদি কাজের সামান্য অজুহাতে কয়েক ওয়াক্ত নামায একত্রে ঘরে আসিয়া পড়িয়া নেয়—অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজর ব্যতীত নামাযকে সময় মত না পড়া কবীরা গোনাহ। যদিও একেবারে নামায না পড়ার সমান গোনাহ না হউক। সময় মত নামায না পড়াও কঠিন গোনাহ, এই গোনাহ হইতে সে রক্ষা পাইল না।

(٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّ نَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ نُوْرٌ وَّلَا بُرْهَانٌ وَّ لَا نَجَاةٌ وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کیلئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرعون ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(اخرجه احمد وابن حبان والطبرانى كذا فى الدر المنثور للسيوطى وقال الهيثمى رواه احمد والطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال احمد ثقات وقال ابن حجر فى الزواجر اخرجه احمد بسند جيد وزاد فيه قارون ايضا مع فرعون وغيره وكذا زاده فى منتخب الكنز برواية ابن نصر والمشكوة ايضا برواية احمد والدارمى والبيهقى فى الشعب وابن قيم فى كتاب الصلوة)

(৬) একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে, তাহার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না, কিয়ামতের দিন নামায তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সহিত হইবে। (দুররে মানসূর, আহমদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)

ফায়দা ঃ ফেরআউন যে কত বড় কাফের ছিল তাহা সকলের জানা আছে। এমনকি সে খোদায়ী দাবী করিয়াছিল। আর হামান হইল তাহার

মন্ত্রীর নাম। আর উবাই ইবনে খলফ মক্কার মুশরিকদের মধ্যে ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ছিল। হিজরতের পূর্বে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিত, আমি একটি ঘোড়া পালিতেছি এবং উহাকে অনেক কিছু খাওয়াইতেছি। উহার উপর আরোহণ করিয়া আমি তোমাকে হত্যা করিব (নাঊযু বিল্লাহ)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে কতল করিব। উহুদের যুদ্ধে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতেছিল আর বলিতেছিল, আজ যদি তিনি বাঁচিয়া যান তবে আমার আর রক্ষা নাই। অতএব হামলা করার উদ্দেশ্যে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এরাদাও করিয়াছিলেন যে, দূর হইতেই তাহাকে শেষ করিয়া দিবেন কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। সে যখন নিকটবর্তী হইল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর হাত হইতে একটি বর্শা লইয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যাহা তাহার ঘাড়ে গিয়া লাগিল এবং ঘাড়ের উপর সামান্য আঁচড়ের ন্যায় ক্ষত হইল। এই সামান্য আঘাতেই সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং এইভাবে কয়েকবার পড়িল। দ্রুত ছুটিয়া আপন দলের নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কতল করিয়া দিয়াছে। দলের কাফেররা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, সামান্য আঁচড় লাগিয়াছে ; চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে বলিতেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে কতল করিব। খোদার কসম, মুহাম্মদ যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম।

কথিত আছে, তাহার চিৎকারের আওয়াজ ষাড়ের চিৎকারের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। আবূ সুফিয়ান যিনি এই যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে বড় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে লজ্জা দিয়া বলিলেন, এই সামান্য একটু আঁচড়ে এমন চিৎকার করিতেছ। সে বলিল, তুমি কি জান, এই আঘাত কে করিয়াছেন? ইহা মুহাম্মদের আঘাত। এই আঘাতে আমার যে পরিমাণ কষ্ট হইতেছে—লাত ও উজ্জার (দুইটি প্রসিদ্ধ মূর্তির নাম) কসম করিয়া বলিতেছি, উহা যদি সমগ্র হিজাযবাসীকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। মুহাম্মদ যখন আমাকে কতল করিবার কথা বলিয়াছিল তখনই আমি বুঝিয়া নিয়াছিলাম

যে, অবশ্যই আমি তাহার হাতে নিহত হইব, রেহাই পাওয়ার আর কোন উপায় আমার নাই। আমাকে কতল করার কথা বলিবার পর তিনি যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম। অবশেষে মক্কায় পৌঁছার একদিন পূর্বে পথিমধ্যেই সে মারা গেল।

উপরোক্ত ঘটনায় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও শিক্ষার বিষয় এই যে, একজন পাক্কা কাফেরও ইসলামের ঘোরতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাহার কি পরিমাণ দৃঢ় একীন ও বিশ্বাস ছিল যে, তাহাঁর হাতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বলিয়া স্বীকার করি, তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহার বাণীসমূহকে অকাট্য সত্য মনে করি, তাহার সহিত মহব্বতের দাবী করি, তাঁহার উম্মত হওয়ার কারণে গর্ববোধ করি, এতদসত্ত্বেও তাঁহার কয়টি হাদীসের উপর আমল করিতেছি? যে সমস্ত বিষয়ে তিনি আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়াছেন, সেই সব বিষয়ে আমরা কতটুকু ভীত–সন্ত্রস্ত হইতেছি। নিজের ভিতরে কি আছে তাহা প্রত্যেকেরই নিজের দেখার বিষয়। একের ব্যাপারে অন্যে কি করিয়া বলিতে পারে।

ইবনে হজর (রহঃ) তাঁহার 'যাওয়াজির' কিতাবে ফেরআউন হামানের সাথে কারূণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদের সহিত হাশর হওয়ার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত দোষ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সমস্ত দোষের কারণেই নামাযের মধ্যে অবহেলা করা হয়। সুতরাং নামাযে অবহেলা যদি ধন–সম্পদের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে কারূণের সহিত। আর যদি হুকূমত ও রাজত্বের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে ফেরআউনের সহিত। আর যদি মন্ত্রিত্ব (অর্থাৎ চাকরী বা মোসাহিবী)এর কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে হামানের সহিত। আর যদি ব্যবসা–বাণিজ্যের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে উবাই ইবনে খলফের সহিত। মোটকথা তাহাদের সহিত হাশর হওয়া যখন সাব্যস্ত হইল তখন বিভিন্ন আজাব সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত যাহাই হউক কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জাহান্নামের আজাব কঠিন হইতে কঠিনতর। অবশ্য ইহাও সত্য যে, ঈমানের কারণে একদিন না একদিন জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভ হইবে আর ঐ কাফেররা চিরকাল সেখানে থাকিবে। কিন্তু নাজাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়টাও কি হাসি–তামাশার ব্যাপার! কে জানে কত হাজার বছর দীর্ঘ হইবে।

(٧) قَالَ بَعْضُهُمْ وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ
اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ اَكْرَمَهُ
اللّٰهُ تَعَالٰى بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ
ضِيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَ
يُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَ
يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَنْ
تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلٰوةِ عَاقَبَهُ اللّٰهُ
بِخَمْسَ عَشَرَةَ عُقُوْبَةً خَمْسَةٌ
فِي الدُّنْيَا وَثَلٰثَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ
ثَلٰثٌ فِيْ قَبْرِهٖ وَثَلَاثٌ عِنْدَ
خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ فَاَمَّا اللَّوَاتِيْ
فِي الدُّنْيَا فَالْاُوْلٰى تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ
مِنْ عُمْرِهٖ وَالثَّانِيَةُ تُمْحٰى سِيْمَاءُ
الصَّالِحِيْنَ مِنْ وَجْهِهٖ وَالثَّالِثَةُ
كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهٗ لَا يَاْجُرُهُ اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَالرَّابِعَةُ لَا يُرْفَعُ لَهٗ دُعَاءٌ
اِلَى السَّمَاءِ وَالْخَامِسَةُ لَيْسَ لَهٗ
حَظٌّ فِيْ دُعَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَاَمَّا الَّتِيْ
تُصِيْبُهٗ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ يَمُوْتُ
ذَلِيْلًا وَالثَّانِيَةُ يَمُوْتُ جُوْعًا وَ
الثَّالِثَةُ يَمُوْتُ عَطْشَانًا وَلَوْ سُقِيَ
بِحَارَ الدُّنْيَا مَا رَوِيَ مِنْ عَطْشِهٖ
وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ فِيْ قَبْرِهٖ
فَالْاُوْلٰى يَضِيْقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام
کرتا ہے حق تعالیٰ شانہٗ پانچ طرح سے اس کا
اکرام و اعزاز فرماتے ہیں ایک یہ کہ اس پر سے
رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ
اس سے عذابِ قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے
یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے داہنے ہاتھ
میں دیئے جائیں گے، (جن کا حال سورۃ الحاقہ
میں مفصّل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامۂ اعمال
داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ نہایت
خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے)
اور چوتھے یہ کہ پُل صراط پر سے بجلی کی طرح گذر
جائیں گے پانچویں بغیر حساب جنّت میں
داخل ہونگے اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے
اُس کو پندرہ طریقہ سے عذاب ہوتا ہے
پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے موت کے
وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے
نکلنے کے بعد۔ دنیا کے پانچ تو یہ ہیں اوّل یہ
کہ اُسکی زندگی میں برکت نہیں رہتی دوسرے
یہ کہ صُلحاء کا نور اُس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا
ہے تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا
دیا جاتا ہے چوتھے اُسکی دُعائیں قبول نہیں
ہوتیں پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں
میں اس کا استحقاق نہیں رہتا اور موت کے
وقت کے تین عذاب یہ ہیں کہ اوّل ذلّت
سے مرتا ہے دوسرے بھوکا مرتا ہے تیسرے

العربية	اردو
حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهٗ وَ	پیاس کی شدّت میں موت آتی ہے، اگر
وَالثَّانِيَةُ يُوْقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ	سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے
نَارًا فَيَتَقَلَّبُ عَلَى الْجَمْرِ	تین عذاب یہ ہیں اوّل اس پر قبر اتنی تنگ
لَيْلًا وَّنَهَارًا وَالثَّالِثَةُ	ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں
يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِيْ قَبْرِهٖ	گھس جاتی ہیں۔ دوسرے قبر میں آگ
ثُعْبَانٌ اِسْمُهُ الشُّجَاعُ	جلادی جاتی ہے تیسرے قبر میں ایک
الْاَقْرَعُ عَيْنَاهُ مِنْ نَارٍ	سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلّط ہوتا ہے
وَاَظْفَارُهٗ مِنْ حَدِيْدٍ طُوْلُ	جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن
كُلِّ ظُفْرٍ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ	لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن پورا
يُكَلِّمُ الْمَيِّتَ فَيَقُوْلُ اَنَا	چل کر اُس کے ختم تک پہنچا جائے
الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ وَصَوْتُهٗ	اُس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح
مِثْلُ الرَّعْدِ الْقَاصِفِ يَقُوْلُ	ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے
اَمَرَنِيْ رَبِّيْ اَنْ اَضْرِبَكَ عَلٰى	ربّ نے تجھ پر مسلّط کیا ہے کہ تجھے
تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِلٰى بَعْدِ	صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے
طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى	آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں
تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اِلَى الْعَصْرِ	اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے
وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ	عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی
الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَضْرِبَكَ	نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک
عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِلَى	اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک
الْعِشَاءِ وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ	اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک
صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ	مارے جاؤں جب وہ ایک دفعہ
فَكُلَّمَا ضَرَبَهٗ ضَرْبَةً يَغُوْصُ	اس کو مارتا ہے تو اُس کی وجہ سے
فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا	وہ مُردہ ستّر ہاتھ زمین میں دھنس
فَلَا يَزَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَذَّبًا	جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اُسکو عذاب
اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَمَّا الَّتِيْ	ہوتا رہیگا اور قبر سے نکلنے کے بعد کے تین
تُصِيْبُهٗ عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ	عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے

فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ فَشِدَّةُ الْحِسَابِ
وَسَخَطُ الرَّبِّ وَدُخُولُ النَّارِ وَفِي
رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ
مَكْتُوبَاتٌ اَلسَّطْرُ الْأَوَّلُ يَا مُضَيِّعَ
حَقِّ اللهِ اَلسَّطْرُ الثَّانِي يَا مَخْصُوصًا
بِغَضَبِ اللهِ الثَّالِثُ كَمَا ضَيَّعْتَ
فِي الدُّنْيَا حَقَّ اللهِ فَأَيِسْ الْيَوْمَ
أَنْتَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ۔

گا دوسرے حق تعالیٰ شانہٗ کا اس پر غصہ
ہوگا تیسرے جہنم میں داخل کردیا جائیگا
یہ کل میزان چودہ ہوتی ممکن ہے کہ پندرھواں
بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں یہ
بھی ہے کہ اُس کے چہرہ پر تین سطریں لکھی
ہوتی ہیں پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع
کرنے والے دوسری سطر او اللہ کے غصے کے
ساتھ مخصوص تیسری سطر جیسا کہ تونے دنیا
میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت
سے مایوس ہے۔

(وما ذكر في هذا الحديث من تفصيل العدد لا يطابق جملة الخمس عشرة لان المفصل اربع عشرة فقط فلعل الراوي نسي الخامس عشر كذا في الزواجر لابن حجر المكي قلت وهو كذلك فان ابا الليث السمرقندي ذكر الحديث في قرة العيون فجعل ستة في الدنيا فقال الخامسة تمقته الخلائق في الدار الدنيا والسادس ليس له حظ في دعاء الصالحين ثم ذكر الحديث بتمامه ولم يعزه الى احد وفي تنبيه الغافلين للشيخ نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي يقال من داوم على الصلوة الخمس في الجماعة اعطاه الله خمس خصال ومن تهاون بها في الجماعة عاقبه الله باثني عشر خصلة ثلثة في الدنيا وثلثة عند الموت وثلثة في القبر وثلثة يوم القيامة ثم ذكر نحوها ثم قال وروي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وذكر السيوطي في ذيل اللآلي بعد ما اخرج بمعناه من تخريج ابن النجار في تاريخ بغداد بسنده الى ابي هريرة قال في الميزان هذا حديث باطل ركبه محمد بن علي بن عباس على ابي بكر بن زياد النيسابوري قلت لكن ذكر الحافظ في المنبهات عن ابي هريرة مرفوعًا الصلوة عماد الدين وفيها عشر خصال الحديث ذكرته في الهندية وذكر الغزالي في دقائق الاخبار بنحو هذا اتم منه وقال من حافظ عليها اكرمه الله بخمس عشرة الخ مفصلًا)

(৭) এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমতঃ

তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। (যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল-হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাহাকে পনের প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরে, আর তিন প্রকার কবর হইতে বাহির হওয়ার পর। দুনিয়াতে পাঁচ প্রকার এই—এক ঃ তাহার জীবনে কোন বরকত থাকে না। দ্বিতীয় ঃ তাহার চেহারা হইতে নেককারদের নূর দূর করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় ঃ তাহার নেক কাজসমূহের কোন বদলা দেওয়া হয় না। চতুর্থ ঃ তাহার কোন দোয়া কবূল হয় না। পঞ্চম ঃ নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যেও তাহার কোন হক থাকে না।

মৃত্যুর সময় তিন প্রকার শাস্তি এই—এক ঃ জিল্লতির সহিত মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহার মৃত্যুবরণ করে। তৃতীয় ঃ এমন কঠিন পিপাসার অবস্থায় মারা যায় যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করিলেও তাহার পিপাসা মিটে না।

কবরের তিন প্রকার শাস্তি এই—এক ঃ কবর তাহার জন্য এমন সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, বুকের একদিকের হাড়গুলি অপর দিকে ঢুকিয়া যায়। দ্বিতীয় ঃ তাহার কবরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় ঃ কবরে তাহার উপর এমন আকৃতির একটি সাপ নিযুক্ত হয় যাহার চক্ষুগুলি আগুনের এবং নখগুলি লোহার হইবে। এত দীর্ঘ হইবে যে, পুরা একদিন চলিয়া উহার শেষ পর্যন্ত পৌঁছা যাইবে। উহার আওয়াজ বজ্রের মত হইবে। সে বলিতে থাকিবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোকে দংশন করিতে থাকি, যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আছর পর্যন্ত দংশন করিতে থাকি, পুনরায় আছরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখন তাহাকে একবার দংশন করে তখন উহার কারণে মুর্দা সত্তর হাত মাটির

নীচে ঢুকিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আজাব হইতে থাকিবে।

কবর হইতে বাহির হওয়ার পর তিন প্রকার আজাব এই—এক ঃ তাহার হিসাব কঠিনভাবে লওয়া হইবে। দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রাগান্বিত থাকিবেন। তৃতীয় ঃ তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে।

এই পর্যন্ত সর্বমোট চৌদ্দটি হইয়াছে। সম্ভবতঃ পনের নম্বরটি ভুলবশতঃ রহিয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকিবে। প্রথম লাইন ঃ ওহে আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইন ঃ ওহে আল্লাহর গোস্বায় পতিত। তৃতীয় লাইন ঃ দুনিয়াতে তুই যেরূপ আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছিস আজ তুই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যা।

(যাওয়াজির ইবনে হজর মক্কী (রহঃ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের সম্পূর্ণটা যদিও আমি সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে পাই নাই। কিন্তু ইহাতে যত প্রকার সওয়াব ও আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহার অধিকাংশেরই সমর্থন বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু রেওয়ায়াত পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে আর কিছু পরে আসিতেছে। পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহে বে-নামাযী ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আজাব যতই হইবে উহাকে কমই বলিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই হাদীসে যাহা কিছু উল্লেখিত হইয়াছে এবং পরে যাহা কিছু আসিতেছে সবই নামায ত্যাগ করার শাস্তি। আর এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণাও রহিয়াছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ মাফ করিবেন না। ইহা ছাড়া অন্য গোনাহের ব্যাপারে যাহাকে ইচ্ছা হইবে মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮)

অতএব এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে যদি এইরূপ অপরাধীকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে উহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত বসিবে। একটি কুফর ও ইসলামের আদালত—এই আদালতে ক্ষমার কোন প্রশ্নই নাই। দ্বিতীয় হুকূকুল এবাদ

অর্থাৎ বান্দার হকের আদালত—এই আদালতে হকদারদের হক অবশ্যই আদায় করিয়া দেওয়া হইবে—যাহার নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার নিকট হইতে লইয়া দেওয়া হইবে অথবা দেনাদারকে যদি আল্লাহ মাফ করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই পাওনাদারের হক আদায় করিয়া দিবেন। তৃতীয় হুকূকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হকের আদালত—এই আদালতে আল্লাহ্ পাক নিজের বখশিশ ও ক্ষমার দরজা খুলিয়া দিবেন।

এইসব রেওয়ায়াত ও বর্ণনার কারণে এই কথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আপন কৃতকর্মের শাস্তি তো উহাই যাহা হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। তবে রাহমান রাহীমের দয়া ও মেহেরবানী এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। উপরে যেইসব আজাব ও সওয়াবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ছাড়া অন্যান্য হাদীসে আরও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও সওয়াবের কথা আসিয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা। যদি কেহ দেখিত তবে বর্ণনা করিত। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার তাবীর বা ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিলেন অতঃপর ফরমাইলেন যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, দুইজন লোক আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অতঃপর দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি বেহেশত, দোযখ এবং দোযখের মধ্যে লোকদের বিভিন্ন প্রকার আজাব হইতে দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং এতো জোরে পাথর মারা হইতেছে যে, সেই পাথর ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়ে। পাথরটিকে উঠাইয়া আনিতে আনিতে তাহার মাথা আগের মতই হইয়া যায়। আবার তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়। এইরূপ আচরণ তাহার সহিত বারবার করা হইতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গীদ্বয়ের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, এই লোকটি কে? তখন তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং ফরজ নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া যাইত।

অন্য এক হাদীসে একই ধরণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের সাথে এইরূপ আচরণ করা হইতেছে দেখিয়া হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, এইসব লোক নামাযে অবহেলা করিত। (তারগীব)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে সচেতন থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন বরকত হয় যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর আওলাদগণের মধ্যে হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত ঈমান রাখে, তাঁহার (আল্লাহ তায়ালার) এবাদত করে, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে, আর এমতাবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন যে, আমি কোন এলাকায় আজাব নাযিল করার ইচ্ছা করি কিন্তু সেখানে এমন লোকদেরকে দেখিতে পাই, যাহারা মসজিদসমূহকে আবাদ করে, আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মহব্বত করে, শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তখন আমি আজাব স্থগিত করিয়া দেই। (দুররে মানসূর)

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ)এর নামে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত কর। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, মসজিদ মোত্তাকী লোকদের ঘর এবং আল্লাহ পাক এই কথার ওয়াদা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাইবে তাহার উপর রহমত নাযিল করিব, তাহাকে শান্তি দান করিব, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের রাস্তা আছান করিয়া দিব এবং আমার সন্তুষ্টি নসীব করিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ পাকের ঘর, আর যাহারা ঘরে আসে তাহাদের সম্মান ও একরাম হইয়াই থাকে ; অতএব আল্লাহর উপর ঐসব লোকের সম্মান করা জরুরী যাহারা মসজিদে হাযির হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, যাহারা মসজিদের সহিত মহব্বত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত মহব্বত রাখেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন যাহারা কবর পর্যন্ত সাথে গিয়াছিল তাহারা ফিরিবার পূর্বেই ফেরেশতাগণ পরীক্ষা লওয়ার জন্য হাজির হইয়া যান। মৃত ব্যক্তি মুমিন হইয়া থাকিলে নামায

তাহার মাথার নিকটে থাকে, যাকাত তাহার ডান দিকে, রোযা তাহার বাম দিকে এবং অন্যান্য নেক আমল তাহার পায়ের দিকে থাকে, এইভাবে চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া লয়। কেহ তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। ফলে ফেরেশতাগণ দূর হইতেই দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন। (দুররে মানসূর)

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন অভাব দেখা দিত, তখন তিনি পরিবার–পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

অর্থাৎ আপনার পরিবার–পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনি রুজি উপার্জন করুন—ইহা আমি চাই না ; রুজি তো আমিই দিব। আর উত্তম পরিণতি পরহেজগারীর মধ্যেই রহিয়াছে। (সূরা ত্বহা, আয়াত ঃ ১৩২)

হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ এক জায়গায় জমা হইবে এবং ফেরেশতাগণ যে কোন আওয়াজই দিবেন সকলেই তাহা শুনিতে পাইবে। ঐ সময় ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সকল লোক যাহারা সুখ–দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিত। ইহা শুনিয়া একদল উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাত্র জাগিয়া আরামের বিছানা ত্যাগ করিয়া এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকিত। অতঃপর এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা–বাণিজ্য ও বেচা–কেনা আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিত না। অতঃপর এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার সহিত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন ঘোষণা করা হইবে, আজ হাশরবাসী দেখিতে পাইবে যে, সম্মানিত লোক কাহারা? আরও ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যস্ততা আল্লাহর যিকির ও নামায হইতে বাধা দিত না।

(দুররে মানসূর)

এই হাদীসটি শায়খ নসর সমরকন্দী (রহঃ) 'তাম্বীহুল গাফেলীন'

নামক কিতাবেও লিখিয়াছেন। অতঃপর লিখিয়াছেন যে, যখন এই সকল লোক বিনা হিসাবে মুক্তি পাইয়া যাইবে তখন জাহান্নাম হইতে একটি লম্বা গর্দান বাহির হইয়া আসিবে এবং উহা লোকদিগকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসিবে। উহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু থাকিবে এবং তাহার ভাষা খুবই স্পষ্ট হইবে। সে বলিবে, আমি ঐসব লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি, যাহারা অহংকারী ও বদমেজাজী এবং সমবেত লোকদের মধ্য হইতে তাহাদেরকে এমনভাবে বাছিয়া লইবে, যেভাবে পশুপক্ষী উহাদের খাদ্য বাছিয়া লয়। তাহাদিগকে বাছিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর এইরূপে দ্বিতীয় বার বাহির হইয়া বলিবে যে, এইবার আমি ঐ সমস্ত লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছে। তাহাদিগকেও দল হইতে বাছিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয়বার বাহির হইয়া আসিবে এবং এইবার ছবি অংকনকারীদিগকে বাছিয়া লইয়া যাইবে। এই তিন প্রকার লোক ময়দান হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার পর হিসাব নিকাশ শুরু হইবে।

কথিত আছে, আগেকার যুগে মানুষ শয়তানকে দেখিতে পাইত। এক ব্যক্তি শয়তানকে বলিল, তুমি আমাকে এমন কোন পন্থা শিখাইয়া দাও, যাহা করিলে আমিও তোমার মত হইতে পারি। শয়তান বলিল, এমন আবদার তো আজ পর্যন্ত আমার নিকট কেহ করে নাই, তোমার কি প্রয়োজন দেখা দিল? লোকটি বলিল, আমার মন এরূপ চাহিতেছে। শয়তান বলিল, ইহার পন্থা এই যে, নামাযে অবহেলা করিও এবং সত্য–মিথ্যা কসম খাইয়া কথা বলিতে কোনই পরওয়া করিও না। লোকটি বলিয়া উঠিল, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি যে, জীবনে কখনও নামায ছাড়িব না এবং কসমও খাইব না। ইহা শুনিয়া শয়তান বলিল, আজ পর্যন্ত চালবাজি করিয়া তুমি ছাড়া আর কেহ আমার নিকট হইতে কথা নিতে পারে নাই। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মানুষকে কখনও উপদেশ দিব না।

হযরত উবাই (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই উম্মতকে উচ্চ মর্যাদা, ইজ্জত–সম্মান ও দ্বীনের উন্নতির সুসংবাদ দান কর। তবে যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। (তারগীব)

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আমি সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত লাভ করিয়াছি। আমার প্রতি এরশাদ হইয়াছে যে, হে মুহাম্মদ! মালায়ে

আলা অর্থাৎ ফেরেশতারা কোন্ বিষয় লইয়া পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, আমার তো জানা নাই। তখন আল্লাহ্ পাক আপন কুদরতী হাত আমার বুকের উপর রাখিয়া দিলেন। যাহার শীতলতা আমার বুকের ভিতর পর্যন্ত অনুভব করিলাম। ইহার বরকতে সমগ্র সৃষ্টিজগত আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। আমাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, এখন বলুন, ফেরেশতারা কোন্ বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, যে সব জিনিস মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে এবং যে সব জিনিস মানুষের গোনাহের কাফ্ফারা হয় আর জামাতে নামায পড়ার জন্য যে কদম উঠে, উহার সওয়াব সম্পর্কে, শীতের সময় উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলত এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকার ফযীলত সম্পর্কে। যে ব্যক্তি এইসব জিনিসের এহতেমাম করিবে, উত্তম হালতে জিন্দেগী কাটাইবে এবং উত্তম হালতে তাহার মৃত্যু হইবে।

বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ হে আদমসন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়িয়া লও, তোমার সারাদিনের যাবতীয় কাজ আমি সমাধা করিয়া দিব।

'তাম্বীহুল-গাফেলীন' কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নামায আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু, আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ। ইহা দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়, দোয়া কবূল হয়, রিযিকে বরকত হয়। ইহা ঈমানের মূল, শরীরের আরাম, দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নামাযীর জন্য সুপারিশকারী, কবরের চেরাগ ও উহার নির্জনতায় মনোরঞ্জনকারী, মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের প্রচণ্ড রৌদ্রে ছায়া, অন্ধকারে আলো, জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক, আমলের পাল্লার ওজন, দ্রুত পুলসেরাত পার করিয়া দেয়, জান্নাতের চাবি।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মুনাব্বিহাত' কিতাবে হযরত উসমান গণী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দি সহকারে সঠিক সময়ে নামাযের এহতেমাম করে, আল্লাহ তায়ালা নয়টি পুরস্কারের দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। (১) আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাকে ভালবাসেন। (২) তাহাকে সুস্থতা দান করেন। (৩) ফেরেশতাগণ তাহার হেফাজত করেন। (৪) তাহার ঘরে বরকত দান করেন। (৫) তাহার চেহারায় বুযুর্গদের নূর ফুটিয়া উঠে। (৬) তাহার দিল নরম করিয়া দেন। (৭) পুলসিরাতের উপর দিয়া সে বিজলীর মত দ্রুত পার হইয়া যাইবে।

(৮) তাহাকে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়া দেন। (৯) জান্নাতে এমন লোকদের প্রতিবেশী হিসাবে সে স্থান পাইবে, যাহাদের সম্পর্কে কুরআনে এই সুসংবাদ আসিয়াছে ঃ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন না তাহাদের কোন ভয়ভীতি থাকিবে আর না তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ৬২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায দ্বীনের খুঁটি এবং ইহার মধ্যে দশ প্রকার উপকারিতা রহিয়াছে ঃ (১) নামায চেহারার উজ্জ্বলতা (২) দিলের নূর (৩) শরীরের আরাম ও সুস্বাস্থ্যের কারণ (৪) কবরের সঙ্গী (৫) আল্লাহর রহমত নাযিলের ওসীলা (৬) আসমানের চাবি (৭) নেক আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বস্তু (উহা দ্বারা নেক আমলের পাল্লা ভারী হইয়া যায়) (৮) আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ (৯) বেহেশতের মূল্য (১০) দোযখের প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করিল সে দ্বীনকে কায়েম রাখিল আর যে নামায ত্যাগ করিল সে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করিল। (মুনাব্বিহাতে ইবনে হজর)

এক হাদীস বর্ণিত আছে, ঘরে নামায পড়া নূর স্বরূপ, সুতরাং তোমরা (নফল) নামায পড়িয়া নিজেদের ঘরগুলিকে উজ্জ্বল কর। (জামে সগীর) আর এই হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন ওযূ ও সেজদার দরুন উজ্জ্বল হাত পা এবং উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হইবে এবং এই আলামত দ্বারাই তাহাদিগকে অন্যান্য উম্মত হইতে চিনা যাইবে।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আসমান হইতে কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয় তখন মসজিদ আবাদকারীদের হইতে উহা সরাইয়া লওয়া হয়। (জামে সগীর) বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদার নিশানীকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন, সে উহা জ্বালাইতে পারিবে না। (অর্থাৎ নিজের বদ-আমলীর কারণে যদি সে জাহান্নামে প্রবেশ করেও, তবু যে জায়গায় সিজদার চিহ্ন থাকিবে সেই জায়গায় আগুন কোন আছর করিতে পারিবে না।)

এক হাদীসে আছে যে, নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয় এবং দান-খয়রাত শয়তানের কোমর ভাঙ্গিয়া দেয়। (জামে সগীর) এক রেওয়ায়াতে এরশাদ হইয়াছে যে, নামায (রোগের জন্য) শেফা।

(জামে সগীর)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) একবার পেটের উপর ভর করিয়া

শুইয়া ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পেটে কি ব্যথা হইতেছে? হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উঠ, নামায পড়। নামাযের মধ্যে শেফা রহিয়াছে।

(ইবনে কাসীর)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নযোগে বেহেশত দেখিলেন। সেখানে তিনি হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর জুতা ঘষিয়া চলার আওয়াজও শুনিতে পাইলেন। সকাল বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই বিশেষ আমল কি, যাহার বদৌলতে জান্নাতেও তুমি (দুনিয়ার ন্যায়) আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলে? তিনি আরজ করিলেন, দিবা-রাত্রি যখনই আমার ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করিয়া লই এবং যে কয় রাকআত তৌফীক হয় তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়িয়া লই। (ফাতহুল বারী) হযরত সাফীরী (রহঃ) বলিয়াছেন, ফজরের নামায ত্যাগকারীকে ফেরেশতাগণ হে ফাজের (বদ্‌কার), যোহরের নামায ত্যাগকারীকে হে খাছের (ক্ষতিগ্রস্ত), আছরের নামায ত্যাগকারীকে হে আছী (না-ফরমান), মাগরিবের নামায ত্যাগকারীকে হে কাফের এবং এশার নামায ত্যাগকারীকে হে মুজীই' (আল্লাহর হক বিনষ্টকারী) বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। (গালিয়াতুল-মাওয়ায়েজ)

আল্লামা শারানী (রহঃ) বলেন, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, বালা-মুসীবত এমন সব বসতি হইতে হটাইয়া দেওয়া হয় যেখানকার লোকজন নামাযী। পক্ষান্তরে যে সকল বসতির লোক নামাযী নহে সেই সব স্থানে বালা-মুসীবত নাযিল হয়। এইরূপ এলাকায় ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হওয়া কিংবা বাড়ীঘর ধসিয়া পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। কেহ যেন এই ধারণা না করে যে, 'আমি তো নামাযী, অন্যদের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই।' বালা-মুসীবত যখন নাযিল হয় তখন তাহা ব্যাপক হইয়া থাকে। স্বয়ং হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে নেককার লোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাঁ যখন খারাবী অধিক হইয়া যায়। কেননা, সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা তাহাদের জন্যও জরুরী ছিল।

(৮) رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضٰى

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ

وَقْتِهَا ثُمَّ قَضٰى عُذِّبَ فِي النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلٰثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ.

بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حُقب جہنم میں جلے گا اور حُقب کی مقدار اسّی ۸۰ برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا (اس حساب سے ایک حُقب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوتی ۲۸۸۰۰۰۰۰)

(كذا في مجالس الابرار قلت لم اجده فيما عندى من كتب الحديث الا ان مجالس الابرار مدحه شيخ مشائخنا الشاه عبد العزيز الدهلوىؒ ثم قال الراغب في قوله تعالى لابثين فيها احقابا قيل جمع الحقب اى الدهر قيل والحقبة ثمانون عاما والصحيح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمة واخرج ابن كثير في تفسير قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون عن ابن عباس ان في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادى في كل يوم اربعمائة مرة اعد ذلك الوادى للمرائين من امة محمد الحديث وذكر ابو الليث السمرقندى في قرة العيون عن ابن عباس وهو مسكن من يؤخر الصلوة عن وقتها وعن سعد بن ابى وقاص مرفوعا الذين هم عن صلوتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلوة عن وقتها وصحح الحاكم والبيهقى وقفه واخرج الحاكم عن عبد الله في قوله تعالى فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم وقال صحيح الاسناد.)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামায কাজা করে, যদিও পরে উহা পড়িয়া নেয়। তথাপি সময়মত নামায না পড়ার কারণে সে এক হোকবা পরিমাণ জাহান্নামে জ্বলিবে। আশি বৎসরে এক হোকবা হয়। আর এক বৎসর তিনশত ষাট দিনে আর কিয়ামতের একদিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। এই হিসাবে এক হোকবার পরিমাণ হইল দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর।

(মাজালিসুল–আবরার)

ফায়দা ঃ আভিধানিক অর্থে হোকবা হইল দীর্ঘ মেয়াদী সময়। অধিকাংশ হাদীসে উহার পরিমাণ উল্লেখিত সংখ্যাই আসিয়াছে। দুররে মানছুর কিতাবেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আলী (রাযিঃ) বেলাল হাজরী (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি

বলিয়াছেন, আশি বৎসরে এক হোকবা। প্রতি বৎসরে বার মাস। প্রতি মাসে ত্রিশ দিন। আর প্রতিদিনে এক হাজার বৎসরের সমান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে সহীহ্ রেওয়ায়াত মোতাবেক আশি বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও ইহা নকল করিয়াছেন যে, আশি বৎসরে এক হোকবা, তিনশত ষাট দিনে এক বৎসর এবং একদিন তোমাদের এই জগতের হিসাবে এক হাজার দিনের সমান হয়। এই একই হিসাব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, কাহারও এই ভরসায় থাকা উচিত নয় যে, ঈমানের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম হইতে বাহির হইবই। কারণ দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর কোন সাধারণ কথা নয় ; তাহাও যদি আরও অধিক পরিমাণ সময় দোযখে থাকার মত অন্য কোন অপরাধ না থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে কিছু কমবেশী সময়েরও উল্লেখ আসিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ উপরে লিখিত পরিমাণটির কথা কয়েকটি হাদীসে আসিয়াছে, এইজন্য ইহাই প্রাধান্য রাখে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে, বিভিন্ন লোকের অবস্থার প্রেক্ষিতে কমবেশী হইতে পারে।

আবূ লাইস সমরকন্দী (রহঃ) 'কুর্‌রাতুল উয়ূন' গ্রন্থে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উহাতে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে। আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ঃ তোমরা এই দোয়া কর হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে কাহাকেও তুমি হতভাগ্য বঞ্চিত করিও না। অতঃপর নিজেই প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কি জান হতভাগ্য বঞ্চিত কে? সাহাবীগণ জানিতে চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সেই হতভাগ্য বঞ্চিত। ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনা ওজরে নামায ত্যাগ করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপও করিবেন না এবং তাহাকে 'আজাবুন আলীম' অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, দশ ব্যক্তি বিশেষভাবে শাস্তি ভোগ করিবে। তন্মধ্যে একজন হইল নামায ত্যাগকারী,

তাহার হাত বাঁধা থাকিবে এবং ফেরেশতাগণ তাহার মুখে ও পিঠে আঘাত করিতে থাকিবে। জান্নাত বলিবে, আমার এবং তোমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই ; না আমি তোমার জন্য, না তুমি আমার জন্য। দোযখ বলিবে, আস, আমার নিকট আস। তুমি আমার জন্য, আমিও তোমার জন্য।

আরও বর্ণিত আছে, জাহান্নামে একটি ময়দান আছে, যাহার নাম লমলম। উহাতে উটের ঘাড়ের মত মোটা মোটা সাপ রহিয়াছে, উহাদের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। উহাতে নামায ত্যাগকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অন্য এক হাদীসে আছে জাহান্নামে 'জুববুল হাযান' নামক একটি ময়দান রহিয়াছে, উহা বিচ্ছুদের আবাসস্থল। একেকটি বিচ্ছু খচ্চরের মত বড় হইবে। উহারাও নামায ত্যাগকারীদেরকে দংশন করিবে। হাঁ, মাওলায়ে কারীম যদি মাফ করিয়া দেন, তবে কাহার কি বলার আছে। কিন্তু মাফ তো চাহিতে হইবে।

ইবনে হজর (রহঃ) 'যাওয়াজির' কিতাবে লিখিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার ভাই দাফনের কাজে শরীক ছিল। ঘটনাক্রমে দাফনের সময় তাহার টাকার থলি কবরে পড়িয়া যায়। তখন খেয়াল হয় নাই। কিন্তু পরে যখন খেয়াল হইল তখন তাহার খুব আফসোস হইল। চুপে চুপে কবর খুলিয়া উহা বাহির করিতে এরাদা করিল। অতঃপর যখন কবর খুলিল তখন কবর আগুনে পরিপূর্ণ ছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিল এবং অবস্থা বর্ণনা করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন, সে নামাযে অলসতা করিত এবং কাজা করিয়া দিত। (আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন)

(৯) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاسَهْمَ فِی الْاِسْلَامِ لِمَنْ لَّا صَلٰوةَ لَهٗ وَلَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّا وُضُوْءَ لَهٗ.

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اُس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے. نماز دین کے لئے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کیلئے سر ہوتا ہے.

(اخرجه البزار واخرج الحاكم عن عائشة رضـ مرفوعًا وصححه ثلث احلف عليهن لايجعل الله من له سهم فی الاسلام كمن لا سهم له وسهام الاسلام الصوم والصلوٰة والصدقة الحديث واخرج الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر مرفوعًا لادين لمن لاصلوٰة له انما موضع الصلوٰة من الدين كموضع الراس من الجسد كذا فی الدر المنثور)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। আর বিনা ওযূতে নামায হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, নামায ব্যতীত দ্বীন হয় না। নামায দ্বীনের জন্য এমন, যেমন মানুষের শরীরের জন্য মাথা।

ফায়দা ঃ যে সমস্ত লোক নামায না পড়িয়াও নিজেদেরকে মুসলমান বলে কিংবা ইসলামী জযবার লম্বা–চওড়া দাবী করিয়া থাকে, তাহারা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সমস্ত পবিত্র বাণীর মধ্যে একটু চিন্তা–ফিকির করে। আর যাহারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের মত সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখে তাহারা যেন ঐ সকল বুযুর্গদের অবস্থাও যাচাই করিয়া দেখে যে, দ্বীনকে তাহারা কত মজবুতির সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। অতএব, দুনিয়া তাহাদের পদচুম্বন কেন করিবে না?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর চোখে পানি জমিয়া গিয়াছিল। লোকেরা আরজ করিল, ইহার চিকিৎসা তো হইতে পারে, তবে কয়েক দিন আপনি নামায পড়িতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, ইহা হইতে পারে না ; আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে আল্লাহর তায়ালার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লোকেরা বলিল, আপনাকে পাঁচ দিন কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, এইভাবে আমি এক রাকআত নামাযও পড়িব না। জীবনভর অন্ধ থাকার উপর ছবর করিয়া যাওয়া তাহাদের নিকট নামায তরক করা হইতে সহজ ছিল। অথচ এরূপ ওজরবশতঃ নামায ছাড়িয়া দেওয়া জায়েযও ছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) শেষ সময়ে যখন বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, তখন সব সময়ই তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত জারী থাকিত এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি একেবারে বেখবর অবস্থায় থাকিতেন, এমনকি এই অবস্থায় তাঁহার ওফাতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দিনগুলিতে যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাহাকে নামাযের কথা স্মরণ করাইয়া নামায পড়ার জন্য দরখাস্ত করা হইত। তিনি এই অবস্থাতেই নামায আদায় করিতেন এবং বলিতেন, হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই। যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। অথচ আমাদের নিকট অসুস্থ ব্যক্তির আরাম ও মঙ্গল কামনা ইহার মধ্যেই মনে করা হয় যে, তাহাকে নামাযের জন্য কষ্ট না দেওয়া হউক ; পরে ফিদিয়া দিয়া

দেওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ঐসব মহান ব্যক্তিদের নিকট রোগীর প্রতি দরদ ইহাকেই মনে করা হইত যে, মওতের মুখেও যদি এবাদত করা সম্ভব হয় তবু উহাতে বাধা না দেওয়া হউক।

ببیں تفاوتِ راہ از کجا است تا بہ کجا.

দেখ, উভয় রাস্তার মাঝে কত ব্যবধান—কত পার্থক্য !

হযরত আলী (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাজকর্মে সাহায্যের জন্য একজন খাদেম চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই তিনজন গোলামের মধ্যে যাহাকে তোমার পছন্দ হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও, সে নামাযী। কিন্তু ইহাকে মারধর করিও না। কেননা, নামাযীকে মারধর করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা একজন সাহাবী হযরত আবুল হাইছাম (রাযিঃ)এর সাথেও ঘটিয়াছিল। তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোলামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে আমাদের কাজের লোক বা কর্মচারী যদি নামাযী হয় তবে আমরা তাহাকে তিরস্কার করি এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার দরুন তাহার নামাযের দ্বারা আমাদের কাজে ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া থাকি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)এর উপর একবার আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থা প্রবল হইয়াছিল। এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাত দিন পর্যন্ত তিনি ঘরে ছিলেন, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদকে এই বিষয়ে জানানো হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায ঠিকমত আদায় করিতেছে কি না? লোকেরা বলিল, জ্বি হাঁ, নামাযে ত্রুটি নাই। ইহাতে মুরশিদ বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি শয়তানকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জামাতের বর্ণনা

কিতাবের শুরুতে লেখা হইয়াছে যে, এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহারা নামায পড়িয়া থাকেন বটে কিন্তু জামাতে নামায পড়ার এহতেমাম করেন না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেমন নামায পড়ার বিষয়ে কঠোরভাবে তাকীদ আসিয়াছে তেমনি জামাতের সহিত নামায পড়ার বিষয়েও অনেক তাকীদ বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ জামাতের ফযীলত সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জামাত তরক করার শাস্তি সম্পর্কে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
জামাতের ফযীলত

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

(رواہ مالک والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی کذا فی الترغیب)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জামাতের নামায একা নামায হইতে সাতাইশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে।

(তারগীব ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ মানুষ যখন নামায পড়ে এবং সওয়াবের নিয়তেই পড়িয়া থাকে, তখন ইহা একটি মামুলী ব্যাপার যে ঘরে না পড়িয়া মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত পড়িয়া লইবে, ইহাতে না তেমন কোন কষ্ট হয় আর না কোন অসুবিধা হয়। অথচ এত অধিক পরিমাণ সওয়াব লাভ হইয়া থাকে ; কে আছে এমন যে, এক টাকার পরিবর্তে সাতাইশ বা আটাইশ টাকা পাইয়াও উহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এত বড় লাভের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। ইহার কারণ এ ছাড়া আর কি হইতে পারে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের কোন পরওয়া নাই। আমাদের দৃষ্টিতে দ্বীনের লাভ যেন কোন লাভই নয়। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে টাকায় এক আনা, দুই আনা লাভের জন্য আমরা দিনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলি আর আখেরাতের ব্যবসা যেখানে সাতাইশ গুণ লাভ রহিয়াছে উহাকে মুসীবত মনে করি। জামাতে নামাযের মধ্যে দোকানের ক্ষতি, বেচা-কেনার অসুবিধা, দোকান বন্ধ করার ঝামেলা ইত্যাদি ওজর আপত্তি পেশ করা হয়। কিন্তু যাহাদের দিলে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন রহিয়াছে এবং যাহাদের অন্তরে আজর ও সওয়াবের কোন প্রকার মূল্য রহিয়াছে, তাহাদের নিকট এইসব অহেতুক আপত্তির কোনই মূল্য নাই। এইরূপ লোকদেরই আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ অর্থাৎ 'তাহারা এমন ব্যক্তি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না।' (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩৭) আযানের পর সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন আপন ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কি আচরণ করিতেন তাহা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সালেম হাদ্দাদ (রহঃ) একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তেজারত করিতেন। আযানের আওয়াজ শুনামাত্রই তাহার চেহারা বিবর্ণ ও হলুদ হইয়া যাইত। তিনি অস্থির হইয়া দোকান খোলা রাখিয়াই দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং এই কবিতাগুলি পাঠ করিতেন ঃ

إِذَا مَا دَعَا دَاعِيكُمْ قُمْتُ مُسْرِعًا مُجِيبًا لِمَوْلًى جَلَّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ

যখন তোমাদের মুআয্যিন আযান দিবার জন্য দাঁড়ায়, তখন আমি ঐ মহান মালিকের দিকে দ্রুত সাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া যাই, যাহার শান ও বড়ত্বের কোন তুলনা নাই।

أُجِيبُ إِذَا نَادَى بِسَمْعٍ وَّطَاعَةٍ وَبِي نَشْوَةٌ لَبَّيْكَ يَا مَنْ لَهُ الْفَضْلُ

যখন মুআয্যিন আহবান করেন, তখন আমি আনন্দের সহিত পরম আবেগ ও আনুগত্য সহকারে উত্তর দেই, হে মহান করুণাময় ! লাব্বাইক ; আমি হাজির।

وَيَصْفَرُّ لَوْنِي خِيفَةً وَّمَهَابَةً وَيَرْجِعُ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ شُغْلُ

ভয় ও আতংকে আমার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যায় এবং সেই পবিত্র সত্তার ধ্যান আমাকে সকল কাজ হইতে বেখবর করিয়া দেয়।

وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِيْ غَيْرُ ذِكْرِكُمْ — وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِيْ فَمِيْ قَطُّ لَا يَحْلُوْ

তোমার হকের কসম, তোমার যিকির ব্যতীত কোন কিছুতেই আমি স্বাদ পাই না এবং তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও যিকিরে আমি মজা পাই না।

مَتٰى يَجْمَعُ الْاَيَّامُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ — وَيَفْرَحُ مُشْتَاقٌ اِذَا جَمَعَ الشَّمْلُ

জানিনা, যমানা কখন তোমার সহিত আমার মিলন ঘটাইবে। আর আশেক তো তখনই আনন্দিত হয় যখন মিলন ভাগ্যে জুটে।

فَمَنْ شَاهَدَتْ عَيْنَاهُ نُوْرَ جَمَالِكُمْ — يَمُوْتُ اِشْتِيَاقًا نَحْوَكُمْ قَطُّ لَا يَسْلُوْ

যাহার দুইটি চোখ তোমার জামালের নূর দেখিয়াছে, সে তোমার মিলনের আগ্রহে মৃত্যবরণ করিবে, কখনও সে সান্ত্বনা পাইবে না।

(নুযহাতুল-মাজালিস)

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যাহারা বেশী সময় মসজিদে অবস্থান করে, তাহারা মসজিদের খুঁটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকেন। তাহারা অসুস্থ হইলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তাহারা কোন কাজে গেলে ফেরেশতাগণ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

(হাকিম)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَضْعُفُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِيْ بَيْتِهٖ وَفِيْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَّذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰٓئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو پچیس ۲۵ درجہ المضاعف ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے مغفرت

لَا يَزَالُ فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ۔ (رواه البخاری واللفظ له ومسلم وابوداؤد والترمذی وابن ماجة كذا فى الترغيب)

اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جبتک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কোন ব্যক্তির ঐ নামায যাহা জামাতের সহিত পড়া হইয়াছে উহা ঘরে বা বাজারে একাকী পড়া নামায হইতে পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াব রাখে। কেননা, কোন ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওযু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহার না থাকে তখন তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বাড়িয়া যায় এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইয়া যায়। অতঃপর যখন নামায পড়িয়া ঐ স্থানে বসিয়া থাকে, যতক্ষণ সে ওযুর সহিত বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করিতে থাকেন। আর যতক্ষণ কেহ নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। (তারগীব ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ প্রথম হাদীসে সাতাইশ গুণ বেশী এবং এই হাদীসে পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। দুই হাদীসের পার্থক্যের বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক উত্তর প্রদান করিয়াছেন যাহা হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। তন্মধ্য হইতে একটি এই যে, ইহা নামাযীদের অবস্থার পার্থক্যের কারণেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেহ পঁচিশ গুণ সওয়াব পায় আর কেহ এখলাসের দরুণ সাতাইশ গুণ পায়। কোন কোন আলেমের মতে যেসমস্ত নামাযে কেরাত আস্তে পড়া হয় উহাতে পঁচিশ গুণ আর যে সমস্ত নামাযে কেরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় উহাতে সাতাইশ গুণ সওয়াব হয়। আবার কেহ কেহ এশা ও ফজরের জন্য সাতাইশ গুণ বলিয়াছেন। কেননা, এই দুই সময়ে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর মনে হয়। আর পঁচিশগুণ বলিয়াছেন বাকী তিন ওয়াক্তের জন্য। কোন কোন ব্যাখ্যাদানকারী লিখিয়াছেন, এই উম্মতের উপর সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। কাজেই প্রথমে পঁচিশ গুণ ছিল পরে উহা বাড়িয়া সাতাইশ গুণ হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এক চমৎকার কথা লিখিয়াছেন। তাহারা লিখিয়াছেন যে, এই হাদীসে বর্ণিত

সওয়াব প্রথম হাদীসে বর্ণিত সওয়াব হইতে অনেক বেশী। কেননা, এই হাদীসে পঁচিশগুণ বেশী হওয়ার কথা এরশাদ হয় নাই বরং পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াবের কথা এরশাদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পঁচিশ বার পর্যন্ত দ্বিগুণ সওয়াব হইতে থাকে। এই হিসাবে জামাতের সহিত এক নামাযের সওয়াব তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারিশত বত্রিশ (৩,৩৫,৫৪,৪৩২) গুণ হয়। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতের কাছে এই সওয়াব কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। আর যেহেতু নামায ত্যাগ করার গোনাহ এক হোকবা, যাহার পরিমাণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই সেই অনুপাতে নামাযের সওয়াবও এতবেশী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইদিকে ইশারা করিয়াছেন যে, ইহা তো নিজেরই চিন্তা করার বিষয় যে, জামাতের নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রহিয়াছে এবং কতভাবে নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযূ করিয়া শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওয়ানা হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইতে থাকে।

মদীনা শরীফে বনু সালামা নামে একটি গোত্র ছিল। তাহাদের ঘর-বাড়ী মসজিদ হইতে দূরে ছিল। তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী কোন স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের মসজিদে আসার প্রতিটি কদম লিখা হয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযু করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, সে যেন এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের জন্য রওয়ানা হইল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি ফযীলতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, নামায শেষ করিবার পর যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসিয়া থাকে ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ মাফ ও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকে। ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কাজেই তাহাদের দোয়ার বরকত স্পষ্ট বিষয়।

মুহাম্মদ ইবনে সামাআহ (রহঃ) একজন বুযুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর শাগরেদ ছিলেন। একশত তিন বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। তিনি বলেন, একাধারে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শুধুমাত্র একবার ব্যতীত কখনও আমার তকবীরে উলা ছুটে নাই। যেদিন আমার মায়ের ইন্তেকাল হয় সেদিন ব্যস্ততার কারণে আমার

তকবীরে উলা ছুটিয়া গিয়াছিল। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, একবার আমার জামাতের নামায ছুটিয়া গিয়াছিল। যেহেতু জামাতের নামাযের সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী হয়, সেহেতু ঐ নামাযকে পঁচিশবার পড়িলাম, যাহাতে ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যায়। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একব্যক্তি আমাকে বলিতেছে ; "হে মুহাম্মদ! পঁচিশবার নামায তো তুমি পড়িয়া নিলে কিন্তু ফেরেশতাদের আমীনের কি হইবে?" (ফাওয়ায়েদে বাহিয়্যাহ)

ফেরেশতাদের আমীনের অর্থ এই যে, বহু হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম যখন সূরা ফাতেহার পর আমীন বলে, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত একত্রে হয়, তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। উপরোক্ত স্বপ্নের মধ্যে এই হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার মধ্যে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, সম্মিলিতভাবে জামাতের নামাযে যে ছওয়াব হাসিল হয়, উহা একাকী নামায পড়িলে কিছুতেই হাসিল হইতে পারে না ; যদিও এই নামাযকে এক হাজার বার পড়ে। আর এই কথা তো সহজেই বুঝে আসে যে, জামাতে নামায পড়ার মধ্যে শুধু ফেরেশতাদের সাথে আমীনের ফযীলতই নহে, বরং জামাতে শরীক হওয়া. নামায শেষে ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়াও রহিয়াছে যাহা এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এই সব ফযীলত ছাড়াও আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা একমাত্র জামাতের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আবার একটি জরুরী বিষয় ইহাও খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন ঃ ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত তখনই হইবে যখন নামায সত্যিকারের নামায হইবে, পুরান কাপড়ের ন্যায় পেঁচাইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ার মত যদি নামায হয়, তবে উহা ফেরেশতাদের দোয়ার উপযুক্ত হইবে না। (বাহ্‌জাহ্‌)

(৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَآءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہٗ کی بارگاہ میں مسلمان بنکر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنیکا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے (یعنی مسجد میں) اسلئے کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے ایسی سنتیں

صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا
الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ
نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ يَتَطَهَّرُ
فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلٰى
مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ
اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً
وَّيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَّيَحُطُّ عَنْهُ
بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ
عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُوْمُ النِّفَاقِ
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهَا يُهَادٰى
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِي الصَّفِّ
وفى رواية لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ
عَنِ الصَّلٰوةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهٗ
أَوْ مَرِيْضٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِيْ
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِيَ الصَّلٰوةَ۔

جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں انہیں میں
سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں. اگر تم لوگ
اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں
شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنّت کے چھوڑنے والے ہوگے اور یہ سمجھ لو
کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کو
چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جو شخص
اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف
جائے تو ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتے
گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی اور ہم تو اپنا
یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو
جماعت سے رہ جاتا تھا ورنہ حضورؐ کے زمانہ میں عام منافقوں
کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمّت نہ ہوتی تھی یا کوئی
سخت بیمار ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے
گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا
جاتا تھا۔

وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلٰوةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ (رواه مسلم وابوداؤد والنسائى وابن ماجة كذا فى الترغيب والدر المنثور والسنة نوعان سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة كالجماعة والاذان والزوائد وتاركها لايستوجب اساءة كسير النبى صلى الله عليه وسلم فى لباسه وقعوده كذا فى نور الانوار والاضافة فى سنة الهدى بيانية اى سنة هى هدى والحمل مبالغة كذا فى قمر الاقمار)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুসলমানরূপে হাজির হইতে চায়, সে যেন এই নামাযসমূহকে এমন স্থানে আদায় করার এহতেমাম

করে যেখানে আযান হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী আলাইহিস-সালামের জন্য এমন সুন্নতসমূহ জারী করিয়াছেন, যেইগুলি সম্পূর্ণই হেদায়েত। এই সমস্ত সুন্নতের মধ্যে জামাতের সহিত নামায আদায় করাও রহিয়াছে। যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় তোমরাও ঘরে নামায পড়িতে আরম্ভ কর, তবে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ত্যাগকারী হইবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, যদি তোমরা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ত্যাগ কর, তবে গোমরাহ হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে এবং মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী লেখা হইবে এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ করা হইবে। (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়) আমরা নিজেদের অবস্থা এরূপ দেখিতাম—যে-ব্যক্তি খোলাখুলি মুনাফেক, সে-ই কেবল জামাতে শামিল হইত না। নতুবা সাধারণ মুনাফেকরাও জামাত ছাড়িয়া দেওয়ার সাহস করিত না। অথবা কাহারও কঠিন রোগ হইলে জামাতে হাজির হইতে পারিত না। অন্যথায় যে-ব্যক্তি দুইজনের উপর ভর করিয়া হেঁচড়াইয়া যাইতে পারিত, তাহাকেও জামাতের সহিত কাতারে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট জামাতের এত এহতেমাম ছিল যে, অসুস্থ অবস্থায়ও কোন রকমে জামাতে উপস্থিত হওয়ার শক্তি থাকিলে তাঁহারা অবশ্য জামাতে শরীক হইতেন। এমনকি দুইজন লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হইলেও যদি যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলেও তাঁহারা জামাত ত্যাগ করিতেন না। আর কেনই বা এমন হইবে না—তাহাদের ও আমাদের মনিব নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এইরূপ এহ্তেমাম করিতেন। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালের অসুস্থতার সময়ও ঠিক এইরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বারবার বেহুঁশ হইয়া পড়িতেছিলেন, কয়েকবার ওযূর জন্য পানি চাহিলেন। অবশেষে একবার ওযূ করিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাযিঃ) এবং অন্য একজন সাহাবীর সাহায্যে মসজিদে তশরীফ লইয়া গেলেন। তখন অবস্থা এই ছিল যে, ভালভাবে তাঁহার পা মোবারক মাটিতে জমাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই নির্দেশে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নামায পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হুযূর (সাঃ) পৌঁছিয়া জামাতে শরীক হইলেন।

(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর এবাদত করিবার সময় অন্তরে এইরূপ ধারণা করিবে যে, তিনি তোমার একেবারে সম্মুখে এবং তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ। তুমি নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মনে করিবে। (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে মনেই করিবে না, তখন না কোন ব্যাপারে আনন্দ হইবে না দুঃখ।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবে। যদি তুমি এতটুকু শক্তি রাখ যে, জমিনে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এশা ও ফজরের জামাতে হাজির হইতে পার, তবে ইহাতে অবহেলা করিবে না।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এশা এবং ফজরের নামায মুনাফেকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যদি তাহাদের জানা থাকিত যে, জামাতের সওয়াব কত বেশী, তাহা হইলে জমিনে হেঁচড়াইয়া হইলেও আসিয়া জামাতে শরীক হইত। (তারগীব)

(۴) عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

(رواه الترمذي وقال لا اعلم احدا رفعه الا ماروى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمر وقال المملى ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقاة كذا فى الترغيب قلت وله شواهد من حديث عمرؓ رفعه من صلى فى مسجد جماعة اربعين ليلة لا تفوته الركعة الاولى من صلوة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار رواه ابن ماجة واللفظ له والترمذى وقال نحو حديث انس يعنى المتقدم ولم يذكر لفظه وقال مرسل يعنى ان عمارة الراوى عن انس لم يدرك انسا وعزاه فى منتخب الكنز الى البيهقى فى الشعب وابن عساكر وابن النجار)

(৪) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত এইভাবে নামায পড়ে যে, তাহার তকবীরে উলা ছুটে না তবে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করিবে—একটি

জাহান্নাম হইতে মুক্তির, দ্বিতীয়টি মুনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার।
(তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে–ব্যক্তি এইভাবে চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত নামায পড়ে যে, শুরু হইতে ইমামের সহিত শরীক হয় এবং ইমামের প্রথম তকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও নামাযে শরীক হইয়া যায়। তবে সেই ব্যক্তি জাহান্নামে দাখেল হইবে না এবং মুনাফেকদের মধ্যেও গণ্য হইবে না। মুনাফেক তাহাদিগকে বলা হয়, যাহারা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কুফরী রাখে। আর বিশেষভাবে চল্লিশ দিনের কথা বলিবার জাহেরী কারণ হইল, অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে চল্লিশ দিনের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে—যেমন হাদীস শরীফে মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, চল্লিশ দিন যাবত বীর্যরূপে অবস্থান করে, পরবর্তী চল্লিশ দিনে গোশতের টুকরার আকার ধারণ করে, এইরূপে প্রতি চল্লিশ দিনে উহার পরিবর্তন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ ওয়ালাদের নিকটও চিল্লার একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কতই না ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের বৎসরের পর বৎসরও তকবীরে উলা ছুটে না।

(৫) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

نبئ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کیلئے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے.

(رواه ابوداؤد والنسائى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم كذا فى الترغيب و فيه ايضا عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الانصار الموت فقال انى محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتسابا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء الحديث وفيه فان اتى المسجد فصلى فى جماعة غفرله فان اتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما ادرك واتم ما بقى كان كذالك فان اتى المسجد وقد صلوا فاتم الصلوٰة كان كذالك رواه ابوداؤد)

(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া নামায পড়িবার জন্য মসজিদে গমন করে এবং সেখানে গিয়া দেখে যে, জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবুও সে জামাতে নামাযের সওয়াব পাইবে এবং এই সওয়াবের কারণে যাহারা জামাতের সহিত নামায আদায় করিয়াছেন, তাহাদের সওয়াবের মধ্যে কোন প্রকার কম করা হইবে না। (তারগীব ঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ ইহা আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও মেহেরবাণী যে, জামাত পাওয়া না গেলেও শুধু চেষ্টা করিলেই জামাতের সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের এত বড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও যদি আমরা তাহা গ্রহণ না করি, তবে ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে।

আর এই হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, মসজিদে জামাত হইয়া গিয়াছে—এই সন্দেহ করিয়া মসজিদে যাওয়া মূলতবী করা উচিত নয়। কেননা, মসজিদে যাইয়া যদি দেখা যায় যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবুও সওয়াব তো মিলিয়াই যাইবে। অবশ্য যদি পূর্ব হইতেই এইরূপ সঠিক জানা থাকে যে, জামাত হইয়া গিয়াছে, তবে কোন দোষ নেই।

(৬) عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ اَرْبَعَةٍ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ اَحَدُهُمْ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ مِائَةٍ تَتْرٰى۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہو ایک مقتدی اللہ کے نزدیک چار آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سو آدمیوں کی متفرق نمازوں سے بڑھی ہوئی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔

XXXXXXXXXXX

رواه البزار والطبرانی باسناد لاباس به کذا فی الترغيب وفی مجمع الزوائد رواه البزار والطبرانی فی الكبير ورجال الطبرانی موثقون وعزاه فی الجامع الصغير الی الطبرانی والبيهقی ورقم له بالصحة وعن ابی بن كعب رفعه بمعنی حديث الباب وفيه قصة وفی آخره وكلما كثر فهو احب الی الله عزوجل رواه احمد وابوداؤد و

النسائی وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحهما والحاکم وقد جزم یحیی بن معین و الذهلی بصحة هذا الحدیث کذا فی الترغیب)

(৬) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায একজন ইমাম ও অপর জন মুক্তাদী হয় চারজন ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। অনুরূপভাবে চার জনের জামাতে নামায আট আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা উত্তম।

(তারগীব ঃ বায্যার, তাবারানী)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এইভাবে যত বড় জামাতে নামায পড়া হইবে, আল্লাহর নিকট উহা ছোট জামাত অপেক্ষা তত বেশী পছন্দনীয় হইবে।

ফায়দা ঃ যাহারা এই কথা মনে করেন যে, দুই–চারজন লোক একত্রে মিলিয়া ঘরে বা দোকান ইত্যাদিতে জামাত করিয়া নিলেই যথেষ্ট হইবে—প্রথমতঃ ইহাতে শুরু হইতেই মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব হয় না। দ্বিতীয়তঃ বড় জামাতের সওয়াব হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়—কেননা, জামাত যত বড় হইবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা তত বেশী প্রিয় হইবে। আর যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই একটি কাজ করিতে হইবে, তখন সেই কাজটি যে তরীকায় করিলে আল্লাহ তায়ালা বেশী সন্তুষ্ট হইবেন সেভাবেই করা উচিত।

এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিস দেখিয়া খুশী হন—এক, জামাতের কাতার। দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি মধ্যরাত্রে উঠিয়া (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেছে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি কোন সৈন্যদলের সহিত জেহাদ করিতেছে। (জামে সগীর)

(৭) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

حضرت سہلؓ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں۔ اُن کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سُنادے۔

(رواہ ابن ماجة وابن خزیمة فی صحیحه والحاکم واللفظ له وقال صحیح علی شرط الشیخین کذا فی الترغیب وفی المشکوٰة بروایة الترمذی وابی داؤد عن بریدة ثم قال رواه

ابن ماجة عن سهل ابن سعد وانس اه قلت وله شاهد فی منتخب کنز العمال برواية الطبرانی عن ابی امامة بلفظ بشر المدلجين الی المساجد فی الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون ذكر السيوطی فی الدر المنثور فی تفسير قوله تعالی انما يعمر مساجد الله عدة روايات فی هذا المعنی

(৭) হযরত সাহ্‌ল (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী মসজিদে গমন করিতে থাকে, তাহাদিগকে কিয়ামত–দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর। (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ আজ দুনিয়াতে অন্ধকার রাত্রিতে মসজিদে যাওয়ার কদর তখন বুঝে আসিবে, যখন কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মুছীবতের মধ্যে গ্রেফতার থাকিবে। আজকের অন্ধকারে কষ্টের বদলা ও উহার মূল্য সেই সময় হইবে যখন সূর্য অপেক্ষা অধিক আলোময় এক উজ্জ্বল নূর তাহাদের সঙ্গে হইবে।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্তমনে নূরের মিম্বরে অবস্থান করিবে এবং অন্যান্যরা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকিবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইবেন—আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশতারা আরজ করিবে, আপনার প্রতিবেশী কাহারা? এরশাদ হইবে, যাহারা মসজিদ আবাদ করিত।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদ আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হইল বাজার।

এক হাদীসে আছে, মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান। (জামে সগীর)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, তোমরা যাহাকে মসজিদে যাইতে অভ্যস্থ দেখ তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও।

(জামে সগীর)

অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত–দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাহারাই মসজিদসমূহকে আবাদ করে।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১৮)(দুররে মানসূর)

এক হাদীসে আছে, কষ্টের সময় ওযূ করা, মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা

গোনাহসমূহকে ধৌত করিয়া দেয়। (জামে সগীর)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে তাহার সওয়াবও তত বেশী হইবে। (জামে সগীর) কারণ, কদমে কদমে সওয়াব লিখিত হইতে থাকে—মসজিদ যত দূরে হইবে কদমও তত বেশী হইবে। এই কারণেই কোন কোন সাহাবী মসজিদের দিকে যাইতে ছোট ছোট কদম রাখিতেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের জানা থাকিত, তবে যুদ্ধ করিয়া হইলেও উহা লাভ করিত। এক, আযান দেওয়া। দ্বিতীয়, দুপুরের সময় জামাতে নামায পড়িবার জন্য যাওয়া। তৃতীয়, প্রথম কাতারে নামায পড়া।(জামে সগীর)

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষ অস্থির হইবে এবং সূর্য অত্যন্ত প্রখর হইবে তখন সাত প্রকারের লোক আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সেও হইবে যাহার মন সর্বদা মসজিদে আটকাইয়া থাকে। যখন মসজিদ হইতে কোন প্রয়োজনে বাহিরে আসে পুনরায় মসজিদেই ফিরিয়া যাওয়ার আকাঙ্খা হয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মসজিদের প্রতি যে–ব্যক্তি মহব্বত রাখে, আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি মহব্বত রাখেন। (জামে সগীর)

পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে যেমন সীমাহীন খায়র–বরকত ও সওয়াব রহিয়াছে, তেমনিভাবে উহার মধ্যে বহুপ্রকার কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ; কারণ আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও উহার মধ্যকার নিহিত কল্যাণ উদঘাটনের সাধ্য কাহার আছে? তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও হিম্মত অনুপাতে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি হিসাবে উহার কল্যাণও বুঝে আসে। যাহার যত বেশী যোগ্যতা হয় ততই শরীয়তের হুকুমের মধ্যে নিহিত গুণাগুণ বা উপকারিতা বুঝে আসিতে থাকে। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে জামাতে নামাযের কল্যাণসমূহও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে এই বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহার তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(এক) প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি হইতে বাঁচার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক উপকারী কোন জিনিস নাই যে, এবাদতসমূহের মধ্য হইতে একটি এবাদতের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটানো

হয় যে, উহা জ্ঞানী–মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে আদায় করা যাইতে পারে। যাহা আদায়ের ব্যাপারে শহর ও গ্রামবাসী সকলেই সমান হয়। একমাত্র ইহাই তাহাদের প্রতিযোগিতা ও গর্বের বস্তু হয়, আর ইহা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, জীবনের এমন প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয় যাহা হইতে আলাদা থাকা কঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহাতে এই ব্যাপকতা আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইয়া যায় এবং ঐ সকল প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলি যাহা পূর্বে ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ ছিল উহাই হক ও সত্যের দিকে আকর্ষণকারী হইয়া যায়। যেহেতু এবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দলীল–প্রমাণের দিক দিয়া অধিকতর মজবুত আর কোন এবাদত নাই, এইজন্য নিজেদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ইহার প্রচলন ঘটানো এবং ইহার জন্য বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা ও পরস্পর একমত হইয়া ইহাকে আদায় করা একান্ত জরুরী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(দুই) প্রত্যেক মাযহাব ও দ্বীনের মধ্যে এমন একদল লোক থাকে যাহারা অন্যান্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়। আবার কিছু লোক দ্বিতীয় স্তরে এমনও থাকে যাহাদিগকে একটু উৎসাহ প্রদান বা সচেতন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরও কিছু দুর্বল ও কমজোর লোক তৃতীয় স্তরে এমন থাকে, যাহাদিগকে সকলের সাথে সমাবেশে এবাদতের জন্য বাধ্য না করা হইলে তাহারা অবহেলা ও গাফলতির দরুন এবাদতই ছাড়িয়া দেয়। কাজেই অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন ইহাই যে, সকলেই জামাতবন্দী হইয়া এবাদত আদায় করিবে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণে এবাদত পরিত্যাগকারীগণ এবাদতকারীদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং এবাদতে আগ্রহী ও অনাগ্রহীদের মধ্যে খোলা পার্থক্য হইয়া যাইবে। এমনিভাবে ওলামাদের অনুসরণ করার দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানী হইয়া যাইবে এবং জাহেল ও মূর্খরা এবাদতের তরিকা জানিতে পারিবে। এইভাবে এবাদত তাহাদের জন্য অভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে গলানো চান্দি রাখার মত হইবে। যাহাতে জায়েয, নাজায়েয ও খাঁটি–ভেজালের মধ্যে খোলাখুলি পার্থক্য হইয়া যায়—অতঃপর জায়েযকে মজবুত করা হয় আর নাজায়েযকে দূর করা হয়।

(তিন) ইহা ছাড়া যেখানে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখে, আল্লাহর রহমত তলব করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এমন লোক উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই সর্বান্তঃকরণে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই রুজু থাকেন, মুসলমানদের এরূপ সমাবেশ বরকত নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর রহমত

আকর্ষণ করার ব্যাপারে আশ্চর্য ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রাখে।

(চার) উম্মতে মুহাম্মাদিয়া কায়েম হওয়ার উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ হউক এবং দ্বীন-ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। আর এই উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকগণ, শহরবাসী ও গ্রামবাসী এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এক জায়গায় জমা হইয়া ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং প্রতীকী নিদর্শনবাহী এবাদতকে আদায় না করিবে। এই নিগূঢ় রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরীয়ত জুমআ এবং জামাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, এইগুলিকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আদায় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে এবং এইগুলিকে পরিত্যাগ করার পরিণামে শাস্তির কথা নাযিল হইয়াছে।

মুসলমানদের এই সমাবেশ যেহেতু দুই পর্যায়ে হইতে পারে—গ্রাম বা মহল্লা পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ শহর পর্যায়ে, আর গ্রাম বা মহল্লার সমাবেশ সবসময়ই সহজ, পক্ষান্তরে সারা শহর পর্যায়ের সমাবেশ করা কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই প্রত্যেক নামাযের সময় জামাতের নামাযের মাধ্যমে মহল্লার সমাবেশ এবং অষ্টম দিনে শহরের সমাবেশ জুমার নামাযের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামাত ত্যাগ করার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হুকুম পালন করিলে যেমন পুরস্কারদানের ওয়াদা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ঘোষণাও করিয়াছেন। ইহাও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে, হুকুম পালন করিলে তিনি অফুরন্ত নেয়ামত ও পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। নতুবা বান্দা হিসাবে তো শুধু শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, বান্দার কর্তব্য হইল হুকুম পালন করিয়া যাওয়া—ইহার জন্য আবার পুরস্কার কিসের? অপরদিকে মনিবের নাফরমানীর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে—সেইজন্য যতই শাস্তি দেওয়া হউক তাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বিশেষ কোন শাস্তি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তবুও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন মহববত ও মেহেরবানী এই যে, ভাল-মন্দ বর্ণনা করিয়া বিভিন্নভাবে সতর্ক করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যদি আমরা না বুঝি তবে নিজেদেরই ক্ষতি করিব।

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہؓ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے. ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو.

(رواہ ابوداؤد وابن حبان فی صحیحہ وابن ماجۃ بنحوہ کذا فی الترغیب وفی المشکوٰۃ رواہ ابوداؤد والدارقطنی)

(১) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া কোনরকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (নিজের জায়গাতেই নামায পড়িয়া নেয়), তাহার নামায কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা বা ভয়–ভীতি।

(তারগীব ঃ আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান॥ মিশকাত ঃ আবূ দাউদ, দারা কুতুনী)

ফায়দা ঃ কবুল না হওয়ার অর্থ এই যে, এই নামায পড়া দ্বারা আল্লাহর তরফ হইতে যে পুরস্কার ও সওয়াব পাওয়া যাইত তাহা পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যে সমস্ত হাদীসে নামায না হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল হাদীসেরও ব্যাখ্যা ইহাই। কেননা, এমন হওয়াকে কি হওয়া বলা যায় যাহাতে কোন পুরস্কার বা সম্মান পাওয়া গেল না? ইহা আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর অভিমত। নতুবা কিছুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে বিনা ওজরে জামাত ত্যাগ করা হারাম এবং জামাতে নামায আদায় করা ফরজ। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে নামাযই হয় না। হানাফী আলেমগণের মতে নামায যদিও হইয়া যাইবে কিন্তু জামাত তরক করার কারণে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনিয়াও জামাতে শরীক হয় না সে নিজেও মঙ্গল কামনা করে নাই এবং তাহার সহিতও মঙ্গল কামনা করা হয় নাই। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি

আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হইল না তাহার কান গলিত সীসা দ্বারা ভরিয়া দেওয়াই উত্তম।

(২) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللّٰهِ يُنَادِيْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يُجِيْبُهُ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی (یعنی مؤذن) کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔

(رواہ احمد والطبرانی من روایۃ زبان بن فائد کذا فی الترغیب وفی مجمع الزوائد رواہ الطبرانی فی الکبیر وزبان ضعفہ ابن معین ووثقہ ابوحاتم اھ وعزاہ فی الجامع الصغیر الی الطبرانی ورقم لہ بالضعف)

(২) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফর এবং মুনাফেকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর (মুআযযিনের) ডাক শুনিয়াও মসজিদে হাজির হয় না। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফে কত কঠোরভাবে সতর্ক করা হইয়াছে এবং ধমক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা জামাতে হাজির হয় না তাহাদের এই কাজকে কাফের ও মুনাফেকদের কাজ বলা হইয়াছে। যেন এমন কাজ মুসলমানের দ্বারা হইতেই পারে না। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মুআয্যিনের আযান শুনিয়া মসজিদে হাজির হয় না।

হযরত সুলাইমান ইবনে আবী হাছমা (রাযিঃ) খুবই উঁচু মর্তবার সাহাবী ছিলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার কারণে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয় নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে বাজারের তদারকী কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন ফজরের জামাতে শরীক হইতে পারেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) খবর নেওয়ার জন্য তাঁহার বাড়ীতে তশরীফ লইয়া গেলেন এবং তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলাইমান আজ ফজরের নামাযে হাজির হয় নাই কেন? তাহার মা বলিলেন, সারারাত্র সে নফল নামাযে মশগুল ছিল ; তাই ঘুমের চাপে চোখ লাগিয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাতভর নফল পড়া অপেক্ষা ফজরের নামায জামাতে আদায়

করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়।

(৩) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْیَتِیْ فَیَجْمَعُوْا لِیْ حُزَمًا مِّنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِیْ قَوْمًا یُّصَلُّوْنَ فِیْ بُیُوْتِهِمْ لَیْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَیْهِمْ ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کرکے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جاکر اُن کے گھروں کو جلادوں ۔

(رواه مسلم و ابوداؤد وابن ماجة والترمذی كذا فی الترغیب قال السیوطی فی الدر اخرج ابن ابی شیبة والبخاری ومسلم وابن ماجة عن ابی هریرة رفعه اثقل الصلوة علی المنافقین صلوة العشاء وصلوة الفجر ولو یعلمون ما فیهما لاتوهما ولوحبوا ولقد هممت ان امر بالصلوة فتقام الحدیث بنحوه)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলি। অতঃপর আমি ঐসব লোকের নিকট যাই, যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া নেয় এবং যাইয়া তাহাদের বাড়ী–ঘর পোড়াইয়া দেই। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উম্মতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মেহেরবানী এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তির সামান্যতম কষ্টও তিনি বরদাশত করিতে পারিতেন না। তাহা সত্ত্বেও যাহারা ঘরে নামায পড়িয়া নেয়, তাহাদের প্রতি তাঁহার এমনই রাগ যে, তিনি তাহাদের বাড়ী–ঘর আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

(৪) عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِیْ قَرْیَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِیْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰنُ فَعَلَیْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا یَاْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِیَةَ ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلّط ہو جاتا ہے اسلئے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے ۔

رواه احمد وابوداؤد والنسائی وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحیهما والحاکم و زاد رزین فی جامعه وان ذئب الانسان الشیطان اذا خلا به اکله کذا فی الترغیب ورقم له فی الجامع الصغیر بالصحة وصححه الحاکم واقره علیه الذهبی

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে আর সেখানে জামাতের সহিত নামায পড়া হয় না, তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। কাজেই জামাতকে জরুরী মনে কর। দল ত্যাগকারী ছাগলকে বাঘে খাইয়া ফেলে। আর মানুষের বাঘ হইল শয়তান।

(তারগীব ঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যাহারা ক্ষেত–খামারে কাজ করে, তাহারা তিনজন হইলেও জামাতের সহিত নামায আদায় করা উচিত। বরং দুইজন হইলেও জামাতে নামায আদায় করা উত্তম। সাধারণতঃ কৃষকেরা নামাযই পড়ে না—ক্ষেত–খামারের ব্যস্ততাকে তাহারা ওজর হিসাবে যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। আর যাহাদিগকে বেশ দ্বীনদার মনে করা হয় তাহারাও একা একাই নামায পড়িয়া নেয়। অথচ কয়েকজন কৃষক একত্র হইয়া জামাতে নামায পড়িয়া নিলে কত বড় জামাত হইয়া যায় এবং কত বড় সওয়াবের অধিকারী হইতে পারে। দুই–চারিটি পয়সা উপার্জনের জন্য শীত–গরম, রৌদ্র–বৃষ্টি সবকিছু উপেক্ষা করিয়া দিনভর কাজে মশগুল হইয়া থাকে, অথচ এত বড় সওয়াবকে তাহারা বরবাদ করিয়া দেয়, ইহার প্রতি তাহারা মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ তাহারা যদি মাঠে জামাতের সাথে নামায পড়ে তবে আরও বেশী সওয়াব হয়। এক হাদীসে আছে, পঞ্চাশ নামাযের সওয়াব হয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন রাখাল কোন পাহাড়ের পাদদেশে অথবা মাঠে আযান দিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করে তখন আল্লাহ তায়ালা খুবই খুশী হন এবং গর্ব করিয়া ফেরেশতাদিগকে বলেন, তোমরা দেখ—আমার বান্দা আযান দিয়া নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, আমার ভয়েই সে এইসব করিতেছে, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম এবং তাহার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করিয়া দিলাম। (মিশকাত)

(৫) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات

لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ فَقَالَ
هٰذَا فِي النَّارِ۔

پھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں
شریک نہیں ہوتا (اس کے متعلق کیا حکم ہے)

(رواه الترمذی موقوفا كذا فی الترغيب وفی تنبيه الغافلين روی عن مجاهد
ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال يا ابن عباس ما تقول فی رجل فذكره بلفظه زاد
فی آخره فاختلف اليه شهرًا يسأله عن ذلك وهو يقول هو فی النار)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নফল নামায পড়ে, কিন্তু জুমআ ও জামাতে শরীক হয় না—তাহার সম্পর্কে কি বলেন। তিনি উত্তর করিলেন, লোকটি জাহান্নামী। (তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই ব্যক্তি যদিও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, যেহেতু সে মুসলমান। কিন্তু নাজানি কতকাল তাহাকে জাহান্নামে পড়িয়া থাকিতে হইবে। জাহেল ছুফীদের মধ্যে ওজীফা এবং নফলের প্রতি জোর দেখা যায় কিন্তু জামাতের প্রতি তাহাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাকেই তাহারা বুযুর্গী মনে করে। অথচ আল্লাহর মাহবুব নবীর অনুসরণ করাই হইল আসল বুযুর্গী। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেন ঃ প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যাহার উপর মুক্তাদীগণ যুক্তিসংগত কারণে নারাজ থাকা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে। দ্বিতীয় ঐ নারী যাহার উপর তাহার স্বামী নারাজ। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হয় না।

(٦) اَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ كَعْبِ
نِ الْحَبْرِ قَالَ وَالَّذِيْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى
مُوْسٰى وَالْاِنْجِيْلَ عَلٰى عِيْسٰى وَالزَّبُوْرَ
عَلٰى دَاوٗدَ وَالْفُرْقَانَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اُنْزِلَتْ
هٰذِهِ الْاٰيَاتُ فِي الصَّلَوٰتِ الْمَكْتُوْبَاتِ
حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ
سَاقٍ اِلٰى قوله وَهُمْ سَالِمُوْنَ الصَّلَوٰتُ
الْخَمْسُ اِذَا نُوْدِيَ بِهَا واخرج البيهقی
فی الشعب عن سعيد بن جبير قال

حضرت کعب احبار رضؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے
اُس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت
موسیٰؑ پر اور انجیل حضرت عیسیٰؑ پر اور زبور
حضرت داؤدؑ پر (علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام)
نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں
کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارہ میں
جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں ترجمہ آیات
جس دن حق تعالیٰ شانہٗ ساق کی تجلی فرمائیں

الصلوٰت فی الجماعات واخرج البیہقی عن ابن عباس قال الرجل یسمع الاذان فلا یجیب الصلوۃ کذا فی الدر المنثور قلت وتمام الآیۃ یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّیُدْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝ (ن-۲)

گے (جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی) اور لوگ اس دن سجدہ کے لئے بلائے جاویں گے، تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرسکیں گے۔ اُن کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اسلئے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے (پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے)

(৬) হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি হযরত মূসা (আঃ)–এর উপর তৌরাত, ঈসা (আঃ)এর উপর ইঞ্জীল, দাঊদ (আঃ)এর উপর যবুর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন—কুরআনের এই আয়াতসমূহ ফরজ নামাযগুলি জামাতের সহিত এমনই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে, যেখানে আযান হয়। (আয়াতসমূহের তরজমা ঃ–) যেদিন আল্লাহ পাক ছাক–এর তাজাল্লী প্রকাশ করিবেন (যাহা এক বিশেষ ধরণের তাজাল্লী হইবে) এবং সকল মানুষকে সেজদার জন্য ডাকা হইবে, সেইদিন তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না, তাহাদের চোখ লজ্জায় অবনত হইয়া থাকিবে, তাহাদের সর্বাঙ্গে অপমান বিরাজ করিবে। কারণ তাহাদিগকে দুনিয়াতে সেজদার জন্য ডাকা হইত কিন্তু সুস্থ–সবল থাকা সত্ত্বেও সেজদা করিত না। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ ছাক–এর তাজাল্লী এক বিশেষ ধরনের জ্যোতি যাহা হাশরের ময়দানে প্রকাশ হইবে। ইহা দেখিয়া সমস্ত মুসলমান সেজদায় লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু কিছু লোকের কোমর শক্ত হইয়া যাইবে ; ফলে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না। এই সমস্ত লোক কাহারা সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে ঃ— হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) হইতে এক তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে ; হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখও এই একইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে জামাতে নামায পড়ার জন্য ডাকা হইত, কিন্তু তাহারা জামাতে নামায পড়িত না।

দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

শুনিয়াছি যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়াতে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়িত।

তৃতীয় তাফসীর মতে ইহারা কাফের, যাহারা দুনিয়াতে মোটেই নামায পড়িত না।

চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী ইহারা হইল মোনাফেক। (আল্লাহই অধিক জানেন এবং তাঁহার জ্ঞানই পূর্ণতম।)

হযরত কাব আহবার (রাযিঃ) কসম খাইয়া যে তাফসীর বর্ণনা করিলেন এবং ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর ন্যায় উঁচু মর্তবার সাহাবী ও ইমামে তাফসীর যাহাকে সমর্থন করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি কত গুরুতর—হাশরের ময়দানে অপমানিত ও লজ্জিত হইতে হইবে এবং যেখানে সমগ্র মুসলমান সেজদায় মশগুল থাকিবে সেখানে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না!

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও নামায তরক করা সম্পর্কে আরও বহু শাস্তি ও সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত মুসলমানের জন্য একটি সতর্কবাণীরও প্রয়োজন ছিল না ; কেননা আল্লাহ ও রাসুলের আদেশই তাহার জন্য যথেষ্ট। আর যাহাদের নিকট কদর নাই তাহাদের জন্য হাজার ধরণের ধমকও নিস্ফল। যখন শাস্তির সময় আসিয়া যাইবে তখন লজ্জা ও অনুতাপ হইবে কিন্তু উহাতে কোন কাজ হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

খুশু–খুজূর (একাগ্রতা) বর্ণনা

অনেক লোক এমন আছেন, যাহারা নামায পড়েন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাহারা জামাআতের সহিত নামায পড়ারও এহতেমাম করিয়া থাকেন ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরূপ খারাপভাবে পড়িয়া থাকেন যে, তাহা নেকী ও সওয়াবের বস্তু হওয়ার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হয়—যদিও একেবারে নামায না পড়া হইতে এইরূপ মন্দভাবে পড়িয়া নেওয়াও উত্তম। কেননা, একেবারে নামায না পড়িলে যে আজাব ও শাস্তির কথা রহিয়াছে, তাহা খুবই মারাত্মক এবং খুবই কঠিন। মন্দভাবে নামায পড়ার কারণে যদিও উহা কবূল হওয়ার মত হইল না, মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হইল এবং ইহাতে কোনরূপ সওয়াবও হইল না, কিন্তু নামায একেবারে না পড়িলে যে পর্যায়ের নাফরমানী ও অবাধ্যতা হইত তাহা তো অন্ততঃপক্ষে হইবে না। কিন্তু আসল কর্তব্য হইল এই যে, যখন মানুষ নামাযের জন্য সময় খরচ করে, কাজ–কারবার ছাড়িয়া রাখে, কষ্ট স্বীকার করে, তখন যাহাতে এই নামায বেশী হইতে বেশী সুন্দর, ওজনী ও মূল্যবান হয়, সেইজন্য চেষ্টা করা চাই ; ইহাতে কোন রকমের কমি করা চাই না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন—যদিও এই আয়াত কুরবানীর সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু আল্লাহর হুকুম–আহকাম তো সবই এক। এরশাদ হইতেছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিকট কুরবানীর গোশতও পৌঁছে না এবং উহার রক্তও পৌঁছে না ; বরং তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে তোমাদের পরহেজগারী ও এখলাস। (সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৩৭)

অতএব, যে পর্যায়ের এখলাস হইবে, সেই পর্যায়েই কবুল হইবে। হযরত মুআয (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহার নিকট শেষ ওসিয়তের আবেদন করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের প্রতিটি কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে, কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী।

হযরত সাওবান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এখলাসওয়ালারা সুখী হউক, কেননা তাহারা হেদায়াতের আলো, তাহাদের কারণেই অনেক বড় বড় ফেৎনা দূর হইয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কমজোর ও দুর্বল লোকদের বরকতে এই উম্মতের সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের দোয়া, তাহাদের নামায এবং তাহাদের এখলাসের ওসীলায় সাহায্য করিয়া থাকেন। (তারগীব) নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

অর্থাৎ, বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংস রহিয়াছে ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা নিজেদের নামায হইতে গাফেল রহিয়াছে। তাহারা এমন যে, (নামাযের মধ্যে) রিয়াকারী করিয়া থাকে। (সূরা মাউন, আয়াত ঃ ৪-৬)

'গাফেল থাকার' বিভিন্ন তফসীর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক তফসীর এই যে, ওয়াক্তের কোন খবর রাখে না ; নামায কাজা করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় তফসীর এই যে, নামাযের প্রতি মনোযোগী হয় না ; এদিক সেদিক মশগুল হইয়া থাকে। তৃতীয় তফসীর এই যে, এই খবর রাখে না যে, কত রাকআত নামায পড়া হইল।

অন্য এক আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইতেছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত অলসভাবে দাঁড়ায়, কেবল লোকদিগকে দেখাইয়া থাকে (যে আমরাও নামাযী), তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না ; কিন্তু অতি অল্প।

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪২)

অন্য এক আয়াতে কয়েকজন নবী আলাইহিমুস-সালামের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিতেছেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অর্থাৎ, এই সকল নবীদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক পয়দা হইয়াছে, যাহারা নামাযকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং খাহেশাতের অনুসরণ করিয়াছে। অতএব তাহারা শীঘ্রই আখেরাতে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। (সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৫৯)

'গাই' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল, গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আখেরাতের বরবাদী ও ধ্বংস। অনেক তফসীরকার লিখিয়াছেন যে, 'গাই' জাহান্নামের একটি স্তর, যেখানে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জমা হইবে এবং উহার মধ্যে এই সমস্ত লোককে নিক্ষেপ করা হইবে।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইতেছে ঃ

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ ○

অর্থাৎ, তাহাদের দান–খয়রাত কবুল না হওয়ার পথে একমাত্র বাধা হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত কুফর করিয়াছে, নামায পড়িলেও অলসতার সহিত পড়িয়াছে এবং দান করিলেও অনিচ্ছা ও অসন্তোষের সহিত করিয়াছে।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৫৪)

অপরদিকে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ○ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঐসকল মুমিন সফলকাম হইয়াছে, যাহারা বিনয় ও খুশু সহকারে নামায আদায় করে, বেহুদা কাজ হইতে নিজেদেরকে ফিরাইয়া রাখে, যাকাত প্রদান করে (অথবা নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করে), নিজেদের স্ত্রী এবং দাসীদের ছাড়া অন্যদের হইতে আপন লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে—কেননা, এই ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই ; তবে যাহারা ইহা ব্যতীত অন্য স্থানে যৌন–খাহেশ পুরা করে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। যাহারা আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখে এবং যাহারা নিজ নামাযের এহতেমাম করে—একমাত্র তাহারাই জান্নাতুল–ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত ঃ ১–১১)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরদাউস জান্নাতের সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সেখান হইতে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয় ; ইহারই উপর আল্লাহ তায়ালার আরশ হইবে। তোমরা যখন জান্নাতের জন্য দোয়া কর তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করিও।

অন্য এক আয়াতে নামায সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে ঃ

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নামায বড় কঠিন, তবে যাহাদের অন্তরে (আল্লাহর প্রতি) খুশু আছে, তাহাদের জন্য মোটেই কঠিন নহে। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা এই কথা খেয়াল রাখে যে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাহারা নিজেদের রবের সহিত মিলিত হইবে এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ৪৫/৪৬)

এই সকল লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন ঃ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থাৎ, যে সকল ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং উহাতে যিকির করিতে আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন, সেই সকল ঘরে এমন সব লোক সকাল–সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে, যাহাদিগকে ব্যবসা–বাণিজ্য, বেচাকেনা আল্লাহর যিকির, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন এক দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ উলট–পালট হইয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এবং তাহারা এইসব এইজন্যই করিতেছে যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নেক আমলের বদলা দান করেন ; বরং আপন করুণায় বদলা হইতেও আরও অনেক বেশী তাহাদিগকে দান করেন ; আর আল্লাহ তায়ালা তো যাহাকে ইচ্ছা অগণিত দান করিয়া থাকেন।

(সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩৬–৩৯)

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے ۔ در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

অর্থাৎ, তুমি এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সদা উন্মুক্ত থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নামায কায়েম করার অর্থ হইল, উহার রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, পুরাপুরি আল্লাহর দিকে রুজু থাকে এবং অত্যন্ত খুশু সহকারে নামায পড়ে।

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতেও এই কথা নকল করা হইয়াছে যে, নামায কায়েম করার অর্থ হইল—নামাযের ওয়াক্তসমূহের হেফাজত করা এবং ওযূ, রুকু ও সেজদাকে উত্তমরূপে আদায় করা—অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত জায়গায় 'আকামাস–সালাতা' এবং 'ইউকীমূনাস–সালাতা' বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত জায়গায় এই অর্থকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। (দুররে মানসূর) বস্তুতঃ ইহারাই হইল ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا وَّالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

অর্থাৎ, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দা হইল তাহারা, যাহারা যমীনের উপর বিনয়ের সহিত চলে (অর্থাৎ অহংকারের সহিত চলাফেরা করে না) যখন তাহাদের সহিত জাহেল লোকেরা (মূর্খের মত) কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা বলে—সালাম। (অর্থাৎ তাহারা শান্তির কথা বলে যাহাতে অশান্তি দূর হয়, অথবা দূর হইতে তাহারা সালাম বলিয়াই ক্ষান্ত হয়) এবং ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাতভর আপন রবের উদ্দেশ্যে সেজদা এবং নামাযে দণ্ডায়মান থাকিয়া কাটাইয়া দেয়।"

(সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৬৩/৬৪)

অতঃপর তাহাদের আরও কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়া এরশাদ ফরমান ঃ

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

অর্থাৎ, এই সকল লোককে তাহাদের ধৈর্যের (অথবা দ্বীনের উপর অটল থাকার) বদলাস্বরূপ বেহেশতের বালাখানাসমূহ দান করা হইবে এবং সেখানে তাহাদিগকে ফেরেশতাদের তরফ হইতে দোয়া ও সালাম দ্বারা স্বাগত জানানো হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করিবে। তাহা কতই না উত্তম ঠিকানা ও আবাসস্থল। (সূরা ফোরকান, আঃ ৭৫/৭৬)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○ پ ۱۳ ع ۱۰

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের উপর সালাম (শান্তি)—কেননা তোমরা দ্বীনের উপর অটল থাকিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছ। অতএব, কতই না চমৎকার শেষ আবাসস্থল। (সূরা রায়াদ, আয়াত ঃ ২৩–২৪)

তাহাদের প্রশংসায় অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক, যাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের বিছানা হইতে পৃথক থাকে, (অর্থাৎ তাহারা নামাযে মগ্ন থাকে) আপন রবকে আজাবের ভয় ও সওয়াবের আশায় ডাকিতে থাকে এবং তাহারা আমার দেওয়া নেয়ামত হইতে খরচ করিয়া থাকে। এইসব লোকের জন্য অদৃশ্য জগতে তাহাদের চক্ষু শীতল করার মত কি কি পুরস্কার মওজুদ রহিয়াছে ; তাহা কেহই জানে না। যাহা তাহাদের নেক আমলের বদলা স্বরূপ হইবে। (সূরা আলিফ, লাম, মীম সেজদা, আয়াত ঃ ১৬–১৭)

তাহাদের শানে আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ پ ۲۶ ع ۱۸

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বেহেশতের বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে। আপন পরওয়ারদিগারের দানকে তাহারা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) নেক আমলকারী ছিল, রাত্রে তাহারা খুব কমই নিদ্রা যাইত, শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহারা এস্তেগফার ও ক্ষমা–প্রার্থনা করিত।(সূরা জারিয়াত,আয়াত ঃ ১৫–১৮)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

যাহারা বে–দ্বীন তাহাদের সহিত কি ঐ সমস্ত লোকের তুলনা হইতে পারে, যাহারা রাত্রিতে কখনও সেজদায় পড়িয়া থাকে আবার কখনও নিয়ত বাঁধিয়া (আল্লাহর এবাদতে) দাঁড়াইয়া থাকে। আখেরাতকে ভয় করে

এবং স্বীয় পরওয়ারদিগারের রহমতের আশা পোষণ করে। (আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন) যাহারা জানে আর যাহারা জানে না—এই দুই শ্রেণী কি কখনও সমান হইতে পারে? (আর ইহা নিতান্তই স্পষ্ট বিষয় যে, যাহারা জানে তাহারা আপন রবের এবাদত করিবেই ; আর যাহারা এমন দয়ালু মাওলার এবাদত করে না তাহারা শুধু অজ্ঞ নয় বরং অজ্ঞ হইতেও অজ্ঞ।) বস্তুতঃ উপদেশ গ্রহণ করে একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই।

(সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৯)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষকে অস্থির চিত্তরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনরূপ বিপদে পড়িলেই সে অতিমাত্রায় হাহুতাশ আরম্ভ করে, আর যখন সে কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে তখন সে কৃপণতা শুরু করে (যাহাতে আর কেহ এই কল্যাণ লাভ করিতে না পারে)। তবে ঐসব নামাযী লোকদের ব্যাপার স্বতন্ত্র যাহারা পাবন্দী ও স্থিরতার সহিত নামায আদায় করে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত ঃ ১৯–২৩)

এই আয়াতের পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আরও কতিপয় গুণ বর্ণনা করার পর এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۝

অর্থাৎ, আর যাহারা নিজেদের নামাযসমূহের হেফাজত করে তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে বেহেশতে সম্মানিত করা হইবে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত ঃ ৩৪–৩৫)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে নামাযের হুকুম এবং নামাযীদের ফযীলত সম্মান ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এইরূপ দৌলতই বটে। এই কারণেই সরদারে দোজাহান, ফখ্‌রে রুসুল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রহিয়াছে। এই কারণেই হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) দোয়া করিতেন ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে বিশেষ এহতেমামের সহিত নামায আদায়কারী বানাইয়া দাও এবং আমার বংশধরের মধ্যেও এমন

লোক পয়দা কর, যাহারা নামাযের এহতেমাম করিবে। হে পরওয়ারদিগার, আমার এই দোয়া কবূল কর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৪০) আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) 'খলীল' উপাধিতে গৌরবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নামাযের পাবন্দী ও এহতেমামের ব্যাপারে তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় হাবীব সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করিতেছেন ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَانَسْأَلُكَ رِزْقًا ط
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝ (سورة طٰهٰ ـ ع ٨)

অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবার–পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনার দ্বারা আমি রুজি (উপার্জন) চাই না ; রিযিক তো আমিই আপনাকে দিব। উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর মধ্যেই নিহিত। (সূরা ত্বহা, আঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অভাব অনটন ইতাদি দেখা দিত, তখন তিনি পরিবারের সকলকে নামাযের আদেশ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতেন।

পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও এই একই রীতি ছিল—যখনই তাঁহারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন তখনই তাহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে এত গাফেল ও বেপরওয়া যে, ইসলাম ও মুসলমানীর লম্বা–চওড়া দাবী করা সত্ত্বেও ইহার প্রতি মনোযোগী হই না। বরং যদি কেহ নামাযের কথা বলে বা নামাযের দিকে দাওয়াত দেয়, তবে তাহার সহিত ঠাট্টা করিয়া থাকি এবং তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল? বরং নিজেরই ক্ষতি হইল।

অপরদিকে যাহারা নামায পড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই এমনভাবে নামায পড়ে যে, ইহাকে যদি নামাযের সাথে তামাশা করা বলা হয়, তবে অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, নামাযের খুশু–খুজু তো দূরের কথা অনেকেই নামাযের অবশ্য করণীয় রুকনও পুরাপুরিভাবে আদায় করে না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনা আমাদের সামনে রহিয়াছে—তিনি নিজে প্রতিটি কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর আমলও আমাদের সামনে রহিয়াছে—

তাঁহাদের অনুসরণ করা উচিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর কিছু ঘটনা নমুনাস্বরূপ আমার রচিত 'হেকায়াতে সাহাবাহ' কিতাবে লিখিয়াছি, এখানে আর লেখার প্রয়োজন নাই। তবে এই কিতাবে সূফিয়ায়ে কেরামের কিছু ঘটনা নকল করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নকল করিতেছি।

শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) বিখ্যাত সুফীগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমার ঘুমের এত চাপ হইল যে, রাত্রের নিয়মিত ওজীফাগুলিও ছুটিয়া গেল। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা। যাহার পায়ের জুতাগুলি পর্যন্ত তসবীহ পাঠে মশগুল রহিয়াছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে কতকগুলি প্রেমের কবিতা পাঠ করিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি জাগিয়া গেলাম এবং কসম করিলাম যে, আমি রাত্রে আর কখনও ঘুমাইব না। বর্ণিত আছে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়াছেন। (নুযহাহ)

শায়েখ মাজহার সা'দী (রহঃ) একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার ইশ্‌ক ও মহব্বতে দীর্ঘ ষাট বছর কান্নাকাটি করিয়াছেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, খাঁটি মেশ্‌কে পরিপূর্ণ একটি নহর। উহার কিনারায় মুক্তার গাছগুলিতে স্বর্ণের শাখাসমূহ বাতাসে দুলিতেছে। সেখানে অল্প বয়সের কয়েকটি কিশোরী উচ্চস্বরে তাসবীহ পাঠে মগ্ন রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? উত্তরে তাহারা কবিতার দুইটি চরণ পাঠ করিল, যাহার অর্থ হইল—আমাদিগকে মানুষের মাবূদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরওয়ারদিগার ঐসব লোকের জন্য পয়দা করিয়াছেন, যাহারা রাত্রে আপন প্রতিপালকের সামনে নামাযে দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল থাকেন।

হযরত আবূ বকর যারীর (রহঃ) বলেন, আমার নিকট একজন নওজোয়ান গোলাম থাকিত। সারাদিন সে রোযা রাখিত এবং সারা রাত্র তাহাজ্জুদ নামায পড়িত। একদা আমার নিকট আসিয়া সে বলিল, ঘটনাক্রমে আজ রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, মেহরাবের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, উহা হইতে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই

কুৎসিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা আর এই কুৎসিত মেয়েলোকটিই বা কে? তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা হইলাম আপনার বিগত রাত্রিসমূহ আর এই মেয়েলোকটি হইল আপনার আজকের রাত্রি। (নুযহাহ)

জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রে আমার এত গভীর ঘুম আসিল যে, আমি ঘুম হইতে জাগিতে পারিলাম না। আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখিলাম। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার দেহ হইতে তীব্র সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল, উহাতে কবিতার তিনটি চরণ লিখা ছিল ঃ তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহকে ভুলিয়া গিয়াছ, যেখানে তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে, সেখানে কখনও মৃত্যু আসিবে না। তুমি ঘুম হইতে উঠ, তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হইতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হইতে যখনই আমার ঘুম আসে এই কবিতাগুলি স্মরণ হইয়া যায় এবং আমার ঘুম একেবারে দূর হইয়া যায়।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি এক বাজারে গেলাম, সেখানে একটি বাঁদী বিক্রয় হইতেছিল। বাঁদীটিকে পাগল বলা হইতেছিল। আমি সাত দীনার দিয়া তাহাকে খরিদ করিয়া আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। যখন রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল, তখন দেখিলাম, সে উঠিয়া ওযূ করিল এবং নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা এমন হইতেছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার দম বাহির হইয়া যাইবে। নামাযের পর সে মোনাজাত শুরু করিল এবং বলিতে লাগিল, হে আমার মাবুদ, তুমি আমাকে যে মহব্বত কর—সেই মহব্বতের কসম, তুমি আমার উপর রহম কর। আমি তাহাকে বলিলাম, এইরূপ বলিও না; বরং এরূপ বল যে, আমি তোমাকে যে মহব্বত করি—সেই মহব্বতের কসম। আমার এই কথা শুনিয়া সে রাগান্বিত হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন, তবে তোমাকে মধুর নিদ্রায় বিভোর করিয়া আমাকে এইভাবে নামাযে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। ইহা বলিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল এবং কয়েকটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করিল। যাহার অর্থ হইল ঃ অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমের জ্বালায় যে অস্থির সে কিভাবে স্থির হইতে

পারে? আয় আল্লাহ, যদি আনন্দদায়ক কিছু থাকে, তবে তাহা দান করিয়া আমার প্রতি দয়া কর। অতঃপর সে উচ্চস্বরে এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, তোমার সহিত আমার এই নিবিড় সম্পর্ক এতদিন গোপন ছিল ; কেহই তাহা জানিত না। এখন মানুষের মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে উঠাইয়া লও। এই কথা বলিয়া সজোরে সে একটি চীৎকার দিল এবং মরিয়া গেল।

এই ধরণেরই একটি ঘটনা হযরত সির্‌রী (রহঃ)এর সঙ্গেও ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, আমি আমার খেদমতের জন্য একটি বাঁদী খরিদ করিয়াছিলাম। নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া সে কিছুদিন আমার খেদমত করিতে থাকিল। নামাযের জন্য তাহার একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল ; যখনই সে কাজকর্ম হইতে অবসর হইয়া যাইত, তখন সে সেখানে যাইয়া নামাযে মশগুল হইয়া যাইত। এক রাত্রে আমি তাহাকে দেখিলাম— কিছুসময় সে নামায পড়ে আবার কিছু সময় মোনাজাতে মশগুল হইয়া থাকে। মোনাজাতে সে বলে যে, হে আল্লাহ, তোমার যে মহব্বত আমার সাথে রহিয়াছে, উহার ওসীলায় তুমি আমার অমুক অমুক কাজ করিয়া দাও। আমি তাহাকে উচ্চস্বরে বলিলাম, হে মহিলা, তুমি এইরূপ বল যে, তোমার সাথে আমার যে মহব্বত রহিয়াছে উহার ওসীলায়। এই কথা শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, হে মনিব, আমার প্রতি যদি তাহার মহব্বত না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে নামায হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে নামাযের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। সিররী (রহঃ) বলেন, যখন সকাল হইল তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি আমার খেদমতের উপযুক্ত নও ; তুমি শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদতের উপযুক্ত। অতঃপর কিছু সামানপত্র দিয়া আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

(নুযহাহ)

হযরত সির্‌রী সাক্‌তী (রহঃ) একজন স্ত্রীলোকের অবস্থান বর্ণনা করেন ঃ যখন সে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াইত, তখন বলিত, হে আল্লাহ, ইবলীসও তোমার বান্দা ; তাহার লাগাম তোমারই হাতে, সে আমাকে দেখে কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। তুমি তাহার সকল কাজের উপর ক্ষমতা রাখ, কিন্তু সে তোমার কোন কাজের উপর ক্ষমতা রাখে না। হে আল্লাহ, সে আমার কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে তুমি তাহা দূর করিয়া দাও, সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তুমি সেই চক্রান্তের প্রতিশোধ নাও। তাহার ক্ষতি হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং তোমারই সাহায্যে আমি তাহাকে বিতাড়িত করিতেছি। এই মোনাজাত

করিয়া সে কাঁদিতে থাকিত। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। লোকেরা তাহাকে বলিল, দেখ ; আল্লাহকে ভয় কর, তোমার দ্বিতীয় চক্ষুটিও না আবার নষ্ট হইয়া যায়। সে বলিল, আমার এই চক্ষু যদি জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম চক্ষু দান করিবেন, আর যদি ইহা দোযখের উপযুক্ত হয়, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়াই ভাল।

শায়খ আবূ আবদিল্লাহ জালা (রহঃ) বলেন, একদিন আমার আম্মা আমার আব্বাজানকে মাছ আনিতে বলিলেন। আব্বাজান আমাকে লইয়া বাজারে রওনা হইলেন। আমরা বাজার হইতে মাছ খরিদ করিলাম। মাছটি ঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা একজন কুলি তালাশ করিতেছিলাম। একজন নওজওয়ান ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ; সে বলিতে লাগিল, চাচাজান, মনে হয় মাছটি বহন করার জন্য আপনি কুলি তালাশ করিতেছেন? আব্বা বলিলেন, হাঁ। ছেলেটি মাছের বোঝা মাথায় উঠাইয়া আমাদের সাথে চলিতে লাগিল। পথে সে আযানের আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহর ডাক আসিয়া গিয়াছে, আমাকে ওযূও করিতে হইবে। আমি নামাযের পর পৌঁছাইয়া দিতে পারিব। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন—ইচ্ছা হয় অপেক্ষা করুন কিংবা আপনাদের মাছ আপনারা লইয়া যান। এই কথা বলিয়া সে মাছ রাখিয়া মসজিদে চলিয়া গেল। আমার আব্বা ভাবিলেন—এই গরীব ছেলেটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছে ; আমাদের তো আরও বেশী করা উচিত। ইহা ভাবিয়া মাছ রাখিয়া আমরাও মসজিদে চলিয়া গেলাম। নামাযের পর আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাছ সেইভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। ছেলেটি উহা মাথায় লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। ঘরে পৌঁছিয়া আব্বাজান এই আশ্চর্য ঘটনা আমার আম্মাকে শুনাইলেন। আম্মা বলিলেন, ছেলেটিকে মাছ খাওয়ার জন্য রাখিয়া দাও। তাহাকে এই কথা জানাইলে সে বলিল, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। আব্বাজান তাহাকে সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া ইফতার করিতে অনুরোধ করিলেন। সে বলিল, আমি একবার চলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আসি না। হাঁ ইহা হইতে পারে যে, আমি নিকটেই কোন মসজিদে অবস্থান করিব, সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াত খাইয়া চলিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া নিকটেই এক মসজিদে সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মাগরিবের পর সে আসিল এবং খানা খাইল। আমরা তাহাকে একটি নির্জন জায়গা দেখাইয়া দিলাম, সে সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমাদের পাশেই একজন পঙ্গু মহিলা

থাকিত। আমরা দেখিলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কিভাবে সুস্থ হইলে? সে বলিল, আমি এই মেহমানের ওসীলা দিয়া দোয়া করিয়াছি, হে আল্লাহ, আমাকে তাহার বরকতে সুস্থ করিয়া দিন। সাথে সাথে আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা তাহাকে দেখিবার জন্য সেই নির্জন স্থানটিতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি দরজা বন্ধ এবং ছেলেটির কোন চিহ্নও নাই।

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তাঁহার পায়ে একটি ফোঁড়া দেখা দিয়াছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিল—যদি পা কাটিয়া না ফেলা হয়, তবে তাহার জীবননাশের আশংকা রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মা বলিলেন, আপনারা এখন বিরত থাকুন ; যখন সে নামাযে দাঁড়াইবে তখন কাটিয়া নিবেন। সুতরাং এইরূপই করা হইল—তিনি মোটেও টের পাইলেন না।

আবূ আমের (রহঃ) বলেন, একদা আমি একটি খুব ক্ষীণ ও দুর্বল বাঁদীকে দেখিলাম—বাজারে খুব কম দামে বিক্রয় হইতেছে। তাহার পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। মাথার চুলও এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার খুবই দয়া হইল, তাই আমি তাহাকে খরিদ করিয়া নিলাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার সঙ্গে বাজারে চল, রমযানের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি বছরের সবগুলি মাস আমার জন্য একই রকম করিয়া দিয়াছেন। সে দিনভর রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত। যখন ঈদের দিন নিকটবর্তী হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আগামীকাল সকালে বাজারে যাইব তুমিও আমার সাথে যাইবে—ঈদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! আপনি তো দুনিয়াদারীতে খুবই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নামাযে মশগুল হইয়া গেল এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধীরস্থিরভাবে এক একটি আয়াত স্বাদ লইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে যখন এই আয়াতে পৌঁছিল ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ الاية অর্থাৎ জাহান্নামে পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করানো হইবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ১৬)

তখন সে এই আয়াতকে বারবার পড়িতে লাগিল এবং একটি বিকট চিৎকার দিয়া এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গেল।

একজন সৈয়দ সাহেবের ঘটনা আছে যে, বার দিন পর্যন্ত তিনি একই ওযূ দ্বারা সমস্ত নামায পড়িয়াছিলেন এবং একাধারে পনের বৎসর পর্যন্ত

তাহার শুইবার সুযোগ হয় নাই। একাধারে কয়েক দিন দিন এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, কোন কিছু মুখে দেওয়ারও সুযোগ হইত না।

যাহারা মোজাহাদা করিয়াছেন এমন লোকদের জীবনে এইরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায়। তাহাদের মত হওয়ার বাসনা খুবই কঠিন ব্যাপার—কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পয়দাই করিয়াছেন এইরূপ কাজের জন্য। কিন্তু যে সকল বুযুর্গানে-দ্বীন, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের মধ্যেই মশগুল থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহাদের মত হওয়ার বাসনাও আমাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সম্পর্কে সকলেই অবগত আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেই তাঁহার মর্তবা। তাঁহার বিবি বলেন, ওযূ-নামাযে মশগুল থাকে এমন বহু লোক পাওয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার চাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে এমন মানুষ আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। এশার নামাযের পর জায়নামাযে বসিয়া থাকিতেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল হইতেন। আর কাঁদিতে কাঁদিতে এই অবস্থাতেই এক সময় তন্দ্রা আসিত আর চোখ লাগিয়া যাইত। আবার যখন চোখ খুলিয়া যাইত তখনই পুনরায় দোয়া ও কান্নায় মশগুল হইয়া যাইতেন।

বর্ণিত আছে যে, খেলাফত লাভের পর হইতে তাঁহার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন বাদশাহ আবদুল মালেকের কন্যা। পিতা কন্যাকে অনেক অলংকার ও ধনরত্ন দিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া এইগুলির সঙ্গে একটি অতুলনীয় হীরকও দিয়াছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একদিন তাঁহার বিবিকে বলিলেন, দুইটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি তুমি গ্রহণ কর—তোমার এই সমুদয় অলংকার ও ধনরত্ন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়া দাও ; আমি উহা বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিব। অন্যথায় তুমি আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কর। কারণ, ধনরত্ন ও আমি এক ঘরে থাকিতে পারি না। বিবি আরজ করিলেন, এইসব ধনরত্ন একেবারেই নগণ্য ; ইহা হইতে আরও অনেক বেশী হইলেও আমি এইসবের বিনিময়ে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধনসম্পদ বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর আবদুল মালেকের পুত্র ইয়াযীদ বাদশাহ হইলেন। তিনি বোনকে বলিলেন, তুমি চাহিলে তোমার সমস্ত অলংকার ফেরত দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি উত্তরে

বলিলেন, আমার স্বামীর জীবনকালে এইসব অলংকার রাখিতে আমি রাজী হই নাই এখন তাঁহার মৃত্যুর পর এইগুলি দ্বারা আমি কি করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই রোগ সম্পর্কে কি ধারণা হয়? কেহ বলিল, লোকেরা ইহাকে যাদু মনে করিতেছে। তিনি বলিলেন, যাদু নয়। অতঃপর তিনি এক গোলামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের লোভে তুমি আমাকে বিষপান করাইয়াছ? সে বলিল, আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং আমার মুক্তির ওয়াদা করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আস। স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আসিলে তিনি সেইগুলি বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন। অতঃপর গোলামকে বলিলেন, তুমি এমন কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাও যেখানে তোমাকে কেহ দেখিতে না পায়।

মৃত্যুর সময় হযরত মাস্‌লামাহ (রহঃ) তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আর কেহ করে নাই—আপনার তেরজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, আমাকে একটু বসাও। বসিয়া বলিলেন, আমি তাহাদের কোন হক নষ্ট করি নাই এবং অন্যের হকও আমি তাহাদিগকে দেই নাই। তাহারা যদি নেককার হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালাই তাহাদের জিম্মাদার, যেমন আল্লাহ পাক কুরআনে বলিয়াছেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহই নেককার লোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৯৬)

আর যদি তাহারা গোনাহগার হয়, তবে তাহাদের ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নাই।

ফেকাহ-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সারাদিন মাসলা-মাসায়েলের চর্চায় মগ্ন থাকিতেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি রাত্র-দিনে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এক রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তিনি অতিমাত্রায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, নামাযে তেলাওয়াতের সময় এই আয়াত শরীফ আসিয়া গিয়াছিল ঃ

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ (সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৪৭)

পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জুলুমকারীদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থাকে, এমনকি সেই পরিমাণ আরও সম্পদও থাকে, তবে কিয়ামতের দিনের কঠিন আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সমস্ত সম্পদ ফিদিয়া স্বরূপ দিয়া দিতে চাহিবে। অতঃপর উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার (অর্থাৎ আজাব) উপস্থিত হইবে, যাহা তাহাদের কল্পনাতেও ছিল না এবং তখন তাহাদের মন্দকাজসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) মৃত্যুর সময়ও খুব ঘাবড়াইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, এই আয়াতকেই আমি ভয় করিতেছি।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। তিনি আল্লাহর সামনে এত অত্যধিক ক্রন্দন করিতেন যে, উহার কোন সীমা ছিল না। কেহ আরজ করিল, আপনার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি উত্তর করিলেন, চোখের দ্বারা যদি ক্রন্দনই না করিলাম তবে ইহার উপকারিতাই বা কি? তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কবরে যদি তুমি কাহাকেও নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে তাহা আমাকেও দিও। আবু সিনান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, ছাবেত বুনানী (রহঃ)কে যাহারা দাফন করিয়াছে তন্মধ্যে আমি একজন ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়িয়া গেল। দেখিতে পাইলাম তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমি সঙ্গীকে বলিলাম, দেখ কি হইতেছে! সে আমাকে চুপ করিতে বলিল। দাফনের পর আমরা ছাবেত বুনানী (রহঃ)এর বাড়ীতে গিয়া তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ছাবেত (রহঃ) কি আমল করিতেন? কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই প্রশ্ন কেন করিতেছ? আমরা কবরের সেই ঘটনা শুনাইলাম। অতঃপর কন্যা বলিল, পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এবং সকালবেলায় এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কাহাকেও যদি তুমি কবরে নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে আমাকেও দান করিও। (একামাতুল হুজ্জাহ্)

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততার কথা সকলেরই জানা আছে। ইহা ছাড়া সমগ্র ইসলামী খেলাফতের প্রধান বিচারপতি হিসাবেও তাঁহার ব্যস্ততা ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত মুহম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি এত বেশী একাগ্রতার সহিত নামায পড়িতেন যে, উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন। একবার নামাযের

ভিতর একটি ভীমরুল তাঁহার কপালে দংশন করার দরুন ক্ষতস্থান হইতে রক্তও বাহির হইল কিন্তু তিনি মোটেও নড়াচড়া করিলেন না এবং নামাযের মনোযোগের মধ্যেও সামান্যতম পার্থক্য দেখা দিল না। বর্ণিত আছে যে, নামাযের সময় তিনি কাঠের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

হযরত বাকী ইবনে মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বেতরের তের রাকাত নামাযে কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত হান্নাদ (রহঃ) মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার জনৈক শাগরেদ বর্ণনা করেন যে, তিনি খুব বেশী ক্রন্দন করিতেন। একদিন সকালবেলা তিনি আমাদিগকে ছবক পড়াইতে ছিলেন। ছবক হইতে উঠিয়া ওযূ ইত্যাদি হইতে ফারেগ হইয়া দুপুর পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। অতঃপর বাড়ীতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া যোহরের নামায পড়াইলেন অতঃপর আছরের নামায পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। তারপর আছরের নামায পড়াইলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিলেন। মাগরিবের পর আমি চলিয়া আসিলাম। তাঁহার এক প্রতিবেশীকে আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, ইনি কত বেশী এবাদত করিয়া থাকেন। প্রতিবেশী বলিল, সত্তর বৎসর যাবত তিনি এইভাবেই এবাদত করিয়া আসিতেছেন, যদি তুমি তাহার রাত্রের এবাদত দেখিতে তাহা হইলে আরও আশ্চর্যবোধ করিতে।

হযরত মাসরূক (রহঃ) একজন মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বর্ণনা করেন, তিনি নামাযে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন যে, সবসময় তাহার পা ফুলিয়া থাকিত। আমি পিছনে বসিয়া তাহার অবস্থার উপর দয়াপরবশ হইয়া কাঁদিতাম।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশা ও ফজরের নামায একই ওযূতে পড়িয়াছেন। হযরত আবুল মু'তামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এইরূপ করিয়াছেন। ইমাম গায্যালী (রহঃ) আবু তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চল্লিশজন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়িতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই আমল করিয়াছেন। (ইত্‌বাক)

হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা আছে যে, ত্রিশ বৎসর কিংবা চল্লিশ বৎসর কিংবা পঞ্চাশ বৎসর এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়িয়াছেন। বর্ণনার এই পার্থক্য বর্ণনাকারীদের জানার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। যিনি যত বৎসরের কথা জানিতে

পারিয়াছেন, তিনি তত বৎসর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময় ঘুমাইতেন এবং বলিতেন, হাদীস শরীফে দুপুরে ঘুমানোর হুকুম রহিয়াছে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযান মাসে নামাযে কুরআন শরীফ ষাট খতম করিতেন। এক বুযুর্গ বলেন, আমি কয়েকদিন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর ঘরে ছিলাম—তাঁহাকে দেখিয়াছি শুধু রাত্রে সামান্য সময় ঘুমাইতেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দৈনিক তিনশত রাকাত পড়িতেন। তৎকালীন বাদশাহর হুকুমে বেত্রাঘাতের পর দুর্বলতা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায় শেষ বয়সে দেড়শত রাকাত পড়িতেন। তখন বয়স প্রায় আশি বৎসর ছিল। আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সারারাত্র ক্রন্দন করিয়া কাটাইতেন এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখিতেন।

আল্লাহ পাকের তওফীকপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্পর্কে এইরূপ হাজারো লাখো ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে রহিয়াছে, লেখার গণ্ডিতে সেইগুলিকে আনা খুবই কঠিন। নমুনাস্বরূপ এই কয়েকটি ঘটনাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও মেহেরবাণীতে আমাকে এবং পাঠকগণকেও এই সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের কিছুমাত্র অনুসরণ করার তওফীক দান করুন—আমীন।

(١) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهٗ اِلَّا عُشْرُ صَلٰوتِهٖ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمْسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

نبیِ اکرم صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اُس کیلئے ثواب کا دسواں حصّہ لکھا جاتا ہے اسی طرح بعض کیلئے نواں حصّہ بعض کیلئے آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصّہ لکھا جاتا ہے۔

(رواه ابوداؤد وقال المنذری فی الترغیب رواه ابوداؤد والنسائی وابن حبان فی صحیحه بنحوه اه وعزاه فی الجامع الصغیر الی احمد وابی داؤد وابن حبان ورقم له بالصحیح وفی المنتخب عزاه الی احمد ایضًا وفی الدُّرِ المنثور اخرج احمد عن ابی الیسر مرفوعًا منکم من یصلی الصّلوة کاملة ومنکم من یصلی النصف والثلث والربع حتی بلغ العشر قال المنذری فی الترغیب رواه النّسائی باسناد حسن واسم ابی الیسر کعب بن عمرو السلمی شهد بدرًا اه)

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ নামায পড়িয়া শেষ করে আর তাহার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের একভাগ লেখা হয়, এমনিভাবে কাহারও জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, কাহারও জন্য আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ আর কাহারও জন্য অর্ধেক সওয়াব লেখা হয়। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে পরিমাণ মনোযোগ ও এখলাস হয়, সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি কেহ পুরা সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ পায় যদি সেই অনুযায়ী মনোযোগী হয়। আবার কেহ অর্ধেক সওয়াব পায়। এমনিভাবে কেহ দশ ভাগের এক ভাগ হইতেও কম কিংবা অর্ধেক হইতেও বেশী পায়। এমনকি কেহ আবার পুরা সওয়াব পাইয়া যায়। আবার কেহ মোটেই পায় না। কেননা তাহার নামায সেই উপযুক্ত হয় নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফরজ নামাযের জন্য আল্লাহর নিকট একটি পরিমাপ আছে, উহাতে যে পরিমাণ কমি হয়, তাহার হিসাব করা হয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম খুশু অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে। পুরা জামাতের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও খুশুর সহিত নামায আদায়কারী পাওয়া যাইবে না। (জামে সগীর)

(২) رُوِيَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاَسْبَغَ لَهَا وُضُوْئَهَا وَاَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُوْلُ حَفِظَكَ اللّٰهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْئَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وَلَا رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے وضو بھی اچھی طرح کرے خشوع وخضوع سے بھی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دُعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہٗ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تونے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بُری طرح پڑھے، وقت کو بھی

الله كما ضيعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه.

ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماردیجاتی ہے۔

رواه الطبراني في الاوسط كذا في الترغيب والدر المنثور وعزاه في المنتخب الى البيهقي في الشعب وفيه ايضًا برواية عبادة رض بمعناه وزاد في الاولى بعد قوله كما حفظتني ثم اصعد بها الى السماء ولها ضوء ونور ففتحت له ابواب السماء حتى ينتهي بها الى الله فتشفع لصاحبها وقال في الثانية وغلقت دونها ابواب السماء وعزاه في الدر الى البزار والطبراني وفي الجامع الصغير حديث عبادة الى الطيالسي وقال صحيح

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সময়মত নামায আদায় করে, উত্তমরূপে ওযূ করে, খুশু–খুযুর সহিত পড়ে, ধীর–স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়ায়, রুকু–সেজদাও উত্তমরূপে শান্তভাবে করে, মোটকথা নামাযের সবকিছু উত্তমরূপে আদায় করে, তাহার নামায উজ্জ্বল ও নূরানী হইয়া উপরে যায় এবং নামাযীকে দোয়া দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এরূপ হেফাজত করুন, যেইরূপ তুমি আমার হেফাজত করিয়াছ। অপরদিকে, যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় করে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে না, ওযূও ভালরূপে করে না, রুকু–সেজদাও ঠিকমত করে না, তাহার নামায বিশ্রী ও কালো হইয়া বদ–দোয়া দিতে দিতে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এরূপ ধ্বংস করুন, যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ। অতঃপর সেই নামাযকে পুরানো কাপড়ের মত পেঁচাইয়া নামাযীর মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয়।

(তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যাহারা উত্তমরূপে নামায আদায় করে—যদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাহার জন্য দোয়া করে। কিন্তু সাধারণতঃ যেভাবে নামায পড়া হয় যেমন রুকু হইতে সোজা সেজদায় চলিয়া গেল, প্রথম সেজদা হইতে সোজা হইয়া না বসিয়া মাথা তুলিয়াই কাকের মত আরেক ঠোকর মারিয়া দিল। এইরূপ নামাযের যে কি পরিণতি, তাহা তো হাদীস শরীফে বলাই হইয়াছে। তদপুরি ঐ

নামায যখন বদ-দোয়া করে তখন নিজের ধ্বংসের অভিযোগ করিয়া লাভ কি? এই কারণেই আজ মুসলমান অধঃপতনের দিকে যাইতেছে, চারিদিকে শুধু ধ্বংসের আওয়াজই প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অন্য এক হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, যে নামায খুশু-খুজুর সহিত পড়া হয়, উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায়। উহা অত্যন্ত নূরানী হয় এবং নামাযীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে নামাযে কোমর ঝুকাইয়া উত্তমরূপে রুকু আদায় করা হয় না, উহার উদাহরণ হইল ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মত যাহার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে গর্ভপাত হইয়া যায়। (তারগীব) এক হাদীস শরীফে এরশাদ হইয়াছে, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদের রোযা দ্বারা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না। এমনিভাবে অনেক রাত্রি জাগরণকারী শুধু জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসমূহ এরূপ লইয়া আসিবে, যাহাতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, উত্তমরূপে ওযূ করা হইয়াছে এবং খুশু-খুজুর সহিত পড়া হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে আজাব দেওয়া হইবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ নামায লইয়া আসিবে না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই—ইচ্ছা করিলে তিনি নিজ রহমত গুণে মাফ করিয়া দিবেন অথবা আজাব দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি জান আল্লাহ পাক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) উত্তর করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। অধিক গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করিলেন এবং সাহাবীগণ একই উত্তর দিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছেন, যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল নামায পড়িতে থাকিবে, আমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি ইহা করিবে না ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করিব, না হয় আজাব দিব।

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ قَالَ الرَّبُّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائیگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشادِ خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دیجائیگی اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔

(رواه الترمذی وحسنه النسائی وابن ماجة والحاكم وصححه كذا فی الدر وفی المنتخب برواية الحاكم فی الكنی عن ابن عمر اوّل ما افترض الله على امّتی الصلوات الخمس واوّل ما يرفع من اعمالهم الصلوات الخمس الحديث بطوله بمعنی حديث الباب وفيه ذكر الصيام والزكوٰة نحو الصلوٰة وفی الدر اخرج ابويعلى عن انس رفعه اوّل ما افترض الله على الناس من دينهم الصّلوٰة واٰخر ما يبقى الصلوٰة واوّل ما يحاسب به الصّلوٰة يقول الله انظروا فی صلوٰة عبدی فان كانت تامة كتبت تامة وان كانت ناقصة قال انظروا هل له من تطوع الحديث فيه ذكر الزكوٰة والصدقة وفيه ايضا اخرج ابن ماجة والحاكم عن تميم الدارى مرفوعًا اوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلوته الحديث وفی اٰخره ثم الزكوٰة مثل ذٰلك ثم توخذ الاعمال حسب ذٰلك وعزاه السيوطی فی الجامع الى احمد والى داؤد والحاكم وابن ماجة ورقم له بالصحيح)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি তাহার নামায ঠিক হয়, তবে সে কামিয়াব ও

সফলকাম হইবে। আর যদি তাহার নামায ঠিক না হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি তাহার ফরজ নামাযে কিছু ঘাটতি দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ তায়ালা বলিবেন, দেখ, এই বান্দার কিছু নফল আছে কিনা, যাহা দ্বারা তাহার ফরজের ঘাটতি পূরণ করা যাইতে পারে। যদি পাওয়া যায়, তবে উহা দ্বারা তাহার ফরজ পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বান্দার রোযা, যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য আমলের হিসাব লওয়া হইবে।

(দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেকের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নফলের পুঁজিও রাখা উচিত। যাহাতে ফরজের মধ্যে কোন ঘাটতি হইলে নফলের দ্বারা সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকে, আরে ভাই আমাদের দ্বারা শুধু ফরজ পুরা হইয়া গেলেই যথেষ্ট ; নফল পড়া তো বুযুর্গদের কাজ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ফরজই যদি পুরাপুরি আদায় হইয়া যায় তবে তো যথেষ্ট হইবে কিন্তু উহা পুরাপুরি আদায় হওয়া কি সহজ কাজ। যখন কম–বেশী ভুল–ত্রুটি হইয়াই থাকে তখন উহা পুরা করিবার জন্য নফল ছাড়া উপায় নাই।

অন্য এক হাদীসে আরও বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম সমস্ত আমলের মধ্যে নামাযকেই পেশ করা হয় এবং কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। যদি ফরজ নামাযে কিছুটা কমি দেখা যায়, তবে নফল দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর একইভাবে রোযার হিসাব লওয়া হইবে—ফরজ রোযার মধ্যে যেসব কমি পাওয়া যাইবে নফল রোযার দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর যাকাতের হিসাবও একইভাবে লওয়া হইবে। এই সমস্ত আমলের সহিত নফল যোগ করিবার পর যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে সে আনন্দচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্যথায় তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত ছিল যে, কেহ নতুন মুসলমান হইলে সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন।

(৪) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ فَاِنْ صَلُحَتْ

نبیِ اکرم صَلَّی اللّٰہ عَلَیہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ قیامت
میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا
اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی
پورے اُتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو

صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهٖ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهٖ۔ باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ مہتم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کرسکتا ہے اور جو اس کو ضائع کردے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کردے گا۔

(رواہ الطبرانی فی الاوسط ولا باس باسنادہ انشاء اللہ کذا فی الترغیب وفی المنتخب بروایۃ الطبرانی فی الاوسط وایضًا عن انس بلفظہ وفی الترغیب عن ابی ھریرۃ رفعہ الصلوٰۃ ثلثۃ اثلاث الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث فمن اداھا بحقہا قبلت منہ وقبل منہ سائر عملہ ومن ردت علیہ صلوتہ رد علیہ سائر عملہ رواہ البزار وقال لا نعلمہ مرفوعًا الا من حدیث المغیرۃ بن مسلم قال الحافظ واسنادہ حسن اہ واخرج مالک فی الموطا ان عمر بن الخطاب کتب الی عمالہ ان اھم امورکم عندی الصلوٰۃ من حفظہا اوحافظ علیہا حفظ دینہ ومن ضیعہا فھو لما سواھا اضیع کذا فی الدر)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি উহা উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ বলিয়া গণ্য হইবে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যুগে সব এলাকার শাসনকর্তাদের নামে একটি ফরমান পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার নিকট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায। যে ব্যক্তি উহার হেফাজত এবং এহতেমাম করিবে, সে দ্বীনের অন্যান্য কাজেরও এহতেমাম করিতে পারিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযকে ধ্বংস করিবে সে দ্বীনের অন্যান্য কাজকে আরও বেশী ধ্বংস করিবে। (দুররে মানসূর ঃ মুআত্তা মালেক)

ফায়দা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ঘোষণার উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ ইহাই, যাহা অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাবন্দীর সহিত উত্তমরূপে নামায আদায় করিতে

থাকে—কেননা ভয়ের কারণে তাহার সাহস হয় না। কিন্তু যখনই সে নামাযকে নষ্ট করিয়া দেয় তখন শয়তানের সাহস অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাহার মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে গোমরাহ করার আকাঙ্ক্ষা পয়দা হইয়া যায়। অতঃপর শয়তান ঐ ব্যক্তিকে বহু ধ্বংসাত্মক কাজে এবং বড় বড় গোনাহে লিপ্ত করিয়া দেয়। (মোন্তাখাবে কান্‌য্) বস্তুতঃ ইহাই আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদের উদ্দেশ্য ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জতা ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।' ইহার বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে।

(৫) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً اَلَّذِىْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرلے. صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ نماز میں سے کسطرح چوری کرے گا. ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے.

(رواہ الدارمی وفی الترغیب رواہ احمد والطبرانی وابن خزیمۃ فی صحیحہ وقال صحیح الاسناد اہ وفی المقاصد الحسنۃ حدیث ان اسوء الناس سرقۃ رواہ احمد والدارمی فی مسندیہما من حدیث الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن یحیٰی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ مرفوعًا وفی لفظ بحذف ان وصححہ ابن خزیمۃ والحاکم وقال انہ علی شرطہما ولم یخرجاہ لروایۃ کاتب الاوزاعی لہ عنہ عن یحیٰی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ورواہ احمد ایضًا و الطیالسی فی مسندیہما من حدیث علی بن زید عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری بہ مرفوعا وروایۃ ابی ہریرۃ عند ابن منیع وفی الباب عن عبد اللہ بن مغفل وعن النعمان بن مرۃ عند مالک مرسلا فی اٰخرین اہ وقال المنذری فی الترغیب لحدیث ابن مغفل رواہ الطبرانی فی معاجمہ الثلثۃ باسناد جید وقال لحدیث ابی ہریرۃ رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وقال صحیح الاسناد قلت وحدیث ابی قتادۃ وابی سعید ذکرہما السیوطی فی الجامع الصغیر ورقم بالصحیح)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যেও চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করিবে? এরশাদ ফরমাইলেন, অর্থাৎ উহার রুকু–সেজদা ঠিকমত আদায় করে না।(দারিমী, তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ চুরি কাজটাই চরম ঘৃণার কাজ, চোরকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে। আবার চুরির মধ্যেও নামাযে রুকু–সেজদা ঠিকমত আদায় না করাকে নিকৃষ্টতম চুরি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এখন দুনিয়া হইতে এলেম উঠিয়া যাওয়ার সময় হইয়াছে। সাহাবী হযরত যিয়াদ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এলেম দুনিয়া হইতে কিভাবে উঠিয়া যাইবে, আমরা তো কুরআন পড়িতেছি এবং নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াইতেছি (তাহারা আবার নিজেদের সন্তানদেরকে পড়াইবে—এইভাবে ক্রমাগত চলিতে থাকিবে)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তো তোমাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করিতাম, খৃষ্টান ও ইহুদীরাও তো তৌরাত এবং ইঞ্জীল পড়ে ও পড়ায়, কিন্তু ইহা তাহাদের কি কাজে আসিয়াছে। আবু দারদা (রাযিঃ)এর এক শাগরেদ বলেন, আমি অন্য একজন সাহাবী হযরত আবু উবাদা (রাযিঃ)এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আবু দারদা সত্য বলিয়াছেন। আমি কি তোমাকে বলিব সর্বপ্রথম দুনিয়া হইতে কোন্ জিনিস উঠিয়া যাইবে? সর্বপ্রথম নামাযের খুশু উঠিয়া যাইবে। তুমি মসজিদ ভরা লোকদের মধ্যে একজনকেও খুশুর সহিত নামায পড়িতে দেখিবে না। হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) যাহাকে হুযূর (সাঃ)এর রহস্যবিদ বলা হয়, তিনিও বলেন যে, সর্বপ্রথম নামাযের খুশু উঠাইয়া লওয়া হইবে। অপর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না যাহাতে রুকু–সেজদা সুন্দরভাবে করা হয় না। এক হাদীসে আছে, মানুষ ষাট বৎসর যাবৎ নামায পড়ে তবু তাহার একটি নামাযও কবুল হয় না। কেননা কখনও রুকু ঠিকমত করিল তো সেজদা ঠিকমত করিল না কিংবা কখনও সেজদা ঠিকমত করিল তো রুকু ঠিকমত করিল না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) তাঁহার 'মাকতুবাতে' নামাযের উপর খুবই জোর দিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি পত্রে নামাযের বিভিন্ন

বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, সেজদায় হাতের অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা এবং রুকুর মধ্যে পৃথক রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়াও জরুরী। কারণ, অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা ও পৃথক রাখার হুকুম শরীয়তে অযথা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ সাধারণ আদবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা জরুরী। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন, নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা, রুকু অবস্থায় পায়ের উপর, সেজদা অবস্থায় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় হাতের উপর দৃষ্টি রাখা নামাযের মধ্যে খুশু পয়দা করে এবং উহার দ্বারা নামাযে একাগ্রতা হাসিল হয়। এইসব সাধারণ আদব ও মুস্তাহাবের উপর আমল করিলে যদি এত বড় উপকার হয়, তবে বড় বড় আদব ও সুন্নতের উপর আমল করিলে যে কত বড় উপকার হইবে, তাহা তুমিই বুঝিয়া দেখ।

(٦) عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ وَالِدَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ رَآنِىْ اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ اَتَمَيَّلُ فِىْ صَلٰوتِىْ فَزَجَرَنِىْ زَجْرَةً كِدْتُ اَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوتِىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكُنْ اَطْرَافَهُ لَايَتَمَيَّلُ تَمَيُّلَ الْيَهُوْدِ فَاِنَّ سُكُوْنَ الْاَطْرَافِ فِى الصَّلٰوةِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ۔

حضرت عائشہؓ کی والدہ اُمِّ رُومانؓ فرماتی ہیں کہ میں ایکمرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں اِدھر اُدھر جھکنے لگی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں (ڈر کی وجہ سے) نماز توڑنے کے قریب ہوگئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضورؐ سے سُنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونیکا جزو ہے۔

(اخرجه الحكيم الترمذى من طريق القاسم بن محمّد عن اسماء بنت ابى بكر عن اُمّ رومان كذا فى الدر وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير الى ابى نعيم فى الحلية وابن عدى فى الكامل ورقم له بالضعف وذكر ايضاً برواية ابن عساكر عن ابى بكرؓ من تمام الصلوٰة سكون الاطراف)

(৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে রোমান (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার নামায পড়িতেছিলাম এবং নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক ঝুঁকিতেছিলাম। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আমাকে এমন জোরে ধমক দিলেন যে, ভয়ে আমি নামায ছাড়িয়া দেওয়ার উপক্রম হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন

সমস্ত শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থির রাখে ; ইহুদীদের মত হেলিয়া দুলিয়া নামায না পড়ে। কেননা, শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা নামায পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ। (দুররে মানসূর ঃ হাকিম-তিরমিযী)

ফায়দা ঃ নামাযের মধ্যে স্থির থাকার তাকিদ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ওহী বহনকারী ফেরেশতার অপেক্ষায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে তাকাইতেন। কোন জিনিসের অপেক্ষায় থাকিলে সেদিকে চোখ লাগিয়াই থাকে ; এইজন্য কখনও নামাযের মধ্যেও নজর উপরে উঠিয়া যাইত। পরবর্তীতে যখন

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (সূরা মমিনূন, আয়াত ১-২ঃ) আয়াত নাযিল হইল তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি নীচের দিকে থাকিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম প্রথম তাঁহারাও এদিক সেদিক দেখিতেন। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁহারা আর কোনদিকে দেখিতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহারা অন্য কোন দিকে নজর করিতেন না ; আপাদমস্তক নামাযের প্রতিই মনোযোগী হইয়া থাকিতেন। নিজেদের দৃষ্টিকে সেজদার জায়গায় রাখিতেন এবং ইহা মনে করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দেখিতেছেন।

হযরত আলী (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, খুশু কি জিনিস? তিনি বলিলেন, খুশু অন্তরে থাকে (অর্থাৎ অন্তর দ্বারা নামাযে মনোযোগী হওয়ার নামই খুশু) এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করাও খুশুর মধ্যে শামিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রকৃত খুশু করনেওয়ালা তাঁহারাই যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নামাযে স্থির থাকে। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, নেফাকের খুশু হইতে তোমরা আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেফাকের খুশু কি, এরশাদ করিলেন, বাহিরে স্থির শান্তভাব অথচ অন্তরে মুনাফেকী।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)ও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যাহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নেফাকের খুশু হইল, বাহিরে খুব মনোযোগী বলিয়া মনে হয় কিন্তু অন্তরে কোন মনোযোগ নাই। হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন,

আল্লাহর ভয় এবং দৃষ্টি নীচের দিকে রাখার নামই হইল অন্তরের খুশু।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দাড়িতে হাত বুলাইতে দেখিয়া বলিলেন, যদি এই লোকের অন্তরে খুশু থাকিত তবে সমস্ত অঙ্গ স্থির থাকিত। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে এদিক সেদিক তাকানো কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, ইহা হইল নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছোঁ মারিয়া নেওয়া। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা নামাযের ভিতর উপরের দিকে দেখে তাহারা যেন এই কাজ হইতে বিরত থাকে, নতুবা তাহাদের দৃষ্টি উপরেই থাকিয়া যাইবে। (দুররে মানসূর) অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী হইতে বর্ণিত আছে, শান্ত থাকার নামই খুশু। অর্থাৎ অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে নামায পড়া চাই।

বিভিন্ন হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা নামায এমনভাবে পড় যেন ইহাই তোমার আখেরী নামায, ঐ ব্যক্তির মত নামায পড় যে মনে করে যে, এই নামাযের পর আমার আর নামায পড়ার সুযোগই হইবে না। (জামে সগীর)

(৭) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍؓ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَقَالَ مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ۔ (اخرجه ابن ابى حاتم وابن مردويه كذا فى الدر المنثور)

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى الخ (بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے) کے متعلق دریافت کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তির নামায এইরূপ না হয় এবং তাহাকে ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে না উহা নামাযই নহে। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে আবি হাতেম)

ফায়দা ঃ নিঃসন্দেহে নামায এমনই এক বড় দৌলত যে, উহাকে

সঠিকভাবে আদায় করার ফল ইহাই যে, উহা অসঙ্গত কাজ হইতে বিরত রাখে। যদি বিরত না রাখে তবে বুঝিতে হইবে নামায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে—এই বিষয়টি বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নামাযের মধ্যে গুনাহ্ হইতে বাধা দেওয়ার ও সরানোর শক্তি রহিয়াছে।

হযরত আবুল আলিয়াহ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার এরশাদ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى –এর উদ্দেশ্য হইল, নামাযের মধ্যে তিনটি জিনিস রহিয়াছে—এখলাস, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর যিকির, যে নামাযের মধ্যে এই তিনটি জিনিস নাই, উহা নামাযই নয়। এখলাস নেককাজের হুকুম করে, আল্লাহর ভয় অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আর আল্লাহর যিকির হইল কুরআন পাক যাহা স্বয়ং নেক কাজের হুকুম করে এবং অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যে নামায অন্যায় ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত না রাখে, সেই নামায আল্লাহর নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করে। হযরত হাসান (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল করেন যে, যে ব্যক্তির নামায তাহাকে মন্দকাজ হইতে বিরত না রাখে উহা নামাযই নহে ; বরং ঐ নামায দ্বারা আল্লাহ হইতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাযের হুকুম মান্য করিল না তাহার নামাযই বা কি? নামাযের হুকুম মান্য করার অর্থ হইল, ফাহেশা ও মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামায পড়িতে থাকে কিন্তু সকাল হইতে চুরি করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতি শীঘ্রই তাহার নামায তাহাকে এই মন্দ কাজ হইতে ফিরাইয়া দিবে। (দুররে মানসূর) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে তবে তাহার গুরুত্ব সহকারে নামাযে মগ্ন হওয়া উচিত, তাহা হইলে খারাপ কাজ বা মন্দ অভ্যাসগুলি আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে। একটি একটি করিয়া মন্দ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করা যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ ; কিন্তু গুরুত্ব সহকারে নামাযে মগ্ন হওয়া যেমন সহজ

তেমনি সময়সাপেক্ষও নহে, উহার বরকতে মন্দ অভ্যাসগুলি তাহার মধ্য হইতে আপনা-আপনিই দূর হইয়া যাইতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও সুন্দরভাবে নামায পড়ার তওফীক দান করুন।

(৮) عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ۔ اخرجه ابن ابی شیبة ومسلم والترمذی وابن ماجة کذا فی الدر المنثور وفیه ایضا عَنْ مُجَاھِدٍ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی وَقُوْمُوْا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ قَالَ مِنَ الْقُنُوْتِ الرُّکُوْعُ وَالْخُشُوْعُ وَ طُوْلُ الرُّکُوْعِ یَعْنِیْ طُوْلَ الْقِیَامِ وَ غَضُّ الْبَصَرِ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ وَالرَّھْبَۃُ لِلّٰہِ وَکَانَ الْفُقَھَاءُ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُھُمْ فِی الصَّلٰوۃِ یَھَابُ الرَّحْمٰنَ سُبْحَانَہٗ وَ تَعَالٰی اَنْ یَّلْتَفِتَ اَوْ یُقَلِّبَ الْحَصٰی اَوْ یَشُدَّ بَصَرَہٗ اَوْ یَعْبَثَ بِشَیْءٍ اَوْ یُحَدِّثَ نَفْسَہٗ بِشَیْءٍ مِّنْ اَمْرِ الدُّنْیَا اِلَّا نَاسِیًا حَتّٰی یَنْصَرِفَ ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں. مجاھد کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہٗ کے ارشاد قُوْمُوْا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ (اور نماز میں) کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب، اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی اور لمبی رکعت ہونا بھی اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا (یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا) اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے (عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں) یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے. ہاں بھول کے خیال آگیا ہو تو دوسری بات ہے.

(اخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن حاتم والاصبهانی فی الترغیب والبیهقی فی شعب الایمان اه وهذا آخر ما اردت ایراده فی هذه العجالة رعایة لعدد الاربعین والله ولی التوفیق وقد وقع الفراغ منه لیلة الترویة من سنة سبع وخمسین بعد الالف وثلث مائة والحمد لله اولا واخرا)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ নামায উত্তম, যাহাতে রাকাতসমূহ দীর্ঘ হয়। (দুররে মানসূর, মুসলিম)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ قُوْمُوْا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ

অর্থাৎ (এবং নামাযে) 'আল্লাহর সম্মুখে আদবের সহিত দাঁড়াইয়া থাক' এই আয়াতের মধ্যে খুশুর সহিত নামায পড়া, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, দৃষ্টি অবনত রাখা, বাহুদ্বয় ঝুকাইয়া রাখা (অর্থাৎ দর্পভরে না দাঁড়ানো) এবং আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি সবই শামিল রহিয়াছে। কেননা উল্লেখিত আয়াতে আদেশকৃত 'কুনূত' শব্দের মধ্যে এই সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন এদিক সেদিক দৃষ্টি করা বা সেজদায় যাওয়ার সময় কংকর উলট-পালট করা (আরব দেশে কাতারের জায়গায় কংকর বিছানো হইত) বা বেহুদা কোন কিছুতে মশগুল হওয়া বা অন্তরে দুনিয়াবী কোন চিন্তা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা আল্লাহকে ভয় করিতেন। হাঁ, ভুলবশতঃ কোন খেয়াল আসিয়া পড়িলে তাহা ভিন্ন কথা।

(তারগীব ঃ সাঈদ ইবনে মানসূর)

ফায়দা ঃ قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ আয়াতের বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত হইয়াছে—এক তফসীর মতে ইহার অর্থ চুপ-চাপ থাকা। ইসলামের শুরু যমানায় নামাযের মধ্যে কথা বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া ইত্যাদি জায়েয ছিল। কিন্তু যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন হইতে নামাযে কথা বলা নাজায়েয হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহার অভ্যাস করাইয়া ছিলেন যে, যখনই আমি উপস্থিত হইতাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিলেও তাঁহাকে সালাম করিতাম আর তিনি উহার জওয়াব প্রদান করিতেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল ছিলেন, আমি উপস্থিত হইয়া অভ্যাস অনুযায়ী তাঁহাকে সালাম দিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন না। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, হয়ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার সম্পর্কে কোন অসন্তুষ্টি নাযিল হইয়াছে। নতুন ও পুরাতন চিন্তাসমূহ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পুরানা কথাসমূহ চিন্তা করিতেছিলাম যে, হয়তঃ অমুক কথার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি নারাজ হইয়াছেন কিংবা অমুক কাজের দরুন তিনি নারাজ হইয়াছেন। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হুকুমসমূহের মধ্যে যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন ঘটান—তিনি নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। আরও এরশাদ করিলেন যে, নামাযের মধ্যে আল্লাহর যিকির,

তাসবীহ এবং তাঁহার হামদ-সানা ব্যতীত কোনপ্রকার কথা বলা জায়েয নয়।

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রাযিঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের জন্য যখন আমি মদীনা শরীফে হাজির হই তখন আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, কেহ হাঁচি দিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলিলে উহার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিতে হয়। যেহেতু নতুন শিক্ষা ছিল, কাজেই তখনও জানা ছিল না যে, নামাযের মধ্যে ইহা বলা যায় না। এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে আমি উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলাম। আশে-পাশের লোকেরা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে চোখ বড় করিয়া তাকাইল। আমার তখনও জানা ছিল না যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা যায় না। তাই আমি বলিয়া উঠিলাম, হায় আফসোস! তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমার দিকে চোখ বড় করিয়া তাকাইতেছ? তাহারা ইশারা করিয়া আমাকে চুপ করাইয়া দিল। আমার কিছুই বুঝে আসিল না তবু আমি চুপ হইয়া গেলাম।

নামায শেষ হইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হউন) আমাকে না মারিলেন, না ধমক দিলেন, না কোনরূপ কটু কথা বলিলেন, বরং এইটুকু বলিলেন যে, নামাযের ভিতর কথা বলা জায়েয নয়—নামায শুধু তসবীহ, তকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াতেরই স্থান। আল্লাহর কসম! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত স্নেহশীল উস্তাদ আমি ইতিপূর্বেও কখনও দেখি নাই এবং পরেও দেখি নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক তফসীর মতে 'কানিতীন'-এর অর্থ হইল 'খাশিয়ীন' অর্থাৎ খুশুর সহিত নামায আদায়কারী। এই তফসীর অনুযায়ীই হযরত মুজাহিদের বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, খুশু-খুজুর সহিত নামায পড়া, দৃষ্টি নীচের দিকে রাখা, আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি বিষয়ও খুশুর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রথম প্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে নামাযে দাঁড়াইতেন তখন ঘুমের ঘোরে নামাযের মধ্যে যাহাতে পড়িয়া না যান, সেইজন্য নিজেকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া লইতেন। ইহার'ই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ঃ

طٰهٰ ۚ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব! আপনি (এইরূপ) অতি মাত্রায় কষ্ট করিবেন এই জন্য আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করি নাই।

(সূরা ত্বহা, আয়াত ঃ ১-২)

আর এই বিষয়টি তো কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত লম্বা লম্বা রাকাত পড়িতেন যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। যদিও আমাদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের কারণে তিনি এরশাদ করিয়াছেন যে, যতটুকু তোমরা বরদাশত করিতে পার ততটুকুই মেহনত কর ; এমন যেন না হয় যে, ক্ষমতার বাহিরে মেহনত করার কারণে সবই থাকিয়া যায়। একজন মহিলা সাহাবী এইভাবে নিজেকে রশিতে বাঁধিয়া নামায পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, সহ্য-ক্ষমতার ভিতরে নামায যত বেশী দীর্ঘ করা হইবে ততই উহা উত্তম ও উৎকৃষ্ট হইবে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পা মোবারক ফুলিয়া যাওয়ার মত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন উহার পিছনে কোন রহস্য তো অবশ্যই আছে। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাত্হের মধ্যে আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন, তবুও আপনি এত কষ্ট করিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইতেন, তবে আমি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা কেন হইব না?

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়িতেন, তখন তাঁহার সীনা মোবারক হইতে যাঁতাকলের আওয়াজের ন্যায় অবিরাম ক্রন্দনের আওয়াজ (শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার কারণে) বাহির হইত। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফুটন্ত ডেগচীর ন্যায় আওয়াজ বাহির হইত। (তারগীব)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি গাছের নীচে সারারাত্রি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে এবং ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। আরও বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কতিপয় লোকের উপর খুবই খুশী হন। তাহাদের মধ্যে একজন হইল ঐ ব্যক্তি, যে শীতের রাত্রে নরম বিছানায় লেপ জড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রী শুইয়া আছে তথাপি সে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে ও নামাযে মশগুল হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর খুবই খুশী হন ও আশ্চর্য প্রকাশ করেন। আলেমুল-গায়েব হওয়া

সত্ত্বেও গর্ব করিয়া তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার জন্য এই বান্দাকে কোন্ জিনিসে বাধ্য করিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আপনার দয়া ও দানের আশা এবং আপনার শাস্তির ভয়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে আমার কাছে যে জিনিসের আশা করিয়াছে তাহা আমি দান করিলাম এবং যে জিনিসের ভয় করিয়াছে উহা হইতে নিরাপত্তা দিলাম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দার জন্য ইহা হইতে উত্তম পুরস্কার আর নাই যে, তাহাকে দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক দিলেন।

কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকেন। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরেশতাদের এক জামাত কিয়ামত পর্যন্ত রুকুতেই মশগুল থাকিবে, তদ্রূপ এক জামাত সর্বদা সেজদায় মশগুল থাকে, আরেক জামাত সর্বদা দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে এইভাবে বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন যে, ফেরেশতাদের সব এবাদতের সমষ্টি তাহাকে দুই রাকাত নামাযের মধ্যে দান করিয়াছেন। এই সবকিছুই দুই রাকাতের মধ্যে রহিয়াছে, যাহাতে ফেরেশতাদের সব এবাদত হইতে সে অংশ পায়। তদুপরি নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তাহাদের এবাদত হইতে অতিরিক্ত দান করিয়াছেন। সুতরাং ফেরেশতাদের এবাদতের সমষ্টি দ্বারা তখনই প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যাইবে, যখন তাহা ফেরেশতাদের ছিফাত ও গুণাবলীর সহিত আদায় করা হইবে। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামাযের জন্য নিজ কোমর ও পেটকে হালকা রাখ। কোমর হালকা রাখার অর্থ হইল, নিজেকে দুনিয়ার ঝামেলায় বেশী জড়াইও না আর পেট হালকা রাখার অর্থ হইল, পেট ভরিয়া খাইও না। কারণ ইহা দ্বারা অলসতা পয়দা হয়। (জামে সগীর)

সুফীয়ায়ে কেরাম বলেন, নামাযের মধ্যে বার হাজার বিষয় রহিয়াছে, এই সবগুলিকে আল্লাহ তায়ালা বারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নামাযকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য এই বারটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা একান্ত জরুরী। বারটি বিষয় হইল ঃ

(১) এলেম ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এলেমের সহিত অল্প আমল ও মূর্খতার সহিত অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। (২) ওযূ (৩) পোশাক (৪) নামাযের ওয়াক্ত (৫) কেবলামুখী হওয়া (৬) নিয়ত (৭) তকবীরে তাহরীমা (৮) দাঁড়াইয়া নামায

পড়া (৯) কুরআন শরীফ পড়া (১০) রুকু করা (১১) সেজদা করা (১২) আত্তাহিয়্যাতু পাঠে বসা। এই বারটি জিনিসের পূর্ণতা আসিবে এখলাসের মাধ্যমে।

এই বারটি বিষয়ের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া অংশ আছে। এলেমের তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) ফরজ এবং সুন্নতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া জানা (২) ওযূ এবং নামাযে কয়টি ফরজ আর কয়টি সুন্নত সেইগুলি জানা (৩) শয়তান কোন্ কোন্ উপায়ে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা জানা।

ওযূতে তিনটি অংশ হইতেছে ঃ (১) বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে পাক করা হয় তদ্রূপ অন্তরকেও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পাক করা। (২) বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ হইতে পাক রাখা (৩) ওযূ করার সময় প্রয়োজনের চাইতে কম বা বেশী পানি খরচ না করা।

পোশাকের তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) হালাল উপার্জন দ্বারা হওয়া (২) পাক হওয়া (৩) সুন্নত মুতাবেক হওয়া অর্থাৎ টাখনু ইত্যাদি যেন ঢাকা না পড়ে, গর্ব ও অহংকারের জন্য পরিধান না করা হয়।

অতঃপর ওয়াক্তের ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী ঃ

(১) সঠিক সময় জানার জন্য সূর্য, তারকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাহাতে সঠিক সময় জানা যায়। (বর্তমানে ঘড়ির সাহায্যে এই কাজ করা সম্ভব হইতেছে) (২) আযানের খবর রাখা (৩) সর্বদা নামাযের প্রতি মনে খেয়াল রাখা। যেন বেখেয়ালীতে নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া না যায়।

কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা ঃ

(১) শরীরকে কেবলার দিকে রাখা (২) অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করা, কেননা অন্তরের কা'বা আল্লাহ্ তায়ালাই (৩) মালিক ও মনিবের সম্মুখে যেরূপ আপাদমস্তক নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত থাকিতে হয়, সেইরূপ থাকা।

নিয়তও তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল ঃ

(১) কোন্ ওয়াক্তের নামায পড়িতেছে উহা ঠিক করা (২) এই ধ্যান করা যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়াছি ; তিনি আমাকে দেখিতেছেন (৩) এই ধ্যান করা যে, আল্লাহ্ তায়ালা অন্তরের অবস্থাও দেখেন।

তকবীরে তাহরীমার সময়ও তিনটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ

(১) শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া (২) কান পর্যন্ত হাত উঠানো (যেন এইদিকে ইঙ্গিত করা হইল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর সবকিছুকে পিছনে ফেলিয়া দিলাম) (৩) আল্লাহু আকবার বলার সময় আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে বিদ্যমান থাকে।

দাঁড়ানোর মধ্যে যে তিনটি বিষয় রহিয়াছে সেইগুলি এই ঃ

(১) দৃষ্টি সেজদার জায়গাতে রাখিবে (২) অন্তরে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ধ্যান করিবে (৩) অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবে না। নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানোর উদাহরণ হইল এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি বাদশাহর দারোয়ানকে অনেক খোশামেদ তোষামোদ করিয়া বহু কষ্টে বাদশাহর দরবারে পৌঁছিল এবং বাদশাহ যখন তাহার কথা শোনার জন্য মনোযোগী হইলেন ; তখন সে ব্যক্তি এদিক-সেদিক তাকাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় বাদশাহ কি তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবেন?

কুরআন পড়ার মধ্যেও তিনটি বিষয় খেয়াল করিবে ঃ

(১) সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করিবে (২) কুরআনের অর্থে গভীরভাবে চিন্তা করিবে (৩) যাহা পড়িবে উহার উপর আমল করিবে।

রুকুর মধ্যে তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) রুকুর মধ্যে কোমর উঁচু-নীচু না রাখিয়া একেবারে সোজা রাখা (আলেমগণ লিখিয়াছেন, মাথা, কোমর ও নিতম্ব বরাবর থাকিবে) (২) হাতের অঙ্গুলিসমূহ খুলিয়া চওড়া করিয়া হাঁটুর উপর রাখা (৩) তসবীহসমূহ ভক্তি ও আজমতের সহিত পড়া।

সেজদার মধ্যেও তিনটি জিনিসের খেয়াল করিবে ঃ

(১) সেজদার মধ্যে দুই হাত কান বরাবর রাখা (২) দুই হাতের কনুই খাড়া রাখা (৩) আজমতের সহিত তসবীহসমূহ পড়া।

বসা অবস্থায় তিন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখিবে ঃ

(১) ডান পা খাড়া করিয়া বাম পায়ের উপর বসা (২) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আজমতের সহিত আত্তাহিয়্যাতু পড়া, কেননা ইহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম ও মুমিনদের জন্য দোয়া রহিয়াছে (৩) সালাম ফিরাইবার সময় ফেরেশতা এবং উভয় দিকের মুসল্লীদের প্রতি সালামের নিয়ত করা।

অতঃপর এখলাসেরও তিনটি অংশ রহিয়াছে ঃ

(১) নামাযের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়া। (২) মনে করা যে, আল্লাহর তওফীকেই এই নামায আদায় হইয়াছে। (৩) সওয়াবের আশা রাখা।

প্রকৃতপক্ষে নামাযের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও বরকত রহিয়াছে। ইহাতে যাহা কিছু পড়া হয়, উহার প্রত্যেকটি অংশই অসংখ্য গুণাগুণ ও আল্লাহর মহত্ত্বের সমষ্টি।

সর্বপ্রথম যে দোয়াটি পড়া হয়, উহাকেই লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—ইহা কত ফযীলতপূর্ণ। যেমন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বয়ান করিতেছি। তুমি যাবতীয় দোষ-ক্রুটি হইতে পবিত্র, যাবতীয় অন্যায় হইতে মুক্ত।"

وَبِحَمْدِكَ

"যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য এবং প্রশংসনীয় যাবতীয় বিষয় তুমিই একমাত্র যোগ্য।"

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

"তোমার নাম এতই বরকতপূর্ণ যে, যে কোন জিনিসের উপর তোমার নাম লওয়া যায়, উহাও বরকতপূর্ণ হইয়া যায়।"

وَتَعَالٰى جَدُّكَ

"তোমার শান ও মর্যাদা বহু উর্ধ্বে ; সবার উপরে।"

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই ; এবাদতের যোগ্য কেহ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না।"

অনুরূপভাবে রুকুর মধ্যে বলা হয়—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"আজমত ও মহত্বের মালিক আমার রব্ব সকল দোষ-ক্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।" এইভাবে আল্লাহর মহত্বের সামনে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা প্রকাশ করা হইতেছে। কেননা ঘাড় উঁচু করা অহঙ্কারের লক্ষণ আর উহা ঝুকাইয়া দেওয়া আনুগত্যের লক্ষণ। সুতরাং রুকুর মধ্যে যেন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে, হে আল্লাহ! তোমার যাবতীয় হুকুম-আহকামের সামনে আমি মাথা নত করিতেছি, তোমার আনুগত্য ও বন্দেগীকে আমি শিরোধার্য করিয়া লইতেছি, আমার এই পাপী দেহখানি তোমার সামনে হাজির ; তোমার দরবারে অবনত হইয়া রহিয়াছে—নিঃসন্দেহে তুমি মহান; তোমার মহত্ত্বের সামনে আমি মাথা নত করিলাম।

অনুরূপভাবে সেজদার মধ্যে বলা হয়—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে যাবতীয় দোষ–ত্রুটি হইতে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করা হইতেছে। শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইল মাথা—চোখ, কান, নাক, জবান ইত্যাদি প্রিয় অঙ্গগুলি সহকারে এই মাথা মাটিতে রাখিয়া যেন স্বীকার করা হইতেছে যে, আমার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয় অঙ্গগুলি তোমার সামনে মাটিতে লুটাইয়া আছে, শুধু এই আশায় যে, তুমি আমার উপর দয়া ও মেহেরবানী করিবে। এই বিনয়ের প্রথম প্রকাশ আদবের সহিত তাহার সম্মুখে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল। রুকুতে মাথা নত করার মধ্যে এই বিনয়েরই আরেক ধাপ উন্নতি হইয়াছিল। অতঃপর তাহার সামনে জমিনে নাক ঘঁষা ও মাথা রাখার মধ্যে আরো এক ধাপ উন্নতি হইল। এইভাবে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নামাযেরই এই অবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই হইল নামাযের আসল রূপ। আর এই নামাযই প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি ও সফলতার সিঁড়ি। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে এইরূপ নামায পড়ার তওফীক দান করুন—আমীন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফকীহ সাহাবায়ে কেরামের নামায এইরূপই ছিল। তাহারা নামাযের সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতেন। হযরত হাসান (রাযিঃ) যখন ওযূ করিতেন তখন তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। জনৈক ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, দেখ, এক জবরদস্ত বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইবার সময় আসিয়াছে। অতঃপর তিনি ওযূ করিয়া যখন মসজিদের দিকে যাইতেন, মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতেন ঃ

اِلٰهِىْ عَبْدُكَ بِبَابِكَ يَا مُحْسِنُ قَدْ اَتَاكَ الْمُسِيْئُ وَقَدْ اَمَرْتَ الْمُحْسِنَ مِنَّا اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيْئِ

فَاَنْتَ الْمُحْسِنُ وَاَنَا الْمُسِيْئُ فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيْحِ مَا عِنْدِىْ بِجَمِيْلِ مَا عِنْدَكَ يَا كَرِيْمُ.

“হে আল্লাহ! তোমার বান্দা তোমার দরজায় হাজির। হে অনুগ্রহকারী ও উত্তম আচরণকারী! গোনাহগার তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি হুকুম করিয়াছ আমাদের সৎলোকেরা যেন অসৎ লোকদেরকে ক্ষমা করিয়া দেয়। হে আল্লাহ! তুমি নেককার আর আমি বদকার। কাজেই হে কারীম! তুমি তোমার যাবতীয় গুণাবলীর ওসীলায় আমার যাবতীয় অন্যায় ক্ষমা

করিয়া দাও।" এই দোয়া করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিতেন।

হযরত যয়নুল আবেদীন (রহঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নামায পড়িতেন। বাড়ীতে বা সফরে কখনও তাঁহার তাহাজ্জুদ ছুটে নাই। তিনি যখন ওযূ করিতেন তখন তাঁহার চেহারা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত এবং নামাযে দাঁড়াইলে তাঁহার শরীরে কম্পন শুরু হইয়া যাইত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেছি।

একবার তিনি নামায পড়িতেছিলেন এমন সময় ঘরে আগুন লাগিয়া গেল। তিনি নামাযেই মশগুল থাকিলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আখেরাতের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলেন, অহংকারী মানুষের উপর আমি আশ্চর্য হই—গতকাল পর্যন্ত যে নাপাক বীর্য ছিল আবার আগামীকাল সে মুর্দা হইয়া যাইবে তবুও সে অহংকার করে। তিনি বলিতেন, আশ্চর্যের বিষয়! মানুষ অস্থায়ী ঘরের জন্য কতই না ফিকির করে অথচ চিরস্থায়ী ঘরের জন্য কোনই ফিকির নাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল, রাত্রের অন্ধকারে চুপে চুপে তিনি দান করিতেন। কেহ জানিতে পারিত না, কে দান করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর এমন একশত পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল যাহারা তাঁহারই সাহায্যের উপর চলিত। (নুজহাহ্)

হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন নামাযের সময় হইত তখন তাহার চেহারার রং বদলাইয়া যাইত, শরীরে কম্পন শুরু হইয়া যাইত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ঐ আমানত আদায় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আসমান–যমীন বহন করিতে পারে নাই, পাহাড়–পর্বত যাহা বহন করিতে অক্ষম হইয়া গিয়াছে—জানিনা আমি সেই আমানত পুরাপুরি আদায় করিতে পারিব কিনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন আযানের আওয়াজ শুনিতেন, তখন এত বেশী কাঁদিতেন যে, তাহার চাদর ভিজিয়া যাইত, রগ ফুলিয়া যাইত, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। কেহ আরজ করিল, আমরাও তো আযান শুনি কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না অথচ আপনি এত বেশী ঘাবড়াইয়া যান! তিনি বলিলেন, মুআয্যিন কি বলে, তাহা যদি লোকেরা জানিত তবে তাহাদের আরাম আয়েশ হারাম হইয়া যাইত এবং ঘুম উড়িয়া যাইত। অতঃপর তিনি আযানের প্রত্যেকটি বাক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত যুন্নূন মিছরী (রহঃ)এর পিছনে আছরের নামায পড়িলাম। তকবীরে তাহরীমার সময় আল্লাহ বলার সাথে সাথে তাহার উপর আল্লাহর আজমত ও মহত্বের এত প্রভাব পড়িল যে, মনে হইল তাহার দেহ হইতে রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অতঃপর তাহার জবান হইতে যখন 'আকবার' শব্দটি শুনিলাম, তখন তাহার এই তকবীরের প্রভাবে আমার অন্তর যেন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। (নুজ্হাহ্)

হযরত উয়াইস কারনী (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন। কোন কোন সময় সারা রাত্র রুকুর হালতে কাটাইয়া দিতেন। আবার কোন কোন সময় এমন হইত যে, এক সেজদার মধ্যেই সারা রাত্র কাটাইয়া দিতেন।

হযরত ইসাম (রহঃ) হযরত হাতেম যাহেদ বলখী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নামায কিরূপে পড়েন? তিনি উত্তর করিলেন, নামাযের সময় হইলে প্রথমে ধীর-স্থিরভাবে উত্তমরূপে ওযূ করি অতঃপর নামাযের জায়গায় উপস্থিত হইয়া ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়াই আর মনে মনে এই ধ্যান করিতে থাকি যে, কাবা শরীফ আমার সম্মুখে, পা আমার পুলসিরাতের উপর, ডান দিকে বেহেশত আর বাম দিকে দোযখ, আজরাঈল (আঃ) আমার মাথার উপর এবং আমি মনে করি ইহাই আমার শেষ নামায ; জীবনে আর নামায পড়ার সুযোগ হয়ত আমার হইবে না, আর আমার মনের অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন। ইহার পর খুবই বিনয়ের সহিত আল্লাহ আকবার বলি অতঃপর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেরাত পড়ি। বিনয়ের সহিত রুকু করি আর বিনয়ের সহিত সেজদা করি। ধীর-স্থিরভাবে নামায পুরা করি আর আল্লাহর রহমতের ওসীলায় উহা কবুল হওয়ার আশা করি। আবার নিজের বদ-আমলের দরুন উহা অগ্রাহ্য হওয়ার ভয়ও করি। ইসাম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নামায আপনি কত দিন যাবত পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবত। ইহা শুনিয়া ইসাম (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন যে, একটি নামাযও আমার এইরূপে আদায় করার সৌভাগ্য হয় নাই।

বর্ণিত আছে, একদিন হাতেম (রহঃ)এর নামাযের জামাত ছুটিয়া গেল, ইহাতে তিনি খুবই দুঃখিত হইলেন। মাত্র দুই একজন এই ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করিল। ইহাতে তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, হায়! আজ যদি আমার ছেলে মারা যাইত তবে বলখের অর্ধেক লোক সমবেদনা প্রকাশ করিত। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, দশ হাজারেরও অধিক

লোক সমবেদনা প্রকাশ করিত অথচ আমার জামাত নষ্ট হওয়াতে মাত্র দুই-একজন লোক দুঃখ প্রকাশ করিল। ইহা শুধু এইজন্যই যে, মানুষের নিকট ধর্মীয় মুসীবত দুনিয়ার মুসীবত হইতে হালকা হইয়া গিয়াছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসরের মধ্যে কখনও এমন হয় নাই যে, নামাযের জন্য আযান হইয়াছে অথচ আমি পূর্ব হইতেই মসজিদে হাজির হই নাই। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে শুধু তিনটি জিনিসই আমার পছন্দ ঃ প্রথম এমন বন্ধু যে আমার ভুল-ত্রুটির জন্য আমাকে সতর্ক করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জীবন ধারণের পরিমাণ রুজি যাহাতে কোন কলহ-বিবাদ নাই। তৃতীয়ঃ জামাতের সহিত নামায আদায়, যাহাতে ভুল-ত্রুটি হইলে মাফ হইয়া যায়। আর সওয়াব হইলে উহা আমাকে দেওয়া হয়।

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জার্‌রাহ (রাযিঃ) একবার নামাযে ইমামতি করিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, এইমাত্র শয়তান আমাকে একটি ধোকা দিল। সে আমার মনে এই ধারণা দিল যে, আমি সবচাইতে ভাল (কারণ যে ভাল তাহাকেই ইমাম বানানো হয়)। কাজেই ভবিষ্যতে আমি আর কখনও নামায পড়াইব না।

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) একবার মসজিদে গিয়া দেখিলেন জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি 'ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়িলেন আর বলিলেন, এই নামাযের ফযীলত আমার নিকট ইরাকের বাদশাহী হইতেও বেশী প্রিয়। কথিত আছে, এই সকল বুযুর্গানে দ্বীনের কাহারও তকবীরে উলা ফউত হইয়া গেলে তিন দিন পর্যন্ত উহার শোক প্রকাশ করিতেন, আর জামাত ফউত হইয়া গেলে সাত দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করিতেন। (এহ্‌ইয়া)

বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, তুমি যদি তোমার মালিক ও মাওলা পাকের সাথে সরাসরি কথা বলিতে চাও, তবে যখন ইচ্ছা তখনই বলিতে পার। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে ওযূ কর অতঃপর নামাযে দাঁড়াইয়া যাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত কথা বলিতে থাকিতেন এবং আমরাও তাহার সহিত কথা বলিতে থাকিতাম ; কিন্তু যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাঁহার অবস্থা এমন হইত যেন তিনি আমাদেরকে একেবারেই চিনেন না এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হইয়া যাইতেন।

সাঈদ তান্নোখী (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন ক্রমাগত

তাহার মুখমণ্ডলের উপর চোখের পানি জারী থাকিত।

খালফ ইবনে আইয়ূব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এই মাছিগুলি কি নামাযে আপনাকে বিরক্ত করে না? তিনি বলিলেন, নামাযের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন জিনিসের অভ্যাস আমার নাই। অসৎ লোকেরা সরকারের বেত্রাঘাত এইজন্য সহ্য করে যে, লোকেরা তাহাদিগকে ধৈর্যশীল বলিবে এবং উহাকে গর্ব সহকারে বলিয়াও বেড়ায়—আর আমি আমার মালিক ও মাওলা পাকের সামনে দাঁড়াইয়াছি ; এইখানে একটি মাছির কারণে নড়াচড়া করিব।

'বাহ্‌জাতুন্নুফুস' কিতাবে আছে, এক সাহাবী (রাযিঃ) রাত্রে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি চোর আসিয়া তাঁহার ঘোড়া খুলিয়া লইয়া গেল। লইয়া যাওয়ার সময় তিনি তাহাকে দেখিতেও পাইলেন কিন্তু নামায ছাড়িলেন না। পরে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন যে, চোরকে আপনি ধরিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি যে কাজে মশগুল ছিলাম, উহা ঘোড়া হইতে অনেক উত্তম ছিল।

হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার শরীরে তীর বিদ্ধ হইলে নামাযের অবস্থায়ই উহা বাহির করা হইত। একবার তাহার উরুতে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন উহা বাহির করিতে পারিল না, তখন তাহারা সকলেই পরামর্শ করিল যে, নামাযের অবস্থায়ই উহা বাহির করা যাইবে। পরে যখন তিনি নফল নামাযে দাঁড়াইলেন এবং সেজদায় গেলেন তখন লোকেরা উহাকে টানিয়া বাহির করিয়া নিল। নামায শেষ করিয়া তিনি আশে-পাশে লোকজনের ভীড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমার তীর বাহির করিতে আসিয়াছ? লোকেরা আরজ করিল, আমরা তো উহা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তো টেরই পাই নাই।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন পরিবারের লোকদিগকে বলিয়া দিতেন যে, তোমরা কথাবার্তা বলিতে থাক। কেননা, তোমাদের কথাবার্তা আমি নামাযের মধ্যে শুনিতে পাইব না।

হযরত রবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াই তখন এই চিন্তায় বিভোর হইয়া যাই যে, মৃত্যুর পর আমাকে কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে!

হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন তখন

লোকজনের কথাবার্তা তাঁহার কানে যাওয়া তো দূরের কথা ঢোলের আওয়াজও তাহার কানে প্রবেশ করিত না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নামাযে কি আপনার কোন কিছুর খেয়াল হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার এই খেয়াল হয় যে, একদিন আল্লাহর দরবারে আমাকে দাঁড়াইতে হইবে এবং বেহেশত ও দোযখ এই দুইটির একটিতে অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে। লোকটি আরজ করিল, ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই বরং আমার প্রশ্ন হইল, আমাদের কথাবার্তা কি কিছুই আপনি শুনিতে পান না? তিনি বলিলেন, নামাযে তোমাদের কথাবার্তা শুনিতে পাওয়ার চাইতে আমার শরীরে বর্শা বিদ্ধ হওয়া অধিক ভাল। তিনি আরও বলিতেন, আখেরাতের যাবতীয় দৃশ্য যদি এখন আমার চোখের সামনে পেশ করা হয় তবে চোখে দেখিয়াও আমার ঈমান ও একীন বিন্দুমাত্র বাড়িবে না। (কারণ গায়েবের উপর তাহার ঈমান এমনই মজবুত ছিল যেমন সরাসরি দেখার উপর হইয়া থাকে)।

এক বুযুর্গের একটি অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যাহা কাটিয়া ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না। লোকেরা ঠিক করিল নামাযের অবস্থায়ই উহা কাটা সম্ভব হইবে ; তিনি টের পাইবেন না। পরে নামাযের অবস্থায়ই উহা কাটা হইল এবং তিনি মোটেও টের পাইলেন না।

জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নামাযের মধ্যে কি আপনার কখনও দুনিয়াবী খেয়াল আসে? তিনি বলিলেন, এইরূপ খেয়াল নামাযেও আসে না এবং নামাযের বাহিরেও আসে না।

অপর এক বুযুর্গকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, নামাযে তাঁহার অন্য কোন খেয়াল আসে কিনা! তিনি বলিয়াছেন, নামাযের চাইতেও প্রিয় জিনিস কি আছে যাহার খেয়াল নামাযের মধ্যে আসিবে।

'বাহ্জাতুন্নুফুস' কিতাবে লেখা আছে, জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল। বুযুর্গকে যোহরের নামাযে মশগুল দেখিয়া লোকটি বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যোহরের নামায শেষ করিয়া তিনি নফলে মশগুল হইয়া গেলেন এবং আছর পর্যন্ত নফল পড়িতে থাকিলেন। এদিকে লোকটি অপেক্ষায় বসিয়াই রহিল। তিনি নফল শেষ করিয়া আছরের নামায শুরু করিলেন। আছরের নামায হইতে ফারেগ হইয়াই মাগরিব পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকিলেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িয়া এশা পর্যন্ত নফলে মশগুল হইয়া গেলেন। এইদিকে আগন্তুক বেচারা অপেক্ষা করিতে থাকিল। এশার নামায পড়িয়া তিনি আবার নফল শুরু করিয়া দিলেন। সকাল পর্যন্ত তিনি এইভাবে নফলেই

মগ্ন রহিলেন। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করিয়া আবার যিকির–ওজীফায় মশগুল হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে জায়নামাযে বসা অবস্থায় তাঁহার চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ মলিতে মলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তওবা–এস্তেগফার করিতে লাগিলেন এবং এই দোয়া পড়িলেন—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَيْنٍ لَا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ

"যে–চোখ ঘুমাইয়া কখনও তৃপ্ত হয় না সেই চোখ হইতে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।"

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তিনি রাত্রে শুইয়া ঘুমানোর চেষ্টা করিতেন কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহার ঘুম আসিত না, তখন তিনি উঠিয়া নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন আর এই আরজ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি জান—জাহান্নামের আগুনের ভয় আমার নিদ্রাকে উড়াইয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া সকাল পর্যন্ত তিনি নামাযে মশগুল থাকিতেন।

অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় কিংবা চরম শওক ও আগ্রহে সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইয়া দেওয়ার ঘটনাবলী এত অধিক যে, উহা গণনা করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা উহার স্বাদ হইতে এত দূরে যে, এই সমস্ত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কেই আমাদের মনে সন্দেহ লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইসব ঘটনা এত অধিক পরিমাণে এবং এত অধিক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি এইগুলিকে অস্বীকার করা হয় তবে গোটা ইতিহাস শাস্ত্রের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। কেননা, যে–কোন ঘটনার সত্যতা উহার অধিক বর্ণনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া সর্বদা আমরা নিজেদের চোখে দেখিতেছি যে, এমন অনেক লোক আছে যাহারা সারা রাত্র দাঁড়াইয়া সিনেমা থিয়েটারে কাটাইয়া দেয় অথচ তাহাদের কোন ক্লান্তি বা নিদ্রা আসে না। তাহা হইলে ইহা কোন্ যুক্তির কথা যে, আমরা পাপকার্যের স্বাদ ও আনন্দকে স্বীকার করা সত্ত্বেও এবাদতের স্বাদ ও আনন্দকে অস্বীকার করি ; অথচ এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শক্তিও দান করা হয়। আসলে আমাদের এই সন্দেহের কারণ কি ইহাই নহে যে, আমরা এই সকল ইশ্‌ক–মহব্বতের স্বাদ সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত। আর একথাও সত্য যে, নাবালেগ বালেগ হওয়ার স্বাদ–আনন্দ সম্পর্কে অজ্ঞই হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদেরকে এই স্বাদ লাভের তওফীক দান করেন তবে উহাই হইবে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

আখেরী গুযারিশ
বা
শেষ আবেদন

সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যেহেতু নামাযের হাকীকত হইল, নিবিড়ভাবে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য গ্রহণ ও তাঁহার সহিত কথাবার্তায় মগ্ন হওয়া, কাজেই অন্যমনস্ক ও গাফেল অবস্থায় তাহা হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য এবাদত গাফলতির সহিতও হইতে পারে। যেমন, যাকাতের হাকীকত হইল মাল খরচ করা ; ইহা স্বয়ং নফসের জন্য এত কষ্টসাধ্য যে, গাফলতির সহিতও যদি কেহ যাকাত আদায় করে তবু ইহা নফসের জন্য কষ্টদায়ক হয়। এমনিভাবে, রোযার হাকীকত হইল, সারাদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করা, সহবাসের মজা হইতে বিরত থাকা—এইগুলি নফসকে এমনিতেই কাবু করিয়া ফেলে, অতএব গাফলতির সহিত রোযা রাখিলেও নফসের প্রবলতা ও তীব্রতার উপর ইহার প্রভাব পড়ে।

কিন্তু নামাযের প্রধান অঙ্গ হইল, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত। গাফলতির সাথে হইলে ইহাকে আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্ক ও কথোপকথন বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। বরং ইহা এমনই হইয়া যায় যেমন, জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি জ্বরের অবস্থায় আবল-তাবল বকাবকি করিতে থাকে অর্থাৎ মনের মধ্যে যেসব কথা থাকে এই সময় তাহার জবান হইতে বাহির হইতে থাকে—ইহাতে তাহার না কোনরূপ কষ্ট হয়, আর না ইহাতে তাহার কোন উপকার হয়। তদ্রূপ নামাযের যেহেতু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই মনোযোগ না থাকিলেও অভ্যাস অনুযায়ী চিন্তা-ফিকির ছাড়াই জবান হইতে কিছু শব্দ বাহির হইতে থাকে, যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখ হইতে বহু কথা এমন বাহির হয় যাহা উপস্থিত শ্রবণকারী শুনিয়াও তাহার সহিত কথা বলা হইতেছে বলিয়া মনে করে না এবং যে বলে তাহারও ইহাতে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালাও এমন নামাযের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করেন না, যাহা ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া হইয়া থাকে। অতএব ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ মনোযোগ ও এখলাসের সহিত নামায পড়িবে।

কিন্তু ইহাও নেহায়েত জরুরী যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের নামায সম্পর্কে যে সকল অবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ নামায যদি নাও পড়া যায় তবুও যেকোন অবস্থাতেই নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে।

শয়তান মানুষকে এইভাবেও ধোকা দিয়া থাকে যে, মন্দভাবে নামায পড়ার চাইতে না পড়াই ভাল। শয়তানের এই মারাত্মক ধোকা হইতে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে। কেননা, নামায একেবারে না পড়িলে যে শাস্তি পাইতে হইবে উহা খুবই কঠিন। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরাম এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে কুফরের ফতওয়াও দিয়াছেন যাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে হক আদায় করিয়া নামায পড়া এবং বুযুর্গদের দেখানো আদর্শ অনুযায়ী নামায পড়ার জন্য জোর চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী করিয়া আমাদিগকে এইরূপ নামায আদায় করার তওফীক দান করুন এবং জীবনে অন্ততঃ একটি নামাযও যেন এইরূপ হইয়া যায় যাহা আল্লাহর দরবারে পেশ করার উপযুক্ত হয়।

পরিশেষে এই বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেওয়া জরুরী মনে করি যে, মুহাদ্দিসগণ ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উদারতা ও প্রশস্ততার অবকাশ দিয়া থাকেন, অতএব তাহাদের মতে সনদ ও সূত্রগত সাধারণ দুর্বলতা এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। ইহা ছাড়া সূফিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী ইতিহাস জাতীয় বিষয়, আর ইতিহাসের মান হাদীসের তুলনায় অনেক কম।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا
وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا
اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ،
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ . وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهِمْ وَحَمَلَةِ الدِّيْنِ
الْمَتِيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ .

॥ ॥ ॥

ফাযায়েলে কুরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ
وَعَلَّمَهُ الْبَیَانَ وَ اَنْزَلَ لَهُ الْقُرْاٰنَ
وَجَعَلَهُ مَوْعِظَةً وَّشِفَاءً وَّهُدًی
وَّرَحْمَةً لِّذَوِی الْاِیْمَانِ لَارَیْبَ
فِیْهِ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا وَّاَنْزَلَهٗ
قَیِّمًا حُجَّةً نُّوْرًا لِّذَوِی الْاِیْقَانِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ
الْاَکْمَلَانِ عَلٰی خَیْرِ الْخَلَائِقِ
مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَآنِّ الَّذِیْ
نَوَّرَ الْقُلُوْبَ وَ الْقُبُوْرَ نُوْرُهٗ وَرَحْمَةٌ
لِّلْعٰلَمِیْنَ ظُهُوْرُهٗ وَعَلٰٓی اٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ الَّذِیْنَ هُمْ نُجُوْمُ الْهِدَایَةِ
وَنَاشِرُو الْفُرْقَانِ وَعَلٰی مَنْ تَبِعَهُمْ
بِالْاِیْمَانِ وَبَعْدُ فَیَقُوْلُ الْمُفْتَقِرُ
اِلٰی رَحْمَةِ رَبِّهِ الْجَلِیْلِ عَبْدُهٗ
الْمَدْعُوُّ بِزَکَرِیَّا بْنُ یَحْیٰی بْنُ
اِسْمٰعِیْلَ هٰذِهِ الْعُجَالَةُ اَرْبَعُوْنَةٌ

تمام تعریف اس پاک ذات کے لئے ہے
جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو
وضاحت سکھائی اور اس کے لئے وہ
قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور
شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں
کے لئے بنایا جس میں نہ کوئی شک ہے
اور نہ کسی قسم کی کجی ، بلکہ وہ بالکل مستقیم
ہے اور حجت و نور ہے یقین والوں کے
لئے۔ اور کامل و مکمل درود و سلام اس
بہترین خلائق پر ہو جیو ، جس کے نور نے
زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد
قبروں کو منوّر فرما دیا اور جس کا ظہور تمام
عالم کے لئے رحمت ہے اور آپ کی اولاد
اور اصحابؓ پر جو ہدایت کے ستارے
ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے ،
نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان
کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلوٰۃ کے

فِیْ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ اَلَّفْتُھَا مُمْتَثِلًا
لِاَمْرِ مَنْ اِشَارَتُہٗ حُکْمٌ وَ
طَاعَتُہٗ غُنْمٌ

بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحیٰی بن اسمٰعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق "فضائل قرآن" میں ایک چہل حدیث ہے جس کو میں نے ایسے حضرات کے اِمتثالِ حکم میں جمع کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح مُغتنم ہے۔

সমস্ত প্রশংসা ঐ পাক যাত আল্লাহর জন্য, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে বয়ান শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য পবিত্র কুরআন নাযিল করিয়াছেন। যে কুরআনকে তিনি ঈমানদারদের জন্য উপদেশ ও শেফা এবং হেদায়াত ও রহমত বানাইয়াছেন। ইহাতে না কোন সন্দেহ আছে, না কোন প্রকার বক্রতা। বরং ইহা একীনওয়ালাদের জন্য সরল–সঠিক প্রামাণ্য কিতাব ও নূর। অতঃপর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দরূদ ও সালাম সৃষ্টির সেরা প্রিয় নবীজীর উপর, যাঁহার নূর দুনিয়ার জীবনে মানুষের আত্মাকে এবং মৃত্যুর পর তাহাদের কবরকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। যাঁহার আগমন ও আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁহার সন্তান–সন্ততি ও সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহারা হেদায়াতের জন্য নক্ষত্রস্বরূপ এবং কালামে পাকের প্রচারক। আরও শান্তি বর্ষিত হউক ঐ সকল মুমিনের উপর যাহারা ঈমানের সহিত তাহাদের অনুসারী হন।

হামদ ও সালাতের পর আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিখারী আমি বান্দা যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল আরজ করিতেছি যে, তাড়াহুড়া করিয়া লেখা এই কয়েকটি পৃষ্ঠা ফাযায়েলে কুরআন সম্পর্কে চল্লিশ হাদীসের একটি সংকলন। ইহা আমি এমন এক মহান বুযুর্গের হুকুমে জমা করিয়াছি যাহার ইশারাও আমার জন্য হুকুম স্বরূপ এবং তাঁহার হুকুম মানা আমার জন্য সর্বদিক দিয়াই কল্যাণকর।

হিন্দুস্থানের সাহারানপুরে অবস্থিত মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার প্রতি আল্লাহ তায়ালার যে সকল খাছ নেয়ামত সর্বদা জারী রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল। প্রতি বৎসর মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট শুনাইবার জন্য এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মাহফিলে বক্তা, ওয়ায়েয এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে জমা করার এত এহ্‌তেমাম করা হয় না যত বুযুর্গানে দ্বীন ও সমাজে অপরিচিত আল্লাহওয়ালাদেরকে একত্রিত করার এহ্‌তেমাম করা হয়। যদিও এখন

আর সেই যমানা নাই, যখন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম ছাহেব নানুতুবী (রহঃ), কুতবুল এরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গোহী (রহঃ)এর শুভাগমন উপস্থিত লোকদের অন্তরসমূহকে আলোকিত করিয়া দিত, কিন্তু সেই দৃশ্য এখনও চোখের আড়াল হইয়া যায় নাই যখন উপরোক্ত মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও হেদায়াতের সূর্য সদৃশ ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (রহঃ), হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ), হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে তশরীফ আনিয়া মুর্দা অন্তরসমূহকে জীবনী শক্তি দান করিতেন এবং নূরানিয়তের ফোয়ারা জারী করিয়া দিতেন। এইভাবে তাঁহারা আল্লাহর এশ্‌ক ও মহব্বতে তৃষ্ণার্ত অন্তরসমূহকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

বর্তমানে মাদ্রাসার মাহফিল যদিও হেদায়াতের এই সকল চন্দ্র হইতেও মাহরূম হইয়া গিয়াছে তবুও তাহাদের সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত বুযুর্গানে দ্বীন এখনও জলসায় হাজেরীনদেরকে স্বীয় ফয়েয ও বরকত দ্বারা ভরপুর করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা এই বছর জলসায় শরীক হইয়াছেন তাহারা ইহার সাক্ষী রহিয়াছেন। অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই বরকত দেখিতে পান। আমাদের মত অন্তর্দৃষ্টিহীন লোকেরাও অন্তত এতটুকু অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারে যে, নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু একটা রহিয়াছে। মাদ্রাসার সালানা জলসায় শুধু বক্তৃতা ও জোরদার লেকচার শুনিবার উদ্দেশ্য নিয়া যদি কেহ আসে তবে সম্ভবতঃ সে এতটুকু পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতে পারিবে না যতটুকু কামিয়াব ও ফয়েজপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে আত্মার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাপ্রার্থীগণ।

মাদ্রাসার সালানা জলসা উপলক্ষে এই বৎসর ২৭শে জিলকদ ১৩৪৮ হিজরীর মাহফিলে হযরত শাহ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব নাগিনবী (রহঃ) শুভাগমন করিয়া অধমের উপর যে স্নেহ ও মেহেরবানীর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছেন উহার শুকরিয়া আদায় করিতেও আমি অক্ষম। তিনি হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ)এর খলীফা—এই কথা জানার পর তাঁহার উচ্চ গুণাবলী, একাগ্রতা, বুযুর্গী, নূর ও বরকতের বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি জলসা হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সম্মানজনক পত্র দ্বারা আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ফাযায়েলে কুরআন সম্পর্কিত চল্লিশ হাদীস সংকলন করিয়া উহার তরজমা তাঁহার খেদমতে পেশ করি। তিনি ইহাও লিখিয়া দিলেন যে, আমি যদি তাঁহার হুকুম

পালনে অবাধ্যতা করি, তবে তিনি আমার শায়েখের স্থলাভিষিক্ত, পিতৃতুল্য চাচাজান হযরত মাওলানা হাফেজ আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা তাঁহার হুকুমকে আরও জোরদার করাইবেন। যাহা হউক, তিনি এই খেদমত আমার মত অধমের দ্বারাই নিতে চাহিলেন। ঘটনাক্রমে এই সম্মানিত পত্রখানি এমন অবস্থায় পৌঁছিল যে, আমি সফরে ছিলাম এবং আমার চাচাজান এখানে আসিয়াছিলেন। আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দান করতঃ পত্রখানি আমার হাওয়ালা করিলেন। ইহার পর আমার না কোন ওজর দেখাইবার অবকাশ রহিল আর না নিজের অযোগ্যতার কথাও পেশ করিবার সুযোগ রহিল। যদিও আমার জন্য হাদীসের কিতাব 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' এর শরাহ লেখার ব্যস্ততাও একটি শক্তিশালী ওজর ছিল। তথাপি এই মহান হুকুমের গুরুত্বের কারণে উহাকে কিছুদিনের জন্য মুলতবী করিয়া দিয়া আমার দ্বারা যাহা সম্ভব হইয়াছে উহা লিখিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিতেছি এবং আমার অযোগ্যতার দরুন ইহাতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক সেইগুলির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

আমি এই কিতাবখানি কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের জামাতে শরীক হওয়ার আশায় লিখিয়াছি যাহাদের সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীনী বিষয়ের উপর চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করিবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে আলেম হিসাবে উঠাইবেন এবং আমি তাহার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব।

হযরত আলকামী (রহঃ) বলেন, 'সংরক্ষণ করা'র অর্থ হইল কোন জিনিসকে একত্র করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করা। চাই লেখা ব্যতীত মুখস্থ করিয়া হউক কিংবা লিখিয়া সংরক্ষণ করা হউক যদিও মুখস্থ না থাকে। সুতরাং যদি কেহ কিতাবে লিখিয়া অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, তবে সেও হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মুনাবী (রহঃ) বলেন, "আমার উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করিবে" এই কথার অর্থ হইল, উম্মতের নিকট সনদের হাওয়ালা সহ বর্ণনা করা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ; যদিও মুখস্থ না থাকে বা অর্থ জানা না থাকে। এমনিভাবে 'চল্লিশ হাদীস' কথাটিও ব্যাপক। অর্থাৎ সবগুলি হাদীস সহীহ বা হাসান পর্যায়েরও হইতে পারে অথবা এমন মামুলী পর্যায়ের দুর্বল হাদীসও হইতে পারে যেগুলির

উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয আছে।

আল্লাহু আকবার ; ইসলামের মধ্যেও কত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমাদের ওলামায়ে কেরাম কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও পরিপূর্ণ ইসলাম নসীব করুন।

এখানে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সতর্ক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা হইল এই যে, আমি হাদীসসমূহের হাওয়ালা দেওয়ার ব্যাপারে মিশকাত, মিরকাত, তানকীহুর রেওয়ায়াত, শরহে এহয়াউল উলূম ও আল্লামা মুনযিরীর তারগীব গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি এবং এইগুলি হইতে হাদীস অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। তাই এইগুলির হাওয়ালা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি নাই। তবে এইগুলি ব্যতীত অন্য কোন কিতাব হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি উহার হাওয়ালা উল্লেখ করিয়া দিয়াছি।

তেলাওয়াতকারীর জন্য তেলাওয়াতের সময় উহার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। অতএব উদ্দেশ্যের পূর্বে কুরআন মজিদ পাঠের কিছু আদব লিখিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে হইতেছে। কেননা—

بے ادب محروم گشت از فضلِ رب

'বেআদব আল্লাহর মেহেরবানী হইতে বঞ্চিত থাকে।'

সংক্ষিপ্তভাবে এই আদবগুলির সারকথা হইল, কালামুল্লাহ শরীফ মাবুদের কালাম, মাহবুব ও প্রিয়ের বাণী।

প্রেম ও ভালবাসার সহিত যাহাদের কিছু মাত্রও সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা জানেন যে, প্রেমিকের নিকট মাশুকের পত্র, তাহার কথা ও লেখার কি পরিমাণ মূল্য ও গুরুত্ব হইয়া থাকে ; উহার সহিত যে প্রেম ও প্রণয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং হওয়াও উচিত তাহা সকল নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে।

জনৈক কবি বলিয়াছেন—

محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گی

অর্থ ঃ মহব্বত নিজেই তোমাকে মহব্বতের কায়দা-কানুন শিখাইয়া দিবে।

এই সময় যদি আল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্য এবং সীমাহীন নেয়ামতের কল্পনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তবে অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসার ঢেউ

উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধ্যান করিতে হইবে যে, ইহা আহকামুল হাকেমীনের কালাম, রাজাধিরাজের ফরমান এবং এমন মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমশালী বাদশাহের আইন যাহার সমকক্ষতার দাবী দুনিয়ার বড় হইতে বড় কাহারো দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, না হইতে পারে।

যাহারা কখনও শাহী দরবারে যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আর যাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই তাহারা আন্দাজ–অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, শাহী ফরমান মানুষের অন্তরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কালামে ইলাহী একদিকে যেমন প্রিয়তম মাহবূবের কালাম অপরদিকে উহা সমগ্র জগতের শাসনকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার ফরমান। তাই উহার ব্যাপারে এই উভয় প্রকার আদব রক্ষা করিয়া চলা জরুরী।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) যখন তেলাওয়াতের জন্য কালামে পাক খুলিতেন, তখন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন এবং তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে থাকিত—

هٰذَا كَلَامُ رَبِّيْ، هٰذَا كَلَامُ رَبِّيْ

'ইহা আমার রবের কালাম, ইহা আমার রবের কালাম।'

উপরোক্ত আদবসমূহ মাশায়েখগণ কর্তৃক লিখিত আদবসমূহের সংক্ষিপ্ত সার। এইগুলির কিছুটা ব্যাখ্যাও আমি পাঠকদের খেদমতে পেশ করিতেছি। যাহার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, বান্দা চাকর ও ভৃত্য হিসাবে নয় বরং বান্দা ও গোলাম হিসাবে দাতা, দয়ালু, মনিব ও মালিকের কালাম তেলাওয়াত করিবে।

সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ পালন করিতে নিজেকে অক্ষম মনে করিতে থাকিবে, সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের ধাপে উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পরিতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিতে দেখিবে, সে উন্নতির পথ হইতে দূরে থাকিবে।

তেলাওয়াতের আদবসমূহ

মেসওয়াক ও ওযূ করিয়া কোন নির্জন স্থানে অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং অত্যন্ত ধ্যান ও খুশুর সহিত উপস্থিত সময়ের উপযোগী এমন ভাবপূর্ণ ভঙ্গিতে তেলাওয়াত করিবে যেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনকে কালামে পাক শোনান হইতেছে।

তেলাওয়াতকারী কুরআনের অর্থ বুঝিলে গভীর চিন্তা-ফিকিরের সহিত রহমতের আয়াতসমূহে গোনাহ-মাফী ও রহমত লাভের দোয়া করিবে। আর আজাব ও ভয়ের আয়াতসমূহে আল্লাহর আশ্রয় চাহিবে। কেননা তিনি ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই। আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কীয় আয়াত তেলাওয়াত কালে সুবহানাল্লাহ বলিবে। তেলাওয়াত করার সময় আপনা আপনি কান্না না আসিলে কান্নার ভাব করিবে। (কবির ভাষায়—)

وَأَلَذُّ حَالَاتِ الْغَرَامِ لِمُغْرَمٍ   شَكْوَى الْهَوَى بِالْمَدْمَعِ الْمُهْرَاقِ

অর্থ ঃ কোন আশেকের জন্য সবচাইতে আনন্দের অবস্থা হইল, সে তাহার মাশুকের নিকট চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ করতঃ অভিযোগ পেশ করিতেছে!

মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে না পড়িলে তেলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া করিবে না। কুরআন শরীফকে রেহাল, বালিশ বা কোন উঁচু জায়গায় রাখিবে। তেলাওয়াতের সময় কাহারও সাথে কথা-বার্তা বলিবে না, বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কালামে পাক বন্ধ করিয়া কথা বলিবে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ পড়িয়া পুনরায় শুরু করিবে। যদি উপস্থিত লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে তবে আস্তে আস্তে পড়া উত্তম। নতুবা জোরে পড়া ভাল। মাশায়েখগণ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার ছয়টি জাহেরী আদব ও ছয়টি বাতেনী আদব বর্ণনা করিয়াছেন।

জাহেরী আদব ৬টি ঃ

১। গভীর শ্রদ্ধা ও এহ্তেরামের সহিত ওযূসহ কেবলামুখী হইয়া বসিবে।

২। পড়ার সময় তাড়াতাড়ি না করিয়া তারতীল ও তাজবীদের সহিত পড়িবে।

৩। উপরে উল্লেখিত নিয়মে রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক আদায় করিবে।

৪। ভান করিয়া হইলেও কান্নার চেষ্টা করিবে।

৫। রিয়া বা লোক-দেখানোর ভয় হইলে বা অন্য কোন মুসলমানের কষ্ট বা অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা হইলে চুপে চুপে পড়িবে, নতুবা জোরে পড়িবে।

৬। মিষ্ট স্বরে পড়িবে। কেননা কালামে পাক মিষ্ট স্বরে পড়িবার জন্য বহু হাদীসে তাকীদ আসিয়াছে।

বাতেনী আদব ৬টি ঃ

১। কালামে পাকের আজমত ও মর্যাদা অন্তরে রাখিবে যে, ইহা কত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কালাম!

২। যে মহান আল্লাহ তায়ালার এই কালাম, তাহার উচ্চ শান, মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে রাখিবে।

৩। অন্তরকে ওয়াস্‌ওয়াসা ও বাজে খেয়াল হইতে পবিত্র রাখিবে।

৪। অর্থের প্রতি চিন্তা করিবে এবং স্বাদ লইয়া পড়িবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সারারাত্র এই আয়াত পড়িয়া কাটাইয়া দিয়াছেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرمادے تو عزت وحکمت والا ہے۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেন তবে তাহারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি মাফ করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী ও হিকমতওয়ালা। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১১৮)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযিঃ) একরাত্রে এই আয়াত পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিয়াছেন—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝

اور مجرمو! آج قیامت کے دن فرماں برداروں سے الگ ہو جاؤ۔

'হে অপরাধীদল! আজ (কিয়ামতের দিন) তোমরা অনুগত বান্দাদের হইতে পৃথক হইয়া যাও।' (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৯)

৫। যখন যে আয়াত তেলাওয়াত করিবে তখন অন্তরকে সেই আয়াতের অধীন ও অনুগত করিয়া লইবে। যেমন, রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করিবার সময় অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। আজাবের আয়াত তেলাওয়াত করিবার সময় অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে।

৬। উভয় কানকে এমন নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে যেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কথা বলিতেছেন আর তেলাওয়াতকারী নিজ কানে শুনিতেছে। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে এই আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করার তওফীক দান করুন, আমীন।

মাসআলা ঃ নামায আদায় করা যায় এই পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ফরযে

কেফায়া। আল্লাহ না করুন যদি একজন হাফেজও না থাকে তবে সমস্ত মুসলমান গোনাহগার হইবে। আল্লামা যরকাশী (রহঃ) হইতে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) নকল করিয়াছেন যে, কোন শহর বা গ্রামে একজন লোকও কুরআন পড়নেওয়ালা না থাকিলে সকলেই গোনাহগার হইবে। বর্তমান গুমরাহী ও জেহালতের যুগে যেখানে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বহু দ্বীনি বিষয়ে গুমরাহী ছড়াইতেছে সেখানে ইহাও সাধারণভাবে ছড়াইয়া গিয়াছে যে, কুরআন শরীফ হিফয করাকে বেকার মনে করা হইতেছে। ইহার শব্দসমূহ বারবার আওড়ানোকে নির্বুদ্ধিতা বলা হইতেছে। ইহার শব্দ মুখস্থ করাকে দেমাগ ক্ষয় ও সময়ের অপচয় বলা হইতেছে। আমাদের বদদ্বীনীর মহামারী যদি এই একটি মাত্র হইত, তবে না হয় উহা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখা যাইত। কিন্তু যেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম একেকটি মারাত্মক ব্যাধি এবং প্রতিটি খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা বাতেলের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ জিনিসের উপর কাঁদিবেন আর কোন্ কোন্ বিষয়েরই বা অভিযোগ করিবেন। সমস্ত অভিযোগ আল্লাহর দরবারে করিতেছি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ফাযায়েলে কুরআন

চল্লিশ হাদীস

(১) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

حضرت عثمانؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے.

(رواہ البخاری وابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجۃ ھٰذا فی الترغیب وعزاہ الٰی مسلم ایضًا لکن حکی الحافظ فی الفتح عن ابی العلاء اَنَّ مسلمًا سکت عنہ)

(১) হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শরীফ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

(তারগীব ঃ বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

অধিকাংশ কিতাবে এই রেওয়ায়াতটি 'ওয়াও' (অর্থাৎ, এবং)এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে, উপরে হাদীসের এই তরজমাই লেখা হইয়াছে। ইহাতে সর্বোত্তম হওয়ার ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য হয়, যে কালামে পাক নিজে শিক্ষা করে অতঃপর অন্যকেও শিক্ষা দেয়। কিন্তু কোন কোন কিতাবে এই রেওয়ায়েত 'আও' (অর্থাৎ, অথবা)এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফযীলত ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ নিজে শিক্ষা করে অথবা অন্যকে শিক্ষা দেয় উভয়ের জন্য পৃথকভাবে সর্বোত্তম হওয়ার ফযীলত রহিয়াছে।

আল্লাহ পাকের কালাম যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি ; ইহার স্থায়িত্ব এবং প্রচারের উপরই দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, কাজেই উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি যে সর্বোত্তম হইবে উহা কাহারো ব্যাখ্যা করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সর্বোচ্চ স্তর হইল অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ শিক্ষা করা। সর্বনিম্ন হইল শুধু শব্দ পড়া শিক্ষা করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি এরশাদও এই হাদীসকে সমর্থন করে। যাহা হযরত সাঈদ ইবনে

সুলাইম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শিক্ষালাভ করিয়া অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিকে নিজের চাইতে উত্তম মনে করিল, সে যেন আল্লাহ পাকের দেওয়া কুরআনের নেয়ামতকে অবমাননা করিল। আর ইহা স্পষ্ট কথা যে, যখন আল্লাহর কালাম সমস্ত কালাম হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত। এই বিষয়ে পৃথকভাবে সামনে হাদীস আসিতেছে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) অপর একটি হাদীস হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামে পাক হাসিল করিল, সে যেন নিজের কপালে নবুওয়াতের এলেম জমা করিয়া নিল।

হযরত সাহ্ল তুস্তরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি মহব্বতের আলামত হইল, অন্তরে তাহার কালামে পাকের প্রতি মহব্বত হওয়া।

কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দিনে যাহারা আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে, তাহাদের তালিকায় 'শরহে এহ্য়া' কিতাবে ঐ সকল লোককেও উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মুসলমানদের ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে ঐ সকল লোককেও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে যাহারা বাল্যকালে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং বড় হইলে কুরআন তেলাওয়াতের এহ্তেমাম করে।

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَ فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ.

ابوسعیدؓ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سُبحانہٗ وتقدّس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شانہٗ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شانہٗ کو تمام مخلوق پر۔

(رواه الترمذی والدارمی والبیهقی فی الشعب)

(২) হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে মশগুল থাকার কারণে যিকির করার ও দোয়া করার অবসর পায় না, তাহাকে আমি সকল দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতে বেশী

দিয়া থাকি। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের মর্যাদা সমস্ত কালামের উপর এইরূপ, যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত মখলুকের উপর। (তিরমিযী, দারেমী, বাইহাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার বা জানিবার ও বুঝিবার ব্যাপারে এইরূপ ব্যস্ত থাকে যে, অন্য কোন যিকির–আযকার ও দোয়া করিবার অবসর পায় না, আমি তাহাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতেও উত্তম বস্তু দান করিব। দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হইল, যখন কোন লোক মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি বিতরণ করিতে থাকে এবং মিষ্টি গ্রহণকারীদের কোন একজন যদি এই বিতরণকারীর কাজে মশগুল থাকে আর এই কারণে সে আসিতে না পারে, তবে অবশ্যই তাহার অংশ আগেই আলাদা করিয়া রাখা হয়। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আমি তাহাকে শোকরগুযার বান্দার সওয়াব হইতেও উত্তম সওয়াব দান করিব।

(٣) عن عقبة بن عامرؓ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلث خير له من ثلث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل (رواه مسلم وابوداؤد)

عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور دو اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے اور تین آیات کا تین اونٹنیوں سے اسی طرح چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔

(৩) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমরা মসজিদে নববীর ছুফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, সকাল বেলা বুতহান বা আকীক নামক বাজারে যাইয়া

কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দুইটি অতি উত্তম উটনী লইয়া আসিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদে গিয়া দুইটি আয়াত পড়া বা দুইটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দুইটি উটনী হইতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হইতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হইতে উত্তম এবং ঐগুলির সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

ছুফ্ফাহ্ মসজিদে নববীর একটি বিশেষ চালাঘরের নাম। যাহা গরীব মুহাজিরগণের বসিবার স্থান ছিল। আসহাবে ছুফ্ফার সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কম বেশী হইতে থাকিত। আল্লামা সূয়ূতী (রহঃ) একশত একজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের নামের উপর একটি আলাদা কিতাব লিখিয়াছেন। বুতহান ও আকীক মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবর্তী দুইটি জায়গার নাম, যেখানে উটের বাজার বসিত। আরবদের নিকট উট অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল। বিশেষতঃ উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট উট খুবই প্রিয় ছিল।

'কোন রকম গোনাহ ছাড়া' কথাটির অর্থ হইল, বিনা পরিশ্রমে কোন বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ত বা কাহারো নিকট হইতে ছিনতাই করিয়া লওয়া হয়, অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ইত্যাদিতে কোন আত্মীয়-স্বজনের মাল আত্মসাৎ করা হয়,নতুবা কাহারো মাল চুরি করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সবগুলি পন্থা বাদ দিয়া বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ বিনা পরিশ্রমে এবং কোনরূপ অন্যায় ব্যতীত উট হাসিল করা যত পছন্দনীয়, উহার চেয়েও বেশী পছন্দনীয় ও উত্তম হইল কয়েকটি আয়াত হাসিল করিয়া নেওয়া। ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, দুই-একটি উট তো দূরের কথা ; কেহ সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী পাইলেই কি? বাদশাহীও যদি কেহ পাইয়া যায় তবে তাহাতেই বা কি? আজ না হয় কাল মৃত্যু উহা হইতে জোরপূর্বক পৃথক করিয়া দিবে। কিন্তু একটি আয়াতের সওয়াব চিরকাল তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিবে। কাহাকেও আপনি একটি টাকা দান করিলে সে কত আনন্দিত হইবে! পক্ষান্তরে তাহার নিকট এক হাজার টাকা রাখিয়া যদি বলেন যে, এইগুলি তোমার নিকট রাখ, একটু পরেই আমি আসিয়া নিয়া যাইব, ইহাতে সে বিন্দুমাত্রও আনন্দিত হইবে না। কারণ ইহাতে আমানতের বোঝা বহন ছাড়া তাহার কোন লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস শরীফে স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুর পরস্পর তুলনা দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়াও উদ্দেশ্য। মানুষ যেন নিজের চাল-চলন ও কাজকর্মের উপর গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে যে, আমি

কি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য মূল্যবান জীবন ধ্বংস করিতেছি, নাকি স্থায়ী বস্তুর জন্য। আর আফসোস ঐ সময়ের উপর যাহা দ্বারা চিরস্থায়ী বিপদ কামাই করিতেছি।

'উহার সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম' হাদীসের এই শেষ বাক্যটির তিনটি অর্থ হইতে পারে—

(এক) চার সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তারিত বলিয়া দিয়াছেন এবং চারের উপরের সংখ্যাগুলিকে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যত আয়াত পড়িবে উহা ততসংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম হইবে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে উট বলিতে উট ও উটনী উভয়কে বুঝানো হইয়াছে এবং চারের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কেননা, চার পর্যন্ত তো স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(দুই) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ রুচির তারতম্যের কারণে কেহ উটনী পছন্দ করে আবার কেহ উট পছন্দ করে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যের মধ্যে ইহা বলিয়া দিলেন যে, প্রতিটি আয়াত যেমন একটি উটনী হইতে উত্তম, তেমনি যদি কেহ উট পছন্দ করে তবে একটি আয়াত একটি উট হইতেও উত্তম হইবে।

(তিন) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বর্ণনা করা হইয়াছে, চারের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে নয়। তবে দ্বিতীয় অর্থে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, একটি উটনী অথবা একটি উট হইতে উত্তম এরূপ নহে, বরং সমষ্টি বুঝানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ, একটি আয়াত একটি উট ও উটনী উভয়ের সমষ্টি হইতে উত্তম, এইরূপে প্রতিটি আয়াত নিজের সংখ্যা অনুযায়ী উট ও উটনী উভয়ের সমষ্টি হইতে উত্তম। ইহাতে প্রতি আয়াতের মোকাবিলা যেন এক জোড়ার সহিত করা হইল। আমার আব্বাজান (রহঃ) এই অর্থকেই পছন্দ করিয়াছেন। কারণ, ইহাতে অধিক ফযীলত বুঝা যায়। যদিও ইহার অর্থ এই নয় যে, একটি বা দুইটি উট একটি আয়াতের সওয়াবের সমতুল্য হইতে পারে। মূলতঃ এইগুলি শুধুমাত্র উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে। আমি আগেই লিখিয়াছি যে, এক আয়াতের সওয়াব যাহা চিরস্থায়ী এবং চিরকাল বাকী থাকিবে তাহা সারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাদশাহী হইতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক বুযুর্গের কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু তাহার নিকট দরখাস্ত করিল যে, জাহাজ হইতে নামিয়া আপনি জিদ্দায় অবস্থান করিলে আপনার বরকতে আমাদের ব্যবসায়ে লাভ হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসার লভ্যাংশ দ্বারা উক্ত বুযুর্গের

কয়েকজন খাদেমকে কিছু ফায়দা পৌছানো। প্রথমতঃ বুযুর্গ ইহাতে অসম্মতি জানান। কিন্তু তাহারা অধিক পীড়াপীড়ি করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যবসার মালে সর্বাধিক কি পরিমাণ লাভ হয়? তাহারা বলিল, উহা বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে ; বেশীর চেয়ে বেশী দ্বিগুণ হইয়া যায়। বুযুর্গ বলিলেন, এই সামান্য লাভের জন্য তোমরা এত কষ্ট করিয়া থাক, এই নগণ্য জিনিসের জন্য আমরা হরম শরীফের নামায কিভাবে ছাড়িয়া দিব, যেখানে একের বদলে এক লক্ষ সওয়াব পাওয়া যায়। বাস্তবিকই মুসলমানদের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়, তাহারা সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য কত বড় দ্বীনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেয়।

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ۔

(رواه البخاری ومسلم وابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجة)

حضرت عائشہ رض نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر اُن ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دِقت اُٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনের পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সকল ফেরেশতাদের দলভুক্ত হইবে যাহারা লেখার কাজে নিয়োজিত এবং নেককার। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

কুরআন শরীফে পারদর্শী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ভালভাবে কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়াছে এবং বেশী বেশী তেলাওয়াত করিয়া থাকে। আর যদি অর্থ ও মর্ম বুঝিয়া পড়ে তবে তো আর কথাই নাই। ফেরেশতাদের দলভুক্ত হওয়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাও কুরআন শরীফ লওহে মাহফূজ হইতে নকল করিয়া থাকেন আর এই ব্যক্তিও কুরআনের নকলকারী এবং মানুষের নিকট কুরআন পৌছাইয়া থাকে। অতএব উভয়েই যেন একই কাজে নিয়োজিত। অথবা উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, হাশরের ময়দানে তাহারা ফেরেশতাদের সহিত মিলিত হইবে। ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠকারীকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে—এক সওয়াব তেলাওয়াতের

জন্য আর এক সওয়াব বার বার ঠেকিয়া ঠেকিয়া কষ্ট করিয়া পড়িবার জন্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তি পারদর্শী ব্যক্তি হইতে আগে বাড়িয়া যাইবে। পারদর্শী ব্যক্তির জন্য যে ফযীলত বলা হইয়াছে তাহা ইহা হইতে অনেক বেশী। কারণ তাহাদেরকে খাছ ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হইয়াছে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ার কারণে যে কষ্ট হয় উহার সওয়াব সে আলাদা পাইবে। অতএব এই ওজরের কারণে কাহারো পক্ষে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাবারানী ও বায়হাকী নামক দুই কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে কিন্তু ইয়াদ থাকে না, সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার আকাঙ্খা করিতে থাকে কিন্তু তাহার মুখস্থ করিবার শক্তি নাই এবং সে পড়াও ছাড়িয়া দেয় না, আল্লাহ তায়ালা হাফেজদের সঙ্গেই তাহার হাশর করিবেন।

(৫) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (رواه البخاری والترمذی والنسائی)

ابن عمرؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہٗ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق سبحانہٗ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔

(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও উপর হাছাদ (অর্থাৎ হিংসা) করা জায়েয নাই। এক, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফীক দিয়াছেন এবং সে দিন-রাত্র উহাতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে দিন-রাত্র উহা হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিতে থাকে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

কুরআন ও হাদীসের বহু বর্ণনা দ্বারা হিংসা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও নাজায়েয বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের দ্বারা দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা জায়েয বুঝা যায়। যেহেতু হিংসা নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত

রেওয়ায়াতসমূহ বহু প্রসিদ্ধ ও অধিক বিধায় ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই হাদীসে হাছাদ শব্দটি ঈর্ষার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহাকে আরবীতে গিব্‌তা বলে। হাছাদ ও গিবতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাহারও উপর কোন নেয়ামত দেখিয়া এই কামনা করা যে, এই নেয়ামত আমি লাভ করি বা না করি তাহার নিকট যেন উহা না থাকে—ইহাকে হাছাদ বা হিংসা বলে। পক্ষান্তরে, কাহারও নেয়ামত দেখিয়া এই আকাঙ্খা করা যে, ইহা তাহার নিকট থাকুক বা না থাকুক আমি যেন লাভ করি—ইহাকে গিবতা বা ঈর্ষা বলে। হাছাদ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম তাই ওলামায়ে কেরাম হাছাদ শব্দটিকে রূপক হিসাবে গিব্‌তার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গিব্‌তা করা দুনিয়াবী বিষয়ে জায়েয এবং দ্বীনি বিষয়ে মুস্তাহাব। দ্বিতীয় অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, অনেক সময় কোন কথা বুঝাইবার জন্য অনুমান বা ধরা যাক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ হাছাদ যদি জায়েয হইত তবে এই দুইটি বিষয় এমন যে, উহাতে জায়েয হইত।

(٦) عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِیْ یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّۃِ رِیْحُھَا طَیِّبٌ وَّطَعْمُھَا طَیِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِیْ لَا یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَۃِ لَا رِیْحَ لَھَا وَطَعْمُھَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِیْ لَا یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ کَمَثَلِ الْحَنْظَلَۃِ لَیْسَ لَھَا رِیْحٌ وَّطَعْمُھَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِیْ یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّیْحَانَۃِ رِیْحُھَا طَیِّبٌ وَّطَعْمُھَا مُرٌّ (رواہ البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجۃ)

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا، اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔

(৬) হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে মুসলমান কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল তুরন্‌জ (বা কমলালেবু)এর ন্যায়।

যাহার খোশবুও উত্তম এবং স্বাদও চমৎকার। আর যে মুসলমান কুরআন শরীফ পাঠ করে না তাহার দৃষ্টান্ত হইল খেজুরের ন্যায়। যাহার কোন খোশবু নাই কিন্তু স্বাদ খুবই মিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পড়ে না তাহার দৃষ্টান্ত হইল হান্‌জাল ফলের ন্যায়। যাহার স্বাদ তিক্ত এবং কোন খোশবু নাই। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল সুগন্ধি ফুলের ন্যায়। যাহার খোশবু চমৎকার কিন্তু স্বাদ তিক্ত।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, অনুভব করা যায় না এমন জিনিসকে অনুভবযোগ্য জিনিসের সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। যাহাতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং না করার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা সহজে বুঝে আসিয়া যায়। নতুবা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, কালামে পাকের স্বাদ ও সুগন্ধির সহিত তুরন্‌জ ও খেজুরের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তবে এইসব বস্তুর সহিত তুলনার মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্য রহিয়াছে যাহা এলমে নবুওতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন, তুরন্‌জের কথাই ধরুন। ইহা মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে, পেট পরিস্কার করে এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ইত্যাদি। এই উপকারগুলি এমন যে, কুরআন তেলাওয়াতের সাথে এইগুলির খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন মুখ খোশবুদার হওয়া, অন্তর পরিস্কার হওয়া এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধি হওয়া। এইগুলি পূর্বে উল্লেখিত উপকারসমূহের সহিত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুরন্‌জের একটি বিশেষত্ব ইহাও যে, যে ঘরে তুরন্‌জর থাকে সেই ঘরে জ্বিন প্রবেশ করিতে পারে না। যদি এই কথা ঠিক হয়, তবে কালামে পাকের সহিত ইহার বিশেষ মিল রহিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসকের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তুরন্‌জের দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। 'এহ্ইয়া' কিতাবে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, তিনটি বস্তুর দ্বারা স্মরণ শক্তি বাড়িয়া যায়। সেইগুলি হইল মেসওয়াক, রোযা এবং কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত।

আবূ দাউদ শরীফে এই হাদীসের শেষ অংশে আরও একটি অত্যন্ত উপকারী কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে—'উত্তম সাথীর দৃষ্টান্ত হইল মেশকের খোশবূওয়ালা লোকের মত। তুমি যদি তাহার নিকট হইতে মেশ্‌ক নাও পাও অন্তত খোশবু তো পাইবেই। আর অসৎ সাথীর দৃষ্টান্ত হইল আগুনের চুল্লিওয়ালার মত। যদি কয়লার কালি তোমার গায়ে নাও লাগে তবে ধুয়া হইতে তো বাঁচিতে পারিবে না।' বিষয়টি অত্যন্ত আহাম ও

গুরুত্বপূর্ণ—মানুষকে তাহার সাথীদের ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কি ধরণের লোকদের সহিত সে সবসময় উঠাবসা ও চলাফেরা করিতেছে।

(৭) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ (رواه مسلم)

حضرت عمر رضی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔

(৭) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পাকের দ্বারা বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং বহু লোককে নীচু ও অপদস্থ করেন। (মুসলিম)

অর্থাৎ যাহারা উহার উপর ঈমান আনে ও আমল করে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা ও ইজ্জত দান করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে অপদস্থ করেন। কালামে পাকের একটি আয়াত দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়— يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআনের দ্বারা অনেক লোককে হেদায়াত দান করেন এবং অনেক লোককে গুমরাহ করেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (سورہ بنی اسرائیل ع ۹)

অর্থাৎ আমি কুরআনের মধ্যে এমন বিষয় নাযিল করিয়াছি যাহা ঈমানদারদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত স্বরূপ আর জালেমদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—এই উম্মতের মধ্যে বহু মুনাফেক ক্বারী হইবে। কোন কোন মাশায়েখ হইতে 'এহ্ইয়া উল উলূম' কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, বান্দা যখন কালামে পাকের কোন সূরা পড়িতে শুরু করে তখন ফেরেশতারা উহা শেষ করা পর্যন্ত তাহার উপর রহমতের দোয়া করিতে থাকে, আবার কোন ব্যক্তি যখন কুরআন পাকের একটি সূরা পড়িতে শুরু করে, তখন ফেরেশতারা

উহা শেষ করা পর্যন্ত তাহার উপর লানত করিতে থাকে। কোন কোন আলেম হইতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ তেলাওয়াত করে এবং নিজেই নিজের উপর লানত করিতে থাকে অথচ সে উহা টেরও পায় না। কুরআন শরীফে সে এই আয়াত পড়ে—

أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ জালেমদের উপর আল্লাহর লানত।" (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ১৮) আর সে নিজেই জালেম হওয়ার কারণে এই লানতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনিভাবে সে এই আয়াতও পড়ে ঃ

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

অর্থাৎ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত।" (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ৬১) আর সে নিজে মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে নিজেই এই লানতের যোগ্য হইয়া যায়।

হযরত আমের ইবনে ওয়াছিলাহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) নাফে ইবনে আব্দুল হারেসকে মক্কা মুকাররামার শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন বিভাগের দায়িত্বভার কাহাকে দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, ইবনে আব্‌যাকে। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইবনে আব্‌যা কে? তিনি আরজ করিলেন, সে আমার একজন গোলাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) অভিযোগের সুরে বলিলেন, গোলামকে কেন আমীর বানাইয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, সে কুরআন শরীফ ভাল পড়িতে পারে। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কালামে পাকের বদৌলতে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং বহু লোককে অপদস্থ করেন।

(৮) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رض بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَّ بَطْنٌ وَّالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِيْ اَلَا مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ

عبدالرحمن رض بن عوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لئے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے۔ اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس

قَطَعَنِیْ قَطَعَهُ اللّٰهُ (رواه فی شرح السنة) شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاوے اور جس نے مجھ کو توڑا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جُدا کرے۔

(৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নীচে থাকিবে। প্রথমঃ কালামে পাক। উহা সেইদিন বান্দার ব্যাপারে ঝগড়া করিবে—এই কুরআনের জাহের ও বাতেন দুইটি দিক রহিয়াছে। দ্বিতীয়ঃ আমানত। তৃতীয়ঃ আত্মীয়তা ; ইহা সেই দিন উচ্চ আওয়াজে বলিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে পৃথক করিয়া দিন। (শরহুস-সুন্নাহ্)

এই জিনিসগুলি আরশের নীচে হওয়ার অর্থ হইল, এইগুলি পরিপূর্ণ নৈকট্য লাভ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে এইগুলি খুবই নিকটবর্তী হইবে। কালামে পাকের ঝগড়া করিবার অর্থ হইল, যাহারা কুরআনকে পুরাপুরি মানিয়াছে, উহার হক আদায় করিয়াছে, উহার উপর আমল করিয়াছে তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করিবে, সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের মর্তবা বুলন্দ করাইবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে নকল করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ আল্লাহর দরবারে আরজ করিবে, ইয়া আল্লাহ! তাহাকে পোষাক দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা সম্মানের তাজ দান করিবেন। অতঃপর আরও বেশী দেওয়ার দরখাস্ত করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা সম্মানের পুরা পোষাক দান করিবেন। অতঃপর সে দরখাস্ত করিবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির উপর রাজী হইয়া যান। তখন আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তির উপর নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করিয়া দিবেন। দুনিয়াতেই যখন প্রিয়জনের সন্তুষ্টির চাইতে বড় আর কোন নেয়ামত হয় না, তখন আখেরাতে প্রিয়জনের সন্তুষ্টির মুকাবিলা আর কোন নেয়ামত করিতে পারিবে? আর যাহারা কুরআনের হক নষ্ট করিয়াছে তাহাদেরকে কুরআন জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার কি খেয়াল রাখিয়াছ? আমার কি হক আদায় করিয়াছ?

'শরহে এহইয়া' কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, বছরে দুইবার খতম করা কুরআনের হক। এখন ঐ সব লোক যাহারা ভুল করিয়াও তেলাওয়াত করেন না তাহারা একটু চিন্তা করিয়া

দেখুন যে, এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে কি জবাবদিহি করিবেন? মৃত্যু অবশ্যই আসিবে। উহা হইতে কোন ভাবেই পলায়নের উপায় নাই।

'কুরআনের জাহের ও বাতেন হওয়ার' অর্থ হইল, কুরআনের একটি জাহেরী অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে আর একটি বাতেনী অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের মধ্যে নিজের রায়ের দ্বারা কিছু বলিল, সে শুদ্ধ বলিলেও ভুল করিল। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন, জাহের অর্থ কুরআনের শব্দসমূহ, যাহা তেলাওয়াতের ব্যাপারে সকলেই সমান। আর বাতেন অর্থ হইল কুরআনের অর্থ ও মর্ম যাহা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যদি এলেম চাও, তবে কুরআন পাকের অর্থের মধ্যে চিন্তা–ফিকির কর। উহাতে আওয়ালীন ও আখেরীন অর্থাৎ পূর্ব–পরের সব এলেম রহিয়াছে। তবে কুরআন পাকের অর্থ বুঝিবার জন্য যে সকল শর্ত ও নিয়ম রহিয়াছে সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। এমন যেন না হয় যে, আমাদের এই জমানার মত কয়েকটি আরবী শব্দের অর্থ শিখিয়া কিংবা শব্দার্থ না জানিয়া শুধুমাত্র কুরআনের তরজমা দেখিয়া নিজের রায়কে উহার মধ্যে দাখেল করিয়া দিল। তফসীরবিদগণ তফসীর করার জন্য পনরটি এলেমের উপর পূর্ণ দক্ষতা হাসিল করা জরুরী বলিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহার জরুরতের প্রতি খেয়াল করিয়া এখানে সেইগুলি সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিতেছি। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, কালামে পাকের গভীর পর্যন্ত পৌছা সকলের জন্য সম্ভব নয়।

(১) আভিধানিক অর্থ জানা। ইহা দ্বারা কালামে পাকের একক শব্দসমূহের অর্থ জানা যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য আরবী আভিধানিক অর্থ জানা ছাড়া কালামে পাকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মুখ খোলাও জায়েয নাই। আর কয়েকটি শব্দার্থ জানিয়া নেওয়াই যথেষ্ট নহে। কেননা, অনেক সময় একটি শব্দের কয়েকটি অর্থ হইয়া থাকে অথচ সে উহা হইতে দুই–একটি অর্থ জানে আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

(২) এলমে নাহু অর্থাৎ আরবী ভাষার ব্যাকরণ জানা। কেননা যের যবর পেশ–এর পরিবর্তনে বাক্যের অর্থও পরিবর্তন হইয়া যায়। আর এই

জ্ঞান এলমে নাহুর উপর নির্ভর করে।

(৩) এলমে ছরফ অর্থাৎ শব্দ গঠন প্রণালী জানা। কেননা শব্দ গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার কারণে অর্থও ভিন্ন হইয়া যায়। ইবনে ফারেস (রহঃ) বলেন, যে এলমে ছরফ জানে না সে অনেক কিছুই জানে না। আল্লামা যমখশরী (রহঃ) তাহার 'উজুবাতে তাফসীর' কিতাবে একটি ঘটনা নকল করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি এলমে ছরফ না জানার কারণে কুরআনের আয়াত يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭১) অর্থাৎ যেদিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইমাম ও নেতাদের সহিত ডাকিব–এর তাফসীর করিল—'যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মায়ের সহিত ডাকিব।' এখানে সে 'ইমাম' শব্দটিকে 'উম্' (মা) এর বহুবচন মনে করিয়া বসিয়াছে। যদি সে এলমে ছরফ জানিত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে, 'উম্'–এর বহুবচন 'ইমাম' আসে না।

(৪) এলমে এশতেকাক অর্থাৎ ধাতুগত অর্থ জানা। কারণ, কোন শব্দ যখন দুইটি ধাতু হইতে বাহির হইয়া আসে তখন উহার অর্থ ভিন্ন হয়। যেমন مَسِيْحٌ একটি শব্দ। ইহা مَسْحٌ ধাতু হইতে বাহির হইলে অর্থ হইবে স্পর্শ করা এবং কোন কিছুর উপর ভিজা হাত বুলানো। আর مِسَاحَتْ হইতে বাহির হইলে ইহার অর্থ হইবে পরিমাপ করা।

(৫) এলমে মাআনী। এই এলেম দ্বারা অর্থ হিসাবে বাক্যের শব্দসমূহের পরস্পর সম্পর্ক জানা যায়।

(৬) এলমে বয়ান। এই এলেম দ্বারা বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং তুলনা ও ইশারা–ইঙ্গিত জানা যায়।

(৭) এলেমে বাদী'। এই এলেম দ্বারা ভাব প্রকাশে বাক্যের সৌন্দর্য জানা যায়। মাআনী, বয়ান ও বাদী' এই তিনটিকে একসাথে এলমে বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র বলা হয়। কুরআন তাফসীরের জন্য এইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কুরআনে পাক সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক গ্রন্থ। আর এই তিন এলেমের দ্বারা উহার অলৌকিকত্ব জানা যায়।

(৮) এলমে কেরাত। বিভিন্ন কেরাতের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ এবং এক অর্থের উপর অন্য অর্থের প্রাধান্য জানা যায়।

(৯) এলমে আকায়েদ। কালামে পাকে অনেক আয়াত এমন আছে, যেগুলির জাহেরী অর্থ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহার করা ঠিক হয় না। তাই এইসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন—

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ 'আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর।' (সূরা ফাত্হ, আয়াত ঃ ১০)

(১০) উসূলে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা দলীল–প্রমাণের প্রয়োগ ও বিধি–বিধান আহরণের কারণসমূহ জানা যায়।

(১১) শানে নূযূল অর্থাৎ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণসমূহ জানা। শানে নুযূলের দ্বারা আয়াতের অর্থ অধিক স্পষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে আসল অর্থ জানাও ইহার উপর নির্ভর করে।

(১২) নাসেখ ও মানসূখ জানা। এই এলেম দ্বারা রহিত আহকাম ও আমলযোগ্য আহকামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

(১৩) এলমে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা শাখাগত বিধানসমূহ আয়ত্ব করিয়া জুযিয়াত (শাখা) আয়ত্ব করিলে মূলনীতি চিনা যায়।

(১৪) ঐ সকল হাদীস জানাও জরুরী, যেগুলি কুরআন পাকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) এলমে ওয়াহবী বা আল্লাহ প্রদত্ত এলেম হাসিল হওয়াও জরুরী। ইহা আল্লাহ তায়ালার খাছ দান। খাছ বান্দাগণকেই এই এলেম দান করা হয়। নিম্নের হাদীস শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) এই দিকেই ইশারা করিয়াছেন। লোকেরা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি কোন খাছ এলেম দান করিয়াছেন বা কোন খাছ ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন? যাহা শুধু আপনার সহিত সম্পর্কিত অন্যদের জন্য নহে। তিনি বলিলেন, ঐ পাক যাতের কসম! যিনি জান্নাত বানাইয়াছেন এবং জান পয়দা করিয়াছেন, ঐ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা আল্লাহ তায়ালা কালামে পাক বুঝিবার জন্য কোন বান্দাকে দান করিয়া থাকেন। ইবনে আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন, কুরআনের এলেম এবং উহা দ্বারা যাহা হাসিল হয় তাহা এমন সমুদ্র যাহার কোন কূল কিনারা নাই।

উপরে বর্ণিত এলেমগুলি একজন মুফাস্‌সিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এই এলেমসমূহ জানা ব্যতীত কেহ কুরআন তফসীর করিলে উহা তফসীর বির রায় (মনগড়া তাফসীর) বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা নিষেধ করা হইয়াছে।

আরবী ভাষা সম্পর্কিত এলেমসমূহ সাহাবায়ে কেরামের জন্মগতভাবে হাসিল ছিল। আর বাকী এলেমগুলি তাহারা পাইয়াছিলেন নবুওয়তের

আলোক-ভাণ্ডার হইতে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, তোমার হয়ত এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, আল্লাহ্-প্রদত্ত এলেম হাসিল করা বান্দার সামর্থের বাহিরে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আসল কথা হইল, আল্লাহ্-প্রদত্ত এলেম হাসিল করার জন্য এমন সব উপায় ও আসবাব গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা এই এলেম দান করিয়া থাকেন। যেমন, জানা এলেমের উপর আমল করা এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ না থাকা ইত্যাদি।

ইমাম গাযয্‌লী (রহঃ) 'কিমিয়ায়ে সাআদত' কিতাবে লিখিয়াছেন, তিন ব্যক্তির উপর কুরআনের তফসীর প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ তাহাদের তফসীর বুঝার ক্ষমতা হয় না। (প্রথম) যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না। (দ্বিতীয়) যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে অথবা বেদআতী হয়। কেননা এই গোনাহ ও বেদআতের কারণে তাহার অন্তর কালো হইয়া যায়। ফলে কুরআনের মারেফত ও রহস্য বুঝিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। (তৃতীয়) যে ব্যক্তি কোন আকীদাগত বিষয়ে বাহ্যিক দিককে গ্রহণ করে এবং কুরআনের যে আয়াত উহার বিপরীত হয় উহা গ্রহণ করিতে তাহার মন তৈয়ার হয় না। এইরূপ ব্যক্তিও কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে। আয় আল্লাহ! আপনি আমাদের হেফাজত করুন।

(৯) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا (رواه احمد والترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه)

عبداللہ بن عمروؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے (کہ قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔

(৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের

দিন ছাহেবে কুরআনকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক এবং বেহেশতে মর্যাদার স্তরসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড় যেভাবে দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার মর্যাদা উহাই হইবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতে পৌঁছিবে।

(আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

'ছাহেবে কুরআন' দ্বারা বাহ্যতঃ হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বিস্তারিত আলোচনায় এই ফযীলত হাফেজদের জন্যই সাব্যস্ত করিয়াছেন ; নাযেরা পড়নেওয়ালাগণ ইহার মধ্যে শামেল নয়। প্রথমতঃ এই কারণে যে, ছাহেবে কুরআন শব্দটিই এই দিকে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয়তঃ এই কারণে যে, 'মুসনাদে আহমাদ' কিতাবে বর্ণিত আছে— حَتّٰى يَقْرَءَ شَيْئًا مَّعَهُ অর্থাৎ, যতটুকু কুরআন শরীফ তাহার সঙ্গে আছে সবটুকু পড়িবে। এই বাক্যটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, ইহা দ্বারা হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। যদিও বেশী পরিমাণে তেলাওয়াতকারী নাজেরা পড়নেওয়ালাগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'মিরকাত' কিতাবে আছে, এইরূপ পড়নেওয়ালা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয় যাহাকে কুরআন লানত করে। যেমন অন্য এক হাদীসে আছে, বহু কুরআন পড়নেওয়ালা এমন আছে, যাহারা কুরআন পড়ে কিন্তু কুরআন তাহাদের উপর লানত করে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তির ঈমান-আকীদা দুরস্ত না থাকে তবে কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা তাহাকে মকবূল বলা যাইবে না। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে এই ধরণের বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

তারতীল অর্থাৎ 'থামিয়া থামিয়া পড়া' সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) তাহার তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অভিধানে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া পড়াকে তারতীল বলে। আর শরীয়তের পরিভাষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করাকে তারতীল বলে। যথা ঃ—

(১) হরফসমূহ সহীহভাবে উচ্চারণ করা অর্থাৎ মাখরাজ আদায় করিয়া পড়া। যাহাতে ط এর জায়গায় ت এবং ضاد এর জায়গায় ظ উচ্চারণ না হয়।

(২) ওয়াকফ-এর জায়গায় ভালভাবে থামা। যাহাতে বাক্যের সংযোগ ও বিরাম অসঙ্গত না হয়।

(৩) হরকতসমূহে ইশবা' করা। অর্থাৎ যের যবর ও পেশকে ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া পড়া।

(৪) আওয়াজ কিছুটা বুলন্দ করিয়া পড়া। যাহাতে কালামে পাকের

শব্দসমূহ জবান হইতে বাহির হইয়া কান পর্যন্ত পৌছে এবং অন্তরে আছর করে।

(৫) এইরূপ আওয়াজে পড়া যাহাতে দরদ পয়দা হয় এবং দিলের উপর তাড়াতাড়ি আছর করিতে পারে। কেননা দরদ ভরা আওয়াজ দিলের উপর খুব দ্রুত আছর করে এবং রূহ শক্তিশালী হয় ও আছর গ্রহণ করে। এই কারণেই হাকিমগণ বলিয়াছেন, যে ঔষধের আছর অন্তরে পৌছান দরকার উহা সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া দেওয়া চাই। এইভাবে দিল উহাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া নেয়। আর যে ঔষধের আছর কলিজায় পৌছান দরকার উহা মিষ্টির সহিত মিলাইয়া দেওয়া চাই। কারণ কলিজা মিষ্টি চোষণ করিয়া থাকে। তাই আমার মতে তেলাওয়াতের সময় যদি খাছভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তবে অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তারে অধিক সহায়ক হইবে।

(৬) তাশদীদ ও মদকে ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া পড়া। কারণ এইগুলি স্পষ্ট করিয়া পড়ার দ্বারা কালামে পাকের আজমত প্রকাশ পায় এবং অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করিতে সহায়ক হয়।

(৭) রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক আদায় করা। যাহা ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়ছে।

এই সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকেই তারতীল বলা হয়। আর এই সবগুলির মূল উদ্দেশ্য একটাই, অর্থাৎ কালামে পাকের মধ্যে গবেষণা ও চিন্তা-ফিকির করা। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফ কিভাবে তেলাওয়াত করিতেন? তিনি বলিলেন, হরকতসমূহকে বাড়াইতেন অর্থাৎ যের যবর ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে উচ্চারণ করিতেন এবং প্রত্যেকটি হরফ পৃথক পৃথক ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেন। তারতীলের সহিত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব যদিও অর্থ বুঝে না আসে।

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি তারতীলের সহিত সূরা আল-কারিয়া ও সূরা ইযা যুলযিলাত পাঠ করি ; ইহা আমার নিকট তারতীল ছাড়া সূরা বাকারা ও সূরা আলি ইমরান পাঠ করা হইতেও উত্তম।

ব্যাখ্যাকারীগণ ও মাশায়েখগণ বর্ণিত হাদীসের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, কুরআনে পাকের এক একটি আয়াত পড়িতে থাক এবং মর্যাদার এক একটি স্তরে উঠিতে থাক। কারণ, বিভিন্ন রেওয়ায়েতের দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতের স্তর কালামুল্লাহ শরীফের আয়াতের বরাবর। সুতরাং যে ব্যক্তি

যতগুলি আয়াতের পারদর্শী হইবে ততগুলি স্তর উপরে তাহার ঠিকানা হইবে। আর যে ব্যক্তি পুরা কালামে পাকের পারদর্শী হইবে, তাহার ঠিকানা সবচেয়ে উপরের স্তরে হইবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, হাদীস শরীফে আসিয়াছে, কুরআন পাঠকারীর চেয়ে উপরে জান্নাতে আর কোন স্তর নাই। সুতরাং কুরআন পাঠকারীগণ আয়াতসমূহ পরিমাণ উন্নতি করিবেন। আল্লামা দানী (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, কেরাতবিশারদগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার আয়াত আছে। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত হইল ২০৪, ১৪, ১৯, ২৫, ৩৬।

'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে আছে যে, প্রতিটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর। সুতরাং ক্বারীকে বলা হইবে, নিজের তেলাওয়াত পরিমাণ জান্নাতের স্তরে আরোহণ করিতে থাক। যে ব্যক্তি পুরা কুরআন শরীফ পড়িয়া নিবে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি কিছু অংশ পড়িয়া থাকিবে সে সেই পরিমাণ মর্যাদায় গিয়া পৌঁছিবে। মোট কথা, কেরাত যেখানে শেষ হইবে তাহার মর্যাদার স্তরও সেখানে শেষ হইবে।

বান্দার (লেখকের) মতে এই হাদীসটির অন্য একটি অর্থ হইতে পারে—যদি ইহা ঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ; আর ভুল হইলে উহা আমার ও শয়তানের পক্ষ হইতে ; আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই অর্থ এই যে, উপরোক্ত হাদীসে এক এক আয়াতের দ্বারা এক এক স্তর উন্নতি লাভের যে কথা বলা হইয়াছে হাদীসে এই উন্নতি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এইভাবে স্তর পাওয়ার জন্য তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। যখন এক আয়াত পড়া হইবে, তারতীলের সহিত পড়া হউক বা না হউক এক স্তর উন্নতি হইবে। বরং উক্ত হাদীসে বাহ্যতঃ গুণগত উন্নতি বুঝানো হইয়াছে যাহাতে তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার দখল রহিয়াছে। সুতরাং যে তারতীলের সহিত দুনিয়াতে পড়িত সেই তারতীলের সহিত আখেরাতেও পড়িতে পারিবে এবং সেই অনুযায়ীই তাহার মর্যাদার স্তরে উন্নতিও হইতে থাকিবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এক হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়াতে বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে আখেরাতে কুরআন শরীফ ইয়াদ থাকিবে নতুবা ভুলিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক রহম করুন—আমাদের মধ্যে

বহু লোক এমন আছে যাহাদেরকে মাতাপিতা বড় দ্বীনী আগ্রহে কুরআন শরীফ হেফজ করাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে দুনিয়াতেই তাহা ভুলিয়া যায়। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ইয়াদ করে এবং ইহার জন্য মেহনত ও কষ্ট করিতে করিতে মারা যায়, সে হাফেজদের দলভুক্ত হইবে। আল্লাহর দরবারে দানের কোন কমী নাই যদি কেহ নেওয়ার থাকে। (কবির ভাষায়—)

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

অর্থাৎ, হে শহীদী ! তাহার দয়া ও মেহেরবানী সকলের জন্য বরাবর। তোমার সহিত কি জিদ ছিল ; যদি তুমি কোনরকম উপযুক্ত হইতে।

(١٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ وَّلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ وَّمِيْمٌ حَرْفٌ.
(رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادا والدارمى)

ابن مسعودؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔

(১০) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়িবে, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিবে এবং এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান হইবে। আমি এই কথা বলি না যে, পুরা 'আলিফ–লাম–মীম' একটি অক্ষর বরং আলিফ এক অক্ষর, লাম এক অক্ষর এবং মীম এক অক্ষর।

অর্থাৎ অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পুরা আমলকে একটি গণ্য করা হয়, কালামে পাকের বেলায় সেইরূপ করা হয় না। বরং এই ক্ষেত্রে আমলের এক একটি অংশকেও পুরা আমল হিসাবে গণ্য করা হয়। এই জন্যই কালামে পাকের তেলাওয়াতের বেলায় প্রতিটি অক্ষরের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী হয় এবং প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার

পক্ষ হইতে দশটি করিয়া নেকীর ওয়াদা রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করিবে তাহাকে দশ নেকীর বরাবর সওয়াব দেওয়া হইবে।' (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৬০) দশগুণ সওয়াবের ওয়াদা এবং ইহা সর্বনিম্ন পরিমাণ।

আরও বলিয়াছেন—

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বাড়াইয়া দেন।

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬১)

প্রতিটি অক্ষরকে পৃথক পৃথক নেকী গণ্য করার দৃষ্টান্তস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 'আলিফ-লাম-মীম' পুরাটা একটি অক্ষর নয় ; বরং আলিফ, লাম, মীম প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা অক্ষর ধরা হইবে। এই ভাবে এখানে মোট ত্রিশটি নেকী হইয়া গেল। ইহাতে মতভেদ আছে যে, 'আলিফ-লাম-মীম' দ্বারা সূরা বাকারার প্রথম আয়াতকে বুঝানো হইয়াছে, নাকি সূরা ফীলের শুরুতে লেখা 'আলাম'কে বুঝানো হইয়াছে। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতকে বুঝানো হইলে বাহ্যিকভাবে অর্থ হইল যে, লিখিত অক্ষর ধর্তব্য হইবে। আর যেহেতু তিনটি হরফই লেখা হয়, তাই ত্রিশটি নেকী হইবে। আর যদি ইহার দ্বারা সূরা ফীলের 'আলাম' বুঝানো হয় তবে সূরা বাকারার শুরুতে যে 'আলিফ-লাম-মীম' আছে উহাতে নয়টি অক্ষর হইবে। এই জন্য উহার বিনিময়ে নব্বই নেকী হইবে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি এই কথা বলি না যে, 'বিসমিল্লাহ' এক অক্ষর। বরং বা, সীন, মীম অর্থাৎ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা অক্ষর।

(١١) عَنْ مُعَاذِ ۣ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْئُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ

معاذ جہنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اُس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمھارے گھروں

فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا (رواه احمد و ابوداؤد وصححه الحاكم)

میں ہو۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔

(১১) হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হইবে, যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও বেশী হইবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআনের উপর আমল করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা !

(আবূ দাউদ, আহমদ, হাকিম)

অর্থাৎ কুরআনে পাক পড়ার এবং উহার উপর আমল করার বরকত এই যে, কুরআন পাঠকারীর মাতাপিতাকে এমন মুকুট পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অনেক বেশী হইবে। যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়? অর্থাৎ সূর্য এত দূর হইতেও কত বেশী আলো দেয়, আর যদি উহা তোমাদের ঘরের ভিতর আসিয়া যায়, নিঃসন্দেহে উহার আলো ও চমক আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং কুরআন পাঠকারীর মাতাপিতাকে যে মুকুট পরানো হইবে উহার আলো ঘরে উদিত হওয়া সূর্য হইতেও বেশী হইবে। আর যখন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতার জন্য এত বড় সম্মান রহিয়াছে, তখন স্বয়ং তেলাওয়াতকারীর প্রতিদান কত বড় হইবে, তাহা নিজেই অনুমান করিয়া নিতে পারে। যাহারা ওসীলা তাহাদেরই যখন এত মর্যাদা তখন আসল পড়নেওয়ালার মর্যাদা আরও বহুগুণ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মাতাপিতাকে এই সম্মান শুধু এই জন্যই দেওয়া হইবে যে, তাহারা সন্তানের জন্ম ও শিক্ষার মাধ্যম হইয়াছেন।

সূর্য ঘরে হওয়া সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে সূর্য নিকটবর্তী হওয়ার কারণে আলো অধিক অনুভূত হওয়া ছাড়াও একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহা হইল, কোন বস্তু সবসময় কাছে থাকিলে উহার প্রতি আকর্ষণ ও মহব্বত বেশী হয়। তাই সূর্য দূরবর্তী হওয়ার কারণে যেরূপ অজানা অচেনা ভাব রহিয়াছে, সর্বদা নিকটে থাকার কারণে উহা মহব্বতে পরিণত হইবে। এই হিসাবে আলো ছাড়াও উহার সহিত মহব্বতের প্রতিও ইঙ্গিত বুঝা যায়। এখানে আরও একটি ইঙ্গিত এই যে, উহা তাহার নিজের হইবে। অর্থাৎ সূর্যের দ্বারা যদিও সকলেই উপকৃত হয় কিন্তু উহা যদি কাহাকেও দান করিয়া দেওয়া হয়

তবে উহা কত বড় গৌরবের বিষয় হইবে!

হাকেম (রহঃ) হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহাকে একটি নূরের তৈয়ারী মুকুট পরানো হইবে এবং তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরানো হইবে যে, পুরা দুনিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবে না। তাহারা আরজ করিবে, হে আল্লাহ! এই জোড়া কিসের বদলে দেওয়া হইয়াছে? তখন এরশাদ হইবে, তোমাদের সন্তানদের কুরআন শরীফ পড়ার বদলে।

'জামউল ফাওয়ায়েদ' কিতাবে তাবারানী হইতে নকল করা হইয়াছে, হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ায়, তাহার আগের ও পরের সকল গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। আর যে হেফজ করাইবে তাহাকে কিয়ামতের ময়দানে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উঠানো হইবে এবং তাহার সন্তানকে বলা হইবে, তুমি পড়িতে শুরু কর। সন্তান যখন একটি আয়াত পড়িবে তখন পিতার একটি মর্যাদা উন্নত করা হইবে। এইভাবে সমস্ত কুরআন শরীফ পূর্ণ হইবে।

সন্তান কুরআন শরীফ পড়িলে পিতা এইসব মর্যাদার অধিকারী হইবে। কথা এখানেই শেষ নয়। আর একটি কথাও শুনিয়া রাখুন। খোদা না করুন, যদি আপনার সন্তানকে দুই–চার পয়সার লোভে দ্বীনি এলেম হইতে বঞ্চিত রাখেন তবে শুধু এইটুকুই নয় যে, আপনি চিরস্থায়ী ছওয়াব হইতে মাহরূম থাকিবেন বরং আল্লাহর দরবারে আপনাকে জবাবদিহিও করিতে হইবে। আপনি এই ভয়ে যে, মৌলবী ও হাফেজগণ লেখাপড়ার পর মসজিদের মোল্লা আর মানুষের দয়ার ভিখারী হইয়া যায় ; আপনার আদরের সন্তানকে ইহা হইতে বাঁচাইতেছেন। মনে রাখিবেন, উহা দ্বারা আপনি তাহাকে তো চিরস্থায়ী বিপদে ফেলিতেছেনই, সাথে সাথে নিজের উপরও কঠিন জবাবদিহির বোঝা চাপাইয়া লইতেছেন। হাদীস শরীফে আছে—

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ الحديث

অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে ; সুতরাং প্রত্যেকে তাহার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে যে, তাহাদেরকে কি পরিমাণ দ্বীন শিক্ষা দিয়াছিলে।

হাঁ, ঐ সমস্ত দোষণীয় বিষয় হইতে আপনি নিজেকে এবং

সন্তানদেরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন ; কিন্তু উকুনের ভয়ে কাপড় না পরা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে কাপড় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা অবশ্যই করা চাই। মোটকথা, যদি সন্তানকে দ্বীনদারীর যোগ্যতা শিক্ষা দেন তবে আপনি জবাবদিহিতা হইতে রক্ষা পাইবেন। তদুপরি সে যতদিন জীবিত থাকিয়া নেক আমল করিবে এবং আপনার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিবে—এইগুলি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে। কিন্তু যদি দুনিয়ার খাতিরে সামান্য দু' চার পয়সার লোভে তাহাকে দ্বীনী শিক্ষা হইতে মাহরূম রাখেন তবে শুধু এইটুকুই নয় যে, আপনাকে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ; বরং তাহার দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় আচরণ ও গোনাহের কাজসমূহ আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের অবস্থার প্রতি রহম করুন। দুনিয়ার জীবন যে কোন অবস্থায়ই কাটিয়া যাইবে, আর মৃত্যু যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটাইবে ; কিন্তু যে কষ্টের পর মৃত্যু নাই সেই কষ্টের কোন সীমা নাই।

(١٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْاٰنُ فِيْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ (رواه الدارمی)

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جاوے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے۔

(১২) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি কুরআন শরীফকে কোন চামড়ার ভিতর রাখিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহা পুড়িবে না। (দারিমী)

মাশায়েখে হাদীস এই রেওয়ায়েতের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, চামড়া দ্বারা যে কোন জন্তুর চামড়াকে এবং আগুন দ্বারা দুনিয়ার আগুনকেই বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে ইহা একটি বিশেষ মোজেযা। যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার সহিত খাছ ছিল, যেমন অন্যান্য নবীদের মোজেযা তাহাদের যমানার সহিত খাছ ছিল। দ্বিতীয় অর্থ হইল, চামড়ার দ্বারা মানুষের চামড়া এবং আগুন দ্বারা জাহান্নামের আগুন বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে হুকুমটি ব্যাপক হইবে ; কোন যমানার সহিত খাছ হইবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের হাফেজ হইবে তাহাকে যদি কোন অন্যায়ের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তবুও আগুন তাহার উপর কোন ক্রিয়া করিবে না। অন্য

রেওয়ায়াতে مَا مَسَّتْهُ النَّارُ শব্দটিও আসিয়াছে। অর্থাৎ আগুন তাহাকে স্পর্শও করিবে না।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) শরহুস্‌সুন্নাহ কিতাব হইতে আবূ উমামা (রাযিঃ)এর যে রেওয়ায়াতটি নকল করিয়াছেন, উহাও এই দ্বিতীয় অর্থকে সমর্থন করে। যাহার তরজমা হইল, তোমরা কুরআন শরীফ হেফজ করিতে থাক। কারণ, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত থাকে, আল্লাহ তায়ালা ঐ অন্তরকে শাস্তি দিবেন না। এই হাদীস উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

যাহারা কুরআন হেফজ করাকে অনর্থক মনে করেন, তাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে এই সব ফযীলতের উপর একটু চিন্তা করুন। এই এক ফযীলতই এমন, যাহার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ হেফজ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, এমন কে আছে, যে গোনাহ করে নাই এবং সেই কারণে আগুনের উপযুক্ত হইবে না।

'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে ঐ সকল লোকের তালিকায় যাহাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আরশের নীচে স্থান দেওয়া হইবে 'দায়লামী' বর্ণিত হযরত আলী (রাযিঃ)এর হাদীস হইতে নকল করা হইয়াছে যে, 'হামেলীনে কুরআন' অর্থাৎ হাফেজগণ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মাহবূব বান্দাগণের সঙ্গে থাকিবে।

(١٣) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

(رواه احمد والترمذی وقال هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوی ليس هو بالقوی يضعف فی الحديث ورواه ابن ماجة والدارمی)

حضرت علیؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ شانہٗ اس کو جنت میں داخل فرماویں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

(১৩) হযরত আলী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িল অতঃপর উহা

হেফজ ইয়াদ করিল এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন এবং তাহার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিবেন, যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, দারিমী)

ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করিবেই যদিও বদ আমলের শাস্তি ভোগ করিয়া হউক না কেন। কিন্তু হাফেজদের ফযীলত হইল তাহারা প্রথম হইতেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। আর ফাসেক ফাজের কবীরা গোনাহে লিপ্ত দশ ব্যক্তির জন্য তাহাদের সুপারিশ কবূল করা হইবে। কাফেরদের জন্য নয় ; কেননা, তাহাদের জন্য কোন সুপারিশ নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাতকে হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৭২)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ, নবী এবং মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাহিবার কোন অধিকার নাই ; যদিও তাহারা আত্মীয় হয়।(সূরা তওবা,আয়াতঃ ১১৩)

কুরআনের আয়াত এই বিষয়ে পরিষ্কার যে, মুশরিকদের জন্য কোন ক্ষমা নাই। কাজেই বুঝা গেল, হাফেজদের সুপারিশ বলিতে ঐ সকল মুসলমানদের জন্য সুপারিশ বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা জরুরী হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাইতে চায় তাহারা যদি নিজেরা হাফেজ না হইয়া থাকে, এখন হেফজ করাও যদি তাহাদের জন্য সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততপক্ষে নিজের কোন নিকট আত্মীয়কে হাফেজ বানানো উচিত। যেন তাহার ওসীলায় সে নিজের বদ আমলের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার বাপ, চাচা, দাদা, নানা, মামা সকলেই হাফেজ। হে আল্লাহ! আপনি এই নেয়ামত আরও বাড়াইয়া দিন। (স্বয়ং লেখক সেই খান্দানের একজন।)

(۱۴) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَأُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهٗ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهٗ فَرَقَدَ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ. (رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حبان)

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو، پھر اُس کو پڑھو. اس لئے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اُس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اُس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سوگیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔

(১৪) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা কর অতঃপর উহা তেলাওয়াত কর। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তেলাওয়াত করে এবং তাহাজ্জুদ নামাযে পড়িতে থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত ঐ থলির মত যাহা মেশ্‌কের দ্বারা ভরপুর ; উহার খোশবু সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিল এবং রাত্রে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল তাহার দৃষ্টান্ত মেশ্‌কের ঐ থলির মত যাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে পাক শিক্ষা করিল এবং উহার যত্ন করিল, রাত্রের নামাযে তেলাওয়াত করিল, তাহার দৃষ্টান্ত সেই মেশ্‌কের পাত্রের মত যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে এবং খোশবুতে সারা ঘর মোহিত হয়। তদ্রূপ হাফেজের তেলাওয়াতের দরুন সমস্ত ঘর নূর ও বরকতে ভরপুর থাকে। আর যদি হাফেজ রাতে ঘুমাইয়া থাকে বা গাফলতির কারণে তেলাওয়াত না করে, তবুও তাহার অন্তরে যে কালামে পাক রহিয়াছে উহা সর্বাবস্থায় মেশ্‌ক। এই গাফলতির কারণে ক্ষতি এই হইল যে, অন্যান্য লোকেরা উহার বরকত হইতে মাহরূম রহিল। কিন্তু তাহার অন্তর তো এই মেশ্‌ককে নিজের ভিতরে ধারণ করিয়াই রাখিয়াছে।

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

(١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِیْ لَیْسَ فِیْ جَوْفِہٖ شَیْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ کَالْبَیْتِ الْخَرِبِ۔
(رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث صحیح ورواہ الدارمی والحاکم وصححہ)

عبداللہ بن عباسؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔

(১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে কুরআনের কোন অংশই রক্ষিত নাই, উহা বিরান ঘরের মত।

(তিরমিযী, দারিমী, হাকিম)

বিরান ঘরের সহিত তুলনার মধ্যে একটি বিশেষ রহস্য রহিয়াছে। خانۂ خالی را دیو مے گیرد বিরান ঘর যেমন জিন–ভূত দখল করিয়া লয় তদ্রূপ কালামে পাক হইতে শূন্য অন্তরকে শয়তান দখল করিয়া লয়। এই হাদীসে হিফজের কত তাকীদ করা হইয়াছে যে, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত নাই উহাকে বিরান ঘর বলা হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে ঘরে কুরআন মজীদ পড়া হয় তাহাদের সন্তান–সন্ততি বৃদ্ধি পায় এবং খায়র–বরকত বাড়িয়া যায়। সেই ঘরে ফেরেশতা অবতরণ করে এবং শয়তান সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। আর যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হয় না সেই ঘরে অভাব ও বে–বরকতি দেখা দেয়। ফেরেশতা সেই ঘর হইতে চলিয়া যায় এবং শয়তান ঢুকিয়া পড়ে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে এবং কেহ কেহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, খালি ঘর উহাকে বলে, যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয় না।

(١٦) عَنْ عَائِشَةَؓ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَۃُ الْقُرْاٰنِ فِی الصَّلٰوۃِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَۃِ الْقُرْاٰنِ فِیْ غَیْرِ الصَّلٰوۃِ وَقِرَاءَۃُ الْقُرْاٰنِ فِیْ غَیْرِ الصَّلٰوۃِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِیْحِ وَ التَّکْبِیْرِ وَالتَّسْبِیْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَۃِ

حضرت عائشہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل ہے

وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔

(১৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, নামাযের ভিতর কুরআন তেলাওয়াত করা নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা হইতে উত্তম। আর নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা তসবীহ এবং তকবীর হইতে উত্তম। আর তসবীহ পড়া ছদকা হইতে উত্তম। আর ছদকা রোযা হইতে উত্তম। আর রোযা দোযখ হইতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। (বায়হাকী ঃ শুয়াব)

কুরআন তেলাওয়াত যিকির হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। কারণ, ইহা আল্লাহ তায়ালার কালাম। আর ইহা পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য কালামের উপর আল্লাহ তায়ালার কালামের ফযীলত এইরূপ যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ফযীলত সমস্ত মখলূকের উপর। আল্লাহর যিকির ছদকা হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য রেওয়ায়াতেও আসিয়াছে। ছদকা রোযা হইতে উত্তম, যাহা এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ; কিন্তু অপর কিছু রেওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিপরীত অর্থাৎ রোযা উত্তম বুঝা যায়। আসলে এই পার্থক্য অবস্থাভেদে হইবে। কোন অবস্থায় রোযা উত্তম হইবে। আর কোন অবস্থায় ছদকা উত্তম হইবে। এমনিভাবে ব্যক্তি হিসাবেও পার্থক্য হইবে। কোন কোন লোকের জন্য রোযা উত্তম। এই হাদীসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তরের আমল রোযাই যখন দোযখ হইতে বাঁচিবার ঢালস্বরূপ, তখন সর্বোচ্চ আমল কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত কী হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন পড়িল সে প্রতি হরফে একশত নেকী পাইবে, যে ব্যক্তি নামাযে বসিয়া পড়িল সে প্রতি হরফে পঞ্চাশ নেকী পাইবে, যে নামাযের বাহিরে ওযূর সহিত পড়িল সে পঁচিশ নেকী পাইবে, আর যে ওযূ ছাড়া পড়িল সে দশ নেকী পাইবে, আর যে নিজে পড়ে নাই কিন্তু কান লাগাইয়া কুরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছে সেও প্রতি হরফের বদলে একটি করিয়া নেকী পাইবে।

(١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلٰثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ (رواه مسلم)

ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جاویں۔ ہم نے عرض کیا کہ بے شک (ضرور پسند کرتے ہیں) حضورؐ نے فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے۔ وہ تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔

(১৭) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা পছন্দ করে যে, সে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনটি বড় ধরনের মোটা তাজা গর্ভবতী উটনী পাইয়া যাইবে? আমরা আরজ করিলাম, অবশ্যই আমরা ইহা পছন্দ করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেহ যদি নামাযে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে উহা তিনটি মোটা-তাজা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম)

তিন নম্বর হাদীসে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। তবে পূর্বের হাদীসে নামাযের বাহিরে পড়ার আর এই হাদীসে নামাযের ভিতরে পড়ার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। নামাযের বাহিরে পড়ার চেয়ে ভিতরে পড়া যেহেতু উত্তম, তাই এখানে গর্ভবতী উটনীর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে এবাদতও যেমন দুইটি অর্থাৎ নামায ও তেলাওয়াত, তেমনি নেয়ামতও দুইটির কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ উটনী এবং দ্বিতীয়টি উহা গর্ভবতী হওয়া। তিন নম্বর হাদীসের ফায়দায় লেখা হইয়াছে যে, এই ধরনের হাদীসের দ্বারা কেবল বুঝানোর জন্যই উপমা দেওয়া হয়। নতুবা একটি আয়াতের চিরস্থায়ী ছওয়াব হাজারো ক্ষণস্থায়ী উটনী হইতে উত্তম।

(١٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ

اوس ثقفیؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ

جاتا ہے۔ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ
تَضَعَّفُ عَلٰى ذَالِكَ اِلٰى اَلْفَيْ دَرَجَةٍ۔
(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

(১৮) হযরত আউস ছাকাফী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়িলে একহাজার গুণ ছওয়াব হয় আর দেখিয়া পড়িলে দুই হাজার গুণ পর্যন্ত ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী ঃ শুয়াব)

হাফেজে কুরআনের বিভিন্ন ফযীলত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে দেখিয়া পড়ার ফযীলত এই জন্য আসিয়াছে যে, কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়ার মধ্যে চিন্তা-ফিকির বেশী করা যায়। আবার ইহাতে কয়েকটি এবাদত একসাথে হয়, যথা—কুরআনে পাক দেখা, কুরআনে পাক হাতে স্পর্শ করা ইত্যাদি। এই জন্যই দেখিয়া পড়া উত্তম। তবে কোন কোন রেওয়ায়াতে মুখস্থ পড়াকে উত্তম বলা হইয়াছে, তাই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এই ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়াছে যে, কালামে পাক মুখস্থ পড়া উত্তম নাকি দেখিয়া পড়া উত্তম। এক জামাতের রায় হইল, উপরোক্ত হাদীসের কারণে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া উত্তম। কারণ ইহাতে ভুল পড়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায় এবং কুরআনের উপর নজর থাকে। অন্যান্য রেওয়ায়াতের কারণে আরেক জামাত মুখস্থ পড়াকে প্রাধান্য দেন। কারণ ইহাতে খুশু ও মনোযোগ বেশী হয় এবং রিয়া থাকে না, তদুপরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মুখস্থ পড়ার অভ্যাস ছিল।

ইমাম নববী (রহঃ) ইহার ফায়সালা দিয়াছেন যে, মানুষের অবস্থা হিসাবে ফযীলত বিভিন্ন হইবে। দেখিয়া পড়িলে যাহার মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য দেখিয়া পড়া উত্তম। আর মুখস্থ পড়িলে যাহার মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য মুখস্থ পড়া উত্তম।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ)ও 'ফতহুল বারী' নামক কিতাবে এই ব্যাখ্যাটিকেই পছন্দ করিয়াছেন। কথিত আছে, অধিক পরিমাণে তেলাওয়াতের কারণে হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর নিকট দুই জিল্দ কুরআন শরীফ ছিড়িয়া গিয়াছিল। 'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া

কুরআন শরীফ খুলে এবং একশত আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার আমলনামায় সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয়। কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী বলা হয়। আবূ উবাইদা (রাযিঃ) এক হাদীসে মুসাল্‌সাল নকল করিয়াছেন, উহার প্রত্যেক বর্ণনাকারী বলিয়াছেন যে, আমার চোখের অসুখ ছিল, এইজন্য আমার উস্তাদ কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক সময় এশার নামাযের পর কুরআন শরীফ খুলিতেন এবং ফজরের নামাযের সময় উহা বন্ধ করিতেন।

(١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

عبداللہ بن عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے پوچھا گیا کہ حضورؐ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

(১৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায় যেমন লোহাতে পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা পরিষ্কার করার উপায় কি? তিনি বলিলেন, মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ অতি মাত্রায় গোনাহ করিলে এবং আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকিলে অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায়, যেমন লোহাতে পানি লাগিলে মরিচা পড়িয়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ উহা পরিষ্কারের জন্য রেতের কাজ করে। অন্তর আয়নার মত, উহা যত ময়লাযুক্ত হইবে মারেফতের প্রতিফলন ততই কম হইবে। পক্ষান্তরে উহা যে পরিমাণ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে সেই পরিমাণ উহাতে মারেফতের প্রতিফলন স্পষ্ট হইবে। এই কারণে মানুষ যে পরিমাণ গোনাহ ও শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহর মারেফত হইতে দূরে থাকিবে। অন্তর নামক এই আয়নাকে পরিষ্কার করার জন্য মাশায়েখগণ

রিয়াজত-মুজাহাদা, যিকির-আযকার ও শুগলের ছবক দিয়া থাকেন। হাদীসে আছে, যখন বান্দা গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খালেছ তওবা করে তবে কাল দাগটি মিটিয়া যায়। আর যদি আরও একটি গোনাহ করে তবে আরও একটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে একের পর এক গোনাহ করিতে থাকিলে একের পর এক দাগসমূহ দ্বারা অন্তর একেবারে কাল হইয়া যায়। অতঃপর এই অন্তরে আর ভাল কাজের প্রতি কোন আগ্রহই থাকে না। বরং মন্দ কাজের প্রতিই তাহার আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। আয় আল্লাহ! এই অবস্থা হইতে আমাদেরকে হেফাজত করুন। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, নিশ্চয় তাহাদের বদআমলসমূহ তাহাদের অন্তরে মরিচা জমাইয়া দিয়াছে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইজন উপদেশদাতা রাখিয়া গেলাম। একটি কথা বলে অপরটি চুপ থাকে। প্রথমটি কুরআন শরীফ আর দ্বিতীয়টি মৃত্যুর স্মরণ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শিরধার্য, কিন্তু উপদেশদাতা তাহার জন্যই হইবে, যে উপদেশ কবূল করে এবং উপদেশের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দ্বীন-ধর্মকেই অনর্থক ও উন্নতির পথে বাধা মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োজনই বা কাহার, আর উপদেশই বা কি কাজে আসিবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, পূর্বেকার লোকেরা কুরআন শরীফকে আল্লাহর ফরমান মনে করিত, রাতভর উহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিত, আর দিনের বেলায় উহার উপর আমল করিত। কিন্তু তোমরা উহার হরফ ও যের-যবরকে তো খুবই দুরস্ত করিতেছ, কিন্তু উহাকে শাহী ফরমান মনে কর না এবং উহার মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর না।

(٢٠) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ شَرَفًا يَتَبَاهُوْنَ بِهٖ وَاِنَّ بَهَاءَ اُمَّتِىْ وَشَرَفَهَا الْقُرْاٰنُ (رواه فى الحلية)

حضرت عائشہ رض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لئے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے

(২০) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য কোন না কোন গর্ব ও মর্যাদার বিষয় থাকে, যাহা দ্বারা সে গর্ব করিয়া থাকে। আমার উম্মতের গর্ব ও মর্যাদার বিষয় হইল কুরআন শরীফ। (হিল্য়াতুল-আওলিয়া)

অর্থাৎ মানুষ নিজেদের বাপ-দাদা, খান্দান এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয়ের দ্বারা নিজেদের মর্যাদা ও বড়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর আমার উম্মতের গৌরবের বস্তু হইল আল্লাহর কালাম। কেননা ইহা পড়া, ইয়াদ করা, অন্যকে পড়ানো, ইহার উপর আমল করা ইত্যাদি সবই গৌরবের বিষয়। কেনই বা হইবে না, ইহা তো মাহবুবের কালাম, মনিবের ফরমান, দুনিয়ার বড় হইতে বড় কোন মর্যাদাই উহার সমান হইতে পারে না। ইহা ছাড়া দুনিয়ার যত মর্যাদা ও গুণাবলী আছে, উহা আজ নহে কাল অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কালামে পাকের মর্যাদা ও সম্মান চিরদিন থাকিবে ; কখনও শেষ হইবে না। কুরআন শরীফের ছোট ছোট গুণাবলীও এইরূপ যে, উহার একটিও গৌরব করার জন্য যথেষ্ট। অথচ উহার মধ্যে সব গুণাবলীই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন উহার সুন্দর গ্রন্থনা, চমৎকার প্রকাশভঙ্গি, শব্দের পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বিবরণ, লোকদের সম্পর্কে এমন সমালোচনা যে, তাহারা মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিলেও করিতে পারিবে না, যেমন ইহুদীদের আল্লাহর মহব্বতের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর আকাঙ্খা করিতে না পারা, শ্রবণকারীর মন প্রভাবিত হওয়া, তেলাওয়াতকারী কখনও বিরক্ত না হওয়া ; অথচ অন্য সব কালাম—উহা যতই মনমাতানো হউক না কেন, প্রিয়তমের পাগল করনেওয়ালা পত্রই হউক না কেন দিনে দশ বার পড়িলে মন বিরক্ত না হইলেও বিশ বার পড়িলে নিশ্চয় বিরক্তির উদ্রেক হইবে। বিশ বার পড়িলেও যদি বিরক্তি না আসে তবে চল্লিশ বারে অবশ্যই আসিবে। মোটকথা কোন না কোন সময় বিরক্তি আসিবেই। কিন্তু কালামে পাকের একটি রুকু ইয়াদ করুন, দুইশত বার পড়ুন, চারশত বার পড়ুন, সারা জীবন পড়িতে থাকুন কখনও বিরক্তি আসিবে না। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে উহা নিতান্তই সাময়িক হইবে এবং অতি শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। যত বেশী পড়িতে থাকিবেন ততই আনন্দ ও স্বাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই সব বিষয় এমন যে, কোন মানুষের কথার মধ্যে যদি উহার একটিও সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায় তবুও উহার উপর কতই না গৌরব করা হয়। অতএব যে কালামে পাকে এইসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে উহা কত গৌরবের

বস্তু হইবে! ইহার পর আমাদের অবস্থার উপর একটু চিন্তা করি। আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাহারা স্বয়ং হাফেজে কুরআন হওয়ার উপর গৌরব বোধ করেন অথবা আমাদের দৃষ্টিতে অন্য কাহারো হাফেজে কুরআন হওয়া সম্মান ও মর্যাদার বিষয় কিনা। আজ আমাদের সম্মান ও গৌরবের বিষয় হইল উচুঁ উচুঁ ডিগ্রী, বড় বড় উপাধি, দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মৃত্যুর পর হাতছাড়া হইয়া যাইবে এমন ধন-সম্পদ।

(٢١) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهٗ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهٖ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَإِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِى الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ.

(رواه ابن حبان فی صحیحه فی حدیث طویل)

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضورؐ نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماویں تو حضورؐ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔

(২১) হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখস্ত করিলাম যে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাকওয়া অবলম্বন কর, কারণ উহা সমস্ত নেক আমলের মূল। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কুরআন তেলওয়াতের এহ্তেমাম কর। কারণ উহা দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আখেরাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।

(ইবনে হিব্বান)

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া বা পরহেজগারীই হইল সমস্ত কাজের মূল। যে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যাইবে তাহার দ্বারা কোন গোনাহ হইতে পারে না এবং তাহার কোন অভাব দেখা দিবে না।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা যে কোন সংকটে তাহার জন্য রাস্তা বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিযিক পৌঁছাইয়া দেন যাহা তাহার ধারণাও হয় না।' (সূরা তালাক, আয়াত ঃ ২)

কুরআন তেলাওয়াত যে নূর উহা পূর্বের রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারাও জানা গিয়াছে। 'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে 'মারেফতে আবূ নুআঈম' হইতে নকল করা হইয়াছে যে, হযরত বাসেত (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় আসমানওয়ালাদের নিকট সেইগুলি এমনভাবে চমকাইতে থাকে, যেমন জমিনওয়ালাদের নিকট আসমানের তারাসমূহ চমকাইতে থাকে। এই হাদীসটি তারগীব ও অন্যান্য কিতাবে সংক্ষেপে এইটুকুই নকল করা হইয়াছে। আসল দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য কিতাব হইতে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বিস্তারিতভাবে এবং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে নকল করিয়াছেন। উপরে যতটুকু অংশ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা যদিও আমাদের এই কিতাবের জন্য মুনাসিব ; কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি খুবই জরুরী ও উপকারী অনেকগুলি বিষয় সম্বলিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীসই ব্যাখ্যাসহ নকল করা হইতেছে।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা মোট কতগুলি কিতাব নাযিল করিয়াছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, একশত ছহীফা এবং চারটি কিতাব। হযরত শীছ (আঃ)এর উপর পঞ্চাশটি, হযরত ইদরীস (আঃ)এর উপর ত্রিশটি, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর উপর দশটি এবং তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)এর উপর দশটি ছহীফা নাযিল করিয়াছিলেন। এইগুলি ছাড়া তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআন এই চারটি কিতাব নাযিল করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ করিলেন, সব শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। যেমন, হে অত্যাচারী ও অহংকারী বাদশাহ! আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাই নাই যে, তুমি শুধু ধন-সম্পদ জমা করিবে। আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাইয়াছিলাম যে, কোন মজলুমের ফরিয়াদ যেন আমার পর্যন্ত পৌছিতে না দাও ; আমার নিকট পৌছার পূর্বেই তুমি উহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কেননা মজলুম কাফের হইলেও আমি তাহার ফরিয়াদকে রদ করি না।

আমি অধম (লেখক) বলিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে কোন এলাকার আমীর বা শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত অত্যন্ত এহ্তেমামের সাথে ইহাও বলিতেন যে, 'সাবধান! মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া

থাক! কেননা, মজলুমের বদ-দোয়া ও আল্লাহর দরবারের মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।' (কবি বলিয়াছেন—)

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگامِ دعا کردن   اجابت از درِ حق بہرِ استقبال می آید

অর্থাৎ, মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের আহ্ শব্দ হইতে সাবধান থাকিবে। কেননা আল্লাহর দরবার হইতে কবুলিয়াত তাহার বদদোয়াকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে।

ঐসব ছহীফায় আরও নসীহত ছিল—জ্ঞানী লোকদের জন্য নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ না পাওয়া পর্যন্ত সময়কে তিন অংশে ভাগ করিয়া লওয়া জরুরী। এক অংশে আপন রবের এবাদত-বন্দেগী করিবে এবং এক অংশে নফসের মুহাসাবা করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, কয়টি কাজ ভাল করিয়াছে আর কয়টি মন্দ করিয়াছে। আর এক অংশ হালাল রুজি-রোজগারের জন্য ব্যয় করিবে।

জ্ঞানীর জন্য ইহাও জরুরী যে, সময়ের হেফাজত করিবে। নিজেও সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া থাকিবে। জবানকে অনর্থক কথাবার্তা হইতে হেফাজত করিবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার হিসাব লইতে থাকে তাহার জবান অনর্থক কথাবার্তায় কম চলে।

বুদ্ধিমান লোকের জন্য আরও জরুরী হইল, সে তিন জিনিস ব্যতীত সফর করিবে না। এক, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্য। দুই, কিছুটা রুজি-রোজগারের জন্য। তিন, বৈধ উপায়ে আনন্দ উপভোগের জন্য।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত মূসা (আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ করিলেন, সবই উপদেশ ও নসীহতের কথা ছিল। যেমন, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে সুনিশ্চিত জানিয়াও কেমন করিয়া কোন বিষয়ের উপর আনন্দিত হয়। (কেননা, কাহারও ফাঁসি সুনিশ্চিত হইলে সে কিছুতেই আনন্দিত হইতে পারে না।) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার মৃত্যুর একীন আছে অথচ সে হাসে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে সবসময় দুনিয়ার দুর্ঘটনা ও উত্থান-পতন দেখিতেছে তারপরও দুনিয়ার প্রতি আস্থাশীল হইয়া থাকে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার তকদীরের উপর একীন আছে তবুও দুঃখ-কষ্টে পেরেশান হইয়া পড়ে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার অতি শীঘ্রই হিসাব দেওয়ার একীন আছে। তবুও নেক আমল করে না। হযরত আবূ যর (রাযিঃ)

বলেন, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকওয়ার ওসিয়ত করিলেন এবং বলিলেন, ইহা হইল সমস্ত কিছুর বুনিয়াদ ও মূল। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও কিছু ওসিয়ত করুন। এরশাদ করিলেন, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের এহ্‌তেমাম কর। এইগুলি দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আসমানে সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরও কিছু ওসিয়তের জন্য আরজ করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, অধিক হাসি হইতে বিরত থাক। কেননা উহাতে দিল মরিয়া যায় এবং চেহারার সৌন্দর্য চলিয়া যায়। (অর্থাৎ জাহের ও বাতেন উভয়টার জন্যই ক্ষতিকর হয়।) আমি আরও কিছু ওসিয়তের দরখাস্ত করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদের এহ্‌তেমাম কর। কেননা ইহাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য–সাধনা। (পূর্ববর্তী উম্মতের ঐ সকল লোকদেরকে রাহেব বা সংসার বিরাগী বলা হইত, যাহারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইয়া থাকিত।) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরও কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, গরীব মিসকীনদের সহিত সম্পর্ক রাখ, তাহাদেরকে বন্ধু বানাইয়া লও, তাহাদের পাশে বস। আমি আরও কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে দেখ (ইহাতে শোকরের অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে)। আর তোমার চেয়ে উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখিও না, কারণ ইহাতে তোমাকে দেওয়া আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে তুচ্ছ ভাবিয়া বসিতে পার। আমি আরও কিছু নসীহত চাহিলে হুযূর এরশাদ করিলেন, তোমার নিজের দোষ যেন তোমাকে অপরের দোষ দেখা হইতে বিরত রাখে, মানুষের দোষ জানিবার চেষ্টা করিও না, কেননা তুমি নিজেই উহাতে লিপ্ত রহিয়াছ। তোমার দোষের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি মানুষের মধ্যে এমন দোষ তালাশ কর যাহা স্বয়ং তোমার মধ্যে রহিয়াছে অথচ তুমি উহা হইতে বে-খবর, আর তুমি তাহাদের এমন বিষয়ে দোষ ধর যাহা তুমি নিজেই করিয়া থাক। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন স্নেহের হাত আমার বুকের উপর মারিয়া এরশাদ করিলেন, হে আবূ যর! ভাবিয়া কাজ করার মত বুদ্ধিমত্তা নাই, নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার মত পরহেজগারী নাই এবং চরিত্রবান হওয়া অপেক্ষা ভদ্রতা নাই।

এখানে সংক্ষিপ্তসার ও মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, শাব্দিক তরজমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

(٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

(رواہ مسلم وابوداؤد)

ابوہریرہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر اُن پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت اُن کو ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ رحمت اُن کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہٗ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں

(২২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন।

(মুসলিম, আবূ দাউদ)

এই হাদীসে মক্তব ও মাদরাসার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহাতে বহু প্রকার সম্মান ও ইজ্জতের বিষয় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি সম্মান এইরূপ যে, যদি কোন ব্যক্তি উহার একটিও হাসিল করিবার জন্য সারা জীবন ব্যয় করিয়া দেয় তবুও উহা অত্যন্ত সস্তার সওদা হইবে। অথচ এখানে অনেকগুলি নেয়ামতের কথা বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ মাহবূবের মজলিসে তাহার আলোচনা হওয়ার এই শেষোক্ত নেয়ামতটি এমন, যাহার সমতুল্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ছাকীনা নাযিল হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তবে ছাকীনার ব্যাখ্যায় হাদীসের মাশায়েখদের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে এবং এইগুলি পরস্পর বিপরীত নয় বরং সবগুলির সমষ্টিও ছাকীনার ব্যাখ্যা হইতে পারে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, উহা একটি বিশেষ বাতাস যাহার চেহারা মানুষের চেহারার মত হইয়া থাকে। আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ছাকীনা স্বর্ণের তৈরী জান্নাতের একটি তশতরীর নাম। উহাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের কলবসমূহকে গোসল করানো হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা একটি খাছ রহমত। আল্লামা তাবারী (রহঃ) এই অর্থকে

পছন্দ করিয়াছেন, কেননা 'ছাকীনা' দ্বারা কলবের স্থিরতা ও শান্তিই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছাকীনা দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি উদ্দেশ্য। আবার কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন গাম্ভীর্য। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ছাকীনা দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য। এইরূপ আরও বহু ব্যাখ্যা রহিয়াছে। 'ফাতহুল বারী' নামক কিতাবে হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বলেন, এই সবগুলি কথাই ছাকীনার ব্যাখ্যা হইতে পারে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ছাকীনা এমন এক জিনিস যাহা শান্তি রহমত ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টি। উহা ফেরেশতাদের সহিত নাযিল হয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ছাকীনা শব্দটি আসিয়াছে। যেমন—فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ (সূরা তওবাহ, আয়াত ঃ ৪০)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

هُوَ الَّذِىٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (সূরা ফাত্হ, আয়াত ঃ ৪)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে— فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৪৮)

মোটকথা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ইহার সুসংবাদ দান করা হইয়াছে। 'এহ্ইয়া উল উলূম' কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, ইবনে ছাওবান (রহঃ) এক বন্ধুর সহিত ইফতারের ওয়াদা করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি পরদিন সকালে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, তোমার সহিত যদি আমার ওয়াদা না থাকিত তবে আমার অসুবিধার কারণটি তোমাকে কিছুতেই বলিতাম না। ব্যাপার হইল, কোন কারণবশতঃ আমার আসলেই দেরী হইয়া গিয়াছিল, এমনকি এশার ওয়াক্ত হইয়া গেল। খেয়াল হইল যে, বেতের নামাযটিও আদায় করিয়া লই, কারণ মৃত্যুর কথা বলা যায় না, হয়ত রাত্রেই মরিয়া যাইব আর বেতের নামাযটি আমার জিম্মায় থাকিয়া যাইবে। দোয়ায়ে কুনূত পড়িতেছিলাম হঠাৎ জান্নাতের একটি সবুজ বাগান আমার নজরে পড়িল। উহাতে সব ধরণের ফল-ফুল ছিল। উহা দেখিতে দেখিতে আমি এমন বিভোর হইয়া পড়ি যে, সকাল হইয়া গেল। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনীতে এইরূপ শত শত ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার প্রকাশ তখনই ঘটে যখন আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহর দিকেই তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ করা হয়।

ফেরেশতাদের বেষ্টন করার কথাও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর-(রাযিঃ)এর একটি ঘটনা হাদীসের কিতাবে

বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একবার তেলাওয়াত করার সময় মাথার উপর মেঘের মত কি যেন অনুভব করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, উহারা ফেরেশতা ছিল। কুরআন শরীফ শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। ফেরেশতাদের ভীড়ের কারণে মেঘের মত মনে হইতেছিল। অপর এক সাহাবীও একবার মেঘের মত অনুভব করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা ছাকীনা ছিল। অর্থাৎ রহমত ছিল যাহা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নাযিল হইয়াছিল। মুসলিম শরীফে এই হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসের শেষাংশে এই বাক্যটিও আসিয়াছে—

مَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তাহার বদ আমল আল্লাহর রহমত হইতে দূরে লইয়া যায় তাহার বংশমর্যাদা তাহাকে রহমতের নিকটবর্তী করিতে পারে না।

একজন বংশানুক্রমে উচ্চ বংশীয় লোক যে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত, সে কোনভাবেই আল্লাহর নিকট ঐ নীচ বংশীয় মুসলমানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না যে মুত্তাকী ও পরহেজগার। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে বেশী মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৩)

(٢٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُونَ إِلَى اللّٰهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ ۔

(رواه الحاكم وصححه ابوداؤد في مراسيله عن جبير بن نفير و الترمذي عن ابي امامة بمعناه)

ابوذرؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہٗ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہٗ سے نکلی ہے یعنی کلام پاک ۔

(২৩) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু ও তাঁহার দরবারে নৈকট্য ঐ জিনিস হইতে অধিক আর কোন জিনিস

দ্বারা হাসিল করিতে পারিবে না, যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির হইয়াছে অর্থাৎ কালামে পাক। (হাকিম, আবূ দাউদ ঃ মারাসীল, তিরমিযী)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৈকট্য হাসিল করার জন্য কালামে পাকের চেয়ে বড় কোন বস্তু নাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা দ্বারা আপনার দরবারে নৈকট্য লাভ করা যায় উহা কি? এরশাদ হইল—আহমদ! আমার কালাম। আমি আরজ করিলাম, বুঝিয়া পড়িলে নাকি না বুঝিয়া পড়িলেও। এরশাদ হইল, বুঝিয়া পড়ুক বা না বুঝিয়া পড়ুক, উভয় অবস্থায় নৈকট্য হাসিল হইবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এবং কালামে পাকের তেলাওয়াত নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা হওয়ার বিশদ বর্ণনা শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)এর তফসীর হইতে পাওয়া যায়। উহার সারকথা হইল, সুলূক ইলাল্লাহ অর্থাৎ মর্তবায়ে এহ্ছান যাহা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধ্যান অন্তরে উপস্থিত থাকার নাম। উহা তিন তরীকায় হাসিল হইতে পারে। প্রথমতঃ তাছাওউর, শরীঅতের পরিভাষায় যাহাকে 'তাফাক্কুর' ও 'তাদাব্বুর' অর্থাৎ চিন্তা ফিকির বলে এবং সুফিয়ায়ে কেরাম যাহাকে মুরাকাবা বলেন। দ্বিতীয়তঃ জবানী যিকির। তৃতীয়তঃ কালামে পাক তেলাওয়াত করা। সর্বপ্রথম তরীকা যেহেতু কলবী যিকিরেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তরীকা মাত্র দুইটিই বাকী রহিল। এক, যিকির, জবানী হউক বা কলবী। দুই, কুরআন তেলাওয়াত। সুতরাং যে শব্দকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণের জন্য ব্যবহার করা হইবে এবং উহাকে বারবার উচ্চারণ করা হইবে—যাহা যিকিরের সারমর্ম, উহার দ্বারা মেধাশক্তি আল্লাহর যাতের প্রতি মনোযোগী ও আকৃষ্ট হইবে। যেন সেই মহান সত্তা সর্বক্ষণ অন্তরে বিরাজ করিবে, আর এই সার্বক্ষণিক অন্তরে বিরাজ থাকার নাম হইল সঙ্গলাভ যাহাকে হাদীস শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে—

لَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا الحديث

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে। আমিও তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই। এমনকি আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে

কোন বস্তুকে ধরে এবং তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। অর্থাৎ বান্দা অধিক এবাদতের দ্বারা যখন আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাজতকারী হইয়া যান। তাহার চোখ কান সবকিছু মনিবের ইচ্ছার অনুগত হইয়া যায়। অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, ফরজ এবাদত নির্ধারিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে বেশী করা যায় না। আর এই অবস্থার জন্য অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির ধ্যান একান্ত জরুরী। নৈকট্য লাভের এই তরীকা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাছ। যদি কেহ চায় যে, অন্য কাহারও নামের তসবীহ পড়িয়া তাহার নৈকট্য হাসিল করিয়া নিবে, তবে ইহা কখনও সম্ভব হইবে না। কারণ যাহার নৈকট্য হাসিল করা হইবে তাহার মধ্যে দুইটি গুণ থাকা খুবই জরুরী। এক, যিকিরকারী বিভিন্ন সময়ে জবানী বা কল্‌বী যে কোন পন্থায় তাহাকে ডাকে উহার সর্বময় এলেম তাহার থাকিতে হইবে। দুই, যিকিরকারীর মেধাশক্তির মধ্যে নূর দান করা ও উহা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। তাসাউফের পরিভাষায় উহাকে 'দুনু ও তাদাল্লী' এবং 'নুযূল ও কুর্‌ব' বলা হয়।

এই দুইটি বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই উপরোক্ত তরীকার দ্বারা একমাত্র তাহারই নৈকট্য হাসিল হইতে পারে। হাদীসে কুদসীতেও এই দিকেই ইশারা করা হইয়াছে—

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই, আর যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে প্রসারিত দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই, আর যে আমার দিকে সাধারণভাবে হাটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।

হাদীসে এইসব উপমা শুধু বুঝাইবার জন্য, নচেৎ আল্লাহ তায়ালা চলাফেরা ইত্যাদি সকল মানবীয় বিষয় হইতে পবিত্র। আসল মকসুদ হইল আল্লাহ তায়ালাকে পাইবার জন্য যে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টার চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালা তাওয়াজ্জুহ দেন ও অগ্রসর হন। আর অসীম দয়ালুর জন্য ইহাই স্বাভাবিক। অতএব যাহারা সর্বদা স্থায়ীভাবে তাহাকে স্মরণ করে, মহান মনিবের পক্ষ হইতে তাওয়াজ্জুহও তাহাদের প্রতি স্থায়ী হয়। কালামে পাক যেহেতু সম্পূর্ণই যিকির, উহার একটি আয়াতও যিকির ও

আল্লাহর প্রতি মনোযোগ হইতে খালি নয়, কাজেই কালামে পাকের দ্বারাও নৈকট্য লাভ হয়। বরং উহার মধ্যে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা অধিক নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। তাহা এই যে, প্রত্যেক কথা নিজের মধ্যে বক্তার গুণাবলী ও প্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, ফাসেক–ফাজেরের কবিতা পড়িলেও অন্তরে উহার প্রভাব পড়ে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবিতা পড়িলে অন্তরে উহার ফল প্রকাশিত হয়। এই কারণেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অতিমাত্রায় চর্চা করিলে গর্ব ও অহঙ্কার পয়দা হয়। হাদীসের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখার দ্বারা বিনয় পয়দা হয়। এই কারণেই ফারসী ও ইংরেজী ভাষা হিসাবে সমান হইলেও উক্ত ভাষাদ্বয়ে যে সকল লেখকের বইপুস্তক পড়ানো হয় তাহাদের মনোভাবের ভিন্নতার দরুন প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মোটকথা, কালামের মধ্যে সর্বদাই বক্তার প্রভাব ও আছর বিদ্যমান থাকে। কাজেই আল্লাহর কালাম বারবার পাঠ করার দ্বারা অন্তরে আল্লাহর প্রভাব পয়দা হওয়া এবং আল্লাহর সহিত স্বভাবগত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত বিষয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক লেখকের নিয়ম হইল, কেহ তাহার লিখিত কিতাব গুরুত্বসহকারে পাঠ করিলে স্বভাবগতভাবেই তাহার প্রতি লেখকের বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সর্বদা আল্লাহ তায়ালার কালামে পাক তেলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহর তাওয়াজ্জুহ অধিক হইবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক ও একীনী কথা। এই অধিক তাওয়াজ্জুহই অধিক নৈকট্য হাসিলের কারণ হয়। মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও রহমতে আমাকে এবং তোমাদেরকে এই অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন।

(۲۴) عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ (رواه النسائی وابن ماجة والحاکم واحمد)

انسؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ کے لئے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں صحابہؓ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔

(২৪) হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, লোকদের মধ্য হইতে কিছু লোক আল্লাহ তায়ালার ঘরোয়া খাছ লোক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! তাহারা কোন্ লোক? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা হইল, কুরআন শরীফ ওয়ালা। তাহারাই আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোক। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, হাকিম)

'কুরআনওয়ালা' ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সর্বদা কালামে পাকে মশগুল থাকে এবং উহার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে। তাহাদের আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোক হওয়া খুবই স্পষ্ট ব্যাপার। পূর্বের আলোচনা দ্বারাও এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যখন সর্বদা আল্লাহর কালামে মশগুল থাকে তখন আল্লাহর মেহেরবানীও সর্বদা তাহাদের প্রতি হইয়া থাকে। যাহারা সর্বদা কাছে অবস্থান করে তাহারাই আপন ও খাছ লোক হইয়া থাকে। কত বড় ফযীলতের কথা! সামান্য মেহনত ও চেষ্টার দ্বারা আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়, আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা হাসিল করা যায়।

দুনিয়ার কোন দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য বা একটি মেম্বরী পদের জন্য মানুষ কত জান মাল বিসর্জন দিয়া থাকে। ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে তোশামোদ করিতে হয়, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হয় এবং এইগুলিকে কাজ মনে করা হয়। কিন্তু কুরআনের জন্য মেহনত করাকে বেকার মনে করা হয়।

ببیں تفاوتِ رہ از کجا است تا بہ کجا

দেখ উভয় রাস্তার মধ্যে কত আকাশ পাতাল ব্যবধান।

(٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ (رواه البخاری ومسلم)

ابوہریرہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہٗ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، جو کلام الٰہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔

(২৫) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারও প্রতি এত মনোযোগ দেন না যত মনোযোগের সহিত ঐ নবীর আওয়াজকে শুনেন যিনি সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করেন। (বুখারী, মুসলিম)

পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কালাম তেলাওয়াতকারীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া থাকেন। আম্বিয়ায়ে

কেরাম যেহেতু তেলাওয়াতের আদব পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের প্রতি মনোযোগ বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তদুপরি উহার সহিত যখন মধুর সুর মিলিত হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার মনোযোগ দান বেশীই হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নবীগণের পর যে যতটুকু হক আদায় করিয়া পড়ে পর্যায়ক্রমে তাহার প্রতি ততটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়।

(٢٦) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَشَدُّ اُذُنًا اِلٰى قَارِئِ الْقُرْاٰنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهٖ.

فضالہ ابن عبیدؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔

(رواہ ابن ماجۃ و ابن حبان والحاکم کذا فی شرح الاحیاء قلت وقال الحاکم صحیح علی شرطھما وقال الذھبی منقطع)

(২৬) হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআন তেলাওয়াতকারীর আওয়াজ ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যে আপন গায়িকা বাঁদীর গান কান লাগাইয়া শ্রবণ করিতেছে। (শরহে এহ্ইয়া ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

স্বভাবতঃই গানের আওয়াজের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীয়তের বাধার কারণে দ্বীনদার লোক সেই দিকে মনোযোগী হয় না। অবশ্য গায়িকা যদি নিজের বাঁদী হয় তবে তাহার গান শুনিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নাই। এইজন্য তাহার গানের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু কালামে পাকের বেলায় ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, উহা যেন গানের সুরে পড়া না হয়। কেননা হাদীসে উহার নিষেধ আসিয়াছে। এক হাদীসে আছে— (اَلْحَدِيْث) اِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ অর্থাৎ, প্রেমিকগণ যেভাবে সুর তুলিয়া সঙ্গীতের নিয়মে গান গায়, তোমরা সেইভাবে কুরআন পড়িও না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, এইভাবে যাহারা পড়িবে তাহারা ফাসেক আর যাহারা শ্রবণ করিবে তাহারা গোনাহগার হইবে। তবে সঙ্গীতের নিয়ম-কানূন ব্যতীত সুমিষ্ট সুরে পড়াই এখানে উদ্দেশ্য। কারণ বিভিন্ন হাদীসে এইরূপে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, তোমরা সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। আরেক হাদীসে আছে, সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হইয়া যায়। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' কিতাবে বলেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) কূফার শহরতলী দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক বাড়ীতে কতকগুলি ফাসেক লোকের সমাবেশ ছিল ; যেখানে যাযান নামক জনৈক গায়ক সারিন্দা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, কত মধুর কন্ঠস্বর ! যদি উহা কুরআন তেলাওয়াতে ব্যবহার হইত ! এই কথা বলিয়া তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। যাযান তাঁহার এই কথা শুনিয়া লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তিনি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এবং তিনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। সাহাবীর বাক্যে তাহার অন্তরে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, কোন সীমা রহিল না। সে তাহার সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদের সঙ্গী হইয়া গেল। পরে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে খ্যাতি লাভ করিল।

মোটকথা, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে মিষ্ট আওয়াজে তেলাওয়াতের প্রশংসা আসিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে গানের সুরে পড়ার ব্যাপারে নিষেধও আসিয়াছে। যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আরবী লাহানে কুরআন শরীফ পড়, প্রেমিকের সুরে বা ইয়াহুদ নাসারাদের আওয়াজে পড়িও না। অতি শীঘ্র এমন এক দল আসিবে যাহারা গায়ক ও বিলাপকারীদের মত টানিয়া টানিয়া কুরআন পড়িবে। এই তেলাওয়াত তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না। বরং তাহারা নিজেরা ফেৎনায় পড়িবে এবং এই পড়া যাহাদের ভাল লাগিবে তাহাদেরকেও ফেৎনায় ফেলিয়া দিবে।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মিষ্ট সুরে তেলাওয়াতকারী কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার তেলাওয়াত শুনিলে তুমি তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় অনুভব কর। অর্থাৎ তাহার আওয়াজ হইতে তাহার ভীত হওয়া বুঝা যায়। এই সবকিছুর পর আল্লাহ তায়ালার বড় দয়া ও অনুগ্রহ এই যে, মানুষ শুধু তাহার সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করার জিম্মাদার।

হাদীসে আছে, 'যাহারা কুরআন পড়ে কিন্তু পুরাপুরি শুদ্ধভাবে পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে যাহারা তাহাদের তেলাওয়াতকে সহী-শুদ্ধ করিয়া উপরে (আল্লাহর দরবারে) লইয়া যায়।' হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার কোন শেষ নাই।

(٢٧) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

عُبیدہ مُلیکیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیساکہ اس کا حق ہے کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اُس کے معانی میں تدبّر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ (دنیا میں) طلب نہ کرو کہ (آخرت میں) اس کے لئے بڑا اجر و بدلہ ہے۔

(২৭) হযরত উবাইদা মুলাইকী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআন ওয়ালাগণ! তোমরা কুরআন শরীফের সহিত টেক লাগাইও না। রাত্র দিন কুরআনের হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত কর। কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার কর এবং উহাকে মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। দুনিয়াতে উহার বদলা চাহিও না, আখেরাতে উহার জন্য বড় বদলা ও প্রতিদান রহিয়াছে।

(বায়হাকী ঃ শুআবুল-ঈমান)

এই হাদীসে কয়েকটি হুকুম রহিয়াছে—

(১) কুরআন শরীফের উপর টেক লাগাইও না। ইহার দুইটি অর্থ। এক, উহার উপর হেলান দিও না, কেননা ইহা আদবের খেলাফ। ইবনে হজর (রহঃ) লিখিয়াছেন, কুরআন পাকের উপর হেলান দেওয়া, উহার দিকে পা মেলাইয়া বসা, উহার দিকে পিঠ দিয়া বসা, উহাকে পদদলিত করা ইত্যাদি হারাম। দুই, কুরআনের উপর হেলান দিয়া না বসার দ্বারা ইঙ্গিত হইল গাফলতি না করা। অর্থাৎ কালামে পাককে বরকতের জন্য শুধু তাকিয়ার উপর রাখিয়া দিও না। যেমন কোন কোন মাজারে দেখা গিয়াছে যে, কবরের শিয়রের দিকে রেহালে কুরআন শরীফ রাখিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে কুরআনের হক নষ্ট করা হয়। কুরআনের হক হইল তেলাওয়াত করা।

(২) উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় হুকুম হইল, হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত কর। অর্থাৎ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেশী বেশী করিয়া তেলাওয়াত করা। স্বয়ং কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ অর্থাৎ, আমি যাহাদেরকে কিতাব দান করিয়াছি তাহারা উহার হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত করিয়া থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২১) অর্থাৎ যে মর্যাদা ও ইজ্জত সহকারে বাদশার ফরমান পাঠ করা হয় এবং যে আনন্দ ও আগ্রহ নিয়া প্রিয়জনের পত্র পড়া হয় ঠিক সেইভাবেই পড়া উচিত।

(৩) তৃতীয় হুকুম কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার কর। অর্থাৎ ওয়াজের দ্বারা, লেখনীর দ্বারা, উৎসাহ প্রদানের দ্বারা এবং বাস্তব আমলের দ্বারা যেভাবেই হউক, যে পরিমাণই হউক উহার প্রচার কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালামে পাকের প্রচার-প্রসারের হুকুম করিতেছেন, আর আমাদের আধুনিক চিন্তাধারার লোকেরা উহার তেলাওয়াতকে নিরর্থক বলিয়া থাকে। অথচ ইসলাম ও নবীর মহব্বতের কথা আসিলে নিজেরা লম্বা চওড়া মহব্বতের দাবীও করিয়া থাকে।

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی   کیں رہ کہ تو می روی بترکستان است

অর্থাৎ, হে বেদুঈন ! আমার ভয় হইতেছে তুমি কা'বা শরীফে পৌছিতে পারিবে না। কারণ, তুমি যে পথে চলিয়াছ উহা তুর্কিস্তানের পথ।

মনিবের হুকুম হইল, তোমরা কুরআনের প্রচার কর আর আমাদের চেষ্টা হইল বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না করি— বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবা ; যেন বাচ্চারা কুরআন পাকের পরিবর্তে প্রাইমারীতে পড়ে। আমাদের ক্ষোভ হইল মকতবের মিয়াজী বাচ্চাদের জীবন নষ্ট করে, এই জন্য আমরা সেখানে পড়াইতে চাই না। স্বীকার করি নিঃসন্দেহে তাহারা ত্রুটি করে কিন্তু মনে রাখিবেন, তাহাদের ত্রুটির কারণে আপনি কি দায়মুক্ত হইয়া যাইতেছেন বা আপনার উপর হইতে কুরআন পাকের প্রচারের দায়িত্ব সরিয়া যাইতেছে? বরং এই অবস্থায় দায়িত্ব আপনার উপরই ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা তাহাদের ত্রুটির জবাবদেহী নিজেরাই করিবেন। কিন্তু তাহাদের ত্রুটির কারণে আপনি বাচ্চাদেরকে জোরপূর্বক কুরআনের মকতব হইতে সরাইয়া দিবেন এবং তাহাদের পিতামাতার উপর নোটিস জারী করাইবেন, যাহার ফলে

তাহারা সন্তানদেরকে হেফজ অথবা নাজেরা পড়ানো হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় আর গোনাহের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপে, এইরূপ করা ক্ষয়রোগের চিকিৎসা প্রাণনাশক বিষ দ্বারা নয় তো আর কি। 'মকতবের মিয়াজী খুব খারাপভাবে পড়াইতেন এইজন্য কুরআন শিক্ষা হইতে জোরপূর্বক সরাইয়াছি' আপনার এই জবাব আল্লাহ পাকের মহান আদালতে কতটুকু ওজন রাখে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন। বানিয়ার দোকান চালাইবার জন্য কিংবা ইংরেজের চাকরি করিবার জন্য ভগ্নাংশের অংক শিক্ষা করা গুরুত্ব রাখে অথচ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল কুরআন শিক্ষা।

(৪) মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। যেমন পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) উহার অর্থের প্রতি চিন্তা কর। ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাহার ইয়াহয়াউল উলূম কিতাবে তাওরাত হইতে নকল করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, হে বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? রাস্তায় চলিতে চলিতে তোমার নিকট কোন বন্ধুর পত্র পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তুমি থামিয়া যাও ; পথের পাশে বসিয়া গভীরভাবে পড়িতে থাক। এক একটি শব্দের উপর চিন্তা–ফিকির কর। আর আমার কিতাব তোমার নিকট পৌঁছে, উহাতে আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বার বার উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তুমি উহার মধ্যে চিন্তা–ভাবনা করিতে পার। অথচ তুমি উহাকে বেপরওয়াভাবে উড়াইয়া দাও। তবে কি আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া গেলাম? হে আমার বান্দা! তোমার কোন বন্ধু যখন তোমার সহিত বসিয়া কথা বলে, তখন তুমি আপাদমস্তক সেই দিকে মগ্ন হইয়া যাও। কান পাতিয়া শুন, গভীরভাবে চিন্তা কর। কথার মাঝখানে অন্য কেহ কথা বলিতে চাহিলে ইশারায় তাহাকে থামাইয়া দাও ; কথা বলিতে নিষেধ কর। আমি তোমার সহিত আমার কালামের মাধ্যমে কথা বলি অথচ তুমি একটুও ভ্রুক্ষেপ কর না। তবে কি আমি তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট? কুরআনে চিন্তা–ফিকির সম্পর্কিত আলোচনা কিছুটা ভূমিকায় আর কিছুটা ৮নং হাদীসে করা হইয়াছে।

(৬) কুরআনের বদলা দুনিয়াতে চাহিও না। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করিয়া কোন বিনিময় গ্রহণ করিও না। কেননা, আখেরাতে উহার জন্য অনেক বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুনিয়াতে উহার বদলা গ্রহণ করা হইলে এমনি হইল যেমন কেহ টাকার পরিবর্তে কড়ির

উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 'যখন আমার উম্মত দীনার ও দিরহামকে বড় জিনিস মনে করিতে লাগিবে তখন তাহাদের দিল হইতে দ্বীনের বড়ত্ব বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।' হে আল্লাহ ! আমাদেরকে এই অবস্থা হইতে হেফাজত করুন।

(٢٨) عَنْ وَاثِلَةَ رَفَعَهُ اُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرٰةِ السَّبْعَ وَاُعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَاُعْطِيْتُ مَكَانَ الْاِنْجِيْلِ الْمَثَانِىَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ

(لاحمد والكبير كذا فى جمع الفوائد)

واثلہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں سبع طُوَل ملی ہیں اور زبور کے بدلہ میں مِئِین اور انجیل کے بدلہ میں مثانی اور مُفَصَّل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔

(২৮) হযরত ওয়াসেলা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে সাতটি তিওয়াল দেওয়া হইয়াছে, যবূর এর পরিবর্তে মিঈন এবং ইঞ্জীলের পরিবর্তে মাছানী দেওয়া হইয়াছে। আর মুফাসসাল আমাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। (জামউল-ফাওয়ায়িদ ঃ আহমদ, কবীর)

কালামে পাকের প্রথম সাতটি সূরাকে তিওয়াল বলা হয়। উহার পরবর্তী এগারটি সূরাকে মিঈন বলা হয়। অতঃপর বিশটি সূরার নাম মাছানী। অতঃপর শেষ পর্যন্ত সূরাগুলির নাম মুফাসসাল। ইহাই প্রসিদ্ধ অভিমত। অবশ্য কোন কোন সূরা সম্পর্কে এরূপ মতভেদও রহিয়াছে যে, উহা কি তিওয়ালের অন্তর্ভুক্ত না মিঈনের অন্তর্ভুক্ত, এমনিভাবে মাছানীর অন্তর্ভুক্ত না মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই মতভেদের দরুন হাদীসের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দিবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, পূর্বের সমস্ত প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবের দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে আছে। তদুপরি মুফাসসাল সূরাগুলি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে যাহার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নাই।

(٢٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَّقْرَأُ

اُبوسعید خُدریؓ کہتے ہیں کہ میں ضُعفاء مُہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں. بعض لوگ بعض کی

عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ۔

(رواه ابوداؤد)

اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہوگئے۔ حضورؐ کے آنے پر قاری چپ ہوگیا تو حضورؐ نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضورؐ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کرکے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضورؐ کی طرف منہ کرکے بیٹھ گئے تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین تمھیں مژدہ ہو، قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھا دن پانسو برس کی برابر ہوگا۔

(২৯) হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি গরীব মুহাজেরদের জামাআতের সহিত বসিয়া ছিলাম। তাহাদের নিকট এই পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যাহা দ্বারা পুরা শরীর ঢাকিতে পারেন। একজন আরেকজনের আড়াল গ্রহণ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী চুপ হইয়া গেলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম

করিলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহর কালাম শুনিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট আমাকে বসিবার হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসিলেন যেন আমরা সকলেই সমান দূরত্বে থাকি ; কাহারও নিকটেও নয় আবার কাহারও নিকট হইতে দূরেও নয়। অতঃপর আমাদেরকে গোলাকার হইয়া বসিতে বলিলেন। সকলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে গরীব মুহাজেরীন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। কিয়ামতের দিন তোমরা পরিপূর্ণ নূরপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা ধনীদের হইতে অর্ধ দিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এই অর্ধ দিন পাঁচশত বছরের সমান হইবে। (আবূ দাউদ)

বস্ত্রহীন শরীর দ্বারা বাহ্যত ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের বাকি অংশকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ ছতরের স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা থাকার কারণেও মজলিসে সংকোচবোধ হইয়া থাকে। এই জন্যই একে অপরের পিছনে বসিয়াছিলেন যাহাতে শরীর নজরে না পড়ে। প্রথমতঃ তাহারা কুরআন শরীফের প্রতি মগ্নতার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে টের পান নাই। কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারেই নিকটে আসিয়া গেলেন তখন টের পাইলেন এবং আদবের কারণে তেলাওয়াতকারী খামোশ হইয়া গেলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু খুশি প্রকাশ করার জন্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; নতুবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তেলাওয়াতকারীকে তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াই ছিলেন।

আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হইবে—কুরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছে— وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট একদিন তোমাদের এখানের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমান। (সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৪৭)

সম্ভবতঃ এই কারণেই যেখানে কিয়ামতের কথা আসে সেখানে 'গাদান' শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ আগামীকাল। কিন্তু এই হিসাব সাধারণ মুমিনদের জন্য নতুবা কাফেরদের জন্য বলা হইয়াছে যে, এমন

দিন যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে। আবার খাছ মুমিনদের জন্য তাহাদের অবস্থা অনুপাতে সেই দিনের পরিমাণ আরও কম মনে হইতে থাকিবে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন মোমেনের জন্য ফজরের দুই রাকাআতের সমান মনে হইবে।

অসংখ্য রেওয়ায়াতে কুরআন শরীফ পড়ার ফযীলত আসিয়াছে, আবার বহু রেওয়ায়াতে কুরআন শুনারও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে যে, স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ মজলিসে বসার হুকুম করা হইয়াছে। কোন কোন আলেম ফতওয়া দিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ পড়ার চেয়ে শ্রবণ করা বেশী উত্তম। কারণ, কুরআন শরীফ পড়া নফল কিন্তু শুনা ফরয। আর ফরযের মর্যাদা নফলের চাইতে বেশী হইয়া থাকে। এই হাদীসের দ্বারা একটি মাসআলার সমাধান হইয়া যায়, যে বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করিয়াছেন। তাহা এই যে, এমন দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি যে নিজের অভাব অনটনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করে সে উত্তম, নাকি ঐ শোকর-গুজার ধনী ব্যক্তি যে মালের হক আদায় করে সে উত্তম। এই হাদীস দ্বারা ধৈর্যশীল দরিদ্র লোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩০) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰی اٰیَةٍ مِّنْ کِتَابِ اللّٰهِ کُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَّمَنْ تَلَاهَا کَانَتْ لَهٗ نُوْرًا یَّوْمَ الْقِیَامَةِ۔

ابوہریرہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سُنے اس کے لئے دو چند نیکی لکھی جاتی ہے اور جو تلاوت کرے اس کے لئے قیامت کے دن نُور ہو گا۔

(رواہ احمد عن عبادة بن میسرة واختلف فی توثیقہ عن الحسن عن ابی هریرة والجمهور علی ان الحسن لم یسمع عن ابی هریرة)

(৩০) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের একটি আয়াত শুনে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হইবে। (আহমদ)

মোহাদ্দেসগণ সনদের দিক হইতে যদিও এই হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু এই হাদীসের বিষয়বস্তু অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা

সমর্থিত। অর্থাৎ কালামে পাক শোনাও যথেষ্ট সওয়াব রাখে। এমন কি কেহ কেহ কুরআন শ্রবণ করাকে পড়া অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন। ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে বসিয়াছিলেন, এরশাদ করিলেন, আমাকে কুরআন শরীফ শুনাও। আমি আরজ করিলাম স্বয়ং হুযূরের উপরেই তো কুরআন নাযিল হইয়াছে ; হুযূরকে কি শুনাইব? এরশাদ হইল, আমার শুনিতে মন চায়। অতঃপর আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। একবার হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেম (রাযিঃ) কালামে পাক পড়িতেছিলেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া শুনিতে থাকিলেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)এর কুরআন শরীফ পড়া শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক প্রশংসা করেন।

(٣١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ۔

عقبہ بن عامرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔

(رواہ الترمذی وابوداؤد والنسائی والحاکم وقال علی شرط البخاری)

(৩১) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শব্দ করিয়া কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে ছদকা করনেওয়ালার সমতুল্য। আর আস্তে তেলাওয়াতকারী গোপনে ছদকা করনেওয়ালার সমতুল্য।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম)

কোন কোন সময় ছদকা প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম যখন অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য হয় কিংবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকে। আবার কোন সময় গোপনে ছদকা করা উত্তম হয় যখন রিয়া বা লোক দেখানোর আশংকা হয় অথবা কাহারও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে কোন কোন সময় কুরআন শরীফ উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম যখন উহার দ্বারা অন্য লোক উৎসাহিত হয়। ইহাতে অন্যদেরও শুনিবার সওয়াব হয়। আবার কখনও আস্তে পড়া উত্তম যখন অন্য লোকের কষ্ট

হয় বা রিয়ার আশঙ্কা হয়। এই জন্য জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবে পড়ার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতও আসিয়াছে। কখনও উচ্চ আওয়াজে পড়া যুক্তিসঙ্গত, কখনও আস্তে পড়া উত্তম। অনেকে গোপনে ছদকার হাদীস দ্বারা আস্তে পড়াকে উত্তম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'কিতাবুশ শুআবে' হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন (কিন্তু এই রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসীনের নিয়ম অনুযায়ী দুর্বল), গোপনে আমল করা প্রকাশ্যে আমল করা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী সওয়াব রাখে। হযরত জাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, জোরে শব্দ করিয়া এমনভাবে পড়িও না যে, একজনের আওয়াজ অন্যজনের আওয়াজের সহিত মিলিয় যায়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) মসজিদে নববীতে এক ব্যক্তিকে জোরে কুরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তেলাওয়াতকারী কিছুটা তর্ক করিতে চাহিলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, যদি আল্লাহর ওয়াস্তে পড় তবে আস্তে পড়। আর যদি মানুষের জন্য পড় তবে উহা বৃথা।

এমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জোরে পড়ার রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে। 'শরহে এহ্‌ইয়াউল উলূম' কিতাবে উভয় প্রকার রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

(۳۲) عَنْ جَابِرٍؓ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُّشَفَّعٌ وَّمَاحِلٌ مُّصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهٗ اَمَامَهٗ قَادَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ سَاقَطَهٗ اِلَى النَّارِ.
(رواه ابن حبان والحاكم مطولا وصححه)

جابرؓ نے حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔

(৩২) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে পাক এমন সুপারিশকারী যাহার সুপারিশ কবূল করা হইয়াছে এবং এমন বিতর্ককারী যাহার বিতর্ক মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে তাহাকে সে জান্নাতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলে সে তাহাকে

জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (ইবনে হিব্বান, হাকিম)

অর্থাৎ কুরআনে পাক যাহার জন্য সুপারিশ করিবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উহা কবূল, আর যাহার সম্পর্কে সে বিতর্ক করিবে উহাও গ্রহণ করা হইবে। কুরআন পাকের বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে যে, কুরআনে পাক তাহার হক আদায়কারীদের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য আল্লাহর দরবারে বির্তক করিবে। আর যাহারা তাহার হক নষ্ট করিয়াছে তাহাদেরকে বলিবে, তুমি আমার হক আদায় কর নাই কেন? যে ব্যক্তি উহাকে নিজের নিকট রাখিবে অর্থাৎ উহার অনুসরণ আনুগত্যকে জীবনের নীতি বানাইয়া লয়, সে তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি উহাকে পিছনে রাখিয়া দেয় অর্থাৎ উহার অনুসরণ করে না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বান্দার (অর্থাৎ লেখকের) মতে কুরআন পাকের প্রতি উদাসীনতা এই হুকূমের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কুরআনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের ব্যাপারে ধমকি আসিয়াছে।

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে যাহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুসংখ্যক লোকের গুনাহের শাস্তি প্রদানের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে, উহাতে এক ব্যক্তির অবস্থা এমন দেখানো হইয়াছিল যে, তাহার মাথায় একটি পাথর এমন জোরে নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, তাহার মস্তক, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে তাঁহার কালাম শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সে না রাত্রে উহার তেলাওয়াত করিয়াছে আর না দিনে উহার উপর আমল করিয়াছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী দ্বারা স্বীয় আজাব হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। প্রকৃতপক্ষে কালামে পাক এত বড় নেয়ামত যে, উহার প্রতি অবহেলার কারণে যে কোন কঠিন শাস্তিই দেওয়া হউক উহা যথাযথই হইবে।

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصِّيَامُ وَ الْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ

عبداللہ بن عمرو حضورؐ سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لئے شفاعت کرتے ہیں روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے

رَبِّ اِنِّیْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِی النَّهَارِ فَشَفِّعْنِیْ فِیْهِ وَیَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّیْلِ فَشَفِّعْنِیْ فِیْهِ فَیُشَفَّعَانِ۔ (رواه احمد وابن ابی الدنیا والطبرانی فی الکبیر والحاکم وقال صحیح علی ماشرط مسلم)

پینے سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا میری شفاعت قبول کیجئے پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(৩৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। রোযা আরজ করে, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে দিনের বেলা খাওয়া ও পান করা হইতে বিরত রাখিয়াছি, আপনি আমার সুপারিশ কবূল করুন। কুরআন শরীফ বলে, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে রাত্রে ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি, আমার সুপারিশ কবূল করুন। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবূল করা হয়। (আহমদ, তাবারানী)

তারগীব নামক কিতাবে 'খাওয়া ও পান করা' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরে উহার তরজমা করা হইল। হাকেম নামক কিতাবে 'পান করা' শব্দের জায়গায় 'শাহওয়াত' শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি রোযাদারকে দিনের বেলা নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। উহাতে ইশারা হইল যে, রোযাদারকে নফসের খাহেশ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ; এমনকি যদি উহা বৈধও হয়। যেমন স্ত্রীকে আদর ও আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, কালামে পাক যুবকের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিবে এবং বলিবে আমি ঐ ব্যক্তি, যে তোমাকে রাত্রে জাগ্রত রাখিয়াছে আর দিনে পিপাসিত রাখিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কুরআন হেফজ করিলে রাত্রে উহাকে নফল নামাযে তেলাওয়াত করিতে হইবে। ২৭ নং হাদীসে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং কালামে পাকেও বিভিন্ন আয়াতে রাত্রে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ۔

অর্থাৎ, 'আর রাত্রে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন যাহা আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইল।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭৯)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

অর্থাৎ, 'রাত্রে আপনি নামায পড়ুন এবং রাত্রে অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল পড়িতে থাকুন।' (সূরা দাহ্‌র, আয়াত ঃ ২৬) আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ, 'রাত্রে তাহারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সেজদায় পড়িয়া থাকে।' (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১১৩) আরও এরশাদ হইয়াছে—

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

অর্থাৎ 'যাহারা সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায় আপন মাওলার সম্মুখে রাত্র কাটাইয়া দেয়।' (সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৬৪)

যেমন, কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের তেলাওয়াত করিতে করিতে সারারাত্র কাটিয়া যাইত। হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সময় তিনি বেতেরের এক রাকাআতে সমস্ত কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)ও এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়া ফেলিতেন। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে দুই রাকাআতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করেন। হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) রাত্র-দিনে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত আবূ হার্‌রাহ (রহঃ)ও করিতেন। আবূ শায়েখ হোনায়ী (রহঃ) বলেন, আমি এক রাত্রে পুরা কুরআন শরীফ দুইবার খতম করিয়া আরও দশ পারা পড়িয়াছি। যদি চাইতাম তবে তৃতীয় খতমও পুরা করিতে পারিতাম। সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) যখন হজ্জে গমন করিয়াছিলেন তখন রাস্তায় প্রায় এক রাত্রে দুই বার কুরআন শরীফ খতম করিতেন।

মনসূর ইবনে যাযান (রহঃ) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর হইতে আসর পর্যন্ত আরেক খতম করিতেন এবং সমস্ত রাত্র নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। তিনি এত কাঁদিতেন যে, পাগড়ীর শামলা ভিজিয়া যাইত। অনুরূপভাবে অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিতেন। মুহাম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) তাহার 'কিয়ামুল লাইল' নামক কিতাবে বহু ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে লিখিত আছে, কুরআন শরীফ খতম করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস বিভিন্ন রকম ছিল। কেহ কেহ রোজানা এক খতম করিতেন, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানের বাহিরে প্রতিদিন এক খতম করিতেন এবং কেহ কেহ প্রতিদিন দুই খতম করিতেন, যেমন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানে প্রতিদিন দুই খতম পড়িতেন। হযরত আসওয়াদ (রহঃ), হযরত সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) এবং হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) প্রমুখ বুযুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল। কাহারও কাহারও রোজানা তিন খতম পড়ার অভ্যাস ছিল। যেমন হযরত সুলাইম ইবনে উতার যিনি প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর যামানায় মিসর বিজয়েও শরীক ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) তাহাকে কোসাসের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাত্রে তিন খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন।

ইমাম নবভী (রহঃ) 'কিতাবুল আযকারে' নকল করিয়াছেন যে, তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যা খতমের যে বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা হইল ইবনুল কাতেব (রহঃ) রাত্র–দিন মিলাইয়া দৈনিক আটবার কুরআন খতম করিতেন। ইবনে কুদামা (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, খতমের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। উহা তেলাওয়াতকারীর মানসিক অবস্থা ও স্ফূর্তির উপর নির্ভর করে।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) রমযান শরীফে একষট্টি খতম করিতেন। এক খতম দিনে এবং এক খতম রাত্রে। আর এক খতম পুরা রমযান মাসে তারাবীর নামাযে। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতমকারী উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা–ফিকির করিতে পারে না। এই জন্যই ইবনে হাযম (রহঃ) ও অন্যান্যরা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করাকে হারাম বলিয়াছেন।

বান্দার (অর্থাৎ লেখকের) মতে এই হাদীস শরীফ অধিকাংশ লোকের প্রতি খেয়াল করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআত হইতে উহার চেয়ে কম সময়ে খতম করারও প্রমাণ রহিয়াছে। এমনিভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বেশী সময়েরও কোন সীমা নাই। সহজভাবে যত দিনে খতম করা যায় ততদিনে করিবে। তবে কোন কোন আলেমের মতে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতে চল্লিশ

দিনের বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। ইহার সারকথা হইল, প্রতিদিন অন্তত তিন পোয়া পারা পড়া জরুরী। যদি কোন কারণ বশতঃ এক দিন পড়িতে না পারা যায় তবে পরদিন উহার কাজা করিয়া নিবে। মোট কথা, চল্লিশ দিনের ভিতরেই যেন একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম হইয়া যায়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও ইহা জরুরী নয় কিন্তু কোন কোন আলেম যেহেতু এই মত পোষণ করেন কাজেই সাবধানতার জন্য ইহার চেয়ে যেন কম না হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা এই মতের সমর্থনও পাওয়া যায়। 'মাজমা' কিতাবের গ্রন্থকার একটি হাদীস নকল করিয়াছেন— مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ عَزَّبَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রে কুরআন শরীফ খতম করিল সে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল।

কোন কোন আলেমের ফতওয়া হইল প্রতি মাসে এক খতম করা উচিত এবং উত্তম হইল সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ খতম করা। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণনা করা হয়। জুমুআর দিন শুরু করিবে এবং সাতদিনে প্রতিদিন এক মঞ্জিল করিয়া পড়িয়া বৃহস্পতিবারে খতম করিবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর উক্তি পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বৎসরে দুই খতম করা কুরআন শরীফের হক। সুতরাং কোন ভাবেই ইহার কম না হওয়া চাই।

এক হাদীসে আসিয়াছে, কুরআন শরীফের খতম যদি দিনের শুরুতে হয় তবে সমস্ত দিন আর যদি রাত্রের শুরুতে খতম হয় তবে সারা রাত্র ফেরেশতারা তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার দ্বারা কোন কোন মাশায়েখ এই তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন যে, গরমের মৌসুমে দিনের প্রথম ভাগে এবং শীতের মৌসুমে রাত্রের প্রথম ভাগে খতম করিবে। ইহাতে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যাইবে।

(৩৪) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَا نَبِىٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ

سعیدؓ بن سُلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا نہ کوئی نبیؑ نہ فرشتہ وغیرہ۔

(قال العراقی رواہ عبد الملک بن حبیب کذا فی شرح الاحیاء)

(৩৪) হযরত সায়ীদ ইবনে সুলাইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুরআনের চেয়ে বড় আর কোন সুপরিশকারী হইবে না। না কোন নবী ; না কোন ফেরেশতা আর না অন্য কেহ। (শরহুল-এহ্ইয়া)

কুরআন পাকের সুপারিশকারী হওয়া এবং এমন পর্যায়ের সুপারিশকারী হওয়া যাহার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইবে—এই বিষয় আরও বহু রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য কুরআন শরীফকে সুপারিশকারী বানাইয়া দিন। আমাদের প্রতিপক্ষ ও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না বানান।

'লাআলী মাসনূআ' নামক কিতাবে 'বায্যারে'র বর্ণনা হইতে নকল করিয়াছেন এবং এই হাদীসকে মওজু' বা জাল বলিয়া আখ্যায়িতও করেন নাই। আর তাহা এই যে, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার পরিবারের লোকেরা কাফন-দাফনের কাজে মশগুল হইয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহার শিয়রে অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন এক ব্যক্তি আসিয়া হাজির হয়। কাফন পরার পর সেই লোকটি কাফন এবং তাহার বুকের মধ্যভাগে থাকে। দাফন করার পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসে এবং মুনকার নাকীর দুই ফেরেশতা আসিয়া কবরে উপস্থিত হয় তখন তাহারা মুর্দাকে নির্জনে প্রশ্ন করার জন্য ঐ লোকটিকে আলাদা করিতে চায়। কিন্তু সেই লোকটি বলিতে থাকে ইনি আমার সাথী, আমার বন্ধু। আমি কোন অবস্থাতেই তাহাকে একাকী ছাড়িয়া যাইতে পারি না। তোমরা যদি তাহাকে প্রশ্ন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া থাক তবে তোমরা নিজেদের কাজ করিয়া যাও। আমি ততক্ষণ তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিব না যতক্ষণ না তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। অতঃপর সে তাহার সাথীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে, আমি ঐ কুরআন যাহাকে তুমি কখনও বড় আওয়াজে আবার কখনও আস্তে আস্তে পড়িতে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মুনকার নাকীরের প্রশ্নের পর তোমার আর কোন চিন্তা নাই। অতঃপর যখন তাহারা প্রশ্নাবলী হইতে অবসর হইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তি তাহার জন্য বেহেশত হইতে বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করে। যাহা রেশমের তৈরী হইবে এবং মিশকের দ্বারা সুঘ্রাণযুক্ত হইবে।' আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকেও এবং তোমাদেরকেও উহা নসীব করুন। ইহা খুবই ফযীলতপূর্ণ হাদীস। দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিলাম।

(٣٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ اَنَّهٗ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ لَا يَنْبَغِىْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَّجِدَ مَعَ مَنْ وَّجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِىْ جَوْفِهٖ كَلَامُ اللّٰهِ.
(رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد)

عبد اللہ بن عمروؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔

(৩৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িল, সে এলমে নবুওয়তকে আপন দুই পাঁজরের মাঝখানে ধারণ করিল ; যদিও তাহার নিকট ওহী পাঠান হয় না। কুরআনের বাহকের জন্য ইহা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত গোস্বা করিলে সেও তাহার সহিত গোস্বা করিবে অথবা মূর্খদের সহিত মূর্খতা করিবে। কেননা, তাহার ভিতরে আল্লাহর কালাম রহিয়াছে। (হাকিম)

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ওহীর সিলসিলা শেষ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য এখন আর ওহী আসা সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআন যেহেতু আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম তাই উহা এলমে নবুওয়ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব কোন ব্যক্তিকে যখন এলমে নবুওয়ত দান করা হয়, তখন উত্তম আখলাক ও চরিত্র গঠন করা এবং মন্দ চরিত্র হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার জন্য একান্তই জরুরী। হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, হাফেজে কুরআন ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী। কাজেই তাহার জন্য কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, সে খেলাধুলায় মত্ত লোকদের সহিত মিশিয়া যাইবে বা গাফেল লোকদের সহিত শরীক হইবে বা বেকার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ

ابن عمرؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی ایسے

لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ
لَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلٰى
كَثِيْبٍ مِّنْ مِّسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ
مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ رَجُلٌ قَرَأَ
الْقُرْاٰنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ
بِهٖ قَوْمًا وَّهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَدَاعٍ
يَّدْعُوْ اِلَى الصَّلٰوتِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ
اللّٰهِ وَرَجُلٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَ
بَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ
مَوَالِيْهِ.
(رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة)

ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ
ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑیگا
اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے
فارغ ہو. وہ مُشک کے ٹیلوں پر تفریح
کریں گے. ایک وہ شخص جس نے اللہ
کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت
کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی
رہے دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے
لئے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے تیسرا
وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ
رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی.

(৩৬) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন হইবে যাহারা কিয়ামতের ভয়ংকর বিপদেও ভীত হইবে না। তাহাদের হিসাব নিকাশও দিতে হইবে না। সমস্ত মখলূক যখন তাহাদের নিজ নিজ হিসাব-কিতাবে ব্যস্ত থাকিবে তখন তাহারা মেশ্‌কের টিলার উপর আনন্দ করিবে।

(প্রথমতঃ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতি করিয়াছে যে, মুক্তাদিগণ তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল।

(দ্বিতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে।

(তৃতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে নিজের মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (তাবারানী)

কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা, ভয়াবহতা ও মুসীবত এমন নয় যে, কোন মুসলমানের অন্তর উহা হইতে খালি বা বে-খবর থাকিতে পারে। সেই দিন যদি কোন কারণে নিশ্চিন্ততা নসীব হইয়া যায় তবে উহা লক্ষ লক্ষ নেয়ামত হইতেও উত্তম এবং কোটি কোটি শান্তির চেয়েও বড় গণীমত হইবে। আর উহার সহিত যদি আনন্দ উপভোগেরও ব্যবস্থা নসীব হইয়া যায় তবে যে ব্যক্তি উহা পাইবে সে তো বহুত বড় খোশনসীব ও সৌভাগ্যশীল। আর চরম বরবাদী ও ধ্বংস ঐ সকল নির্বোধদের জন্য

যাহারা কুরআনের তালীমকে অনর্থক ও বেকার এবং সময়ের অপচয় মনে করে। 'মুজামে কবীর' কিতাবে এই হাদীসের শুরুতে রেওয়ায়াতকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি যদি এই হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একবার দুইবার তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনিতাম তবে ইহা বর্ণনা করিতাম না।

(৩৭) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّیَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تُصَلِّیَ اَلْفَ رَكْعَةٍ

(رواه ابن ماجة باسناد حسن)

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر اگر تو صبح کو جاکر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی سو رکعات سے افضل ہے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بہ ہو یا نہ ہو تو ہزار رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔

(৩৭) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হে আবূ যর ! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা হাজার রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

এই বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, এলেম শিক্ষা করা এবাদত হইতে উত্তম। এলেমের ফযীলত সম্পর্কে যে পরিমাণ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে উহার সবগুলি বর্ণনা করা বিশেষতঃ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় অসম্ভব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমনি যেমন আমার ফযীলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। অন্য এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, শয়তানের নিকট একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে কঠিন।

(৩৮) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ فِیْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ
رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا۔

(৩৮) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাত্রে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। (হাকিম)

দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাহা দ্বারা সারারাত্রির গাফলত হইতে মুক্ত থাকা যায়। ইহার চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে!

(৩৯) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِیْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.
(رواہ ابن خزیمۃ فی صحیحہ والحاکم وقال صحیح علی شرطھما)

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جاوے گا جو شخص سو آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جاوے گا۔

(৩৯) হযরত আবূ হুরাইয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায নিয়মিত আদায় করিবে, সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাত্রে কানেতীন (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারী)দের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে কালামুল্লাহ শরীফের অভিযোগ হইতে বাঁচিয়া

যাইবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে রাতভর এবাদত করার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত হইতে একহাজার আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে এক কিনতার সওয়াব লাভ করিবে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, কিনতার কি? হুযূর এরশাদ করিলেন, কিনতার হইল বার হাজার (দেরহাম বা দিনার) সমতুল্য।

(٤٠) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ قَالَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ۔

(رواہ رزین کذا فی الرحمۃ المہداۃ)

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السّلام نے حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلّم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے۔ انھوں نے کہا کہ قرآن شریف۔

(৪০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, বহু ফেৎনা প্রকাশ পাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি? তিনি বলিলেন, কুরআন শরীফ। (রহমতে মুহদাত ঃ রাযীন)

আল্লাহর কিতাবের উপর আমলও যাবতীয় ফেৎনা হইতে বাঁচিবার উপায়, এমনিভাবে উহার তেলাওয়াতের বরকতও ফেৎনা হইতে মুক্তির উপায়। ২২নং হাদীসে বলা হইয়াছে, যে ঘরে কালামে পাকের তেলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে ছাকীনা ও রহমত নাযিল হয় এবং সেই ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যায়।

ওলামায়ে কেরাম ফেৎনার অর্থ দাজ্জালের আবির্ভাব ও তাতারীদেব ফেৎনা ইত্যাদি বলিয়াছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও একটি দীর্ঘ রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইয়াহয়া (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তাঁহার কালাম পড়ার হুকুম করিতেছেন এবং উহার দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ যেন কোন কওম নিজেদের কিল্লায় হেফাজতে রহিয়াছে। আর দুশমন উহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু দুশমন যে দিক হইতেই হামলা করিতে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে আল্লাহর কালাম তাহাদের হেফাজতকারী হিসাবে রহিয়াছে এবং উহা সেই দুশমনকে প্রতিহত করিয়া দিবে।

পরিশিষ্ট

এখানে চল্লিশ হাদীসের সহিত সংগতিপূর্ণ অতিরিক্ত আরও কতিপয় রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইল।

(১) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔ (رواه الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

عبد الملک بن عمیرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۂ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاء ہے۔

(১) হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, সূরা ফাতেহার মধ্যে যাবতীয় রোগের শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য) রহিয়াছে।

(দারিমী, বায়হাকী ঃ শুআব)

পরিশিষ্টের মধ্যে এমন কিছু সূরার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পড়িতে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ফাযায়েল অনেক বেশী। ইহা ছাড়া দুয়েকটি এমন খাছ বিষয় রহিয়াছে যেগুলির উপর সতর্কতা অবলম্বন করা কুরআন পাঠকারীর জন্য জরুরী।

বহু রেওয়ায়াতে সূরা ফাতেহার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, এক সাহাবী নামায পড়িতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে রত থাকার কারণে জওয়াব দিতে পারেন নাই। যখন নামায হইতে অবসর হইয়া হাজির হইলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবী নামাযের ওজর পেশ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফের আয়াতে পড় নাই—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে, যখনই তাঁহারা তোমাদিগকে ডাকিবেন।(সূরা আনফাল, আঃ ২৪)

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা অর্থাৎ সর্বোত্তম সূরাটি বলিয়া দিব? তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিলেন, উহা হইল আলহাম্‌দু সূরার সাতটি আয়াত। ইহা ‘ছাবয়ে মাছানী’ ও ‘কুরআনে আযীম’। কোন কোন সূফীয়ায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহে যাহা কিছু ছিল তাহা সম্পূর্ণ কালামে পাকে আসিয়া গিয়াছে। আর কালামে পাকে যাহা কিছু আছে উহা সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহায় আসিয়া গিয়াছে। আর যাহা কিছু সূরা ফাতেহায় আছে উহা বিসমিল্লাহর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আর বিসমিল্লাহর মধ্যে যাহা আছে উহা বিসমিল্লাহর ‘বা’ অক্ষরের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এখানে বা হরফটি মিলানোর অর্থে আসিয়াছে। আর সব কিছুর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বান্দাহকে আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। কেহ কেহ আরেকটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, ‘বা’ হরফের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা তাহার নুকতার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। কারণ পরিভাষায় নুকতা এমন বিন্দুকে বলা হয় যাহা ভাগ করা যায় না।

কোন কোন মাশায়েখ হইতে বর্ণিত আছে—إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

এই আয়াতে যাবতীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী মাকসাদ আসিয়া গিয়াছে। অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই জাতের কসম যাহার কব্জায় আমার জান, সূরা ফাতেহার মত এইরূপ সূরা আর নাযিল হয় নাই। না তাওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যবূরে, না অবশিষ্ট কুরআন শরীফে।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ সূরা ফাতেহা ঈমান ও একীনের সহিত পাঠ করে, তবে সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চাই দ্বীনী হউক বা দুনিয়াবী হউক, জাহেরী হউক বা বাতেনী হউক। উহা লিখিয়া লটকানো এবং চাটিয়া খাওয়াও রোগ-ব্যাধির জন্য উপকারী।

সিহাহ সিত্তাহ কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সাপ-বিচ্ছুর দংশন করা লোকের উপর, মৃগী রোগী ও পাগলের উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া দম করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে জায়েযও রাখিয়াছেন।

এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিঃ)এর উপর এই সূরা দম করিয়াছেন এবং এই সুরা পড়িয়া মুখের লালা ব্যথার স্থানে লাগাইয়াছেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ঘুমাইবার ইচ্ছায় শয়ন করে এবং সূরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পড়িয়া নিজের উপর দম করে তবে মৃত্যু ব্যতীত সকল বালা-মুসীবত হইতে সে নিরাপদ

থাকিবে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, সওয়াবের দিক হইতে সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআন শরীফের দুই–তৃতীয়াংশের সমান। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, আরশের খাছ খাযানা হইতে আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে, অন্য আর কাহাকেও এই খাযানা হইতে কোন কিছু দেওয়া হয় নাই। এক, সূরা ফাতেহা। দুই, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। তিন, সূরা কাউসার।

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করিল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও কুরআন শরীফ পাঠ করিল। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, শয়তানকে চারবার নিজের উপর বিলাপ ও কান্নাকাটি করিতে ও মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এক, যখন তাহার উপর লানত করা হয়। দুই, যখন তাহাকে আসমান হইতে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তিন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করেন। চার, যখন সূরা ফাতেহা নাযিল হয়।

ইমাম শাবী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া কলিজা ব্যথার অভিযোগ করিল। শাবী (রহঃ) বলিলেন, 'আসাসুল কুরআন' পড়িয়া ব্যথার জায়গায় দম কর। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল 'আসাসুল কুরআন' কি? শাবী (রহঃ) বলিলেন, সূরা ফাতেহা।

মাশায়েখগণের পরীক্ষিত আমলে লিখিত আছে যে, সূরা ফাতেহা ইস্‌মে আযম। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উহা পড়া উচিত। উহা আমল করার দুইটি তরীকা আছে। (১) ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–এর মীম হরফটি আলহামদুলিল্লাহ এর লামের সহিত মিলাইয়া ৪১ বার করিয়া চল্লিশ দিন পড়িবে। যে উদ্দেশ্য নিয়া পড়িবে, ইনশাআল্লাহ উহা হাসিল হইবে। যদি কোন রোগী বা যাদুগ্রস্ত লোকের জন্য পড়ার জরুরত হয় তবে পানিতে দম করিয়া তাহাকে পান করাইবে। (২) চাঁদের প্রথম রবিবার ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝখানে আগের মত মীম না মিলাইয়া ৭০ বার পড়িবে অতঃপর প্রত্যেক দিন একই সময়ে ১০ বার করিয়া কমাইয়া পড়িতে থাকিবে। এইভাবে এক সপ্তাহে পড়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি প্রথম মাসে মকসূদ হাসিল হইয়া যায় তবে তো উত্তম। নতুবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসেও এইরূপ আমল করিবে। এমনিভাবে যে কোন পুরানা রোগের জন্য চীনা বর্তনে চল্লিশ দিন এই সূরা গোলাপ, জাফরান ও মেশ্‌কের দ্বারা লিখিয়া বর্তন

ধুইয়া পান করানোর আমলও বিশেষভাবে পরীক্ষিত। ইহা ছাড়া দাঁত, মাথা ও পেট ব্যথায় ৭ বার পড়িয়া দম করার আমলও পরীক্ষিত। এই আমলগুলি 'মাজাহেরে হক' নামক কিতাব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে নকল করা হইয়াছে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ করিলেন—আজ আসমানের একটি দরজা খোলা হইয়াছে। যাহা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। অতঃপর এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা নাযিল হইলেন। তিনি এমন এক ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে আর কখনও নাযিল হন নাই। অতঃপর এই ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, আপনি দুইটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যাহা আপনার পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। একটি সূরা ফাতেহা আরেকটি সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ অর্থাৎ শেষ রুকু। এইগুলিকে নূর এই জন্য বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর আগে আগে চলিবে।

(٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِیْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِیْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ یٰسٓ فِیْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهٗ

(رواه الدارمی)

عطاء بن ابی رباحؒ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورۂ یٰسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔

(২) হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাহার সমস্ত দিনের জরুরত পুরা হইয়া যাইবে। (দারিমী)

হাদীস শরীফে সূরা ইয়াসীনের বহু ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি দিল থাকে, কুরআন শরীফের দিল হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশবার কুরআন খতমের সওয়াব লিখেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহা ও সূরা ইয়াসীনকে আসমান–জমিন পয়দা করার হাজার বছর পূর্বে পড়িয়াছেন। ফেরেশতাগণ

উহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য সেই উম্মতের জন্য যাহাদের উপর এই কুরআন নাযিল করা হইবে, সৌভাগ্য ঐ অন্তরসমূহের জন্য যাহারা উহাকে ধারণ করিবে অর্থাৎ ইয়াদ করিবে আর সৌভাগ্য ঐ সকল জিহ্বার জন্য যাহারা উহাকে তেলাওয়াত করিবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে তাহার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। সুতরাং তোমরা নিজেদের মুর্দাদের উপর এই সূরা পাঠ কর। অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, তাওরাতে সূরা ইয়াসীনের নাম ছিল মুন্য়িমাহ্। কেননা, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বহিয়া আনে, পাঠকারীর দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত দূর করে ও আখেরাতের ভয়-ভীতি দূর করে। এই সূরার আরেক নাম হইল, রাফেয়া ও খাফেযা। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকারী। এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় আমার প্রত্যেক উম্মতীর অন্তরে সূরা ইয়াসীন থাকুক।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিল অতঃপর মারা গেল, সে ব্যক্তি শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাঠ করে সে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পথ হারাইয়া যাওয়ার কারণে পাঠ করে সে পথ পাইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি জানোয়ার হারাইয়া যাওয়ার কারণে পড়ে সে জানোয়ার পাইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি খানা কম হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কায় পাঠ করে তাহার সেই খানা যথেষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর কোন লোকের নিকট উহা পাঠ করা হইলে তাহার যন্ত্রণা লাঘব হয়। প্রসব বেদনার সময় পড়িলে সন্তান সহজে প্রসব হয়।

হযরত মুকরী (রহঃ) বলেন, যদি কোন বাদশা বা দুশমনের ভয় হয় এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তবে ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা ইয়াসীন এবং সূরা সাফ্ফাত পড়ে অতঃপর আল্লাহর নিকট দোয়া করে তাহার দোয়া কবুল হয়। (উল্লেখিত আমলসমূহের বেশীর ভাগই 'মুজাহেরে হক' কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মাশায়েখগণের আপত্তি রহিয়াছে।)

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهٖ يَقْرَأْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ (رواه البيهقى فى الشعب)

ابن مسعودؓ نے حضورؐ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۂ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور ابن مسعودؓ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورۃ کو پڑھیں۔

(৩) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া তেলাওয়াত করিবে সে কখনও অনাহারে থাকিবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাহার কন্যাদিগকে প্রত্যেক রাত্রে এই সূরা তেলাওয়াত করার হুকুম করিতেন। (বায়হাকী ঃ শুআব)

সূরা ওয়াকেয়ার ফাযায়েলও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সূরা হাদীদ, সূরা ওয়াকেয়া ও সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত করে, সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা বলিয়া অভিহিত হয়। এক হাদীসে আছে, সূরা ওয়াকেয়া হইল সূরাতুল গিনা। তোমরা নিজেরা ইহা পাঠ কর এবং নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষা দাও। এক রেওয়ায়াতে আছে, ইহা নিজেদের স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দাও। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও এই সূরা পাঠ করার তাকীদ বর্ণিত আছে। কিন্তু খুবই হীনমন্যতার পরিচয় হইবে যদি উহা পার্থিব চার পয়সার জন্য পাঠ করা হয়। তবে দিলের অভাব দূর করার ও আখেরাতের নিয়তে পাঠ করিলে দুনিয়া স্বয়ং হাত জোড় করিয়া হাজির হইবে।

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔

رواه ابوداؤد واحمد والنسائى وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان فى صحيحه

ابوہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت تیس آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے وہ سورت تبارک الذی ہے۔

(৪) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফের মধ্যে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে যে, উহা তাহার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিতে থাকিবে, যতক্ষণ না তাহাকে ক্ষমা করা হইবে। উহা হইল সূরা তাবারাকাল্লাযী। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ)

এক রেওয়ায়াতে সূরা তাবারাকাল্লাযী সম্পর্কেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার মন চায় এই সূরা প্রত্যেক মুমেনের অন্তরে থাকুক। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা তাবারাকাল্লাযী ও সূরা আলিফ–লাম–মীম সেজদাহ পড়িল, সে যেন লাইলাতুল কদরে জাগিয়া থাকিয়া এবাদত–বন্দেগী করিল। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি সূরা পড়ে তাহার জন্য সত্তরটি নেকী লেখা হয় এবং সত্তরটি গোনাহ দূর করিয়া দেওয়া হয়। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি সূরা পড়ে তাহার জন্য শবে কদরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হয়।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, কিছুসংখ্যক সাহাবী এক জায়গায় তাঁবু লাগাইলেন। তাঁহাদের জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রহিয়াছে। হঠাৎ তাঁবু স্থাপনকারীরা সেখানে কাহাকেও সূরা তাবারাকাল্লাযী পড়িতে শুনিলেন। এই ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই সূরা আল্লাহর আজাব হইতে বাধাদানকারী এবং নাজাত দানকারী। হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ শুইতেন না যতক্ষণ সূরা আলিফ–লাম–মীম সেজদা ও সূরা তাবারাকাল্লাযী না পড়িতেন। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি বড় গোনাহগার ছিল। সে সূরা আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িত। ইহা ছাড়া সে আর কোন কিছু পড়িত না। লোকটির (মৃত্যুর পর তাহার) উপর এই সূরা স্বীয় ডানা মেলিয়া দিয়া সুপারিশ করিল, হে রব! এই ব্যক্তি আমাকে অনেক বেশী তেলাওয়াত করিত। তাহার সুপারিশ কবূল করা হইল এবং প্রত্যেক গোনাহের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী দেওয়ার হুকুম হইল। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) ইহাও বলেন যে, এই সূরা তাহার পাঠকারীর পক্ষে কবরে ঝগড়া করে এবং বলে, আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হইয়া থাকি তবে আমার সুপারিশ কবূল কর। নতুবা আমাকে তোমার কিতাব হইতে মিটাইয়া দাও, অতঃপর এই সূরা পাখির মত হইয়া যায় ও

মুর্দার উপর নিজের ডানা মেলিয়া দেয় আর তাহার উপর হইতে কবরের আজাব ফিরাইয়া রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, সূরা তাবারাকাল্লাযীর জন্যও এই সবগুলি ফযীলত রহিয়াছে। হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাযিঃ) এই দুইটি সূরা না পড়িয়া শুইতেন না।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, এই দুইটি সূরা সমস্ত কুরআন শরীফের অন্যান্য সব সূরা হইতে ৬০ নেকী বেশী রাখে। কবরের আজাব কোন সাধারণ বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম কবরের সম্মুখীন হইতে হয়। হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াইতেন তখন এত বেশী কাঁদিতেন যে, দাড়ি মুবারক ভিজিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা দ্বারাও এত কাঁদেন না, যত কবর দেখিয়া কাঁদেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, কবর হইল আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি উহার আজাব হইতে নাজাত পাইয়া যায়, তাহার জন্য পরবর্তী বিষয়গুলি সহজ হইয়া যায়। আর যদি কবরের আজাব হইতে নাজাত না পায় তবে পরবর্তী বিষয়গুলি উহার চেয়ে কঠিন হয়। আমি এই কথাও শুনিয়াছি যে, কবরের চেয়ে ভয়ানক আর কোন দৃশ্য নাই।

(৫) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَهٗ وَمِنْ اٰخِرِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اَوَّلَهٗ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کونسا عمل ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ حال مُرتَحِل. لوگوں نے پوچھا کہ حال مُرتَحِل کیا چیز ہے حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحبُ القرآن ہے جو اوّل سے چلے حتّٰی کہ اخیر تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اوّل پر پہنچے جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے۔

(رواه الترمذی کما فی الرحمة والحاکم وقال تفرد به صالح المری وهو من زهاد اهل البصرة الا ان الشیخین لم یخرجاه وقال الذهبی صالح متروك قلت هو من رواة ابی داؤد والترمذی)

(৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল সর্বোত্তম আমল কি? তিনি

বলিলেন, 'হাল্-মুরতাহিল।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হাল্-মুরতাহিল কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কুরআনওয়ালা, যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছে এবং শেষ করার পর আবার শুরুতে পৌঁছে এবং যেখানে থামে সেখান হইতে আবার সামনে অগ্রসর হয়। (রহমতে মুহ্দাত ঃ তিরমিযী, হাকিম)

'হাল্' অর্থ মঞ্জিলে আগমনকারী। 'মুরতাহিল' অর্থ যাত্রা আরম্ভকারী। অর্থাৎ যখন কালামে পাক খতম হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ আবার নতুন করিয়া শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ নহে যে, এখন তো খতম হইয়া গিয়াছে, আবার পরে দেখা যাইবে। 'কান্যুল উম্মালের' এক রেওয়ায়াতে ইহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আল খাতিমুল-মুফাত্তিহ্' খতম করনেওয়ালা এবং সাথে সাথেই শুরু করনেওয়ালা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ একবার খতম করার সাথে সাথেই আবার দ্বিতীয় খতম শুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশে কুরআন শরীফ খতম করার পর 'মুফলিহূন' পর্যন্ত পড়ার যে প্রচলন রহিয়াছে, সম্ভবত এখান হইতেই এই রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ইহাকেই আদব মনে করে এবং পরে আর খতম পুরা করার এহ্তেমাম করে না। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং উদ্দেশ্য হইল একবার খতম করার পর পুনরায় শুরু করা। কাজেই উহাকে পুরা করাও উচিত।

'শরহে এহ্ইয়ায়' এবং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাহার 'ইতকান' কিতাবে দারেমীর রেওয়ায়াত নকল করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুল আউজু বিরাব্বিন্নাছ পড়িতেন, তখন সাথে সাথে সূরা বাকারার মুফলিহূন পর্যন্তও পড়িতেন। অতঃপর কুরআন খতমের দোয়া করিতেন।

(٦) عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّیًا مِّنَ الْاِبِلِ فِیْ عُقُلِهَا۔ (رواه البخاری ومسلم)

ابو موسیٰ اشعری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بہ نسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے

(৬) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফে

খোঁজ খবর লইতে থাক। কসম সেই পাক জাতের যাহার হাতে আমার জান। উট যেমন রশি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা অপেক্ষা দ্রুত কুরআন অন্তর হইতে বাহির হইয়া যায়। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ মানুষ যদি জানোয়ারের হেফাজত হইতে উদাসীন হইয়া যায় এবং উহা রশি হইতে বাহির হইয়া যায় তবে ভাগিয়া যাইবে। এমনিভাবে যদি কালামে পাকের হেফাজত না করা হয় তবে উহাও ইয়াদ থাকিবে না ; ভুলিয়া যাইবে। আসল কথা হইল, কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়া স্বয়ং কুরআনেরই একটি প্রকাশ্য মুজিযা। নতুবা উহার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কোন কিতাবও মুখস্থ হওয়া শুধু কঠিনই নয় বরং প্রায় অসম্ভব। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-কামারে কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়াকে তাহার দয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থাৎ, আমি কালামে পাককে হেফ্‌জ করিবার জন্য সহজ করিয়া রাখিয়াছি, কেহ কি হেফ্‌জ করিতে প্রস্তুত আছে?(সূরা কামার, আয়াত ঃ ১৭)

জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে প্রশ্নবোধক বাক্যটি আদেশ অর্থে আসিয়াছে। সুতরাং যে বিষয়টিকে আল্লাহ তায়ালা বার বার তাকীদ করিয়া বলিতেছেন, আমরা মুসলমানগণ উহাকে অনর্থক, নির্বুদ্ধিতা এবং অযথা সময়ের অপচয় বলিয়া মনে করিতেছি। এই আহাম্মকীর পরও আমাদের ধ্বংসের জন্য আর কিসের অপেক্ষা বাকী রহিয়াছে? আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, হযরত উযাইর (আঃ) তাওরাত মুখস্থ লিখিয়া দেওয়াতে আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হন। আর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই নেয়ামতকে সহজ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া উহার এরূপ মূল্যায়ন করা হইয়া থাকে।

فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ, অত্যাচারীগণ অচিরেই জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মোটকথা, ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দয়া ও অনুগ্রহ যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া যায়। ইহার পর যদি কাহারও পক্ষ হইতে অবহেলা হয় তবে তাহাকে ভুলাইয়া দেওয়া হয়। কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বড় কঠোর শাস্তির কথা আসিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সামনে

উম্মতের গোনাহ পেশ করা হইয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ দেখিতে পাই নাই। অন্য জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুষ্ঠ রুগী হইয়া হাজির হইবে। 'জমউল ফাওয়ায়েদ' কিতাবে রাযীন–এর রেওয়ায়াত দ্বারা নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে—

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় আমি তাহার জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া দেই এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব। সে বলিবে হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন? আমি তো চক্ষুওয়ালা ছিলাম। এরশাদ হইবে, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ আসিয়াছিল তুমি সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলে। সুতরাং আজ তোমাকেও সেইভাবেই ভুলিয়া যাওয়া হইবে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১২৫) অর্থাৎ তোমার কোন সাহায্য করা হইবে না।

(٧) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

بُریدہؓ نے حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔

(৭) হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) হইতে, বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার চেহারায় শুধুমাত্র হাড্ডি থাকিবে যাহার উপর কোন গোশ্ত থাকিবে না। (বায়হাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ যাহারা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমরা কুরআন শরীফ পড়ি, আমাদের মধ্যে আজমী ও আরবী সব ধরণের লোক আছে। যেভাবে পড়িতেছ পড়িতে থাক। অতি শীঘ্র এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা

কুরআন শরীফের হরফগুলিকে এমনভাবে সোজা করিবে যেমন তীর সোজা করা হয়। অর্থাৎ খুবই সুন্দর করিবে। ঘন্টার পর ঘন্টা একেকটি হরফ সহীশুদ্ধ করিবে। মাখরাজ আদায়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিবে। আর এই সব কিছু দুনিয়ার জন্য হইবে। আখেরাতের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক থাকিবে না।

উদ্দেশ্য হইল, শুধু সুন্দর সুরের কোন মূল্য নাই যদি উহার মধ্যে এখলাস না থাকে। ইহা কেবল দুনিয়া কামানোর জন্য হইবে। চেহারায় গোশ্‌ত না থাকা'র অর্থ হইল, সে যখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তু কামাইবার মাধ্যম বানাইয়াছে তখন তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ চেহারাকে সৌন্দর্য ও রওনক হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) এক ওয়াজকারীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট কিছু চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করিবে তাহার যাহা কিছু চাহিবার থাকে সে যেন আল্লাহর নিকট চায়। অতিসত্বর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে। মাশায়েখগণ হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এলেমের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করে তাহার উদাহরণ হইল, নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা জুতা পরিস্কার করে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জুতা তো পরিস্কার হইয়া যাইবে কিন্তু মুখমণ্ডল দ্বারা উহা পরিস্কার করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকী। এইরূপ লোকদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হইয়াছে—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

অর্থাৎ, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করিয়াছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৬) সুতরাং না তাহাদের ব্যবসা লাভজনক, আর না তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের একটি সূরা পড়াইয়াছিলাম। সে হাদিয়া হিসাবে আমাকে একটি ধনুক দিল। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক লইয়াছ। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)ও তাহার নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এই জওয়াব নকল করিয়াছেন যে, তুমি জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ আপন কাঁধের মাঝখানে লটকাইয়া দিয়াছ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তুমি যদি জাহান্নামের একটি বেড়ি গলায় পরিতে চাও তবে উহা কবূল কর।

এখানে পৌঁছিয়া আমি ঐ সকল হাফেজদের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সহিত আরজ করিতে চাই, যাহারা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যেই মকতবে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পদমর্যাদা ও জিম্মাদারীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। যাহারা আপনাদের বদনিয়তের কারণে কালামে মজীদ পড়ানো বা হেফ্জ করানো বন্ধ করিয়া দেয় উহার আজাবে শুধু তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে না বরং আপনাদেরকেও উহার জন্য জবাবদেহী করিতে হইবে এবং আপনারাও কুরআনে পাক পড়া বন্ধ করনেওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আপনারা মনে করেন যে, আমরা কুরআন প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই উহা প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক। আমাদের বদস্বভাব ও বদ নিয়তি দুনিয়াকে কুরআনে পাক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতেছে।

ওলামায়ে কেরাম তালীমের বিনিময়ে বেতন নেওয়াকে এই জন্য জায়েয বলেন নাই যে, আমরা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া নিব। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য শুধু তালীম এবং কুরআনী এলেমের প্রচার–প্রসার। বেতন উহার বদলা নয় বরং জরুরত মিটানোর একটি উপায় মাত্র, যাহা একান্ত বাধ্য হইয়া এবং অপারগতার কারণেই এখতিয়ার করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

কালামে পাকের এইসব ফাযায়েল ও গুণাবলী আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল, উহার সহিত মহব্বত পয়দা করা। কেননা, কালামুল্লাহ শরীফের মহব্বত মহান আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের জন্য অপরিহার্য। আর একটির মহব্বত অপরটির মহব্বতের কারণ হয়। দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র আল্লাহর মারেফত হাসিল করিবার জন্য। আর মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখলুকের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য।

(কবির ভাষায়—)

ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند ٭ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار ٭ شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری

অর্থাৎ মেঘ-বায়ু, চাঁদ-সুরুজ, আসমান-জমিন মোটকথা সব কিছুই তোমার খাতিরে কর্মরত রহিয়াছে। যাহাতে তুমি আপন প্রয়োজন ইহাদের মাধ্যমে পুরা কর এবং উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এইসব বস্তু কত ফরমাবরদার, অনুগত ও সময়মত কাজ করিয়া থাকে। তবে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য কখনও কখনও উহাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় কিছুটা ব্যতিক্রমও করিয়া দেওয়া হয়। যেমন বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না হওয়া বাতাসের সময় বাতাস না চলা। এমনিভাবে গ্রহণের মাধ্যমে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। মোট কথা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই কোন না কোন পরিবর্তন আনা হয় যাহাতে একজন অসতর্ক ও গাফেল লোক সতর্ক ও সচেতন হইতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই সব কিছুকে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তোমার অধীন ও অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। অথচ উহাদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী তোমাকে আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার করিতে পারিল না। বস্তুতঃ আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী হইল মহব্বত—

اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

যখন কাহারো প্রতি মহব্বত হইয়া যায় এবং প্রেম ও অনুরাগ সৃষ্টি হইয়া যায় তখন তাহার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী স্বভাব ও অভ্যাসে পরিনত হইয়া যায় এবং তাহার নাফরমানী এমন কঠিন ও দুরূহ হইয়া যায়, যেমন মহব্বত ছাড়া কাহারও অনুগত্য করা অভ্যাস ও স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে কঠিন অনুভুত হয়। কোন জিনিসের সহিত মহব্বত পয়দা করার উপায় হইল, জাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর ধ্যান করা। যদি কাহারও চেহারা দেখিয়া অনিচ্ছাকৃত তাহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যায় তবে কাহারও মধুর কণ্ঠস্বরও অনেক সময় চুম্বকের মত শক্তি রাখে।

(যেমন কবি বলিয়াছেন—)

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد — بسا کیں دولت از گفتار خیزد

অর্থাৎ, প্রেম শুধু রূপ দেখিয়াই হয় না বরং অনেক সময় এই মুবারক দৌলত কথার দ্বারাও পয়দা হইয়া যায়। কাহারও কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়া যেমন মনের অজান্তে তাহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তেমনি কাহারও কথার মাধুর্য ও গুণাবলী তাহার সহিত মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞগণ লিখিয়াছেন, কাহারও সহিত মহব্বত পয়দা

করার ইহাও একটি পন্থা যে, মন হইতে অন্য সকলের কল্পনা দূর করিয়া শুধু তাহারই যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কল্পনা করা। যেমন স্বভাবজাত প্রেম-প্রণয়ে এইসব বিষয় মনের অজান্তে হইয়া থাকে। যখন কাহারও সুন্দর চেহারা বা হাত নজরে পড়িয়া যায়, তখন মানুষ অন্যান্য অঙ্গসমূহ দেখিবার চেষ্টা সাধনা করে, যাহাতে মহব্বত বাড়িয়া যায়। মনে করে উহাতে মনে শান্তি আসিবে। কিন্তু শান্তি তো আসেই না বরং অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। (কবির ভাষায়—)

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

অর্থাৎ, চিকিৎসা যতই করা হইল, রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।

জমিনে বীজ বপন করার পর যদি উহাতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে উহাতে যেমন ফসল হয় না, তেমনি যদি মনের অলক্ষে কাহারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, তবে আজ না হউক কাল এই ভালবাসা অন্তর হইতে মিটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার আপাদমস্তক দেহ সৌষ্ঠব, চালচলন ও কথাবার্তার কল্পনা দ্বারা অন্তরের এই মহব্বতের বীজকে যদি লালন করা হয় তবে প্রতি মুহূর্তে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। (কবি বলিয়াছেন—)

مکتبِ عشق کے انداز نرالے دیکھے　　اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

অর্থাৎ, প্রেমের পাঠশালায় ভিন্ন নিয়ম দেখিলাম, ছুটি সে পাইল না যে ছবক ইয়াদ করিয়াছে।

প্রেমের এই ছবক যদি ভুলিয়া যাও, তবে তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইয়া যাইবে। ইয়াদ যতই করিবে ততই উহাতে জড়াইয়া যাইবে। এমনিভাবে কোন যোগ্য পাত্রের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিতে চাহিলে তাহার হৃদয়গ্রাহী গুণাবলী ও তাহার সৌন্দর্যাবলী অনুসন্ধান করিবে। যে পরিমাণ জানা যায় উহার উপর সন্তুষ্টি না হইয়া আরো অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী মাহবূবের কোন একটি অঙ্গ দেখার উপর পরিতুষ্ট না হইয়া যতটুকু সম্ভব আরও বেশী দেখার লালসা বাকী থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যিনি প্রকৃতই সকল গুণ ও সৌন্দর্যের মূল উৎস এবং যাহার গুণ-সৌন্দর্য ব্যতীত দুনিয়াতে আর কোন গুণ-সৌন্দর্যই নাই, নিঃসন্দেহে তিনি এমন মাহবূব যাহার গুণাবলী ও সৌন্দর্যের কোন সীমা নাই। তাঁহার এই সীমাহীন গুণাবলীর মধ্য হইতে তাঁহার কালামও একটি। যাহার সম্পর্কে পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি যে, উহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার

পর আর কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই। প্রেমিকদের জন্য এই সম্পর্কের সমতুল্য আর কি হইতে পারে? (কবির ভাষায়—)

اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری

অর্থাৎ, হে ফুল আমি তোমাকে এই জন্যই ভালবাসি যে, তুমি কাহারও সুবাস বহন করিতেছ।

যাহা হউক যদি এই সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়িয়াও দেওয়া হয় যে এই কালামের উদ্ভাবক কে এবং উহা কাহার গুণ, তারপরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উহার যে সকল সম্পর্ক রহিয়াছে, একজন মুসলমানের কালামে পাকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উহা কম কি? যদি উহাও বাদ দেওয়া হয় তবে স্বয়ং কালামে পাকের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, দুনিয়াতে এমন কোন্ সৌন্দর্য ও গুণ রহিয়াছে যাহা কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় অথচ কালামে পাকের মধ্যে উহা বিদ্যমান নাই। (কবির ভাষায়—)

دامان نگہ تنگ وگل حسن تو بسیار   گل چیں بہار تو ز داماں گلہ دارد
فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر   ادائیں لاکھ اور بیتاب دل ایک

অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টির আঁচল অতি সংকীর্ণ, নতুবা ফুলের সৌন্দর্যের কোন অভাব ছিল না ; পুষ্প-কাননের বসন্ত কেবল তোমার সঙ্কীর্ণ আঁচলেরই অভিযোগ করে।

আপনার সীমাহীন গুণাবলীর কোন্ কোন্টির উপর প্রাণ উৎসর্গ করিব ; লাখো গুণাবলী অথচ অশান্ত মন মাত্র একটি।

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠকারীর নিকট গোপন থাকার কথা নয় যে, দুনিয়াতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার দিকে উপরোক্ত হাদীসসমূহে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং প্রেম ও গৌরবের বিষয়সমূহের মধ্য হইতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার প্রতি কোন প্রেমিক আকৃষ্ট হয় আর সেই বিষয়ে কালামুল্লাহ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব চরম পর্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। যেমন সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ যাহা পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে উহার সম্পূর্ণই পরিপূর্ণরূপে কালামে পাকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সর্বপ্রথম হাদীস ঃ সামগ্রিকভাবে যাবতীয় বস্তুর তুলনায় কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। মহব্বত ও ভালবাসার যে কোন একটি প্রকারই ধরুন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট মহব্বতের অসংখ্য

কারণসমূহের মধ্য হইতে কোন এক কারণে কাহাকেও পছন্দ হয় তবে কুরআন শরীফ সেই সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে উহা হইতে উত্তম। অতঃপর সাধারণভাবে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপনের যত কারণ হইতে পারে পৃথকভাবেও দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্বক ঐ সবের ঊর্ধ্বে কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২নং হাদীস ঃ লাভ–মুনাফার কারণে যদি কাহারও সহিত মহব্বত হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, আমি কুরআন পাকের তেলাওয়াতকারীকে অন্যান্য সকল দোয়াকারীর তুলনায় বেশী দান করিব। ব্যক্তিগত মর্যাদা, যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণে যদি কাহারও প্রতি আকর্ষণ হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুর উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপ, যেমন মখলূকের উপর আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, গোলামের উপর মনিবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মালের উপর মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব।

৩নং হাদীস ঃ যদি কেহ ধনসম্পদ, খাদেম–খোদ্দাম ও জীবজন্তুর প্রতি আসক্ত হয় বা কোন এক ধরণের পশু পালনের ব্যাপারে সৌখিন হয়, তবে বিনা পরিশ্রমে জীবজন্তু পাওয়ার চাইতেও কুরআন পাক হাসিল করার শ্রেষ্ঠত্বের কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪নং হাদীস ঃ কোন সূফী ভাবাপন্ন লোক যদি তাকওয়া–পরহেজগারী হাসিল করিতে আগ্রহী হয়, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হয় ; তাকওয়া ও পরহেজগারীতে যাঁহাদের সমান হওয়া কঠিন ; এক মুহূর্তও যাঁহারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলেন না। তদুপরি যদি কেহ দ্বিগুণ পাওয়াকে কিংবা নিজের মতামতকে দুইজনের মতামতের সমান গণ্য করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে, তবে বলা হইয়াছে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

৫নং হাদীস ঃ হিংসা যদি কাহারও অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহার ভিতরে হিংসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে ; কিছুতেই সে এই অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহার যোগ্যতার উপর প্রকৃতই হিংসা হইতে পারে, সে হাফেজে কুরআন।

৬নং হাদীস ঃ যদি কেহ ফল–ফলাদির পাগল হয় এবং উহার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, ফল ছাড়া সে শান্তি পায় না, তবে কুরআন পাক তুরন্‌জ (কমলালেবু জাতীয় ফল) সমতুল্য। যদি কেহ মিষ্টদ্রব্যের এমন

আসক্ত হয় যে, মিষ্টি ছাড়া তাহার চলে না, তবে কুরআন পাক খেজুর হইতে অধিক মিষ্ট।

৭নং হাদীস ঃ যদি কেহ ইজ্জত-সম্মান ও মেম্বারী-সরদারীর অভিলাষী হয়, উহা ছাড়া সে থাকিতে পারে না, তবে কুরআন পাক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী।

৮নং হাদীস ঃ যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গকারী এমন সাহায্যকারী চায়, যে সকল ঝগড়া-বিবাদে আপন সঙ্গীর পক্ষে লড়াই করিতে সদা প্রস্তুত থাকে, তবে কুরআন পাক এমন সঙ্গী যে, (কিয়ামতের দিন) সকল বাদশার বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহিত আপন সঙ্গীর পক্ষে ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী গবেষক তত্ত্ব উদঘাটনের কাজে নিজের জীবন ব্যয় করিতে চায় এবং তাহার নিকট একটি তত্ত্ব উদঘাটন দুনিয়ার সকল আনন্দ হইতেও অধিকতর হয়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তর যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

তদ্রূপ যদি কেহ গুপ্ত রহস্য ও তথ্য আবিষ্কার করাকে যোগ্যতা মনে করে, সি.আই.ডি পদের দক্ষতাকে কৃতিত্ব মনে করে এবং ইহার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তবে কুরআন পাকের অভ্যন্তরে অন্তহীন গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে।

৯নং হাদীস ঃ যদি কেহ সুউচ্চ মহল তৈরীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, সপ্তম তলায় নিজের জন্য খাছ কামরা বানাইতে চায়, তবে কুরআন পাক সপ্তম হাজার তলায় পৌঁছাইয়া দেয়।

১০নং হাদীস ঃ যদি কেহ এমন ব্যবসা করিতে চায়, যাহাতে কোন পরিশ্রম নাই অথচ লাভ খুব বেশী, তবে কুরআন পাক প্রতি হরফে দশ নেকী দেওয়ায়।

১১নং হাদীস ঃ যদি কেহ সিংহাসন ও রাজমুকুটের কাঙ্গাল হয় আর উহার জন্য সমগ্র দুনিয়ার সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে কুরআন পাক আপন বন্ধুর পিতামাতাকে এমন মুকুট পরাইয়া দিবে যাহার চমক ও উজ্জ্বলতার দুনিয়াতে কোন তুলনা নাই।

১২নং হাদীস ঃ যদি কেহ ভেল্কিবাজীতে এইরূপ পারদর্শী হইতে চায় যে, হাতে আগুন রাখিতে পারে এবং জ্বলন্ত দিয়াশলাই মুখে পুরিয়া নিতে পারে, তবে কুরআন পাক এমন যে, জাহান্নামের আগুনকেও নিষ্ক্রিয় করিতে পারে।

১৩নং হাদীস ঃ যদি কেহ শাসকগোষ্ঠীর প্রিয় হওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া লাগে ; সে গর্ববোধ করে যে, আমার একটি চিঠির কারণে অমুক

বিচারপতি অমুক অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি অমুক ব্যক্তির উপর শাস্তি হইতে দেই নাই। শুধু এইটুকু বিষয় হাসিল করিবার জন্য জজ ও কালেক্টরকে দাওয়াত করিয়া তোষামোদ করিয়া সময় ও টাকা-পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে ; প্রতিদিন কোন না কোন একজন জজকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তবে কুরআন শরীফ তাহার প্রত্যেক বন্ধুর মাধ্যমে এমন দশজনকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করাইয়া দেয় যাহাদের সম্পর্কে জাহান্নামের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে।

১৪নং হাদীস ঃ যদি কেহ খোশবূর পাগল হয়, বাগান ও ফুলের প্রেমিক হয় তবে কুরআন শরীফ খোশবুর ভাণ্ডার। যদি কেহ আতরের আসক্ত হয়, মেশকযুক্ত মেহদীতে গোসল করিতে চায়, তবে কালামে মজীদ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মেশ্‌ক। আর গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই মেশ্‌কের সহিত ঐ মেশ্‌কের কোন তুলনাই হয় না।

چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

"বস্তুতঃ সেই পাক-পবিত্র ঊর্ধ্বজগতের সহিত এই মর্তজগতের কোন তুলনাই হইতে পারে না।"

কবির ভাষায়—

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں
مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

"মেশকের সুগন্ধি ছড়ানো (হে প্রেমাষ্পদ!) তোমারই কেশগুচ্ছের কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ কারণবশতঃ এই অপবাদ চীনের (কস্তুরীযুক্ত) হরিণের উপর চাপাইয়া দিয়াছে।"

১৫নং হাদীস ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃতির হয় যে, সে শাস্তির ভয়ে কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু উৎসাহ প্রদান তাহার মধ্যে কোন ক্রিয়া করে না, কুরআন শরীফ হইতে খালি হওয়া ঘরের বরবাদী সমতুল্য।

১৬নং হাদীস ঃ কোন আবেদ যদি সর্বোত্তম এবাদতের তালাশে থাকে এবং সবচাইতে বেশী সওয়াবপূর্ণ এবাদতে মশগুল থাকার আকাঙ্খী হয় তবে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত সর্বোত্তম এবাদত। পরিস্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআন তেলাওয়াত নফল নামায, নফল রোযা, তাসবীহ-তাহলীল এই সবকিছু হইতে উত্তম।

১৭নং ও ১৮নং হাদীস ঃ বহু লোক গর্ভবতী জানোয়ারের প্রতি আগ্রহ রাখে এবং গর্ভবতী জানোয়ার অধিক মূল্যে খরিদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইয়া দিয়াছেন এবং বিশেষভাবে এই বিষয়টিকেও দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ উহা হইতেও উত্তম।

১৯নং হাদীস ঃ অধিকাংশ লোক সর্বদা স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তাযুক্ত থাকে। আর এইজন্য ব্যায়াম করে, প্রতিদিন গোসল করে, দৌড়ায়, ভোরে উঠিয়া ভ্রমণ করে, এমনিভাবে কতক লোকের দুঃখ, অশান্তি, চিন্তা, ভাবনা হামেশা লাগিয়া থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, সূরায়ে ফাতেহা প্রত্যেক রোগের শেফা এবং কুরআনে কারীম অন্তরের ব্যাধি দূর করিয়া দেয়।

২০নং হাদীস ঃ গর্বের পূর্বোল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রহিয়াছে, সেই সবগুলি বর্ণনা করা মুশকিল। যেমন, অধিকাংশ লোক বংশমর্যাদার গর্ব করে। কেহ নিজের সুনীতির উপর গর্ব করে। কেহ সর্বজনপ্রিয় বলিয়া গর্বিত, আবার কেহ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলের দরুন গর্বিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, কুরআনই হইতেছে প্রকৃত গর্বের বিষয়। আর হইবেই না কেন? কুরআনে কারীমই বস্তুতঃ সর্বপ্রকার গুণ ও সৌন্দর্যের আধার।

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

"সকলে মিলিয়া পাইয়াছে যাহা তুমি একা পাইয়াছ তাহা।"

২১নং হাদীস ঃ অধিকাংশ লোকেরই ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ থাকে। ইহার জন্য খানাপিনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদে কম খরচ করে এবং কষ্ট সহ্য করে। ধনসম্পদ জমা করার ঘুরপাকে এমনভাবে ফাঁসিয়া যায় যাহা হইতে বাহির হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম সঞ্চয়যোগ্য সম্পদ হইতেছে কালামুল্লাহ। অতএব যত ইচ্ছা কেহ জমা করুক কেননা ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ নাই।

২২নং হাদীস ঃ আপনার যদি বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার সখ হয়, আপনি নিজ কামরায় দশটি বৈদ্যুতিক বাল্ব এইজন্য লাগান যাহাতে আপনার কামরা বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করিয়া উঠে তবে কুরআন কারীমের তুলনায় অধিক আলোর বস্তু আর কি হইতে পারে?

আপনি যদি চান যে, আপনার বন্ধু-বান্ধব আপনার কাছে প্রতিদিন কিছু না কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠাইতে থাকুক আর এই উদ্দেশ্যেই মানুষের সহিত সম্পর্কও বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং কখনও কোন বন্ধু

নিজের বাগানের ফল আপনার জন্য না পাঠাইলে তাহার সমালোচনা করেন তবে কুরআনে কারীমের চাইতে বেশী হাদিয়া কে পাঠাইতে পারিবে? যে কুরআন তেলাওয়াত করে তাহার কাছে ছাকীনা অর্থাৎ বিশেষ রহমত পাঠানো হয়। সুতরাং আপনার কাহারও প্রতি জীবন উৎসর্গ করার কারণ যদি ইহাই হয় যে, সে আপনার জন্য দৈনিক কিছু হাদিয়া আনিয়া থাকে তবে কুরআন শরীফে উহারও বদল রহিয়াছে।

আপনি যদি কোন মন্ত্রীর এইজন্য সর্বদা পদচুম্বন করিয়া থাকেন যে, সে উচ্চ দরবারে আপনার আলোচনা করিবে। কোন পেশকারের এইজন্য তোষামোদ করেন যে, সে কালেক্টারের নিকট আপনার কিছু প্রশংসা করিবে অথবা কাহারো এইজন্য গুণকীর্তন করেন যে, বন্ধুর মজলিশে আপনার আলোচনা করিবে তবে কুরআনে কারীম প্রকৃত মাহবুব ও আহকামুল হাকিমীনের দরবারে আপনার আলোচনা স্বয়ং প্রিয় ও মনিবের জবানে করাইয়া দেয়।

২৩নং হাদীস ঃ আপনি যদি এই তালাশে থাকেন যে, প্রিয়জনের নিকট সর্বাধিক প্রিয়-বস্তু কি? যাহার জন্য আপনি পাহাড় খুড়িয়া দুধের নহর বাহির করিতেও প্রস্তুত থাকেন তবে মনিবের নিকট কুরআন শরীফ হইতে প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই।

২৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি দরবারী হওয়ার জন্য জীবন ব্যয় করিয়া থাকেন এবং বাদশার সহচর হওয়ার জন্য শত সহস্র তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন তবে কালামুল্লাহ শরীফের মাধ্যমে এমন এক বাদশার সহচরে পরিগণিত হইবেন যাহার সামনে বড় হইতে বড় কোন বাদশাহীর মূল্য নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, কাউন্সিলের মেম্বর হওয়ার জন্য বা একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শিকারে যাওয়ার জন্য আপনি কত কুরবানী করেন, আরাম-আয়েশ ও জানমাল উৎসর্গ করেন, মানুষের মাধ্যমে চেষ্টা-তদবীর করান, দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, আপনার দৃষ্টিতে ইহা দ্বারা আপনার মর্যাদা লাভ হইবে। যদি তাহাই হয় তবে প্রকৃত মর্যাদার জন্য এবং প্রকৃত হাকিম ও বাদশার সহচর এবং তাঁহার দরবারের সদস্য হওয়ার জন্য কি আপনার সামান্য মনোযোগেরও প্রয়োজনও নাই? আপনি এই লৌকিকতাপূর্ণ মর্যাদার জন্য জীবন ব্যয় করুন কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনের কিছু অংশ জীবনদাতার জন্যও তো ব্যয় করুন।

২৫নং হাদীস ঃ আপনি যদি চিশতিয়া তরীকার আশেক হইয়া থাকেন এবং এই সকল মজলিস ব্যতীত আপনার শান্তি লাভ না হয় তবে

তেলাওয়াতে কুরআনের মজলিস উহা হইতে বহু গুণে বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং যত বড় উপেক্ষাকারী হউক তাহার কানকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়।

২৬নং হাদীস ঃ এমনিভাবে আপনি যদি মনিবকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

২৭নং হাদীস ঃ আপনি যদি ইসলামের দাবীদার হন, মুসলমান হওয়ার দাবী করেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল, কুরআন শরীফ এইরূপ তেলাওয়াত করুন যেইরূপ উহার হক রহিয়াছে। আপনার নিকট ইসলাম যদি কেবল মৌখিক জমা খরচ না হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সহিত আপনার ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকে তবে ইহা আল্লাহর ফরমান এবং তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে উহার তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। অধিকন্তু আপনার মধ্যে যদি তীব্র জাতীয়তাবোধ থাকিয়া থাকে, আপনি যদি তুর্কী টুপি এইজন্য পরিয়া থাকেন যে, ইহা ইসলামী লেবাস, আপনার কাছে যদি জাতীয় নিদর্শন প্রিয়বস্তু হইয়া থাকে আর ইহা প্রচার করার জন্য আপনি বিভিন্ন রকম চেষ্টা তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, পত্র–পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন সভা–সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়া থাকেন তবে আল্লাহর রাসূল আপনাকে নির্দেশ দিতেছে যথাসম্ভব কুরআন শরীফের প্রচার করুন।

আমি যদি এইখানে পৌছিয়া জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তবে অসঙ্গত হইবে না। আপনার পক্ষ হইতে কুরআন প্রচারের ব্যাপারে কতটুকু সহযোগিতা হইতেছে? শুধু ইহাই নহে বরং আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা–ভাবনা করিয়া জওয়াব দিন যে, ইহার প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে আপনার কি পরিমাণ অংশ রহিয়াছে? আজ কুরআনের তালীমকে বেকার বলা হয়, সময় ও জীবন নষ্ট করা, অযথা ও অহেতুক মগজ ক্ষয় করা এবং নিস্ফল মেহনত করা বলা হয়। আপনি হয়ত উহার সহিত একমত নহেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একদল লোক উক্ত কাজে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টারত রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নীরবতা উহার সহযোগিতা নহে কি? মানিয়া নিলাম আপনারা এই চিন্তাধারাকে পছন্দ করেন না, কিন্তু আপনাদের এই অপছন্দের দ্বারা কি লাভ হইল?

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن　　خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

অর্থাৎ, মানিয়া লইলাম যে, তুমি আমার প্রতি উদাসীন থাকিবে না ;

কিন্তু তোমার চেতনা লাভের আগেই আমি ধুলায় মিশিয়া যাইব।

বর্তমানে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে এইজন্য অস্বীকার করা হইতেছে যে, মসজিদের মোল্লারা ইহাকে পেট পালার একটা পন্থা বানাইয়া নিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদের নিয়তের উপর বিরাট এক হামলা এবং একটি বড় কঠিন দায়-দায়িত্বের ব্যাপার সময়মত যাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। ইহার পরও আমি অত্যন্ত আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিষয় একটু চিন্তা করুন যে, এই সকল স্বার্থপর মোল্লাদের স্বার্থপরতার ফলাফল আজ দুনিয়াতে আপনারা কি দেখিতেছেন, আর আপনাদের নিঃস্বার্থ মতামতসমূহের ফলাফল কি হইবে? এবং কালামে পাকের প্রচার ও প্রসারে আপনাদের সুপরামর্শ ও মতামতসমূহ হইতে কতটুকু সহযোগিতা মিলিবে। যাহাই বলুন না কেন আপনাদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল কুরআন পাকের প্রচার করা। এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বারা কতটুকু পালন করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য করুন, অনেকে মনে করে আমরা তাহাদের এই চিন্তাধারার সহিত শরীক নাই, তাই আমাদের কিছু কি ক্ষতি হইবে? কিন্তু ইহাতে আপনারাও আল্লাহর পাকড়াও এবং শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যখন মন্দকাজ প্রবল হইবে।

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা কোন এক গ্রামকে উল্টাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গ্রামে এমন একজন ব্যক্তি রহিয়াছে যে কখনও গোনাহ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু আমার নাফরমানী হইতেছে দেখিয়াও তাহার কপালে কখনও বিরক্তির ভাঁজ পড়ে নাই।

বস্তুতঃ ওলামায়ে কেরামকে এই সমস্ত কারণই নাজায়েয কাজ দেখিলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে বাধ্য করে। আমাদের মুক্ত চিন্তাধারার লোকেরা যাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আপনারা নিজেদের প্রশস্ত চিন্তাধারা ও উদার স্বভাবের উপর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

কেননা এই দায়িত্ব শুধু আলেম সমাজের উপরই ন্যস্ত নহে বরং ইহা এইরূপ প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। যে কোন নাজায়েয কাজ হইতে দেখিয়া বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহাতে বাধা দেয় না। বেলাল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গোনাহ যখন গোপনে করা হয় তখন উহার দায়-দায়িত্ব কেবল ঐ গোনাহগার ব্যক্তির উপরই আসে। আর যখন প্রকাশ্যে হয় এবং উহাতে বাধা না দেওয়া হয় তখন উহার শাস্তি ব্যাপক হইয়া যায়।

২৮নং হাদীস ঃ আপনি যদি ইতিহাসপ্রিয় হন এবং যেখানে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আপনি উহা সংগ্রহ করার জন্য সফর করেন তবে কুরআন শরীফে বিগত যুগের সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাবসমূহের বিকল্প মওজুদ রহিয়াছে।

২৯নং হাদীস ঃ আপনি যদি এইরূপ উচ্চমর্যাদা লাভের আকাংখা করেন যে, নবীদেরকে আপনার মজলিশে বসার ও শরীক হওয়ার হুকুম করা হউক, তবে ইহাও শুধু কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যেই মিলিবে।

৩০নং হাদীস ঃ আপনি যদি এতই অলস হন যে কোন কাজই করিতে পারেন না, তবে বিনা পরিশ্রম ও বিনা কষ্টে মর্যাদা লাভও শুধু কুরআন শরীফের মধ্যে মিলিবে। কোন মক্তবে বসিয়া চুপচাপ বাচ্চাদের কুরআন শরীফ পড়া শুনিতে থাকুন এবং বিনা কষ্টে সওয়াব লাভ করিতে থাকুন।

৩১নং হাদীস ঃ আপনি যদি বৈচিত্র্যপ্রিয় হইয়া থাকেন, কোন এক বিষয় বিরক্তি আসিয়া যায় তবে কুরআনে কারীমের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন রকম ও বিচিত্র বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করুন। কোথাও রহমতের আলোচনা, কোথাও আজাবের আলোচনা, কোথাও কিচ্ছা-কাহিনী, কোথাও হুকুম-আহকাম। আবার তেলাওয়াতের অবস্থায় কখনও জোরে ও কখনও আস্তে পড়ুন।

৩২নং হাদীস ঃ আপনার গোনাহ যদি সীমা ছাড়াইয়া গিয়া থাকে আর আপনার মৃত্যুর একীন রহিয়াছে তাহা হইলে কুরআন তেলাওয়াতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। কেননা, কুরআনে কারীমের ন্যায় সুপারিশকারী পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু কুরআনে কারীমের সুপারিশ গৃহীত হওয়া নিশ্চিত।

৩৩নং হাদীস ঃ অনুরূপভাবে আপনি যদি এত বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন যে, ঝগড়াটে মানুষকে ভয় পান এবং লোকদের ঝগড়ার ভয়ে আপনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে কুরআনের অভিযোগকে ভয় করুন। কেননা, কুরআনের চাইতে বেশী ঝগড়াটে

আপনি আর কাহাকেও পাইবেন না। দুই পক্ষের ঝগড়ার মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন সমর্থক থাকে। কিন্তু কুরআনের ঝগড়ার মধ্যে তাহার দাবীকেই সমর্থন করা হয়, সকলে তাহাকে সত্যবাদী বলিবে। আর আপনার কোন সমর্থনকারী থাকিবে না।

৩৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি এমন একজন পথপ্রদর্শক চাহেন যে আপনাকে প্রিয়জনের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে তবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করুন। আপনি কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় করেন তবে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত আপনার কোন গত্যন্তর নাই।

৩৫নং হাদীস ঃ আপনি যদি নবী রাসূলগণের এলেম লাভ করিতে চান এবং উহার আকাঙ্ক্ষী ও আগ্রহী হন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন এবং এই বিষয়ে যত ইচ্ছা যোগ্যতা অর্জন করুন। আপনি যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য জীবন দিতে তৈয়ার থাকেন তবে বেশী বেশী কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করুন।

৩৬নং হাদীস ঃ যদি আপনার চঞ্চল মন সর্বদা শিমলা ও মনসুরীর চূড়াতেই ভ্রমণ করার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং শত প্রাণে হইলেও আপনি একটি পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য কুরবান, তবে কুরআনে কারীম এমন এক সময় আপনাকে মুশকের পাহাড়ে ভ্রমণ করাইবে যখন সবাই নাফসী নাফসী বলিবে।

৩৭, ৩৮ ও ৩৯নং হাদীস ঃ আপনি যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ত্যাগীদের সর্বোচ্চ তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন এবং রাতদিন নফল এবাদত হইতে আপনার অবসর নাই, তবে জানিয়া রাখুন কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উহার চাইতে অগ্রগামী।

৪০নং হাদীস ঃ আপনি যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ হইতে মুক্ত থাকিতে চান এবং সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে থাকিতে পছন্দ করেন তবে একমাত্র কুরআনের মধ্যেই উহা হইতে মুক্তি রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট হাদীস

১নং হাদীস ঃ আপনি যদি কোন চিকিৎসকের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চান তবে সূরায়ে ফাতেহায় প্রত্যেক রোগের শেফা রহিয়াছে।

২নং হাদীস ঃ যদি আপনার সীমাহীন প্রয়োজনসমূহ পুরা না হয়, তাহা হইলে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করেন না কেন?

৩নং হাদীস ঃ টাকা পয়সার সহিত যদি আপনার এতই ভালবাসা

থাকিয়া থাকে যে, ইহা ছাড়া আপনি আর কিছু বুঝেন না তবে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করেন না কেন?

৪নং হাদীস ঃ আপনি যদি সর্বদা কবরের আজাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন আর উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আপনার নাই তবে উহার জন্যও কালামে পাকের মধ্যে মুক্তি রহিয়াছে।

৫নং হাদীস ঃ আপনার যদি এমন কোন স্থায়ী কাজের প্রয়োজন হয় যাহাতে আপনার মূল্যবান সময় কাটিবে তবে উহার জন্য কুরআনে পাক হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু মিলিবে না।

৬-৭নং হাদীস ঃ কিন্তু এমন যেন না হয় যে, এই সম্পদ লাভ হওয়ার পর ছিনাইয়া নেওয়া হইল, কেননা রাজত্ব লাভ হওয়ার পর হারাইয়া যাওয়া বড়ই আফসোস ও ক্ষতির বিষয় হইয়া থাকে। আর এমন কোন কাজও যেন না হয় যাহাতে নেকী বরবাদ ও গোনাহ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

আমার মত অধম কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কতটুকু আর অবগত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানানুসারে বাহ্যতঃ যতটুকু বুঝে আসিয়াছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার পথ খুলিয়া গিয়াছে। কেননা মহব্বত ও ভালবাসার উপকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে পাঁচটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। (১) স্বীয় অস্তিত্ব। কেননা স্বভাবতঃ মানুষ ইহাকে ভালবাসে। আর কুরআনে কারীমে যেহেতু বিপদাপদ হইতে নিরাপত্তা রহিয়াছে। কাজেই উহা আপন হায়াত ও স্থায়ীত্বের কারণ (২) স্বভাবতঃ মিল ও সম্পর্ক। যাহার ব্যাপারে ইহার চেয়ে অধিক পরিস্কারভাবে আর কি বলিতে পারি যে, কুরআন সিফাতে ইলাহী। আর মালিক ও মালিকাধীনের, মনিব ও গোলামের পরস্পরে যে মিল ও সম্পর্ক রহিয়াছে উহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অজানা নহে।

ہست رَبّ الناس را باجان ناس — اِتصال بے تکیف و بے قیاس
سب سے ربطِ آشنائی ہے اُسے — دِل میں ہر اک کے رسائی ہے اُسے

মানুষের পরওয়ারদিগারের সহিত মানুষের প্রাণের এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা ব্যক্ত করা যায় না ; ধারণা করা যায় না। সকলের সহিত তাহার পরিচয় ও সম্পর্ক রহিয়াছে, সকলের অন্তরে তিনি পৌঁছিতে পারেন। (৩) সৌন্দর্য। (৪) গুণ। (৫) ইহ্সান ও অনুগ্রহ।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোকে যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে সৌন্দর্য ও গুণ সম্পর্কে আমার মত স্বল্প জ্ঞানীর বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিঃসংকোচে

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবেন যে, সম্মান ও গৌরব, শান্তি ও আনন্দ, সৌন্দর্য ও গুণাবলী, দয়া ও অনুগ্রহ, তৃপ্তি ও আরাম, ধন ও দৌলত, মোটকথা এমন কোন বিষয় পাইবেন না যাহা মহব্বতের উপকরণ হইতে পারে, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে উহার সকল বিষয়ের উপর কুরআন শরীফকে প্রাধান্য দেন নাই। তবে পর্দায় ঢাকা থাকা দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধিমান লোক লিচুর কাঁটাযুক্ত খোসার কারণে সুস্বাদু মগজ খাওয়া হইতে বিরত থাকে না। কোন আত্মহারা প্রেমিক তাহার প্রিয়তমাকে পর্দায় ঢাকা থাকার কারণে ঘৃণা করে না বরং পর্দা সরাইয়া তাহাকে দেখার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে সক্ষম না হয় তবে পর্দার উপর দিয়া দেখিয়াই চক্ষু শীতল করিয়া নিবে। যখন নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, যাহার জন্য বৎসরের পর বৎসর অধির আগ্রহে রহিয়াছি, সে এই চাদরের ভিতর রহিয়াছে, তখন ঐ চাদর হইতে তাহার দৃষ্টি সরা অসম্ভব হইবে।

অনুরূপভাবে কুরআনে পাকের এই সকল ফযীলত, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য মওজুদ থাকার পরও যদি কোন পর্দা ও অন্তরালের কারণে উপলব্ধি না হয় তবে ইহা হইতে বিমুখ হওয়া কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। বরং স্বীয় ত্রুটির জন্য আফসোস করিবে এবং কুরআনের মহত্ত্বের বিষয়ে চিন্তা করিবে।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, অন্তর যদি নাপাকী হইতে পাক হইয়া যায় তবে কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হইবে না।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসর আমি খুব কষ্ট করিয়া কুরআনে কারীম পড়িয়াছি এবং বিশ বৎসর যাবত আমি উহার শীতলতা লাভ করিতেছি। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি গোনাহ হইতে তৌবা করতঃ চিন্তা করিবে সে কালামে পাককে এই কথার প্রমাণকারী পাইবে—

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ, সকলে মিলিয়া যে সৌন্দর্য রাখে তুমি একাই তাহা ধারণ কর।

হায়! এই সমস্ত শব্দ যদি আমার জন্যও প্রযোজ্য হইত, তবে কতই না ভাল হইত!

পাঠকদের কাছে আমি ইহাও আরজ করিব, তাহারা যেন লেখকের প্রতি লক্ষ্য না করেন, কেননা আমার অযোগ্যতা যেন আপনাদেরকে মহান উদ্দেশ্য হইতে বিরত না রাখে। বরং আমার কথার প্রতি লক্ষ্য করুন

এবং এই সমস্ত কথা আমি যেখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি উহার প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি তো মাঝখানে কেবল পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। এই পর্যন্ত পৌঁছার পর আল্লাহ পাকের জন্য মোটেও অসম্ভব নয় যে, তিনি কোন অন্তরে কুরআন পাক হেফয করার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন। সুতরাং যদি ছোট শিশুকে কুরআন হেফজ করাইতে চান তাহা হইলে তাহার শৈশবই ইহার জন্য সাহায্যকারী হইবে অন্য কোন আমলের প্রয়োজন নাই। আর যদি কেহ বড় হইয়া হেফজ করিতে চায় তবে তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো একটি পরীক্ষিত আমল লিখিয়া দিতেছি, যাহা তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাযিঃ) আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক, কুরআন পাক আমার সিনা হইতে বাহির হইয়া যায়, যাহা মুখস্থ করি তাহা ভুলিয়া যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন নিয়ম বাতাইয়া দিব যাদ্বারা তুমি নিজেও উপকৃত হইবে আর যাহাকে শিখাইবে সেও উপকৃত হইবে। আর যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা ভুলিবে না। হযরত আলী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন জুমআর রাত্র (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র) আসিবে তখন সম্ভব হইলে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিবে এবং ইহা খুবই উত্তম। এই সময় ফেরেশতারা নাযিল হয়। এই সময়ে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়, এই সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন ছেলেদিগকে বলিয়াছিলেন, "অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট এস্তেগফার করিব।" অর্থাৎ, জুমআর রাত্রে। যদি ঐ সময় জাগ্রত হওয়া সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে শুরু রাত্রেই দাঁড়াইয়া চার রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে—

প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর সূরায়ে ইয়াসীন পড়িবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে দুখান পড়িবে, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে মুলক পড়িবে। 'আত্তাহিয়্যাত' শেষ করার পর (নামায শেষ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। সমস্ত নবীর প্রতি

দুরূদ পাঠ করিবে, সমস্ত মুমেনের জন্য এবং ঐ সমস্ত মুসলমান ভাইয়ের জন্য এস্তেগফার করিবে যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছে। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে—

ফায়দা ঃ দোয়া পরে আসিতেছে। দোয়ার শুরুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা করার হুকুম করিয়াছেন। তাই বিভিন্ন রেওয়ায়াত হইতে শরহে হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুল নামক কিতাবে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া উল্লেখ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি। যাহারা নিজে নিজে পড়িতে পারে না তাহারা ইহা পড়িবে, আর যাহারা নিজে পড়িতে পারে তাহারা ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া হামদ ও সালাতকে উত্তমরূপে আরও অধিক পরিমাণে পড়িবে।

দোয়াটি এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَدَدَ
خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ
وَمِدَادَ كَلِمٰتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ
ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ
عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ
الْاُمِّىِّ الْهَاشِمِىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى
سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِجَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے
لئے ہے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات
کے اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے
موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے
برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں
کے برابر ہو۔ اے اللہ میں تیری تعریف کا
احاطہ نہیں کرسکتا۔ تو ایسا ہی ہے جیساکہ
تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ اے اللہ
ہمارے سردار نبئ اُمّی اور ہاشمی پر درود
سلام اور برکات نازل فرما اور تمام نبیوں
اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی۔ اے
ہمارے رب ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں
کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں مومنین
کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے
رب تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے الٰہ العالمین
میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ ط	اور مسلمانوں کی مغفرت فرما. بیشک تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے.

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এমন প্রশংসা যাহা তাঁহার সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ হয়, তাঁহার সন্তুষ্টি অনুপাতে হয়, তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ হয় এবং তাঁহার কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি ঐরূপ—যেইরূপ আপনি নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সরদার উম্মী ও হাশেমী নবীর প্রতি দুরূদ সালাম ও বরকত নাযিল করুন। এমনিভাবে সমস্ত নবী রাসূল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের প্রতি নাযিল করুন। হে আমাদের রব! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের অন্তরে মুমেনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে আমাদের রব, আপনি মেহেরবান ও দয়ালু। হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমেন মুসলমানকে মাফ করিয়া দিন নিশ্চয় আপনি দুয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

অতঃপর ঐ দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে শিখাইয়াছেন। উহা এই—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ وَارْحَمْنِىْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِىْ وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ اَقْرَأَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ	اے الٰہ العالمین مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں، اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما. اے اللہ زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے. اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھا دی اسی

الْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِیْ لَاتُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَ نُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِیْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِیْ وَ اَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِیْ وَ اَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِیْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِیْ فَاِنَّهٗ لَايُعِيْنُنِیْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَ لَايُؤْتِيْهِ اِلَّاۤ اَنْتَ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ ط

طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کردے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کردے اور میری زبان کو اس پر جاری کردے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کردے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کرسکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہوسکتی، مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔

অর্থ ঃ হে সমগ্র জগতের মাবুদ ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি। আর আপনার সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ ! নমুনাবিহীন আসমান–যমীনের সৃষ্টিকর্তা ! মহত্ব ও মহিমার অধিকারী, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের অধিকারী যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব হে আল্লাহ ! হে রাহমান ! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনিভাবে পড়ার তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে আল্লাহ ! নমুনাবিহীন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা ! মহত্ব ও মহিমার

মালিক, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব। হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করিয়া দিন আর আমার যবানকে উহার উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। ঐ সত্তার কসম যিনি আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন কোন মুমেনের দোয়াই বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না।

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন।

وَصَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উপসংহার

উপরে যে চল্লিশ হাদীস লেখা হইয়াছে উহা একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু

এই যমানায় লোকের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে, দ্বীনের জন্য সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করাও কঠিন মনে হয় তাই এখানে অন্য একটি চল্লিশ হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একই স্থানে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইহার বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এমনভাবে সমন্বিত হইয়াছে যাহার নজীর পাওয়া মুশকিল। কানযুল উম্মালে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের এক জামাতের সহিত এই হাদীসকে সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে। এমনিভাবে মাওলানা কুতুবুদ্দীন মুহাজিরে মক্কীও ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বীনের সহিত যাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা যদি হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নেন তাহা হইলে কতই না উত্তম হইবে। যেন কড়ির বিনিময়ে মুক্তা পাওয়ার মত। উক্ত হাদীস এই—

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا الَّتِىْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّىَ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتْرُكْهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَّلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَاْكُلْ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَّلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفْ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَّلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَّلَا تَعْمَلْ بِالْهَوٰى وَلَا تَغْتَبْ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفِ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبْ وَلَا تَلْهَ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ عَيْبَهٗ وَلَا تَسْخَرْ بِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاَخَوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَاْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ اَقْرِبَائَكَ وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنْ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَا تَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ

سَالِ - (رواه الحافظ ابو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة والحافظ ابو الحسن على بن ابى القاسم بن بابويه الرازى فى الاربعين و ابن عساكر و الرافعى عن سلمان)

অর্থ ঃ হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ চল্লিশ হাদীস যাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে যাইবে উহা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

১. ঈমান আনিবে আল্লাহর প্রতি অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি।

২. আখেরাতের দিনের প্রতি,

৩. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের প্রতি,

৪. কিতাবসমূহের প্রতি,

৫. সমস্ত নবীগণের প্রতি,

৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি,

৭. তাকদীরের প্রতি অর্থাৎ ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়,

৮. আর এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সত্য রাসূল।

৯. প্রত্যেক নামাযের সময় পূর্ণ ওযু করিয়া নামায কায়েম করিবে। (পূর্ণ অযু হইল, যাহার মধ্যে আদব ও মুস্তাহাব বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। আর প্রত্যেক নামাযের সময় দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন ওযূ করিবে যদিও পূর্ব হইতে ওযূ থাকে। কেননা ইহা মুস্তাহাব। আর 'নামায কায়েম করা' দ্বারা উহার সমস্ত সুন্নত এবং মুস্তাহাবের এহতেমাম করা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, জামাতে কাতারসমূহ সোজা করা, কাতার বাঁকা না হওয়া ও মধ্যখানে খালি না থাকা ইহাও নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

১০. যাকাত আদায় করিবে।

১১. রমযানের রোযা রাখিবে।

১২. মাল থাকিলে হজ্জ করিবে অর্থাৎ যাতায়াত খরচ বহন করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করিবে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালই না যাওয়ার

কারণ হইয়া থাকে তাই মালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা উদ্দেশ্য হইল হজ্জের শর্তসমূহ যদি পাওয়া যায় তবে হজ্জ করিবে।

১৩. দৈনিক বার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করিবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য হাদীসে এইরূপ আসিয়াছে—ফজরের ফরযের আগে দুই রাকাত, যোহরের ফরযের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত এবং এশার ফরযের পরে দুই রাকাত।

১৪. বিতরের নামায কোন রাত্রেই তরক করিবে না। (যেহেতু এই নামাযের গুরুত্ব সুন্নতে মুয়াক্কাদার চাইতেও বেশী তাই এত তাকিদের সহিত বলিয়াছেন।)

১৫. আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না।

১৬. পিতামাতার অবাধ্যতা করিবে না।

১৭. জুলুম করিয়া ইয়াতিমের মাল খাইবে না। (অর্থাৎ, যদি কোন কারণে এতীমের মাল খাওয়া জায়েয হয় যেমন কোন কোন অবস্থাতে হইয়া থাকে তবে কোন দোষ নাই।)

১৮. শরাব পান করিবে না।

১৯. যিনা করিবে না।

২০. মিথ্যা কসম খাইবে না।

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

২২. নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলিবে না।

২৩. মুসলমান ভাইয়ের গীবত করিবে না।

২৪. সচ্চরিত্রা মহিলাকে অপবাদ দিবে না। (এমনিভাবে সচ্চরিত্র পুরুষকেও না।)

২৫. মুসলমান ভাইয়ের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে না।

২৬. খেলাধুলায় লিপ্ত হইবে না।

২৭. রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করিবে না।

২৮. কোন খাটো লোককে দোষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে খাটো বলিবে না। (অর্থাৎ যদি কোন নিন্দাসূচক শব্দ এইরূপ প্রচলিত হইয়া থাকে যে, উহা বলার দ্বারা দোষ বুঝায় না এবং দোষের নিয়তে বলাও হয় না, যেমন কাহারো নাম বুদ্ধু বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা জায়েয নাই।)

২৯. কাহাকেও উপহাস করিবে না।

৩০. মুসলমানদের মধ্যে চোগলখোরী করিবে না।

৩১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করিবে।

৩২. বালা–মুসীবতে সবর করিবে।

৩৩. আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না।

৩৪. আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

৩৫. বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

৩৬. আল্লাহর কোন মখলুককে লা'নত করিবে না।

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এর ওযীফা বেশী বেশী পড়িবে।

৩৮. জুমআ এবং দুই ঈদে উপস্থিত হওয়া ছাড়িবে না।

৩৯. এই একীন ও বিশ্বাস রাখিবে যে, শাস্তি বা কষ্ট যাহা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে উহা তকদীরে ছিল যাহা হটিবার ছিল না, আর যাহা পৌঁছে নাই উহা কখনও পৌঁছার ছিল না।

৪০. কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত কখনও ছাড়িবে না।

সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ যদি এই হাদীস মুখস্থ করে তবে তাহার কি সওয়াব লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া (আঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের সহিত তাহার হাশর করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া আমাদিগকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁহার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন তবে ইহা তাঁহার দয়ার কাছে অসম্ভব কিছু নহে।

পাঠক ভাইদের কাছে আমার সবিনয় আরজ যে, তাহারা এই অধমকেও নেক দোয়ার দ্বারা সাহায্য করিবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ -

মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী উফিয়া আনহু
মুকীম ঃ মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর
২৯শে যিলহজ্জ, ১৩৪৮ হিজরী
বৃহস্পতিবার।

সূচীপত্র

ফাযায়েলে যিকির

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
ফাযায়েলে যিকির

দ্বিতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে তাইয়্যেবা

তৃতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল

॥ ॥ ॥

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ۃ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ
حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের মধ্যে যে বরকত, লজ্জত, স্বাদ, আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে, তাহা এমন কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নহে, যে কিছুদিন এই পাক নামের যিকির করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র নাম অন্তরের সুখ ও শান্তির কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورہ رعد-رکوع ۴)

অর্থ ঃ তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার যিকির (–এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার) দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে।

(সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ২৮)

বর্তমান দুনিয়াতে পেরেশানী ব্যাপক হইয়া গিয়াছে ; সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রতিদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে লোকেরা বিভিন্ন পেরেশানী ও অশান্তির খবর লিখিয়া পাঠাইতেছে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য হইল, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পেরেশান লোকেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা ও ঔষধ জানিয়া লইতে পারে এবং সৌভাগ্যবান লোকেরা যেন আল্লাহর যিকিরের মাহাত্ম্য জানিয়া লাভবান হইতে পারে। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই কিতাবের ওসীলায় কোন বান্দা এখলাসের সহিত আল্লাহর নাম লইবার তাওফীক পাইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে আমি অধম ও বেআমলের জন্য ইহা এমন সময় কাজে আসিবে যখন একমাত্র আমলই কাজে আসিয়া থাকে। হাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি কাহাকেও আমল ছাড়াই নিজ রহমতে নাজাত দিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা।

এই কিতাব লেখার পিছনে ইহাও একটি বিশেষ কারণ যে, আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)কে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা ও জয্বা দান করিয়াছেন। তাঁহার তবলীগে–দ্বীনের যে তৎপরতা বর্তমানে ভারতের সীমান্ত পার হইয়া সুদূর হেজায পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে, উহার এখন আর কাহারও পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উহার সুফল দ্বারা সাধারণভাবে ভারত ও বহির্ভারত এবং বিশেষ করিয়া মেওয়াতবাসীগণ যে কি পরিমাণ উপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা নাই। তাঁহার তবলীগী উসূলগুলি এমনই মজবূত ও পরিপক্ক যে, স্বভাবতই এইগুলির সুফল ও বরকত নিশ্চিত। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি হইল, মোবাল্লেগগণ আল্লাহর যিকিরের প্রতি যত্নবান হইবে। বিশেষতঃ তবলীগের কাজ করার সময়গুলিতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করিতে থাকিবে। তাঁহার এই নীতির বরকত ও কল্যাণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বহু মানুষের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছি। এইজন্য যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি নিজেই অনুভব করি। তদুপরি যাহারা এ যাবত শুধু হুকুম পালনার্থে যিকিরের এহতেমাম করিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট যিকিরের ফাযায়েল পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজানও আমাকে হুকুম করিয়াছেন। ইহাতে যিকিরের ফাযায়েল ও পুরস্কারের কথা জানিয়া এবং আল্লাহর যিকির যে কত বড় নেয়ামত ও কত বড় দৌলত—এই উপলব্ধি লইয়া স্বতঃস্ফূর্ত মনে আগ্রহের সহিত তাহারা আল্লাহর যিকির করিবে।

যিকিরের সমস্ত ফাযায়েল বর্ণনা করা আমার মত সম্বলহীনের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয় ; এমনকি বাস্তবেও ইহা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এই কিতাবে মাত্র কয়েকখানি রেওয়ায়েত পেশ করিতেছি। প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ যিকিরের ফাযায়েল। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সর্বোত্তম যিকির কালেমায়ে তাইয়্যেবার ফাযায়েল। তৃতীয় অধ্যায় ঃ কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ তসবীহে ফাতেমীর ফাযায়েল।

প্রথম অধ্যায়
ফাযায়েলে যিকির

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের যিকির সম্বন্ধে যদি কোন আয়াত বা হাদীসে–নববী নাও আসিত তবুও সেই প্রকৃত দাতার যিকির এমনই যে, বান্দার জন্য এক মুহূর্তও উহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কেননা, ঐ পবিত্র সত্তার দান ও অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে বান্দার উপর এত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে যে, না উহার কোন শেষ আছে, না কোন তুলনা হইতে পারে। এইরূপ মহান দাতাকে স্মরণ করা, তাহার যিকির করা, তাহার শোকর ও অনুগ্রহ স্বীকার করা একটি স্বভাবজাত বস্তু। কবি বলেন ঃ

خداوندِ عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার লাখো দয়া ও এহসান আমার উপর প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হইতেছে ; তাঁহারই জন্য আমার জান কুরবান।

তদুপরি এই পবিত্র যিকিরের প্রতি প্রেরণা ও উৎসাহ দানে যখন কুরআন, হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য বাণী ও ঘটনা ভরপুর রহিয়াছে, তখন আল্লাহর যিকিরের নূর ও বরকতের যে শেষ নাই তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আমরা এই মোবারক যিকির সম্পর্কে প্রথমতঃ কিছু আয়াত ও পরে কিছু হাদীস পেশ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ
যিকির সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ

(١) فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝ (سورہ بقرہ رکوع ١٨)

پس تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمھیں یاد رکھونگا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو

(১) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর (অর্থাৎ আমার যিকির কর)। আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব। তোমরা আমার শোকর আদায় কর ; আমার না–শোকরী করিও না।

(٢) فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۝ (سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۵)

پھر جب تم (حج کے موقعہ میں) عرفات سے واپس آجاؤ تو مزدلفہ میں (ٹھیر کر) اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے درحقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے

(২) অতঃপর তোমরা যখন (হজ্জ মৌসুমে) আরাফাত হইতে ফিরিয়া যাও, তখন মোজদালেফায় (অবস্থান করিয়া) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমন (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদিগকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছেন। আসলে তোমরা পূর্বে অজ্ঞ ছিলে।

(٣) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۝ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۝ (سورۂ بقرہ۔ رکوع ۲۵)

پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء (واجداد) کا ذکر۔ کیا کرتے ہو (کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو) بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیئے پھر (جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے) بعض تو ایسے ہیں (جو اپنی دعاؤں میں) یوں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دیدے (سو اُن کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا) اور اُن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا سو یہی ہیں جن کو اُن کے عمل کی وجہ سے (دونوں جہاں میں) حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔

(৩) তোমরা হজ্জের আমলসমূহ পূরা করিবার পর আল্লাহর যিকির এমনভাবে কর যেমন তোমরা নিজেদের বাপ–দাদাদের স্মরণ করিয়া থাক (অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসায় তোমরা পঞ্চমুখ হইয়া থাক)। বরং আল্লাহর যিকির উহা হইতেও অধিক হওয়া উচিত। অতঃপর (যাহারা আল্লাহকে স্মরণও করে তাহাদের মধ্যে) কেহ কেহ এইরূপ যে, তাহারা (নিজেদের দোয়ার মধ্যে) বলে, হে পরোয়ারদেগার! আমাদেরকে আপনি দুনিয়াতেই দিয়া দিন। (সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য তাহারা দুনিয়াতেই পাইয়া যাইবে।)

তাহারা আখেরাতে কিছুই পাইবে না। আর কেহ কেহ দোয়া করে যে, হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদিগকে আপনি দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। এইরূপ লোকেরাই নিজেদের আমলের কারণে (উভয় জাহানে) অংশ পাইবে। আল্লাহ অতিসত্বর হিসাব লইবেন।

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে। দ্বিতীয় ঃ মজলূম। তৃতীয় ঃ ন্যায় বিচারক বাদশাহ।

(٤) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ (سورۂ بقرہ رکوع ۲۵)

اور حج کے زمانہ میں منیٰ میں بھی ٹھہر کر گنتی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو (اس کا ذکر کیا کرو)

(৪) আর (হজ্জ মৌসুমে মিনা অবস্থানকালেও) কয়েকদিন পর্যন্ত আল্লাহর যিকির কর।

(٥) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝ ع (آل عمران ع ۴)

اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔

(৫) আর বেশী বেশী করিয়া আপন রবকে স্মরণ করুন এবং সকাল–সন্ধ্যা তসবীহ পড়িতে থাকুন।

(٦) اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (سورہ آل عمران رکوع ۲۰)

(پہلے سے عقلمندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں) کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔

(৬) (পূর্বে জ্ঞানীদের উল্লেখ হইয়াছে।) তাঁহারা এমন লোক, যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন করিয়া স্মরণ করে। তাহারা আসমান–জমীনের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা–ফিকির করে। অতঃপর তাহারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি এই সবকিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই ; আমরা আপনার তসবীহ পড়িতেছি, আপনি আমাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন।

(৭) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ
(سورۂ نساء رکوع ۱۵)

جب تم نماز (خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے) پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو)

(৭) যখন তোমরা (ভয়ের) নামায পড়িয়া নিয়াছ, এখন তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়া যাও। দাঁড়াইয়াও আল্লাহর যিকির কর, বসিয়া যিকির কর এবং শুইয়াও যিকির কর। (মোটকথা, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ ও তাঁহার যিকির হইতে গাফেল হইও না।)

(৮) وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا
(سورہ نساء رکوع ۲۱)

(منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔

(৮) (মোনাফেকদের অবস্থা এই যে,) যখন তাহারা নামাযে দাঁড়ায় তখন খুবই অলসতার সহিত দাঁড়ায়। তাহারা মানুষের সামনে নিজেদেরকে নামাযী রূপে দেখায়। তাহারা আল্লাহর যিকির খুব কমই করিয়া থাকে।

(৯) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ○
(سورہ مائدہ رکوع ۱۲)

شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کردے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے بتاؤ اب بھی (ان بری چیزوں سے) باز آجاؤ گے۔

(৯) শয়তান ইহাই চায় যে, শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের পরস্পরে দুশমনী ও হিংসা পয়দা করিয়া দিবে এবং তোমাদিগকে যিকির ও নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিবে। বল, এখনও কি তোমরা (এইসব মন্দ কাজ হইতে) ফিরিয়া আসিবে?

(١٠) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط (سورہ انعام ع ٦)

اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں.

(১০) যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকিতে থাকে যদ্দ্বারা তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাহাদিগকে আপনি স্বীয় মজলিস হইতে পৃথক করিয়া দিবেন না।

(١١) وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط (سورہ اعراف. رکوع ٣)

اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ کو) خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو.

(১১) আল্লাহর জন্য তোমাদের দ্বীনকে খালেছ রাখিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক।

(١٢) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ (سورہ اعراف. رکوع ٧)

تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے (بھی) بیشک حق تعالیٰ شانہٗ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جل شانہٗ کو پکارا کرو خوف کیساتھ (عذاب سے) اور طمع کے ساتھ (رحمت میں) بیشک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنیوالوں کے بہت قریب ہے.

(১২) তোমরা বিনয়ের সহিত এবং চুপে চুপে তোমাদের রবকে ডাকিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না উহার সংস্কার করিয়া দেওয়ার পর। তোমরা আল্লাহর এবাদত করিতে থাক (আজাবের) ভয় ও (রহমতের) আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের অতি নিকটে।

(١٣) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص (سورہ اعراف ع ٢١)

اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس اُن کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو.

(১৩) আর আল্লাহরই জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকে ডাকিতে থাক।

⑭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○ (سورہ اعراف رکوع ۲۴)

اور اپنے ربّ کی یاد کیا کر اپنے دل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی اور غافلین میں سے نہ ہو۔

(১৪) আপন রবকে স্মরণ করিতে থাক নিজ অন্তরে কিছুটা নিম্ন আওয়াজে এবং বিনয় ও ভয়ের সহিত (সর্বদা) সকাল ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

⑮ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ (سورہ انفال رکوع ۱)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو (اس کی بڑائی کے تصور سے) ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں (آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے) یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور عزّت کی روزی ہے)

(১৫) নিশ্চয় ঈমানদারগণ এইরূপ যে, তাহাদের সামনে যখন আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন (আল্লাহর মহানত্বের চিন্তা করিয়া) তাহারা ভয় পাইয়া যায়। আর যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তাহাদের সামনে পড়া হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।

অতঃপর তাহাদের নামাযের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করা হইয়াছে ঃ এই সমস্ত লোকই সত্যিকার ঈমানদার। তাহাদের জন্য আপন রবের নিকট উচ্চমর্যাদাসমূহ, গোনাহমাফী ও সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

⑯ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○ (سورہ رعد رکوع ۴)

اور جو شخص اللہ کی طرف مُتوجّہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اُس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

(১৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হেদায়াত দান করেন। তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্তি লাভ করে। খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, আল্লাহর যিকিরে এইরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহার দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

(١٧) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج
(سورۂ اسراء۔ رکوع ۱۲)

آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمٰن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکاروگے (وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔

(১৭) আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক ; যেই নামেই ডাকিবে (উহাই উত্তম)। কেননা, তাঁহার বহু ভাল ভাল নাম রহিয়াছে।

(١٨) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (کہف ع)
وفی مسائل السلوک فیہ مطلوبیۃ الذکر الظاہر

اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے رَبّ کا ذکر کر لیا کیجئے۔

(১৮) আর যখন (উহা) ভুলিয়া যান, তখন আপন রবকে স্মরণ করিতে থাকুন।

(١٩) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○
(سورہ کہف۔ رکوع ۴)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھنے کا) پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رَبّ کو پکارتے رہتے ہیں محض اس کی رضاجوئی کے لئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پاوے (رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

(১৯) আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত (বসিবার) পাবন্দ করিয়া রাখুন—যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন রবকে একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই ডাকিতে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করিয়া আপনার দৃষ্টি (মনোযোগ) যেন তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়।

(জাঁকজমক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নেতৃস্থানীয় লোক মুসলমান হইলে ইসলামের উন্নতি হইবে।) আর এইরূপ লোকের কথা মানিবেন না যাহার অন্তরকে আমার যিকির হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের মনমত চলে এবং তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

(٢٠) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ (کہف۔ ع ١١)

اور ہم دوزخ کو اس روز (یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کردیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔

(২০) সেইদিন (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমি জাহান্নামকে কাফেরদের সম্মুখে পেশ করিব, যাহাদের চক্ষুর উপর আমার স্মরণ হইতে পর্দা পড়িয়াছিল।

(٢١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝ۚ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ (سورۂ مریم رکوع ١)

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا (علیہ السلام) پر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔

(২১) ইহা আপনার রবের মেহেরবানীর বর্ণনা, যাহা তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি হইয়াছে, যখন তিনি নিজ রবকে গোপনে ডাকিয়াছেন।

(٢٢) وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝ (مریم رکوع ٣)

اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو (قطعی) اُمید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔

(২২) আমি আমার রবের এবাদত করিব (অবশ্যই)। আশা করি আমি আমার রবের এবাদত করিয়া মাহরূম হইব না।

(٢٣) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ۝ (سورۂ طٰہٰ رکوع ١)

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔

(২৩) নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেহ মাবূদ নাই।

সুতরাং তুমি (হে মূসা !) আমারই এবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্যই নামায পড়। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে, আমি উহাকে গোপন রাখিতে চাই, যেন প্রত্যেকেই নিজ আমলের বিনিময় পায়।

(۲۴) وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ج
(سورہ طٰہٰ. رکوع ۲)

(حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.

(২৪) (হযরত মূসা ও হারুন (আঃ)কে বলা হইতেছে।) তোমরা আমার স্মরণে অলসতা করিও না।

(۲۵) وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ.
(سورۃ انبیاء. رکوع ۶)

اور نوح (علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجئے) جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو (حضرت ابراہیمؑ کے قصے سے) پہلے.

(২৫) আর আপনি তাহাদের সহিত নূহ (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁহার রবকে (ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনার) পূর্বে ডাকিয়াছিলেন।

(۲۶) وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ج
(سورہ انبیاء. رکوع ۶)

اور ایوب (علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں.

(২৬) আর আইয়ুব (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন রবকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আর আপনি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

(۲۷) وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ج
(سورۃ انبیاء. رکوع ۶)

اور مچھلی والے (پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جب وہ (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں. بیشک میں قصوروار ہوں.

(২৭) আর মৎস্যওয়ালা (পয়গাম্বর অর্থাৎ ইউনুস (আঃ))এর আলোচনা করুন, যখন তিনি রাগ করিয়া (নিজ কওমকে ছাড়িয়া) চলিয়া গেলেন। আর তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমি তাহাকে পাকড়াও

করিব না। অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকিলেন—আপনি ব্যতীত আর কেহ মাবূদ নাই, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী।

(২৮) وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۝ (سورہ انبیاء رکوع ۶)

اور زکریا (علیہ السّلام کا ذکر کیجئے) جب انہوں نے اپنے ربّ کو پکارا کہ اے میرے ربّ مجھے لاوارث نہ چھوڑو (اور یوں تو) سب وارثوں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔

(২৮) আর যাকারিয়্যা (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন রবকে ডাকিলেন, হে আমার রব! আমাকে নিঃসন্তান রাখিবেন না, আর সকল ওয়ারিছ অপেক্ষা আপনিই উত্তম (ও প্রকৃত ওয়ারিছ)।

(২৯) إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ۝ (سورہ انبیاء رکوع ۶)

بیشک یہ سب (انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو (ثواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور تھے سب کے سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے۔

(২৯) নিশ্চয় ইহারা (অর্থাৎ যেই সকল নবীর আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে) নেক কাজের দিকে ধাবিত হইতেন এবং (ছওয়াবের) আশায় ও (আজাবের) ভয়ে আমাকে ডাকিতেন। আর তাহারা সকলেই ছিলেন আমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী।

(৩০) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ (سورۂ حج۔ رکوع ۵)

اور آپ (جنّت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

(৩০) আর আপনি (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সমস্ত বিনয়ী লোকদেরকে—যাহাদের অবস্থা এই যে, যখন আল্লাহর কথা আলোচনা করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

(৩১) إِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ

(قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا کیا تم کو یاد نہیں) میرے بندوں کا ایک گروہ تھا (جو بیچارے ہم سے) یوں کہا کرتے تھے

سِخۡرِيًّا حَتّٰۤى اَنۡسَوۡكُمۡ ذِكۡرِىۡ وَكُنۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ تَضۡحَكُوۡنَ ○ اِنِّىۡ جَزَيۡتُهُمُ الۡيَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ ○

(سورۂ مومنون - رکوع ٦)

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے آپ سب سے زیادہ رحم کرنیوالے ہیں پس تم نے اُن کا مذاق اُڑایا حتّٰی کہ اس مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلادی اور تم اُن سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج اُن کو اُن کے صبر کا بدلہ دیدیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

(৩১) (কেয়ামতের দিন কাফেরদের সহিত এক পর্যায়ে বলা হইবে, তোমাদের কি স্মরণ নাই যে,) আমার একদল বান্দা ছিল যাহারা (আমার নিকট) বলিত, হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব আমাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা, আপনি সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়াবান। তখন তোমরা তাহাদেরকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছ এমনকি এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ তোমাদেরকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। আর তোমরা তাহাদের সহিত হাসি-তামাশা করিতে। আজ আমি তাহাদিগকে ছবরের পুরস্কার দিয়াছি, তাহারাই কামিয়াব হইয়াছে।

(٣٢) رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ۔ الاية

(سورہ نور، رکوع ٥)

(کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ اُن کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

(৩২) (কামেল ঈমানদারদের প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে যে,) তাহারা এমন লোক যে, কোনরূপ বেচাবিক্রি অথবা কেনাকাটা তাহাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না।

(٣٣) وَلَذِكۡرُ اللّٰهِ اَكۡبَرُ (عنکبوت ع ٥)

اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

(৩৩) আর নিশ্চয় আল্লাহর যিকির সবচাইতে বড় জিনিস।

(٣٤) تَتَجَافٰى جُنُوۡبُهُمۡ عَنِ الۡمَضَاجِعِ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ ○ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّاۤ اُخۡفِىَ لَهُمۡ مِّنۡ قُرَّةِ اَعۡيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ○

ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی اُمید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک

کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ (سورہ سجدہ۔ رکوع ۲)

(فی الدر عن الضحاک ھُمْ قَوْمٌ لَّا يَزَالُوْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ وروی نحوہ عن ابن عباسؓ)

(৩৪) তাহাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে এমনভাবে যে, তাহারা আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় আপন রবকে ডাকিতে থাকে এবং আমার দেওয়া যাবতীয় জিনিস হইতে খরচ করিয়া থাকে। কেহই জানে না তাহাদের চোখ জুড়ানোর কি কি জিনিস গায়েবের খাজানায় সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। এই সবকিছু তাহাদের আমলের বিনিময়।

ফায়দা ঃ এক হাদীসে আছে, বান্দা শেষ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তবে ঐ সময় তুমি আল্লাহর যিকির করিও।

(۳۵) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۞ (سورہ احزاب۔ ع ۳)

بیشک تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود تھا یعنی ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو (کہ جب حضورؐ لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لئے کیا مانع ہو سکتا ہے)

(৩৫) নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ ছিল। অর্থাৎ এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় রাখে আর বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির করে। (যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লড়াইয়ে শরীক হইয়াছেন এবং জিহাদ করিয়াছেন, তখন তোমার জন্য যিকির করিতে কিসের বাধা।)

(۳٦) وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۞ (سورہ احزاب۔ رکوع ۵)

(پہلے سے مؤمنوں کی صفات کا بیان ہے اس کے بعد ارشاد ہے) اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(৩৬) (পূর্বে মোমিনদের ছিফাত বয়ান করা হইয়াছে, অতঃপর এরশাদ হইতেছে,) বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর যিকিরকারিণী স্ত্রীলোকদের সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা মাগফেরাত ও

বিরাট প্রতিদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

(৩৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (احزاب ع ٦)

اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(৩৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে থাক এবং তাহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সব সময়)।

(৩৮) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۖ (سورہ صٰفّٰت رکوع ٣)

اور پکارا تھا ہم کو نوح (علیہ السلام) نے پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

(৩৮) এবং নূহ (আঃ) আমাকে ডাকিলেন। আর আমিই উত্তম ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

(৩৯) فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (سورہ زمر رکوع ٣)

پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

(৩৯) তাহাদের জন্য বড় সর্বনাশ, যাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকির শুনিয়া প্রভাবিত হয় না। তাহারা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

(৪০) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ (سورہ زمر رکوع ٣)

اللہ جل جلالہ نے بڑا عمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہدایت فرما دیتا ہے۔

(৪০) আল্লাহ তায়ালা অতি উৎকৃষ্ট বাণী (অর্থাৎ কুরআন) নাজেল করিয়াছেন। উহা এমন কিতাব যাহা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বারবার দোহরানো হইয়াছে, যাহার কারণে আপন রবের ভয়ে ভীত লোকদের শরীর কাঁপিয়া উঠে, আর দেহ ও অন্তর নরম হইয়া আল্লাহর যিকিরের প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত। তিনি

যাহাকে ইচ্ছা ইহা দ্বারা হেদায়েত করিয়া থাকেন।

(৪১) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ (مومن رکوع ۲)

پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔

(৪১) অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খাঁটি ঈমানের সহিত ডাক—যদিও কাফেররা ইহাকে অপছন্দ করে।

(৪২) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط (سورہ مومن رکوع ۷)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں پس تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو

(৪২) তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই। অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে থাক।

(৪৩) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○ (سورہ زخرف رکوع ۴)

جو شخص رحمان کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے

(৪৩) আর যেই ব্যক্তি পরম দয়ালুর যিকির হইতে (জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া থাকে, আমি তাহার উপর একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই এবং সে তাহার সঙ্গে থাকে।

(৪৪) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ صلے وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ قف كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں (اور خشوع خضوع کے) آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ اُن کے اوصاف توراۃ میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی پھر اس کو قوی کیا پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوتی پھر اپنے تنہ پر سیدھی کھڑی ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی (اسی طرح صحابہؓ

عَظِيْمًا ۝ (سورہ فتح. رکوع ۴) میں اوّل ضُعف تھا پھر روزانہ قوّت بڑھتی گئی
اور اللہ نے یہ نشو ونما اس لئے دیا تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو اُن لوگوں سے جو ایمان لائے
اور نیک عمل کر رہے ہیں مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

(৪৪) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আর যে সমস্ত লোক তাঁহার সাহচর্য পাইয়াছে, তাহারা কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিবে কখনও রুকূ করিতেছে, কখনও সেজদা করিতেছে এবং আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী কামনায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের (অনুনয় বিনয়ের) চিহ্ন তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহাদের এই গুণাবলী তওরাতে এবং ইঞ্জীলে আছে। যেমন শস্য—সে প্রথমে অংকুর বাহির করিল অতঃপর উহাকে শক্তিশালী করিল, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হইল, তৎপর উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল। ফলে, উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল। (তদ্রূপ সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। তারপর দিন দিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। (আর আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রতিপালন ও শক্তি বৃদ্ধি এইজন্য করিয়াছেন) যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে আল্লাহ তাহাদের সহিত মাগফিরাত এবং বড় প্রতিদানের ওয়াদা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও স্পষ্টতঃ রুকূ, সেজদা ও নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা এবং তাহা পরিস্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে। তবুও কালেমায়ে তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ফযীলতও ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

ইমাম রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা চুক্তিপত্রে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিতে অস্বীকার করিয়া 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। তাই উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এই কথার উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষী। আর যেখানে প্রেরক নিজেই স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার দূত সেখানে অন্য কেহ লাখো অস্বীকার করিলেও কিছু আসে যায় না। এই সাক্ষ্যের স্বীকৃতি হিসাবে আল্লাহ তায়ালা 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' এরশাদ ফরমাইয়াছেন।

এই আয়াতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে

একটি এই যে, উক্ত আয়াতে চেহারায় এবাদতের আলামত জাহির হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে একটি এই যে, রাত্রি জাগরণকারীদের চেহারায় যে নূর ও বরকত জাহির হইয়া থাকে আয়াতে উহাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইমাম রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইহা একটি বাস্তব কথা যে, দুই ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিল, তন্মধ্যে একজন খেল–তামাশা করিয়া রাত্রি কাটাইল আরেকজন নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও এলেম শিক্ষার মধ্যে কাটাইল। পরের দিন উভয়ের চেহারার জ্যোতিতে স্পষ্ট ব্যবধান ধরা পড়িবে। খেল–তামাশায় যে রাত্রি কাটাইয়াছে, সে যিকিরে–শোকরে রাত্রি–যাপনকারীর মত হইতেই পারিবে না।

এখানে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যাহারা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে গালিগালাজ করে, তাঁহাদিগকে মন্দ বলে, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাহাদের কাফের হইয়া যাওয়ার বিষয়টিকে ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের এক জামাত উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

(৪৫) اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (سورہ حدید رکوع ۲)

کیا ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں۔

(৪৫) ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, আল্লাহর যিকিরের জন্য তাহাদের অন্তরসমূহ ঝুঁকিয়া যাইবে।

(৪৬) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ (سورہ مجادلہ ع ۳)

(پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے) ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

(৪৬) (পূর্ব হইতে মোনাফেকদের আলোচনা চলিতেছে) তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে, তাই শয়তান তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত লোক শয়তানের দল। জানিয়া রাখ, শয়তানের দলই নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(৪৭) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو چکے تو (تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول

تُفْلِحُوْنَ ○ (سورہ جمعہ رکوع ۲) ہونے کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہونچ جاؤ۔

(৪৭) অতঃপর যখন (জুমার) নামায শেষ হয় তখন (অনুমতি দেওয়া হইল) তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড়, (দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হইয়া) আল্লাহর দেওয়া রিযিকের তালাশে লাগিয়া যাও এবং (ইহাতেও) বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে থাক, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(۴۸) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ (سورہ منافقون ع۲)

اے ایمان والو تم کو تمھارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں (کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے)

(৪৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর স্মরণ হইতে যেন গাফেল করিয়া না দেয়। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (কেননা, এই সমস্ত জিনিস তো দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহর স্মরণ আখেরাতে কাজে আসিবে।)

(۴۹) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○ (سورۂ قلم رکوع ۲)

یہ کافر لوگ جب ذکر (قرآن) سنتے ہیں (تو شدّت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

(৪৯) এইসব কাফের যখন যিকির (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন (চরম শত্রুতার কারণে) এইরূপ মনে হয়, যেন তাহারা আপনাকে নিজ দৃষ্টি দ্বারা আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে যে, (নাউজুবিল্লাহ) এই ব্যক্তি তো একজন পাগল।

ফায়দা ঃ 'দৃষ্টি দ্বারা আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিবে' দ্বারা চরম শত্রুতার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন আমাদের পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে, সে এমনভাবে দেখিতেছে যেন খাইয়া ফেলিবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)

বলেন, কাহারও উপর বদ–নজর লাগিয়া গেলে উক্ত আয়াত পড়িয়া তাহাকে দম করিয়া দিলে বিশেষ ফায়দা পাওয়া যায়।

(৫০) وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝ (سورۂ جن۔ رکوع ۱)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

(৫০) আর যে ব্যক্তি আপন রবের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভীষণ আজাবে লিপ্ত করিবেন।

(৫১) وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝ (سورۂ جن۔ ع ۱)

جب خدا کا خاص بندہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہدیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(৫১) যখন আল্লাহর খাছ বান্দা (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে ডাকিবার জন্য দাঁড়াইয়া যান, তখন কাফেরগণ ঐ বান্দার নিকট ভিড় জমাইতে থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আমি তো শুধু আমার পরোয়ারদেগারকেই ডাকিয়া থাকি। তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।

(৫২) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ (سورۂ مزمل ع ۱)

اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کرکے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ (منقطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلہ میں سب مغلوب ہوں)

(৫২) আর আপন রবের নাম লইতে থাকুন এবং যাবতীয় সংশ্রব হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র তাঁহারই দিকে মনোনিবেশ করুন। ('সম্পর্ক ছিন্ন করার' অর্থ হইল, আল্লাহর সহিত সম্পর্কের মোকাবেলায় অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক যেন দমিয়া থাকে।)

(৫৩) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝ اِنَّ

اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصہ میں

هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ○

(سورۂ دہر رکوع ۲)

اس کی تسبیح کیا کیجئے (مراد اس سے تہجد کی نماز ہے، یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں) دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(৫৩) আর সকাল–সন্ধ্যা আপন রবের নাম লইতে থাকুন, রাত্রির কিছু অংশেও তাঁহাকে সেজদা করিতে থাকুন এবং রাত্রির একটি বড় অংশে তাঁহার তসবীহ পড়িতে থাকুন। (তাহাজ্জুদ নামাযকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।) এই সমস্ত লোক (যাহারা আপনার বিরোধিতা করিয়াছে) দুনিয়াকে ভালবাসে এবং সামনে (কেয়ামতের) যে ভয়ংকর দিন আসিতেছে উহাকে বর্জন করিয়া আছে।

(۵۴) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ○ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ○ (اعلیٰ-ع۱)

بیشک بامراد ہوگیا وہ شخص جو (برے اخلاق سے) پاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

(৫৪) নিশ্চয় কামিয়াব হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে (বদ–আখলাক হইতে) পবিত্র হইয়া গিয়াছে, আপন রবের নাম লইয়াছে এবং নামায আদায় করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিকির সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বর্ণনা

যিকির সম্পর্কে কুরআন পাকে যেখানে এত বেশী আয়াত রহিয়াছে, সেখানে হাদীসের তো কথাই নাই। কেননা, কুরআন শরীফ সর্বমোট ত্রিশ পারায় বিভক্ত অথচ হাদীসের অসংখ্য কিতাব রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক কিতাবে অগণিত হাদীস রহিয়াছে। এক বোখারী শরীফেই বড় বড় ত্রিশ পারা রহিয়াছে। আবূ দাঊদ শরীফে বত্রিশ পারা রহিয়াছে। তদুপরি এমন কোন হাদীসের কিতাব নাই যাহা যিকিরের আলোচনা হইতে খালি। এইজন্য যিকির সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস একত্র করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বস্তুতঃ নমুনা ও আমলের জন্য একখানি আয়াত বা একখানি হাদীসই যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি আদৌ আমল করিতে চায় না তাহার সম্মুখে বড় বড় দপ্তর পেশ করিলেও সব বেকার হইবে। كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا অর্থাৎ তাহারা হইল পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধার মত। (সূরা জুমআ, ৫)

① عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَکَرَنِیْ فَاِنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ نَفْسِهٖ ذَکَرْتُهٗ فِیْ نَفْسِیْ وَاِنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ مَلَاٍ ذَکَرْتُهٗ فِیْ مَلَاٍ خَیْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِیْ یَمْشِیْ اَتَیْتُهٗ هَرْوَلَةً۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔

(رواه احمد و البخاری و مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة والبیهقی فی الشعب واخرج احمد والبیهقی فی الاسماء والصفات عن انس بمعناه بلفظ یَا ابْنَ اٰدَمَ اِذَا ذَکَرْتَنِیْ فِیْ نَفْسِكَ الحدیث وفی الباب عن معاذ بن انس عند الطبرانی باسناد حسن وعن ابن عباس عند البزار باسناد صحیح و البیهقی وغیرهما وعن ابی هریرة عند ابن ماجة وابن حبان وغیرهما بلفظ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه کما فی الدر المنثور والترغیب للمنذری والمشکوٰة مختصرًا وفیه بروایة مسلم عن ابی ذر بمعناه و فی الاتحاف علقه البخاری عن ابی هریرة بصیغة الجزم ورواه ابن حبان من حدیث ابی الدرداء اه)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাদীসে কুদসীতে) এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইতেছেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেরূপ সে আমার সহিত ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাহাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে

আমার যিকির করে তবে আমি ঐ মজলিস হইতে উত্তম (অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের) মজলিসে তাহার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (তারগীব, দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম এই যে, 'বান্দার সহিত তাহার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকি।' ইহার উদ্দেশ্য হইল, সব সময় আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর আশা করা চাই ; তাঁহার রহমত হইতে কখনও নিরাশ হইতে নাই। অবশ্যই আমরা গোনাহগার ; পা হইতে মাথা পর্যন্ত গোনাহের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। নিজেদের অন্যায় ও পাপকার্যের শাস্তি নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত হইতে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত হইবে না। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পাক কালামে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط

অর্থ ঃ "আল্লাহ তায়ালা শির্‌কের গোনাহ তো মাফ করিবেন না ; কিন্তু উহা ব্যতীত যাহার জন্য ইচ্ছা করেন যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮) তবে অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন এমন কথা বলা যায় না। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'ঈমান—আশা ও ভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নওজোয়ান সাহাবীর মৃত্যুশয্যায় তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অবস্থায় আছ? সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গোনাহের কারণে ভয়ও করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এইরূপ অবস্থায় যাহার দিলের মধ্যে এই দুইটি বস্তু থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আশাকৃত বস্তু দান করেন এবং ভয় হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন।

এক হাদীসে আছে, মোমেন বান্দা আপন গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে আর পাহাড়টি তাহার

উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অপরপক্ষে ফাসেক ব্যক্তি গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন তাহার উপর একটি মাছি বসিল আর সে উহাকে উড়াইয়া দিল। অর্থাৎ গোনাহের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মূলকথা, গোনাহকে গোনাহ মনে করিয়া সেই অনুযায়ী ভয় করা উচিত এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত অনুযায়ী আশাও করা উচিত।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া শহীদ হইয়াছেন। তাহার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময় তিনি বারবার বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিলেন। কখনও হুঁশ ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি ; আপনার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি, আমার এই মহব্বতের বিষয় আপনার জানা আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন বলিলেন, ওহে মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হউক, কতই না মোবারক মেহমান আসিয়াছে ; কিন্তু এই মেহমান অনাহার অবস্থায় আসিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করিয়াছি ; আজ আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ! আমি জীবনকে মহব্বত করিয়াছি ; কিন্তু উহা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরী করার জন্য নয় ; বরং গরমে (রোযা রাখিয়া) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকিরের মজলিসে ওলামায়ে কেরামের নিকটে জমিয়া বসিবার জন্য।

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন' কথাটি শুধু গোনাহমাফীর ব্যাপারেই খাছ নয়। বরং ইহা অন্যান্য অবস্থার জন্যও হইতে পারে। যেমন দোয়া, স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা,শান্তি ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সব বিষয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন দোয়ার ব্যাপারে বান্দা যদি একীন করে যে, আমার দোয়া কবুল হয় এবং অবশ্যই কবুল হইবে তবে তাহার দোয়া কবুল হয়। আর যদি ধারণা করে যে, আমার দোয়া কবূল হয় না তবে তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। যেমন অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দার দোয়া কবূল হইয়া থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই কথা না বলে যে, আমার দোয়া কবূল হয় না। এইভাবে স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি সব বিষয়ে একই অবস্থা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায়, তাহার সচ্ছল অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি মিনতি ও দোয়া করে তবে অতিসত্বর এই অবস্থা দূর হইয়া যাইবে।

তবে এই কথাও বুঝিয়া লওয়া জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত ভাল ধারণা এক জিনিস আর ধোকায় পড়া অন্য জিনিস। কুরআন পাকে এই বিষয়ে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ "ধোকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে।" (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ৫)

অর্থাৎ শয়তান যেন এই কথা না বুঝায় যে, গোনাহ করিতে থাক ; আল্লাহ গাফুরুর রাহীম তিনি মাফ করিয়া দিবেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۙ كَلَّا

"সে কি গায়েবের কথা জানিতে পারিয়াছে, নাকি আল্লাহর সহিত তাহার কোন চুক্তি হইয়া গিয়াছে? এইরূপ কখনও নয়।"

(সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৭৮, ৭৯)

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় হইল, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অন্য হাদীসে আছে, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, তাহার ঠোঁট যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করিতে থাকে ততক্ষণ আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অর্থাৎ আমার খাছ নজর ও তাওয়াজ্জুহ তাহার উপর থাকে এবং আমার বিশেষ রহমত তাহার উপর নাযিল হইতে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় বিষয় হইল—'আমি ফেরেশতাদের মাহফিলে আলোচনা করি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিয়া তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই কারণে যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহকে মানা এবং না মানা উভয় প্রকার শক্তিই রাখা হইয়াছে। (যেমন ৮ নম্বর হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।) এমতাবস্থায় মানুষের জন্য আল্লাহকে মানিয়া চলা অবশ্যই গর্বের বিষয়। আল্লাহ তায়ালার গর্বের দ্বিতীয় কারণ হইল, সৃষ্টির শুরুতে ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, (হে পরোয়ারদেগার!) "আপনি এমন মখলূক পয়দা করিবেন যাহারা দুনিয়াতে ফেতনা–ফাসাদ ও খুন–খারাবী করিবে।" মূলতঃ ইহার কারণও মানুষের মধ্যে সেই সৃষ্টিগত 'না মানা'র শক্তি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের মধ্যে মানা না মানার এই দুই শক্তির কোনটাই নাই। এইজন্যই তাহারা আরজ করিয়াছিল, আপনার তসবীহ তাহলীল তো আমরাই করিতেছি। গর্বের তৃতীয় কারণ হইল, মানুষের এবাদত ও এতায়াত বা মানার গুণ ফেরেশতাদের এবাদত–এতায়াত হইতে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে, মানুষ না দেখিয়া আল্লাহর এবাদত করে। আর ফেরেশতারা

আখেরাতের জগতকে দেখিয়া এবাদত করে। এইজন্যই আল্লাহ পাক বলেন—মানুষ যদি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখিত, তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত! এইসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা যিকিরকারী ও এবাদতকারীদের প্রশংসা করিয়া গর্ব করিয়া থাকেন।

চতুর্থ বিষয় এই যে, বান্দা যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোযোগী হয়, আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী বান্দার প্রতি উহা হইতে আরও অনেক বেশী হয়। নিকটবর্তী হওয়া ও দৌড়াইয়া আসার অর্থ ইহাই যে, খুব দ্রুতবেগে আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে অগ্রসর হয়। অতএব, আল্লাহর রহমতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। কাজেই যে যে পরিমাণ রহমত পাইতে চায় সে যেন ঐ পরিমাণ আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

পঞ্চম বিষয় এই যে, যিকিরকারী অপেক্ষা ফেরেশতাদের জামাতকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অথচ ইহা মশহুর কথা যে, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মখলুক। পূর্বে ইহার একটি কারণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ফেরেশতা বিশেষ এক দিক দিয়া উত্তম যে, তাহারা নিষ্পাপ তাহাদের দ্বারা গোনাহ হইতেই পারে না। দ্বিতীয় কারণ হইল, এই শ্রেষ্ঠত্ব অধিকাংশ সংখ্যা হিসাবে অর্থাৎ অধিকাংশ ফেরেশতা অধিকাংশ মানুষ হইতে বরং অধিকাংশ মোমিন হইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে খাছ মোমেন যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সমস্ত ফেরেশতা হইতে শ্রেষ্ঠ। এইগুলি ছাড়া আরও কারণ রহিয়াছে, যেগুলির আলোচনা অনেক দীর্ঘ।

(৩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَسْتَنُّ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ۔

ایک صحابی رض نے عرض کیا یا رسول اللہ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔

(اخرجه ابن ابى شيبة واحمد والترمذى وحسنه وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه والبيهقى كذا فى الدر وفى المشكوٰة برواية الترمذى وابن ماجة وحكى عن الترمذى حسن غريب اه قلت وصححه الحاكم واقره عليه الذهبى وفى الجامع الصغير برواية ابى نعيم فى الحلية مختصرا

بلفظ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَ لِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ و رقم له بالضعف وبمعناه عن مالك بن يخامر اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اٰخِرَ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ قُلْتُ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ اخرجه ابن ابى الدنيا والبزار وابن حبان والطبرانى والبيهقى كذا فى الدر والحصن الحصين والترغيب للمنذرى وذكره فى الجامع الصغير مختصرًا وعزاه الى ابن حبان فى صحيحه وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب وفى مجمع الزوائد رواه الطبرانى باسانيد)

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ جُدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رَطْبُ اللِّسَان ہو۔

(২) এক সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের হুকুম–আহ্কাম তো অনেক রহিয়াছে, সেইগুলির মধ্য হইতে আমাকে এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন যাহার উপর আমি সবসময় আমল করিতে পারি এবং উহাতে মশগুল থাকিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহর যিকির দ্বারা তুমি তোমার জিহ্বাকে সর্বদা ভিজাইয়া রাখ।

আরেক হাদীসে আছে, হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেন, বিদায়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সর্বশেষ কথা এই হইয়াছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় আমল কোন্‌টি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমন অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয় যে, আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা তরতাজা থাকে।(দুররে মানসূর ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

ফায়দা ঃ 'বিদায়ের সময়' দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ)কে ইয়ামানবাসীদের তবলীগ ও তালীমের উদ্দেশ্যে ইয়ামানের আমীর বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তখন বিদায়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কিছু নসীহত করিয়াছিলেন। আর হযরত মু'আয (রাযিঃ)ও কিছু বিষয়

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

'শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনেক' হওয়ার অর্থ হইল—শরীয়তের প্রত্যেক হুকুমের উপর আমল করা তো জরুরী ; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা হাসিল করা এবং সবগুলির মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকা কঠিন। কাজেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলিয়া দিন যাহাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারি এবং চলাফেরা, উঠাবসা সর্ব অবস্থায় আমি উহার উপর আমল করিতে পারি।

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি এইগুলিকে হাসিল করিতে পারিবে সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ভালাই ও কল্যাণ হাসিল করিতে পারিবে। এক, এমন জিহ্বা যাহা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। দুই, এমন দিল যাহা সর্বদা আল্লাহর শোকরে মশগুল থাকে। তিন, এমন শরীর যাহা কষ্ট সহ্য করিতে পারে। চার, এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে এবং স্বামীর সম্পদে খিয়ানত না করে। নিজের ইজ্জতের হেফাজত করার অর্থ হইল, কোন বেহায়াপনা ও অপকর্মে লিপ্ত হয় না।

জিহ্বাকে যিকির দ্বারা তরতাজা রাখার অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বেশী বেশী যিকির করা লিখিয়াছেন। প্রচলিত ভাষার মধ্যেও এই ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন কেহ কাহারও বেশী প্রশংসা করিলে বলা হয়, অমুকের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। কিন্তু অধমের খেয়ালে ইহার আরেকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। উহা এই যে, যাহার প্রতি এশ্‌ক ও মহব্বত হয় তাহার নাম লইলে মুখে একপ্রকার মজা অনুভব হয়। যে ব্যক্তি মহব্বত-জগতের কিছুটাও সংস্পর্শ পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। এই হিসাবে অর্থ হইল, আল্লাহর নাম এমনভাবে স্বাদ করিয়া লও যেন মজা আসিয়া পড়ে। আমি আমার অনেক বুযুর্গকে বহুবার দেখিয়াছি, আওয়াজ করিয়া যিকির করিতে করিতে তাঁহাদের জিহ্বা এমনভাবে ভিজিয়া যাইত যে পাশে বসা লোকও তাহা অনুভব করিতে পারিত। মুখ পানিতে এরূপ ভরিয়া যাইত, যাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু এই অবস্থা তখনই হইতে পারে যখন অন্তরে মহব্বতের স্বাদ থাকে এবং জবান বেশী বেশী যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর সহিত মহব্বতের আলামত হইল তাহার যিকিরকে মহব্বত করা আর আল্লাহর সহিত বিদ্বেষের আলামত হইল তাঁহার যিকিরের সহিত বিদ্বেষ রাখা।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা তাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(٣) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَ اَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ وَ خَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللهِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔

(اخرجه احمد والترمذى وابن ماجة وابن ابى الدنيا والحاكم وصححه والبيهقى كذا فى الدر والحصن الحصين قلت قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره عليه الذهبى ورقم له فى الجامع الصغير بالصحة واخرجه احمد عن معاذ بن جبل كذا فى الدر وفيه ايضًا برواية احمد والترمذى والبيهقى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ اَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً)

(৩) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলিয়া দিব না যাহা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সবচাইতে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে অনেক বেশী বুলন্দকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা খরচ করা হইতেও বেশী দামী এবং জেহাদের ময়দানে তোমরা দুশমনকে কতল কর আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে ইহা হইতেও বেশী উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উহা হইল আল্লাহর যিকির।

(দুররে মানসূর, হিসনে হাসীন ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহা সাধারণ অবস্থা ও সব সময়ের জন্য বলা হইয়াছে।

নতুবা সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে সদকা জিহাদ ইত্যাদি আমলও সর্বোত্তম হইয়া যায়। এই কারণেই কোন কোন হাদীসে এই সমস্ত আমলকেও সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। কেননা, এই সমস্ত আমলের প্রয়োজনীয়তা সাময়িক আর আল্লাহ তায়ালার যিকির সব সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করিবার এবং উহার ময়লা দূর করিবার বস্তু আছে (যেমন, কাপড় ও শরীরের জন্য সাবান, লোহার জন্য আগুনের ভাঁট ইত্যাদি)। আর অন্তরসমূহের ময়লা দূরকারী হইল আল্লাহ তায়ালার যিকির। আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিস আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষাকারী নাই। এই হাদীসে যিকিরকে যেহেতু দিলের সাফাই বা পরিষ্কারের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারাও আল্লাহর যিকির সর্বাপেক্ষা উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়। এইজন্য প্রত্যেক এবাদত তখনই এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে যখন উহা এখলাসের সহিত হইবে। আর এখলাস নির্ভর করে দিল পরিষ্কার হওয়ার উপর। এই কারণেই কোন কোন সূফী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে যে যিকিরের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা 'যিক্‌রে ক্বালবী' অর্থাৎ দিলের যিকির উদ্দেশ্য। জবানের যিকির উদ্দেশ্য নয়। আর দিলের যিকির ঐ যিকিরকে বলা হয় যাহা দ্বারা দিল সব সময়ের জন্য আল্লাহর সহিত জুড়িয়া যায়। আর নিঃসন্দেহে এই অবস্থাটি সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম। যখন কাহারও ইহা হাসিল হয়, তখন তাহার কোন এবাদত ছুটিতেই পারে না। কেননা, শরীরের বাহির ও ভিতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিলের অনুগত। দিল যে জিনিসের সহিত জুড়িয়া যায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উহার সহিত জুড়িয়া যায়। আল্লাহর আশেকগণের অবস্থা কাহারও অজানা নহে। আরও অনেক হাদীসে যিকির সর্বোত্তম আমল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি?

তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফ পড় নাই? কুরআন পাকে আছে, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ আল্লাহর যিকির হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস নাই।

হযরত সালমান (রাযিঃ) যে আয়াতের কথা বলিয়াছেন উহা ২১তম পারার প্রথম আয়াত।

'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক বলেন, এই হাদীসে আল্লাহর যিকিরকে দান-খয়রাত, জিহাদ ও অন্যান্য এবাদত হইতে এইজন্য উত্তম বলা হইয়াছে যে, আসল মকসূদ হইল আল্লাহর যিকির। অন্যান্য সমস্ত

এবাদত–বন্দেগী হইল এই মূল মকসূদকে হাসিল করার ওসীলা ও মাধ্যম। যিকিরও দুই প্রকার—জবানী যিকির ও কালবী যিকির। কালবী যিকির জবানী যিকির হইতে উত্তম। আর উহা হইল মুরাকাবা ও চিন্তা। আর এই হাদীসেও ইহাই উদ্দেশ্য যাহাতে বলা হইয়াছে "এক মুহূর্ত ফিকির করা সত্তর বৎসর এবাদত করা হইতেও উত্তম"। 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে আছে, হযরত ছাহ্‌ল (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন—আল্লাহর যিকিরের সওয়াব এত বেশী যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচের চেয়ে সাত লক্ষ গুণ বেশী হইয়া যায়। মোটকথা, এই সমস্ত আলোচনায় বুঝা গেল, দান–খয়রাত, জিহাদ ইত্যাদি সাময়িক। সময়ের প্রয়োজন হিসাবে এইগুলির ফযীলত অনেক বেশী হইয়া যায়। কাজেই যেসমস্ত হাদীসে এইসব আমলের বেশী বেশী ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, সেইসব হাদীস সম্পর্কে কোন জটিলতা রহিল না। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, সামান্য সময় আল্লাহর পথে দাঁড়াইয়া থাকা সত্তর বৎসর ঘরে নামায পড়া হইতে উত্তম। অথচ নামায সকলের নিকট সর্বোত্তম এবাদত। কিন্তু কাফেরদের উপদ্রব যখন বাড়িয়া যায় তখন জেহাদের আমল ঐ সমস্ত আমল হইতে উত্তম হইয়া যায়।

(٤) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیَذْکُرَنَّ اللّٰهَ اَقْوَامٌ فِی الدُّنْیَا عَلَی الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ یُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی۔

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہٗ جنّت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔

(اخرجہ ابن حبان کذا فی الدر قلت ویؤیدہ الحدیث المتقدم قریبًا بِلَفْظِ اَرْفَعُهَا فِیْ دَرَجَاتِكُمْ وَ اَیْضًا قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاکِرُوْنَ اللّٰهَ کَثِیْرًا وَّالذَّاکِرَاتِ۔ رواہ مسلم کذا فی الحصن وفی روایۃ قَالَ الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِیْ ذِکْرِ اللّٰهِ یَضَعُ الذِّکْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَیَاْتُوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِفَافًا رواہ الترمذی والحاکم مختصرا وقال صحیح علی شرط الشیخین وفی الجامع رواہ الطبرانی عن ابی الدرداء ایضًا)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, অনেক মানুষ দুনিয়াতে নরম নরম বিছানার উপর বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে

জান্নাতের উচ্চস্তরে পৌছাইয়া দেন। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ দুনিয়াতে কষ্টভোগ করা, দুঃখ–যাতনা সহ্য করা আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। দুনিয়াতে দ্বীনি কাজে যতই কষ্ট সহ্য করিবে ততই উচ্চ মর্যাদাসমূহের হকদার হইবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মোবারক যিকিরের বরকত এই যে, আরামের সহিত নরম বিছানায় বসিয়াও যদি কেহ যিকির করে তবুও আখেরাতে এই যিকির তাহার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি তোমরা সব সময় যিকিরের মধ্যে মশগুল থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর ও পথের মধ্যে তোমাদের সহিত মোছাফাহা করিতে শুরু করিবে। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মুফাররিদ লোকেরা অনেক বেশী আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, মুফাররিদ লোক কাহারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা পাগলপারার ন্যায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়। এই হাদীসের কারণে সূফীগণ লিখিয়াছেন, বাদশাহ ও আমীরগণকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখা উচিত নয়। কেননা, তাহারা উহার কারণে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, তুমি তোমার সুখের সময়গুলিতে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর, তোমার দুঃখের সময়গুলিতে কাজে আসিবে। হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, বান্দা যখন তাহার সুখ, আনন্দ ও প্রাচুর্যের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে অতঃপর সে কোন কষ্ট ও মুসীবতে পড়ে, তখন ফেরেশতারা বলেন—ইহা কোন দুর্বল বান্দার পরিচিত আওয়াজ। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করে। আর যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে না অতঃপর কোন কষ্ট ও মুসীবতে পড়িয়া আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ফেরেশতারা বলে—ইহা কেমন অপরিচিত আওয়াজ! হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে ; তন্মধ্যে একটি দরজা শুধু যিকিরকারীদের জন্য রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত। আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এক জায়গায় পৌছিয়া তিনি বলিলেন, অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কতিপয়

দ্রুতগামী লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ সমস্ত অগ্রবর্তী লোকেরা কোথায়, যাহারা আল্লাহর যিকিরে পাগলপারা হইয়া মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিবে সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে।

(৫) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مُردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مُردہ ہے۔

(اخرجه البخارى ومسلم والبيهقى كذا فى الدر والمشكوٰة)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির করে না সে মৃত। (দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে প্রত্যেকেই ভয় করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত সমতুল্য। তাহার জীবন বেকার।

زندگانی نتواں گفت حیاتیکہ مراست   زندہ آنست کہ با دوست وصالے دارد

অর্থাৎ, আমার হায়াতকে জীবনই বলা চলে না। প্রকৃত জীবন তো তাহার, বন্ধুর সহিত যাহার মিলন লাভ হইয়াছে।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে দিলের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে তাহার দিল জিন্দা থাকে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না তাহার দিল মরিয়া যায়। কোন কোন আলেম আরও বলিয়াছেন, উদাহরণটি উপকার ও ক্ষতির দিক বুঝানোর জন্য দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরকারীকে যে কষ্ট দেয় সে যেন জিন্দা ব্যক্তিকে কষ্ট দিল। কাজেই ইহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে এবং ইহার পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি যিকির করে না, তাহাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল মুর্দাকে কষ্ট দেওয়া। আর মুর্দা ব্যক্তি কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন, এখানে জিন্দা বলিয়া চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, যাহারা এখলাসের সহিত বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে তাহারা কখনও মরে না ; বরং তাহারা এই দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়ার পরও জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণের ব্যাপারে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে ঃ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের প্রভুর নিকট জীবিত। অনুরূপ, যিকিরকারীদের জন্যও মৃত্যুর পর এক প্রকার বিশেষ জীবন রহিয়াছে। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৬৯)

হাকেম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর যিকির দিলকে ভিজাইয়া দেয় এবং দিলের মধ্যে নম্রতা পয়দা করে। আর যখন দিল আল্লাহর যিকির হইতে খালি হয় তখন নফসের গরমি ও খাহেশাতের আগুনে শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও শক্ত হইয়া যায়। ফলে এই দিল ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবাদত–বন্দেগী হইতে রুখিয়া যায়। যদি এই অঙ্গগুলিকে টানিয়া সোজা করিতে চাও তা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। যেমন শুকনা কাঠকে ঝুকাইতে চাহিলেও ঝুকে না শুধু কাটিয়া জ্বালাইবার উপযুক্ত থাকিয়া যায়।

(৬) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰىؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِىْ حِجْرِهٖ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَاٰخَرُ يَذْكُرُ اللّٰهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ لِلّٰهِ اَفْضَلَ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ اُن کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

(اخرجه الطبرانی كذا فی الدر وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی فی الاوسط ورجاله وثقوا)

(৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা–পয়সা থাকে এবং সে এইগুলিকে দান করিতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, তবে যিকিরকারী ব্যক্তিই উত্তম হইবে। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা যত বড় জিনিসই হউক না কেন আল্লাহর যিকির উহার চাইতেও উত্তম। সুতরাং কত সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত মালদার যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির করারও তওফীক পাইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও বান্দার উপর প্রতিদিন ছদকা হইতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই

তাহার যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যিকিরের তাওফীক পাওয়া এত বড় নেয়ামত যে, ইহা হইতে বড় নেয়ামত আর হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক ব্যবসা–বাণিজ্য, চাকরী–বাকরী, চাষাবাদ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে তাহারা যদি সামান্য সময় আল্লাহর যিকিরের জন্য বাহির করিয়া লয়, তবে ইহা বিনা পরিশ্রমে অনেক বড় কামাই হইবে। দিবা–রাত্র চব্বিশ ঘন্টা হইতে দুই চার ঘন্টা সময় আল্লাহর যিকিরের জন্য বাহির করিয়া লওয়া এমনকি কঠিন ব্যাপার। অথচ অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্মে অনেক সময় খরচ হইয়া যায়। আল্লাহর যিকিরের মত একটি উপকারী কাজের জন্য সময় বাহির করা কি আর মুশকিল হইবে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার উত্তম বান্দা তাহারা, যাহারা আল্লাহর যিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য, তারা ও ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ, সঠিক সময়ের নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ এহতেমাম করে। বর্তমান যুগে ঘড়ি–ঘন্টার অধিক প্রচলন যদিও ইহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছে, তবুও এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা ভাল। যাহাতে কখনও ঘড়ি নষ্ট হইয়া গেলেও সময় নষ্ট না হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, জমিনের যে অংশে আল্লাহর যিকির করা হয় সেই অংশ সাত তবক নীচ পর্যন্ত অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করিয়া থাকে।

(৭) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق وافسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گذر گئی ہو۔

(اخرجه الطبرانی والبیهقی كذا فی الدر وفی الجامع رواه الطبرانی فی الكبیر و البیهقی فی الشعب ورقم له بالحسن وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی ورجاله ثقات وفی شیخ الطبرانی خلاف واخرج ابن ابی الدنیا والبیهقی عن عائشة ؓ بمعناه مرفوعًا كذا فی الدر وفی الترغیب بمعناه عن ابی هریرة مرفوعًا وقال رواه احمد باسناد صحیح وابن حبان والحاكم وقال صحیح علی شرط البخاری)

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতবাসীদের দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস বা আক্ষেপ হইবে না ; শুধুমাত্র ঐ সময়টুকুর জন্য আফসোস হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া কাটিয়াছে।

(দুররে মানসূর ঃ তাবারানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার পর যখন এই দৃশ্য সামনে আসিবে যে, একবার মাত্র আল্লাহর নাম লওয়ার কারণে কি পরিমাণ নেকী দেওয়া হইতেছে ; কত পাহাড় পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইতেছে, তখন নিজের কামাইয়ের এত লোকসান দেখিয়া যে পরিমাণ আফসোস হইবে উহা সহজেই অনুমেয়। এমন সৌভাগ্যবান বান্দাও আছে, যাহাদের কাছে আল্লাহর যিকির ছাড়া দুনিয়াটাই ভাল লাগে না। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মোনাব্বেহাত' কিতাবে লিখিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয রাযী (রহঃ) এইভাবে মোনাজাত করিতেন ঃ

اِلٰهِى لَا يَطِيْبُ اللَّيْلُ اِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ وَلَا يَطِيْبُ النَّهَارُ اِلَّا بِطَاعَتِكَ وَلَا تَطِيْبُ الدُّنْيَا اِلَّا بِذِكْرِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْاٰخِرَةُ اِلَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْجَنَّةُ اِلَّا بِرُؤْيَتِكَ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! তোমার সহিত মোনাজাত ছাড়া রাত্র ভাল লাগে না, তোমার এবাদত ছাড়া দিন ভাল লাগে না, তোমার যিকির ছাড়া দুনিয়া ভাল লাগে না, তোমার ক্ষমা ছাড়া আখেরাত ভাল লাগিবে না, তোমার দীদার ছাড়া জান্নাত ভাল লাগিবে না।

হযরত ছিররী ছাকতী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জুরজানী (রহঃ)কে ছাতু খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এইভাবে শুকনা ছাতু খাইতেছেন! তিনি বলিলেন, রুটি চিবাইয়া খাওয়া এবং এইভাবে ছাতু খাওয়ার মধ্যে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, রুটি চিবাইয়া খাইতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত সময় খরচ হয় উহাতে একজন মানুষ সত্তরবার সুবহানাল্লাহ পড়িতে পারে। এইজন্য আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ রুটি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। এইভাবে শুধু ছাতুর উপরই জীবন কাটাইতেছি।

মনসূর ইবনে মোতামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর যাবত এশার পর তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন নাই। রবী' ইবনে হায়ছাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বিশ বৎসর যাবৎ তিনি যে কথা বলিতেন উহা একটি কাগজে লিখিয়া লইতেন এবং রাত্রে তিনি নিজের দিলের সহিত হিসাব করিতেন কয়টি কথা দরকারী ছিল আর কয়টি বেদরকারী।

(٨) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ وَاَبِیْ سَعِیْدٍ رض اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَا یَقْعُدُ قَوْمٌ یَّذْکُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَةُ وَذَکَرَهُمُ اللّٰهُ فِیْمَنْ عِنْدَهٗ۔ اخرجه ابن ابی شیبة واحمد ومسلم والترمذی وابن ماجة والبیهقی کذا فی الدر والحصن والمشکٰوة وفی حدیث طویل لابی ذر اُوْصِیْكَ بِتَقْوَی اللّٰهِ فَاِنَّهٗ رَاْسُ الْاَمْرِ کُلِّهٖ وَعَلَیْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِکْرِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ ذِکْرٌ لَّكَ فِی السَّمَآءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِی الْاَرْضِ الحدیث ذکره فی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی وعبد بن حمید فی تفسیره ورقم له بالحسن۔

حضرت اَبُوہُرَیرَہ رض اور حضرت ابوسعید رض دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حُضور صَلَّی اللہ عَلَیہِ وَسَلَّم سے سُنا، اِرشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ اُن کا تذکرہ اپنی مجلس میں (تفاخُر کے طور پر) فرماتے ہیں۔ حضرت ابوذر رض نبیِ اکرم صَلَّی اللہ علیہ وسلّم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوٰی کی وصیّت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری اُمّت کی فقیری یہی ہے مسکینوں سے محبّت رکھنا ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلّقات جوڑنے کی فکر رکھنا وہ اگرچہ تجھ سے تعلّقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردُّد نہ کرنا گو کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کی مَلامت کی پرواہ نہ کرنا۔ تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیُوب پر نظر نہ کرنے دے اور جس عیب میں خود مُبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصّہ نہ کرنا۔ اے ابوذر حُسنِ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز اُمور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے اور

خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں !!

(৮) হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) দুইজনই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি—তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, ফেরেশতারা উহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর ছাকীনা নাযিল হয়। আর আল্লাহ তায়ালা নিজ মজলিসে (গর্ব করিয়া) তাহাদের আলোচনা করেন।

(দুররে মানসূর ঃ হিসনে হাসীন, মিশকাত ঃ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার নসীহত করিতেছি। কেননা ইহা সমস্ত বিষয়ের মূল। কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম কর। ইহা দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হইবে এবং জমিনে ইহা তোমার জন্য নূর হইবে। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাক। ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলিও না। ইহা শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং দ্বীনের কাজে সাহায্য করে। অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, ইহাতে দিল মরিয়া যায় ও চেহারার নূর চলিয়া যায়। জিহাদ করিতে থাক। কেননা, আমার উম্মতের বৈরাগ্য ইহাই। মিসকীনদেরকে মহব্বত কর। তাহাদের সহিত বেশী সময় কাটাও। নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে দেখ, উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ যে নেয়ামত তোমাকে দান করিয়াছেন উহার প্রতি বেকদরী পয়দা হয়। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া রাখার চেষ্টা কর। যদিও তাহারা তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। হক কথা বলিতে দ্বিধা করিও না, যদিও কাহারও নিকট তিক্ত লাগে। আল্লাহর ব্যাপারে কাহারও তিরস্কারের পরোয়া করিও না। নিজের দোষ দেখার মধ্যে এমনভাবে মশগুল হও যেন অন্যের দোষ দেখার সুযোগ না হয়। যে দোষ তোমার মধ্যে রহিয়াছে এমন দোষের কারণে অন্যের প্রতি রাগ করিও না। হে আবূ যর! সুব্যবস্থা গ্রহণের চাইতে উত্তম বুদ্ধিমত্তা আর নাই। নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা সর্বোত্তম পরহেজগারী। সদ্ব্যবহার সমতুল্য কোন ভদ্রতা নাই। (জামে সগীর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ 'ছাকীনা' শব্দের অর্থ শান্তি ও গাম্ভীর্য অথবা বিশেষ রহমত। ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। আমার লেখা 'ফাযায়েলে

কুরআন' কিতাবের চল্লিশ হাদীস অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ছাকীনা' এমন জিনিস যাহার মধ্যে শান্তি, রহমত ইত্যাদি সবকিছু রহিয়াছে এবং তাহা ফেরেশতাদের সহিত নাযিল হয়।

যিকিরকারীদের আলোচনা আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে গর্বের সহিত করিয়া থাকেন—ইহার একটি কারণ হইল, আদম (আঃ)কে পয়দা করার সময় ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, ইহারা দুনিয়াতে ফেতনা–ফাসাদ করিবে। বিস্তারিত আলোচনা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ হইল, ফেরেশতারা যদিও পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মানিয়া চলে, তাহার এবাদত–বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকে তবু ইহা বাস্তব যে, তাহাদেরকে গোনাহ করার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এবাদত করা বা গোনাহে লিপ্ত হওয়া এই দুই প্রকারেরই ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন। তদুপরি গাফলতি ও নাফরমানীর বিভিন্ন উপকরণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, মনের কামনা–বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই এই সমস্ত বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও মানুষের এবাদত ও আনুগত্য এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া চলা খুবই প্রশংসনীয় ও কদর পাওয়ার উপযুক্ত।

হাদীসে আছে, যখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাত তৈরী করার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, জান্নাত দেখিয়া আস। তিনি জান্নাত দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, এই জান্নাতের খবর যে–ই পাইবে সে ইহাতে প্রবেশ করিবেই। অর্থাৎ, জান্নাতের মধ্যে যেসমস্ত নেয়ামত, আরাম–আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের আসবাব রাখা হইয়াছে, উহা শুনিবার ও একীন করিবার পর এমন কে আছে যে উহাতে প্রবেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্ট দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি আমল উহার উপর সওয়ার করাইয়া দিলেন ; অর্থাৎ এই সমস্ত আমল সঠিকভাবে পালন কর, তাহা হইলেই জান্নাতে যাইতে পারিবে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, এইবার দেখিয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমনিভাবে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম তৈরী করার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে উহা দেখিয়া আসার জন্য বলিলেন। হযরত

জিবরাঈল (আঃ) জাহান্নামের আজাব, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গন্ধময় জিনিস দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, যে ব্যক্তি জাহান্নামের অবস্থা জানিতে পারিবে, সে কখনও উহার কাছেও যাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে দুনিয়ার মোহ ও বিভিন্ন খাহেশের বস্তু দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যেমন, আল্লাহর নাফরমানী, জেনা, শরাব, জুলুম ইত্যাদি পাপকার্যের পর্দা উহার উপর ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, এইবার দেখিয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ! এখন তো আমার আশংকা হইতেছে যে, কেহই জাহান্নাম হইতে বাঁচিতে পারিবে না।

এই কারণেই কোন বান্দা যখন আল্লাহর 'হুকুম মানিয়া চলে এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে তখন সে যে পরিবেশে থাকিয়া এইরূপ চলিতেছে সেই পরিবেশ হিসাবে তাহার কদর হয়। আর এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উক্ত হাদীসে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা বিশেষভাবে এই কাজের জন্যই নিযুক্ত। অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর যিকিরের মজলিস হয়, আল্লাহর যিকির করা হয় সেখানে তাহারা জমা হয় এবং যিকির শুনিয়া থাকে। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ফেরেশতাদের একটি জামাত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরাফেরা করিতে থাকে, যেখানেই তাহারা যিকিরের আওয়াজ শুনিতে পায় অন্যান্য সঙ্গীদেরকে ডাকিয়া বলে, আস, এখানে আস, তোমরা যে জিনিস তালাশ করিতেছ তাহা এখানে রহিয়াছে। তখন তাহারা একজনের উপর আরেকজন জমা হইতে থাকে। এইভাবে তাহাদের হাল্‌কা বা ঘেরাও আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৪নং হাদীসে আসিতেছে।

(৭) عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدٰنَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہؓ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے عرض کیا کہ اللہ جل شانہٗ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی

آللّٰہِ مَا اَجْلَسَکُمْ اِلَّا ذٰلِکَ
قَالُوْا آللّٰہِ مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا ذٰلِکَ
قَالَ اَمَا اِنِّیْ لَمْ اَسْتَحْلِفْکُمْ تُہْمَۃً
لَّکُمْ وَلٰکِنْ اَتَانِیْ جِبْرَئِیْلُ فَاَخْبَرَنِیْ
اَنَّ اللّٰہَ یُبَاہِیْ بِکُمُ الْمَلٰئِکَۃَ۔
(اخرجه ابن ابی شیبة واحمد و
مسلم والترمذی والنسائی کذا
فی الدر والمشکوة)

دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان
ہم پر ہے۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا،
کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو صحابہؓ
نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے
بیٹھے ہیں، حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ
کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم
نہیں دی بلکہ جبرئیلؑ میرے پاس ابھی آئے
تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ تم لوگوں
کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে কোন্ জিনিস এইখানে জমা করিয়াছে। তাঁহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি এবং এই জন্য তাঁহার হাম্‌দ ও ছানা করিতেছি যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করিয়াছেন—ইহা আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার বড়ই এহসান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, খোদার কসম! তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়া আছ? সাহাবীগণ বলিলেন, জ্বি হাঁ, খোদার কসম, আমরা শুধু এইজন্যই বসিয়া আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাদের প্রতি কোন খারাপ ধারণার কারণে তোমাদেরকে কসম দেই নাই বরং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইমাত্র আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং তিনি এই খবর শুনাইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারণে ফেরেশতাদের উপর গর্ব করিতেছেন।

(দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, আমি যে তোমাদেরকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য হইল, বিষয়টির প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা। কেননা, ইহা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কারণও হইতে পারে যেইজন্য আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিতেছেন। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ইহাই একমাত্র গর্বের কারণ। কতই না সৌভাগ্যবান ছিলেন ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের এবাদত–বন্দেগী আল্লাহর কাছে কবুল হইয়া গিয়াছিল। যাহাদের হাম্‌দ ও

ছানার উপর আল্লাহ তায়ালার গর্বের সুসংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক জবানে তাঁহারা দুনিয়াতেই জানিতে পারিতেন। আর এইরূপ কেনই বা হইবে না? তাঁহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজসমূহ আসলেই ইহার যোগ্য ছিল। নমুনাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে তাহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর আলোচনা 'হেকায়াতে সাহাবা' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, গর্ব করার অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন যে, দেখ, এই সমস্ত লোক—তাহাদের সহিত নফস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না রহিয়াছে, শয়তান তাহাদের উপর সওয়ার হইয়া রহিয়াছে, মনের কামনা–বাসনা তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, দুনিয়াবী নানাবিধ প্রয়োজনও তাহাদের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে, এতদসত্ত্বেও তাহারা এই সবকিছুর মোকাবিলায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল রহিয়াছে। এত বাধা–বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা আমার যিকির হইতে হটিতেছে না। তোমাদের যিকির ও তসবীহ–তাহলীলের পিছনে কোন বাধা–বিপত্তি নাই, যাহা তাহাদের রহিয়াছে। এই হিসাবে তাহাদের যিকিরের তুলনায় তোমাদের যিকির কিছুই নহে।

(১০) عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا وَجْهَهٗ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع ہوں، اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے، اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

اخرجہ احمد والبزار وابویعلی والطبرانی واخرجہ الطبرانی عن سہل بن الحنظلیۃ ایضا واخرجہ البیہقی عن

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَزَادَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا فِيْ مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوْا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ اِلَّا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

دوسری حدیث میں ہے اس کے بالمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت وافسوس کا سبب ہوگا۔

كذا فى الدر قال المنذرى رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورواته

مصتج بهم فی الصحیح وفی الباب عن ابی هریرة عند احمد وابن حبان وغیرهما وصححه الحاکم علی شرط مسلم فی موضع وعلی شرط البخاری فی موضع اخری وعزا السیوطی فی الجامع حدیث سهل الی الطبرانی والبیهقی فی الشعب والضیاء ورقم له بالحسن وفی الباب روایات ذکرها فی مجمع الزوائد۔

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত লোক আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হইতে এক ফেরেশতা ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
(দুররে মানসূর ঃ আহমদ, তাবারানী)

আরেক হাদীসে আছে, ইহার বিপরীত যে মজলিসে আল্লাহ পাকের কোন যিকির হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হইবে। (দুররে মানসূর ঃ বায়হাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, এই মজলিসের বে–বরকতী ও ক্ষতির কারণে আফসোস হইবে। আর ইহাও বিচিত্র নহে যে, কোন অসঙ্গত কাজের দরুন বিপদ বা ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোক এমন যেন তাহারা মৃত গাধা ভক্ষণ করিয়া উঠিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, মজলিসের কাফফারা অর্থাৎ, মজলিসের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য মজলিসের শেষে এই দোয়া পড়িয়া নিবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

আরেক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন দয়ায় চাহিলে মাফ করিয়া দিবেন অথবা শাস্তি প্রদান করিবেন। এক হাদীসে আছে, তোমরা মজলিসের হক আদায় কর। আর তাহা এই যে, বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর। পথিককে প্রয়োজনে

পথ দেখাইয়া দাও। নাজায়েয কিছু সামনে আসিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও (কিংবা নজর নীচু করিয়া লও যাহাতে উহার উপর দৃষ্টি না পড়িয়া যায়)।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার সওয়াব অনেক বড় পাল্লায় ওজন করা হউক (অর্থাৎ, তাহার সওয়াব বেশী হউক), কারণ সওয়াব বেশী হইলেই বড় পাল্লায় ওজন করার প্রয়োজন হইবে নতুবা সাধারণ হইলে তো পাল্লার এক কোণাই যথেষ্ট হইবে। সে যেন মজলিসের শেষে এই দোয়া পড়ে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

উপরে উল্লেখিত হাদীসে গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার সুসংবাদও রহিয়াছে। কুরআন পাকেও সূরায়ে ফুরকানের শেষে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

অর্থাৎ, ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের গোনাহকে আল্লাহ তায়ালা নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৭০)

এই আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে ঃ

এক. গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং নেকী থাকিয়া যাইবে। আর ইহাও এক রকম পরিবর্তন কেননা, কোন গোনাহ বাকী রহিল না।

দুই. এই সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বদ আমলের পরিবর্তে নেক আমলের তওফীক পাইবে। যেমন বলা হয় গরমের পরিবের্তে শীত আসিয়া গেল।

তিন. তাহাদের খারাপ অভ্যাসগুলি ভাল অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের অভ্যাস স্বভাবগত হইয়া থাকে যাহা কখনও পরিবর্তন হয় না। এইজন্যই প্রবাদ আছে, 'পাহাড় স্থানান্তরিত হয় কিন্তু স্বভাব বদলায় না।' এই প্রবাদও একটি হাদীস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে—তোমরা যদি শুনিতে পাও যে, পাহাড় নিজের জায়গা হইতে সরিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে তবে ইহা বিশ্বাস করিতে পার ; কিন্তু যদি শুনিতে পাও যে, কাহারও স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে তবে উহা বিশ্বাস করিও না। হাদীসের অর্থ এই হইল যে, স্বভাব বদলাইয়া যাওয়া পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ মানুষের অভ্যাস

সংশোধনের যে কাজ করেন উহার অর্থ কি হইবে? উত্তর হইল, এছলাহ বা সংশোধন দ্বারা অভ্যাস পরিবর্তন হয় না বরং উহার সম্পর্ক পরিবর্তন হইয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তির স্বভাবে রাগ আছে। এমন নয় যে, মাশায়েখগণের এছলাহের দ্বারা তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে, বরং পূর্বে রাগের সম্পর্ক যে সমস্ত জিনিসের সহিত ছিল যেমন অপাত্রে জুলুম করা, অহংকার করা ইত্যাদি। এইগুলির বদলে আল্লাহর নাফরমানী ও তাহার আদেশ লংঘন ইত্যাদির দিকে পরিবর্তন হইয়া যায়

হযরত ওমর (রাযিঃ) যিনি এক সময় মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেন নাই, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে তিনি কাফেরদের উপর অনুরূপভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। অন্যান্য চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারও ঠিক এইরকম। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হইবে, আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত লোকদের চরিত্রের সম্পর্ক গোনাহের বদলে নেকীর সহিত করিয়া দেন।

চার. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে গোনাহ হইতে তওবা করার তওফীক দান করেন। যে কারণে পুরাতন গোনাহগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয় ও তওবা করে। আর তওবা যেহেতু একটি এবাদত, কাজেই প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি তওবার জন্য নেকী লাভ হইয়া যায়।

পাঁচ. উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হইল, যদি মেহেরবান আল্লাহ তায়ালার নিকট কাহারও কোন কাজ পছন্দ হয় এবং নিজ দয়ায় তিনি তাহাকে গোনাহের সমান নেকী দান করেন তবে কাহার কি বলার আছে। তিনি মালিক, বাদশাহ, সর্বশক্তিমান। তাঁহার রহমতের কোন সীমা নাই। তাঁহার মাগফিরাতের দরজা কে বন্ধ করিতে পারে। কে তাঁহার দানের ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। তিনি যাহা কিছু দেন আপন মালিকানা হইতে দেন। আপন কুদরতের প্রকাশও তিনি ঘটাইবেন। অসাধারণ ক্ষমা ও মাগফেরাতও তিনি সেইদিন দেখাইবেন। হাশরের দৃশ্য ও হিসাব-নিকাশের বিভিন্ন তরীকা বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

'বাহ্‌জাতুন-নুফূস' কিতাবে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হইয়াছে যে, হিসাব কয়েক প্রকারে লওয়া হইবে ঃ— একটি এই যে, অত্যন্ত গোপনে পর্দার আড়ালে বান্দার হিসাব লওয়া হইবে। তাহার গোনাহসমূহ একটি একটি করিয়া পেশ করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, অমুক সময় তুমি অমুক কাজ কর নাই? তখন স্বীকার না করিয়া তাহার

কোন উপায় থাকিবে না। এমনকি গোনাহের পরিমাণ বেশী দেখিয়া সে মনে করিবে যে, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ গোপন রাখিয়াছি আজও গোপন রাখিলাম এবং তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর এই ব্যক্তি এবং তাহার মত আরও অন্যান্য লোক যখন হিসাবের স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবে তখন লোকেরা তাহাদেরকে দেখিয়া বলিবে, ইহারা আল্লাহর কত মোবারক বান্দা, কোন গোনাহই করে নাই। আসলে তাহারা তাহাদের গোনাহের কথা জানিতেই পারে নাই। এমনিভাবে আরেক প্রকারের লোক হইবে, তাহাদের ছোট বড় অনেক গোনাহ থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইবেন, তাহাদের ছোট গোনাহগুলিকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দাও। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিবে, আয় আল্লাহ! আরও অনেক গোনাহ আছে যেগুলি এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। এই ধরনের আরও অনেক প্রকার হিসাব-নিকাশের কথা 'বাহজাতুন-নুফূস' কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি যাহাকে সকলের শেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে এবং সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। এক ব্যক্তিকে ডাকা হইবে এবং ফেরেশতাদেরকে বলা হইবে, তাহার বড় বড় গোনাহ যেন এখন উল্লেখ করা না হয় ; বরং ছোট গোনাহগুলিকে তাহার সামনে পেশ করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতএব হিসাব শুরু হইয়া যাইবে—এক একটি গোনাহ সময় উল্লেখ করিয়া তাহার সামনে পেশ করা হইবে। সে উপায় না দেখিয়া এইগুলি স্বীকার করিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এরশাদ হইবে, তাহার প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি নেকী দান কর। তখন সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, আয় আল্লাহ! এখনও অনেক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেগুলি উল্লেখ করা হয় নাই। এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাসিয়া উঠিলেন।

উক্ত ঘটনায় প্রথমতঃ তাহাকে সর্বশেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে—ইহা কি সামান্য সাজা! দ্বিতীয় কথা হইল যে, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে, যাহার গোনাহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইবে ; তাহা তো আমরা জানি না। কাজেই আল্লাহ পাকের দরবারে আশাবাদী হইয়া তাহার দয়া ও মেহেরবানী কামনা করাই হইবে গোলামীর পরিচয়। আর এই

ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া বড়ই স্পর্ধার ব্যাপার। হাঁ গোনাহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল এখলাসের সহিত যিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া। যাহা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এই এখলাসও আল্লাহরই দান।

একটি জরুরী কথা এই যে, জাহান্নাম হইতে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি বাহ্যতঃ একটি অপরটির বিপরীত মনে হইলেও আসলে কোন অমিল নাই। কারণ, একদল বাহির হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে 'সর্বশেষে বাহির হইয়াছে' বলা যাইবে। আর যে শেষের নিকটবর্তী তাহাকেও শেষই বলা হইয়া থাকে। এমনিভাবে ইহার অর্থ—বিশেষ বিশেষ দল যাহারা সর্বশেষে বাহির হইবে তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও হইতে পারে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এখলাস। আর এখলাসের এই শর্তটি এই কিতাবের অনেক হাদীসে পাওয়া যাইবে। আসলে আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসেরই মূল্য। যে পরিমাণ এখলাস হইবে আমলও সেই পরিমাণে মূল্যবান হইবে। সূফিয়ায়ে কেরামের মতে এখলাসের হাকীকত হইল—কথা ও কাজ এক রকম হওয়া। সামনে এক হাদীসে আসিতেছে, এখলাস উহাকে বলে যাহা গোনাহ হইতে বিরত রাখে।

'বাহজাতুন–নুফূস' কিতাবে আছে, এক অত্যাচারী বাদশাহের জন্য জাহাজ ভর্তি করিয়া শরাব আনা হইতেছিল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি সেই জাহাজের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি শরাবের মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু একটি মটকা না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাহাকে বাধা দেওয়ার মত সাহস কাহারও হয় নাই। কিন্তু সকলেই অবাক হইল যে, এই লোক কি করিয়া এমন অত্যাচারী বাদশার মোকাবেলা করার সাহস করিল! বাদশাহকে জানানো হইল। বাদশাও অবাক হইল যে, একজন সাধারণ লোক এমন সাহস কিভাবে করিল! আবার সবগুলি মটকা ভাঙ্গিয়া একটিকে ছাড়িয়া দিল কেন? বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন তুমি ইহা করিলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার দিলে ইহার প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইয়াছে, তাই এইরূপ করিয়াছি। তোমার মনে যাহা চায় আমাকে শাস্তি দিতে পার। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, একটি মটকা কেন রাখিয়া দিলে? তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি ইসলামী জোশের কারণে ভাঙ্গিয়াছি। কিন্তু শেষ মটকাটি ভাঙ্গিবার সময় আমার মনে এক

ধরনের খুশী আসিল যে, আমি একটি নাজায়েয কাজকে খতম করিয়া দিয়াছি। তখন আমার মনে খটকা হইল যে, হয়ত আমার মনের খুশীর জন্য ইহা ভাঙ্গিতেছি। কাজেই একটিকে না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। বাদশাহ বলিল, লোকটিকে ছাড়িয়া দাও, কেননা (ঈমানের কারণে) সে অপারগ ছিল।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'এহয়াউল উলূম' কিতাবে লিখিয়াছেন, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ ছিল। সবসময় সে এবাদতে মশগুল থাকিত। একবার একদল লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, এখানে কিছু লোক একটি গাছের পূজা করে। ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং কুড়াল কাঁধে লইয়া গাছটি কাটিবার জন্য রওয়ানা হইল। পথে শয়তান এক বৃদ্ধ লোকের বেশ ধরিয়া আবেদকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, অমুক গাছটি কাটিতে যাইতেছি। শয়তান বলিল, গাছের সাহিত তোমার কি সম্পর্ক ; তুমি নিজের এবাদতে মশগুল থাক। একটি বেহুদা কাজের জন্য তুমি নিজের এবাদত ছাড়িয়া দিয়াছ কেন? আবেদ বলিল, ইহাও একটি এবাদত। শয়তান বলিল, আমি তোমাকে কাটিতে দিব না। এইবার দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। আবেদ শয়তানের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শয়তান অপারগ হইয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, আচ্ছা, একটি কথা শুন। আবেদ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শয়তান বলিল, গাছ কাটা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর ফরজ করেন নাই এবং ইহাতে তোমার কোন ক্ষতিও হইতেছে না। আর তুমি নিজেও উহার এবাদত করিতেছ না। আল্লাহ তায়ালার বহু নবী আছেন। ইচ্ছা করিলে কোন নবীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গাছটি কাটাইয়া দিতেন। আবেদ বলিল, আমি ইহা অবশ্যই কাটিব। এই কথার উপর আবার দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। আবেদ শয়তানের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শয়তান বলিল, আমি একটি মীমাংসার কথা বলিব কি? যাহা তোমার জন্য লাভজনক হইবে। আবেদ বলিল, হাঁ বল। শয়তান বলিল, তুমি একজন গরীব লোক, দুনিয়ার উপর বোঝা হইয়া আছ। তুমি গাছ কাটা হইতে বিরত হইলে আমি তোমাকে দৈনিক তিনটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিব, যাহা প্রতিদিন তুমি শিয়রের কাছে পাইবে। ইহাতে তোমার প্রয়োজনও মিটিয়া যাইবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদেরও সাহায্য করিতে পারিবে। আরও অন্যান্য সওয়াবের কাজও করিতে পারিবে। আর গাছ কাটিলে মাত্র একটি সওয়াব পাইবে। আবার তাহাও বেকার। কেননা, ঐসব লোক এই গাছের পরিবর্তে আরেকটি গাছ লাগাইয়া লইবে।

শয়তানের কথা আবেদের মনে লাগিল এবং মানিয়া লইল। দুইদিন পর্যন্ত সে স্বর্ণমুদ্রা ঠিকমতই পাইল কিন্তু তৃতীয় দিন আর পাইল না। আবেদ রাগান্বিত হইয়া কুড়াল হাতে লইয়া আবার গাছ কাটিতে চলিল। পথে সেই বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? আবেদ বলিল, ঐ গাছটি কাটিতে যাইতেছি। বৃদ্ধ বলিল, তুমি উহা কাটিতে পারিবে না। এই বলিয়া দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। এইবার বৃদ্ধ আবেদের উপর জয়ী হইয়া গেল এবং আবেদের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। আবেদ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এইবার তুমি কিভাবে জয়ী হইলে? বৃদ্ধ বলিল, আগে তোমার রাগ খালেছ আল্লাহর জন্য ছিল ; কাজেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর এইবার তোমার মনে স্বর্ণমুদ্রার খেয়াল ছিল বলিয়া তুমি পরাস্ত হইয়াছ। আসল কথা হইল, যে কাজ খালেছ আল্লাহর জন্য হয় উহা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়।

(١١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ اٰدَمِيٌّ عَمَلًا اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔

(اخرجه احمد كذا فى الدر والى احمد عزاه فى الجامع الصغير بلفظ اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ورقم له بالصحة وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله رجال الصحيح الا ان زيادًا لم يدرك معاذًا ثم ذكره بطريق اٰخر وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح قلت وفى المشكوٰة عنه موقوفًا بلفظ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وقال رواه مالك والترمذى وابن ماجة اه قلت وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبى وفى المشكوٰة برواية البيهقى فى الدعوات عن ابن عمر مرفوعًا بمعناه قال القارى رواه ابن ابى شيبة و ابن ابى الدنيا وذكره فى الجامع الصغير برواية البيهقى فى الشعب ورقم له بالضعف وزاد فى اوّله لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وفى مجمع الزوائد برواية جابر مرفوعًا نحوه وقال رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط ورجالهما رجال الصحيح اه)

(১১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর

যিকির হইতে বড় মানুষের আর কোন আমল কবর আজাব হইতে অধিক নাজাত দানকারী নাই। (দুররে মানসূর ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ কবর আজাব যে কত কঠিন তাহা ঐ সমস্ত লোকই জানেন, যাহাদের সামনে কবরের আজাব সম্পর্কিত হাদীসগুলি রহিয়াছে। হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কবরের পাশ দিয়া যাইতেন তখন তিনি এত কাঁদিতেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক ভিজিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত কাঁদেন না, কবরের সামনে আসিলে যত কাঁদেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলিলেন, কবর আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তাহার জন্য পরবর্তী সব মঞ্জিল সহজ হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ইহা হইতে নাজাত পায় না তাহার জন্য পরবর্তী সব মঞ্জিল কঠিন হইতে থাকে। অতঃপর হযরত ওসমান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ শুনাইলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে বেশী ভয়াবহ আর কোন দৃশ্য দেখি নাই। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আজাব হইতে পানাহ চাহিতেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার এই আশংকা হয় যে, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরে দাফন করা ছাড়িয়া দিবে তাহা না হইলে আমি দোয়া করিতাম যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনাইয়া দেন। মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া অন্য সব প্রাণী কবরের আজাব শুনিতে পায়।

এক হাদীসে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার উটনী লাফাইতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর কি হইল? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এক ব্যক্তির কবরে আজাব হইতেছে উহার আওয়াজ শুনিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়া দেখিলেন, কিছুলোক খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা যদি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে, তবে এই অবস্থা হইত না। এমন কোন দিন যায় না যেদিন কবর এই কথা ঘোষণা না করে যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি

নির্জনতার ঘর, আমি কীট-পতঙ্গের ও জীব-জন্তুর ঘর। যখন কোন কামেল মুমিনকে দাফন করা হয় তখন কবর তাহাকে বলে, তোমার আগমন মোবারক হউক, তুমি খুবই ভাল করিয়াছ যে, আসিয়া গিয়াছ। যত মানুষ আমার পিঠের উপর (অর্থাৎ জমিনের উপর) দিয়া চলিত তুমি তাহাদের মধ্যে আমার নিকট খুবই প্রিয় ছিলে। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর এত প্রশস্ত হইয়া যায় যে, দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত খুলিয়া যায়। উহাতে জান্নাতের একটি দরজা খুলিয়া যায় যাহা দ্বারা জান্নাতের হাওয়া ও খোশবূ আসিতে থাকে। আর যখন কাফের অথবা বদকার লোককে দাফন করা হয়, তখন কবর বলে, তোর আগমন অশুভ ও নামোবারক। কি প্রয়োজন ছিল তোর আসার। যত মানুষ আমার পিঠের উপর চলিত তাহাদের মধ্যে তুই আমার কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয় ছিলি। আজ তোকে আমার কাছে সোপর্দ করা হইয়াছে। তুই আমার আচরণ দেখিতে পাইবি। এই কথা বলিয়া কবর তাহাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, তাহার এক পার্শ্বের পাঁজরের হাড় অন্য পার্শ্বের পাঁজরের হাড়ের ভিতর এমনভাবে ঢুকিয়া যায় যেমন এক হাত অপর হাতের মধ্যে ঢুকাইলে দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের ভিতর ঢুকিয়া যায়। অতঃপর নব্বই অথবা নিরানব্বইটি অজগর সাপ তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, ঐ অজগরগুলির একটিও যদি জমিনের উপর ফূৎকার মারে তবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনের বুকে কোন ঘাস জন্মিবে না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। এরশাদ ফরমাইলেন, "এই দুইজনের আজাব হইতেছে। একজনের চোগলখোরীর কারণে আর অপরজনের পেশাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে।" অর্থাৎ শরীরকে পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচাইত না। আমাদের মধ্যে এমন বহু ভদ্রলোক আছে যাহারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পেশাব হইতে পবিত্রতা হাসিলের বিষয়টিকে দোষণীয় মনে করে এবং ইহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওলামায়ে কেরাম পেশাব হইতে পবিত্রতা হাসিল না করাকে কবীরা গোনাহ বলিয়াছেন। ইবনে হজর মক্কী (রহঃ) বলেন, সহীহ হাদীসে আছে, বেশীর ভাগ কবরের আজাব পেশাব হইতে অপবিত্রতার কারণে হইয়া থাকে।

এক হাদীসে আছে, "কবরের মধ্যে সর্বপ্রথম পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" মোট কথা, কবরের আজাব অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যেমনিভাবে বিশেষ কিছু গোনাহের কারণে কবরের আজাব হয়, অনুরূপভাবে এমন কিছু বিশেষ এবাদতও আছে, যাহা দ্বারা কবরের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে আছে, "প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে তাবারাকাল্লাযী পড়া কবরের আজাব ও জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজত ও নাজাতের উপায়।" আর আল্লাহর যিকির দ্বারাও যে ইহা হয় তাহা উপরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١٢) عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِیْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوْا بِاَنْبِيَآءَ وَلَا شُهَدَآءَ فَقَالَ اَعْرَابِیٌّ حُلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِی اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهٗ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہٗ بعضی قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ اُن کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ اُن پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہونگے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اُن کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم اُن کو پہچان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آکر ایک جگہ جمع ہوگئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

(اخرجه الطبرانی باسناد حسن کذا فی الدر و مجمع الزوائد و الترغیب للمنذری وذکره ایضًا له متابعة بروایة عمرو بن عبسة عند الطبرانی مرفوعًا قال المنذری واسناده مقارب لا بأس به ورقم لحدیث عمرو بن عبسة فی الجامع الصغیر بالحسن وفی مجمع الزوائد رجاله موثوقون وفی مجمع الزوائد بمعنی هذا الحدیث مطولًا و فیه حُلْهُمْ لَنَا یعنی صِفْهُمْ لَنَا شَکِّلْهُمْ لَنَا فَسُرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِسُؤَالِ الْاَعْرَابِیِّ الْحَدِیْثَ. قال رواه احمد والطبرانی بنحوه ورجاله وثقوا قلت و فی الباب عن ابی هریرة عند البیهقی فی الشعب ان فی الجنة لعُمُدًا مِنْ یاقوت عَلَیْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِیْءُ کَمَا یُضِیْءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ یَسْکُنُهَا

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِی اللّٰہِ تَعَالٰی وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِی اللّٰہِ تَعَالٰی وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِی اللّٰہِ کذا فی الجامع الصغیر ورقم له بالضعف وذکر فی مجمع الزوائد له شواھد وکذا فی المشکوٰۃ

دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زَبَرْجَد (زُمُرُّد) کے بالاخانے ہوں گے ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں۔

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের হাশর এমনভাবে করিবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মোতির মিম্বরে বসা থাকিবে। অন্যান্য লোক তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবে। তাহারা নবীও হইবেন না, শহীদও হইবেন না। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের অবস্থা বলিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদেরকে চিনিয়া লইতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন এলাকা হইতে এবং বিভিন্ন খান্দান হইতে এক জায়গায় একত্রিত হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়াছে। (দুররে মানসূর, তারগীব ঃ তাবারানী)

আরেক হাদীসে আছে, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের খুঁটিসমূহ হইবে। উহার উপর যাবার্‌জাদ (যুমুররুদ) পাথরের বালাখানা হইবে। উহাতে চারিদিকে দরজাসমূহ খোলা থাকিবে। উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করিতে থাকিবে। এইসব বালাখানার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক থাকিবে যাহারা একে অপরের সহিত আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখে, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে এক জায়গায় জমা হয় এবং যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে। (জামে সগীর, মিশকাত)

ফায়দা ঃ এই ব্যাপারে চিকিৎসকদের মতভেদ রহিয়াছে যে, যাবার্‌জাদ ও যুমুররুদ একই পাথরের দুই নাম অথবা একই পাথরের দুইটি প্রকার কিংবা একই ধরণের দুইটি পাথর। যাহা হোক, ইহা একটি অতি উজ্জ্বল ও চমকদার পাথর। যাহার অতি মিহিন পাত তৈরী হয়। এবং এক প্রকার ঝলমলে কাগজের আকারে বাজারে বিক্রি হয়।

আজ যাহারা খানকাতে বসিয়া আছেন তাহাদের উপর সব ধরনের

অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। যত মনে চায় আজ তাহাদেরকে মন্দ বলিয়া লউক ; কাল যখন তাহাদিগকে ঐ সকল মিম্বর ও অট্টালিকার উপর দেখিবে তখন প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবে যে, ছিঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া তাহারা কত কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছেন। আর বিদ্রূপকারী ও গালমন্দকারীরা কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছে।

فَسَوْفَ تَرٰى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ   اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارٌ

"যখন ধুলিবালি সরিয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইবে, ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলে নাকি গাধার উপর।"

এই খানকাসমূহ যাহার উপর আজ চারিদিক হইতে গালমন্দ পড়িতেছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহার মূল্য কি? ইহা ঐ সকল হাদীস দ্বারা জানা যায় যাহাতে উহার ফযীলতসমূহ আলোচিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় উহা আসমানবাসীদের নিকট এমন চমকায় যেমন দুনিয়াবাসীদের নিকট নক্ষত্র চমকায়। আরেক হাদীসে আছে, যিকিরের মজলিসসমূহের উপর 'ছাকীনা' (এক প্রকার বিশেষ নেয়ামত) নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাহাদেরকে ঘিরিয়া লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়। আর আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আরশের উপর তাহাদের আলোচনা করেন।

সাহাবী হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমাকে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধিকারী বস্তু বলিয়া দিব কি? যাহা দ্বারা তুমি উভয় জাহানের ভালাই লাভ করিবে। উহা হইল যিকিরকারীদের মজলিস। উহাকে মজবুত করিয়া ধর। আর যখন তুমি একাকী হও তখন যত পার আল্লাহর যিকির করিতে থাক।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন—যে সমস্ত ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয়, আসমানবাসীগণ ঐ ঘরগুলিকে এইরূপ উজ্জ্বল দেখেন যেমন জমিনবাসীগণ তারকাসমূহকে উজ্জ্বল দেখে, যে সকল ঘরে আল্লাহর যিকির হয়, সেইগুলি এমন আলোকিত ও নূরানী হয় যে, নূরের কারণে তারকার মত চমকায়। আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে নূর দেখিবার মত চোখ দান করেন তাঁহারা এই জগতেও উহার চমক দেখিয়া নেয়। আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছেন, যাহারা বুযুর্গদের চেহারার নূর, তাহাদের বাসস্থানের নূর স্বচক্ষে চমকিতে দেখিয়া থাকেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফুজায়েল ইবনে ইয়াজ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত ঘরে যিকির করা হয়

সেইগুলি আসমানওয়ালাদের নিকট বাতির মত চমকিতে থাকে। শায়খ আবদুল আজীজ দাব্বাগ (রহঃ) কাছাকাছি যুগের একজন উম্মী বুযুর্গ ছিলেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত, হাদীসে কুদসী, হাদীসে নববী, জাল হাদীস এইসবগুলিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন যে—বর্ণনাকারীর জবান হইতে যখন শব্দ বাহির হয়, তখন ঐ শব্দসমূহকে নূরের দ্বারা বুঝিতে পারি—ইহা কাহার কালাম। কেননা আল্লাহর কালাম এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামের নূর আলাদা। অন্যদের কালামে এই দুইপ্রকার নূর থাকে না।

'তাযকেরাতুল-খলীল' নামক হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)এর জীবনীগ্রন্থে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের উদ্ধৃতি দিয়া লেখা হইয়াছে যে, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) যখন তাহার পঞ্চম বারের হজ্জে তওয়াফে-কুদূমের জন্য মসজিদে হারামে আসিলেন তখন আমি (মাওলানা জাফর আহমদ) হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর খলীফা ও কাশফওয়ালা মাওলানা মুহিব্বুদ্দীনের নিকট বসা ছিলাম। তিনি তখন দুরূদের কিতাব খুলিয়া অজীফা আদায় করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই সময় হরমে কে আসিয়াছেন যে হঠাৎ হরম নূরে ভরিয়া গেল? আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পর তওয়াফ শেষ করিয়া হযরত খলীল আহমদ ছাহেব (রহঃ) মাওলানার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন মাওলানা দাঁড়াইয়া গেলেন এবং হাসিমুখে বলিলেন, তাই তো বলি হরমে আজ কাহার আগমন ঘটিল? বহু হাদীসে বিভিন্নভাবে যিকিরের মজলিসের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, সর্বোত্তম 'রিবাত' হইল নামায ও যিকিরের মজলিস। কাফেরদের হামলা হইতে বাঁচাইবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়াকে রিবাত বলে।

(১৩) عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گذرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

(اخرجه احمد والترمذی وحسنه وذكره فی المشكوٰة برواية الترمذی وزاد فی الجامع

الصغير والبيهقي في الشعب ورقم له بالصحة وفى الباب عن جابر عند ابن ابى الدنيا والبزار وابي يعلى والحاكم وصححه والبيهقي في الدعوات كذا في الدر وفى الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عباس بلفظ مجالس العلم وبرواية الترمذى عن ابى هريرة بلفظ المساجد محل حلق الذكر وزاد الرتع. سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ اللهُ اَكْبَرُ،

(১৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়া যাও তখন সেখানে খুব বিচরণ কর। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগানসমূহ কি? এরশাদ ফরমাইলেন, যিকিরের হাল্‌কাসমূহ। (আহমদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উদ্দেশ্য হইল, কোন ভাগ্যবান লোক যদি ঐ সমস্ত মজলিস ও হাল্‌কাসমূহে পৌঁছিতে পারে, তবে উহাকে অতি গনীমত মনে করা উচিত। কেননা, এইগুলি দুনিয়াতেই জান্নাতের বাগান। 'খুব বিচরণ কর'—এই বাক্য দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত কার হইয়াছে যে, পশু যখন কোন শস্যক্ষেত বা বাগানে চরিতে লাগিয়া যায় তখন সরাইতে চাহিলেও সহজে সরে না। এমনকি মালিকের লাঠি ইত্যাদির আঘাত খাইতে থাকে তবুও মুখ ফিরায় না। তদ্রূপ যিকিরকারী ব্যক্তিকেও দুনিয়াবী চিন্তা–ফিকির ও বাধা–বিপত্তির কারণে যিকিরের মজলিস হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া উচিত নয়। উক্ত হাদীসে 'জান্নাতের বাগান' এইজন্য বলা হইয়াছে যে, জান্নাতে যেমন কোন আপদ–বিপদ হইবে না, তদ্রূপ যিকিরের মজলিসও আপদ–বিপদ হইতে মুক্ত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির দিলের জন্য শেফা, অর্থাৎ অন্তরে যেসব রোগ সৃষ্টি হয় যেমন অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় রোগের জন্য যিকির চিকিৎসা স্বরূপ। 'ফাওয়ায়েদ ফিস–সালাত' কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সব সময় যিকির করিতে থাকিলে মানুষ বিপদ–আপদ হইতে হেফাজতে থাকে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির করিতে হুকুম করিতেছি। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কাহারও পিছনে কোন দুশমন লাগিয়া গেল আর সে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া দূর্গে নিরাপদ আশ্রয় লইল। যিকিরকারী আল্লাহর সঙ্গী হয়। ইহা হইতে বড় ফায়দা আর কি হইবে যে, সে সমস্ত জগতের বাদশার সঙ্গী হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যিকিরের দ্বারা দিল খুলিয়া যায়, নূরানী হইয়া যায়। দিলের কঠোরতা দূর হইয়া

যায়। যিকিরের জাহেরী বাতেনী আরও অনেক ফায়দা আছে। ওলামায়ে কেরাম একশত পর্যন্ত ফায়দা লিখিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যখনই আপনি ঘরে প্রবেশ করেন অথবা ঘর হইতে বাহিরে আসেন অথবা দাঁড়াইয়া থাকেন অথবা বসিয়া থাকেন, ফেরেশতা আপনার জন্য দোয়া করে। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি চাহিলে ফেরেশতারা তোমার জন্যও দোয়া করিতে পারে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا .... رَحِيْمًا

(সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪১)

এই আয়াতে যেন এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়া তোমাদের যিকিরের উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ, তোমরা যত বেশী যিকির করিবে অপরদিক হইতে তত বেশী রহমত ও দোয়া হইবে।

(١٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَجِزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ اَنْ يُّكَابِدَهٗ وَبَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ يُّنْفِقَهٗ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ يُّجَاهِدَهٗ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو (یعنی نفلی صدقات) اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیئے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔

(رواه الطبرانی والبیهقی والبزار واللفظ له وفی سنده ابو یحیی القتات وبقیته محتج بهم فی الصحیح کذا فی الترغیب قلت هو من رواة البخاری فی الادب المفرد والترمذی وابی داؤد وابن ماجة وثقه ابن معین وضعفه آخرون وفی التقریب لین الحدیث وفی مجمع الزوائد رواه البزار والطبرانی وفیه القتات قد وثق وضعفه الجمهور وبقیة رجال البزار رجال الصحیح)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত্রে মেহনত করিতে অক্ষম, কৃপণতার কারণে মালও খরচ করিতে পারে না (অর্থাৎ নফল দান-খয়রাত করিতে পারে

না) এবং কাপুরুষতার কারণে জেহাদেও শরীক হইতে পারে না, তাহার জন্য উচিত, সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে।

(তারগীব ঃ বায্‌যার, তাবারানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নফল এবাদতের মধ্যে যত রকমের কমি হইয়া থাকে, বেশী বেশী আল্লাহর যিকির উহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে। হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর যিকির ঈমানের আলামত, মোনাফেকী হইতে পবিত্রতা, শয়তান হইতে হেফাজত ও জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষার উপায়। এই সমস্ত উপকারিতার কারণেই আল্লাহর যিকিরকে অনেক এবাদত হইতে উত্তম বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে ইহার বিশেষ দখল রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, শয়তান হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান অপারগ ও অপদস্থ হইয়া পিছনে হটিয়া যায়। আবার যখন গাফেল হইয়া যায় তখন পুনরায় কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। এইজন্যই সূফিয়ায়ে কেরাম বেশী বেশী যিকির করাইয়া থাকেন। যাহাতে দিলের মধ্যে তাহার কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ না থাকে এবং দিল এমন মজবুত হইয়া যায় যে, শয়তানের মোকাবেলা করিতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভের বরকতে সাহাবায়ে কেরামের কলবের শক্তি এত উন্নত ছিল যে, বর্তমান যমানার মত যিকিরের যরব লাগাইবার তাহাদের প্রয়োজন হইত না। হুযূরের যমানা হইতে যতই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই কলবের জন্য শক্তিবর্ধক ঔষধের প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে। এখন মানুষের দিল এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক চিকিৎসা করিয়াও ঐ শক্তি হাসিল হয় না। তবুও যতটুকু হাসিল হয় উহাকেই গনীমত মনে করিতে হইবে। কারণ, মহামারী যত কমাইয়া আনা যায় ততই ভাল।

এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শয়তান মানুষের অন্তরে কিভাবে কুমন্ত্রণা দেয় উহা জানিবার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। তিনি দেখিলেন, দিলের বাম পার্শ্বে কাঁধের পিছনে মশার আকৃতি নিয়া শয়তান বসিয়া আছে। মুখে লম্বা একটি শুড় উহাকে সুইয়ের মত দিলের দিকে লইয়া যায়। যখন সে দিলকে যিকির অবস্থায় পায় তাড়াতাড়ি শুড়টাকে টানিয়া লয়। আর যখন দিলকে গাফেল পায় তখন শুড়ের দ্বারা কুমন্ত্রণা ও গোনাহের বিষ ইনজেকশনের মত দিলের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এই বিষয়টি এক হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে, শয়তান

তাহার নাকের অগ্রভাগ মানুষের দিলের উপর রাখিয়া বসিয়া থাকে, যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন বেইজ্জত হইয়া পিছনে সরিয়া যায়। আর যখন সে গাফেল হয় তখন তাহার দিলকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

(১৫) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔

(رواہ احمد و ابو یعلی و ابن حبان والحاکم فی صحیحہ وقال صحیح الاسناد وروی عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّكُمْ مُرَاؤُنَ رواہ الطبرانی ورواہ البیہقی عن ابی الجوزاء مرسلاً کذا فی الترغیب والمقاصد الحسنۃ للسخاوی وھکذا فی الدر المنثور للسیوطی الا انہ عزا حدیث ابی الجوزاء الی عبد اللہ بن احمد فی زوائد الزھد وعزاہ فی الجامع الصغیر الی سعید بن منصور فی سننہ والبیہقی فی الشعب ورقم لہ بالضعف وذکر فی الجامع الصغیر ایضا بروایۃ الطبرانی عن ابن عباس مسندا ورقم لہ بالضعف وعزا حدیث ابی سعید الی احمد وابی یعلی فی مسندہ وابن حبان والحاکم والبیہقی فی الشعب ورقم لہ بالحسن)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর যিকির এত বেশী করিতে থাক যে, লোকেরা পাগল বলে।

(তারগীব ঃ আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

আরেক হাদীসে আছে, এমনভাবে যিকির করিতে থাক যে, মোনাফেকরা তোমাকে রিয়াকার বলে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, মোনাফেক অথবা অজ্ঞলোকদের রিয়াকার বা পাগল বলার কারণে যিকিরের মত এত বড় দৌলত ছাড়িয়া দেওয়া চাই না ; বরং এত বেশী পরিমাণে ও গুরুত্ব সহকারে যিকির করা উচিত, যেন এই সমস্ত লোক পাগল মনে করিয়া পিছু ছাড়িয়া দেয়। আর পাগল তখনই বলা হয় যখন খুব বেশী পরিমানে এবং জোরে জোরে যিকির করা হয়। আস্তে যিকির করিলে কেহ পাগল বলে না।

ইবনে কাসীর (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যে কোন জিনিস ফরজ করিয়াছেন উহার একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং ওজর হইলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করেন নাই। আবার জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় ইহার জন্য কোন ওজর-আপত্তিও গ্রহণ করেন নাই। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের যিকির খুব বেশী করিয়া কর। (সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪১) অর্থাৎ, রাত্রে, দিনে, মাঠে-ময়দানে, নদী-বন্দরে, ঘরে, সফরে, অভাবে, সচ্ছল অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, আস্তে, জোরে এবং সর্ব অবস্থায়।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মুনাব্বিহাত' কিতাবে লিখিয়াছেন, কুরআন পাকের আয়াত وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا সম্পর্কে হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, উহা স্বর্ণের একটি পাত ছিল। যাহাতে সাতটি লাইন লেখা ছিল ঃ

(১) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও কেমন করিয়া হাসে।

(২) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়া একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে এই বিশ্বাস রাখিয়াও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(৩) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে তকদীরকে বিশ্বাস করে অথচ কোন জিনিস হারাইয়া গেলে আফসোস করে।

(৪) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে আখেরাতের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে তবুও সে ধন-সম্পদ জমা করে।

(৫) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে জাহান্নামের আগুনকে বিশ্বাস করে তবুও সে গোনাহে লিপ্ত হয়।

(৬) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহকে জানে তবুও সে অন্যের আলোচনা করে।

(৭) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে জান্নাতের খবর রাখে, তবুও সে দুনিয়ার কোন জিনিসের মধ্যে শান্তি লাভ করে।

কোন কোন বর্ণনায় আরেকটি লাইন রহিয়াছে যে, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে শয়তানকে দুশমন বলিয়া জানে তবুও তাহার আনুগত্য করে।

হাফেজ (রহঃ) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত জিবরাঈল

(আঃ) আমাকে যিকিরের এত বেশী তাকিদ করিয়াছেন যে, আমার মনে হইতেছিল যিকির ছাড়া কোন কিছুতেই কাজ হইবে না। এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, যত বেশী যিকির করা সম্ভব হয় উহাতে কোন রকম ত্রুটি করা চাই না। লোকদের পাগল অথবা রিয়াকার বলার কারণে যিকির ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে নিজেরই ক্ষতি। সূফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ইহাও শয়তানের একটি ধোকা যে, শয়তান প্রথম প্রথম যিকির হইতে মানুষকে এই বাহানায় ফিরাইয়া রাখে যে, লোকে দেখিয়া ফেলিবে, অথবা কেউ দেখিয়া ফেলিলে কি বলিবে? ইত্যাদি।

তারপর যিকির হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে শয়তানের জন্য ইহা একটি স্থায়ী মাধ্যম ও বাহানা মিলিয়া যায়। এইজন্য ইহা জরুরী যে, দেখানোর নিয়তে কোন আমল করিবে না। কিন্তু যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, দেখুক উহার পরওয়া করিবে না। আর এই কারণে আমল ছাড়িয়া দেওয়াও উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ জুল–বেজাদাইন (রাযিঃ) একজন সাহাবী যিনি শৈশবে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। চাচার কাছে থাকিতেন। চাচা অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাকে লালন–পালন করিতেন। ঘরের কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। চাচা জানিতে পারিয়া রাগান্বিত হইয়া উলঙ্গ করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মা'ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও মায়ের মন—উলঙ্গ দেখিয়া তাহাকে একটি মোটা চাদর দিয়া দিলেন। তিনি চাদরটি দুইভাগ করিয়া নিচে উপরে পরিয়া নিলেন। অতঃপর মদীনা শরীফে হাজির হইলেন। এখানে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় পড়িয়া থাকিতেন এবং অত্যধিক পরিমাণে ও উচ্চস্বরে যিকির করিতেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এইভাবে উচ্চস্বরে যিকির করে ; লোকটা কি রিয়াকার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, সে কোমলপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তবুক যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দেখিলেন, রাত্রে কবরসমূহের নিকট বাতি জ্বলিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কবরের মধ্যে নামিয়াছেন এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমরকে বলিতেছেন, লও, তোমাদের ভাইয়ের লাশ আমার হাতে উঠাইয়া দাও। তাঁহারা উঠাইয়া দিলেন। দাফন শেষ হইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আয় আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির উপর রাজী, আপনিও রাজী হইয়া যান। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন,

এই দৃশ্য দেখিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা হইল, হায় এই লাশটি যদি আমার হইত!

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফোযায়ল ইবনে এয়াজ (রহঃ) বলেন, কোন আমল এইজন্য না করা যে, মানুষ দেখিবে—ইহাও রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে আছে, কোন কোন মানুষ যিকিরের চাবিস্বরূপ। তাহাদেরকে দেখিলেই আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়। আরেক হাদীসে আছে, ঐ সমস্ত লোক আল্লাহর ওলী, যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তাহারা—যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয়। এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যাহাকে দেখিলে আল্লাহ স্মরণে আসে, যাহার কথাবার্তা শুনিলে এলেম বাড়িয়া যায় এবং যাহার আমল দেখিলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এই অবস্থা তখনই হাসিল হইতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে যিকিরে অভ্যস্ত হয়।

আর যে ব্যক্তির নিজেরই যিকিরের তওফীক হয় না, তাহাকে দেখিয়া কাহারো কি আল্লাহর কথা স্মরণ হইতে পারে? কোন কোন লোক উচ্চস্বরে যিকির করাকে বেদয়াত ও নাজায়েয বলিয়া থাকে। হাদীসের উপর নজর কম থাকার কারণেই তাহাদের এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব (রহঃ) 'ছাবাহাতুল–ফিক্‌র' নামক একখানি কিতাব এই বিষয়ের উপর লিখিয়াছেন। যাহাতে এরূপ প্রায় ৫০টি হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা উচ্চস্বরে যিকির করা প্রমাণিত হয়। তবে জরুরী বিষয় হইল শর্তাদির প্রতি খেয়াল রাখিয়া আপন সীমার মধ্যে থাকিবে যাহাতে অন্যের কষ্টের কারণ না হয়।

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالشَّابُّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہٗ اپنے (رحمت کے) سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک عادل بادشاہ. دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو تیسرے

تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَ
تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ
اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ
مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ
خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ۔

وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔
چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے
محبت ہو اُسی پر اُن کا اجتماع ہو اُسی پر
جدائی، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب
والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور
وہ کہدے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے، چھٹے
وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے
کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو
بہنے لگیں۔

(رواه البخاري ومسلم وغيرهما كذا في الترغيب والمشكوة وفي الجامع الصغير
برواية مسلم عن ابي هريرة وابي سعيد معا وذكر عدة طرقه اخرى)

(১৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সাত প্রকার মানুষ এমন আছে, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতের ছায়াতলে এমন দিনে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া হইবে না।

এক. ন্যায়বিচারক বাদশাহ। দুই. ঐ যুবক, যে যৌবনে আল্লাহর এবাদত করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যাহার দিল মসজিদেই আটকিয়া থাকে। চার. ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করিয়াছে, আল্লাহর জন্যই তাহারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই তাহারা পৃথক হয়। পাঁচ. ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চবংশীয় সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ছয়. ঐ ব্যক্তি, যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার অন্য হাতও টের পায় না। সাত. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে এবং তাহার দুই চোখ দিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে।

(তারগীব, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ ‘পানি গড়াইয়া পড়া’র অর্থ হইল, জানিয়া শুনিয়া নিজের কৃত গোনাহসমূহ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, আবেগের আতিশয্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) এক বুযুর্গের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিতেন, আমার কোন্ দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবূল হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কিভাবে বুঝিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যে দোয়াতে আমার শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যায়, দিল কাঁপিতে থাকে, চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে থাকে আমার সেই দোয়া কবূল হয়। যেই সাতজনের কথা হাদীসে বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন হইল, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর কাঁদিতে থাকে—এই ব্যক্তির মধ্যে দুইটি গুণ জমা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, এখলাস। কেননা, সে নির্জনে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়াছে। আর দ্বিতীয়টি হইল, আল্লাহর ভয় বা আগ্রহ। উভয়টির কারণেই কান্না আসে আর উভয়টিই মহৎ গুণ। (কবি বলেন ঃ)

ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ٭ ہماری نیند ہے محوِ خیالِ یار ہو جانا

অর্থাৎ, প্রিয়জনের স্মরণে সারা রাত্র কান্নাকাটি করাই আমার কাজ। আর প্রিয়জনের ধ্যানে বিভোর হইয়া যাওয়াই আমার ঘুম।

সুফিয়া কেরাম হাদীসে বর্ণিত 'খালিয়ান'-এর দুই অর্থ লিখিয়াছেন, এক অর্থ নির্জনে আল্লাহর যিকির করা। আরেক অর্থ হইল গায়রুল্লাহ হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করা। আসল নির্জনতা ইহাই। এইজন্য সবচেয়ে উত্তম হইল উভয় নির্জনতা সহ যিকির করা। তবে যদি কেহ মজলিসে বসিয়া গায়রুল্লাহ হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করে এবং কাঁদিতে থাকে তবে সেও উক্ত ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা, তাহার জন্য মজলিস ও নির্জনতা উভয়ই সমান। যেহেতু তাহার দিল মজলিস তো দূরের কথা সমস্ত গায়রুল্লাহ হইতে একেবারে খালি, কাজেই মজলিস তাহার মোটেও ক্ষতির কারণ হইবে না। আল্লাহর স্মরণে অথবা তাহার ভয়ে কান্নাকাটি করা অনেক বড় নেয়ামত। বড় ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহতায়ালা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিবে, স্তন হইতে বাহির করা দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে জাহান্নামে যাইতে পারে না। অর্থাৎ স্তন হইতে দুধ বাহির করার পর পুনরায় প্রবেশ করানো যেমন অসম্ভব, তাহার জন্য জাহান্নামে যাওয়াও এমন অসম্ভব। আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এমন কান্নাকাটি করে যে, চোখের কিছু পানি জমিনে পড়িয়া যায়, কেয়ামতের দিন তাহার আজাব হইবে না। এক হাদীসে আছে, দুই প্রকার চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম। এক প্রকার

হইল, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে আর দ্বিতীয় প্রকার হইল, যে চোখ কাফেরদের অনিষ্ট হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের জন্য জাগিয়াছে।

আরেক হাদীসে আছে, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদিয়াছে উহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় জাগিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ নাজায়েয জিনিসের উপর (যেমন বেগানা মহিলা)র উপর নজর করা হইতে বিরত রহিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম।

এক হাদীসে আছে, নির্জনে আল্লাহর যিকিরকারী এইরূপ যেন কাফেরদের মোকাবেলায় সে একা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

(١٧) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِیْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ اُولُوا الْاَلْبَابِ قَالُوْا اَیَّ اُولِی الْاَلْبَابِ تُرِيْدُ قَالَ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عُقِدَ لَهُمْ لِوَاءٌ فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَائَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اُدْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

(اخرجه الاصبهانی فی الترغیب کذا فی الدر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مراد ہیں. جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے) اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ.

(১৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান লোক কাহারা? উত্তরে বলা হইবে, যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিকির করিত। আর আসমান-জমিনের সৃষ্টি-রহস্যের

মধ্যে চিন্তা–ফিকির করিত। আর বলিত, আয় আল্লাহ! আপনি এই সবকিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আপনার তসবীহ পড়ি। আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া দিন। অতঃপর এই সমস্ত লোকের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈয়ার করা হইবে এবং তাহারা সেই ঝাণ্ডার পিছনে চলিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও তোমরা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ আসমান–জমিনের সৃষ্টি–রহস্যের মধ্যে চিন্তা করে অর্থাৎ, আল্লাহর কুদরতের দৃশ্যাবলী ও তাঁহার হিকমতের আশ্চর্যজনক বিষয়গুলির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে। ফলে, আল্লাহর মারেফত (অর্থাৎ পরিচয়) মজবূত হইয়া যায়।

الٰہی یہ عالم ہے گلزار تیرا

"হে আল্লাহ! এই জগত হইল তোমার কুদরতের নিদর্শনে ভরপুর একটি বাগান।"

ইবনে আবিদ্–দুনিয়া একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি জামায়াতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই চুপচাপ বসিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কী চিন্তা করিতেছ? তাঁহারা আরজ করিলেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাঁ, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কেননা, তিনি ধারণার অতীত। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্য কথা আমাকে শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ কথাটি এমন ছিল যাহা আশ্চর্য নহে। একবার তিনি রাত্রে তশরীফ আনিলেন এবং আমার বিছানায় আমার লেপের নিচে শুইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি বলিতে লাগিলেন, আমাকে ছাড়, আমি আমার পরোয়ারদিগারের এবাদত করিব। এই কথা বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। অজু করিয়া নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন এবং নামাযের মধ্যে এত বেশী কাঁদিতে লাগিলেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার সীনা মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকূতেও এইভাবে কাঁদিলেন। সেজদাতেও এইভাবে কাঁদিলেন। সারারাত্র তিনি এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দিলেন। ফজরের সময় হযরত বেলাল (রাযিঃ)

আসিয়া ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে তো আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিয়াছেন, তবু আপনি এত বেশী কাঁদিলেন কেন? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি আরও এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কেন কাঁদিব না ; আজই তো আমার উপর এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে ঃ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ... فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০)

অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে অথচ চিন্তা-ফিকির করে না। আমের ইবনে আবদে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি একজন নয়, দুইজন নয়, তিনজন নয়, বরং আরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ঈমানের রোশনী ও ঈমানের নূর হইল চিন্তা-ফিকির। হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ছাদের উপর শুইয়া আসমান ও তারকাসমূহ দেখিতেছিল। অতঃপর বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমাদের পয়দা করনেওয়ালা কেহ অবশ্যই আছেন ; আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পড়িল এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা সারারাত্র এবাদত-বন্দেগী হইতে উত্তম। হযরত আবূ দারদা ও হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এক মুহূর্ত চিন্তা করা আশি বৎসরের এবাদত হইতে উত্তম। উম্মে দারদা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ)এর সর্বোত্তম এবাদত কি ছিল? তিনি বলিলেন, চিন্তা-ফিকির করা। হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ)এর সূত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা যাট বৎসরের এবাদত হইতে উত্তম। কিন্তু এই সকল বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, এবাদতের আর প্রয়োজন নাই। বরং প্রত্যেক এবাদত নিজ নিজ জায়গায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব যে পর্যায়েরই হউক, উহা ত্যাগ করিলে সেই পর্যায়ের শাস্তি ও তিরস্কার হইবে।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, চিন্তা-ফিকিরকে উত্তম এবাদত এইজন্য বলা হইয়াছে যে, চিন্তা-ফিকিরের মধ্যে যিকিরের দিকটা তো

আছেই, অতিরিক্ত আরও দুইটি জিনিস রহিয়াছে। একটি হইল, আল্লাহর মারেফাত। কেননা, মারেফাতের চাবিকাঠিই হইল চিন্তা–ফিকির। দ্বিতীয় হইল—আল্লাহর মহব্বত। যাহা ফিকিরের দ্বারাই হাসিল হয়। এই চিন্তা–ফিকিরকেই সূফীগণ 'মোরাকাবা' বলেন। বহু রেওয়ায়েত দ্বারা ইহার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

মুসনাদে আবু ইয়ালা গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, যিক্‌রে খফী (অর্থাৎ গোপনে যিকির) যাহা ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহার সওয়াব সত্তরগুণ বেশী। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলূককে হিসাবের জন্য জমা করিবেন এবং কেরামান–কাতেবীন আমলনামা লইয়া হাজির হইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, অমুক বান্দার আমলসমূহ দেখ, কোন কিছু বাকী রহিয়াছে কিনা? তাহারা আরজ করিবে, আমরা সবকিছু লিখিয়াছি এবং হেফাজত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার নিকট তাহার এমন নেকী রহিয়াছে যাহা তোমাদের জানা নাই। উহা হইল যিক্‌রে খফী। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে, যে যিকির ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহা ঐ যিকির হইতে যাহা তাহারা শুনিতে পায় সত্তরগুণ বেশী ফযীলত রাখে। কবি বলেন ঃ

میانِ عاشق و معشوق رمزے است کراماً کاتبین راہم خبر نیست

"প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে, যাহা ফেরেশতারাও জানে না।"

কত ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহারা এক মুহূর্তও যিকির হইতে গাফেল হয় না। তাহারা জাহেরী এবাদতের সওয়াব তো পাইবেনই।

উপরন্তু সর্বক্ষণ যিকির–ফিকিরের কারণে তাহারা সত্তরগুণ বেশী সওয়াব পাইবেন। আর ইহাই ঐ জিনিস যাহা শয়তানকে পেরেশান করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত জুনাইদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি একবার শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের সামনে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে তোর কি লজ্জা হয় না? শয়তান বলিল, ইহারা কি মানুষ ; মানুষ তো উহারা, যাহারা শোনিজিয়া'র মসজিদে বসা আছেন। যাহারা আমার শরীরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, আমার কলিজাকে পুড়িয়া কাবাব করিয়া দিয়াছে। হযরত জুনাইদ (রহঃ) বলেন, আমি শোনিজিয়ার

মসজিদে গিয়া দেখিলাম কয়েকজন বুযুর্গ হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মোরাকাবায় মশগুল রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, খবীস শয়তানের কথায় কখনও ধোকায় পড়িও না।

মাসূহী (রহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি শয়তানকে উলঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে এইভাবে উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতে তোর কি লজ্জা হয় না? সে বলিতে লাগিল, খোদার কসম, ইহারা তো মানুষ নয়। যদি মানুষ হইত তবে ইহাদের সহিত আমি এমনভাবে খেলা করিতাম না, যেমন বাচ্চারা ফুটবল নিয়া খেলা করে। মানুষ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আমাকে অসুস্থ করিয়া দিয়াছে। এই কথা বলিয়া সে সূফিয়ায়ে কেরামের জামাতের দিকে ইশারা করিল।

হযরত আবু সাঈদ খায্যার (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, শয়তান আমার উপর হামলা করিয়াছে। আমি তাহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সে কোন পরওয়া করিল না। এমন সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, শয়তান ইহাকে ভয় করে না ; সে অন্তরের নূরকে ভয় করে ।

হযরত সা'দ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম যিকির হইল জিক্‌রে খফী। আর সর্বোত্তম রিযিক হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। হযরত উবাদা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন। উত্তম যিকির হইল যিকিরে খফি আর উত্তম রিযিক হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। (অর্থাৎ এত কমও নয় যাহা দ্বারা চলাই মুশকিল আবার এত বেশীও নয় যাহার কারণে অহংকার পয়দা হয় ও অপকর্ম হয়।) ইবনে হিব্বান ও আবু ইয়ালা এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে 'জিক্‌রে খামেল' দ্বারা স্মরণ কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জিক্‌রে খামেল কি? এরশাদ ফরমাইলেন, গোপন যিকির।

এইসব বর্ণনা দ্বারা জিকরে খফীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। অথচ পূর্বে যিকরে জলীর প্রশংসা করা হইয়াছে। আসলে দুইটাই পছন্দনীয়। কাহার জন্য কোন্‌টি কখন বেশী উপকারী তাহা অবস্থাভেদে শায়খে কামেল ঠিক করিয়া দিবেন।

(১৮) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَعْضِ اَبْيَاتِهٖ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَجَافُّ الْجِلْدِ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَاٰهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مَنْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ (اخرجه ابن جرير والطبرانی وابن مردويه كذا فی الدر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ میں تھے کہ آیت واصبر نفسک نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور اقدس اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں (کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف اُن کے پاس ہے) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دیکھا تو اُن کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے اُن کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔

(১৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ নাযিল হইল। যাহার অর্থ হইল, হে নবী! আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের নিকট বসিবার পাবন্দ করুন, যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদের তালাশে বাহির হইলেন এবং একদল লোককে দেখিলেন, তাহারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে, যাহাদের চুল এলোমেলো, শরীরের চামড়া শুকনা, একটি মাত্র কাপড় পরণে (অর্থাৎ শুধু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায়)। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিলেন তখন তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আমাকে তাহাদের সহিত বসিবার হুকুম করিয়াছেন। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে তালাশ করিয়া মসজিদের শেষ অংশে উপবিষ্ট আল্লাহর যিকিরে মশগুল পাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার জীবদ্দশায়ই এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমাদের সাথেই আমার জীবন, তোমাদের সাথেই মরণ অর্থাৎ তোমরাই আমার জীবন-মরণের সাথী ও বন্ধু।

এক হাদীসে আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এবং আরও অন্যান্য সাহাবীদের এক জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলে সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাঁহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি দেখিতে পাইলাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজেল হইতেছে। তখন আমারও দিল চাহিল তোমাদের সাথে শরীক হই। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহকে ডাকে' বলিয়া কুরআনে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 'যিকিরকারীদের জামাত'। এই ধরনের আয়াত হইতেই সুফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন যে, পীর মাশায়েখগণকেও মুরিদানদের নিকট বসা উচিত। কেননা ইহাতে মুরিদানকে ফায়দা পৌঁছানো ছাড়াও সব ধরনের লোকের সহিত মেলামেশার কারণে শায়খের নফসের জন্যও পূর্ণ মুজাহাদা হইবে। নানা প্রকার বদ আখলাক লোকদের অশোভনীয় আচরণ সহ্য করার ফলে শায়খের নফসের মধ্যে আনুগত্য ও বিনয়ভাব পয়দা হইবে। ইহা ছাড়াও অনেকগুলি দিলের একত্রিত হওয়া আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই কারণেই শরীয়তে জামাতের সহিত নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বড় কারণ যে, আরাফার ময়দানে সমস্ত হাজী সাহেবানদের একই অবস্থায় একই ময়দানে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করা হয়। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব ফযীলত আল্লাহর যিকিরকারীগণকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু হাদীসে ইহার প্রতি উৎসাহিত

করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গাফেলদের দলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ সময় সে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেও হাদীসে বহু ফযীলত আসিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের জন্য আরও বেশী যত্নসহকারে ও মনোযোগের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে মশগুল থাকা চাই। যাহাতে উহার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। হাদীসে আছে, গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করিল, সে যেন জিহাদের ময়দানে পলায়নকারী দলের মধ্য হইতে অটল থাকিয়া একাকী মোকাবেলা করিল। এক হাদীসে আসিয়াছে যে, গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী ঐ ব্যক্তির মত যে পলায়নকারীদের পক্ষ হইতে কাফেরদের মোকাবিলা করে। অনুরূপভাবে সে যেন অন্ধকার ঘরে বাতিস্বরূপ এবং পাতাবিহীন বৃক্ষসমূহের মধ্যে সবুজ পাতাভরা একটি বৃক্ষস্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তাহার ঘর দেখাইয়া দিবেন। আর সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর সমপরিমাণ মাগফেরাত করিয়া দিবেন। গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও আল্লাহর যিকির করা হইলে এইসব ফযীলত পাওয়া যাইবে। নতুবা এইরূপ মজলিসে শরীক হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাদীসে আছে, বন্ধুত্বপূর্ণ মজলিস হইতে নিজেকে বাঁচাও। আজিজী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, ঐসব মজলিস যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের আলোচনা বেশী হয় বাজে কথাবার্তা ও বেহুদা কাজ কর্ম হয়। এক বুযুর্গ বলেন, এক বার আমি বাজারে যাইতেছিলাম। আমার সাথে একটি হাবশী বাঁদী ছিল। তাহাকে আমি বাজারে এক জায়গায় এই মনে করিয়া বসাইয়া দিলাম যে, ফিরিবার সময় তাহাকে নিয়া যাইব। কিন্তু সেইখান হইতে সে চলিয়া আসিল। ফিরিবার সময় আমি তাহাকে না পাইয়া রাগান্বিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সেই বাঁদী আসিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! রাগান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিবেন না ; আপনি আমাকে এমনসব লোকের কাছে বসাইয়া গিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল ছিল। আমার ভয় হইল যে, নাজানি আল্লাহর আজাব আসিয়া পড়ে এবং তাহারা মাটিতে ধসিয়া যায় আর আমিও তাহাদের সহিত আজাবে ধসিয়া যাই।

(١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر۔

اُذْكُرْنِىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً اَكْفِكَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا (اخرجه احمد كذا فى الدر)

میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا (ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا)

(১৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এরশাদ নকল করিতেছেন যে, তুমি ফজর ও আছর নামাযের পর সামান্য সময় আমার যিকির কর। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া দিব। (আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির করিতে থাক ; ইহা তোমার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সহায়ক হইবে।)

(দুররে মানসূর ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ আখেরাতের জন্য না হউক দুনিয়ার জন্যই আমরা কতই না চেষ্টা করিয়া থাকি। এমন কী ক্ষতি হইয়া যাইবে যদি ফজর ও আছরের পর সামান্য সময় আল্লাহর যিকিরেও মশগুল থাকি ! বহু হাদীসে এই দুই সময় যিকির করার অধিক পরিমাণে ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই যেহেতু যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার ওয়াদা করিতেছেন, কাজেই আর কিসের জরুরত বাকী থাকিতে পারে।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যাহারা ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে তাহাদের সাথে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকিরকারীদের সঙ্গে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত পড়িয়া সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকে অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, সে একটি কামেল হজ্জ ও একটি কামেল ওমরার ছওয়াব পাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক প্রিয়। এইসব কারণেই ফজর ও আছর নামাযের পর অজীফা পড়া হইয়া থাকে। সূফিয়ায়ে কেরাম এই দুই ওয়াক্তকে অজীফা আদায়ের জন্য খুবই গুরুত্ব দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ফজরের পরের সময়টিকে ফকীহগণও খুব

গুরুত্ব দিয়াছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কথা বলা মকরূহ। হানাফী মাজহাব মতে 'দোররে মোখতার' কিতাবের লেখকও এই সময় কথা বলা মকরূহ লিখিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ঐ অবস্থায় বসা থাকিয়া কোন কথা বলার আগে এই দোয়া দশবার পড়িবে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হইবে, দশটি গোনাহ মাফ হইবে, জান্নাতে দশগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সমস্ত দিন শয়তান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু হইতে হেফাজত থাকিবে। দোয়া এই ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক। তাঁহার কোন শরীক নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মরণ দান করেন। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের পর এই এস্তেগফার তিনবার পড়িবে, তাহার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া যাইবে। এস্তেগফার এই ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতেছি ; তওবা করিতেছি।

(২০) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دُنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دُور ہے) مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

(رواه الترمذی و ابن ماجة والبیهقی وقال الترمذی حدیث حسن کذا فی الترغیب وذکره فی الجامع الصغیر بروایة ابن ماجة ورقم له بالحسن وذکره فی مجمع الزوائد بروایة

الطبرانی فی الاوسط عن ابن مسعود وکذا السیوطی فی الجامع الصغیر وذکرہ بروایۃ البزار عن ابن مسعود بلفظ اِلَّا اَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْيًا عَنْ مُّنْكَرٍ اَوْ ذِكْرَ اللهِ ورقم له بالصحة،

(২০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর যিকির ও উহার নিকটবর্তী জিনিসসমূহ এবং আলেম ও দ্বীনের তালেবে-এলেম ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে দূরে)। (তারগীব ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'উহার নিকটবর্তী হওয়া'র অর্থ যিকিরের নিকটবর্তী হওয়াও হইতে পারে। তখন যিকিরের সহায়ক ও সাহায্যকারী জিনিসসমূহ উদ্দেশ্য হইবে। যেমন জরুরত পরিমাণ খানা-পিনা ও জীবন ধারণের জন্য জরুরী আসবাবপত্র। এমতাবস্থায় এবাদতের সাহায্যকারী যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর যিকিরের মধ্যে শামিল থাকিবে।

'উহার নিকটবর্তী হওয়া'র আরেক অর্থ আল্লাহর নৈকট্যও হইতে পারে। এই ব্যাখ্যা হিসাবে যাবতীয় এবাদতসমূহ ইহার মধ্যে শামেল হইবে আর আল্লাহর যিকির দ্বারা তখন বিশেষ যিকির উদ্দেশ্য হইবে। উভয় ব্যাখ্যা অনুসারে এলেম ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। প্রথম ব্যাখ্যায় এই হিসাবে যে, এলেম আল্লাহর যিকিরের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। যেমন কথা আছে ঃ "بے علم نتواں خدا را شناخت" "এলেম ছাড়া আল্লাহকে চিনা যায় না। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এই হিসাবে যে, এলেমের চাইতে বড় এবাদত আর কি হইতে পারে! কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলেম ও তালেবে-এলেমকে ভিন্নভাবে উহার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এলেম অনেক বড় দৌলত।

এক হাদীসে আছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এলেম শিক্ষা করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল। আর উহার তলবও তালাশে কোথাও যাওয়া এবাদত। আর উহা মুখস্থ করা এইরূপ যেমন তছবীহ পড়া। আর উহা নিয়া চিন্তা-গবেষণা করা জিহাদের শামিল। আর উহা পাঠ করা করা দান-খয়রাত সমতুল্য। যোগ্য পাত্রে উহা দান করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা, এলেম জায়েয নাজায়েয চিনার উপায় এবং জান্নাতে পৌঁছার জন্য পথের নিশানা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সান্ত্বনাদানকারী এবং সফরের সাথী। কেননা, কিতাব দেখার দ্বারা উভয় কাজ হাছিল হয়, এমনিভাবে একাকী অবস্থায় আলাপ-আলোচনাকারী, সুখে-দুঃখে দলীল স্বরূপ। দুশমনের বিরুদ্ধে, দোস্ত-আহবাবের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। ইহার

কারণে আল্লাহ তায়ালা ওলামায়ে কেরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। কেননা তাহারা কল্যাণের দিকে আহবানকারী হন এবং তাহারা এইরূপ ইমাম ও নেতা হন যে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাহাদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা হয়, তাহাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ফেরেশতারা তাহাদের সহিত দোস্তি করার আগ্রহ রাখে, বরকত হাছিল করার জন্য অথবা মহব্বতের পরিচয় স্বরূপ আপন ডানা তাহাদের উপর মোছন করে। দুনিয়ার আদ্র শুষ্ক প্রত্যেক বস্তু তাহাদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, বিষাক্ত জানোয়ার, সাপ ইত্যাদি পর্যন্ত তাহাদের গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। আর এইসব ফযীলত এইজন্য যে, এলেম হইল অন্তরের নূর, চোখের আলো। এলেমের কারণেই বান্দা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। দুনিঁয়া ও আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল করিয়া লয়। এলেম অধ্যয়ন করা রোযা সমতুল্য। উহা ইয়াদ করা তাহাজ্জুদের সমতুল্য। উহা দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া থাকে। এলেম দ্বারাই হালাল-হারাম জানা যায়। এলেম হইল আমলের ইমাম আর আমল হইল উহার অনুগামী। নেক লোকদেরকেই এলেমের এলহাম করা হয়। হতভাগারা উহা হইতে মাহরূম থাকিয়া যায়।

কেহ কেহ এই হাদীস সম্পর্কে কিছুটা আপত্তি করিলেও ইহাতে বর্ণিত ফযীলতসমূহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া এলেমের আরও অনেক ফযীলত হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উপরোক্ত হাদীস শরীফে আলেম ও তালেবে-এলেমকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে 'আলওয়াবিলুছ ছাইয়্যিব' নামে আরবী ভাষায় একখানি কিতাব লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিকিরের ফায়দা ও উপকারিতা একশতেরও বেশী। তন্মধ্য হইতে ঊনাশিটি ফায়দা নম্বর সহ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ক্রমিক নম্বরসহ এইগুলি এইখানে উল্লেখ করিতেছি। অনেক ক্ষেত্রে একটি ফায়দার ভিতরে একাধিক ফায়দা রহিয়াছে বিধায় এই ঊনআশিটি ফায়দার ভিতর যিকিরের একশতেরও বেশী ফায়দা আসিয়া গিয়াছে।

যিকিরের একশত ফায়দা

(১) যিকির শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

(৩) মনের দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দেয়।

(৪) মনে আনন্দ ও খুশী আনয়ন করে।

(৫) শরীরে ও অন্তরে শক্তি যোগায়।

(৬) চেহারা ও অন্তরকে নূরানী করে।

(৭) রিযিক টানিয়া আনে।

(৮) যিকিরকারীকে প্রভাব ও মাধুর্যের পোশাক পরানো হয়। তাহার দৃষ্টিপাতের কারণে মনে ভয়ও জাগে আবার তাহার প্রতি চাহিলে মনে স্বাদ ও মধুরতা অনুভব হয়।

(৯) আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে। আর মহব্বতই হইল ইসলামের রূহ দ্বীনের কেন্দ্র এবং সৌভাগ্য ও নাজাতের আসল উপায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বত পাইতে চায় সে যেন বেশী বেশী তাহার যিকির করে। পড়াশুনা ও বারবার আলোচনা যেমন ইলম হাসিলের দরজা স্বরূপ তদ্রুপ আল্লাহর যিকিরও তাহার মহব্বতের দরজাস্বরূপ।

(১০) যিকিরের দ্বারা মোরাকাবা নছীব হয়। যাহা যিকিরকারীকে এহছানের স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। এই স্তরে পৌঁছিতে পারিলে বান্দার এমন এবাদত নছীব হয় যেমন সে আল্লাহকে দেখিতে পাইতেছে। (এই এহছানের ছেফত অর্জন করাই সূফীগণের জীবনের চরম উদ্দেশ্য।)

(১১) আল্লাহর দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে ফলে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য আশ্রয়স্থল হইয়া যান এবং যাবতীয় বিপদ আপদে সে একমাত্র তাঁহারই দিকে মনোযোগী হইয়া যায়।

(১২) আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যিকির যতবেশী হয় ততই নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যিকির হইতে যেই পরিমাণ গাফলতি করা হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরত্ব পয়দা হইবে।

(১৩) আল্লাহর মারেফতের দরজা খুলিয়া যায়।

(১৪) বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বড়ত্ব পয়দা করে এবং আল্লাহ সবসময় বান্দার সঙ্গে আছেন—এই ধ্যান পয়দা করিয়া দেয়।

(১৫) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আলোচনার কারণ হয়। যেমন

কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ فَاذْكُرُونِىْ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব।"

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৫২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—

مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ الحديث

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি।"

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের বয়ানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যিকিরের যদি আর কোন ফযীলত নাও থাকিত, তবে এই একটি মাত্র ফযীলতই ইহার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি যিকিরের আরও বহু ফযীলত রহিয়াছে।

(১৬) দিলকে জিন্দা করে। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, দিলের জন্য আল্লাহর যিকির এইরূপ, যেইরূপ মাছের জন্য পানি। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, পানি ছাড়া মাছের কি অবস্থা হয়।

(১৭) যিকির হইল, দিল ও রূহের খোরাক। খাদ্য না পাইলে শরীরের যে অবস্থা হয়, যিকির না পাইলে দিল ও রূহেরও তদ্রূপ অবস্থা হয়।

(১৮) দিলের জং অর্থাৎ মরিচা দূর করিয়া দেয়। যেমন হাদীসে আছে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে সেই জিনিস হিসাবে মরিচা ও ময়লা জন্মে। দিলের ময়লা ও মরিচা হইল খাহেশাত ও গাফলত। যিকির উহাকে পরিষ্কার করিয়া দেয়।

(১৯) ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়।

(২০) বান্দার মনে আল্লাহর প্রতি যে দূরত্ব ও অসম্পর্কের ভাব থাকে যিকির উহা দূর করিয়া দেয়। গাফেলের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা থেকে একপ্রকার দূরত্ব পয়দা হয়, যাহা যিকিরের দ্বারা দূর হয়।

(২১) বান্দা যে সমস্ত যিকির-আজকার করে, উহা আরশের চতুর্দিকে বান্দার যিকির করিয়া ঘূরিতে থাকে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সতের নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(২২) যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে, আল্লাহ তায়ালা মুছীবতের সময় তাহাকে স্মরণ করেন।

(২৩) যিকির আল্লাহর আজাব হইতে নাজাতের ওসীলা।

(২৪) যিকিরের কারণে ছাকীনা ও রহমত নাজেল হয়। ফেরেশতারা চতুর্দিক হইতে যিকিরকারীকে ঘিরিয়া রাখে। সকীনার অর্থ এই অধ্যায়ের

২নং পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(২৫) যিকিরের বরকতে জবান গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা, খারাপ কথা, বেহুদা কথা হইতে হেফাজতে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যাহার জবান যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সে এইসব জিনিস হইতে সাধারণতঃ হেফাজতে থাকে। আর যাহার জবান যিকিরে অভ্যস্ত হয় না, সে এইগুলির মধ্যে লিপ্ত থাকে।

(২৬) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস। আর গাফলতি ও বেহুদা কথাবার্তার মজলিস হইল শয়তানের মজলিস। এখন মানুষের এখতিয়ার রহিয়াছে সে যেমন মজলিস চাহিবে পছন্দ করিয়া নিবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি উহাকেই পছন্দ করে যাহার সহিত সে সম্পর্ক রাখে।

(২৭) যিকিরের বদৌলতে যিকিরকারীও সৌভাগ্যবান হয়। আর তাহার আশেপাশের লোকেরাও সৌভাগ্যবান হয়। আর গাফেল ও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও বদবখত হয় এবং তাহার আশেপাশের লোকেরাও বদবখত হয়।

(২৮) যিকিরকারী কেয়ামতের দিন আফসোস করিবে না। কেননা, হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না, কেয়ামতের দিন উহা আফসোস ও লোকসানের কারণ হইবে।

(২৯) যিকির অবস্থায় যদি নির্জনে ক্রন্দনও নসীব হয়, তবে কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড উত্তাপে যখন মানুষ ছটফট করিতে থাকিবে তখন যিকিরকারীকে আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে ছায়া দিবেন।

(৩০) দোয়াকারীগণ যাহা কিছু পায় যিকিরকারীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক পায়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার যিকিরে কারণে যে দোয়া করিবার সুযোগ পায় নাই, আমি তাহাকে দোয়াকারী হইতে উত্তম দান করিব।

(৩১) সবচেয়ে সহজ এবাদত হওয়া সত্ত্বেও যিকির সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম। সবচেয়ে সহজ এইজন্য যে, শুধু জবান নড়াচড়া করা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করা হইতে সহজ।

(৩২) আল্লাহর যিকির জান্নাতের চারাগাছ।

(৩৩) যিকিরের জন্য যত পুরস্কার ও সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে, অন্য কোন আমলের জন্য এইরূপ করা হয় নাই। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

এই দোয়া যে কোন দিন একশত বার পড়ে, তাহার জন্য দশটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব লেখা হয়, একশত নেকী লেখা হয়, একশত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হইতে হেফাজতে থাকে। যে ব্যক্তি এই আমল তাহার চেয়ে বেশী করে সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাহার চেয়ে উত্তম বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ অনেক হাদীস দ্বারা যিকির সর্বোত্তম আমল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বেশ কিছু হাদীস এই কিতাবেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩৪) সবসময় যিকির করার বদৌলতে নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া হইতে—যাহা উভয় জাহানে বদ নসীবীর কারণ—নিরাপদ থাকা নসীব হয়। কেননা আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া নিজেকে ও নিজের সমস্ত কল্যাণকে ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (سوره حشر رکوع ۳

অর্থ ঃ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লার ব্যাপারে বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে বেপরোয়া করিয়া দিয়াছেন। আর উহারাই ফাসেক।

(সূরা হাশর, আয়াত ঃ ১৯)

অর্থাৎ তাহাদের বিবেক–বুদ্ধিকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রকৃত লাভকে বুঝে নাই। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে ভুলিয়া যায় তখন নিজের কল্যাণ সম্পর্কেও গাফেল হইয়া যায়। অবশেষে ইহাই ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষেত–খামার করিল কিন্তু উহাকে ভুলিয়া গেল ; সেবা–যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিল না, তবে তাহা নির্ঘাত ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন জিহ্বাকে যিকির দ্বারা সর্বদা তরুতাজা রাখিবে এবং যিকির তাহার নিকট এরূপ প্রিয় হইয়া যাইবে যেরূপ প্রচণ্ড পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি, অত্যাধিক ক্ষুধার সময় খাদ্য, তীব্র গরম ও শীতের সময় ঘরবাড়ী ও পোশাক–পরিচ্ছদ প্রিয়বস্তু হইয়া যায়। বরং আল্লাহর যিকির তো ইহার চেয়েও বেশী প্রিয় হইবার দাবী রাখে। কারণ, এইসব জিনিস না হইলে শুধু শরীরই ধ্বংস হওয়ার আশংকা। কিন্তু যিকির না হইলে দিল এবং রূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহার সহিত শরীর ধ্বংসের কোন তুলনাই হয় না।

(৩৫) যিকির মানুষের উন্নতি সাধন করিতে থাকে। বিছানায়–বাজারে, সুস্থতায়–অসুস্থতায়, নেয়ামত ও ভোগবিলাসে মশগুল অবস্থায়ও উন্নতি

করিতে থাকে। আর কোন বস্তু এমন নাই যাহা সর্বাবস্থায় উন্নতির কারণ হইতে পারে। এমনকি যিকির দ্বারা যাহার দিল নূরানী হইয়া যায়, সে ঘুমন্ত অবস্থায়ও গাফেল রাত্রি জাগরণকারী হইতে অনেক আগে বাড়িয়া যায়।

(৩৬) যিকিরের নূর দুনিয়াতেও সঙ্গে থাকে, কবরেও সঙ্গে থাকে এবং আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর আগে আগে চলিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ
فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (سوره انعام رکوع ۱۵)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মৃত অর্থাৎ গোমরাহ ছিল আমি তাহাকে জীবিত অর্থাৎ মুসলমান বানাইয়াছি আবার তাহাকে এমন নূর দিয়াছি যাহা লইয়া সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে অর্থাৎ সর্বদা এই নূর তাহার সঙ্গে থাকে। সে কি ঐ দুর্দশাগ্রস্ত, গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমান হইবে যে উহা হইতে বাহির হইবার শক্তি রাখে না? (সূরা আন'আম, আয়াতঃ ১২২)

আয়াতে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি মোমিন, যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং আল্লাহর মহব্বত, মারেফত ও যিকিরে সে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে এই সবকিছু হইতে খালি। বাস্তবিক পক্ষে এই নূর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর ইহার মধ্যেই পুরাপুরি কামিয়াবী। এই কারণেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে নূর চাহিতেন ও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রত্যেকটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে নূর দ্বারা ভরিয়া দেওয়ার জন্য দোয়া করিতেন। বহু হাদীসে এইরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেমন তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! আমার গোশতে, হাড়ে, মাংসপেশীতে, পশমে, চর্মে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পিছনে নূর দিয়া ভরিয়া দাও। এমনকি এই দোয়াও করিতেন, হে আল্লাহ! আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত নূর বানাইয়া দাও অর্থাৎ তাঁহার সত্তাই যেন নূর হইয়া যায়। এই নূর অনুসারেই আমলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। এমনকি অনেকের আমল সূর্যের মত নূর লইয়া আসমানে পৌঁছিয়া থাকে। কেয়ামতের দিনেও তাহাদের চেহারায় এইরূপ নূর ঝলমল করিতে থাকিবে।

(৩৭) যিকির তাছাউফের মৌলিক বিষয়গুলির মূল। ইহা সূফিয়ায়ে কেরামের সব তরীকায় চলিয়া আসিতেছে। যিকিরের দরজা যাহার জন্য খুলিয়া গিয়াছে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার দরজাও তাহার জন্য খুলিয়া

গিয়াছে। আর আল্লাহ পর্যন্ত যে পৌঁছিয়াছে সে যাহা চায় তাহাই পায়। কেননা, আল্লাহর দরবারে কোন জিনিসেরই কমি নাই।

(৩৮) মানুষের অন্তরে একটি কোণ আছে, যাহা যিকির ছাড়া অন্য কিছু দিয়া পূরণ হয় না। যিকর যখন দিলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে তখন শুধু ঐ কোণটুকুই পূর্ণ করে না বরং যিকিরকারীকে সম্পদ ছাড়াই ধনী করিয়া দেয়। আত্মীয়–স্বজন ও জনবল ছাড়াই মানুষের অন্তরে তাহাকে সম্মানী করিয়া দেয়। রাজত্ব ছাড়াই তাহাকে বাদশাহ বানাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি যিকির হইতে গাফেল হয় সে ধনসম্পদ, আত্মীয়–স্বজন ও রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

(৩৯) যিকির বিক্ষিপ্তকে একত্র করে এবং একত্রকে বিক্ষিপ্ত করে। দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে।

বিক্ষিপ্তকে একত্র করার অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে বিভিন্ন রকমের যেই সমস্ত আশংকা, চিন্তা–ভাবনা ও পেরেশানী জমিয়া থাকে, যিকির সেইগুলিকে দূর করিয়া অন্তরে প্রশান্তি আনিয়া দেয়।

'একত্রকে বিক্ষিপ্ত করা'র অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে যেই সমস্ত চিন্তা–ফিকির জমা হইয়াছে, যিকির সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়, মানুষের যেই সমস্ত ভুল–চুক ও পাপরাশি একত্র হইয়াছে যিকির সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং শয়তানের যে সৈন্যবাহিনী মানুষের উপর চাপিয়া বসিয়াছে যিকির উহাকে তাড়াইয়া দেয় এবং আখেরাত যাহা দূরে উহাকে নিকটবর্তী করিয়া দেয় আর দুনিয়া যাহা নিকটে উহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

(৪০) যিকির মানুষের দিলকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দেয়। গাফলত হইতে সতর্ক করিয়া দেয়। দিল যতক্ষণ ঘুমাইতে থাকে নিজের সমস্ত কল্যাণই হারাইতে থাকে।

(৪১) যিকির একটি গাছ। ইহাতে মারেফতের ফল ধরিয়া থাকে। সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় হাল ও মাকামের ফল ধরে। যিকির যত বেশী হইবে ততই সেই গাছের শিকড় মজবুত হইবে। আর শিকড় যত মজবুত হইবে গাছে তত বেশী ফল ফলিবে।

(৪২) যিকির ঐ পবিত্র সত্তার নিকটবর্তী করিয়া দেয় যাহার যিকির করা হয়। এইভাবে অবশেষে তাঁহার সঙ্গলাভ হইয়া যায়। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীনদের সাথে আছেন। (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ১২৮)

হাদীসে আছে ঃ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ مَا ذَكَرَنِيْ অর্থাৎ, আমি বান্দার সহিত থাকি যতক্ষণ সে আমার যিকির করিতে থাকে। এক হাদীসে আছে, আমার যিকিরকারীগণ আমার আপনজন, তাহাদেরকে আমি আমার রহমত হইতে দূরে সরাই না। যদি তাহারা নিজেদের গোনাহ হইতে তওবা করিতে থাকে তবে আমি তাহাদের বন্ধু হই আর যদি তাহারা তওবা না করে তবে আমি তাহাদের চিকিৎসক হই ; গোনাহ হইতে পবিত্র করিবার জন্য তাহাদেরকে কষ্ট পেরেশানীতে লিপ্ত করি। তদুপরি যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যে সঙ্গ হাসিল হয় উহার তুল্য আর কোন সঙ্গ হইতে পারে না। উহা না ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না লিখিয়া প্রকাশ করা যায়। আল্লাহ পাকের সঙ্গ ও সান্নিধ্যের লজ্জত ও স্বাদ সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে উহা লাভ করিয়াছে। হে আল্লাহ! আমাকেও উহার কিছু অংশ দান করুন।

(৪৩) যিকির গোলাম আজাদ করার সমতুল্য। আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার সমতুল্য। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য। (পিছনে এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সামনে আরও বর্ণনা আসিতেছে।)

(৪৪) যিকির শোকরের মূল। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, সে শোকরও আদায় করে না। এক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, আপনি আমার উপর অনেক এহসান করিয়াছেন সুতরাং আমাকে এমন তরীকা বলিয়া দিন যাহাতে আপনার বেশী বেশী শোকর আদায় করিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি যত বেশী আমার যিকির করিবে তত বেশী আমার শোকর আদায় হইবে। আরেক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনার শান মোতাবেক শোকর কিভাবে আদায় হইবে? আল্লাহ তায়ালা ফরমাইলেন, তোমার জবান যেন সর্বদা যিকিরের সহিত তরতাজা থাকে।

(৪৫) পরহেজগার লোকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহারাই বেশী সম্মানী, যাহারা সবসময় যিকিরে মশগুল থাকে। কেননা, তাকওয়ার শেষ ফল হইল জান্নাত আর যিকিরের শেষ ফল হইল আল্লাহ তায়ালার সঙ্গলাভ।

(৪৬) দিলের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের কঠোরতা আছে। যাহা যিকির ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নরম হয় না।

(৪৭) যিকির হইল দিলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা।

(৪৮) যিকির হইল আল্লাহর সহিত দোস্তির মূল। আর যিকির হইতে গাফলতী তাহার সহিত দুশমনীর মূল।

(৪৯) যিকিরের মত আল্লাহর নেয়ামত আকর্ষণকারী এবং আল্লাহর আজাব দূরকারী আর কোন জিনিস নাই।

(৫০) যিকিরকারীর উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত এবং ফেরেশতাদের দোয়া থাকে।

(৫১) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকিয়াও জান্নাতের বাগানে ঘুরাফেরা করিতে চায় সে যেন যিকিরের মজলিসে বসে। কেননা, এই মজলিসগুলি হইল জান্নাতের বাগান।

(৫২) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস।

(৫৩) আল্লাহ তায়ালা যিকিরকারীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।

(৫৪) সর্বদা যিকিরকারী ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে জান্নাতে দাখেল হইবে।

(৫৫) যাবতীয় আমল আল্লাহর যিকির করার জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

(৫৬) সমস্ত আমলের মধ্যে সেই আমলই সর্বোত্তম যাহাতে বেশী বেশী যিকির করা হয়। যেমন, যে রোযার মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা সর্বোত্তম রোযা, যে হজ্জের মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা সর্বোত্তম হজ্জ। এমনিভাবে জিহাদ ইত্যাদি আমলেরও একই হুকুম।

(৫৭) যিকির নফল আমল ও এবাদতসমূহের স্থলাভিষিক্ত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, গরীব সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা বড় বড় মর্তবা হাসিল করিয়া নেয় ; তাহারা আমাদের মতই নামায-রোযা আদায় করে। অথচ সম্পদের কারণে তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে আগে বাড়িয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার ফলে কোন ব্যক্তি তোমাদের মর্তবায় পৌঁছিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কেহ যদি এই আমলই করে তবে সে পৌঁছিতে পারিবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়িতে বলিলেন। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাত নং হাদীসে ইহার বর্ণনা আসিতেছে। উক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরকে হজ্জ, ওমরা,

জিহাদ ইত্যাদি এবাদতের সমপর্যায়ে সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(৫৮) যিকির অন্যান্য এবাদতের জন্য খুবই সহায়ক ও সাহায্যকারী। কেননা, বেশী বেশী যিকির করার দ্বারা প্রত্যেকটি এবাদত প্রিয় হইয়া যায়। ফলে এবাদতে স্বাদ লাগিতে আরম্ভ করে ; কোন এবাদতের মধ্যেই কষ্ট ও বোঝা অনুভব হয় না।

(৫৯) যিকিরের কারণে প্রত্যেক কষ্টকর কাজ আছান হইয়া যায় এবং প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ হইয়া যায়। সর্বপ্রকার বোঝা হালকা হইয়া যায়। সকল মুছীবত দূর হইয়া যায়।

(৬০) যিকিরের কারণে দিল হইতে ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। ভয়-ভীতি দূর করিয়া দিলের মধ্যে প্রশান্তি আনার ব্যাপারে আল্লাহর যিকিরের বিশেষ দখল রহিয়াছে ; ইহা যিকিরের বিশেষ গুণ, যতই যিকির বেশী করা হইবে অন্তরে ততবেশী শান্তি লাভ হইবে এবং ভয়-ভীতি দূর হইবে।

(৬১) যিকিরের কারণে মানুষের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি পয়দা হয় যাহার দরুন দুঃসাধ্য কাজও সহজ হইয়া যায়। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আটা পিষা ও ঘরের অন্যান্য কাজ-কর্মে কষ্টের কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন একজন খাদেম চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শুইবার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ আল্লাহু আকবার পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, ইহা খাদেম হইতে উত্তম।

(৬২) আখেরাতের মেহনতকারীরা সবাই দৌড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে যিকিরকারীদের জামাত সকলের আগে রহিয়াছে। হযরত গোফরা (রহঃ)এর আজাদকৃত গোলাম ওমর (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন যখন লোকদের নিজ নিজ আমলের সওয়াব মিলিবে তখন অনেকেই এই বলিয়া আফসোস করিবে যে, হায় আমরা কেন যিকিরের এহতেমাম করি নাই। অথচ ইহা সবচেয়ে সহজ আমল ছিল। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মুফাররিদ লোকেরা আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদ লোক কাহারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা যিকিরের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। যিকির তাহাদের যাবতীয় বোঝাকে হালকা করিয়া দেয়।

(৬৩) যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা সত্যায়ন করেন ও

তাহাদেরকে সত্যবাদী বলেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে সত্যবাদী বলেন, তাহাদের হাশর মিথ্যাবাদীদের সাথে হইতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই আর আমি সবচেয়ে বড়।

(৬৪) যিকিরের দ্বারা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন যিকির বন্ধ করিয়া দেয় তখন ফেরেশতারা নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা অমুক নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছ কেন? তখন তাহারা বলে, এই নির্মাণ কাজের খরচ এখনও পর্যন্ত আসে নাই। আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম সাতবার পড়ে, জান্নাতে তাহার জন্য একটি গম্বুজ তৈরী হইয়া যায়।

(৬৫) যিকির জাহান্নামের জন্য দেওয়াল স্বরূপ। কোন বদ–আমলের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হইলেও যিকির মাঝখানে প্রাচীর হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যিকির যত বেশী হইবে প্রাচীর তত বেশী মজবূত হইবে।

(৬৬) ফেরেশতারা যিকিরকারীদের গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলে অথবা আল–হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন বলে, তখন ফেরেশতারা এই বলিয়া দোয়া করে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন।

(৬৭) যেই পাহাড়ের উপর অথবা ময়দানের মধ্যে আল্লাহর যিকির করা হয় উহা গর্ববোধ করে। হাদীস শরীফে আছে, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডাকিয়া বলে, আজ তোমার উপর দিয়া কোন যিকিরকারী পথ অতিক্রম করিয়াছে কি? যদি সে বলে, অতিক্রম করিয়াছে তবে উক্ত পাহাড় আনন্দিত হয়।

(৬৮) বেশী বেশী যিকির করা মোনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা (ও সনদস্বরূপ)। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের অবস্থা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর যিকির খুব কমই করিয়া থাকে। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪২)

হযরত কা’ব আহবার (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বেশী বেশী যিকির করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত।

(৬৯) সমস্ত নেক আমলের মোকাবেলায় যিকিরের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের স্বাদ রহিয়াছে। যাহা অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না। যদি

যিকিরের এই স্বাদ ছাড়া অন্য কোন ফযীলত নাও থাকিত তবুও উহার ফযীলতের জন্যে ইহাই যথেষ্ট ছিল। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন যে, স্বাদ অনুভবকারীরা কোন কিছুতেই যিকিরের সমান স্বাদ পায় না।

(৭০) যিকিরকারীদের চেহারায় দুনিয়াতে চমক এবং আখেরাতে নূর হইবে।

(৭১) যে ব্যক্তি পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে, দেশে-বিদেশে বেশী বেশী যিকির করে, কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী বেশী হইবে। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সম্পর্কে এরশাদ ফরমান ঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

অর্থাৎ, ঐ দিন জমিন আপন খবরা-খবর বর্ণনা করিবে।

(সূরা যিলষাল, আয়াত ঃ ৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জমিনের খবরা-খবর তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, আমাদের জানা নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যে কোন পুরুষ ও মহিলা জমিনের যে অংশে যে কাজ করিয়াছে জমিন বলিয়া দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিন আমার উপর এই কাজ করিয়াছে (ভাল হউক বা মন্দ হউক)। এইজন্যই বিভিন্ন জায়গায় বেশী বেশী যিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারীও বেশী হইবে।

(৭২) জবান যতক্ষণ যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ মিথ্যা, গীবত, বেহুদা কথাবার্তা হইতে হেফাজতে থাকিবে। কারণ, জবান তো চুপ থাকেই না ; হয় আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইবে, না হয় বেহুদা কথা বলিবে। দিলের অবস্থাও তদ্রূপ—দিল যদি আল্লাহর মহব্বতে মশগুল না হয় তবে উহা মখলূকের মহব্বতে লিপ্ত হইবে।

(৭৩) শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন—সর্বরকমে তাহাকে আতংকিত করিতে থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। দুশমন যাহাকে চতুর্দিক হইতে সবসময় ঘেরাও করিয়া রাখে তাহার অবস্থা কত মারাত্মক হয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু দুশমনও যদি এইরূপ হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকেই চায় যে, যত পারি কষ্ট দিব, তবে তো আরও মারাত্মক হইবে! এইসমস্ত বাহিনীকে হটাইবার জন্য যিকির ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। বহু হাদীসে অনেক দোয়া বর্ণিত হইয়াছে, যেইগুলি পড়িলে শয়তান নিকটেও আসিতে পারে না, ঘুমাইবার পূর্বে পড়িলে রাতভর শয়তান হইতে হেফাজত হয়।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) এই ধরনের বেশ কিছু দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ছয়টি শিরোনামে বিভিন্ন প্রকার যিকিরের তুলনামূলক ফযীলত ও যিকিরের মৌলিক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ৭৫টি পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য বর্ণিত খাছ দোয়াসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। এই কিতাবখানি সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না। যাহার তওফীক হইবে তাহার জন্য এই কিতাবে যাহা আছে, তাহাও যথেষ্টের চেয়ে বেশী। আর যাহার তাওফীক নাই তাহার জন্য হাজারো ফাযায়েল বর্ণনা করিলেও কোন কাজে আসিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে তাইয়্যেবা

কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে কালেমায়ে তাওহীদও বলা হয়। কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে যত বেশী পরিমাণে এই কালেমা তাইয়্যেবা উল্লেখ করা হইয়াছে সম্ভবতঃ এত বেশী পরিমাণে আর কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। যেহেতু সকল শরীয়ত ও সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়াতে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্যই হইল তাওহীদ ; কাজেই এই কালেমার উল্লেখ যত বেশী পরিমাণেই করা হউক না কেন উহা যুক্তিসঙ্গত। কুরআন পাকে এই কালেমাকে বিভিন্ন শিরোনামে ও বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা', 'কাওলে ছাবেত', 'কালেমায়ে তাকওয়া', 'মাকালীদুস্-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' (অর্থাৎ আসমান-জমিনের চাবিকাঠি) প্রভৃতি। যেমন সামনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আসিতেছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 'এহয়াউল-উলূম' কিতাবে নকল করিয়াছেন ঃ ইহা 'কালেমায়ে তাওহীদ', 'কালেমায়ে এখলাস', 'কালেমায়ে তাকওয়া', কালেমায়ে তাইয়্যেবা' 'উরওয়াতুল-উস্‌কা', দাওয়াতুল-হক ও 'ছামানুল-জান্নাহ্'।

যেহেতু কুরআন পাকে বিভিন্ন শিরোনামে ইহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, কাজেই এই অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে কিন্তু কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই। এইজন্য আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত তফসীরও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহা সাহাবায়ে কেরাম হইতে অথবা স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে পূর্ণ কালেমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা কিছু পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, লা ইলাহা ইল্লা হূ। যেহেতু এই সকল আয়াতে স্বয়ং কালেমার উল্লেখ রহিয়াছে অথবা অন্য শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাই এই সকল আয়াতের তরজমা দরকার মনে করা হয় নাই ; শুধু সূরা ও রুকূর

উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত হাদীসের তরজমা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলিতে এই পবিত্র কালেমার তরগীব ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার প্রতি হুকুম করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দগুলি উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু কালেমায়ে তাইয়্যেবাকেই বুঝানো হইয়াছে।

(১) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

(سورہ ابراہیم ۔ ع ۴)

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں اور خبیث کلمہ (یعنی کلمہ کفر) کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔

(১) আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়্যেবার কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন? উহা একটি পবিত্র বৃক্ষসদৃশ যাহার শিকড় মাটিতে গাড়িয়া আছে আর উহার শাখা-প্রশাখা আসমানের দিকে যাইতেছে। এই বৃক্ষটি আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেক মৌসুমে ফল দেয় (অর্থাৎ খুব ফল ধরে)। আল্লাহ তায়ালা এই সকল দৃষ্টান্ত এইজন্য বর্ণনা করেন, যাহাতে মানুষ খুব ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর খবীছ (অর্থাৎ কুফরী) কালেমার দৃষ্টান্ত হইল, ঐ নিকৃষ্ট বৃক্ষ সদৃশ যাহা মাটির উপর হইতেই উপড়াইয়া লওয়া হয় এবং মাটিতে উহার কোন স্থায়িত্ব নাই। (সূরা ইবরাহীম, রুকূ ঃ ৪)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কালেমায়ে তাইয়্যেবা দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমায়ে শাহাদত—'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

যাহার শিকড় মুমিনের স্বীকারোক্তির মধ্যে আর শাখা-প্রশাখা আসমানে। কেননা ইহার দ্বারা মুমিনের আমল আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। আর কালেমায়ে খবীছা হইল শিরক। ইহার সহিত কোন আমলই কবুল হয় না। অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, সর্বদা ফল দেওয়ার অর্থ হইল, আল্লাহকে দিবা-রাত্র সর্বদা স্মরণ করা। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী ব্যক্তিরা (দান-খয়রাতের মাধ্যমে) সমস্ত সওয়াব নিয়া যাইতেছে। জওয়াবে তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি—যদি কোন ব্যক্তি সামান-পত্র উপরে নীচে স্তূপ করিয়া রাখিতে থাকে, তবে উহা কি আসমানের উপর চড়িয়া যাইবে? আমি কি তোমাকে এমন জিনিস শিখাইয়া দিব যাহার শিকড় জমিনে আর শাখা-প্রশাখা আসমানে। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ' দশ দশবার করিয়া পড়। ইহার শিকড় জমিনে আর শাখা-প্রশাখা আসমানে।

(٢) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ط

(سورہ فاطر۔ رکوع ٢)

جو شخص عزّت حاصل کرنا چاہے (وہ اللہ ہی سے عزّت حاصل کرے کیونکہ) ساری عزّت اللہ ہی کے واسطے ہے اسی تک اچھے کلمے پہونچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔

(২) যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করিতে চায় (সে যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই ইজ্জত লাভ করে। কারণ,) সমস্ত ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। আর তাহারই নিকট উত্তম কালেমা পৌঁছিয়া থাকে এবং নেক আমল ঐগুলিকে পৌঁছাইয়া দেয়।

ফায়দা ঃ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে উত্তম কালেমার অর্থ হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ — সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ এই কথাই নকল করিয়াছেন। অন্য এক তফসীর অনুযায়ী ইহার অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশকারী শব্দসমূহ। যেমন অন্য অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আসিবে।

(٣) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط (سورہ انعام۔ رکوع ١٤)

اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف (و اعتدال) کے اعتبار سے پورا ہے۔

(৩) আর তোমার রবের কালেমা সত্যতা ইনসাফ ও মধ্যপন্থার দিক দিয়া পরিপূর্ণ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রবের কালেমা দ্বারা লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে। আর অধিকাংশ তফসীরকারের মতে কালামুল্লা শরীফকে বুঝানো হইয়াছে।

(۴) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ۝ (سورہ ابراہیم، رکوع ۴)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات (یعنی کلمہ طیبہ) سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے اور کافروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(৪) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে পাকাপোক্ত কথা (অর্থাৎ কালেমায়ে তাইয়্যেবা) দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে মজবুত করিয়া রাখেন। আর কাফেরদেরকে উভয় জগতে গোমরাহ করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা আপন হেকমতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকেন।

ফায়দা ঃ হযরত বারা' (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যখন কবরে সওয়াল করা হয় তখন মুসলমান ব্যক্তি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেয়। কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত পাকাপোক্ত কথার অর্থ ইহাই। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, পাকাপোক্ত কথার অর্থ কবরের সওয়াল–জওয়াব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন মুসলমানের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন ফেরেশতারা আসিয়া তাহাকে সালাম করে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। যখন তাহার মৃত্যু হইয়া যায় ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় এবং তাহার জানাযায় শরীক হয়। অতঃপর দাফন হওয়ার পর তাহাকে বসায় এবং তাহার সহিত সওয়াল–জওয়াব হয়। তন্মধ্যে ইহাও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমার সাক্ষ্য কি? সে বলে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'—ইহাই উল্লেখিত আয়াত শরীফের অর্থ।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াতে পাকাপোক্ত কালেমার অর্থ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আখেরাতে ইহার অর্থ সওয়াল–জওয়াব। হযরত তাউস (রহঃ) হইতেও এই ব্যাখ্যাই নকল করা হইয়াছে।

⑤ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

(سورۂ رعد۔ رکوع ۲)

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کرسکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے (اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے) تاکہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ (پانی اڑکر) اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔

⑤ সত্য ডাক তাহারই জন্য নির্দিষ্ট। আর ইহারা আল্লাহকে ছাড়া যাহাদেরকে ডাকে তাহারা ইহাদের আবেদনকে ইহার চেয়ে বেশী মঞ্জুর করিতে পারে না যে পরিমাণ পানি ঐ ব্যক্তির আবেদনকে মঞ্জুর করিতে পারে যে নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় (এবং পানিকে নিজের দিকে ডাকে) যেন পানি তাহার মুখে আসিয়া পৌঁছে। অথচ এই পানি (কোন রকমেই তাহার মুখে উড়িয়া) আসিয়া পৌঁছিবে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দরখাস্ত একেবারে বৃথা।

ফায়দা ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দাওয়াতুল হক বা সত্য ডাকের অর্থ হইল তাওহীদ অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, 'দাওয়াতুল হক' দ্বারা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেওয়াকেই বুঝানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ হইতেও এইরূপ উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে।

⑥ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

(سورۂ آل عمران۔ ع ۷)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلّم ہونے میں) برابر ہے وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے۔ خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔

⑥ হে মুহাম্মদ ! আপনি বলিয়া দিন—হে আহলে কিতাব (ইহুদী–নাসারা) ! তোমরা এমন এক কালেমার দিকে আস যাহা (স্বীকৃত হওয়ার কারণে) আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান (ভাবে স্বীকৃত)। আর তাহা

এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও এবাদত করিব না। আল্লাহর সহিত অন্য কিছুকে শরীক করিবনা। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া আমরা একে অপরকে রব সাব্যস্ত করিবনা। ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমরা বলিয়া দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলমান।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু পরিষ্কার যে, কালেমার অর্থ তাওহীদ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ। হযরত আবুল আলিয়া ও হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, কালেমা দ্বারা এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–কেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

(٧) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (سورۃ آل عمران۔ رکوع ۱۲)

(اے اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم لوگ (سب اہلِ مذاہب سے) بہترین جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو اُن کے لئے بہتر تھا ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو ایمان لے آئے) لیکن اکثر حصّہ ان میں سے کافر ہے

(৭) (হে উম্মতে মুহাম্মাদী!) তোমরা (সকল ধর্মাবলম্বী হইতে) সর্বোত্তম দল। যে দলটিকে লোকদের উপকারের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর মন্দ কাজে বাধা দাও আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি আহলে কিতাবও ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত ; তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমান (অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে) আর অধিকাংশই কাফের।

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ভাল কাজে আদেশ করার অর্থ হইল, তোমরা লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং আল্লাহর হুকুম স্বীকার করার জন্য আদেশ কর। কেননা, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু।

(٨) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ (سورہ ہود۔ رکوع ۱۰)

(اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصّوں میں بیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں (نامۂ اعمال سے) بُرے کاموں کو یہ بات ایک نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لئے۔

(৮) এবং (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি নামাযের পাবন্দী করিতে থাকুন দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমল (আমলনামা হইতে) গোনাহকে মিটাইয়া দেয়। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

ফায়দা ঃ এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত হাদীসে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নেক আমল (আমলনামা হইতে) গোনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, আর যখন কোন গোনাহ হইয়া যায় তখন দেরী না করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন নেক আমল করিয়া নাও, যাহাতে গোনাহের কারণে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইয়া যায় এবং গোনাহ মিটিয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহও কি নেক আমলের মধ্যে গণ্য? অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলেও কি নেক আমল হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে কোন সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ ধৌত হইয়া যায়।

(৯) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ (سورہ نحل، رکوع ۱۳)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا اور منع فرماتے ہیں فحش باتوں سے اور بری باتوں سے اور کسی پر ظلم کرنے سے حق تعالیٰ شانہٗ تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔

(৯) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার, এহসান ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার হুকুম করেন এবং অশ্লীল কাজ, অন্যায় আচরণ ও জুলুম করা হইতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদিগকে নসীহত করেন যেন তোমরা নসীহত গ্রহণ কর।

ফায়দা ঃ 'আদল' শব্দের অর্থ তফসীরে বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এক তফসীরে বর্ণিত

হইয়াছে, আদল অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করা আর 'এহসান' অর্থ ফরজসমূহকে আদায় করা।

(১০) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ (سورہ احزاب۔ رکوع ۹)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستی کی (پکی) بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اچھے کردے گا اور گناہ معاف فرمادے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہونچے گا۔

(১০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক (পাকা) কথা বল, আল্লাহ তোমাদের আমল ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে বিরাট সফলতা অর্জন করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে,'সঠিক (পাকা)' কথা বলার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। অন্য এক হাদীসে আছে, সর্বাপেক্ষা পাকা আমল তিনটি—সর্বদা (সুখে-দুঃখে অভাবে ও সচ্ছলতায়) আল্লাহর যিকির করা।। দ্বিতীয় ঃ নিজের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করা (অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, অন্যের বেলায় তো খুব জোর দেখানো হয় কিন্তু নিজের বেলায় এদিক সেদিকের কথা বলিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়)। তৃতীয় ঃ ভাইকে আর্থিক সাহায্য করা।

(১১) فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (سورہ زمر۔ ع ۲)

پس آپ میرے ایسے بندوں کو خوش خبری سُنا دیجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر سُنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں۔

(১১) অতএব আপনি আমার ঐ সকল বান্দাকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা এই কুরআনকে মনোযোগ দিয়া শুনে অতঃপর উহার সর্বোত্তম কথাগুলির অনুসরণ করে। ইহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দিয়াছেন এবং ইহারাই জ্ঞানবান।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ, হযরত আবু যর গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এই তিনজন সাহাবী জাহেলিয়াতের যুগেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতেন। উল্লেখিত

আয়াতে সর্বোত্তম কথাগুলি দ্বারা ইহাকেই বুঝানো হইয়াছে। হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম (রাযিঃ) হইতেও প্রায় একই ধরনের কথা বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত আয়াতখানি এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা জাহেলিয়াতের যুগেও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতেন।—জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল, আবুযর গিফারী ও সালমান ফারসী (রাযিঃ)

(১২) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(سورہ زمر۔ رکوع ۴)

اور جو لوگ (اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے) سچی بات لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی (اس کو سچا جانا) تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں یہ لوگ جو کچھ چاہیں گے اُن کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بُرے اَعمال کو اُن سے دور کردے (اور مُعاف کردے) اور نیک کاموں کا بدلہ (ثواب) دے۔

(১২) যাহারা (আল্লাহর পক্ষ হইতে অথবা তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে) সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে এবং নিজেরাও উহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে (অর্থাৎ উহাকে সত্য জানিয়াছে) তাহারাই পরহেজগার। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহাদের প্রভুর নিকট পাইবে। ইহাই হইল নেক কার লোকদের পুরস্কার ; যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে তাহাদের হইতে দূর করিয়া দেন (অর্থাৎ মাফ করিয়া দেন) এবং নেক কাজগুলির বিনিময় (অর্থাৎ সওয়াব) দান করেন।

ফায়দা ঃ যাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে লইয়া আসেন তাহারা হইতেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর যাহারা আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষ হইতে লইয়া আসেন তাহারা হইতেছেন ওলামায়ে কেরাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্য কথা'র অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কোন কোন মুফাসসিরীনের মতে 'যে সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে' দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হইয়াছে আর 'যাহারা সত্যতা স্বীকার করিয়াছে' দ্বারা মুমিনদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

(১৩) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ (جل جلالہٗ) ہے پھر مُستقیم رہے (یعنی جمے رہے

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝ (سورہ حم سجدہ۔ رکوع ۴)

اس کو چھوڑا نہیں) اُن پر فرشتے اُتریں گے (موت کے وقت اور قیامت میں یہ کہتے ہوئے) کہ نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور خوشخبری لو اس جنّت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور آخرت میں تمہارے لئے جس چیز کو تمہارا دل چاہے وہ موجود ہے اور وہاں جو تم مانگو گے وہ ملے گا (اور یہ سب انعام واکرام) بطور مہمانی کے ہے اللہ جلّ شانہٗ کی طرف سے (کہ تم اس کے مہمان ہوگے اور مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے)

(১৩) নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, আমাদের রব আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) অতঃপর ইহার উপর অটল রহিয়াছে, অর্থাৎ জমিয়া রহিয়াছে, উহাকে ছাড়ে নাই। তাহাদের উপর (মৃত্যুকালে ও কিয়ামতের ময়দানে) ফেরেশতা অবতীর্ণ হইবে (এবং বলিবে) ঃ তোমরা ভয় করিও না, চিন্তিত হইও না আর সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ জান্নাতের যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সহিত করা হইয়াছে, আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখেরাতেও তোমাদের সাথী থাকিব, আর আখেরাতে তোমাদের মনে যাহা চায় তাহা বিদ্যমান আছে। সেখানে তোমরা যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। আর এই সব (পুরস্কার ও সম্মান) অতি ক্ষমাশীল ও অতি মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ হইতে মেহমানী স্বরূপ হইবে। (কেননা তোমরা তাহার মেহমান হইবে আর মেহমানকে সম্মান করা হইয়া থাকে।)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, অটল থাকিবার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তির উপর কায়েম থাকে। হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতেও এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকে এবং শেরেক ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় নাই।

(۱۴) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (سورہ حم سجدہ۔ رکوع ۵)

بات کی عمدگی کے لحاظ سے کون شخص اُس سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

(১৪) উৎকৃষ্ট কথার দিক হইতে কোন ব্যক্তি তাহার চাইতে উত্তম হইতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে আর এরূপ বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন।

ফায়দা ঃ হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর দিকে ডাকা' দ্বারা মুয়াজ্জিন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। হযরত আসেম ইবনে হোবায়রাহ (রহঃ) বলেন, যখন তুমি আযান শেষ করিবে তখন বলিবে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

(١٥) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ (سورہ فتح۔ رکوع ۳)

پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ (سکون تحمل یا خاص رحمت) اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مؤمنین پر اور اُن کو تقویٰ کے کلمہ پر (تقویٰ کی بات پر) جمائے رکھا اور وہی اُس تقویٰ کے کلمہ کے مستحق تھے اور اہل تھے۔

(১৫) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের প্রতি এবং মুমিনদের প্রতি আপন ছাকীনা (অর্থাৎ প্রশান্তি ও সহন ক্ষমতা বা খাছ রহমত ও শান্তি) নাযিল করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার কালেমার উপর (তাকওয়ার কথার উপর) অটল রাখিলেন। আর তাহারাই এই তাকওয়ার কালেমার উপযুক্ত ছিল।

ফায়দা ঃ অধিকাংশ বর্ণনায় তাকওয়ার কালেমার অর্থ কালেমায়ে তাইয়্যেবাই বলা হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত সালামাহ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হইতেও এই অর্থই নকল করা হইয়াছে। হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পূর্ণ কালেমাই ইহার অর্থ।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারও নকল করা হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(١٦) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ

بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ

فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ (سورۂ رحمٰن۔ رکوع ۳)

ہوسکتا ہے سوائے (جنّ وانس) تم اپنے رَبّ کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔

(১৬) উপকারের বদলা উপকার ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে কি? অতএব (হে জিন ও ইনসান) তোমরা আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের অস্বীকার করিবে?

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হইল, আমি যাহাকে দুনিয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র নেয়ামত দান করিয়াছি আখেরাতে ইহার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে? হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে। হযরত হাসান (রহঃ) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(۱۷) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی ۝ (سورہ اعلیٰ۔ رکوع ۱)

فلاح کو پہونچ گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا (پاکی حاصل کی)

(১৭) কামিয়াবী লাভ করিয়াছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা হাসিল করিয়াছে।

ফায়দা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, পবিত্রতা হাসিল করার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–র সাক্ষ্য প্রদান করা এবং মূর্তিপূজা বর্জন করা। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(۱۸) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنُیَسِّرُہٗ لِلْیُسْرٰی ۝ (سورہ لیل۔ رکوع ۱)

پس جس شخص نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو آسان کردیں گے ہم اس کو آسانی کی چیز کے لئے۔

(১৮) অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায়) দান করিল, আল্লাহকে ভয় করিল এবং উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল তাহার জন্য আমি আরামদায়ক বস্তু সহজ করিয়া দিব।

ফায়দা ঃ 'আরামদায়ক বস্তু' দ্বারা এইখানে জান্নাত বুঝানো হইয়াছে। কারণ, জান্নাতে সব ধরনের শান্তি ও সুবিধা সহজে পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ, আমি তাহাকে এমন আমলের তাওফীক দান করিব যাহার ফলে ঐ সকল নেক কাজ সহজ হইয়া যাইবে যাহা দ্রুত জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেয়। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে উক্ত আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। হযরত আবদুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হযরত ইমাম আজম (রহঃ) আবু জুবায়েরের সূত্রে হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ছাদ্দাকা বিল হুছনা' পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর 'কায্‌যাবা বিল হুছনা' পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অবিশ্বাস করা।

(১৯) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(سورہ انعام۔ ع ۲۰)

جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (کم سے کم) دس حصے ثواب کے ملیں گے اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیکی درج نہ کی جائے یا بدی کو بڑھا کر لکھ دیا جائے)۔

(১৯) যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে (কমপক্ষে) দশগুণ সওয়াব পাইবে আর যে গোনাহের কাজ করিবে সে সমান সমান বদলা পাইবে এবং তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করা হইবে না। (অর্থাৎ কোন নেক কাজ লেখা হয় নাই কিংবা কোন গোনাহ অতিরিক্ত লেখা হইয়াছে এমন হইবে না।)

ফায়দা ঃ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন এই আয়াত নাযিল হইল, তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–ও কি নেকীর মধ্যে গণ্য? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেকী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, 'হাছানাহ' অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, 'হাছানাহ' দ্বারা লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত আবু যর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, দশগুণ সওয়াব সাধারণ মানুষের জন্য আর মুহাজিরগণের জন্য সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

(২০) حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

(سورہ مومن ع۱)

یہ کتاب اُتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قدرت (یا عطا) والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

(২০) এই কিতাব নাযিল হইয়াছে আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, গোনাহ মাফকারী, তওবা কবূলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং কুদরত (বা দান) ওয়ালা। তিনি ছাড়া আর কেহ এবাদতের যোগ্য নহে। তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোনাহমাফকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তওবা কবূলকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, আর কঠিন শাস্তি প্রদানকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে না।

আয়াতে উল্লেখিত 'যিত্তাউল' অর্থ ধনী। 'লা ইলাহা ইল্লা হু' কুরাইশী কাফেরদের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, কেননা তাহারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না। আর 'ইলাইহিল মাছীর' অর্থ হইল, তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ঐ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে যাহাতে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করেন। আর তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ঐ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নাই যাহাতে তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।

(২১) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ

(بقرہ۔ رکوع ۳۴)

پس جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش عقیدہ ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں۔

(২১) অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে মজবুত কড়াকে আঁকড়াইয়া ধরিল যাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবে না।

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, 'মজবুত কড়া ধরিল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিল। হযরত সুফিয়ান (রহঃ) হইতেও বর্ণিত যে, আয়াতে উল্লেখিত 'উরওয়াতুল উছকা' দ্বারা কালেমায়ে এখলাস উদ্দেশ্য।

উপসংহার

আরও বহু আয়াতের তফসীরেও কুরআনের কোন কোন শব্দের অর্থ কালেমায়ে তাওহীদ লওয়া হইয়াছে। যেমন, ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেন, হযরত জাকারিয়া (আঃ)এর ঘটনায় উল্লেখিত مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ বুঝানো হইয়াছে। এমনিভাবে إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ এর আমানত দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ উদ্দেশ্য। আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য এতটুকুই বর্ণনা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত আলোচিত হইবে যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে পুরা কালেমা উল্লেখ করা হইয়াছে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার কোথাও ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে হুবহু কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। এমনিভাবে مَا مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ এর অর্থও তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তদ্রূপ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এরও একই অর্থ। এমনিভাবে لَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ এর অর্থও প্রায় একই রকম। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ছাড়া কাহারো এবাদত করি না। لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ এরও একই অর্থ যে, আমরা তাহাকে ছাড়া আর কাহারো এবাদত করি না। অনুরূপ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ এর অর্থ হইল তিনিই একমাত্র মা'বুদ।

এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যেইগুলির অর্থ কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থের অনুরূপ। এই সমস্ত আয়াতের সূরা ও রুকূসমূহের উদ্ধৃতি এইজন্য উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ আয়াতের তরজমা কেহ দেখিতে চাহিলে উদ্ধৃতির সাহায্যে কুরআন শরীফের তরজমা হইতে উহা দেখিয়া লইতে পারিবে। আর বস্তুতঃ সমস্ত কুরআন শরীফই কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ। কেননা, পুরা কুরআন ও পুরা দ্বীনের

উদ্দেশ্যই হইতেছে তাওহীদ, আর তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বিভিন্ন যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে পাঠানো হইয়াছে। তাওহীদই সকল দ্বীনের এক ও অভিন্ন বিষয়। আর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিভিন্ন শিরোনাম অবলম্বন করা হইয়াছে। আর ইহাই কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিষয়বস্তু।

(١) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (سوره بقره ركوع ١٩) (٢) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (سوره بقره ركوع ٣٤) (٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (سوره آل عمران ركوع ١) (٤) شَهِدَ
اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ (سوره آل عمران ركوع ٢) (٥) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ (سوره آل عمران ركوع ٢) (٦) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (سوره آل عمران
(٧) تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ (سوره آل عمران ركوع ٧) (٨)
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (سوره نساء ركوع ١١) (٩) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ (سوره مائده ركوع ١٠) (١٠) قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سوره انعام ركوع ٢) (١١) مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِهٖ (سوره انعام ركوع ٥) (١٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (سوره انعام ركوع ١٣) (١٣) لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (سوره انعام ركوع ١٣) (١٤) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا (سوره اعراف ركوع ١٦)
(١٥) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ (سوره اعراف ركوع ٢٠) (١٦) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (سوره توبه ركوع ٥) (١٧) حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ (سوره توبه ركوع ١٦) (١٨) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (سوره يونس ركوع ١) (١٩) فَذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (سوره يونس ركوع ٤) (٢٠) قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (سوره يونس ركوع ٩) (٢١) فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
(سوره يونس ركوع ١١) (٢٢) فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (سوره هود ركوع ٢)
(٢٣) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ (سوره هود ركوع ٣) (٢٤٠٢٥-٢٦) قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (سوره هود ركوع ٥-٦-٨) (٢٧) ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
(سوره يوسف ركوع ٥) (٢٨) اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ (سوره يوسف ركوع ٥) (٢٩) قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ (سوره رعد ركوع ٤) (٣٠) وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سوره ابراهيم ركوع ٧) (٣١) اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (سوره نحل ركوع ١) (٣٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سوره نحل ركوع ٣) (٣٣) اِنَّمَا هُوَ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سوره نحل ركوع ٧) (٣٤) وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (سوره بنی اسرائیل ركوع ٤) (٣٥) قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ (سوره بنی اسرائیل ركوع ٥) (٣٦) فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ

الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلٰهًا (سورہ کہف رکوع ۲) (۳۷) هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِهِ آلِهَةً (سورہ کہف رکوع ۲) (۳۸) يُوحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ کہف رکوع ۱۲) (۳۹)

وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (سورہ مریم رکوع ۲) (۴۰) اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (سورہ طٰہٰ رکوع ۱) (۴۱)

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ (سورہ طٰہٰ رکوع ۱) (۴۲) إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ

إِلَّا هُوَ (سورہ طٰہٰ رکوع ۵) (۴۳) لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (سورہ انبیاء رکوع ۲) (۴۴)

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً (سورہ انبیاء رکوع ۲) (۴۵) إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا

(سورہ انبیاء رکوع ۲) (۴۶) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا (سورہ انبیاء رکوع ۳) (۴۷) أَفَتَعْبُدُوْنَ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ (سورہ انبیاء رکوع ۵) (۴۸) لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

سُبْحَانَكَ (سورہ انبیاء رکوع ۶) (۴۹) إِنَّمَا يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ انبیاء رکوع ۷)

(۵۰) فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا (سورہ حج رکوع ۵) (۵۱-۵۲) اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

إِلٰهٍ غَيْرُهُ (سورہ مومنون رکوع ۲) (۵۳) وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ (سورہ مومنون رکوع ۵) (۵۴) فَتَعَالَى

اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (سورہ مومنون رکوع ۶) (۵۵) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ (سورہ مومنون رکوع ۶) (۵۶) ءَ إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ (پانچ مرتبہ سورہ نمل رکوع

نمبرہ میں وارد ہے) (۵۷) وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ (سورہ قصص رکوع ۷) (۵۸) مَنْ إِلٰهٌ

غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ (سورہ قصص رکوع ۷) (۵۹) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

(سورہ قصص رکوع ۹) (۶۰) وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ (سورہ عنکبوت رکوع ۵) (۶۱) لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنّٰى

تُؤْفَكُوْنَ (سورہ فاطر رکوع ۱) (۶۲) إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (سورہ صٰفّٰت رکوع ۱) (۶۳) إِنَّهُمْ كَانُوْا

إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (سورہ صٰفّٰت رکوع ۲) (۶۴) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ

إِلٰهًا وَّاحِدًا (سورہ ص رکوع ۱) (۶۵) وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ ص رکوع ۵)

(۶۶) هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ زمر رکوع ۱) (۶۷) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

(سورہ زمر رکوع ۱) (۶۸) لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (سورہ مومن رکوع ۱) (۶۹) لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (سورہ مومن رکوع ۷) (۷۰) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ (سورہ مومن رکوع ۷) (۷۱)

يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ حم سجدہ رکوع ۱) (۷۲) أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ (سورہ حم سجدہ

رکوع ۲) (۷۳) اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (سورہ شوریٰ رکوع ۲) (۷۴) أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً

يُّعْبَدُوْنَ (سورہ زخرف رکوع ۴) (۷۵) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (سورہ دخان رکوع ۱)

(۷۶) لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ (سورہ دخان رکوع ۱) (۷۷) أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ (سورہ احقاف ۲)

(٧٨) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (سورہ محمد رکوع ۲) (٧٩) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ ط (سورہ ذٰریٰت رکوع ۳) (٨٠) هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج (سورہ حشر رکوع ۳) (٨١) إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (سورہ ممتحنہ رکوع ۱) (٨٢) اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (سورہ تغابن رکوع ۲) (٨٣) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (سورہ مزمل رکوع ۱) (٨٤) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ (سورہ کافرون) (٨٥) قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ (سورہ اخلاص)

উল্লেখিত ৮৫টি আয়াতের মধ্যে কালেমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা উহার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতগুলি ছাড়া আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যেইগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ভাবার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আমি এই পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে, তাওহীদই দ্বীনের মূল, কাজেই ইহার প্রতি যত বেশী একাগ্রতা ও মনোযোগ হইবে ততই দ্বীনের মধ্যে মজবুতী ও পরিপক্কতা আসিবে। এইজন্য এই বিষয়টিকে বিভিন্ন শব্দে এবং বিভিন্ন ধরনে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তওহীদের বিষয়টি অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য সামান্যতম স্থানও অন্তরে বাকী না থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত হাদীস আলোচিত হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ফাযায়েল উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যেখানে আয়াত এত বেশী পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে হাদীসের কথা বলাই বাহুল্য। অতএব সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কাজেই নমুনা স্বরূপ কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে।

(١) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ہے۔ اور تمام دعاؤں میں افضل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ہے۔

(كذا في المشكوة برواية الترمذي وابن ماجة وقال المنذري رواه ابن ماجة والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه وقال الحاكم صحيح الإسناد قلت رواه الحاكم بسندين و

صححهما واقره عليهما الذهبي و كذا رقم له بالصحة السيوطي في الجامع،

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বোত্তম দোয়া হইল, আল–হামদুলিল্লাহ। (মিশকাত ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিকির হওয়া তো সুস্পষ্ট এবং বহু হাদীসে ইহা অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পুরা দ্বীনের স্থায়ীত্বই হইল কালেমায়ে তাওহীদের উপর। সুতরাং ইহার সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে।

আর 'আল–হামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এই হিসাবে বলিয়াছেন যে, দয়ালু দাতার প্রশংসার উদ্দেশ্যই হইল কিছু চাওয়া। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন সর্দার, আমীর বা নওয়াবের প্রশংসাপত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য তাহার নিকট কিছু চাওয়াই হইয়া থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে যেন ইহার পর আল–হামদুলিল্লাহও পড়িয়া নেয়। কারণ, আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এর পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ উল্লেখ করিয়াছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বড় যিকির হইল কালেমায়ে তাইয়্যেবা। কেননা, ইহাই হইল দ্বীনের সেই ভিত্তি যাহার উপর পুরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। ইহা সেই পবিত্র কালেমা যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই দ্বীনের চাকা ঘুরে। এই কারণেই সূফী ও আরেফগণ এই কালেমার প্রতি গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং সমস্ত যিকির–আযকারের উপর ইহাকে প্রাধান্য দেন এবং যতদূর সম্ভব ইহার যিকির বেশী পরিমাণে করাইয়া থাকেন। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, এই কালেমার যিকির দ্বারা যে পরিমাণ ফায়দা ও উপকারিতা হাসিল হয় তাহা অন্য কোন যিকির দ্বারা হাসিল হয় না। যেমন, সাইয়েদ আলী ইবনে মাইমুন মাগরেবী (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, শায়খ উলওয়ান হামাভী (রহঃ) যিনি একজন বিজ্ঞ আলেম মুফতী ও মুদাররেস ছিলেন। তিনি যখন সাইয়েদ সাহেবের খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাহার প্রতি সাইয়েদ সাহেবের মনোযোগ নিবদ্ধ হইল তখন তিনি তাহার শিক্ষকতা ও ফতওয়া দান ইত্যাদি সকল কাজকর্ম বন্ধ করাইয়া তাহাকে

সর্বক্ষণের জন্য যিকিরে মশগুল করিয়া দিলেন। সাধারণ লোকদের তো কাজই হইল অভিযোগ করা আর গালাগালি দেওয়া। কাজেই লোকেরা খুব হৈচৈ আরম্ভ করিল যে, শায়খের উপকার হইতে দুনিয়াকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, শায়েখকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিন পর সাইয়েদ সাহেব জানিতে পারিলেন শায়খ সাহেব কোন এক সময় কুরআন তেলাওয়াত করেন। সাইয়্যেদ সাহেব ইহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না ; সাইয়্যেদ সাহেবের উপর ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতার অপবাদ লাগিতে শুরু হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শায়েখের উপর যিকিরের প্রভাব পড়িল এবং অন্তরে রঙ ধরিয়া গেল। তখন সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, এইবার তেলাওয়াত আরম্ভ কর। শায়খ যখন কুরআন পাক খুলিলেন, তখন প্রতিটি শব্দে তিনি এমন এলেম ও মারেফাত দেখিতে পাইলেন যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, খোদা না করুন আমি কুরআন তেলাওয়াত নিষেধ করি নাই বরং এই জিনিসকে পয়দা করিতে চাহিয়াছিলাম।

এই পবিত্র কালেমা যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমানের মূল, কাজেই যতবেশী ইহার যিকির করা হইবে ততই ঈমানের জড় মজবুত হইবে। এই কালেমার উপরই ঈমান নির্ভর করে ; বরং গোটা জগতের অস্তিত্বই ইহার উপর নির্ভরশীল। যেমন, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে একজনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হইতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যতদিন পর্যন্ত জমিনের বুকে একজনও আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে কেয়ামত হইবে না।

(২) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ مُوْسٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَبِّ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ بِهٖ قَالَ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ يَارَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهٖ قَالَ يَا مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ فِىْ كَفَّةٍ وَّلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فِىْ كَفَّةٍ مَالَتْ

حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام نے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، کہ مجھے کوئی وِرد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں، ارشادِ خداوندی ہوا، کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کہا کرو، انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے ارشاد ہوا کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کہا کرو. عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص

بِهِمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو ارشاد ہوا کہ اگر
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ کو رکھ دیا جائے تو لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔

(رواه النسائی وابن حبان والحاکم کلهم من طریق دراج عن ابی الهیثم عنه و
قال الحاکم صحیح الاسناد کذا فی الترغیب قلت قال الحاکم صحیح الاسناد و
لم یخرجاه واقره علیه الذهبی و اخرج فی المشکوٰة بروایة شرح السنة نحوه زاد
فی منتخب الکنز ابا یعلی والحکیم وابانعیم فی الحلیة والبیهقی فی الاسماء و
سعید بن منصور فی سننه وفی مجمع الزوائد رواه ابو یعلی ورجاله وثقوا وفیهم
ضعف)

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন ওজীফা শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। তিনি আরজ করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! ইহা তো সকলেই পড়িয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাহিতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হইল, হে মূসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–ওয়ালা পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। (তারগীব ঃ নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ইহাই যে, যে জিনিস যত বেশী প্রয়োজনীয় উহাকে ততবেশী ব্যাপকভাবে দান করিয়া থাকেন। দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই দেখা যাক, শ্বাস–প্রশ্বাস, পানি ও বাতাস কত ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই আল্লাহ তায়ালাও এইগুলিকে কত ব্যাপক করিয়া রাখিয়াছেন। তবে ইহাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে ওজন হইল এখলাছের। যেই পরিমাণ এখলাছের সাথে কোন কাজ করা হইবে ততই ওজনী হইবে। আর এখলাছের অভাব যে পরিমাণ হইবে ততই হালকা হইবে। এখলাছ পয়দা করার জন্যও এই কালেমার বেশী বেশী যিকির যত ফলদায়ক অন্য কোন জিনিস এত

ফলদায়ক নয়। এইজন্যই এই কালেমার নাম হইতেছে জিলাউল–কুলূব (দিলের জং দূরকারী)। তাই সূফীগণ বেশী পরিমাণে এই কালেমার যিকির করাইয়া থাকেন এবং প্রতিদিন শত শত বার বরং হাজার হাজার বার ইহার ওজীফা নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক মুরীদ নিজের শায়খের নিকট বলিল, হুযূর! আমি যিকির করি কিন্তু আমার দিল গাফেল থাকে। শায়খ বলিলেন, তুমি নিয়মিত যিকির করিতে থাক আর আল্লাহর শোকর আদায় করিতে থাক যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ অর্থাৎ জবানকে তাঁহার যিকির করার তওফীক দান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে দিলের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগের জন্যও দোয়া করিতে থাক।

এইরূপ ঘটনা 'এহয়াউল উলূম' গ্রন্থেও আবু ওসমান মাগরেবী (রহঃ) সম্পর্কেও নকল করা হইয়াছে। জনৈক মুরীদ তাঁহার নিকট এই অভিযোগ করার পর তিনি একই জবাব দিয়াছিলেন। প্রকৃতই ইহা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি শোকর কর তবে আমি বাড়াইয়া দিব। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ, যিকির আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত, সুতরাং আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, তিনি যিকিরের তওফীক দান করিয়াছেন।

(٣) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لَّا يَسْئَلَنِیْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ۔

حضرت ابوہریرہؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہے۔

(رواه البخاری وقد اخرجه الحاکم بمعناه وذکر صاحب بهجة النفوس فی الحدیث اربعا وثلثین بحثا)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে, তোমার আগে এই ব্যাপারে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না (অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন,) আমার শাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত ও সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি হইবে যে অন্তরের এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ মানুষকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার তৌফিক পক্ষে হওয়াকে সৌভাগ্য বলে।

এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠকারী শাফায়াতের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হওয়ার দুই রকম অর্থ হইতে পারে ঃ

এক. এই হাদীসে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যে এখলাসের সহিত মুসলমান হইয়াছে এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা ছাড়া তাহার কাছে আর কোন নেক আমল নাই। এই অবস্থায় শাফায়াত দ্বারাই তাহার সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, কেননা তাহার কাছে তো অন্য কোন আমল নাই। হাদীসের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহার অর্থ ঐ সমস্ত হাদীসের কাছাকাছি হইবে যেখানে এরশাদ হইয়াছে, আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গোনাহওয়ালাদের জন্য হইবে। কেননা তাহারা নিজেদের আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে ; কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবার বরকতে তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

দুই. হাদীস দ্বারা ঐ সকল লোককে বুঝানো হইয়াছে যাহারা এখলাছের সহিত কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করিতে থাকে এবং তাহাদের নেক আমলও রহিয়াছে। তাহাদের সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হওয়ার অর্থ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত দ্বারা তাহারা বেশী উপকৃত হইবে, কেননা উহা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়ত ছয় প্রকারের হইবে। এক, হাশরের ময়দানের বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হইবে। কেননা, হাশরের ময়দানে সমস্ত মাখলূক বিভিন্ন প্রকার কষ্টে লিপ্ত হইয়া অসহ্য অবস্থায় এই কথা বলিতে থাকিবে যে, আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া

হইলেও এই সকল কষ্ট হইতে নাজাত দেওয়া হউক। তখন একের পর এক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবীদের খেদমতে হাযির হইবে যে, আপনিই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন। কিন্তু কাহারও সুপারিশ করার সাহস হইবে না। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়ত করিবেন। এই শাফায়ত সমস্ত জগত, সমস্ত সৃষ্টি, জ্বিন, ইনসান, মুসলমান, কাফের সকলের জন্য হইবে এবং সকলেই উপকৃত হইবে। কিয়ামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার শাফায়াত কোন কোন কাফেরের আজাব হালকা করার জন্য হইবে। যেমন আবু তালেব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার শাফায়াত কোন কোন মুমিনকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনার জন্য হইবে, যাহারা পূর্বেই উহাতে দাখিল হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ প্রকার শাফায়াত কতিপয় এমন মুমিনের জন্য হইবে, যাহাঁরা গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে ; তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে ক্ষমা এবং জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফায়াত করা হইবে। পঞ্চম প্রকার শাফায়াত, কোন কোন মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হইবে। ষষ্ঠ প্রকার শাফায়াত, মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হইবে।

(٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا قَالَ اَنْ تَحْجُزَهٗ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ (رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر)

حضرت زیدؓ بن ارقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔

(৪) হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কলেমার এখলাছ (এর আলামত) কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহাকে হারাম কাজসমূহ হইতে বাধা প্রদান করে।

(তাবারানী)

ফায়দা ঃ ইহা পরিষ্কার কথা যে, যখন হারাম কাজ হইতে বিরত থাকিবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–তে বিশ্বাসী হইবে তখন নিঃসন্দেহে

জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি হারাম কাজ হইতে বিরত নাও থাকে, তবুও নিঃসন্দেহে এই পাক কালেমার বরকতে নিজের মন্দ কাজের শাস্তি ভোগ করার পর কোন এক সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাঁ, খোদা না করুন, যদি অন্যায় ও বদ আমলসমূহের কারণে সে ইসলাম ও ঈমান হইতেই বঞ্চিত হইয়া যায়, তবে ভিন্ন কথা।

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহঃ) 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী হইল, সে যেন বেশী বেশী করিয়া কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িতে থাকে, নিজের ঈমান বাকী থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়াও করিতে থাকে এবং নিজেকে গোনাহ হইতে বাঁচাইতে থাকে। কেননা, বহু লোক এমন রহিয়াছে যে, গোনাহের কারণে শেষ পর্যন্ত তাহাদের ঈমান চলিয়া যায়। ফলে দুনিয়া হইতে কুফরের অবস্থায় বিদায় নেয়। ইহা হইতে বড় মুসীবত আর কি হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির নাম সারাজীবন মুসলমানদের তালিকায় রহিল কিন্তু কেয়ামতের দিন কাফেরদের তালিকাভুক্ত হইয়া গেল। ইহা সত্যিকার ও চরম আফসোসের বিষয়। যে ব্যক্তি সারাজীবন গীর্জা বা মন্দিরে কাটাইল অবশেষে তাহাকে কাফেরদের দলভুক্ত করা হইল, তাহার জন্য আফসোস নাই ; আফসোস তো তাহার জন্য যে মসজিদে জীবন কাটাইল অথচ কাফেরদের মধ্যে গণ্য হইল। সাধারণতঃ অধিক গোনাহ ও নির্জনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অনেক লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট অন্যের মাল-সম্পদ গচ্ছিত থাকে ; তাহারা জানে যে, ইহা অন্যের মাল ; কিন্তু মনকে এই বলিয়া বুঝায় যে, কোন একসময় আমি তাহাকে ফেরত দিয়া দিব এবং পাওনাদার হইতে মাফ করাইয়া নিব। কিন্তু উহার সুযোগ আর হইয়া উঠে না, পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায়। অনেক লোক এমন রহিয়াছে যে, স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে—বুঝা সত্ত্বেও স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত থাকে আর এই অবস্থাতেই মৃত্যু আসিয়া যায় যে, তওবার করারও তৌফিক হয় না। বস্তুতঃ এই ধরনের অবস্থাতেই পরিশেষে ঈমানহারা হইয়া যায়। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই ধরনের অবস্থা হইতে রক্ষা করুন।)

হাদীসের কিতাবসমূহে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক যুবকের ইন্তেকাল হইতে লাগিলে লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, এই যুবক কালেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দিলের উপর যেন একটি তালা লাগিয়া আছে। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, যুবকের উপর তাহার মা অসন্তুষ্ট ; সে মাকে কষ্ট দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করিয়া উহাতে তোমার ছেলেকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, তবে তুমি কি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সুপারিশ করিবে? সে আরজ করিল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তোমার এই ছেলের অন্যায়কে ক্ষমা করিয়া দাও। সে ক্ষমা করিয়া দিল। অতঃপর যুবককে কালেমা পড়িতে বলা হইলে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়িয়া নিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন যে, তাঁহার ওসীলায় যুবকটি দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইল।

এই ধরনের শত শত ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, আমরা এমন এমন গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকি যাহার কুফল আমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এহয়াউল উলূমের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পাঠ করিলেন এবং উহাতে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ ভেজাল না করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। হযরত আলী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা বুঝাইয়া দিন যে, ভেজাল করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং উহার তালাশে লাগিয়া যাওয়া। বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কথা বলে নবীগণের মত কিন্তু কাজ করে অহঙ্কারী ও অত্যাচারী লোকদের মত। যদি কেহ এই কালেমাকে উক্তরূপ কোন কাজ না করিয়া পড়ে, তবে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

(৫) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰی یُفْضِیَ اِلَی الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہونچتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں

سے بچتا رہے۔

(رواہ الترمذی وقال حدیث حسن غریب کذا فی الترغیب وھکذا فی المشکوٰۃ لکن لیس فیہا حسن بل غریب فقط قال القاری ورواہ النسائی وابن حبان وعزاہ السیوطی فی الجامع الی الترمذی ورقم لہ بالحسن وحکاہ السیوطی فی الدر من طریق ابن مردویہ عن ابی ھریرۃ ولیس فیہ ما اجتنب الکبائر والجامع الصغیر بروایۃ الطبرانی عن معقل بن یسار لکل شئ مفتاح ومفتاح السمٰوٰت قول لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ورقم لہ بالضعف)

(৫) কোন বান্দা এমন নাই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর তাহার জন্য আসমানসমূহের দরজা খুলিয়া যায় না। এমনকি এই কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, ইহার পাঠকারী কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তারগীব ঃ তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কত বড় ফযীলত এবং চরম কবুলিয়াতের কথা যে, এই কালেমা সরাসরি আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। একটু আগে ইহাও জানা গিয়াছে যে, কবীরা গোনাহের সহিত পড়া হইলেও ইহা ফায়দা হইতে খালি নহে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য এবং আসমানের সকল দরজা খুলিয়া যাওয়ার জন্য 'কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা'কে শর্ত করা হইয়াছে। নতুবা কবীরা গোনাহের সহিতও সওয়াব কবুল হইতে খালি নহে।

কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসের মর্ম এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর তাহার রূহের সম্মানার্থে আসমানের সকল দরজা খুলিয়া যাইবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুইটি কালেমা এমন আছে যে, উহাদের একটির জন্য আরশ পর্যন্ত কোন বাধা নাই আর অপরটি জমিন ও আসমানকে (নিজ নূর অথবা নিজ সওয়াব দ্বারা) ভরিয়া দেয়। একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপরটি আল্লাহু আকবার।

(৬) عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ شَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت شدادؓ فرماتے ہیں اور حضرت عبادہؓ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِيْ اَهْلَ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاَمَرَ بِغَلْقِ الْاَبْوَابِ وَقَالَ ارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ بَعَثْتَنِيْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَ وَعَدْتَّنِيْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَاَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ۔

دریافت فرمایا کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں نہیں، ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا کواڑ بند کردو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھا) پھر فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ پر جنّت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

(رواه احمد باسناد حسن والطبراني وغيرهما كذا في الترغيب قلت واخرجه الحاكم وقال اسمٰعيل بن عياش احد ائمة اهل الشام وقد نسب الى سوء الحفظ وانا على شرطي في امثاله وقال الذهبي راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه رحيم اه وفي مجمع الزوائد رواه احمد والطبراني والبزار ورجال موثقون اه)

(৬) হযরত শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন এবং হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) এই ঘটনার সমর্থন করেন যে, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মজলিসে কোন অপরিচিত (অমুসলিম) লোক নাই তো? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তখন তিনি বলিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম (এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়িলাম)। অতঃপর বলিলেন, আল–হামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই কালেমা দিয়া পাঠাইয়াছ এবং এই কলেমার উপর জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছ। আর তুমি কখনও ওয়াদা খেলাফ কর না। ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ অপরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং দরজা বন্ধ করিতে বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, উপস্থিত লোকদের

কালেমা পাঠের দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগফেরাতের সুসংবাদ পাইবার আশাবাদী ছিলেন ; অন্যদের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। সূফীগণ উক্ত হাদীস দ্বারা মুরীদগণকে যিকিরের তালকীন (তালীম) করার বিষয়টি প্রমাণিত করেন। 'জামেউল উলূম' কিতাবে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জামাতবদ্ধভাবে বা একা একা যিকিরের তালীম দিয়াছেন। জামাতবদ্ধভাবে তালীম দেওয়ার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এমতাবস্থায় দরজা বন্ধ করার দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ পূর্ণ করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই অপরিচিত লোক মজলিসে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেননা, অপরিচিত ব্যক্তির মজলিসে উপস্থিতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ না হইলেও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই।

چہ خوش است باتو بزمے بنہفتہ سازکردن   درخانہ بند کردن سرشیشہ باز کردن

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুরার বোতলের মুখ খুলিয়া তোমার সহিত গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়া কতই না আনন্দের বিষয় !

(৭) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی تازہ کرتے رہا کرو. صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو.

(رواه احمد والطبرانی واسناد احمد حسن كذا فی الترغیب قلت ورواه الحاكم فی صحيحه وقال صحيح الاسناد وقال الذهبی صدقة (الراوی) ضعفوه قلت هو من رواة ابی داؤد والترمذی واخرج له البخاری فی الادب المفرد وقال فی التقريب صدوق له اوهام وذكره السيوطی فی الجامع الصغير برواية احمد والحاكم ورقم له بالصحة وفی مجمع الزوائد رواه احمد واسناده جيد وفی موضع آخر رواه احمد والطبرانی ورجال احمد ثقات)

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করিতে থাক অর্থাৎ তাজা করিতে থাক।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানকে কিভাবে নূতন করিব? এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়িতে থাক। (তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, ঈমান পুরাতন হইয়া যায় যেমন কাপড় পুরাতন হইয়া যায়, অতএব আল্লাহ তায়ালার নিকট ঈমানের নতুনত্ব চাহিতে থাক। পুরাতন হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল গোনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং ঈমানী নূর কমিয়া যাইতে থাকে। যেমন এক হাদীসে আসিয়াছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খাঁটিভাবে তওবা করে তবে সেই দাগ মিটিয়া যায়। নতুবা জমিয়া থাকে। অতঃপর যখন আরও একটি গোনাহ করে তখন আরও একটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচাযুক্ত হইয়া যায়। যাহা আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে মুতাফ্‌ফিফীনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

ইহার পর অন্তরের অবস্থা এমন হইয়া যায় যে, সত্য কথা উহাতে আর কোন আছর করে না বরং প্রবেশই করে না।

এক হাদীসে আসিয়াছে, চারটি জিনিস মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করিয়া দেয়— (১) আহমকদের সাথে মোকাবিলা (২) গোনাহের আধিক্য (৩) স্ত্রীলোকদের সহিত বেশী মেলামেশা (৪) মৃত লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করা। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মৃত লোক কাহারা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সমস্ত ধনী ব্যক্তি, যাহাদের অন্তরে ধনসম্পদ অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَبْلَ اَنْ يُّحَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لآ الٰہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔

(رواه ابو يعلى باسناد جيد قوى كذا فى الترغيب وعزاه فى الجامع الى ابى يعلى وابن عدى فى الكامل ورقم له بالضعف وزاد لقنوها موتاكم وفى مجمع الزوائد رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ضمام وهو ثقة)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র সাক্ষ্য দিতে থাক ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা এই কালেমা বলিতে পারিবে না। (তারগীব ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন মৃত্যু বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা মৃত্যুর পর আমলের আর কোন সুযোগ থাকে না। খুবই স্বল্প সময়ের জিন্দেগী, ইহাই আমল করার ও বীজ বপনের সময়। আর মৃত্যুর পরের জীবন অত্যন্ত লম্বা, সেখানে উহাই পাওয়া যাইবে যাহা এখানে বপন করা হইয়াছে।

(৯) عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے وہ کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے۔

(رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرطهما ورویاہ بنحوہ کذا فی الترغیب)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা ইহাকে অন্তরে সত্য জানিয়া পাঠ করিবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। সেই কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তারগীব ঃ হাকিম)

ফায়দা ঃ বহু হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। যদি এইসব হাদীসের অর্থ এই হয় যে, সে মুসলমানই ঐ সময় হইয়াছে তবে তো কথাই নাই কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের গোনাহ সর্বসম্মতভাবে মাফ হইয়া যায়। আর যদি অর্থ এই হয় যে, পূর্ব হইতেই সে মুসলমান ছিল মৃত্যুর আগে কালেমা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহা হইলেও আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন ইহা কোন অসম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করিয়াছেন শিরক ছাড়া যাবতীয় গোনাহ তিনি যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম হইতে ইহাও নকল করিয়াছেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন দ্বীনের অন্যান্য হুকুম নাযিল হইয়াছিল না।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ, এই কালেমাকে উহার হক আদায় করিয়া পড়া, যাহা পূর্বে ৪নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলেমও এই

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলিয়াছেন ইহার অর্থ অনুতাপ সহকারে এই কালেমা পড়িয়াছে। কেননা প্রকৃত তওবা ইহাই এবং এই অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ হইল, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে না। এই সবকিছু ছাড়াও আরেকটি সুস্পষ্ট বিষয় হইল, কোন জিনিসের বিশেষ কোন আছর বা ক্রিয়া থাকা এক কথা আর কোন কারণবশতঃ ঐ ক্রিয়া বাস্তবায়িত না হওয়া ভিন্ন কথা, এই দুইয়ের মাঝে কোন বিরোধ নাই। যেমন সাকমুনিয়া ঔষধের ক্রিয়া হইল, পায়খানা তরল করা। কিন্তু ইহা সেবনের পর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিকারী কোন খাদ্য খাওয়া হয়, তবে সাকমুনিয়া ক্রিয়া করিবে না। তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নয় যে, সাকমুনিয়া ঔষধটির কোন ক্রিয়া নাই। বরং বিশেষ কারণবশতঃ এই ব্যক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ হইতে পারে নাই।

(١٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں۔

(رواہ احمد کذا فی المشکوٰۃ والجامع الصغیر ورقم له بالضعف وفی مجمع الزوائد رواہ احمد ورجاله وثقوا الا ان شهرًا لم یسمعه عن معاذ اه ورواہ البزار کذا فی الترغیب وزاد السیوطی فی الدر ابن مردویه والبیهقی وذکرہ فی المقاصد الحسنة بروایة احمد بلفظ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ واختلف فی وجه حمل الشهادة و هی مفرد علی المفاتیح وهی جمع علی اقوال اوجههما عندی انها لما کانت مفتاحًا لکل باب من ابوابه صارت کالمفاتیح)

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের চাবি–সমূহ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র সাক্ষ্য প্রদান করা। (মিশকাত ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ চাবিসমূহ এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, এই কালেমাই প্রত্যেক দরজা ও প্রত্যেক জান্নাতের চাবি এই কারণে সকল চাবিই এই কালেমা হইল। অথবা এই হিসাবে যে এই কলেমাও দুইটি অংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে, একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি অপরটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর স্বীকৃতি। কাজেই দুইটি হইয়া গেল অর্থাৎ উভয়ের সমন্বয়ে খুলিতে পারে। ইহাছাড়া আরও যে সকল হাদীসে

জান্নাতে প্রবেশ করার কথা অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, উহা দ্বারা পুরা কালেমাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতের মূল্য হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(۱۱) عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلَّا طُبِسَتْ مَا فِى الصَّحِيْفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى تَسْكُنَ اِلٰى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

(رواه ابو يعلى كذا فى الترغيب وفى مجمع الزوائد فيه عثمان بن عبد الرحمٰن الزهرى وهو متروك اھ)

(১১) যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়—দিনে অথবা রাত্রে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ মিটিয়া যায় এবং উহার স্থলে নেকীসমূহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তারগীব ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ 'গোনাহসমূহ মিটিয়া নেকীসমূহ লিখিত হওয়া' সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই ধরনের আয়াত ও হাদীসের কতিপয় ব্যাখ্যাও লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাখ্যা হিসাবে আমলনামা হইতে গোনাহ মিটানোর বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এখলাছ থাকা জরুরী। বেশী বেশী আল্লাহর তায়ালার পবিত্র নাম লওয়া এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা বেশী পড়ার দ্বারাও এখলাছ পয়দা হইয়া থাকে। এই জন্যই এই পাক কালেমার নাম 'কালেমায়ে এখলাছ'।

(۱۲) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَمُوْدًا مِّنْ نُوْرٍ بَيْنَ يَدَىِ الْعَرْشِ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اهْتَزَّ ذٰلِكَ الْعَمُوْدُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُسْكُنْ فَيَقُوْلُ كَيْفَ اَسْكُنُ وَلَمْ يُغْفَرْ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی

لِقَائِلِهَا فَيَقُوْلُ اِنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ فَيَسْكُنُ عِنْدَ ذٰلِكَ۔

ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کردی تو وہ ستون ٹھیر جاتا ہے۔

(رواہ البزار وهو غريب كذا فی الترغيب وفی مجمع الزوائد فيه عبد الله بن ابراهيم بن ابی عمرو وهو ضعيف جدًا اه قلت وبسط السيوطی فی اللآلی على طرقه وذكر له شواهد)

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আরশের সামনে একটি নূরের খুঁটি রহিয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন ঐ খুঁটি দুলিতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, থামিয়া যাও। সে আরজ করে, কিভাবে থামিব ; অথচ কালেমা পাঠকারীকে এখনও মাফ করা হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। তখন ঐ খুঁটি থামিয়া যায়। (তারগীব ঃ বায্যার)

ফায়দা ঃ মুহাদ্দিসগণ যদিও এই রেওয়ায়াতকে দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন সনদে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় উহার সহিত আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, আমি ঐ ব্যক্তির জবানে কালেমায়ে তাইয়্যেবা এইজন্যই জারী করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহাকে মাফ করিয়া দিব। আল্লাহ তায়ালার কত দয়া ও মেহেরবানী যে, নিজেই তওফীক দান করেন এবং নিজেই মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দেন।

হযরত আতা (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একবার বাজারে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বাঁদী বিক্রয় হইতেছে। তিনি খরিদ করিয়া নিলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই পাগলী উঠিল ও ওজু করিয়া নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা এই ছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। নামায শেষ করিয়া বলিল, হে আমার মাবূদ! আমার প্রতি আপনার যে মহব্বত উহার দোহাই, আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত আতা (রহঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, ওহে বাঁদী! তুমি এইভাবে বল, আপনার প্রতি আমার যে মহব্বত উহার দোহাই। ইহা শুনিয়া বাঁদী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তাঁহার হকের কসম, আমার প্রতি যদি তাঁহার মহব্বত না হইত তবে তোমাকে এই সুখ নিদ্রায় শোয়াইয়া রাখিয়া আমাকে এইরূপ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। অতঃপর সে এই কবিতা পাঠ করিল ঃ

اَلْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ
كَيْفَ الْقَرَارُ عَلٰى مَنْ لَّا قَرَارَ لَهٗ مِمَّا جَنَاهُ الْهَوٰى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ
يَارَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ فِيْهِ لِيْ فَرَجٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهٖ مَادَامَ بِيْ رَمَقٌ

অর্থ ঃ অস্থিরতা বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে, ধৈর্য শেষ হইয়া গিয়াছে, অশ্রু বহিয়া চলিয়াছে। এশক, মহব্বত ও অস্থিরতার হামলায় যাহার শান্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সে কিভাবে স্থির হইতে পারে! হে আল্লাহ! যদি এমন কোন জিনিস থাকে, যাহা দ্বারা মনের অস্থিরতা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তবে উহা আমার জীবনে দান করিয়া আমার উপর মেহেরবানী কর। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! আমার ও আপনার এই সম্পর্ক এখন আর গোপন থাকে নাই, অতএব আমাকে উঠাইয়া নিন। এই কথা বলিয়া সে এক চিৎকার দিল এবং মৃত্যুবরণ করিল। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা রহিয়াছে। পরিষ্কার কথা হইল এই যে, আল্লাহর তওফীক না হইলে কিছুই হয় না। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইচ্ছা করিতে পার না।" (সূরা তাকবীর, আয়াত ঃ ২৯)

(۱۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ وَلَا مَنْشَرِهِمْ وَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ يَنْفُضُوْنَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُسِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَيْسَ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لآ الٰہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدانِ حشر میں اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے (قبروں سے) اُٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کے لئے) رنج وغم دُور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لآ الٰہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔

(رواه الطبراني والبيهقي كلاهما من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني وفي متنه نكارة كذا في الترغيب وذكره في الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عمرؓ ورقم له بالضعف وفي اسنى المطالب رواه الطبراني وابويعلى بسند ضعيف وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني وفي رواية لَيْسَ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ في الاولى يحيى الحماني وفي الاخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف اه وقال السخاوي في المقاصد الحسنة رواه ابويعلى والبيهقي في الشعب والطبراني بسند ضعيف عن ابن عمرؓ اه قلت وما حكم عليه المنذرى بالنكارة مبناه اَنَّهُ حَمَلَ اَهْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلَى الظَّاهِرِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ فِي الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ فَيَكُوْنُ الْحَدِيْثُ مُخَالِفًا لِلْمَعْرُوْفِ فَيَكُوْنُ مُنْكَرًا لٰكِنَّهُ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ الْمَخْصُوْصُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَيَكُوْنُ مُوَافِقًا لِلنُّصُوْصِ الْكَثِيْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَسَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ فَالْحَدِيْثُ مُوَافِقٌ لَهَا لَا مُخَالِفٌ فَيَكُوْنُ مَعْرُوْفًا لَا مُنْكَرًا وذكر السيوطي في الجامع الصغير برواية ابن مردويه والبيهقي في البعث عَنْ عُمَرَ بِلَفْظِ سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُوْرٌ لَهٗ ورقم له بالحسن قلت و يؤيده حديث سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِي ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا رواه الترمذي والحاكم عن ابي هريرة والطبراني عن ابي الدرداء كذا في الجامع ورقم له بالصحة وفي الاتحاف عن ابي الدرداء مَوْقُوْفًا اَلَّذِيْنَ لَا تَزَالُ اَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ وفي الجامع الصغير برواية الحاكم ورقم له بالصحة اَلسَّابِقُ وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهٖ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)

(১৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না হাশরের ময়দানে। যেন ঐ দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসিতেছে যে, তাহারা যখন নিজেদের মাথা হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে কবর হইতে উঠিবে এবং বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি (চিরকালের জন্য) আমাদের উপর হইতে দুঃখ–চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকিবে, না কবরে।

(তারগীব ঃ তাবরানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, আপনাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? (আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ভেদ জানেন তবু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করাইতেন।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে জিবরাঈল! আমার উম্মতের চিন্তা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে যে, কিয়ামতের দিন তাহাদের কি অবস্থা হইবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেরদের ব্যাপারে না মুসলমানদের ব্যাপারে? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা হইতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে লইয়া একটি কবরস্থানে তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে বনী সালামা গোত্রের লোকদেরকে দাফন করা হইয়াছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি কবরের উপর তাঁহার একটি ডানা মারিলেন এবং বলিলেন قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস)। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি উঠিল এবং সে বলিতেছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর অন্য এক কবরে তাঁহার অপর ডানা মারিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর হুকুমে উঠিয়া আস। তৎক্ষণাৎ কবর হইতে একজন অত্যন্ত কালো কুশ্রী নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সে বলিতেছিল, হায় আফসোস! হায় লজ্জা! হায় মুসীবত! হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাও। সে ফিরিয়া গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, এই সকল লোক যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে (হাশরের দিন) সেই অবস্থায়ই উঠিবে।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালা বলিতে বাহ্যতঃ ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের এই পাক কালেমার সহিত বিশেষ সম্পর্ক ও মশগুলী রহিয়াছে। কারণ, দুধওয়ালা, জুতাওয়ালা, মোতিওয়ালা, বরফওয়ালা ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যাহার নিকট এই সমস্ত জিনিসের বিশেষভাবে বেচাকেনা হয় এবং এইসব জিনিস বিশেষভাবে

থাকে। কাজেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের সহিত এই ধরনের ব্যবহারে আপত্তির কিছু নাই, যাহা উপরের হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুরআন পাকে সূরা ফাতিরে এই উম্মতের তিনটি স্তর উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্তর, ছাবিক বিল খাইরাত ঃ যাহাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ১০০ বার করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন অবস্থায় উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِّثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحٰفِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ فَاِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اُس کے سامنے ننانوے دفتر اعمال کے کھولیں گے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک (یعنی جہاں تک نگاہ جاسکے وہاں تک) پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اُس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو) وہ عرض کرے گا نہیں (نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بداعمالیوں کا کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم

الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اللّٰهِ شَيْءٌ۔ نہیں ہے پھر ایک کاغذ کا پُرزہ نکالا جائے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ لکھا ہوا ہوگا ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوالے وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر اُن سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے گا اور دوسری جانب وہ پُرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلڑا اُڑنے لگے گا اُس پُرزہ کے وزن کے مقابلہ میں۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔

(رواه الترمذى وقال حسن غريب وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم كذا فى الترغيب قلت كذا قال الحاكم فى كتاب الايمان واخرجه ايضا فى كتاب الدعوات وقال صحيح الاسناد واقره فى الموضعين الذهبى وفى المشكوٰة اخرجه برواية الترمذى وابن ماجة وزاد السيوطى فى الدر فيمن عزاه اليهم احمد وابن مردويه واللالكائى والبيهقى فى البعث وفيه اختلاف وفى بعض الالفاظ كقوله فى اول الحديث يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ وفيه ايضا فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ اَوْ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً الحديث وعلم منه ان الاستدراك فى الحديث على محله ولا حاجة اذا الى ما اوله القارى فى المرقاة وذكر السيوطى ما يؤيد الرواية من الروايات الاخر)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হকতায়ালা শানুহু কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডাকিবেন এবং তাহার সামনে আমলের ৯৯টি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর এত বড় হইবে যে, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায়) প্রসারিত হইবে। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কি এই সমস্ত আমলনামার কোন কিছুকে অস্বীকার কর? আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে? (কোন গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়াছে কিংবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (অর্থাৎ, না অস্বীকার করার কিছু আছে, আর না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এই সমস্ত গোনাহের পক্ষে তোমার

নিকট কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, কোন ওজর নাই। এরশাদ হইবে—আচ্ছা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বাহির করা হইবে যাহাতে লেখা থাকিবে ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এরশাদ হইবে, যাও ইহাকে ওজন করাইয়া লও। সে আরজ করিবে, এতগুলি দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসিবে। এরশাদ হইবে, আজ তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরকে এক পাল্লায় রাখা হইবে আর অপরদিকে কাগজের ঐ টুকরাটি রাখা হইবে। তখন ঐ কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবেলায় দফতরওয়ালা পাল্লাটি শূন্যে উড়িতে থাকিবে। আসল কথা হইল এই যে, আল্লাহর নামের চাইতে ভারী আর কোন জিনিস নাই।

(তারগীব ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ ইহা এখলাছেরই বরকত, এখলাসের সহিত একবার পড়া, কালেমায়ে তাইয়্যেবা ঐ সমস্ত দফতরের মোকাবেলায় ভারী হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই জরুরী যে, কেহ যেন কোন মুসলমানকে হেয় মনে না করে এবং নিজেকে যেন তাহার তুলনায় উত্তম মনে না করে। কারণ, জানা নাই যে, তাহার কোন্ আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া যাইবে এবং তাহার নাজাতের জন্য উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে। আর নিজের অবস্থা জানা নাই যে, কোন আমল কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে কিনা।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল—একজন আবেদ, আরেকজন গোনাহগার। উক্ত আবেদ ব্যক্তি ঐ গোনাহগার ব্যক্তিকে সর্বদা তিরস্কার করিত। সে বলিত, আমাকে আমার আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দাও। একদিন আবেদ রাগান্বিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম! তোর কখনও মাগফেরাত হইবে না। আল্লাহ তায়ালা উভয়কে রূহের জগতে একত্রিত করিলেন এবং গোনাহগারকে রহমতের আশা করিত বলিয়া মাফ করিয়া দিলেন। আর আবেদকে এরূপ কসম খাওয়ার পরিণতিতে আজাবের হুকুম দিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা জঘন্যতম কসম ছিল। যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

(আল্লাহ তায়ালা কুফর ও শিরক মাফ করিবেননা। ইহা ছাড়া যাবতীয় গোনাহ যাহার জন্য চাহেন মাফ করিয়া দিবেন।) (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪৮)

তখন কাহারো এই কথা বলার কি অধিকার আছে যে, অমুকের মাগফিরাত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাও নয় যে, অন্যায় কার্যকলাপে গোনাহের কাজে নাজায়েয বিষয়ের উপর ধরপাকড় করা যাইবে না, টোকা যাইবে না। কুরআন ও হাদীসে শত শত জায়গায় ইহার হুকুম রহিয়াছে এবং না টোকার উপর শাস্তির ধমকি রহিয়াছে। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা কাহাকেও গোনাহ করিতে দেখিয়া শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না, তাহারাও ঐ ব্যক্তির সহিত গোনাহের শাস্তি ভোগ করিবে, আযাবে শরীক হইবে। এই বিষয়টিকে আমি আমার ফাযায়েলে তবলীগ নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় দেখিয়া নিবে।

এখানে একটি জরুরী বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দ্বীনদার লোকদের জন্য গোনাহগারদেরকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী মনে করা যেমন ধ্বংসকর তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদের জন্যও যে কোন লোককে—চাই সে যতই কুফরী কথা বলুক না কেন অনুসরণীয় ও বড় বানাইয়া লওয়া বিষতুল্য ও ধ্বংসকর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদাতীকে সম্মান করে সে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে। বহু হাদীসে আসিয়াছে, শেষ জমানায় বহু দাজ্জাল, ধোকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বাহির হইবে, যাহারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাইবে, যাহা তোমরা কখনও শুন নাই। এমন যেন না হয় যে, এই সকল লোক তোমাদেরকে গোমরাহ করিয়া ফেলে এবং ফেতনায় ফেলিয়া দেয়।

(১৫) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ جِئَ بِالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فَوُضِعْنَ فِىْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِى الْكِفَّةِ الْاُخْرٰى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھدیا جائے اور لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔

(اخرجه الطبرانی کذا فی الدر وهکذا فی مجمع الزوائد وزاد فی أوله لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته قال تلك أوجب وأوجب ثم قال والذي نفسي بيده الحديث قال رواه الطبراني ورجاله ثقات الا ان ابن ابی طلحة لم يسمع من ابن عباس)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ পাক জাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, যদি সমগ্র আসমান জমিন ও উহার মাঝে যত মানুষ আছে এবং যত জিনিস উহার মাঝে আছে এবং যাহা কিছু উহার নীচে আছে সমস্তই এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র সাক্ষ্য অপর পাল্লায় রাখা হয় তবু উহাই ওজনে ভারী হইয়া যাইবে। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিষয় বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পাক নামের সমতুল্য কোন বস্তুই নাই। হতভাগা ও বঞ্চিত ঐ সমস্ত লোক, যাহারা ইহাকে হালকা মনে করে। তবে ইহার মধ্যে ওজন এখলাছের দ্বারা পয়দা হয়। এখলাছ যত হইবে ততই এই পাক নামের ওজন ওজনী হইবে। এই এখলাছই পয়দা করার জন্য সূফী মাশায়েখগণের জুতা সোজা করিতে হয়।

এক হাদীসে উপরোক্ত বিষয়ের পূর্বে আরেকটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইযে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন কর। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এই কালেমা পড়ে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেহ সুস্থ অবস্থায় এই কালেমা পড়ে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো আরও বেশী জান্নাত ওয়াজেবকারী। ইহার পরই এই কসমযুক্ত বিষয় বলিয়াছেন, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١٦) عن ابن عباس رض قال جاء النحام ابن زيد وقردم بن كعب وبحري ابن عمرو فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله الها غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ تین کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے (نہیں مانتے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

بِذٰلِكَ بُعِثْتُ وَاِلٰى ذٰلِكَ اَدْعُوْا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَوْلِهِمْ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۔ الاٰية	ارشاد فرمایا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا) اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں

اسی بارہ میں آیت قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً نازل ہوئی۔

(اخرجه ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ كذا فی الدر المنثور)

(১৬) একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনজন কাফের উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদকে জানেন না (মানেন না)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই)। এই কলেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি, মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহ্বান করি, এই সম্পর্কেই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً (দুররে মানসূর ঃ ইবনে ইসহাক)

ফায়দা ঃ 'এই কালেমার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি' অর্থাৎ নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি এবং আমি মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহবান করি। ইহার অর্থ এই নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহাতে বিশেষত্ব রহিয়াছে। বরং সকল নবীকেই এই একই কালেমার সহিত নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে এবং সকল নবী (আঃ)গণই এই কালেমার দিকে দাওয়াত দিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোন নবী এমন নাই যিনি এই মোবারক কালেমার দাওয়াত না দিয়াছেন। কতই না বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদাশীল এই কালেমা যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সমস্ত সত্য মাজহাব একই পাক কালেমার দিকে মানুষকে ডাকিয়াছেন এবং ইহারই প্রচার করিয়াছেন। কোন রহস্য তো অবশ্যই আছে, যাহার কারণে কোন সত্য ধর্মই এই কালেমা হইতে খালি নহে। এই কালেমার সত্যতা সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

(সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৯)

ইহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা উহার সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

(١٧) عَنْ لَيْثٍ قَالَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَثْقَلُ النَّاسِ فِى الْمِيْزَانِ ذَلَّتْ اَلْسِنَتُهُمْ بِكَلِمَةٍ ثَقُلَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (اخرج الاصبهانى فى الترغيب كذا فى الدر)

حضرت عیسٰی علٰی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال (حشر کی ترازو میں اس لئے) سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو اُن سے پہلی اُمتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لاالٰہ الااللہ ہے۔

(১৭) হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলসমূহ (হাশরের দিন মীজানের পাল্লায় এইজন্য) সবচাইতে বেশী ভারী হইবে যে, তাহাদের জবান এমন এক কালেমায়ে অভ্যস্ত যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ভারী ছিল। উহা হইল, কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ ইহা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কালেমায়ে তাইয়্যেবার যেরূপ জোর তাকিদ ও অধিক পরিমাণে উহা পাঠ করার প্রচলন রহিয়াছে আর কোন উম্মতের মধ্যে এরূপ অধিক পাঠ করার প্রচলন নাই। সূফী মাশায়েখগণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নহে বরং কোটি কোটি পরিমাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক শায়খের কমবেশী শত শত মুরীদ আছে। প্রায় সকলেরই কালেমা তাইয়্যেবার ওজীফা হাজার হাজার সংখ্যায় দৈনিক আমলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। জামেউল উসূল কিতাবে আছে, 'আল্লাহ' শব্দের যিকির ওজীফা হিসাবে কমপক্ষে পাঁচহাজার বার আর বেশীর জন্য কোন সীমা নির্ধারিত নাই। আর সূফীগণের জন্য দৈনিক কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বার। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিমাণ সম্পর্কে লিখিয়াছে যে, কমপক্ষে দৈনিক পাঁচ হাজার বার। এই সমস্ত সংখ্যা মাশায়েখদের বিবেচনা অনুযায়ী কম-বেশী হইতে থাকে। আমার উদ্দেশ্য হইল হযরত ঈসা (আঃ)এর সমর্থনে মাশায়েখগণের ওজীফার একটি অনুমান পেশ করা যে, এক একজনের জন্য দৈনিক ওজীফার পরিমাণ কমপক্ষে এইরূপ বলা হইয়াছে।

আমাদের হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) 'কাওলে জামীল' কিতাবে তাঁহার পিতার উক্তি নকল করিয়াছেন যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে দুইশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতাম।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে দোযখের আগুন হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করিয়া রাখিলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশ্‌ফ হয় এবং জান্নাত–জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়া–দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, আমার মা দোযখে জ্বলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মা'র জন্য বখশিয়া দেই। যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মা'র জন্য বখশিয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিয়াছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল, একটি—সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল।

ইহা তো একটি মাত্র ঘটনা, না জানি এই উম্মতের নেককার লোকদের এই ধরনের কত অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাইবে। সূফীগণের পরিভাষায় একটি সাধারণ জিনিস 'পাছ আনফাছ' অর্থাৎ ইহার অভ্যাস করা যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির ব্যতীত না ভিতরে যায়, না বাহিরে আসে। উম্মতে মুহাম্মাদীর কোটি কোটি লোক এমন রহিয়াছেন যাহাদের এই অভ্যাস হাসিল রহিয়াছে। ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ)এর এই এরশাদের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, তাহাদের জবান এই

কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সহিত অভ্যস্ত ও অনুগত।

(১৮) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے (اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا) میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جو شخص اس (کلمہ) کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔

(اخرجه ابو الشيخ كذا في الدر)

(১৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, জান্নাতের দরজায় লিখিত আছে যে— اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا لَآ اُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا

আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই, যে ব্যক্তি এই (কালেমা) বলিতে থাকিবে আমি তাহাকে আযাব দিব না।

(দুররে মানসূর ঃ আবু শাইখ)

ফায়দা ঃ গোনাহের কারণে আজাব হওয়ার বিষয় অন্যান্য হাদীসে অনেক বেশী আসিয়াছে। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা যদি চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য হয়, তবে তো কোন প্রশ্ন থাকে না। আর যদি কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এরূপ এখলাসের সহিত এই কালেমার নিয়মিত পাঠকারী হয় যে, গোনাহ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে মোটেও আজাব দেওয়া না হয় তবে ইহাও আল্লাহর রহমতের কাছে অসম্ভব নয়। যেমন ১৪নং হাদীসে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৯নং হাদীসেও কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৯) عَنْ عَلِيٍّؓ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِىْ مَنْ جَاءَنِىْ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بِالْاِخْلَاصِ دَخَلَ فِىْ حِصْنِىْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِىْ اَمِنَ عَذَابِىْ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہٗ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گا۔

(اخرجه ابو نعيم في الحلية كذا في الدر وابن عساكر كذا في الجامع الصغير وفيه

ايضاً برواية الشيرازى عن على ورقم له بالصحة وفى الباب عن عتبان ابن مالك بلفظ
إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ رواه الشيخان
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ
وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رواه ابن ماجة

(১৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) হইতে নকল করেন যে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ ফরমান, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিয়া আসিবে সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিবে। আর যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিবে সে আমার আজাব হইতে নিরাপদ হইবে। (দুররে মানসূর ঃ হিলিয়া)

ফায়দা ঃ যদি ইহাও কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার সহিত শর্তযুক্ত হয় যেমন ৫নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তবে তো কোন প্রশ্নই নাই। আর যদি কবীরা গোনাহ সত্ত্বেও এই কালেমা পাঠ করে তবে নিয়মানুযায়ী আজাবের অর্থ চিরস্থায়ী আজাব হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালার রহমত নিয়মের অধীন নয়। কুরআন পাকে স্পষ্ট বলা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা শিরক মাফ করিবেন না। উহা ব্যতীত যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকেই আজাব দেন যে আল্লাহ তায়ালার সহিত হঠকারিতা করিয়া থাকে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে অস্বীকার করে।

এক হাদীসে আসিয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তায়ালার গোস্বাকে দূর করিতে থাকে যতক্ষণ দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য না দেয় এবং যখন সে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী নও।

(২০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَآءِ الْاِسْتِغْفَارُ ثُمَّ قَرَأَ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الاية

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے پھر اس کی تائید میں سورۂ محمد کی آیت فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تلاوت فرمائی۔

(اخرجه الطبراني وابن مردويه والديلمي كذا في الدر وفي الجامع الصغير برواية الطبراني مَا مِنَ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا مِنَ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ ورقموله بالحسن)

(২০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সমস্ত দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল এস্তেগফার। অতঃপর ইহার সমর্থনে সূরা মুহাম্মাদ–এর আয়াত তেলাওয়াত করেন— فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

(দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ সূফীগণ লিখিয়াছেন, দিল পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এই যিকিরের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার বরকতে দিল সমস্ত ময়লা হইতে পবিত্র হইয়া যায়। আর যখন ইহার সহিত এস্তেগফারও শামিল হইয়া যায় তবে তো কোন কথাই নাই। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইউনুস (আঃ)কে যখন মাছ খাইয়া ফেলে তখন উহার পেটে থাকা অবস্থায় তাহার দোয়া ছিল— لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৮৭)

(লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায–যালিমীন।) যে কোন ব্যক্তি এই শব্দগুলির সাহায্যে দোয়া করিবে উহা অবশ্যই কবুল হইবে।

এই পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু সেখানে সর্বোত্তম দোয়া 'আল–হামদুলিল্লাহ' বলা হইয়াছিল আর এখানে এস্তেগফার বর্ণিত আছে। এই ধরনের পার্থক্য অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। যেমন, একজন মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তির জন্য 'আল–হামদুলিল্লাহ' সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন গোনাহগার যেহেতু তওবা ও এস্তেগফারেরই বেশী মোহতাজ, কাজেই তাহার জন্য এস্তেফগারই সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিও বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। লাভ অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। আর ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য এস্তেগফার সবচাইতে বেশী উপকারী। ইহা ছাড়া এই ধরনের পার্থক্যের আরও কারণ রহিয়াছে।

(۲۱) عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ فَاَكْثِرُوْا مِنْهُمَا فَاِنَّ اِبْلِيْسَ قَالَ اَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوْبِ وَاَهْلَكُوْنِىْ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ اَهْلَكْتُهُمْ بِالْاَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

حضرت ابوبکر صدیق رض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انھوں نے مجھے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو میں نے ان کو ہوائے نفس (یعنی بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔

(اخرجه ابو يعلى كذا فى الدر والجامع الصغير ورقم له بالضعف)

(২১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার খুব বেশী করিয়া পড়। কেননা, শয়তান বলে, আমি মানুষকে গোনাহ দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি আর মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। যখন আমি দেখিলাম (যে, কিছুই তো হইল না) তখন আমি তাহাদিগকে নফসানী খাহেশাত (অর্থাৎ বেদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়াছি। অথচ তাহারা নিজেদেরকে হেদায়েতের উপর আছে বলিয়া মনে করিতে রহিল। (দুররে মানসূর ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, শয়তানের চরম উদ্দেশ্য হইল অন্তরকে স্বীয় বিষে বিষাক্ত করা। (ইহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীসে গিয়াছে।) আর এই বিষক্রিয়া তখনই হয় যখন অন্তর আল্লাহর যিকির হইতে খালি থাকে, তা না হইলে শয়তানকে লাঞ্ছিত হইয়া অন্তর হইতে ফিরিয়া যাইতে হয়। তদুপরি আল্লাহর যিকির অন্তর পরিষ্কারের উপায়। যেমন মিশকাত শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য পরিষ্কার করার বস্তু থাকে, অন্তর পরিষ্কার করার বস্তু হইল আল্লাহর যিকির। এমনিভাবে এস্তেগফার সম্পর্কেও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দিলের ময়লা এবং মরিচা দূর করে। আবু আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন, বান্দা যখন এখলাসের

সহিত লা ইলাহা বলে তখন দিল একদম পরিষ্কার হইয়া যায় (যেমন ভিজা কাপড় দ্বারা আয়না মুছিলে হয়)। অতঃপর যখন ইল্লাল্লাহ বলে, তখন পরিষ্কার অন্তরে উহার নূর প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, শয়তানের সমস্ত চেষ্টাই বেকার হইয়া গেল এবং সমস্ত মেহনত ব্যর্থ হইল।

'নফসানী খাহেশ' দ্বারা ধ্বংস করার অর্থ হইল, নাহককে হক মনে করিতে থাকে এবং দিলে যাহা আসে উহাকেই দ্বীন ও ধর্ম বানাইয়া নেয়। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় ইহার নিন্দা করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আপনি কি ঐ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়াছেন, যে নফসানী খাহেশকে নিজের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছে। আকল–বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাহাকে গোমরাহ করিয়াছেন, তাহার কান ও দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন এবং চোখের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন (ফলে সে সত্য কথা শুনে না, সত্য দেখে না এবং সত্য বিষয় তাহার অন্তরে প্রবেশ করে না) সুতরাং আল্লাহ (গোমরাহ করা)র পর কে হেদায়েত করিতে পারে? তবুও কি তোমরা বুঝ না? (সূরা জাছিয়া, আয়াত ঃ ২৩)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

এমন ব্যক্তি হইতে অধিক গোমরাহ আর কে হইবে যে আল্লাহর পক্ষ হইতে (তাহার নিকট) কোন প্রমাণ ছাড়া আপন নফসের খাহেশের উপর চলে। আল্লাহ তায়ালা এরূপ জালেমদিগকে হেদায়েত করেন না।

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৫০)

আরও বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শয়তানের অত্যন্ত কঠিন হামলা যে, সে বে–দ্বীনিকে দ্বীনের রূপ দিয়া বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষ উহাকে দ্বীন মনে করিয়া করিতে থাকে এবং উহার উপর সওয়াবের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আর যখন উহাকে সে ইবাদত এবং দ্বীন মনে করিয়া করিতেছে, তখন উহা হইতে তওবা কিভাবে করিবে। যদি কোন ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে তবে কোন না কোন সময় তওবা করার এবং বর্জন করার আশা

করা যায়। কিন্তু যখন কোন নাজায়েয কাজকে সে এবাদত বলিয়া মনে করে তবে উহা হইতে তওবা কেন করিবে এবং কেন উহা বর্জন করিবে ; বরং দিন দিন সে উহাতে আরও উন্নতি করিবে। শয়তানের এই কথা বলার ইহাই অর্থ যে, আমি তাহাকে পাপের কাজে লিপ্ত করি কিন্তু সে তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা আমাকে কষ্ট দিতে থাকে। এখন আমি তাহাকে এমন জালে আটকাইয়া দিয়াছি যে, উহা হইতে সে আর কখনও বাহির হইতে পারিবে না। তাই দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তরীকাকেই আপন রাহ্‌বর ও পথপ্রদর্শক বানানো অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে সুন্নতের খেলাফ কোন পন্থা যদি গ্রহণ করি, তবে নেকী বরবাদ ও গোনাহ নিশ্চিত হইবে।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর সামনে গোনাহসমূহকে সুসজ্জিত করিয়া পেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের এস্তেগফার আমার কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাদের সামনে আমি এমন গোনাহের কাজ পেশ করিয়াছি, যাহাকে তাহারা গোনাই মনে করে না ; উহা হইতে এস্তেগফার করার প্রয়োজন বোধ করে না। আর উহা হইল ঐ সকল বেদআত, যাহা তাহারা দ্বীন মনে করিয়া করে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর ; তুমি মানুষের সম্মুখে শয়তানকে লানত কর অথচ চুপে চুপে তাহার আনুগত্য কর আর তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর। কোন কোন সূফী–সাধক হইতে বর্ণিত আছে---ইহা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, মেহেরবান মনিব আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতসমূহ জানার এবং স্বীকার করার পরও তাঁহার নাফরমানী করা হয় আর শয়তানের শত্রুতা সত্ত্বেও এবং তাহার প্রতারণা, অবাধ্যতা জানা সত্ত্বেও তাহার আনুগত্য করা হয়।

(۲۲) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَّشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذٰلِكَ اِلٰى قَلْبِ مُّوْقِنٍ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی سچے دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنّت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اُس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں گے۔

(اخرجه احمد والنسائی والطبرانی والحاکم والترمذی فی نوادر الاصول وابن مردویه والبیهقی والاسماء والصفات كذا فی الدر وابن ماجة وفی الباب عن عمران بلفظ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ رَبُّهٗ وَاَنِّیْ نَبِیُّهٗ مُوْقِنًا مِنْ قَلْبِهٖ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَی النَّارِ رواه البزار ورقم له فی الجامع بالصحة وفیه ایضا بروایة البزار عن اَبِیْ سَعِیْدٍ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَرَقَمَ لَهٗ بِالصِّحَّةِ)

(২২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কোন ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অপর এক হাদীসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

(দুররে মানসূর ঃ আহমদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং অন্যদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসের কদর রহিয়াছে ; এবং এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী আজর ও সওয়াব রাখে। মানুষকে দেখানো বা মানুষকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোন আমল করিলে উহা আল্লাহর দরবারে শুধু বেকার নয় ; বরং উহা আমলকারী ব্যক্তির জন্য ধ্বংসেরও কারণ। কিন্তু এখলাসের সহিত সামান্য আমলও বহু ফল দান করে। অতএব, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত কালেমায়ে শাহাদাত পড়িবে তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হইবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাঁ, হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি নিজ গোনাহের কারণে কিছুদিন শাস্তিভোগ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে ; কিন্তু ইহাও জরুরী নহে। কোন খাঁটি বান্দার এখলাস যদি মালেকুল মুল্‌ক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট পছন্দ হইয়া যায়, তাহার কোন খেদমতই যদি পছন্দ হইয়া যায়, তবে তিনি সমস্ত গোনাহই মাফ করিয়া দিতে পারেন। এমন মহান দাতা ও দয়ালু খোদার জন্য যদি আমরা কুরবান হইতে না পারি তবে ইহা কত বড় বঞ্চনা !

মোটকথা,এই সমস্ত হাদীস শরীফে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠকারীর জন্য অনেক কিছুর ওয়াদা রহিয়াছে। যাহাতে উভয় প্রকার সম্ভাবনাই আছে—নিয়ম হিসাবে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর ক্ষমা পাওয়া, অথবা দয়া,

মেহেরবানী, এহসান ও শাহী দান হিসাবে শাস্তি ছাড়াই ক্ষমা পাওয়া।

ইয়াহ্‌য়া ইবনে আকছাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর দরবারে আমাকে হাজির করা হইলে ; আমাকে বলিলেন, হে গোনাহগার বুড়া! তুমি অমুক কাজ করিয়াছ, অমুক কাজ করিয়াছ, এইভাবে আমার গোনাহসমূহ গণনা করা হইল এবং বলা হইল যে, তুমি এমন এমন কর্ম করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম, আয় আল্লাহ্! আমার নিকট কি আপনার পক্ষ হইতে এই হাদীস পৌঁছে নাই? এরশাদ হইল, কি হাদীস পৌঁছিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমার নিকট আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট মা'মার (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট জুহ্‌রী (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ওরওয়াহ (রহঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট আপনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয় আমি তাহাকে (তাহার আমলের কারণে) শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাহার বার্ধক্যের কারণে লজ্জা করিয়া মাফ করিয়া দেই।" আর আপনি জানেন যে, আমি বৃদ্ধ। আল্লাহতায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন,আবদুর রাজ্জাক সত্য বলিয়াছে, মা'মারও সত্য বলিয়াছে, যুহরীও সত্য বলিয়াছে, উর্‌ওয়া–ও সত্য বর্ণনা করিয়াছে, আয়েশাও সত্য বলিয়াছে, নবীও সত্য বলিয়াছে, জিবরাঈলও সত্য বলিয়াছে এবং আমিও সত্য বলিয়াছি। ইয়াহয়া (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ করিলেন।

(٢٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ اِلَّا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ اِلَّا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَدُعَاءُ الْوَالِدِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لئے اللہ کے یہاں پہونچنے کے لئے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لئے ان دونوں کے لئے کوئی حجاب نہیں۔

(اخرجه ابن مردويه كذا فى الدر وفى الجامع الصغير برواية ابن النجار ورقم له بالضعف وفى الجامع الصغير برواية الترمذى عن ابن عمرو رقم له بالصحة اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَؤُهٗ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا دُوْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ)

(২৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, প্রত্যেক আমলের জন্য আল্লাহর দরবারে পৌঁছিতে মাঝখানে পর্দা থাকে। কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া এই দুইটি বিষয়ের জন্য কোন পর্দা নাই। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে মারদূয়াহ)

ফায়দা ঃ 'পর্দা না থাকা'র অর্থ হইল, এই দুইটি জিনিস কবুল হইতে একটুও বিলম্ব হয় না। অন্যান্য বিষয় কবুল হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের বাধা হয় কিন্তু এই বিষয়গুলি সরাসরি আল্লাহর দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া যায়।

এক কাফের বাদশার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, সে খুবই অত্যাচারী ও গোঁড়া স্বভাবের ছিল। ঘটনাক্রমে সে এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়া গেল। তাহার দ্বারা মুসলমানগণ যেহেতু খুবই কষ্ট পাইয়াছিল, তাই মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার জোশও ছিল বেশী। সুতরাং তাহাকে একটি ডেগের ভিতর বসাইয়া আগুনের উপর রাখিয়া দিল। সে প্রথমে তাহার দেবতাদেরকে ডাকিতে লাগিল এবং উহাদের কাছে সাহায্য চাহিল। যখন ইহাতে কোন ফল হইল না, তখন সেখানেই মুসলমান হইয়া গেল এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে শুরু করিল এবং অনবরত পড়িতে থাকিল। এরূপ অবস্থায় যে কি রকম আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত পড়িতে পারে উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ হইতে সাহায্য আসিল এবং এমন জোরে বৃষ্টি হইল যে, সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল এবং ডেগ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অতঃপর প্রচণ্ড বেগে বাতাস আসিয়া ঐ ডেগ উড়াইয়া নিয়া এক দূরবর্তী কাফের দেশে নিয়া ফেলিল। লোকটি অনবরত কালেমা তাইয়্যিবা পড়িতেছিল। আশেপাশে লোকজন আসিয়া ভীড় জমাইল এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করার পর বিস্তারিত অবস্থা জানিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

(۲۴) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔

(اخرجه احمد والبخاری ومسلم وابن ماجة والبیهقی فی الاسماء والصفات کذا فی الدر)

(২৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহার উপর জাহান্নাম হারাম হইবে। (দুররে মানসূর ঃ আহমদ, বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবার যিকির করিয়াছে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার বিষয়টিতো স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কবীরা গোনাহ না থাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত। অথবা জাহান্নাম হারাম হওয়ার অর্থ হইল চিরকালের জন্য উহাতে থাকা হারাম হইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি এখলাসের সহিত এই পবিত্র কালেমা পাঠকারীকে গোনাহ সত্ত্বেও জাহান্নাম হইতে একেবারেই মাফ করিয়া দেন তাহা হইলে কে বাধা দিতে পারে?

বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ বান্দাদেরও আলোচনা আসিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কোন কোন ব্যক্তিকে বলিবেন, তুমি অমুক গোনাহ করিয়াছ, অমুক গোনাহ করিয়াছ, এইভাবে যখন অনেক গোনাহ উল্লেখ করিবেন। আর সে মনে করিবে যে, আমি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি এবং স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছি আজও গোপন রাখিব। যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এইরূপ অনেক ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই ঐ সকল জাকেরীনদের জন্যও যদি এই ধরনের ব্যবহার হয় তবে উহা অসম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের মধ্যে বড় বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। সুতরাং যত বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায় উহাতে অবহেলা করা উচিত নয়। বড়ই সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যাহারা এই কালেমার বরকত বুঝিয়াছে এবং এই যিকিরের মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছে।

(۲۵) عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ رض بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ رُؤِىَ طَلْحَةُ حَزِيْنًا فَقِيْلَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ اِلَّا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَتَهٗ وَاَشْرَقَ لَوْنُهٗ وَرَاٰى مَا يَسُرُّهٗ

حضرت طلحہ رض کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سُنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اُس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے مگر مجھے حضور صلی اللہ

وَمَا مَنَعَنِیْ اَنْ اَسْأَلَهُ عَنْهَا اِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ رض اِنِّیْ لَاَعْلَمُهَا قَالَ فَمَا هِیَ قَالَ لَا نَعْلَمُ كَلِمَةً هِیَ اَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ اَمَرَ بِهَا عَمَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَهِیَ وَاللّٰهِ هِیَ۔

علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی (اُس کا رنج ہو رہا ہے) حضرت عمر رض نے فرمایا مجھے معلوم ہے طلحہ رض (خوش ہو کر) کہنے لگے کیا ہے حضرت عمر رض نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابوطالب) پر پیش کیا تھا اور وہ ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فرمایا واللہ یہی ہے واللہ یہی ہے۔

(اخرجه البيهقي في الاسماء والصفات كذا في الدر قلت اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين واقره عليه الذهبي واخرجه احمد واخرج ايضاً من مسند عمر رض بمعناه بزيادة فيهما واخرجه ابن ماجة عن يحيى بن طلحة عن امه وفي شرح الصدور للسيوطي واخرج ابو يعلى والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني اعلم كلمة الحديث)

(২৫) একদা লোকজন দেখিতে পাইল যে, হযরত তালহা (রাযিঃ) বিষন্ন মনে বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিলাম ঃ আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উহা পড়িবে তাহার মৃত্যুকষ্ট দূর হইয়া যাইবে। তাহার রং উজ্জ্বল হইতে থাকিবে এবং সে আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমি উক্ত কালেমা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। (তাই মনক্ষুন্ন আছি।) হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার ঐ কালেমাটি জানা আছে। হযরত তালহা (রাযিঃ) আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, উহা কি? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জানা আছে, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কালেমা নাই, যাহা তিনি স্বীয় চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় পেশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম ইহাই, আল্লাহর কসম, ইহাই সেই কালেমা।

(দুররে মানসূর ঃ বায়হাকী ঃ আসমা। হাকিম)

ফায়দা ঃ কালেমায়ে তাইয়্যেবা যে পরিপূর্ণ নূর ও আনন্দ ইহা বহু

হাদীস দ্বারা জানা যায় ও বুঝা যায়। হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ) 'মোনাবেবহাত' কিতাবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পাঁচটি অন্ধকার আছে এবং উহার জন্য পাঁচটিই চেরাগ রহিয়াছে। এক, দুনিয়ার মহব্বত অন্ধকার ; উহার চেরাগ তাকওয়া। দুই, গোনাহ অন্ধকার ; উহার চেরাগ তওবা। তিন, কবর অন্ধকার ; উহার চেরাগ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। চার, আখেরাত অন্ধকার ; উহার চেরাগ নেক আমল। পাঁচ, পুলসিরাত অন্ধকার ; উহার চেরাগ একীন।

হযরত রাবেয়া আদবিয়া (রহঃ) বিখ্যাত ওলী ছিলেন। সারারাত্র তিনি নামাযে মশগুল থাকিতেন। সুবহে সাদেকের পরে সামান্য একটু ঘুমাইতেন। যখন ভোরের আকাশ খুব ফর্সা হইয়া যাইত ঘাবড়াইয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন যে, আর কতকাল ঘুমাইতে থাকিবে? অতি শীঘ্রই কবরের জামানা আসিতেছে, সেখানে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকিতে হইবে। যখন মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন এক খাদেমাকে ওসিয়ত করিলেন, এই তালিযুক্ত পশমী কাপড়ে (যাহা তিনি তাহাজ্জুদের সময় পরিধান করিতেন) আমাকে কাফন দিবে। সুতরাং অসিয়ত অনুযায়ী তাঁহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হইল। মৃত্যুর পর সেই খাদেমা তাহাকে অত্যন্ত উত্তম লেবাছ পরিহিতা অবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সেই তালিযুক্ত কাপড় কোথায়? যাহাতে আপনাকে কাফন দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, উহা ভাঁজ করিয়া আমার আমলসমূহের সহিত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদেমা আবেদন করিল যে, আমাকে কোন নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর যিকির যতই পার করিতে থাক। উহাতে তুমি কবরে ঈর্ষার পাত্রী হইয়া যাইবে।

(٢٦) عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ اِنَّ رِجَالًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ رضـ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ رضـ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهِ فَاشْتَكٰى عُمَرُ رضـ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رضـ ثُمَّ اَقْبَلَا حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے حضرت عثمان رض فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے حضرت عمر رض میرے پاس تشریف

فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍؓ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ لَّا تَرُدَّ
عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَؓ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ
فَقَالَ عُمَرُؓ بَلٰى وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ
قُلْتُ وَاللهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ
وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍؓ صَدَقَ
عُثْمَانُؓ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ
فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوَفَّى
اللهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ اَنْ نَّسْأَلَهٗ عَنْ نَّجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ
قَالَ اَبُوْبَكْرٍؓ قَدْ سَأَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ
فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بِاَبِيْ اَنْتَ وَ
اُمِّيْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْبَكْرٍؓ قُلْتُ
يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِيْ
عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا فَهِيَ
لَهٗ نَجَاةٌ۔

لائے مجھے سلام کیا مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا
اُنہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے شکایت کی
(کہ عثمانؓ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام
کیا انہوں نے جواب بھی نہ دیا) اس کے بعد
دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام
کیا اور حضرت ابوبکرؓ نے دریافت فرمایا کہ تم
نے اپنے بھائی عمرؓ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا
(کیا بات ہے) میں نے عرض کیا کہ میں نے تو
ایسا نہیں کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔
میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی
بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے نہ سلام کا پتہ
چلا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا سچ ہے ایسا ہی
ہوا ہوگا غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے
میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ
میں تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے دریافت فرمایا
کیا تھا میں نے عرض کیا حضورؐ کا وصال ہو
گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی
نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں میں اٹھا
اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے
کے (کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو) حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ میں نے حضورؐ سے
دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کرلے
جس کو میں نے اپنے چچا (ابوطالب پر ان کے انتقال کے وقت) پیش کیا تھا اور انہوں
نے رد کردیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے۔

(رواہ احمد کذا فی المشکوٰۃ وفی مجمع الزوائد رواہ احمد والطبرانی فی الاوسط باختصار
وابویعلی بتمامہ والبزار بنحوہ وفیہ رجل لم یسم لکن الزہری وثقہ وابہمہ
اھ قلت وذکر فی مجمع الزوائد لہ متابعات بالفاظ متقاربۃ)

(২৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এত বেশী শোকাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেকেই বিভিন্ন প্রকার ওসওয়াসায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমিও সেই ওসওয়াসায় লিপ্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) আমার নিকট আসিয়া সালাম করিলেন কিন্তু আমি মোটেও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট অভিযোগ করিলেন (যে, ওসমান (রাযিঃ)কেও অসন্তুষ্ট মনে হইতেছে। কেননা, আমি তাহাকে সালাম দিয়াছি, তিনি সালামের উত্তর পর্যন্ত দেন নাই।)। অতঃপর তাহারা দুইজনই আমার নিকট তশরীফ আনিলেন এবং সালাম করিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি তোমার ভাই উমরের সালামের জবাব দিলে না (ইহার কারণ কি)? আমি আরজ করিলাম, কই আমি তো এইরূপ করি নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, নিশ্চয় করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আপনি কখন আসিয়াছেন বা সালাম করিয়াছেন উহা আমি মোটেও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, ঠিক আছে এমনই হইয়া থাকিবে ; আপনি হয়ত কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আমি বলিলাম, জ্বি–হাঁ আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা কি ছিল? আমি আরজ করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল অথচ এই কাজের নাজাত কিসের মধ্যে সেই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে পারি নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, আপনার উপর আমার মা–বাপ কুরবান হউন, এই কথা জিজ্ঞাসা করার আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন (কেননা, আপনি দ্বীনের প্রত্যেক কাজে অগ্রগামী)। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই কাজের নাজাত কিসে পাওয়া যাইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যেই ব্যক্তি ঐ কালেমাকে গ্রহণ করিবে যাহা আমি আপন চাচা (আবু তালেবের উপর তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম, আর তিনি উহা করিয়া দিয়াছিলেন উহাই একমাত্র নাজাতের কালেমা।(মিশকাত ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ 'ওসওয়াসা'য় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হইল, সাহাবায়ে কেরাম সেই সময় অত্যধিক শোক ও দুঃখে এত বেশী পেরেশান হইয়া গিয়াছিলেন যে, হযরত উমরের মত বড় ও বাহাদুর সাহাবীও তরবারী হাতে দাঁড়াইয়া

বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, নবীজীর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন মাওলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে গিয়াছিলেন। কোন কোন সাহাবীর এই ধারণা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, এখন দ্বীন খতম হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন, দ্বীনের উন্নতির আর কোন সুযোগ হইবে না। অনেকে একেবারেই নিশ্চুপ ছিলেন। মুখে কোন কথাই আসিতেছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সক্রিয় ছিলেন, যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম এশ্‌ক ও মহব্বত থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় অটল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। তিনি উঁচুস্বরে খোতবা দিলেন। উহাতে তিনি এই আয়াত পড়িলেন ঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ যাহার অর্থ হইল ঃ "মুহাম্মদ তো শুধুমাত্র রাসূলই (তিনি খোদা তো নহেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না)। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৪) যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদ হইয়া যান, তবে কি তোমরা (দ্বীন হইতে) ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি (দ্বীন হইতে) ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহ তায়ালার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না (নিজেরই ক্ষতি করিবে)। সংক্ষিপ্ত আকারে এই ঘটনা আমি আমার 'হেকায়াতে সাহাবা' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

'এই কাজের নাজাত কিসের মধ্যে' এই বাক্যটির দুই অর্থ। এক এই যে, দ্বীনের কাজ তো বহু রহিয়াছে তন্মধ্যে দ্বীন নির্ভরশীল কোনটির উপর যাহা ছাড়া কোন উপায় নাই। এই অর্থ অনুযায়ী উত্তর খুবই পরিষ্কার যে, দ্বীনের সম্পূর্ণ ভিত্তিই হইল কালেমায়ে শাহাদাতের উপর এবং ইসলামের মূলই হইল কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ। দ্বিতীয় অর্থ হইল, এই কাজে অর্থাৎ দ্বীনের কাজে অনেক জটিলতাও দেখা দেয়, বিভিন্ন ওসওয়াসাও ঘিরিয়া নেয়। শয়তানের প্রতিবন্ধকতাও একটি স্বতন্ত্র মুসীবত। দুনিয়াবী প্রয়োজনসমূহও নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির অর্থ হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবার বেশী বেশী যিকির এই সকল সমস্যার সমাধান। কেননা ইহা এখলাস পয়দা করে, অন্তর পরিষ্কার করে এবং শয়তানের ধ্বংসের কারণ হয়। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে কালেমা তাইয়্যেবার অনেক রকম আছরের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীয় পাঠকারী হইতে ৯৯ প্রকারের বিপদ আপদ দূর করিয়া দেয়। তন্মধ্যে সবচাইতে ছোট বিপদ হইল চিন্তা, যাহা সর্বদা

মানুষের উপর সওয়ার হইয়া থাকে।

(٢٧) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَا هِيَ هِيَ كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ الَّتِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهٗ وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِىْ اَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهٗ اَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے سُنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے (یقین کرتے ہوئے) اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اُس پر حرام ہے. حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے. وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اُس کے صحابہؓ کو عزت دی. وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی. وہ شہادت ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی۔

(رواه احمد واخرجه الحاكم بهذا اللفظ وقال صحيح على شرطهما واقره عليه الذهبي واخرجه الحاكم برواية عثمانؓ عن عمرؓ مرفوعًا اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وقال هذا صحيح على شرطهما ثم ذكر له شاهدين من حديثهما)

(২৭) হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যদি কেহ হক জানিয়া এখলাসের সহিত অন্তরের (দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে) উহা পাঠ করে, তবে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি বলিব ঐ কালেমাটি কি? উহা ঐ কালেমা যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল এবং তাঁহার সাহাবীগণকে সম্মানিত করিয়াছেন। উহা ঐ তাকওয়ার কালেমা যাহার আকাংখা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তাহার নিকট হইতে করিয়াছিলেন—উহা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবের ঘটনা হাদীস, তফসীর ও ইতিহাসের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ। হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উপর তাঁহার বহু এহসান ছিল। তাই এন্তেকালের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট তাশরীফ নিয়া গেলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, হে আমার চাচা ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। যাহাতে আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করিতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার ইসলামের সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি বলিলেন, মানুষ এই বলিয়া আমার নিন্দা করিবে যে, মৃত্যুর ভয়ে ভাতিজার দ্বীন গ্রহণ করিয়া নিয়াছে, যদি এই ধারণা না হইত তবে এই মুহূর্তে কালেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা করিয়া দিতাম। ইহা শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই প্রসঙ্গেই কুরআনে পাকের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থ ঃ আপনি যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত করিতে পারেন না ; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দান করেন। (সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৫৬)

এই ঘটনার দ্বারা ইহাও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যাহারা অন্যায় ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ ও রাসূল হইতে দূরে সরিয়া থাকে আর ধারণা করে যে, নিকটতম আত্মীয়বুযুর্গের দোয়ায় পার হইয়া যাইবে, তাহারা ভুলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র উদ্ধারকারী তাহারই দিকে রুজু করা চাই, তাহারই সহিত প্রকৃত সম্পর্ক কায়েম করা চাই। অবশ্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য, তাঁহাদের দোয়া ও নেক দৃষ্টি সাহায্যকারী ও সহায়ক হইতে পারে।

(২৮) عن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى السماء فقال اسألك بحق محمد الا غفرت لي فاوحى الله اليه من محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي الى عرشك فاذا فيه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا ممن

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم (علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام) سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا (جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعاو استغفار کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں وحی نازل ہوئی کہ محمد صلعم کون ہیں (جن کے واسطے سے تم نے

جَعَلْتَ اِسْمَهٗ مَعَ اسْمِكَ فَاَوْحَی اللّٰهُ اِلَیْهِ یَآ اٰدَمُ اِنَّهٗ اٰخِرُ النَّبِیِّیْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ وَلَوْلَاهُوَ مَا خَلَقْتُكَ.

استغفار کی، عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔

(اخرجه الطبرانی فی الصغیر والحاکم وابونعیم والبیهقی کلاهما فی الدلائل وابن عساکر فی الدر وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی فی الاوسط والصغیر وفیه من لم اعرفهم قلت ویؤید الاخر الحدیث المشهور لولاك لما خلقت الافلاك قال القاری فی الموضوعات الکبیر موضوع لکن معناه صحیح وفی التشرف معناه ثابت ویؤید الاول ماورد فی غیر روایة من انه مکتوب علی العرش واوراق الجنة لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کما بسط طرقه السیوطی فی مناقب اللالی فی غیر موضع و بسط له شواهد ایضاً فی تفسیره فی سورة الم نشرح)

(২৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত আদম (আঃ) হইতে যখন ঐ গোনাহ সংঘটিত হইল (যাহার দরুন তাহাকে বেহেশত হইতে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি সর্বদা ক্রন্দন করিতেন এবং দোয়া এস্তেগফার করিতে থাকিতেন একবার) আসমানের দিকে দেখিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ওহী নাযেল হইল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? (যাহার ওসীলায় ক্ষমা চাহিলে) তিনি আরজ করিলেন, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আমি আরশের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিত দেখিয়াছিলাম। তখন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কেহ নাই। যাহার নাম আপনি নিজের নামের সহিত রাখিয়াছেন। ওহী অবতীর্ণ হইল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তিনি তোমার আওলাদের মধ্য হইতে, কিন্তু তিনি যদি না হইতেন তবে তোমাকেও সৃষ্টি করা হইত না। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী, হাকেম)

ফায়দা ঃ হযরত আদম (আঃ) তখন কি কি দোয়া করিয়াছিলেন এবং

কিরূপ কাকুতি–মিনতী করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব রেওয়ায়েতের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মনিব যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় সেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। দুনিয়ার নগণ্য মুনিবদের অসন্তুষ্টির কারণে চাকর বাকর ও খাদেমদের উপর কত কি অতিবাহিত হইয়া যায়। আর সেখানে তো সমগ্র বিশ্বের মালিক, রিযিকদাতা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসন্তুষ্টি ছিল। তাহাও আবার ঐ ব্যক্তির উপর যাহাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেহ্দা করাইয়া নৈকট্য দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় অসন্তুষ্টির প্রভাব তাহার উপর তত বেশী পড়ে যদি না নীচ স্বভাবের হয়। আর তিনি তো নবী ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) এত বেশী ক্রন্দন করিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যদি একত্র করা হয়, তবুও উহার সমান হইতে পারে না। তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মাথা উপরের দিকে উঠান নাই। হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আঃ)এর ক্রন্দন যদি সমগ্র দুনিয়ার ক্রন্দনের সহিত তুলনা করা হয়, তবে তাঁহার ক্রন্দনই অধিক হইবে। এক হাদীসে আছে, যদি তাহার চোখের পানি তাহার সমস্ত আওলাদের চোখের পানির সহিত ওজন করা হয় তবে তাহার চোখের পানিই বেশী হইবে। এমন অবস্থায় তিনি কতভাবে যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں　　واں ایک خامشی تیری سب کے جواب میں

এইদিক হইতে জবানে লাখো লাখ মিনতি ও আহাজারি। কিন্তু আমার সবকিছুর জবাবে সেইদিক হইতে এক নিরবতা।

অতএব আলোচিত রেওয়ায়াতসমূহে যেসব বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে সমষ্টিগতভাবে উহাতে কোন আপত্তির কিছু নাই। তন্মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা করা এবং আরশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখিত থাকার বিষয়ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিলাম তখন উহার দুই পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইনে ছিল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দ্বিতীয় লাইনে ছিল ঃ

مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا اَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا

(অর্থাৎ, যাহা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি (অর্থাৎ, দান-খয়রাত করিয়াছি) উহা পাইয়াছি। যাহা দুনিয়াতে খাইয়াছি তাহাতে লাভবান হইয়াছি। আর যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।)

তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল ঃ

أُمَّةٌ مُّذْنِبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ

(অর্থাৎ, উম্মত গোনাহগার আর আল্লাহ ক্ষমাশীল)

এক বুযুর্গ বলেন, আমি হিন্দুস্থানের এক শহরে গেলাম এবং সেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, যাহার ফল দেখিতে বাদামের মত। উহা দুইটি খোসা দ্বারা আবৃত। ভাঙ্গিবার পর উহার ভিতর হইতে মুড়ানো একটি সবুজ পাতা বাহির হইয়া আসে। পাতাটি খুলিলে উহাতে লালবর্ণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই ঘটনা আবু ইয়াকুব শিকারীর নিকট উল্লেখ করিলাম।

তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। আমি 'আইলা' নামক স্থান হইতে একটি মাছ শিকার করিয়াছিলাম। উহার এক কানে লেখা ছিল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং অপর কানে লেখা ছিল مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(٢٩) عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَالٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ۔

حضرت اسماءؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام (جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشرطیکہ اخلاص سے پڑھی جائیں) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (س بقرہ ع ١٩) اور الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (س ال عمران ع ١)

(اخرجه ابن ابى شيبة واحمد والدارمى وابوداؤد والترمذى وصححه وابن ماجة وابومسلم الكجى فى السنن وابن الضريس وابن ابى حاتم والبيهقى فى الشعب كذا فى الدر)

(২৯) হযরত আসমা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার বড় নাম (যাহা সাধারণতঃ ইসমে আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। (যদি উহা

এখলাসের সহিত পড়া হয়) ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ‘ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুওঁ ওয়াহিদ লা–ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম’ (সূরা বাকারা, রুকূ–১৯) এবং اَلٓمّٓ ۚ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ‘আলিফ–লাম–মীম আল্লাহু লা–ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম’ (সূরা আলি ইমরান, রুকূ–১)।

(দুররে মানসূর ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ‘ইসমে আজম’ সম্পর্কে হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিয়া যে কোন দোয়া করা হয় তাহা আল্লাহর দরবারে কবূল হয়। তবে ইসমে আজম নির্ধারণের ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হইয়াছে। আসলে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, এইরূপ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়া উহাতে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন। যেমন শবে কদরের নির্ধারণ এবং জুমার দিন দোয়া কবূল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। ইহাতে অনেক হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এইগুলি আমি ‘ফাযায়েলে রমযান’ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রূপ ইসমে আজমের নির্দিষ্টতা সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো অনেক রেওয়ায়াতে এই আয়াতগুলি সম্পর্কে এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য এই দুইটি আয়াতের চাইতে কঠিন আর কোন আয়াত নাই। وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোল্লিখিত শেষ পর্যন্ত।

ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) বলেন, পাগলামী, বদনজর ইত্যাদি নিরাময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি খুবই উপকারী। যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে সে এই ধরনের সমস্যা হইতে নিরাপদ থাকিবে ঃ

(১) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ পূর্ণ আয়াত (সূরা বাকারাহ, রুকূ ঃ ১৯)

(২) আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ)

(৩) সূরা বাকারার শেষ আয়াত।

(৪) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ হইতে مُحْسِنِيْنَ পর্যন্ত।

(৫) সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলি ঃ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ হইতে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, উপরোক্ত আয়াতগুলি

আরশের কোণে লিখিত আছে। ইবরাহীম ইবনে দাসমা (রহঃ) ইহাও বলিতেন যে, শিশুদের ভয় অথবা বদনজরের আশঙ্কা হইলেও তাহাদের জন্য এই আয়াতগুলি লিখিয়া দিও।

আল্লামা শামী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, ইসমে আজম হইল, স্বয়ং 'আল্লাহ' শব্দটি। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, আল্লামা তাহাবী (রহঃ) ও অনেক ওলামায়ে কেরাম হইতে এই একই উক্তি নকল করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ আরেফীন তথা বিশিষ্ট সূফীগণও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহাদের নিকট এই পবিত্র নামের যিকিরই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) হইতে ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি বলেন, ইসমে-আজম হইল 'আল্লাহ' শব্দটি। তবে শর্ত হইল, যখন তুমি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমার অন্তরে না থাকে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ লোক এই নাম এমনভাবে লইবে যে, যখন ইহা জবানে জারী হইবে তখন অন্তরে আল্লাহর আজমত ও ভয় থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকেরা এই নাম এমনভাবে উচ্চারণ করিবে যে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর জাত ও ছিফাতের উপস্থিতি থাকিতে হইবে। আর খাছ লোকদের মধ্যে যাহারা আরও খাছ তাহাদের জন্য শর্ত হইল, ঐ পাক জাত ছাড়া তাহাদের অন্তরে যেন আর কিছু না থাকে। কুরআন শরীফেও এই মোবারক নাম এত অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সীমা নাই। যাহার পরিমাণ দুই হাজার তিনশত ষাট বলা হইয়াছে।

শায়খ ইসমাঈল ফারগানী (রহঃ) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার ইস্‌মে-আজম শিখিবার আকাংখা ছিল। উহার জন্য আমি অনেক মোজাহাদা করিতাম এবং একাধারে কয়েকদিন না খাইয়া থাকিতাম। আর এই না খাওয়ার দরুন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। একদিন আমি দামেশকের মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় দুইজন লোক মসজিদে প্রবেশ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইল ইহারা ফেরেশতা হইবেন। তাহাদের একজন অপরজনকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ইস্‌মে-আজম শিখিতে চাও? অপরজন বলিল, জ্বি-হাঁ, বলুন উহা কি? আমি তাহাদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। অপরজন বলিলেন, ইস্‌মে-আজম হইল, 'আল্লাহ' শব্দ, তবে শর্ত হইল উহা 'সিদকে লাজার' সহিত পড়িতে হইবে। শায়খ ইসমাঈল (রহঃ) বলেন, 'সিদকে লাজা' হইল, 'আল্লাহ' শব্দ

উচ্চারণকারীর অবস্থা তখন এমন হইবে যেমন কোন ব্যক্তি সাগরে ডুবিতেছে এবং তাহার উদ্ধারকারী কেহই নাই। এইরূপ অবস্থায় যেই আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাকা হইতে পারে সেই অবস্থা হইতে হইবে।

ইস্‌মে–আজম শিখার জন্য বড় যোগ্যতা, কঠোর সংযমের প্রয়োজন। জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্‌মে–আজম জানিতেন। একদা একজন ফকীর আসিয়া বড় বিনয়ের সহিত তাহাকে ইস্‌মে–আজম শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিল। বুযুর্গ বলিলেন, তোমার সেই যোগ্যতা নাই। ফকীর বলিল, হুযূর! আমার সেই যোগ্যতা আছে। অগত্যা বুযুর্গ বলিলেন, আচ্ছা অমুক জায়গায় গিয়া বস এবং সেইখানে যাহা ঘটে আমার নিকট আসিয়া বলিবে। ফকীর সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি গাধার উপর লাকড়ি বোঝাই করিয়া আসিতেছে। সামনের দিক হইতে একজন সিপাহী আসিয়া ঐ বৃদ্ধকে খুব মারধর করিল এবং তাহার লাকড়িগুলি ছিনাইয়া লইয়া গেল। সিপাহীর প্রতি ফকীরের ভীষণ রাগ হইল। ফকীর বুযুর্গের নিকট আসিয়া পূর্ণ ঘটনা শুনাইল এবং বলিল, আমি যদি ইস্‌মে–আজম জানিতাম, তবে ঐ সিপাহীকে বদদোয়া করিতাম। বুযুর্গ বলিলেন, এই বৃদ্ধ লাকড়িওয়ালার নিকট হইতেই আমি ইস্‌মে–আজম শিখিয়াছি।

(۳۰) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ ذَكَرَنِيْ اَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن، حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اُس شخص کو نکال لو جس نے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور ہر اُس شخص کو نکال لو جس نے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا ہو یا مجھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو یا کسی موقعہ پر مجھ سے ڈرا ہو۔

(اخرجہ الحاکم بروایت المؤمل عن المبارک بن فضالۃ وقال صحیح الاسناد واقرہ علیہ الذہبی وقال الحاکم قد تابع ابوداؤد مؤملا علی روایتہ واختصرہ)

(৩০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান,

(কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, জাহান্নাম হইতে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে। এবং এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে অথবা আমাকে (যেকোনভাবে) স্মরণ করিয়াছে কিংবা কোন অবস্থায় আমাকে ভয় করিয়াছে। (হাকেম)

ফায়দা ঃ এই পবিত্র কালেমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কি কি বরকতসমূহ রাখিয়াছেন, উহার কিছুটা আন্দাজ ইহাতেই হইয়া যায় যে, এক শত বৎসর বয়সের বৃদ্ধ যাহার সারাজীবন শিরক ও কুফরের মধ্যে কাটিয়াছে। একবার এই পাক কালেমা ঈমানের সহিত পড়ার কারণে মুসলমান হইয়া যায় এবং সারা জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ঈমান আনার পর গোনাহ করিলেও এই কালেমার বরকতে কোন না কোন সময় জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ) যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলাম এমন ম্লান হইয়া যাইবে যেমন কাপড়ের কারুকার্য (পুরাতন হওয়ার কারণে) ম্লান হইয়া যায়। রোযা, হজ্জ, যাকাত কি লোকেরা তাহা জানিবে না। অবশেষে এমন একটি রাত্র আসিবে যে, কুরআন পাক উঠাইয়া লওয়া হইবে, একটি আয়াতও বাকী থাকিবে না। বৃদ্ধ নারী–পুরুষেরা এইরূপ বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুব্বীদেরকে কালেমা পড়িতে শুনিয়াছি কাজেই আমরাও উহা পড়িব। হযরত হোজায়ফা (রাযিঃ)–র এক শাগরেদ বলিল, হুযূর! যখন যাকাত, হজ্জ, রোযা কিছুই থাকিবে না তখন শুধু এই কালেমা কি কাজে আসিবে? হযরত হোজাইফা (রাযিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। তিনবার প্রশ্ন করিবার পর তিনি বলিলেন, (কোন না কোন সময়) জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে, জাহান্নাম হইতে বাহির করিবে। অর্থাৎ ইসলামের অন্যান্য হুকুম পালন না করার কারণে শাস্তি ভোগ করার পর কোন না কোন সময় কালেমার বরকতে জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

উপরোক্ত হাদীসের অর্থও ইহা যে, যদি ঈমানের সামান্যতম অংশও থাকে তাহা হইলেও কোন এক সময় জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে উহা কোন না

কোনদিন অবশ্যই তাহার কারণে আসিবে যদিও বা কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

(۳۱) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض

قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ طَيَالِسَةٍ مَّكْفُوْفَةٌ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا يُرِيْدُ اَنْ يَّرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ وَّابْنَ رَاعٍ وَّيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَّابْنَ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَاَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهٖ فَاجْتَذَبَهٗ وَقَالَ اَلَا اَرٰى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَّا يَعْقِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَقَالَ اِنَّ نُوْحًا لَّمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ قَاصٌّ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ اٰمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَاَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ اَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَاٰمُرُكُمَا بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِي الْكِفَّةِ الْاُخْرٰى كَانَتْ اَرْجَحَ مِنْهُمَا وَلَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا كَانَتْ حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلَيْهَا لَقَصَمَتْهَا وَاٰمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللّٰهِ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیبا کی گوٹ تھی (صحابہؓ سے خطاب کرکے) کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے (بکری چرانے والے) اور چرواہے زادے کو بڑھادیں اور شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گرادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑکر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ (تو ہی بتا) تو بیوقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے پھر اپنی جگہ واپس آکر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحب زادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں (آخری) وصیت کرتا ہوں جس میں دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ جن سے روکتا ہوں ایک شرک ہے دوسرا تکبر اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں (اخلاص سے کہا ہوا) لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ رکھ دیا جائے تو وہی

وَبِحَمْدِهٖ فَإِنَّهُمَا صَلٰوةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِمَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔

پلڑا جھک جاتے گا اور اگر تمام آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمہ کو اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں وہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ہے کہ یہ دو لفظ ہر مخلوق کی نمازیں اور انھیں کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔

(اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه للصقعب ابن زهير فانه ثقة قليل الحديث اه واقره عليه الذهبي وقال الصقعب ثقة ورواه ابن عجلان عن زيد بن اسلم مرسلا اه قلت ورواه احمد فى مسنده بزيادة فيه بطرق وفي بعض منها فَإِنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً تَقْصِمُهُنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وذكره المنذرى فى الترغيب عن ابن عمرو مختصرا وفيه لَوْ كَانَتْ حَلْقَةً لَقَصَمَتْهُنَّ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَى اللّٰهِ ثم قال رواه البزار ورواته محتج بهم فى الصحيح الا ابن اسحاق وهو فى النسائى عن صالح بن سعيد رفعه الى سليمان بن يسار الى رجل من الانصار لم يسمه ورواه الحاكم عن عبد الله وقال صحيح الاسناد ثم ذكر لفظه قلت وحديث سليمان بن يسار يأتى فى بيان التسبيح وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورواه الطبرانى بنحوه ورواه البزار من حديث ابن عمرو ورجال احمد ثقات قال فى رواية البزار محمد بن اسحاق وهو مدلس وهو ثقة)

(৩১) একজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। লোকটি রেশমী জুব্বা পরিহিত ছিল এবং উহার কিনারায় রেশমের কারুকার্য করা ছিল। (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বলিতে লাগিল, তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ (দঃ)) প্রত্যেক বকরীর রাখাল ও তাহাদের সন্তানদেরকে উন্নত এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী ও তাহাদের সন্তানদেরকে অবনত করিতে চাহিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার কাপড়ের বুকের অংশ ধরিয়া কিছুটা টানিলেন আর বলিলেন যে, (তুমিই বল) তুমি কি বেকুবদের মত কাপড় পর নাই? অতঃপর নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)এর যখন এন্তেকালের সময় হইল তখন তাহার দুই পুত্রকে ডাকিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, আমি তোমাদেরকে (শেষ) অসিয়ত করিতেছি। দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি আর দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি। যে দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি তন্মধ্যে একটি হইল শিরক আর দ্বিতীয়টি

হইল অহংকার। আর যে দুইটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি একটি হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত আসমান–জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় (এখলাসের সহিত বলা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে উক্ত পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান–জমিন এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে আছে একটি হালকা বা গোলাকার করিয়া উহার উপর এই পবিত্র কালেমাকে রাখা হয় তবে উহা ওজনের কারণে ভাঙ্গিয়া যাইবে। দ্বিতীয় বিষয় যাহার আদেশ করিতেছি তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' এই দুইটি শব্দ প্রত্যেক মখলূকের নামায এবং উহারই বরকতে প্রত্যেক জিনিসকে রিযিক দান করা হয়। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ পোশাক সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের অর্থ হইল, বাহিরের অবস্থা দ্বারা ভিতরের অবস্থা প্রমাণিত হয়। যাহার বাহিরের অবস্থা খারাপ হয় তাহার ভিতরের অবস্থাও সাধারণতঃ তদ্রূপ হইয়া থাকে। যেহেতু ভিতরের অবস্থা বাহিরের অবস্থার অধীন, তাই বাহিরের অবস্থাকে ভাল রাখার চেষ্টা করা হয়। এইজন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম বাহিরের পবিত্রতা তথা অযু ইত্যাদির এহতেমাম করাইয়া থাকেন যাহাতে ভিতরের পবিত্রতা হাছিল হইয়া যায়। যাহারা এইরূপ বলেন, আরে জনাব ভিতর ভালো হওয়া চাই বাহির যেমনই হউক—ইহা সঠিক নয়। ভিতর ভাল হওয়া একটি স্বতন্ত্র বিষয়—বাহির ভাল হওয়াও আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً

"হে আল্লাহ! আমার ভিতরকে আমার বাহির অপেক্ষা উত্তম করিয়া দাও এবং আমার বাহিরকে নেক বানাইয়া দাও।" হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন—

(৩২) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيْ اَرَاكَ كَئِيْبًا قَالَ يَا رَسُوْلَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لِّي الْبَارِحَةَ فُلَانٍ

حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہوکر حاضر ہوئے حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ گذشتہ شب میرے

وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهٖ قَالَ فَهَلْ لَقَّنْتَهٗ
لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ
يَارَسُوْلُ كَيْفَ هِيَ لِلْاَحْيَاءِ قَالَ
هِيَ اَهْدَمُ لِذُنُوْبِهِمْ هِيَ اَهْدَمُ لِذُنُوْبِهِمْ.

چچازاد بھائی کا انتقال ہوگیا میں نزع کی
حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا (اس
منظر سے طبیعت پر اثر ہے) حضورؐ نے
فرمایا تم نے اس کو لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تلقین
بھی کی تھی؟ عرض کیا کی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ
پڑھ لیا تھا عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا ارشاد فرمایا کہ
جنت اس کے لئے واجب ہوگئی حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ لوگ اس
کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو حضورؐ نے دو۲ مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ اُن کے گناہوں کو بہت ہی منہدم
کردینے والا ہے (یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے۔

(رواه ابو يعلى والبزار وفيه زائدة بن ابى الرقاد وثقة القوارى وضعفه البخارى وغيره
كذا فى مجمع الزوائد واخرج بمعناه عن ابن عباس ايضا قلت وروى عن علىؓ مرفوعًا مَنْ
قَالَ إِذَا مَرَّ بِالْمَقَابِرِ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ
قَوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ مَنْ قَالَ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهٗ ذُنُوْبُ
خَمْسِيْنَ سَنَةً قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَلِقَرَابَتِهٖ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ رواه الديلمى فى تاريخ همدان
والرافعى وابن النجار كذا فى منتخب كنز العمال لكن روى نحوه السيوطى فى ذيل اللآلى
وتكلم على سنده وقال الاسناد كله ظلمات ورمى رجاله بالكذب وفى تنبيه الغافلين
وروى عن بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ خَالِصًا وَمَدَّهَا بِالتَّعْظِيْمِ كَفَّرَ اللّٰهُ
عَنْهُ اَرْبَعَةَ اٰلَافِ ذَنْبٍ مِنَ الْكَبَائِرِ قِيْلَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ اَرْبَعَةَ اٰلَافِ ذَنْبٍ قَالَ يُغْفَرُ مِنْ
ذُنُوْبِ اَهْلِهٖ وَجِيْرَانِهٖ اه قلت وروى بمعناه مرفوعًا لكنهم حكموا عليه بالوضع كما
فى ذيل اللآلى نعم يؤيده الامر بدفن جوار الصالح وتازيه بجوار السوء ذكره السيوطى
فى اللآلى بطرق وورد السلام على اهل القبور بالفاظ مختلفة فى كنز العمال وغيره)

(৩২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন অবস্থায় হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে বিষন্ন দেখিতেছি, ইহার কি কারণ? তিনি বলিলেন, গত রাত্রে আমার চাচাতো ভাইয়ের ইন্তেকাল হইয়াছে, অন্তিম সময় আমি তাহার পাশে বসা

ছিলাম। সেই দৃশ্যের কারণে মনের উপর প্রভাব পড়িয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি কি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াইয়াছিলে? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়াইয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এই কালেমা পড়িয়াছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, পড়িয়াছিল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবিত লোকেরা যদি এই কালেমা পড়ে, তবে কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার এরশাদ ফরমাইলেন, এই কালেমা তাহাদের গোনাহসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া দিবে। (মাঃ যাওয়ায়িদ ঃ আবু ইয়া'লা)

ফায়দা ঃ কবরস্থান ও মৃত ব্যক্তির নিকটে কালেমা পড়া সম্পর্কেও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, তোমরা জানাযার সহিত বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। এক হাদীসে আছে, আমার উম্মত যখন পুলছেরাত পার হইবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'। অন্য হাদীসে আছে, যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে, তখন তাহাদের পরিচয় হইবে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অন্য এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের অন্ধকারে তাহাদের পরিচয় হইবে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা'।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পড়ার বরকতসমূহ মৃত্যুর পূর্বেই কখনো বা মৃত্যুর সময় হইতেই অনুভূত হইয়া যায়। অনেক আল্লাহর বান্দাদের উহারও পূর্বে প্রকাশ হইয়া যায়। হযরত আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, আমি আমার নিজ শহর 'আশবিলায় অসুস্থ পড়িয়াছিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম, লাল, সাদা, সবুজ এবং আরও বিভিন্ন রংয়ের অনেক বড় বড় পাখী একই সাথে ডানা মেলিতেছে আর একই সাথে ডানা গুটাইতেছে। বেশ কিছু লোক যাহাদের হাতে ঢাকনায় আচ্ছাদিত বড় বড় পাত্র রহিয়াছে, যাহাতে কিছু রাখা আছে। আমি এই সবকিছু দেখিয়া মনে করিলাম যে, ইহা মৃত্যুর তোহফা, তাড়াতাড়ি কালেমা পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের একজন আমাকে বলিল, তোমার সময় এখনও আসে নাই ; এইগুলি অন্য এক মোমিনের জন্য তোহফা, যাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল তখন বলিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। লোকেরা তাহাকে

বসাইয়া দিল। অতঃপর বলিলেন, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে অনেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছ ; আমার দ্বারা উহাতে ত্রুটি হইয়াছে। তুমি আমাকে অনেক বিষয় নিষেধ করিয়াছ, আমার দ্বারা উহাতে নাফরমানী হইয়াছে। তিনবার ইহাই বলিতে থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই বলিয়া একদিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিতেছেন? বলিলেন, কিছু সবুজ জিনিস উহারা মানুষও নহে, জ্বীনও নহে। অতঃপর ইন্তেকাল করিলেন।

জুবায়দা (রহঃ)কে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কি ব্যবহার হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এই চারটি কালেমার বদৌলতে আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ,

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই আমি জীবন শেষ করিব।
(২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই কবরে লইয়া যাইব।
(৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথেই নির্জন সময় কাটাইব।
(৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই লইয়া আপন রবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

(٣٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ اِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ هِىَ اَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ.

حضرت ابوذر غفاریؓ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمادیجئے ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہوجائے تو کفارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کرلیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے حضورؐ نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔

(رواه احمد وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله ثقات الا ان شمر بن عطية حدثه عن اشياخه ولم يسم احدًا منهم قال السيوطى فى الدر اخرجه ايضًا ابن مردويه والبيهقى فى الاسماء والصفات قلت واخرجه الحاكم بِلَفْظِ يَا اَبَا ذَرٍّ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وقال صحيح على شرطهما واقره عليه الذهبى وذكره السيوطى فى الجامع مختصرًا ورقم له بالصحة)

(৩৩) হযরত আবু যর গেফারী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন অসীয়ত করুন। এরশাদ হইল, যখন কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেল তখনই ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন নেক আমল করিয়া লইও। (যাহাতে অন্যায়ের অশুভ প্রভাব ধৌত হইয়া যায়।) আমি

আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, ইহা তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (আহমদ)

ফায়দা ঃ অন্যায় যদি সগীরা গোনাহ হয় তবে নেক আমল দ্বারা উহা বিলুপ্ত হওয়া ও মিটিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আর যদি উহা কবীরা গোনাহ হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী তওবা দ্বারা মিটিয়া যাইতে পারে অথবা কেবল আল্লাহর মেহেরবানীতে মাফ হইতে পারে, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। মোটকথা, গোনাহ মিটিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, এই গোনাহ না আমলনামাতে থাকে আর না কোথাও উহার উল্লেখ থাকে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন বান্দা কোন গোনাহ হইতে তওবা করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ তায়ালা 'কেরামান কাতেবীন'কে সেই গোনাহ ভুলাইয়া দেন, স্বয়ং গোনাহগার ব্যক্তির হাত পা–কেও ভুলাইয়া দেন, এমনকি জমীনের ঐ অংশকেও ভুলাইয়া দেন যাহার উপর ঐ গোনাহ করা হইয়াছে। এমনকি তাহার এই গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার মত কেহই থাকে না। সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন মানুষের হাত, পা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নেক আমল অথবা বদ আমল যাহাই সে করিয়াছে উহার সাক্ষ্য দিবে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। ঐ সকল হাদীস দ্বারাও উপরের হাদীসের সমর্থন হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে যে, গোনাহ হইতে তওবাকারী এইরূপ যেন সে গোনাহ করেই নাই। এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তওবা হইল, কোন অন্যায় কাজ হইয়া গেলে উহার উপর চরমভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এইরূপ গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, এমন এখলাছের সহিত আমল কর যেন আল্লাহ পাক তোমার সামনে আছেন, নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর, প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির কর (যাহাতে কেয়ামতের দিন তোমার সাক্ষীর সংখ্যা বেশী হয়), যখন কোন অন্যায় কাজ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নেক আমল করিয়া লও, গোনাহ গোপনে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও গোপনে কর, আর গোনাহ প্রকাশ্যে করিয়া থাকিলে উহার কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও প্রকাশ্যে কর।

(৩৪) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهٗ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ حَسَنَةٍ (اخرجه احمد قلت اخرج الحاكم شواهده بالفاظ مختلفة)

حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ کو دس مرتبہ پڑھے گا چالیس ہزار نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی.

(৩৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি দশবার এই দোয়া পড়িবে তাহার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হইবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(আহমদ)

ফায়দা ঃ কালেমা তাইয়্যেবার বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপরও হাদীসের কিতাবসমূহে বড় বড় ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন তোমরা ফরয নামায আদায় কর তখন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার এই দোয়াটি পড়িবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ইহার সওয়াব এইরূপ যেমন একটি গোলাম আজাদ করিল।

(৩৫) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَيْ اَلْفِ حَسَنَةٍ. (رواه الطبرانى كذا فى الترغيب وفى مجمع الزوائد فيه قائد ابو الورقاء متروك)

دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ پڑھے اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی

(৩৫) অন্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে, তাহার জন্য বিশ লাখ নেকী লেখা হইবে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ ইহা আল্লা জাল্লা শানুহুর পক্ষ হইতে কি পরিমাণ বখশিশ ও দয়ার বর্ষণ যে, অতি সাধারণ একটি জিনিস যাহা পড়িতে কষ্টও হয় না এবং সময়ও লাগে না, তা সত্ত্বেও হাজার হাজার লাখ লাখ নেকী দান করা হয়। কিন্তু আমরা এত বেশী গাফলত ও দুনিয়ার স্বার্থের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি যে, আল্লাহর এই সমস্ত দান ও দয়ার বৃষ্টি হইতে কিছুই লইতে পারি না। আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রত্যেক নেকীর জন্য কমপক্ষে দশগুণ সওয়াব তো নির্দিষ্টই আছে, তবে শর্ত হইল যদি এখলাছের সহিত হয়। অতঃপর এখলাছের ভিত্তিতেই সওয়াব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ইসলাম গ্রহণ করিলে কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গোনাহ মাফ হইয়া যায়। ইহার পর পুনরায় হিসাব শুরু হয়। প্রত্যেক নেকী দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিখা হয় এবং ইহা হইতেও বেশী আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ চাহেন লিখা হয়। আর গোনাহ একটিই লিখা হয়। আর যদি আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে উহাও লিখা হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দা যখন নেককাজের এরাদা করে তখন শুধু এরাদার কারণে একটি নেকী লেখা হয়। পরে যখন আমল করে তখন দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত যেই পরিমাণ আল্লাহ পাক চাহেন, লেখা হয়। এই ধরনের আরও অনেক হাদীস হইতে জানা যায় যে, দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন কমি নাই ; যদি কেহ নেওয়ার মত থাকে। এই বিষয়টিই আল্লাহওয়ালাদের সামনে থাকে, ফলে তাহাদিগকে দুনিয়ার বিরাট বিরাট সম্পদও আকর্ষণ করিতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমল ছয় প্রকার এবং মানুষ চার প্রকার। দুইটি আমল হইল ওয়াজেবকারী, দুইটি সমান সমান, একটি দশগুণ, আরেকটি সাতশত গুণ। (যে দুইটি আমল ওয়াজেবকারী উহার একটি হইল–) (১) যে ব্যক্তি শেরেক হইতে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (২) যে ব্যক্তি শেরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (৩) আর যে আমল সমান সমান উহা হইল অন্তরে নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছা আছে (কিন্তু আমল করার সুযোগ হয় নাই)। (৪) আর আমল করিলে দশগুণ সওয়াব হইবে। (৫) আর আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদ ইত্যাদিতে) খরচ করা সাতশত গুণ সওয়াব রাখে। (৬) আর যদি গোনাহ করে তবে একটির বদলা একটিই হইবে।

আর চার প্রকার মানুষ হইল ঃ কিছুলোক এমন আছে, যাহাদের জন্য

দুনিয়াতে আরাম আখেরাতে কষ্ট, কিছু লোক এমন আছে যাহাদের উপর দুনিয়াতে কষ্ট আখেরাতে আরাম। কিছু লোক এমন আছে যে, যাহাদের উপর উভয় স্থানে কষ্ট (দুনিয়াতে অভাব–অনটন, আখেরাতে আযাব)। কিছু লোক এমন আছে যে, তাহাদের উপর উভয় জাহানে আরাম।

এক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কথা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা কোন কোন নেকীর বদলা দশ লক্ষ গুণ দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? আল্লাহর কছম! আমি এইরূপই শুনিয়াছি। অন্য হাদীসে আছে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন কোন নেকীর সওয়াব বিশ লক্ষ পর্যন্ত মিলিয়া থাকে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

"উহার সওয়াব বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট সওয়াব দান করেন।" (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪০)

যে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বিরাট সওয়াব বলিয়াছেন উহার পরিমাণ কে ধারণা করিতে পারে? ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, সওয়াবের এত বড় পরিমাণ তখনই হইতে পারে যখন এই সকল শব্দের অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িবে যে, এইগুলি আল্লাহ তায়ালার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী।

(৩৬) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَآءَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے (یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے) پھر یہ دعا پڑھے اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو۔

(رواہ مسلم و ابوداؤد وابن ماجہ وقالا فیحسن الوضوء زاد ابوداؤد ثم یرفع طرفہ الی السماء ثم یقول فذکرہ ورواہ الترمذی کابی داؤد وزاد اللّٰھم اجعلنی من

التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ الحديث وتكلم فيه كذا في الترغيب زاد السيوطي في الدر ابن ابي شيبة والدارمي)

(৩৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে করে (অর্থাৎ অজুর সুন্নত ও আদবসমূহ আদায় করিয়া অজু করে) অতঃপর এই দোয়া পড়ে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলিয়া যায়, যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। (তারগীব ঃ মুসলিম, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তো একটি দরজাই যথেষ্ট, তবুও তাহার সম্মানার্থে আটটি দরজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করে নাই, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে।

(۳۷) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سو مرتبہ لا الٰہ الا اللہ پڑھا کرے حق تعالیٰ شانہٗ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اُس دن اُس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

(رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن ضحاك متروك كذا في مجمع الزوائد قلت هو من رواة ابن ماجة ولا شك انهم ضعفوه جدًا الا ان معناه مؤيد بروايات منها ما تقدم من روايات يحيى ابن طلحة ولا شك انه افضل الذكر وله شاهد من حديث ام هانی الآتی)

(৩৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট করিয়া

উঠাইবেন। আর যেইদিন এই তসবীহ পড়িবে সেইদিন তাহার চাইতে উত্তম আমলওয়ালা কেবল ঐ ব্যক্তিই হইতে পারিবে যে তাহার চাইতে বেশী পড়িবে। (মাঃ যাওয়াহিদ ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলের জন্যও নূর এবং চেহারার জন্যও নূর। যেই সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীন এই কালেমা শরীফ বেশী বেশী পড়িয়া থাকেন, তাহাদের চেহারা দুনিয়াতেই নূরানী হইয়া যাইতে দেখা যায়।

(৩৮) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفْتَحُوْا عَلٰى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَقِّنُوْهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَاِنَّهٗ مَنْ كَانَ اَوَّلُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ عَاشَ اَلْفَ سَنَةٍ لَمْ يُسْئَلْ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچّہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ یاد کراؤ اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ تلقین کرو جس شخص کا اوّل کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ ہو اور آخری کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وہ ہزار برس بھی زندہ رہے تو (انشاء اللہ) کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا (یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے مُعاف ہو جائے گا یا اس وجہ سے کہ اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ اپنے فضل سے مُعاف فرمائیں گے)

(موضوع، ابن محمویة والوہ مجہولان وقد ضعف البخاری ابراہیم بن مہاجر حکاہ السیوطی عن ابن الجوزی ثم تعقبہ بقولہ الحدیث فی المستدرک واخرجہ البیہقی فی الشعب عن الحاکم وقال متن غریب لم نکتبہ الا بہذا الاسناد وا وردہ الحافظ ابن حجر فی امالیہ ولم یقدح فیہ بشئی الا انہ قال ابراہیم فیہ لین وقد اخرج لہ مسلم فی المتابعات کذا فی اللالی وذکرہ السیوطی فی شرح الصدور ولم یقدح فیہ بشئ قلت وقد ورد فی التلقین احادیث کثیرة ذکرہا الحافظ فی التلخیص وقال فی جملة من رواہا وعن عروة بن مسعود الثقفی رواہ العقیلی باسناد ضعیف ثم قال روی فی الباب احادیث صحاح عن غیر واحد من الصحابة ورواہ ابن ابی الدنیا فی کتاب المحتضرین من طریق عروة بن مسعود عن ابیہ عن حُذَیْفَةَ بلفظ لَقِّنُوْا مَوْتَاکُمْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ فَاِنَّہَا تَہْدِمُ مَا قَبْلَہَا مِنَ الْخَطَایَا وروی فیہ

ايضًا عن عمر وعثمان وابن مسعود وانس وغيرهم اه وفي الجامع الصغير لقنوا موتاكم. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رواه احمد ومسلم والاربعة عن ابي سعيد ومسلم وابن ماجة عن ابي هريرة والنسائي عن عائشة ورقم له بالصحة وفي الحصن اِذَا اَفْصَحَ الْوَلَدُ فَلْيُعَلِّمْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وفي الحرز رواه ابن السني عن عمرو بن العاص اه قلت ولفظه في عمل اليوم والليلة عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَجَدْتُّ فِيْ كِتَابِ جَدِّيْ الَّذِيْ حَدَّثَهٗ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ لَا تُبَالُوْا مَتٰى مَاتُوْا وَاِذَا اثْغَرُوْا فَمُرُوْهُمْ بِالصَّلٰوةِ وفي الجامع الصغير برواية احمد وابي داؤد والحاكم عَنْ مُعَاذٍ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ورقم له بالصحة وفي مجمع الزوائد عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهٗ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لم يدخل النار وفي غير رواية مرفوعة مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(৩৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শিশুরা যখন কথা বলিতে শিখে প্রথমে তাহাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 'তালকীন' কর। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে এবং শেষ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইবে যদি সে হাজার বৎসরও জীবিত থাকে (ইনশাআল্লাহ) তাহাকে কোন গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। (হয়ত বা এইজন্য যে, তাহার দ্বারা কোন গোনাহের কাজ হইবে না, অথবা যদি হইয়াও যায় তবে তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হইয়া যাইবে অথবা এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ তালকীন বলে মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসিয়া কালেমা পড়িতে থাকা—যেন উহা শুনিয়া সে ব্যক্তিও পড়িতে শুরু করিয়া দেয়। ঐ সময় তাহার উপর কালেমা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি না করা চাই। কারণ সে তখন কঠিন কষ্টে লিপ্ত থাকে।

মৃত্যুশয্যায় কালেমা তালকীন করার বিষয় বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসীব হইয়া যায় তাহার গোনাহ এমনভাবে ধসিয়া পড়ে যেমন প্লাবনের কারণে দালান-কোঠা ধসিয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে, মৃত্যুর সময় যাহার এই মোবারক কালেমা নসীব হয়, তাহার পিছনের

গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, মোনাফেকদের এই কালেমা পড়ার সৌভাগ্য হয় না। এক হাদীসে আছে, তোমরা মুর্দাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাথেয় দান কর। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে এই পর্যন্ত লালন পালন করে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে শুরু করে তাহার হিসাব মাফ হইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করে, মৃত্যুর সময় তাহার নিকট একজন ফেরেশতা হাযির হয়, যে শয়তানকে তাড়াইয়া দেয়, আর সেই ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ--এর তালকীন করে। বহু পরীক্ষিত একটি বিষয় এই যে, তালকীনের দ্বারা বেশীর ভাগ ফায়দা তখনই হয় যখন জীবিত অবস্থায়ও এই পাক কালেমার বেশী বেশী যিকিরের অভ্যাস রাখে।

এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে, সে ভূষি বিক্রয় করিত। মৃত্যুর সময় হইলে লোকজন তাহাকে কালেমার তালকীন করিতেছিল আর সে বলিতেছিল, এই গাঁঠরির মূল্য এত, ঐ গাঁঠরির মূল্য এত। এই রকম আরও ঘটনা 'নুজহাতুল বাছাতীন' নামক কিতাবে আছে। ইহাছাড়া চোখের সামনেও এই রকম ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

অনেক সময় এমন হয় যে, কোন গোনাহের কারণে কালেমা নছীব হয় না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, আফীম খাওয়ার মধ্যে সত্তরটি ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। আর ইহার বিপরীত মেসওয়াকের সত্তরটি উপকার রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয়।

এক ব্যক্তির ঘটনা, বর্ণিত আছে মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করা হইল। সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না ; তোমরা দোয়া কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? সে বলিল, আমি ওজনে সতর্কতা অবলম্বন করিতাম না।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা, মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমার তালকীন করা হইলে সে বলিল, আমার মুখে কালেমা আসিতেছে না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এক মহিলা আমার নিকট তোয়ালে কিনিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বারবার তাহাকে দেখিতেছিলাম। এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। কিছু ঘটনা 'তাজকেরায়ে কুরতুবিয়া' কিতাবে লেখা হইয়াছে। বান্দার কাজ হইল, সে গোনাহ হইতে তওবা করিতে থাকিবে আর আল্লাহ পাকের কাছে তাওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

(৩৯) عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَّلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الٰہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔

(رواه ابن ماجة كذا في منتخب كنز العمال قلت واخرجه الحاكم في حديث طويل وصححه ولفظه قول لا اله الا الله لا يترك ذنبا ولا يشبهها عمل اه وتعقب عليه الذهبي بان زكريا ضعيف وسقط بين محمد وام هانئ وذكره في الجامع برواية ابن ماجة ورقم له بالضعف)

(৩৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে না কোন আমল আগে বাড়িতে পারে আর না এই কালেমা কোন গোনাহকে ছাড়িতে পারে।

(মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইতে কোন আমল আগে বাড়িতে পারে না, ইহা তো স্পষ্ট। কোন আমলই এমন নাই যাহা কালেমা তাইয়্যেবাহ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মোট কথা প্রত্যেকটি আমলের জন্য ঈমানের প্রয়োজন। যদি ঈমান থাকে তবে ঐ সমস্ত আমলও কবুল হইতে পারে, নতুবা কবুল হইবে না। আর কালেমা তাইয়্যেবাহ যেহেতু স্বয়ং ঈমান, সেহেতু উহা কোন আমলের মুখাপেক্ষী নহে। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি শুধু ঈমান রাখে এবং ঈমান ছাড়া তাহার কাছে আর কোন আমল না থাকে তবুও তো এক সময় ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান রাখে না সে যতই পছন্দনীয় আমল করুক না কেন নাজাতের জন্য যথেষ্ট নহে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ হইল, কোন গোনাহকে ছাড়ে না, ইহাকে যদি এই হিসাবে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি জীবনের শেষ সময় মুসলমান হয় এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে তবে ইহা একটি স্পষ্ট বিষয় যে, এই ঈমান গ্রহণ করিবার পূর্বে কুফরের অবস্থায় সে ব্যক্তি যত গোনাহ করিয়াছিল ঐ সকল গোনাহ সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্ব হইতে পড়া বুঝায় তবে হাদীস শরীফের অর্থ হইল এই কালেমা অন্তর পরিষ্কার

ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপায় স্বরূপ। যখন এই পবিত্র কালেমার যিকির বেশী বেশী করা হইবে তখন অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার কারণে তওবা করা ব্যতীত স্বস্তিই পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত গোনাহ মাফের কারণ হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ঘুমাইবার সময় এবং ঘুম হইতে জাগিবার পর নিয়মিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে স্বয়ং দুনিয়াও তাহাকে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং মুছীবত হইতে তাহাকে হেফাজত করিবে।

(٤٠) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلْاِیْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَۃً فَاَفْضَلُھَا قَوْلُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَدْنَاھَا اِمَاطَۃُ الْاَذٰی عَنِ الطَّرِیْقِ وَالْحَیَاءُ شُعْبَۃٌ مِّنَ الْاِیْمَانِ۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی ستّر سے زیادہ شاخیں ہیں (بعض روایات میں ستتّر آئی ہیں) ان میں سب سے افضل لآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کا پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز (اینٹ لکڑی کانٹے وغیرہ) کا ہٹا دینا ہے اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔

(رواہ الستۃ وغیرھم بالفاظ مختلفۃ واختلاف یسیر فی العدد وغیرہ وھذا اخر ما اردت ایرادہ فی ھذا الفصل رعایۃ لعدد الاربعین واللہ الموفق لما یحب ویرضی)

(৪০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রহিয়াছে। (কোন বর্ণনা মতে সাতাত্তরটি) এইগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি) হটাইয়া দেওয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ লজ্জাকে বিশেষ গুরুত্বের কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা বহু গোনাহের কাজ, যথা—জেনা, চুরি, অশ্লীল কথা, উলঙ্গপনা, গালিগালাজ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকার কারণ হয়। অনুরূপ, এই লজ্জার খাতিরে মানুষ অনেক নেককাজ করিতেও বাধ্য হইয়া যায়। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে লজ্জিত হইতে হইবে এই অনুভূতি মানুষকে অনেক নেক কাজ করিতে উৎসাহ দান করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছেই, ইহা ছাড়াও যাবতীয় হুকুম

আহকাম পালন করার কারণ হয়।

প্রবাদ আছে, "تو بے حیا باش وہر چہ خواہی کن" "তুমি নির্লজ্জ হও অতঃপর যাহা মনে চায় তাহাই কর।"

সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "তুমি যখন লজ্জাশীল হইবে না তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" কেননা, সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ একমাত্র লজ্জার কারণেই হইয়া থাকে। লজ্জা থাকিলে ইহা অবশ্যই মনে করিবে যে, যদি নামায না পড়ি তবে আখেরাতে কিরূপে মুখ দেখাইব। আর লজ্জা না থাকিলে মনে করিবে যে, কেহ কিছু বলিলে তেমন আর কি হইবে।

তাম্বীহ ঃ এই হাদীসে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা এরশাদ ফরমাইয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। অনেক রেওয়ায়াতে সাতাত্তরের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উপরে হাদীসের তরজমায় এইদিকে ইশারা করিয়া দিয়াছি। আলেমগণ ঈমানের এই সাতাত্তরটি শাখার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার উপর বহু স্বতন্ত্র কিতাবও লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হাব্বান (রহঃ) বলেন, "আমি এই হাদীসের মর্ম বুঝিবার জন্য বহু দিন যাবৎ চিন্তা করিতে থাকি। এবাদতসমূহ গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। হাদীসসমূহ তালাশ করি এবং হাদীস শরীফে যেইসব বস্তুকে বিশেষভাবে ঈমানের শাখার আওতায় উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি গণনা করিয়া দেখিলাম উহা সাতাত্তর হইতে কম হইয়া যায়। আমি কুরআনে পাকের দিকে মনোযোগী হইলাম। কুরআন পাকে যেসব জিনিসকে ঈমানের আওতায় উল্লেখ করিয়াছে সেইগুলি গণনা করিলাম। তাও উল্লেখিত সংখ্যা হইতে কম ছিল। অবশেষে কুরআন ও হাদীস উভয়টিকে একত্রিত করিলাম এবং উভয়টির মধ্যে যেসব জিনিসকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে স্থির করা হইয়াছে উহা গণনা করিয়া যেগুলি উভয়টির মধ্যে অভিন্ন ছিল সেগুলিকে এক সংখ্যা ধরিয়া মোট হিসাব দেখিলাম। ইহাতে উভয়ের সমষ্টি অভিন্ন জিনিসগুলি বাদ দিলে এই সংখ্যার সহিত মিলিয়া যায় তখন আমি বুঝিলাম হাদীস শরীফের অর্থ ইহাই।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, একটি জামাত ঈমানের এই শাখাগুলি গুরুত্বসহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইজতেহাদের দ্বারা এই বিস্তারিত বিবরণকে হাদীসের উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ এই সংখ্যার নির্দিষ্ট বিবরণ জানা না থাকিলে ঈমানের মধ্যে কোন

ত্রুটি বা কমি আসে না। কারণ ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলি ও শাখা–প্রশাখা সবকিছুই বিস্তারিতভাবে জানা আছে এবং প্রমাণিতও আছে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই সংখ্যার বিবরণ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই জানেন এবং ইহা শরীয়তের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব, ইহার সংখ্যার সহিত বিস্তারিত বিবরণ না জানা মোটেও ক্ষতিকর নয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের এই শাখাসমূহের মধ্যে 'তওহীদ' তথা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, ঈমানের মধ্যে তওহীদের মর্তবা সব শাখার উপরে। ইহার উপরে ঈমানের আর কোন শাখা নাই। সুতরাং বুঝা গেল তওহীদই হইল মূল বিষয় যাহা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী যাহার উপর শরীয়তের হুকুম–আহকাম আরোপিত হয়। আর সর্বনিম্ন শাখা হইল, ঐ সকল বিষয় দূর করিয়া দেওয়া যাহা কোন মুসলমানের ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। বাকী সমস্ত শাখা এই দুইয়ের মাঝখানে রহিয়াছে। এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানা জরুরী নয় ; বরং সমষ্টিগতভাবে উহার উপর ঈমান আনিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন সমস্ত ফেরেশতার উপর ঈমান আনা জরুরী অথচ তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও তাহাদের সকলের নাম আমরা জানি না। ঈমানের জন্য ইহাই যথেষ্ট।

তথাপি মোহাদ্দেসগণের এক জামাত এই সমস্ত শাখার নাম উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন কিতাব লিখিয়াছেন। আবু আবদুল্লাহ হালিমী (রহঃ) ইহার উপর কিতাব লিখিয়াছেন, উহার নাম দিয়াছেন 'ফাওয়ায়েদুল মিনহাজ'। এমনিভাবে ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'শু'আবুল ঈমান' নামক কিতাব লিখিয়াছেন। একই নামে শায়েখ আবদুল জলীল (রহঃ) কিতাব লিখিয়াছেন। ইসহাক ইবনে কুরতুবী (রহঃ) 'কিতাবুল নাছায়েহ' নামক কিতাব লিখিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) 'ওয়াছফুল ঈমান ওয়া শুআবিহ্' নামক কিতাব লিখিয়াছেন।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিষয়ের বিভিন্ন কিতাব হইতে সারোদ্ধার করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে জমা করিয়াছেন। যাহার সারমর্ম হইল এই যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম।

প্রথমতঃ তাসদীকে কালবী। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের একীন করা।

দ্বিতীয়তঃ জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল।

তৃতীয়তঃ শরীরের আমলসমূহ।

অর্থাৎ, ঈমানের সমুদয় শাখা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম যাহার সম্পর্ক নিয়ত, বিশ্বাস ও অন্তরের আমলের সহিত। দ্বিতীয় যাহার সম্পর্ক মুখের সহিত। তৃতীয় উহা যাহার সম্পর্ক শরীয়তের অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত। ঈমান সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস এই তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার—সমস্ত বিশ্বাস ও আকীদাগত বিষয়সমূহ যাহার অন্তর্ভুক্ত। উহা মোট ৩০টি জিনিস। যথা ঃ

(১) আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনা। ইহার মধ্যে আল্লাহর জাত ও ছিফাত (গুণাবলী)এর উপর ঈমান আনা শামিল রহিয়াছে। আর এই একীন রাখাও উহার অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা এক অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কোন তুলনাও নাই।

(২) আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই পরবর্তীতে সৃষ্টি হইয়াছে, একমাত্র তিনিই অনন্তকাল হইতে আছেন।

(৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

(৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

(৫) আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমান আনা।

(৬) তকদীরের উপর ঈমান আনা যে ভালমন্দ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়।

(৭) কিয়ামত সত্য—এই কথার উপর ঈমান আনা। কবরের সওয়াল-জওয়াব, কবরের আজাব, মৃত্যুর পর পুনরায় জিন্দা হওয়া, হিসাব-নিকাশ, আমলের ওজন, পুলছিরাত পার হওয়া এই সবকিছু কিয়ামতের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) জান্নাতের উপর একীন ও বিশ্বাস করা এবং এই একীন করা যে, ইনশাআল্লাহ মোমিন বান্দারা জান্নাতে চিরকাল থাকিবে।

(৯) জাহান্নামের উপর একীন করা এবং একীন রাখা যে, জাহান্নামে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে আর উহাও চিরস্থায়ী হইবে।

(১০) আল্লাহ পাকের সহিত মহব্বত রাখা।

(১১) কাহারও সহিত আল্লাহর জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্যই কাহারও সহিত দুশমনী রাখা। (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বত রাখা ও তাহার নাফরমানদের সহিত শত্রুতা রাখা) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষ করিয়া মোহাজেরীন ও আনছার শাহাবীগণ ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণের প্রতি মহব্বত রাখাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বত রাখা। তাঁহাকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পড়া এবং তাঁহার সুন্নতের অনুসরণ করাও মহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(১৩) এখলাছ। যাহার মধ্যে রিয়াকারি ও মোনাফেকী না করাও শামিল রহিয়াছে।

(১৪) তওবা। অর্থাৎ কৃত গোনাহের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় ওয়াদা করা।

(১৫) আল্লাহর ভয়।

(১৬) আল্লাহর রহমতের আশা করা।

(১৭) আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া।

(১৮) আল্লাহর শোকর করা।

(১৯) ওয়াদা পূরণ করা।

(২০) ছবর করা।

(২১) বিনয়–নম্রতা। বড়দেরকে সম্মান করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২২) স্নেহ ও দয়া। ছোটদেরকে স্নেহ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৩) তকদীরের উপর রাজী থাকা।

(২৪) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(২৫) আত্মগর্ব ও আত্মপ্রশংসা ত্যাগ করা ; আত্মশুদ্ধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৬) বিদ্বেষ না রাখা। হিংসাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২৭) 'আইনী' নামক কিতাবে এই নম্বর বাদ পড়িয়াছে। আমার খেয়ালে এখানে 'হায়া' অর্থাৎ লজ্জা করা হইবে। যাহা লেখকের ভুলের দরুন বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

(২৮) রাগ না করা।

(২৯) ধোকা না দেওয়া। অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা ও প্রতারণা না করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩০) দুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। মালের মহব্বত ও সম্মানের লোভও ইহাতে রহিয়াছে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিলের দ্বারা সমাধা হয় এইরূপ সমস্ত আমল আসিয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও কোন আমল রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন না কোন একটির মধ্যে উহা আসিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

জবানের আমল ঃ ইহার ৭টি শাখা রহিয়াছে।

(১) কালেমা তাইয়্যেবা পড়া।

(২) কুরআন পাক তেলাওয়াত করা।

(৩) দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা।

(৪) অন্যদেরকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া।

(৫) দোয়া করা।

(৬) আল্লাহর যিকির করা। ইস্তেগফারও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) বেকার বা অনর্থক কথা না বলা।

তৃতীয় প্রকার ঃ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ঃ ইহা মোট ৪০টি। যাহা তিনভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ; ইহার ১৬টি শাখা।

(১) পবিত্রতা হাসিল করা। শরীর, পোশাক, জায়গা, এই সবকিছু পবিত্র রাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত। শরীর পবিত্র রাখার মধ্যে অজু, হায়েজ, নেফাস ও জানাবাতের গোছলও অন্তর্ভুক্ত।

(২) নামাযের পাবন্দি করা এবং উহা কায়েম করা (অর্থাৎ নামাযের সমস্ত আদব ও শর্ত সহকারে নামায পড়া, যেমন ফাযায়েলে নামাযের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)। ফরজ, নফল সময়মত আদায় ও কাজা সর্বপ্রকার নামায ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ছদকা করা। যাকাত, ছদকায়ে ফেতর, দান-খয়রাত, মেহমানদারী, লোকদেরকে খাওয়ান, গোলাম আজাদ করা এই সবকিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) রোযা রাখা। ফরজ ও নফল উভয় প্রকার।

(৫) হজ্জ করা। ফরজ হজ্জ ও নফল হজ্জ উভয় প্রকার এবং ওমরা ও তাওয়াফও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৬) এতেকাফ করা। শবে কদর তালাশ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) দ্বীনের হেফাজতের জন্য বাড়ীঘর ত্যাগ করা। হিজরত করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৮) মান্নত পুরা করা।

(৯) কছম খাইলে উহার হেফাজত করা।

(১০) কাফফারা আদায় করা।

(১১) নামায অবস্থায় অথবা নামাযের বাহিরে ছতর ঢাকিয়া রাখা।

(১২) কুরবানী করা, কুরবানীর পশুর দেখাশুনা ও যত্ন করা।

(১৩) জানাযার এহতেমাম করা ও উহার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করা।

(১৪) কর্জ পরিশোধ করা।

(১৫) লেনদেন শরীয়ত মোতাবেক করা, সূদ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

(১৬) হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন না করা।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ অন্যের সহিত আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত। ইহার ৬টি শাখা ঃ

(১) বিবাহের দ্বারা হারাম হইতে বাঁচা।

(২) পরিবার-পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উহা আদায় করা। চাকর-বাকর ও খাদেমের হকও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। নম্র আচরণ করা ও তাহাদের কথা মানিয়া চলা।

(৪) সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক রাখা।

(৬) বড়দের অনুগত হওয়া ও কথা মানিয়া চলা।

তৃতীয় ভাগ ঃ সাধারণ হক সম্পর্কিত। ইহার ১৮টি শাখা।

(১) ইনছাফের সহিত শাসন করা।

(২) হক্কানী জমাতের সহিত থাকা।

(৩) শাসনকর্তার অনুগত হইয়া চলা। (যদি শরীয়তবিরোধী কোন হুকুম না হয়।)

(৪) পারস্পরিক বিষয়সমূহের সংশোধন করা। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও বিদ্রোহীদের দমন ও জিহাদ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) নেক কাজে অন্যের সহযোগিতা করা।

(৬) নেক কাজে আদেশ করা, অন্যায় কাজে নিষেধ করা। ওয়াজ ও তবলীগও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হদ অর্থাৎ শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি বিধান কায়েম করা।

(৮) জিহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৯) আমানত আদায় করা। গণীমত অর্থাৎ জেহাদে প্রাপ্ত মাল বায়তুল মালে জমা দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) করজ প্রদান করা ও পরিশোধ করা।

(১১) প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা।

(১২) লেনদেন সঠিকভাবে করা। বৈধ পন্থায় মাল জমা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) মাল-দৌলত উপযুক্ত স্থানে খরচ করা। বেহুদা খরচ, অপব্যয় ও কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৪) ছালাম করা ও ছালামের উত্তর দেওয়া।

(১৫) কেহ হাঁচি দিলে উহার জবাবে 'ইয়ার্‌ হামুকাল্লাহ' বলা।

(১৬) দুনিয়াবাসীর সহিত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণ না করা।

(১৭) বেহুদা কাজ ও খেলতামাশা হইতে বিরত থাকা।

(১৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা।

ঈমানের মোট এই ৭৭টি শাখা হইল। এই সবের মধ্যে কোন কোনটিতে একটিকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সঠিক লেনদেনের মধ্যে মাল জমা করা ও খরচ করা উভয়টি দাখিল হইতে পারে। এমনিভাবে চিন্তা করিলে আরও সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। এই হিসাবে সত্তর অথবা সাতষট্টি সংখ্যা সম্বলিত হাদীসের অধীনেও উপরোক্ত ব্যাখা হইতে পারে।

ঈমানের এই শাখাসমূহ বর্ণনায় আমি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রহঃ)এর বক্তব্যকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, তিনি ধারাবাহিক নম্বর সহ এই তালিকা পেশ করিয়াছেন। আর হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ)এর 'ফতহুল বারী' ও আল্লামা কারী (রহঃ)এর 'মেরকাত' গ্রন্থদ্বয় হইতে এইগুলির ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা সংক্ষিপ্তভাবে এইগুলিই, যাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন মানুষের কর্তব্য হইল, এই সমস্ত শাখা-প্রশাখার ভিতরে চিন্তা-ফিকির করিবে, যেইগুলি নিজের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, উহার উপর আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিবে। কেননা একমাত্র তাঁহারই দয়া, মেহেরবানী ও খাছ তওফীকেই কোন ভালাই হাছিল হইতে পারে। আর যেইসব শাখা ও গুণাবলীর ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্রুটি বা কমি মনে করিবে সেইগুলি হাছিল করার জন্য চেষ্টা করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তওফীকের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল

কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' কোন কোন বর্ণনায় ইহার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-রও উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে এই কালেমাগুলির অনেক বেশী ফযীলত আসিয়াছে। এই কালেমাগুলি 'তসবীহে ফাতেমী' নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হইল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমাগুলি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কেও শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার বিবরণ সামনে আসিতেছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেও যেহেতু কালামে পাকের আয়াত এবং হাদীসসমূহ অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই ইহাকে দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল। প্রথম পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীসসমূহ বর্ণিত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহাতে ঐ সমস্ত আয়াত বর্ণনা করা হইতেছে যেগুলির মধ্যে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার-এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাই নিয়ম যে, যে জিনিস যত বেশী মর্যাদাসম্পন্ন হয় উহা তত বেশী গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন উপায়ে উহাকে অন্তরে বদ্ধমূল বা হৃদয়ঙ্গম করানো হয়। অতএব কুরআন পাকে এই শব্দগুলির ভাবার্থও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম শব্দ হইল, 'সুবহানাল্লাহ' ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তয়ালা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব হইতে মুক্ত ; আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি। এই বিষয়টিকে আদেশ হিসাবেও বলিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর। সংবাদ হিসাবেও বলিয়াছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মখলূকও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে অন্যান্য শব্দের বিষয়বস্তুও কালামে পাকে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(١) وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ (سورۂ بقرہ رکوع ۴)

(فرشتوں کا مقولہ انسان کی پیدائش کے وقت) ہم بحمد اللہ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی کا دل سے اقرار کرتے رہتے ہیں۔

(১) (মানুষের সৃষ্টিলগ্নে ফেরেশতাদের উক্তি) আমরা সর্বদা আপনার তসবীহ পড়ি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা অন্তরে স্বীকার করি। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

(٢) قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ (سورۂ بقرہ رکوع ۴)

(ملائکہ کا جب بمقابلہ انسان امتحان ہوا تو) کہا آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں ہم کو تو اس کے سوا کچھ بھی علم نہیں جتنا آپ نے بتا دیا ہے بیشک آپ بڑے علم والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں۔

(২) (মানুষের মোকাবেলায় যখন ফেরেশতাদের পরীক্ষা হইল তখন) তাহারা বলিল, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র। আপনি যাহা আমাদেরকে শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো আর কোনই জ্ঞান নাই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতময়। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

(٣) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۔ (س آل عمران رکوع ۴)

اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیجیو اور اس کی تسبیح کیجیو دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت بھی۔

(৩) আপন পরোয়ারদেগারকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করিও এবং তাঁহার তসবীহ পাঠ করিও বিকালে ও সকালেও। (আলি-ইমরান, রুকূ ঃ ৪)

(٤) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (سورۂ آل عمران رکوع ۲۰)

(سمجھ دار لوگ جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور قدرت کے کارناموں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں) یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے (بلکہ بڑی حکمتیں اس میں ہیں) آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔

(৪) (ঐ সমস্ত জ্ঞানীলোক যাহারা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর কুদরতের আলামতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ফিকির

করে, তাহারা বলে,) হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আপনি এই সমস্ত জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। (বরং এই সবকিছুর মধ্যে বিরাট হেকমতসমূহ নিহিত রহিয়াছে।) আপনার সত্তা সর্বপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন। (সূরা আলি-ইমরান, রুকূ ঃ ২০)

(৫) سُبْحَانَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ (سورۂ نساء رکوع ۲۳)

وہ ذات اس سے پاک ہے کہ اُس کے اولاد ہو۔

(৫) সেই মহান সত্তা সন্তান হওয়ার বিষয় হইতে পবিত্র।

(সূরা নিসা, রুকূ ঃ ২৩)

(৬) قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ط (سورۂ مائدہ رکوع ۱۶)

(قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیٰ نبیّنا و علیہ السّلام سے سوال ہوگا کہ اپنی اُمّت کو تثلیث کی تعلیم کیا تم نے دی تھی تو) وہ کہیں گے (توبہ توبہ) میں تو آپ کو (شرک سے اور ہر عیب سے) پاک سمجھتا ہوں میں ایسی بات کیسے کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہ تھا۔

(৬) (কেয়ামতের দিন যখন হযরত ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি তোমার উম্মতকে তিন খোদার তালীম দিয়াছিলে? তখন) তিনি বলিবেন, (তওবা তওবা) আমি তো আপনাকে শিরক হইতে এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে পাক-পবিত্র বিশ্বাস করি। আমি কিরূপে এমন কথা বলিতে পারি যাহা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না।

(সূরা মায়েদাহ, রুকূ ঃ ১৬)

(৭) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (سورہ انعام رکوع ۱۲)

اللہ جلّ جلالہٗ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو (یہ کافر لوگ اللہ کی شان میں) کہتے ہیں (کہ اُس کے اولاد ہے یا شریک ہے وغیرہ وغیرہ)

(৭) এই সব লোক (কাফেরগণ) আল্লাহ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলে (যথা, আল্লাহর সন্তান আছে, শরীক আছে ইত্যাদি) তিনি ঐ সমস্ত হইতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে। (সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৭)

(৮) فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(جب طور پر حق تعالیٰ شانہٗ کی ایک تجلّی سے حضرت موسیٰ علیٰ نبیّنا و علیہ السّلام

(سورۃ اعراف رکوع ۱۷) بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کے دیکھنے سے اور ہر عیب سے) پاک ہے میں (دیدار کی درخواست سے) توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔

(৮) হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার এক তাজাল্লিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন) অতঃপর যখন তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিল তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আপনার যাত (এই চক্ষু দ্বারা দেখা হইতে এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে) পবিত্র। আমি আপনাকে (দেখার আবেদন হইতে) তওবা করিতেছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।

(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৭)

(৯) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ○ (سورہ اعراف رکوع ۲۴)

بیشک جو اللہ کے مقرب ہیں (یعنی فرشتے) وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

(৯) নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তাহারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার করে না। তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাঁহাকেই সেজদা করিতে থাকে।

(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ২৪)

ফায়দা ঃ সূফীয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে অহংকার না করার বিষয়টি আগে উল্লেখ করিয়া এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অহংকার দূর করা এবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপায়, অহংকারের কারণে এবাদতে ত্রুটি হয়।

(১০) سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (سورہ توبہ رکوع ۵)

اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ (کافر اس کا) شریک بناتے ہیں۔

(১০) তাঁহার যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে তাহারা (কাফেররা তাহার সহিত) শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরা তওবা, রুকূ ঃ ৫)

(১১) دَعْوٰهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَ

(ان جنتیوں کے) منہ سے یہ بات نکلے گی سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اور آپس کا ان کا سلام ہوگا

اٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ (سورۂ یونس رکوع ۱)

السلام علیکم اور جب دنیا کی دقتوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے کہ اب ہمیشہ کے لئے اُن سے خلاصی ہوگئی تو، آخر میں کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

(১১) (ঐ সমস্ত জান্নাতীদের) মুখ হইতে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' কথাটি বাহির হইবে ও তাহাদের পরস্পর সালাম হইবে 'আস্‌সালামু' (আলাইকুম)। (তাহারা যখন দুনিয়ার কষ্টের কথা স্মরণ করিবে এবং এই কথা মনে করিবে যে, এখন চিরকালের জন্য দুনিয়ার কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।) তখন সর্বশেষে বলিবে, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ২)

(۱۲) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (سورۂ یونس رکوع ۲)

وہ ذات پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ کافر شریک بناتے ہیں۔

(১২) সেই যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে, যেগুলিকে কাফেররা তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করে। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ২)

(۱۳) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ (سورۂ یونس رکوع ۷)

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہٗ کے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں

(১৩) তাহারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তান রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ইহা হইতে পাক ; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

(সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ৭)

(۱۴) وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (سورہ یوسف رکوع ۱۲)

اور اللہ جل شانہٗ (ہر عیب سے) پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں

(১৪) আল্লাহ তায়ালা (সমস্ত দোষ হইতে) পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ১২)

(۱۵) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ (سورۂ رعد رکوع ۲)

اور رعد (فرشتہ) اُس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اُس کے ڈر سے (تسبیح وتحمید کرتے ہیں)

(১৫) এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁহার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁহার ভয়ে (প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা

করে)। (সূরা রা'দ, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিজলী গর্জনের সময় এই আয়াত পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

সে উহার ক্ষতি হইতে হেফাজতে থাকিবে। এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা বিজলীর গর্জন শুন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিও। কেননা, বিজলী যিকিরকারী পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। আরেক হাদীসে আছে, বিজলী গর্জনের সময় তোমরা তসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়িও ; তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) বলিও না।

(١٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝ (سورہ حجر رکوع ٦)

اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (جو نامناسب کلمات آپ کی شان میں) کہتے ہیں ان سے آپ کو دل تنگی ہوتی ہے پس (اس کی پرواہ نہ کیجئے) آپ اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آوے۔

(১৬) আমি জানি এই সমস্ত লোক (আপনাকে যে সকল অসঙ্গত কথা) বলিয়া থাকে, উহাতে আপনার অন্তরে ব্যথা হয়। আপনি (ইহার পরওয়া করিবেন না।) আপনি আপন রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকুন, সেজদাকারীদের অর্থাৎ নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপন রবের এবাদতে মশগুল থাকুন। (হিজর, রুকূঃ ৬)

(١٧) سُبْحَانَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (سورہ نحل رکوع ١)

وہ ذات لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔

(১৭) সেই সত্তা মানুষের শিরক হইতে পবিত্র ও উর্ধ্বে।

(সূরা নাহল, রুকূ ঃ ১)

(١٨) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحَانَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ (سورہ نحل رکوع ٧)

اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وہ ذات اس سے پاک ہے (اور تماشا یہ ہے کہ) اپنے لئے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جس کو خود پسند کرتے ہیں۔

(১৮) তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। তিনি ইহা হইতে

পবিত্র। আর (আশ্চর্য এই যে) নিজেদের জন্য এমন জিনিস নির্ধারণ করে যাহা নিজেরা পছন্দ করে। (সূরা নাহ্ল, রুকূ ঃ ৭)

(১৯) سُبْحَانَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی (بنی اسرائیل رکوع ۱)

(ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی (معراج کا قصہ)

(১৯) সেই মহান যাত যিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, তিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাত্রিতে মসজিদে-হারাম (অর্থাৎ কাবা শরীফের মসজিদ) হইতে মসজিদে-আকসা পর্যন্ত নিয়া গিয়াছেন। (বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ১)

(২০) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ (سورۂ بنی اسرائیل ع ۵)

(۲۰ تا ۲۲) یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہٗ اس سے پاک اور بہت زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔

(২০) এই সমস্ত লোক যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। (বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(২১) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط (سورۂ بنی اسرائیل رکوع ۵)

تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے (آدمی فرشتے اور جن) ان کے درمیان میں ہیں سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

(২১) সাত আসমান ও জমীন সমস্তই এবং (মানুষ, ফেরেশতা ও জ্বিন) যতকিছু এইগুলির মধ্যে আছে সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(২২) وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط (سورۂ بنی اسرائیل رکوع ۵)

(اور یہی نہیں بلکہ) کوئی چیز بھی (جاندار ہو یا بے جان) ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔

(২২) (আর শুধু ইহাই নহে ; বরং) (প্রাণী বা নিষ্প্রাণ) এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহকে বুঝ না। (বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(۲۳) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ٥ (سورہ بنی اسرائیل ع ۱۰)

(آپ ان لغو مطالبوں کے جواب میں جو وہ کرتے ہیں) کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ میں تو ایک آدمی ہوں، رسول ہوں (خدا نہیں ہوں کہ جو چاہے کروں)

(২৩) আপনি (তাহাদের অহেতুক ফরমায়েশসমূহের জবাবে) বলিয়া দিন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ, একজন রাসূল। (আল্লাহ নহি, যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব।) (বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ১০)

(۲۴) وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ٥ (س بنی اسرائیل ۱۲)

(ان علماء پر جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے. بے شک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے.

(২৪) (এই সমস্ত ওলামাদের সম্মুখে যখন কুরআন শরীফ পড়া হয় তখন তাহারা থুতনীর উপর সেজদায় পড়িয়া যায় এবং) তাহারা বলে, আমাদের রব পবিত্র ; নিশ্চয়ই তাঁহার ওয়াদা অবশ্য পূর্ণ হইবে।

(বনী ইস্রাঈল, রুকূ ঃ ১২)

(۲۵) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ٥ (سورۃ مریم رکوع ۱)

پس (حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) حجرہ میں سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی تسبیح کیا کرو.

(২৫) অতঃপর (হযরত যাকারিয়া (আঃ)) হুজরা হইতে বাহিরে তশরীফ আনিলেন এবং আপন কওমকে ইশারায় বলিলেন, তোমরা সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহর তসবীহ পড়িতে থাক। (মারয়াম, রুকূ ঃ ১)

(۲۶) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ ط (سورۃ مریم رکوع ۲)

اللہ جل شانہٗ کی یہ شان (ہی) نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے وہ ان سب قصوں سے پاک ہے.

(২৬) আল্লাহ তায়ালার এই শানই নয় যে, তিনি সন্তান অবলম্বন করিবেন। তিনি এইসব বিষয় হইতে পবিত্র। (মারয়াম, রুকূ ঃ ২)

(۲۷) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَآئِ

(محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی نامناسب باتوں پر صبر کیجئے) اور اپنے رب کی حمد (وثنا)

اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ○ (س طٰہٰ ع ٨) کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں تاکہ آپ (اس ثواب اور بے انتہا بدلے پر جو اُن کے مقابلہ میں ملنے والا ہے بے حد) خوش ہو جائیں۔

(২৭) (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাহাদের অসঙ্গত কথার উপর ছবর করুন) এবং আপন রবের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করিতে থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির সময়গুলিতে তসবীহ পড়ুন এবং দিনের শুরুতে ও শেষে। যাহাতে আপনি (উহার বিনিময়ে সওয়াবও অফুরন্ত প্রতিদানে অত্যন্ত) আনন্দিত হন। (সূরা ত্বাহা, রুকূ ঃ ৮)

(٢٨) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (سورۂ انبیاء رکوع ٢) (اللہ کے مقبول بندے اس کی عبادت سے تھکتے نہیں) شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت بھی موقوف نہیں کرتے۔

(২৮) (আল্লাহর মকবূল বান্দাগণ তাঁহার এবাদতে ক্লান্ত হয় না) দিবারাত্রি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পড়িতে থাকে। কখনও বন্ধ করে না। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(٢٩) فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ (سورۂ انبیاء رکوع ٢) اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (کہ نعوذ باللہ اس کے شریک ہیں یا اس کے اولاد ہے)

(২৯) আল্লাহ তায়ালা যিনি আরশের মালিক। এই সকল লোক যাহা কিছু বলে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। (যেমন নাঊযুবিল্লাহ তাঁহার শরীক আছে বা আওলাদ রহিয়াছে।) (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(٣٠) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ط (سورۂ انبیاء رکوع ٢) یہ (کافر لوگ یہ) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) رحمٰن نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو) اولاد بنایا ہے اس کی ذات اس سے پاک ہے۔

(৩০) কাফেররা বলিয়া থাকে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) রাহমান (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে) সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সত্তা এইসব বিষয় হইতে পবিত্র। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ২)

(۳۱) وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (سورۂ انبیاء رکوع ٦)

ہم نے پہاڑوں کو داؤد (علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کے تابع کر دیا تھا کہ اُن کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کریں اور اسی طرح پرندوں کو (تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کریں)

(৩১) পাহাড়সমূহকে আমি দাঊদ (আঃ)এর অনুগত করিয়া দিয়াছিলাম যেন তাহার তসবীহের সাথে তাহারাও তসবীহ পড়ে এবং (এমনিভাবে) পাখীদেরকেও (অনুগত করিয়া দিয়াছিলাম যে তাহার তসবীহের সাথে তাহারাও যেন তসবীহ পড়ে। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ৬)

(۳۲) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (سورۂ انبیاء رکوع ٦)

(حضرت یونسؑ نے تاریکیوں میں پکارا) کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ سب عیوب سے پاک ہیں میں بے شک قصوروار ہوں.

(৩২) (হযরত ইউনুস (আঃ) অন্ধকারে ডাকিলেন) আপনি ব্যতীত আর কেহ মাবূদ নাই, আপনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। আমি নিঃসন্দেহে অপরাধী। (সূরা আম্বিয়া, রুকূ ঃ ৬)

(۳۳) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (سورۂ مؤمنون رکوع ٥)

اللہ تعالیٰ ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں.

(৩৩) ইহারা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা সেই সবকিছু হইতে পবিত্র। (সূরা মুমিনূন ঃ রুকূ ঃ ৫)

(۳۴) سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۝ (سورۂ نور رکوع ٢)

سُبحان اللہ یہ (لوگ جو کچھ حضرت عائشہؓ کی شان میں تہمت لگاتے ہیں) بہت بڑا بہتان ہے.

(৩৪) সুবহানাল্লাহ! ইহারা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর শানে যে অপবাদ দেয়, উহা অতি বড় অপবাদ। (সূরা নূর, রুকূ ঃ ২)

(۳۵) يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ

ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح وشام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ فروخت کرنا وہ

الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ (سورہ نور رکوع ۵)

ایسے دن (کے عذاب) سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی (یعنی قیامت کے دن سے)

(৩৫) এই মসজিদসমূহে সকাল–সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহর তসবীহ পড়িয়া থাকে যাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে এবং নামায আদায় করা হইতে ও যাকাত দেওয়া হইতে ক্রয়–বিক্রয় গাফেল করিতে পারে না। তাহারা ঐ দিনের শাস্তিকে ভয় করে যেইদিন অনেক অন্তর এবং অনেক চক্ষু উল্টিয়া যাইবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে ভয় করে।) (সূরা নূর, রুকূ ঃ ৫)

(۳۶) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ (سورہ نور رکوع ۶)

(اے مخاطب) کیا تجھے (دلائل اور مشاہدہ سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور (خصوصاً) پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں سب کو اپنی اپنی دعا (نماز) اور اپنی اپنی تسبیح (کا طریقہ) معلوم ہے اور اللہ جل شانہٗ کو سب کا حال اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سب معلوم ہے۔

(৩৬) (হে শ্রোতা!) তোমার কি (প্রমাণাদি ও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দ্বারা এই কথা) জানা হয় নাই যে, আসমান ও জমীনে যাহাকিছু আছে, সব আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে। (বিশেষতঃ) ডানা বিস্তার করিয়া উড়ন্ত পাখীও। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া (নামায) ও নিজ নিজ তসবীহ (পড়ার তরীকা) জানা আছে। সকলের অবস্থা এবং মানুষ যাহাকিছু করে আল্লাহ তায়ালা তাহা সব জানেন। (সূরা নূর, রুকূ ঃ ৬)

(۳۷) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ۝ (سورہ فرقان رکوع ۲)

(قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور جن کو یہ پوجتے تھے سب کو جمع کر کے ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا تو) وہ کہیں گے سبحان اللہ ہماری کیا طاقت تھی کہ آپ

کے سوا اور کسی کو کارساز تجویز کرتے بلکہ یہ (احمق خود ہی بجائے شکر کے کفر میں مُبتلا ہوئے) کہ آپ نے اُن کو اور اُن کے بڑوں کو خوب ثروت عطا فرمائی یہاں تک کہ یہ لوگ (دولت کے نشہ میں شہوتوں میں مُبتلا ہوئے اور) آپ کی یاد کو بُھلا دیا اور خود ہی برباد ہو گئے۔

(৩৭) (কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এবং ইহারা যাহাদের পূজা করিত সকলকে একত্র করিয়া উপাস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা কি ইহাদেরকে গোমরাহ করিয়াছিলে? তখন) তাহারা বলিবে, সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি ক্ষমতা ছিল যে, আপনাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও মালিক সাব্যস্ত করিব? বরং (এইসব বোকার দল নিজেরাই আল্লাহর শোকর গুজারী না করিয়া কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে।) আপনি ইহাদেরকে এবং ইহাদের বড়দেরকে খুব প্রাচুর্য দিয়াছিলেন, পরিণামে ইহারা (সম্পদের নেশায় খাহেশাতে লিপ্ত হইয়াছিল।) আর আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে।

(সূরা ফোরকান, রুকূ ঃ ২)

(٣٨) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۝

(سورۂ فرقان ع ٥)

اور اُس ذات پاک پر توکّل رکھئے جو زندہ ہے اور کبھی اس کو فنا نہیں اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیئے (یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیئے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے) کیونکہ وہ پاک ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ (قیامت میں ہر شخص کی مخالفت کا بدلہ دیا جائے گا)

(৩৮) আর ঐ পাক যাতের উপর তাওয়াক্কুল করুন, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও তিনি ফানা হইবেন না। তাঁহারই প্রশংসা সহকারে তসবীহ পড়িতে থাকুন। (অর্থাৎ তসবীহ–তাহমীদে মশগুল থাকুন ; কাহারও বিরোধিতার পরওয়া করিবেন না।) কেননা, ঐ পাক যাত স্বীয় বান্দাদের গোনাহ সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞাত। (কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের বিরুদ্ধাচরণের বদলা দেওয়া হইবে।) (সূরা ফোরকান, রুকূ ঃ ৫)

(٣٩) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(سورۂ نمل رکوع ١)

اللہ ربّ العالمین ہر قسم کی کدورت سے پاک ہے۔

(৩৯) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।

(সূরা নাম্‌ল, রুকূ ঃ ১)

(۴۰) سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (سورہ قصص رکوع ۷)

اللہ جل جلالہٗ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالاتر ہے۔

(৪০) মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে। (সূরা কাছাছ, রুকূ ঃ ৭)

(۴۱) فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○ (سورہ روم رکوع ۲)

پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت (یعنی رات میں) اور صبح کے وقت اور اسی کی حمد (کی جاتی) ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں اور اُسی کی (تسبیح وتحمید کیا کرو) شام کے وقت بھی (یعنی عصر کے وقت بھی) اور ظہر کے وقت بھی۔

(৪১) অতএব তোমরা আল্লাহর তসবীহ পড় সন্ধ্যায় (অর্থাৎ রাত্রিকালে) এবং সকালে। সমস্ত আসমান–জমীনে তাহারই প্রশংসা করা হয়। আর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা কর সন্ধ্যায় (অর্থাৎ আছরের সময়ও) এবং জোহ্‌রের সময়ও। (সূরা রূম, রুকূ ঃ ২)

(۴۲) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (سورہ روم رکوع ۴)

اللہ جل شانہٗ کی ذات پاک اور بالاتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف (منسوب کرکے) بیان کرتے ہیں۔

(৪২) আল্লাহ তায়ালার যাত ঐ সব জিনিস হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে যেইগুলিকে তাহারা আল্লাহর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া বর্ণনা করে।

(সূরা রূম, রুকূ ঃ ৪)

(۴۳) اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ السجدة (سورۂ سجدہ رکوع ۲)

پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب اُن کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔

(৪৩) আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঐ সমস্ত লোক ঈমান আনয়ন করে, যাহাদিগকে এই আয়াতসমূহ স্মরণ করাইলে তাহারা সেজদায় পড়িয়া যায় এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মগ্ন হইয়া যায়। আর তাহারা অহংকার করে না। (সূরা সেজদা, রুকূ ঃ ২)

(۴۴) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○ (سورۂ احزاب رکوع ۶)

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল–সন্ধ্যা তাঁহার তসবীহ পড়। (সূরা আহযাব, রুকূ ঃ ৬)

(۴۵) قَالُوْا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ (سورۂ سبا رکوع ۵)

(جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کرکے حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے تو) وہ کہیں گے آپ (شرک وغیرہ عیوب سے) پاک ہیں ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ اُن سے۔

(৪৫) (কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলূককে জমা করিয়া আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত লোক কি তোমাদের উপাসনা করিত? তখন) তাহারা বলিবে, আপনি (শিরক ইত্যাদি যাবতীয় দোষ হইতে) পবিত্র ; আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথেই, ইহাদের সাথে নয়। (ছাবা, রুকূ ঃ ৫)

(۴۶) سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا۔ (سورۂ یٰس رکوع ۳)

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام جوڑ کی (یعنی ایک دوسرے کے مقابل) چیزیں پیدا کیں۔

(৪৬) ঐ যাত পবিত্র, যিনি সমস্ত জোড়া (অর্থাৎ একটির বিপরীতে আরেকটি এইরূপ) জিনিস পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ইয়াসীন, রুকূ ঃ ৩)

(۴۷) فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ (سورۂ یٰس رکوع ۵)

پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(৪৭) অতএব পবিত্র সেই যাত, যাহার হাতে প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা ইয়াসীন, রুকূ ঃ ৫)

(৪৮) فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۙ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۚ

(سورہ صافات رکوع ۵)

پس اگر (یونس علیہ السلام) تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی (مچھلی) کے پیٹ میں رہتے۔

(৪৮) সুতরাং হযরত ইউনুস (আঃ) যদি তসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না হইতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মাছের পেটের মধ্যেই থাকিতেন।

(সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৪৯) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

(سورہ صافات رکوع ۵)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

(৪৯) তাহারা যাহাকিছু বর্ণনা করে, আল্লাহ তায়ালার যাত ঐ সবকিছু হইতে পবিত্র। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫০) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۚ

(سورہ صافات رکوع ۵)

(فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب ادب سے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں) اور سب اُس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

(৫০) (ফেরেশতারা বলে, আমরা সকলেই আদবের সহিত সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকি) এবং আমরা সকলেই তাহার তসবীহ পড়িতে থাকি।

(সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫১) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

(سورہ صافات رکوع ۵)

آپ کا رب جو عزت (وعظمت) والا ہے پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

(৫১) আপনার রব, যিনি ইজ্জত (ও আজমতে)র মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত জিনিসসমূহ হইতে পবিত্র। শান্তি বর্ষিত হউক সকল পয়গাম্বরগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই যিনি তামাম জগতের পরোয়ারদিগার। (সূরা ছাফ্‌ফাত, রুকূ ঃ ৫)

(৫২) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ وَالطَّيْرَ

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ اُن کے (حضرت داؤد علیہ السلام کے) ساتھ شریک

مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ۝
(سورہ ص رکوع ۲)

ہو کر صبح شام تسبیح کیا کریں اسی طرح پرندوں کو بھی حکم کر رکھا تھا (جو کہ تسبیح کے وقت) اُن کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب (پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد علیہ السّلام کے ساتھ) اللہ کی طرف رُجوع کرنے والے (اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہونے والے) ہوتے تھے۔

(৫২) আমি পাহাড়কে তাঁহার (দাউদ (আঃ)এর) সহিত শরীক হইয়া সকাল–সন্ধ্যা তসবীহ পড়িবার হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। এমনিভাবে পাখীদেরকেও হুকুম করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহারা (তসবীহের সময়) তাঁহার নিকট জমা হইয়া যাইত। তাহারা সকলে (মিলিয়া হযরত দাউদ আঃএর সাথে) আল্লাহর দিকে রুজু (হইয়া তসবীহ ও প্রশংসায় মশগুল) হইত। (সূরা সোয়াদ, রুকূ ঃ ২)

(৫৩) سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (سورۂ زمر رکوع ۱)

وہ عیوب سے پاک ہے ایسا اللہ ہے جو اکیلا ہے (کوئی اس کا شریک نہیں) زبردست ہے۔

(৫৩) তিনি যাবতীয় দোষ–ত্রুটি হইতে পবিত্র। তিনি এমন আল্লাহ যিনি অদ্বিতীয় (তাহার কোন শরীক নাই) এবং জবরদস্ত। (যুমার, রুকূ ঃ ১)

(৫৪) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (سورۂ زمر رکوع ۷)

وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

(৫৪) তাহারা যেই সমস্ত জিনিসকে শরীক করে, তিনি উহা হইতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৭)

(৫৫) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(سورہ زمر رکوع ۸)

آپ (قیامت میں) فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہوں گے اور (اس دن) تمام بندوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور (ہر طرف سے) کہا جائے گا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے)

(৫৫) আপনি কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে দেখিবেন, তাহারা আরশের চতুর্দিকে গোলাকার হইয়া দাঁড়াইবে এবং আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসায় মশগুল থাকিবে। আর (ঐ দিন) সমস্ত বান্দার ঠিক ঠিক ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে। (সব দিক হইতে) বলা হইবে, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি তামাম আলমের পরোয়ারদিগার।) (যুমার, রুকূঃ ৮)

(٥٦) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ (سورۂ مومن رکوع ۱)

جو فرشتے عرش کو اُٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر شئے کو شامل ہے. پس ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے.

(৫৬) যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করিয়া আছে আর যাহারা চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহারা আপন রবের তসবীহ করিতে থাকে এবং প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং ঈমানদারগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তাহারা বলে,) হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আপনার রহমত ও এলেম সবকিছুকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন, যাহারা তওবা করিয়াছে এবং আপনার পথে চলে। আপনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইয়া দিন। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ১)

(٥٧) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○ (سورہ مومن رکوع ٦)

صبح اور شام (ہمیشہ) اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیئے.

(৫৭) সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ৬)

(٥٨) فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ

جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں (یعنی

لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ۝

(سورہ حم سجدہ رکوع ۵)

مُقرّب ہیں مراد فرشتے ہیں) وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ذرا بھی نہیں اُکتاتے۔

(৫৮) যাহারা আপনার রবের নিকটবর্তী (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা) তাহারা দিবা-রাত্রি তসবীহ পড়িতে থাকে ; একটুও ক্লান্ত হয় না।

(সূরা হা-মীম সেজদা, রুকূ ঃ ৫)

(۵۹) وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ

(سورہ شوریٰ رکوع ۱)

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں رہتے ہیں ان کے لئے اِستغفار کرتے رہتے ہیں۔

(৫৯) এবং ফেরেশতাগণ আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকে আর জমীনে যাহারা আছে তাহাদের জন্য গোনাহমাফীর দোয়া করিতে থাকে। (সূরা শূরা, রুকূ ঃ ১)

(۶۰) وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

(س زخرف ع ۱)

(اور تم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو) اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(৬০) (আর তোমরা সওয়ারীর উপর বসিবার পর আপন রবকে স্মরণ কর) আর বল, পবিত্র ঐ যাত, যিনি এই সওয়ারীগুলিকে আমাদের বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, অথচ আমরা তো এমন ছিলাম না যে, এইগুলিকে বাধ্য করিতে পারি। নিঃসন্দেহে আমাদিগকে আপন রবের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা যুখরুফ, রুকূ ঃ ১)

(۶۱) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (س زخرف ع ۶)

آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو مالک ہے عرش کا بھی پاک ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں۔

(৬১) সমস্ত আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার যিনি আরশেরও মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত সব জিনিস হইতে পবিত্র।(যুখরুফ, রুকূ ঃ ৭)

(٦٢) وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (سورہ فتح ع ۱) اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت۔

(৬২) আর তাঁহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল–সন্ধ্যা।(ফাত্‌হ, রুকূ ঃ ১)

(٦٣) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○ (سورہ ق رکوع ۳)

پس ان لوگوں کی (نامناسب باتوں پر) جو کچھ وہ کہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب کے غروب کے بعد اور رات میں بھی اس کی تسبیح وتحمید کیجئے اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی تسبیح وتحمید کیجئے۔

(৬৩) অতএব আপনি তাহাদের (অশোভনীয়) কথার উপর ছবর করুন আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন। আর রাত্রেও তাহার তসবীহ ও প্রশংসা করুন এবং (ফরজ) নামাযের পরও তসবীহ ও প্রশংসা করুন। (সূরা কাফ, রুকূ ঃ ৩)

(٦٤) سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (سورہ طور رکوع ۲)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

(৬৪) আল্লাহর যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে ইহারা শরীক করে। (সূরা তূর, রুকূ ঃ ২)

(٦٥) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ○ (سورہ طور رکوع ۲)

اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید کیا کیجئے (مجلس سے یا سونے سے) اٹھنے کے بعد (یعنی تہجد کے وقت) اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے (غروب ہونے کے) بعد بھی۔

(৬৫) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন (মজলিস অথবা ঘুম হইতে) উঠিবার পর (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়)। রাত্রেও তাঁহার তসবীহ করিতে থাকুন এবং তারকাসমূহ ডুবিয়া যাওয়ার পরও (তসবীহ পড়ুন)। (সূরা তূর, রুকূ ঃ ২)

(৬৬-৬৭) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝
(سورۂ واقعہ رکوع ۲، ۳ دو جگہ)

پس اپنے اُس بڑی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(৬৬) (৬৭) অতএব আপন মহান রবের নামের তসবীহ পড়িতে থাকুন। (সূরা ওয়াকেয়া, রুকূ ঃ ২ ও ৩ ঃ দুই জায়গায়)

(৬৮) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
(سورہ حدید رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৬৮) আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।(সূরা হাদীদ, রুকূ ঃ ১)

(৬৯) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
(سورۂ حشر رکوع ۱)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৬৯) যাহাকিছু আসমানে আছে, আর যাহা কিছু জমীনে আছে সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ১)

(৭০) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
(سورۂ حشر رکوع ۳)

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔

(৭০) তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ তায়ালা তাহা হইতে পবিত্র। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

(৭১) يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
(سورۂ حشر رکوع ۳)

اللہ تعالیٰ شانہٗ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৭১) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।(সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

(৭২) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں

(سورۂ صف رکوع ۱) ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৭২) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা ছফ, রুকূ ঃ ১)

(۷۳) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ○ (سورۂ جمعہ رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৭৩) আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে সবই যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে। তিনি বাদশাহ, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পাক, জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা জুমুআ, রুকূ ঃ ১)

(۷۴) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○ (سورۂ تغابن رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اسی کے لئے ساری سلطنت ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

(৭৪) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তাহারই সমস্ত রাজত্ব, তিনিই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাগাবুন, রুকূ ঃ ১)

(۷۵ ۔ ۷۶) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ○ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ○ (سورۂ قلم رکوع ۱)

ان میں سے جو افضل تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے (پہلے ہی) کہا نہ تھا اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ لوگ کہنے لگے سُبْحٰنَ رَبِّنَا (ہمارا رب پاک ہے) بیشک ہم خطاوار ہیں۔

(৭৫) (৭৬) তাহাদের মধ্যে যে উত্তম ছিল সে বলিতে লাগিল, আমি কি তোমাদের (আগেই) বলি নাই যে, তোমরা আল্লাহর তসবীহ কেন কর না? ঐ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, আমাদের রব পবিত্র ; নিঃসন্দেহে

আমরাই গোনাহগার। (সূরা কালাম, রুকূ ঃ ১)

(৭৭) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝ (سورہ الحاقۃ رکوع ۲) پس اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیئے۔

(৭৭) অতএব আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা আল-হাক্কাহ, রুকূ ঃ ২)

(৭৮) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝ (سورہ دہر رکوع ۲) اپنے پروردگار کا صبح وشام نام لیا کیجئے اور رات کو بھی اس کے لئے سجدہ کیجئے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔

(৭৮) সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদিগারের নাম লইতে থাকুন, রাত্রেও তাহার জন্য সেজদা করুন এবং রাত্রির বড় অংশে তাহার তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা দাহ্‌র, রুকূ ঃ ২)

(৭৯) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ (سورہ اعلیٰ رکوع ۱) آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(৭৯) আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ পড়ুন।
(সূরা আ'লা, রুকূ ঃ ১)

(৮০) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝ (سورہ نصر رکوع ۱) پس آپ اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیئے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیئے بیشک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(৮০) অতএব আপনি আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন এবং তাহার নিকট মাগফেরাত কামনা করিতে থাকুন। নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবূলকারী। (সূরা নাছর, রুকূ ঃ ১)

ফায়দা ঃ এই আশিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ অর্থাৎ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করা বা উহা স্বীকার করার হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। যেই বিষয়টিকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এত গুরুত্বসহকারে বারবার বর্ণনা করিয়াছেন উহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা থাকিতে পারে না। এইসব আয়াতের মধ্যে অনেক আয়াতে তসবীহের সঙ্গে তাহমীদ অর্থাৎ প্রশংসা, হামদ বয়ান করা এবং তৎসঙ্গে আল-হামদুলিল্লাহ বলার

বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক আয়াতে আল–হামদুলিল্লাহ বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল এই যে, আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম শুরুই করা হইয়াছে আল–হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা। ইহা হইতে বড় ফযীলত এই কালেমার আর কি হইতে পারে!

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(سورہ فاتحہ رکوع ١)

سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জাহানের পরোয়ারদেগার। (সূরা ফাতেহা, রুকূ ঃ ১)

(٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝
(سورہ انعام رکوع ١)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ (دوسروں کو) اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔

(২) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি আসমান ও জমীন পয়দা করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও নূর পয়দা করিয়াছেন। তবুও কাফেররা (অন্যকে) আপন রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (আনআম, রুকূঃ ১)

(٣) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
(سورۃ انعام رکوع ٥)

پھر (ہماری گرفت سے) ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (اس کا شکر ہے) جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(৩) অতঃপর (আমার পাকড়াওয়ের কারণে) জালেমদের মূল কাটিয়া গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (তাহার শোকর) যিনি তামাম জাহানের পরোয়ারদিগার। (সূরা আনআম, রুকূ ঃ ৫)

(٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ
(سورۃ اعراف رکوع ٥)

اور (جنت میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ جل شانہ ہم کو نہ پہنچاتے۔

(৪) এবং (জান্নাতে পৌঁছিবার পর) ঐ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা এখানে কখনও পৌঁছিতে পারিতাম না যদি আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে না পৌঁছাইতেন। (সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ৫)

(৫) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ (سورہ اعراف ع ۱۹)

جو لوگ ایسے رسول نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

(৫) যাহারা এইরূপ নিরক্ষর নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে যাহাকে তাহারা নিজেদের নিকট বিদ্যমান তৌরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়।
(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৯)

ফায়দা ঃ তৌরাত কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মত বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা করিবে। 'দুররে মানছূর' কিতাবে এ সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ (سورہ توبہ رکوع ۱۴)

(اُن مجاہدین کے اوصاف جن کے نفوس کو اللہ جل شانہٗ نے جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے یہ ہیں کہ) وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لئے سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں (یعنی نمازی ہیں) نیک باتوں کا حکم کرنے والے ہیں اور بُری باتوں سے روکنے والے ہیں (تبلیغ کرنے والے ہیں) اور اللہ کی حدود کی (یعنی احکام کی) حفاظت کرنے والے ہیں (ایسے) مومنوں کو آپ خوشخبری سُنا دیجئے۔

(৬) (যে সকল মুজাহিদের জান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া নিয়াছেন, তাহাদের গুণাবলী হইল) তাহারা গোনাহ হইতে তওবাকারী, আল্লাহর এবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী (অথবা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী) রুকূ–সেজদাকারী (অর্থাৎ তাহারা নামাযী), নেক কাজে আদেশকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী (অর্থাৎ তাহারা তবলীগ করে) আল্লাহ তায়ালার সীমা

(হুকুম–আহকামের) হেফাজতকারী ; (এইরূপ) মোমিনদেরকে আপনি খোশখবর শুনাইয়া দিন। (সূরা তওবা, রুকূ ঃ ১৪)

(٧) وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورہ یونس رکوع ۱)

اور آخری پکار اُن کی یہی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

(৭) তাহাদের সর্বশেষ কথা হইল, আল–হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।) (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ১)

(٨) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۚ (سورہ ابراہیم رکوع ۶)

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو (دو بیٹے) اسمٰعیل و اسحٰق (علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام) عطا فرمائے۔

(৮) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে (দুইটি পুত্র সন্তান) ইসমাঈল ও ইসহাক দান করিয়াছেন। (সূরা ইবরাহীম, রুকূ ঃ ৬)

(٩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (سورۂ نحل رکوع ۱۰)

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (پھر بھی وہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے) بلکہ اکثر ان میں سے ناسمجھ ہیں۔

(৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, (তথাপি তাহারা এইদিকে মনোযোগী হয় না।) বরং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (নাহ্‌ল, রুকূঃ ১০)

(١٠) يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (سورۂ بنی اسرائیل رکوع ۵)

جس دن (صور پھنکے گا اور تم کو زندہ کر کے پکارا جائے گا تو تم مجبوراً اس کی حمد (وثنا) کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے اور (ان حالات کو دیکھ کر) گمان کرو گے (کہ تم دنیا میں اور قبر میں) بہت ہی کم مدت ٹھہرے تھے۔

(১০) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং তোমাদেরকে জিন্দা করিয়া ডাক দেওয়া হইবে, সেইদিন তোমরা বাধ্য হইয়া তাহার প্রশংসা করতঃ আদেশ পালন করিবে। আর (এইসব অবস্থা দেখিয়া) তোমরা ধারণা করিবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা (দুনিয়াতে এবং কবরে) অবস্থান করিয়াছিলে। (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ○

(سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۲)

اور آپ (علی الاعلان) کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اُسی اللہ کے لئے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اُس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خُوب تکبیر (بڑائی بیان) کیا کیجئے۔

(১১) আপনি (প্রকাশ্যে) বলিয়া দিন যে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি না কোন সন্তান-সন্ততি রাখেন, না তাঁহার রাজত্বে কোন শরীক আছে ; না দুর্বলতাহেতু তাঁহার কোন সাহায্যকারী রহিয়াছে। আর আপনি তাঁহার খুব বড়ত্ব বর্ণনা করিতে থাকুন।(সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ ঃ ১২)

(١٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○ (سورہ کہف رکوع ۱)

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا سی بھی کجی نہیں رکھی۔

(১২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর কিতাব নাজেল করিয়াছেন এবং উঁহাতে কোন প্রকার সামান্যতম বক্রতাও রাখেন নাই।

(সূরা কাহাফ, রুকূ ঃ ১)

(١٣) فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

(سورہ مؤمنون رکوع ۲)

(حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ) تو کہنا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔

(১৩) (হযরত নূহ (আঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, যখন তুমি নৌকাতে বসিয়া যাও) তখন বল, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জালেমদের কবল হইতে নাজাত দিয়াছেন।

(সূরা মুমিনুন, রুকূ ঃ ২)

(١٤) وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ ○ (سورہ نمل رکوع ٢)

اور (حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ نے) کہا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

(১৪) আর (হযরত সুলাইমান ও হযরত দাঊদ (আঃ)) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অনেক মোমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ২)

(١٥) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ۙ (سورہ نمل رکوع ٥)

آپ (خطبہ کے طور پر) کہیئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔

(১৫) আপনি (খোতবা হিসাবে) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য আর তাহার ঐ সমস্ত বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ৫)

(١٦) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۙ (سورہ نمل رکوع ٧)

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھاوے گا پس تم اس کو پہچان لوگے۔

(১৬) এবং আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি অতিসত্বর তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইবেন, তখন তোমরা ঐগুলি চিনিয়া লইবে। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ৭)

(١٧) لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاُوْلٰی وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ (سورہ قصص رکوع ٧)

حمد و ثنا کے لائق دنیا اور آخرت میں وہی ہے اور حکومت بھی اسی کے لئے ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(১৭) দুনিয়া ও আখেরাতে হাম্‌দ ও ছানার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, রাজত্বও একমাত্র তাঁহারই এবং তাঁহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে। (সূরা কাছাছ, রুকূ ঃ ৭)

(۱۸) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ (سورۂ عنکبوت رکوع ۶)

آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر اُن میں سمجھتے بھی نہیں۔

(১৮) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ বুঝেও না। (সূরা আনকাবুত, রুকূ ঃ ২)

(۱۹) وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ (سورۂ لقمان رکوع ۲)

اور جو شخص کفر کرے (ناشکری کرے) تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔

(১৯) আর যে ব্যক্তি কুফরী (অর্থাৎ নাশোকরী) করে, তবে আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায এবং প্রশংসনীয়। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ২)

(۲۰) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (سورۂ لقمان رکوع ۳)

آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر ان میں کے جاہل ہیں۔

(২০) আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ মূর্খ। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(۲۱) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝ (سورۂ لقمٰن رکوع ۳)

بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔

(২১) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(۲۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ط (سورۂ سبا ع ۱)

تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی کی حمد (وثنا) ہو گی آخرت میں (کسی دوسرے کی پوچھ نہیں)

(২২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান-জমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আখেরাতে প্রশংসা একমাত্র তাহারই জন্য হইবে (অন্য কাহারো জন্য নয়)। (সূরা সাবা, রুকূ ঃ ১)

(۲۳) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (سورہ فاطر رکوع ۱)

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا۔

(২৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ পয়দা করিয়াছেন এবং জমীন পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ১)

(۲۴) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝ (سورہ فاطر رکوع ۳)

اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔

(২৪) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ বে-নিয়ায। তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ৩)

(۲۵) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۝ نِ الَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝ (سورہ فاطر رکوع ۴)

(جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے) اور کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کیلئے) رنج دور کر دیا بیشک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدر کرنے والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں پہنچا دیا نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

(২৫) (মুসলমানগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাহাদিগকে রেশমের পোশাক পরানো হইবে) আর তাহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি (চিরদিনের জন্য) আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের রব বড় দয়াশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। যিনি মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যেখানে আমাদের না কোন কষ্ট হইবে আর না আমাদের কোন ক্লান্তি আসিবে। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ৪)

(۲۶) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورہ صافات رکوع ۵)

اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(২৬) শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের উপর এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। (ছাফফাত, রুকূঃ ৫)

(٢٧) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ (سورۂ زمر رکوع ۳)

تمام تعریف اللہ کے واسطے ہے (مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں) بلکہ اکثر جاہل ہیں۔

(২৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, (কিন্তু এই সকল লোক বুঝে না) বরং তাহারা অধিকাংশই জাহেল। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৩)

(٢٨) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ○ (سورۂ زمر رکوع ۸)

اور (جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو) کہیں گے کہ تمام تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس زمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔

(২৮) আর (মুসলমানগণ জান্নাতে দাখেল হইয়া) বলিবে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের সহিত তাহার কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং আমাদেরকে এই জমীনের মালিক বানাইয়া দিয়াছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব। নেক আমলকারীদের কতই না উত্তম প্রতিদান। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৮)

(٢٩) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ (س جاثیہ ع ۴)

پس اللہ ہی کے لئے تمام تعریف ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(২৯) অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার এবং সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার।
(সূরা জাশিয়াহ, রুকূ ঃ ৪)

(٣٠) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ (سورۂ بروج رکوع ۱)

(ایک کافر بادشاہ کے مسلمانوں کو ستانے اور تکلیفیں دینے کا اُوپر سے ذکر ہے) اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آتے تھے جو زبردست ہے اور تعریف کا مستحق ہے اسی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔

৩০ (পূর্ব হইতে মুসলমানদের উপর এক কাফের বাদশার জুলুম অত্যাচারের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে) আর ঐ কাফেররা মুসলমানদের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য এবং তাহারই জন্য আসমান ও জমীনের রাজত্ব। (বুরুজ, রুকূ ঃ ১)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করার প্রতি উৎসাহদান উহার হুকুম ও উহার খবর বর্ণিত হইয়াছে। বহু হাদীসেও অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসাকারীদের ফযীলত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত লোককে ডাকা হইবে, যাহারা সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের প্রশংসা খুবই পছন্দনীয়। আর হওয়াও চাই, কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল্লাহ ছাড়া অন্যের কি প্রশংসা হইতে পারে ; যাহার এখতিয়ার কিছুই নাই বরং সে নিজেই নিজের এখতেয়ারভুক্ত নহে। কাজেই প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহারাই শ্রেষ্ঠ বান্দা হইবে, যাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও হামদ ও ছানা করে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, প্রশংসা হইল শোকর-গুজারীর আসল ও মূল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিল না, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করিল না। এক হাদীসে আসিয়াছে, কোন নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা করার দ্বারা উক্ত নেয়ামতের হেফাজত হয়। এক হাদীসে আছে, সমগ্র দুনিয়া যদি আমার উম্মতের কাহারও হাতে থাকে আর সে আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তবে এই আল-হামদুলিল্লাহ বলা সমগ্র দুনিয়া হইতে উত্তম। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন আর সে ঐ নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন নেয়ামত যত বড়ই হউক প্রশংসা উহা হইতে বেশী হইয়া যায়।

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে পড়িলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া কে পড়িল? সাহাবী ভয় পাইলেন—হয়ত বা কোন অনুচিত কথা হইয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দোষের কিছু

নাই। সে কোন খারাপ কথা বলে নাই। তখন সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই দোয়া আমি পড়িয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তেরজন ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই চেষ্টা করিতেছিল যে, কে এই কালেমাকে সবার আগে লইয়া যাইবে। আর এই হাদীস তো প্রসিদ্ধ আছে যে, গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজ আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত শুরু করা হইবে উহা বরকতহীন হইবে। এইজন্য সাধারণতঃ সমস্ত কিতাব আল্লাহর প্রশংসা দিয়া শুরু করা হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, কাহারও সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করিয়াছ? তাহারা আরজ করে, কবজ করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি তাহার কলিজার টুকরাকে লইয়া ফেলিয়াছ? তাহারা আরজ করে, নিঃসন্দেহে লইয়া ফেলিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, ইহার উপর আমার বান্দা কি বলিয়াছে? তাহারা আরজ করে, তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করিয়াছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়িয়াছে। তখন এরশাদ হয়, আচ্ছা, ইহার বিনিময়ে জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ইহার উপর সীমাহীন খুশী হইয়া যান যে, বান্দা কিছু খাওয়া বা পান করিবার পর আল–হামদুলিল্লাহ বলে।

কালেমায়ে ছুওমের তৃতীয় বাক্যটি ছিল, 'তাহলীল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

কালেমায়ে ছুওমের চতুর্থ বাক্যকে তাকবীর বলে, অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা, আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বয়ান করা এবং তাহার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করা, যাহা 'আল্লাহু আকবার' বলার মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। উপরোক্ত আয়াতগুলিতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শুধু 'তকবীর' অর্থাৎ আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্বের বর্ণনাও বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে ঃ

(١) وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (سورہ بقرہ رکوع ٢٣)

اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔

(১) এবং আর যেন তোমরা আল্লাহর বড়াই বর্ণনা কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং যেন তোমরা আল্লাহ

তায়ালার শোকর আদায় কর। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ২৩)

(২) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝ (سورہ رعد رکوع ۲)

وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، (سب سے) بڑا ہے اور عالی شان رُتبہ والا ہے۔

(২) তিনি যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা রাদ, রুকূ ঃ ২)

(৩) كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (سورہ حج رکوع ۵)

اسی طرح اللہ جل شانہٗ نے (قربانی کے جانوروں کو) تمہارے لئے مُسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اُس نے تم کو ہدایت کی (اور قربانی کرنے کی توفیق دی) اور (اے محمدؐ) اِخلاص والوں کو (اللہ کی رضا کی) خوش خبری سُنا دیجئے۔

(৩) এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা (কোরবানীর পশুকে) তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে তোমরা আল্লাহর বড়াই বয়ান কর। এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন (এবং কুরবানী করার তওফীক দিয়াছেন)। আর (হে মোহাম্মদ সঃ!) আপনি এখলাছ ওয়ালাদেরকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির) খোশখবরী শুনাইয়া দিন। (হজ, রুকূ ঃ ৫)

(۴-۵) وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝ (سورہ حج رکوع ۸) (سورہ لقمٰن رکوع ۳)

اور بے شک اللہ جل شانہٗ ہی عالی شان اور بڑائی والا ہے۔

(৪-৫) আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই উচ্চমর্যাদাশীল ও মহান। (সূরা হজ্জ, রুকূ ঃ ৮ ; লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(٦) حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (سورہ سبا رکوع ۳)

(جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ خوف کے مارے گھبرا جاتے ہیں) یہاں تک کہ جب اُن کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار کا کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ (فلانی) حق بات کا حکم ہوا واقعی وہ عالی شان اور بڑے مرتبہ والا ہے۔

(৬) (যখন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন হুকুম করা হয়

তখন তাহারা ভয়ে ঘাবড়াইয়া যায়।) অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূর হইয়া যায় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে কি হুকুম হইয়াছে? তাহারা বলে, (অমুক) হক বিষয়ের হুকুম হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তায়ালা অতি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা সাবা, রুকূ ঃ ৩)

(৭) فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝ (سورۂ مؤمن رکوع ۲)

پس حکم اللہ ہی کے لئے ہے جو عالی شان ہے، بڑے رتبہ والا ہے۔

(৭) অতএব হুকুম আল্লাহ তায়ালারই, যিনি অতি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ২)

(৮) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ (سورہ جاثیہ رکوع ۴)

اور اسی (پاک ذات) کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

(৮) আর ঐ পাক যাতের জন্যই বড়ত্ব আসমানসমূহে এবং জমীনে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা জাছিয়া, রুকূ ঃ ৪)

(৯) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (سورہ حشر ع۳)

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے (سب نقصانات سے) سالم ہے امن دینے والا ہے نگہبانی کرنے والا ہے۔ (یعنی آفتوں سے بچانے والا ہے) زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے بڑائی والا ہے۔

(৯) তিনি এমন মাবূদ যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি বাদশাহ। (সমস্ত দোষ হইতে) পবিত্র (সমস্ত ত্রুটি হইতে) মুক্ত। নিরাপত্তা দানকারী রক্ষণাবেক্ষণকারী (অর্থাৎ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষাকারী)। তিনি মহাপরাক্রান্ত। বিকৃতের সংস্কারক। তিনি সুমহান। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং ইহার হুকুম করা হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসেও বিশেষভাবে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশের হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার প্রতি অধিক পরিমাণে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোথাও আগুন লাগিয়াছে দেখিলে তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বেশী বেশী করিয়া) পড়িতে থাক। ইহা আগুন নিভাইয়া

দিবে। আরেক হাদীসে আছে, তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলা) আগুনকে নিভাইয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন বান্দা তকবীর বলে, তখন (উহার নূর) জমীন হইতে আসমান পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসকে ঢাকিয়া ফেলে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আমাকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তকবীর বলিতে হুকুম করিয়াছেন।

এই সমস্ত আয়াত ও হাদীস ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার আজমত, মহত্ব, তাঁহার হামদ ও ছানা এবং বুলন্দ উচ্চ মর্যাদার বিষয়কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দে কুরআন পাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক আয়াত এইরূপ রহিয়াছে, যেখানে এইসব তসবীহের শব্দাবলী উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু এইসব তসবীহকেই বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ কিছু আয়াত বর্ণনা করা হইল ঃ

(١) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ (سورہ بقرہ رکوع ۴)

پس حاصل کرلئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے (ان کے ذریعہ سے توبہ کی) پس اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی بیشک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔

(১) অতঃপর হযরত আদম (আঃ) আপন রবের নিকট হইতে কতিপয় কালেমা লাভ করিলেন (যাহা দ্বারা তিনি তওবা করিলেন)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (করুণভরে) তাঁহার প্রতি মনোযোগ দিলেন। নিশ্চয় তিনিই বড় তওবা কবুলকারী ও বড় মেহেরবান। (বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

ফায়দা ঃ উক্ত কালেমাসমূহের তাফসীরে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, কালেমাগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

এই বিষয়ে আরও বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'দুররে মানছুর' কিতাবে লিখিয়াছেন। উহাতে তসবীহ ও তাহমীদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

(۲) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(سورہ انعام رکوع ۲۰)

جو شخص ایک نیکی لے کر آوے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا اور جو شخص برائی لے کر آوے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا.

(২) যে ব্যক্তি একটি নেকী লইয়া আসিবে সে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে তাহার সমপরিমাণ শাস্তি মিলিবে এবং তাহাদের উপর জুলুম করা হইবে না। (সূরা আনআম, রুকূ ঃ ২০)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুইটি বিষয় এমন আছে যে, যে কোন মুসলমান উহার প্রতি যত্নবান হইবে জান্নাতে দাখেল হইবে। বিষয় দুইটি খুবই মামুলী কিন্তু উহার উপর আমলকারী খুবই কম। প্রথম আমল হইল, সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশবার করিয়া পড়িয়া লইবে। ইহাতে প্রত্যহ (পাঁচওয়াক্ত নামাযে) একশত পঞ্চাশ বার পড়া হইবে। যাহার সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া পনর শত নেকী হইয়া যাইবে।

আর দ্বিতীয় আমল হইল, শুইবার সময় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়িয়া লইবে। মোট একশত বার পড়া হইল, ইহাতে একহাজার নেকী হইয়া গেল। এখন এইগুলি ও সারাদিনের নামায শেষের সমষ্টি মিলিয়া দুই হাজার পাঁচশত নেকী হইয়া গেল। আমলসমূহ ওজন করিবার সময় দৈনিক আড়াই হাজার গোনাহ কাহার হইবে যাহা উক্ত নেকীসমূহের উপর প্রবল হইয়া যাইবে। অধম বান্দার মতে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মধ্যে যদিও এমন কেহ হইবেন না যাহার আড়াই হাজার গোনাহ দৈনিক হইত ; কিন্তু বর্তমান জমানায় আমাদের দৈনিক বদ–আমল উহা হইতে অনেক বেশী। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেরবানী করিয়া গোনাহের তুলনায় নেকী বেশী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র বলিয়া দিয়াছেন। এখন ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চলা না চলা রোগীর কাজ। এক হাদীসে আসিয়াছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমল দুইটি এত সহজ, তবুও ইহার উপর আমলকারী এত কম—ইহার কারণ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, শুইবার সময় শয়তান তসবীহ পড়ার আগে ঘুম পাড়াইয়া দেয় আর নামাযের সময় এমন কোন কথা মনে করাইয়া দেয় যাহার দরুন তসবীহ না পড়িয়াই

উঠিয়া চলিয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা কি দৈনিক এক হাজার নেকী কামাই করিতে অক্ষম? কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজার নেকী দৈনিক কি করিয়া কামাই করা যায়। এরশাদ ফরমাইলেন, একশত বার সুবহানাল্লাহ পড় হাজার নেকী হইয়া যাইবে।

(٣) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝ (سورۂ کہف رکوع ٦)

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق (فقط) ہے اور باقیات صالحات (وہ نیک اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی (بدرجہا) بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں (کہ ان کے ساتھ اُمیدیں قائم کی جائیں بخلاف مال اور اولاد کے کہ اُن سے اُمیدیں قائم کرنا بے کار ہے۔

(৩) ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। আর ‘বাকিয়াতে ছালেহাত’ (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নেক আমল) তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সওয়াবের দিক দিয়াও অনেক বেশী উত্তম এবং আশা হিসাবেও বহু গুণে শ্রেয়। (অর্থাৎ ঐগুলির উপর আশা করা যায়। কিন্তু মাল–আওলাদের উপর আশা করা অনর্থক।)

(٤) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۭ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ (سورۂ مریم رکوع ٥)

اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقیات صالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔

(৪) আর আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর ‘বাকিয়াতে ছালেহাত’ তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সওয়াবের দিক দিয়াও উত্তম এবং পরিনামের দিক দিয়াও উত্তম।

ফায়দা ঃ যদিও ‘বাকিয়াতে ছালেহাতের’ মধ্যে এমন সমস্ত নেক আমলই অন্তর্ভুক্ত, যেইগুলির সওয়াব চিরকাল লাভ হইতে থাকিবে, কিন্তু বহু হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, এইসব তসবীহকেই ‘বাকিয়াতে ছালেহাত’ বলা হয়। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা ‘বাকিয়াতে ছালেহাত’কে বেশী বেশী করিয়া পড়িতে থাক। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি জিনিস? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু

আকবার), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমীদ (অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ বলা) এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, খুব ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বাকিয়াতে ছালেহাতের অন্তর্ভুক্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, তোমরা নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়া লও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপস্থিত কোন দুশমনের আক্রমণ হইতে কি নিজেদের হেফাজত করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, বরং জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতের ব্যবস্থা কর। আর তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পড়া। এই কালেমাগুলি কেয়ামতের দিন অগ্রগামী থাকিবে (অর্থাৎ সুপারিশ করিবে অথবা আগে বাড়াইয়া দিবে অর্থাৎ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে বাড়াইয়া দিবে।) পিছনে থাকিবে। (অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া হেফাজত করিবে।) এহসান করিবে। আর এইগুলিই হইল বাকিয়াতে ছালেহাত। আরও অনেক রেওয়ায়েতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'দুররে মানছূর' কিতাবে এই সমস্ত রেওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

(۵) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ الاٰية، اللہ ہی کے واسطے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔

(سورۂ زمر رکوع ۶) (سورۂ شوریٰ رکوع ۲)

(৫) আসমান ও জমীনের সমস্ত চাবি আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে।

(সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৬ ; সূরা শূরা, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমান-জমীনের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, উহা হইল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অন্য এক হাদীসে আছে, আসমান-জমীনের চাবি হইল, 'সুবহানাল্লাহি

ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার’। আর ইহা আরশের খাজানা হইতে নাজেল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

(٦) اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ط
(سورہ فاطر رکوع ۲)

اسی کی طرف اچھے کلمے پہونچتے ہیں اور نیک عمل اُن کو پہنچاتا ہے۔

(৬) তাহারই দিকে উত্তম কালেমাসমূহ পৌছে এবং নেক আমল উহাকে পৌছায়। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ কালেমা তাইয়্যেবার বয়ানে এই আয়াতের আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস শুনাই তখন কুরআনের আয়াত দ্বারা উহার সনদ পেশ করিয়া থাকি। মুসলমান যখন ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি’ এবং আল–হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাবারাকাল্লাহ পড়ে, তখন ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানার মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই কালেমাগুলিকে বহন করিয়া আসমানের উপর লইয়া যায় এবং তাহারা যে যে আসমান অতিক্রম করে সেখানকার ফেরেশতাগণ এই কালেমা পাঠকারীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার সমর্থন কুরআনের এই আয়াত রহিয়াছে ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

(সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১০)

হযরত কা’ব আহবার (রহঃ) বলেন, আরশের চারিদিক সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার–এর এক প্রকার গুঞ্জন হয়, যাহার মধ্যে এই কালেমাগুলি আপন পাঠকারীদের আলোচনা করিতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত কা’ব (রহঃ) এই বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবী হযরত নোমান (রাযিঃ)ও এইরূপ বিষয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কালেমাসমূহের ফযীলত এবং উহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَلِمَتَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں وہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اور سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ ہیں۔

(رواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجۃ کذا فی الترغیب)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, দুইটি কালেমা এমন রহিয়াছে, যাহা জবানে বড় হালকা, ওজনে খুব ভারী আর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। উহা হইল, ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী ছুবহানাল্লাহিল আজীম। (বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ 'জবানে হালকা'র অর্থ হইল, পড়িতে তেমন সময়ও লাগে না। কেননা অতি সংক্ষিপ্ত আর মুখস্থ করিতে তেমন কষ্ট বা দেরী হয় না। ইহা সত্ত্বেও আ'মাল ওজন করার সময় উক্ত কালেমাগুলি বেশী হওয়ার কারণে অনেক ভারী হইয়া যাইবে। যদি কোন ফায়দা নাও থাকিত তবুও ইহার চেয়ে বড় জিনিস আর কি হইবে যে, এই দুইটি কালেমা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। ইমাম বোখারী (রহঃ) তাঁহার সহীহ বোখারী শরীফ এই দুই কালেমা দ্বারাই খতম করিয়াছেন এবং উল্লেখিত হাদীসই তাঁহার কিতাবের সর্বশেষ হাদীস।

এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করা ছাড়িয়া না দেয় ; ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িলে হাজার নেকী হইয়া যাইবে। এতগুলি গোনাহ তো ইনশাআল্লাহ রোজানা হইবেও না ; আর এই তাসবীহ ব্যতীত যত নেক কাজ করিয়া থাকিবে উহার সওয়াব অতিরিক্ত লাভের মধ্যে রহিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা এক এক তছবীহ (১০০ বার) পরিমাণ ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী পড়িবে, সমুদ্রের ফেনা হইতে বেশী হইলেও তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়িলে গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়।

(২) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَخْبِرْنِىْ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے میں نے عرض کیا ضرور بتاویں ارشاد فرمایا سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ۔ دوسری حدیث میں ہے سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لئے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے اور وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ ہے۔

(رواه مسلم والنسائى والترمذى الا انه قال سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ وقال حسن صحيح وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير الى مسلم واحمد والترمذى ورقم له بالصحة وفى رواية لمسلم اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلٰئِكَتِهٖ اَوْ لِعِبَادِهٖ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ كذا فى الترغيب قلت واخرج الاخير الحاكم وصححه على شرط مسلم واقره عليه الذهبى وذكره السيوطى فى الجامع برواية احمد عن رجل مختصرا ورقم له بالصحة)

(২) হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম কোন্‌টি বলিয়া দিব? আমি আরজ করিলাম, নিশ্চয়ই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। অন্য হাদীসে আছে, 'ছুবহানা রাব্বী ওয়াবিহামদিহী'। এক হাদীসে ইহাও আছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ফেরেশতাদের জন্য যে জিনিসকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাই সর্বোত্তম, অর্থাৎ 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। (মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ প্রথম পরিচ্ছেদে কয়েকটি আয়াতে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে, আরশের নিকটস্থ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনায় ও প্রশংসায় মশগুল থাকে। তাঁহাদের কাজই হইল আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় মশগুল থাকা। এই কারণে যখন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় হইল তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই কথাই উল্লেখ করিল যে, আমরা সর্বদা আপনার তসবীহ পাঠ করি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা

অন্তরে স্বীকার করি। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম আয়াতে আলোচিত হইয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার আজমত ও মহত্বের ভারে আসমান (ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া) শব্দ করে (যেমন চৌকি ইত্যাদি অধিক ভারের দরুন শব্দ করিয়া থাকে।) আর আসমানের জন্য এইরূপ আওয়াজ করিতে বাধ্য ; (কেননা আল্লাহর মহত্বের বোঝা অত্যন্ত ভারী) ঐ মহান যাতের কছম যাহার হাতে মোহাম্মদ (সঃ)এর প্রাণ—সমস্ত আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও এমন নাই যেখানে কোন ফেরেশতা সেজদা অবস্থায় আল্লাহর তাছবীহ ও তাহমীদে মশগুল না আছেন।

(٣) عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِیْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ کَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَّاَرْبَعًا وَّعِشْرِیْنَ اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا لَّا یَهْلِكُ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ بَلٰی اِنَّ اَحَدَکُمْ لَیَجِیْءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلٰی جَبَلٍ اَثْقَلَتْهُ ثُمَّ تَجِیْءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ثُمَّ یَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِهٖ۔

(رواه الحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب قلت واقره علیه الذهبی)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے اس کے لئے جنت واجب ہو جائیگی اور جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سو مرتبہ پڑھے گا اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہو سکتا (کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی) حضورؐ نے فرمایا (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اور کیوں نہ ہوں) بعض آدمی اتنی نیکیاں لیکر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جل شانہٗ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িবে,

তাহার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় তো (কেয়ামতের দিন) কেহই ধ্বংস হইতে পারে না (কেননা নেকীসমূহ বেশী থাকিবে)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, (কোন কোন লোক তবুও ধ্বংস হইবে ; আর কেনই বা ধ্বংস হইবে না)—কিছুসংখ্যক লোক এত বেশী নেকী লইয়া আসিবে যে, উহা পাহাড়ের উপর রাখিলে পাহাড় ধসিয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় ঐসব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও দয়ার দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। (তারগীব ঃ হাকেম)

ফায়দা ঃ 'আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে'—এই বাক্যটির অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন যেখানে নেকী ও বদীর ওজন করা হইবে সেখানে এই বিষয়েও প্রশ্ন করা হইবে এবং হিসাব লওয়া হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার কি হক আদায় করিয়াছে ও কি শোকর আদায় করা হইয়াছে। বান্দার নিকট প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ পাকেরই দেওয়া। প্রত্যেক জিনিসের একটি হক আছে। এই হক আদায় সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, প্রত্যেক সকালে প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি জোড়া এবং হাড়ের উপর একটা ছদকা ওয়াজিব হয়। অন্য এক হাদীসে আছে—মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে ; প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করিয়া ছদকা করা তাহার উপর জরুরী। অর্থাৎ ইহার শোকরিয়া স্বরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা প্রায় মৃত্যু সমতুল্য ঘুম হইতে সুস্থ সবল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সহকারে জাগ্রত করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এত বেশী সদকা করার সামর্থ্য কে রাখে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক তাসবীহ সদকা প্রত্যেক তাকবীর সদকা, একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা ছদকা—এইরূপ অনেক ছদকার কথা বলিলেন।' এইরূপ অনেক হাদীসে মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহর বহু নেয়ামতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া খাওয়া–দাওয়া, আরাম–আয়েশ ইত্যাদি সম্পর্কিত আরও যে সকল নেয়ামত সর্বক্ষণ ভোগ করা হইতেছে তাহা অতিরিক্তই রহিল।

পবিত্র কুরআনে সূরা 'তাকাছুর'–এ বর্ণিত হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রাযিঃ) বলেন, 'শরীর, কান ও চক্ষুর সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া এই সমস্ত নেয়ামত দিয়াছিলেন, তুমি এইগুলিকে আল্লাহর কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (নাকি চতুষ্পদ জন্তুর মত কেবল পেট পালার কাজে খরচ করিয়াছ?)'. সূরা বনী ইসরাঈলে এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ কান, চক্ষু, অন্তর সম্পর্কে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত জিনিস কোথায় ব্যবহার করিয়াছে?

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৬)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, চিন্তা হইতে মুক্ত থাকা ও শারীরিক সুস্থতাও আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত—এই সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক সুস্বাদু ও আনন্দদায়ক বস্তু নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত ; এইগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, সুস্থতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কুরআনের আয়াত ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ, অতঃপর (সেই) দিন নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।) (সূরা তাকাসূর, আয়াত ঃ ৮)–এর অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গমের রুটি ও ঠাণ্ডা পানি এইগুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং বাসস্থান সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন কোন কোন ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে ; আমাদের তো মাত্র আধা পেট রুটি মিলে, তাহাও যবের রুটি (পেট ভরিয়া খাওয়ার মত রুটিও জোটে না)। ওহী নাযিল হইল, তোমরা কি পায়ে জুতা পর না, তোমরা কি ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এইগুলিও তো আল্লাহর নেয়ামত। এক হাদীসে আসিয়াছে, উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর কোন শাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, খানাপিনার জন্য শুধু খেজুর আর পানি এই দুই জিনিসই জুটিয়া থাকে, (জেহাদের জন্য) সবসময় আমাদের তলোয়ার আমাদের কাঁধের উপর থাকে, (কোন না কোন কাফের) শত্রু সম্মুখে আছেই (যাহার ফলে এই দুই জিনিসেরও নিশ্চিন্তে ভোগ করা নছীব হয় না)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, শীঘ্রই প্রচুর নেয়ামত লাভ হইবে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কেয়ামতের দিন যেই সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে সেইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছিলাম—(এই সুস্থতার কি হক আদায় করিয়াছ এবং ইহার মধ্যে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য কি কাজ করিয়াছ?) আমি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমার পিপাসা নিবারণ করিয়াছি—ইহার কি হক আদায় করিয়াছ? (বাস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত ; যেখানে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যায় না সেখানকার লোকদেরকে ইহার কদর জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যাইবে। ইহা আল্লাহ তায়ালার এত বড় নেয়ামত যাহার কোন সীমা নাই কিন্তু ইহার শোকর আদায় করা তো দূরের কথা, বরং ইহা যে আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত এইদিকে আমরা লক্ষ্য করি না।)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, সেইগুলি হইল ঃ ঐ রুটির টুকরা যাহা দ্বারা পেট ভরা হয়, ঐ পানি যাহা দ্বারা পিপাসা দূর করা হয় এবং ঐ কাপড় যাহা দ্বারা শরীর ঢাকা হয়।

একবার দুপুরের সময় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) পেরেশান অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে পৌছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)ও একই অবস্থায় মসজিদে আসিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)কে বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই সময় এখানে কেন? তিনি বলিলেন, ক্ষুধার জ্বালা আমাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কছম, একই জিনিস আমাকেও বাধ্য করিয়াছে যে, কোথাও যাই। তাহারা দুইজন এই বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় এখানে কেন? তাঁহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় আমরা পেরেশান হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমিও তো এই কারণেই আসিয়াছি। তিনজন একত্র হইয়া হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে পৌছিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার বিবি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গৌরব মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ আইয়ুব কোথায় গিয়াছে? বিবি বলিলেন, কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন ; এখনই আসিয়া পড়িবেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ)ও আসিয়া খেদমতে হাজির হইলেন এবং আনন্দের

আতিশয্যে খেজুরের একটি বড় ছড়া কাটিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, সম্পূর্ণ ছড়া আনার কি প্রয়োজন ছিল, ইহাতে কাঁচা ও আধা পাকা খেজুরও আসিয়া গিয়াছে, শুধু পাকা খেজুরগুলি বাছিয়া আনিতে? তিনি বলিলেন, সবগুলি এইজন্য আনিয়াছি যে, সব রকমের খেজুরই সামনে রহিল যাহা পছন্দ হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। (কখনও পাকা খেজুরের চাইতে আধা পাকা খেজুর বেশী পছন্দ হয়।) খেজুরের ছড়াটি তাঁহাদের সামনে রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করিলেন এবং কিছু গোশত এমনিই ভুনিয়া লইলেন ও কিছু রান্না করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির মধ্যে সামান্য গোশত রাখিয়া আবূ আইয়ুব (রাযিঃ)কে দিয়া বলিলেন, ইহা ফাতেমার নিকট পৌঁছাইয়া দাও কারণ সেও কয়েকদিন যাবত খাওয়ার কিছু পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাইলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, এইগুলি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত—রুটি, গোশত এবং কাঁচা-পাকা সব রকমের খেজুর। এই কথা বলিতেই হুযূরের চক্ষু মোবারক হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং বলিলেন, ঐ পাক যাতের কছম, যাহার কুদরতি হাতে আমার জান, এইগুলিই সেই সমস্ত নেয়ামত যাহা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। (যেই চরম অবস্থায় এই জিনিসগুলি মিলিয়াছিল সেই হিসাবে) ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর নিকট ইহা অত্যন্ত ভারী মনে হইল এবং মনে চিন্তার উদয় হইল (যে, এইরূপ কষ্ট ও চরম অবস্থায় এইসব জিনিস মিলিয়াছে আর উহার উপরও প্রশ্ন ও হিসাব হইবে?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা একান্ত জরুরী—যখন এই জাতীয় জিনিসে হাত লাগাও তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ পড় এবং খাওয়া শেষ হইলে এই দোয়া পড় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছেন, আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন এবং অনেক বেশী দান করিয়াছেন।" শোকর আদায়ের জন্য এই দোয়া যথেষ্ট হইবে। এই ধরনের ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে, যাহা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন একবার আবুল হায়ছাম মালেক ইবনে তায়হান (রাযিঃ)-র

বাড়ীতেও তশরীফ নিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াকেফী নামক আরও এক ব্যক্তির সহিতও এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি কুষ্ঠরোগীও ছিল, অন্ধ, বধির এবং বোবাও ছিল। তিনি সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির মধ্যেও কি তোমরা আল্লাহর কোন নেয়ামত দেখিতেছ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তির নিকট কি নেয়ামত থাকিতে পারে? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সে কি সহজে পেশাব করিতে পারে না?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন তিনটি আদালত কায়েম হইবে ঃ এক আদালতে নেকীসমূহের হিসাব হইবে। আরেকটিতে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের হিসাব লওয়া হইবে। তৃতীয় দরবারে গোনাহের হিসাব লওয়া হইবে। নেকীসমূহ নেয়ামতের বিনিময়ে হইয়া যাইবে। আর গোনাহ বাকী থাকিয়া যাইবে। যাহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিবে। এই সবকিছুর অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালার যত নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে প্রতি শ্বাসে বান্দার উপর হইতেছে উহার শোকর আদায় করা, উহার হক আদায় করা বান্দার দায়িত্ব। এইজন্য যতবেশী সম্ভব নেকী হাছিল করার ব্যাপারে কোনরূপ কমি করিতে নাই এবং কামাই কোন (বেশী) পরিমাণকেও বেশী মনে করিতে নাই। কারণ, সেখানে যাওয়ার পর বুঝা যাইবে আমরা চোখ,কান, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা দুনিয়াতে কি পরিমাণ গোনাহ করিয়াছি ; অথচ সেইগুলিকে আমরা গোনাই মনে করি নাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমাদের মধ্যে কেহই এমন নাই, যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে না। তখন মাঝখানে না কোন পর্দার আড়াল থাকিবে, না কোন দোভাষী (উকিল ইত্যাদি) থাকিবে। ডান দিকে তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ, বাম দিকেও তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ—ভাল–মন্দ যাহাকিছু আমল করিয়াছে উহা সবই সঙ্গে থাকিবে। জাহান্নামের আগুন সামনে থাকিবে। কাজেই যতদূর সম্ভব ছদকা দ্বারা জাহান্নামের আগুন নিভাও। যদিও খেজুরের টুকরাই হউক না কেন। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছি, পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি দিয়াছি। (তুমি এইগুলির কি হক আদায় করিয়াছ?)

আরেক হাদীসে আছে, ঐ পর্যন্ত মানুষ হিসাবের ময়দান হইতে

সরিতে পারিবে না যেই পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করা হইবে? (১) হায়াত কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (২) যৌবনের শক্তি কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করিয়াছ? (৪) সম্পদ কিভাবে খরচ করিয়াছ (অর্থাৎ উপার্জন ও খরচ জায়েয পন্থায় করিয়াছ কি নাজায়েয পন্থায়)? (৫) যাহাকিছু এলেম হাছিল করিয়াছ (যেই পরিমাণই হোক না কেন) উহার উপর আমল কতটুকু করিয়াছ (অর্থাৎ যেইসমস্ত মাসায়েল জানা ছিল সেইগুলির উপর আমল করিয়াছ কি-না)?

(۴) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ رواه الترمذی والطبرانی فی الصغیر و لاوسط و زاد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وقال الترمذی حسن غریب من هذا الوجه ورواه الطبرانی ایضًا باسناد واهٍ من حدیث سلمان الفارسی رض وعن ابن عباس رض مرفوعًا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ غُرِسَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ رواه الطبرانی واسناده حسن لا باس به فی المتابعات

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے (درخت) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں (جتنے کسی کا دل چاہے درخت لگالے) ایک حدیث میں اس کے بعد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگایا جاوے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رض کو دیکھا کہ ایک

وَعَنْ جَابِرٍؓ مَرْفُوْعًا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ ۔

پودا لگا رہے ہیں دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں. ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جاویں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہر کلمہ سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے۔

(رواه الترمذى وحسنه والنسائى الا انه قال شجرة وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى الموضعين باسنادين قال فى احدهما على شرط مسلم وفى الاخر على شرط البخارى وذكره فى الجامع الصغير برواية الترمذى وابن حبان والحاكم ورقم له بالصحة وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ يَغْرِسُ الحديث رواه ابن ماجة باسناد حسن والحاكم وقال صحيح الاسناد كذا فى الترغيب وعزاه فى الجامع الى ابن ماجة والحاكم رقم له بالصحة قلت وفى الباب من حديث ابى ايوبؓ مرفوعا رواه احمد باسناد حسن وابن ابى الدنيا وابن حبان فى صحيحه ورواه ابن ابى الدنيا والطبرانى من حديث ابن عمر ايضا مرفوعا مختصرا الا ان فى حديثهما الحوقلة فقط كما فى الترغيب قلت وذكر السيوطى فى الدر حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ حديث ابن مسعودؓ وقال اخرجه ابن مردويه وذكر ايضا حديث ابن مسعودؓ وقال اخرجه الترمذى وحسنه والطبرانى وابن مردويه قلت وذكره فى الجامع الصغير برواية الطبرانى ورقم له بالصحة وذكر فى مجمع الزوائد عدة روايات فى معنى هذا الحديث)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, মেরাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের নিকট আমার সালাম বলিবেন এবং বলিবেন যে, জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র, উহার পানিও সুমিষ্ট কিন্তু উহা একেবারে খালি ময়দান। উহার চারা (গাছ) হইল ঃ ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। (যাহার যত ইচ্ছা গাছ লাগাইতে পারে।) (তিরমিযী, তাবারানী) এক হাদীসে উক্ত কালেমার পর ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে’ও রহিয়াছে। (তিরমিযী)

আরেক হাদীসে আছে, এই সমস্ত কালেমার এক একটির বিনিময়ে জান্নাতে একটি করিয়া গাছ লাগান হয়। (তাবারানী) এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আ'জীম ওয়াবিহামদিহী' পড়িবে উহার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হইবে। (তিরমিযী, নাসাঈ) এক হাদীসে আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন, পথে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)কে একটি গাছের চারা লাগাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, গাছ লাগাইতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা হইতে উত্তম চারা লাগাইবার কথা আমি তোমাকে বলিব কি—'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ইহার প্রতিটি কালেমার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়া যায়। (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, হাকেম)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছালাম পাঠাইয়াছেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যাহার কাছে এই হাদীস পৌঁছিবে, সে যেন এই ছালামের জবাবে বলে ঃ 'ওয়াআলাহিছ ছালাম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্'। হাদীসে উল্লেখিত 'জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট হওয়া'র দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমটি হইল, উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র ঐ জায়গার অবস্থা বর্ণনা করা যে, উহা অতি উত্তম স্থান, যাহার মাটি সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, উহা মুশক ও জাফরানের। আর পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। এমন স্থানে সকলেই বাড়ী তৈরী করিতে চায়। তদুপরি আমোদ প্রমোদের জন্য যদি বাগান ইত্যাদি লাগানোর ব্যবস্থাও থাকে তবে এমন স্থান কে ছাড়িতে চায়। দ্বিতীয় অর্থ হইল, যে জায়গার মাটি উত্তম, পানিও উত্তম সেখানে গাছপালা খুব ভাল জন্মে। এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে যে, একবার ছুবহানাল্লাহ পড়িলেই সেখানে একটি গাছ লাগিয়া যাইবে। অতঃপর মাটি ও পানি উত্তম হওয়ার কারণে উক্ত গাছ নিজে নিজেই বড় হইতে থাকিবে। অর্থাৎ কেবল একবার বীজ বপন করিলেই চলিবে। অন্যান্য সমস্ত কাজ আপনা-আপনিই সমাধা হইয়া যাইবে।

উক্ত হাদীসে জান্নাতকে 'খালি ময়দান' বলা হইয়াছে অথচ অন্যান্য যে সমস্ত হাদীসে জান্নাতের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে সেইগুলিতে জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল ও গাছপালা ইত্যাদি থাকার কথা বলা হইয়াছে। বরং জান্নাত শব্দের অর্থই হইল বাগান। এইজন্য দৃশ্যতঃ প্রশ্ন জাগে। কোন কোন আলেম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ জান্নাত আসলে

খালি ময়দান ; কিন্তু নেক বান্দাকে যখন উহা দেওয়া হইবে তখন তাহার আমল হিসাবে উহাতে বাগান ও গাছপালা থাকিবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এই করিয়াছেন যে, জান্নাতের বাগান ইত্যাদি আমল অনুপাতে লাভ হইবে, অতএব যখন ঐগুলি আমলের কারণে এবং আমল অনুপাতে মিলিবে তখন যেন আমলই বাগান ও গাছপালার কারণ হইল।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, একজন জান্নাতী কমপক্ষে এই দুনিয়ার কয়েকগুণ বড় জান্নাত লাভ করিবে। উহার অনেক অংশে প্রথম হইতেই আসল বাগান বিদ্যমান আছে আর কিছু অংশ খালি পড়িয়া আছে। যে যত পরিমাণ যিকির, তাছবীহ ইত্যাদি পড়িবে তাহার জন্য তত পরিমাণ বাগ–বাগিচা আরও লাগিয়া যাইবে। শায়খুল মাশায়েখ হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ)এর উক্তি 'কাউকাবুদ–দুর্‌রী' নামক কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, জান্নাতের সমস্ত গাছ খামীর আকারে এক জায়গায় জড় হইয়া আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল হিসাবে উহা তাহার অংশের জমিতে লাগিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫) عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ اَنْ يُّكَابِدَهُ اَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ يُّنْفِقَهُ اَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ يُّقَاتِلَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُّنْفِقُهُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو اس کو چاہیئے کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ کثرت سے پڑھا کرے کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

(رواه الفريابي والطبراني واللفظ له وهو حديث غريب ولا بأس باسناده انشاء الله كذا في الترغيب وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه سليمان بن احمد الواسطي وثقه عبدان وضعفه الجمهور والغالب على بقية رجاله التوثيق وفي الباب عن ابي هريرةؓ مرفوعًا اخرجه ابن مردويه وابن عباس ايضًا عند ابن مردويه كذا في الدر)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি

রাত্রের কষ্ট সহ্য করিতে ভয় পায় (অর্থাৎ রাত্রি জাগরণ করতঃ ইবাদতে মশগুল হইতে অক্ষম) অথবা কৃপণতার কারণে মাল খরচ করা কঠিন হয় অথবা কাপুরুষতার কারণে জেহাদের হিম্মত হয় না, সে যেন ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বেশী বেশী করিয়া পড়ে। কেননা, এই কালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার চাইতেও বেশী প্রিয়। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী! যাহারা সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্যও সওয়াব ও উচ্চমর্যাদা লাভের দরজা বন্ধ করেন নাই। রাত্রি জাগরণ সম্ভব হয় না, কার্পণ্যের কারণে টাকা–পয়সা খরচ করা হয় না, কাপুরুষতার কারণে জেহাদের মত মোবারক আমল হয় না, এতদসত্ত্বেও যদি অন্তরে দ্বীনের কদর ও আখেরাতের ফিকির থাকে তবে তাহার জন্যও রাস্তা খোলা রহিয়াছে। তবুও যদি কিছু কামাই করিতে না পারে তবে ইহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? পূর্বে এই বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

حضورؐ کا ارشاد ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں) ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں.

(رواه مسلم وابن ماجة والنسائی وزادوهن من القرآن ورواه النسائی ایضًا وابن حبان فی صحیحه من حدیث ابی هریرةؓ كذا فی الترغیب وعزا السیوطی حدیث سمرة الی احمد ایضًا ورقم له بالصحة وحدیث ابی هریرةؓ الی مسند الفردوس للدیلمی ورقم له ایضًا بالصحة)

(৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম হইল চারটি কালেমা ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। এইগুলির মধ্যে যে কোনটি ইচ্ছা আগে এবং যে কোনটি ইচ্ছা পরে পড়া যাইতে পারে (কোন খাছ তরতীব নাই)। এক হাদীসে আছে,

এই কালেমাগুলি কুরআন পাকেও রহিয়াছে। (তারগীব ঃ মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কুরআন পাকেও এই কালেমাগুলি বহু জায়গায় আসিয়াছে। এইগুলি পড়ার হুকুম ও উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমরা ঈদসমূহকে এই সমস্ত কালেমা দ্বারা সুসজ্জিত কর। অর্থাৎ এইগুলি বেশী পরিমাণে পড়াই হইল ঈদের সৌন্দর্য।

(৭) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ اِنَّ الْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِیْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰی وَالنَّعِیْمِ الْمُقِیْمِ فَقَالَ مَا ذَاكَ قَالُوْا یُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّیْ وَیَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَیَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَیُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَیْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا یَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِیْنَ مَرَّةً قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِیْنَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مالدار سارے بلند درجے لے اُڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہیں کے حصہ میں آگئی۔ حضورؐ نے فرمایا کیوں۔ عرض کیا کہ نماز روزہ میں تو یہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرکے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک ان ہی اعمال کو نہ کرے صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ۳۳،۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو (ان حضرات نے شروع کر دیا مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے انھوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے

فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۔ مالدار بھائیوں نے بھی سُن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے، حضورؐ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصّہ ذکر کیا گیا اس میں حضورؐ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لئے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے سُبْحَانَ اللہِ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے صحابہؓ نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے حضورؐ نے فرمایا اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہو گا یا نہیں صحابہؓ نے عرض کیا ضرور ہو گا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔

(متفق علیہ ولیس قول ابی صالح الی اٰخرہ الا عند مسلم وفی روایۃ للبخاری تُسَبِّحُوْنَ فِیْ دُبُرِ کُلِّ صَلٰوۃٍ عَشْرًا وَّ تَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَّ تُکَبِّرُوْنَ عَشْرًا بَدَلَ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِیْنَ کذا فی المشکوٰۃ وعن ابی ذرؓ بنحو ھٰذا الحدیث وفیہ اِنَّ بِکُلِّ تَسْبِیْحَۃٍ صَدَقَۃً وَّ بِکُلِّ تَحْمِیْدَۃٍ صَدَقَۃً وَّ فِیْ بُضْعِ اَحَدِکُمْ صَدَقَۃً قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ یَاْتِیْ اَحَدُنَا شَھْوَتَہٗ یَکُوْنُ لَہٗ فِیْھَا اَجْرٌ الحدیث اخرجہ احمد وفی الباب عن ابی الدرداء عند احمد)

(৭) একদা গরীব মোহাজের সাহাবীগণ একত্র হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা সকল উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কেমন করিয়া? তাহারা আরজ করিলেন, নামায, রোযায় তো তাহারা আমাদের সহিত শরিক রহিয়াছে, আমরাও করি তাহারাও করে; কিন্তু তাহারা মালদার হওয়ার কারণে ছদকা করে, গোলাম আজাদ করে; আর আমরা এইসব বিষয়ে অক্ষম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার উপর আমল করিয়া তোমরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধরিয়া ফেলিবে এবং পরবর্তীদের হইতেও আগে চলিয়া যাইবে, আর কেহ এই আমলগুলি করা ব্যতীত তোমাদের চেয়ে উত্তম হইবে না? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, নিশ্চয় আমাদিগকে বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া

পড়িতে থাক। তাঁহারা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই জামানার মালদার লোকেরাও একই নমুনার ছিলেন, খবর জানিতে পারিয়া তাহারাও পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গরীব মোহাজেরগণ পুনরায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মালদার ভাইয়েরাও ইহা শুনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন, কে বাধা দিতে পারে? (বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসেও উক্ত ঘটনা অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের জন্যও আল্লাহ তায়ালা ছদকার সমতুল্য আমল রাখিয়াছেন। ছুবহানাল্লাহ একবার বলা ছদকা, আল-হামদুলিল্লাহ একবার বলা ছদকা, স্ত্রীর সহিত সহবাস করা ছদকা। সাহাবীগণ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীসহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয় ; ইহাও ছদকা হইয়া যাইবে! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যদি সে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয় তবে কি তাহার গোনাহ হইবে না? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, অবশ্যই হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এমনিভাবে হালালের মধ্যে ছদকা ও ছওয়াব রহিয়াছে।

(আহমদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার নিয়তে স্ত্রীসহবাস নেকী ও ছওয়াবের কারণ হইবে। এই ঘটনা সম্পর্কিত অন্য এক হাদীসে স্ত্রী সহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে,—'বল দেখি—যদি সন্তান জন্ম লাভ করে অতঃপর সে যৌবনে পৌঁছে আর তোমরা তাহার সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ কর এমন সময় সে মারা যায়, তবে কি তোমরা ছওয়াবের আশা করিবে না? সাহাবীগণ বলিলেন, অবশ্যই ছওয়াবের আশা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কেন? তোমরা কি তাহাকে পয়দা করিয়াছ? তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলে? তোমরা কি তাহাকে রিযিক দান করিয়াছিলে? না, বরং আল্লাহ পাকই পয়দা করিয়াছেন, তিনিই হেদায়াত দান করিয়াছেন, তিনিই রিযিক দিয়াছেন। অনুরূপভাবে সহবাসের দ্বারা তোমরা বীর্যকে হালাল স্থানে রাখিয়া থাক অতঃপর উহা আল্লাহ তায়ালার কব্জায় চলিয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে জিন্দা করেন অর্থাৎ উহা

দ্বারা সন্তান পয়দা করেন অথবা উহার মৃত্যু ঘটান সন্তান পয়দা করেন না।' এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, সহবাস সন্তান লাভের কারণ হয় বলিয়াই নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়।

(৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه مسلم كذا في المشكوٰة وكذا في مسند احمد)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ، اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الٰہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے جھاگ۔

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িবে সেই ব্যক্তির গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া যায়। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ গোনাহসমূহের ক্ষমার ব্যাপারে পূর্বে কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এইসব গোনাহ বলিতে আলেমদের মতে ছগীরা গোনাহ বুঝায়। এই হাদীসে তিনটি কালেমা ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার আসিয়াছে। পরবর্তী হাদীসে দুই কালেমা ৩৩ বার করিয়া এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার আসিতেছে। হযরত জায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া পড়ার হুকুম করিয়াছিলেন। এক আনছারী সাহাবী স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, প্রত্যেকটি কালেমা পঁচিশবার করিয়া পড় এবং এইগুলির সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহও পঁচিশ বার পড়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট এই স্বপ্নের কথা আরজ করিলে তিনি ইহা কবুল করিয়া নেন এবং এইরূপ করার অনুমতি প্রদান করেন।

এক হাদীসে ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিন কালেমাকে প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করিয়া পড়ার হুকুম করা হইয়াছে। আরেক হাদীসে ১০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার বাকী তিন কালেমা প্রত্যেকটি ৩৩ বার বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত চার কালেমা ১০০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত রেওয়ায়াত 'হিসনে হাসীন' কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংখ্যার এই পার্থক্য মানুষের বাহ্যিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। অবসর ও ব্যস্ততা হিসাবে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। যাহারা অন্যান্য জরুরী কাজে মশগুল থাকে তাহাদের জন্য কম সংখ্যা আর যাহারা অবসর তাহাদের জন্য বেশী নির্ধারণ করা হইয়াছে। মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত এই যে, হাদীসে যেই সমস্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিকে বজায় রাখা জরুরী। কেননা যেই জিনিস ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় উহাতে পরিমাণ ঠিক রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْفَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَّ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چند پیچھے آنے والے (کلمات) ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ ۳۳ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۳۴ مرتبہ اللّٰهُ اَكْبَرُ.

(رواه مسلم كذا فى المشكوٰة وعزاه السيوطى فى الجامع الى احمد ومسلم والترمذى والنسائى ورقم له بالضعف وفى الباب عن ابى الدرداء عند الطبرانى)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, কতিপয় পশ্চাদগামী কালেমা এমন রহিয়াছে যে, যাহার পাঠকারী বিফল হয় না। সেই কালেমাগুলি হইল ঃ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই কালেমাগুলিকে 'পশ্চাদগামী' হয়ত বা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এইগুলিকে নামাযের পর পড়া হয়। অথবা এইজন্য যে,

গোনাহের পর এইগুলি পড়ার দ্বারা গোনাহকে ধৌত করিয়া দেয় ও মিটাইয়া দেয়। অথবা এইজন্য যে, এই কলেমাগুলি একটির পর আরেকটি পড়া হয়। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমাদেরকে নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার করিয়া এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ার হুকুম করা হইয়াছে।

(١٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ قَالَ كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَّلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَّاللهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ اُحُد (جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) کے برابر عمل کر لیا کرے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے) حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے صحابہؓ نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے ارشاد فرمایا کہ سُبْحَانَ اللہ کا ثواب اُحُد سے زیادہ ہے، لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کا اُحُد سے زیادہ ہے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کا اُحُد سے زیادہ ہے، اَللہُ اَکْبَرُ کا اُحُد سے زیادہ ہے۔

(للكبير والبزار كذا فى جمع الفوائد واليهما عزاه فى الحصن ومجمع الزوائد وقال رجالها رجال الصحيح)

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যে প্রতিদিন ওহুদ (যাহা মদীনা মুনাওয়ারার একটি পাহাড়ের নাম) পরিমাণ আমল করিবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে ইহার ক্ষমতা রাখে যে, (এত বড় পাহাড় পরিমাণ আমল করিবে)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমতা রাখে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা কিভাবে হইতে পারে? এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, আলহামদুলিল্লাহ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, আল্লাহু আকবার–এর ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী।

(জামউল–ফাওয়ায়িদ ঃ তাবারানী, বাযযার)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ এই কালেমাগুলির প্রত্যেকটিই এমন যে, উহার ছওয়াব ওহুদ পাহাড় হইতে বেশী। এক পাহাড় কেন, না জানি কত পাহাড় হইতে বেশী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ সমস্ত আসমান ও জমিনকে ছওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, সুবহানাল্লাহ এর সওয়াব পাল্লার অর্ধেক, আল-হামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পূর্ণ করিয়া দেয়, আর আল্লাহু আকবার আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আমার নিকট এরূপ সকল বস্তু হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদয় হয়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, সমস্ত দুনিয়া আল্লাহর জন্য খরচ করিয়া দেওয়া হইতেও ইহা বেশী প্রিয়। কথিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁহার হাওয়াই তখতে চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পাখীরা তাঁহার উপর ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল এবং জিন ও মানুষ ইত্যাদির লশকর দুই সারিতে ছিল। তাঁহার এই তখত এক আবেদ ব্যক্তির উপর দিয়া অতিক্রম করিল। সে হযরত সুলাইমান (আঃ)এর এই বিশাল ও ব্যাপক রাজত্বের প্রশংসা করিল। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, মুমিনের আমলনামায় এক তসবীহ সুলায়মানের সমস্ত রাজত্ব হইতে উত্তম। কেননা সুলায়মানের রাজত্ব একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে আর এক তসবীহ চিরকাল থাকিবে।

(١١) عَنْ اَبِیْ سَلَامٍ مَوْلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَخٍ بَخٍ خَمْسٌ مَا اَثْقَلَهُنَّ فِی الْمِیْزَانِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ یُتَوَفّٰی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَیَحْتَسِبُهٗ.

ایک مرتبہ حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ پانچ چیزیں (اعمالنامہ تلنے کی) ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور وہ بچّہ جو مر جائے اور باپ (اسی طرح ماں بھی) اس پر صبر کرے۔

(الحدیث اخرجه احمد فی مسنده ورجاله ثقات كما فی مجمع الزوائد والحاكم و قال صحيح الاسناد واقره علیه الذهبی وذكره فی الجامع الصغیر برواية البزار عن ثوبان وبرواية النسائی وابن حبان والحاكم عن ابی سلمی وبرواية احمد عن

ابی امامۃ ورقم لہ بالحسن۔ وذکرہ فی مجمع الزوائد بروایۃ ثوبان وابی سلمیٰ رأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسفینۃ ومولی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسم وصحح بعض طرقہا)

(১১) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, বাহ্ বাহ্! পাঁচটি জিনিস আমলনামা ওজনের পাল্লায় কত বেশী ওজনী হইবে! সেইগুলি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ এবং ঐ সন্তান যে মারা যায় আর পিতা (এমনিভাবে মাতাও) উহার উপর ছবর করে।

(মাজমাউয্–যাওয়ায়িদ ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টি কয়েকজন সাহাবী হইতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্ বাহ্ অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ প্রকাশের জন্য বলা হয়। যে জিনিস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুশী ও আনন্দের সহিত বর্ণনা করিতেছেন এবং দান করিতেছেন। উহার উপর জীবন উৎসর্গ করা মহব্বতের দাবীদারদের জন্য কর্তব্য নয় কি? বস্তুতঃ ইহাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আনন্দের মর্যাদা দান ও সমাদর।

(۱۲) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ نُوْحٌ لِّابْنِهٖ اِنِّیْ مُوْصِيْكَ بِوَصِيَّةٍ وَقَاصِرُهَا لِكَیْ لَاتَنْسَاهَا اُوْصِيْكَ بِاثْنَيْنِ وَاَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ اَمَّا الَّتِیْ اُوْصِيْكَ بِهِمَا فَيَسْتَبْشِرُ اللّٰهُ بِهِمَا وَصَالِحُ خَلْقِهٖ وَهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوْجَ عَلَى اللّٰهِ اُوْصِيْكَ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَوْكَانَتَا حَلْقَةً قَصَمَتْهُمَا وَلَوْكَانَتَا فِیْ كِفَّةٍ وَزَنَتْهُمَا وَاُوْصِيْكَ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهُمَا صَلٰوةُ الْخَلْقِ وَ

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمھیں وصیت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ نہایت مختصر کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں جن دو کاموں کے کرنے کی وصیت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے یہاں رسائی (اور مقبولیت) بھی بہت زیادہ ہے ان دو میں سے ایک لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے کہ اگر تمام

بِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَيَحْتَجِبُ اللّٰهُ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهٖ أَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ.

آسمان اور زمین ایک حلقہ ہو جائیں تو بھی یہ پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسمان پر جائے بغیر نہ رہے اور اگر تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پاک کلمہ ہو تب بھی وہی پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ کا پڑھنا ہے کہ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے نہیں ہو اور جن دو چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔

(رواه النسائي واللفظ له والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الاسناد كذا في الترغيب قلت وقد تقدم في بيان التهليل حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا وتقدم فيه ايضًا ما في الباب وتقدم في الآيات قوله عز اسمه وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ الآية وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن جابر مرفوعًا ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه إن نوحًا قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سُبْحَانَ اللّٰهِ فإنها صلوة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق وأخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعًا إن نوحًا لما حضرته الوفاة قال لابنيه آمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلوة كل شيء وبها يرزق كل شيء كذا في الدر)

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত নূহ (আঃ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, আমি তোমাকে নসীহত করিতেছি এবং যাহাতে ভুলিয়া না যাও সেইজন্য অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। আর উহা এই যে, দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি এবং দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। যে দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি তাহা এমন যে, আল্লাহ তায়ালা উহাতে অত্যন্ত খুশী হন, আল্লাহ তায়ালার নেক মাখলুকও খুশী হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুই কাজের কবুলিয়াতও অনেক বেশী। তন্মধ্যে একটি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি সমস্ত আসমান ও জমীন একত্র হইয়া একটি গোলাকার বৃত্ত হইয়া যায় তবুও এই পাক কালেমা উহাকে ভেদ করিয়া আসমানের উপর পৌঁছিয়া

যাইবে। আর সমস্ত আসমান ও জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর দ্বিতীয় পাল্লায় এই পাক কালেমাকে রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ঝুঁকিয়া যাইবে। আর দ্বিতীয় যে কাজটি করিতে হইবে উহা হইল— 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' পড়া। কেননা, এই কালেমা সমস্ত মখলূকের এবাদত। আর ইহারই বরকতে সমস্ত মখলূককে রিযিক দান করা হয়। মখলুকের মধ্যে কোন জিনিস এমন নাই যে, আল্লাহর তাসবীহ পড়ে না কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা বুঝিতে পার না।

আর যে দুই কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উহা হইল, শিরক ও অহংকার। কেননা, এই দুই কাজের কারণে আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে পর্দা পড়িয়া যায় এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সহিতও পর্দা হইয়া যায়।

(তারগীব ঃ নাসাঈ)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বর্ণনাতেও এই হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে তাসবীহ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কুরআন পাকের আয়াতেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৪৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে মেরাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আসমানসমূহের তাসবীহ পড়া শুনিয়াছেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট গমন করিলেন, যাহারা নিজেদের ঘোড়া ও উটের উপর দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা জানায়োরসমূহকে মিম্বর ও কুরসী বানাইও না। কেননা, অনেক জানোয়ার আরোহণকারীদের হইতে উত্তম এবং তাহাদের চাইতে বেশী আল্লাহর যিকির করিয়া থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ক্ষেতের ফসলও আল্লাহর যিকির করে এবং ক্ষেতের মালিক উহার ছওয়াব লাভ করে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক পেয়ালা 'ছারীদ' (গোশত–রুটি মিশান এক প্রকার খাদ্য) পেশ করা হইল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, এই খাদ্য তাসবীহ পড়িতেছে। কেহ আরজ করিল, আপনি উহার তাসবীহ বুঝিতেছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হাঁ বুঝিতেছি। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, ইহা অমুকের নিকটে নিয়া যাও। তাহার নিকট নেওয়া হইলে সেও উহার তাসবীহ শুনিতে পাইল। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ করা হইলে

সেও শুনিতে পাইল। কেহ দরখাস্ত করিল, মজলিসের সকলকেই শুনানো হউক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি শুনিতে না পায় তবে লোকেরা তাহাকে গোনাহগার মনে করিবে। এইসব জিনিসের সম্পর্ক কাশফের সহিত। আর নবীগণের তো কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) পুরাপুরিই হাসিল ছিল এবং থাকার কথাও। সাহাবায়ে কেরামেরও অনেক সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে ও সান্নিধ্যের নূরের বদৌলতে কাশ্‌ফ হাসিল হইত ; শত শত ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। সূফীগণেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মোজাহাদার কারণে কাশ্‌ফ হাসিল হয়। ফলে, তাঁহারা প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তুর তাসবীহ তাহাদের ভাষা ও কথাবার্তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু মোহাক্কেক মাশায়েখগণের মতে ইহা কামেল হওয়ার দলীল নয় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভেরও কারণ নয়। কেননা যে কোন লোক মোজাহেদা করিয়া ইহা হাসিল করিতে পারে। চাই সেই ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল হউক বা না হউক। কাজেই মোহাক্কেকগণ এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। বরং এই হিসাবে তাহারা ইহাকে ক্ষতিকর মনে করেন যে, প্রাথমিক দরজার সাধক যখন ইহাতে লাগিয়া যায়, তখন দুনিয়া পরিভ্রমণের এক আগ্রহ জন্মিয়া তাহার উন্নতির জন্য বাধা হইয়া যায়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)–এর কোন এক খাদেম সম্পর্কে আমার জানা আছে, যখন তাহার কাশফের অবস্থা শুরু হইতে লাগিল, তখন হযরত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কিছুদিনের জন্য তাহার যিকির–আযকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে এই অবস্থার উন্নতি হইতে না পারে। ইহা ছাড়া কাশফ দ্বারা অন্যের গোনাহসমূহ প্রকাশিত হইয়া অন্তর কলুষিত হওয়ার কারণ হয়। বিধায় এই সকল বুযুর্গগণ ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চান। আল্লামা শা'রানী (রহঃ) মীজানুল কুবরা নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কাহাকেও ওজূ করিতে দেখিলে ওজূর পানিতে ধৌত হইয়া যাওয়া গোনাহ দেখিতে পাইতেন এবং গোনাহটি কবীরা না ছগীরা অথবা মকরূহ না অনুত্তম তাহাও অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।

যেমন একবার তিনি কুফার জামে মসজিদের অজুখানায় উপস্থিত ছিলেন। এক যুবক অযু করিতেছিল। তিনি তাহার অজুর পানি দেখিয়া চুপে চুপে তাহাকে নসীহতস্বরূপ বলিলেন, বেটা! তুমি মা–বাপের নাফরমানী হইতে তওবা কর। তখন সে তওবা করিয়া নিল। আরেক

ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নসীহত করিলেন, ভাই! জেনা করিও না ; ইহা অত্যন্ত খারাপ কাজ। সেও তখন জেনা হইতে তওবা করিল। আরেক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার ওজূর পানি হইতে মদ্যপান ও অবৈধ আমোদ–প্রমোদের গোনাহ ঝরিতেছে। তিনি তাহাকেও নসীহত করিলেন। সেও তওবা করিল। ইহার পর ইমাম সাহেব আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমি মানুষের দোষ–ত্রুটি জানিতে চাই না ; এই জিনিস আমার মধ্য হইতে দূর করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবূল করিলেন এবং এই অবস্থা দূর হইয়া গেল। কথিত আছে যে, ঐ সময় ইমাম সাহেব ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। কেননা, যখন ঐ পানি পঁচা ও দুর্গন্ধময় দেখা যাইতেছে, তখন উহাকে কি করিয়া পাক বলিয়া ফতওয়া দিবেন? কিন্তু যখন এই অবস্থা দূর হইয়া গেল তখন উহাকে নাপাক বলাও ছাড়িয়া দিলেন।

আমাদের হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এর এক খাদেমের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি পেশাব–পায়খানায় যাইতে পারিতেন না। কারণ, যেখানেই যাইতেন সেখানেই তিনি নূর দেখিতে পাইতেন। এই ধরনের আরও শত সহস্র ঘটনা আছে, যেইগুলির বাস্তবতা ও সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, যাহারা যেই পরিমাণ কাশফের অংশ পাইয়াছেন, সেই অনুপাতে তাহারা বিভিন্ন অবস্থা জানিতে পারিতেন।

(۱۳) عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ اَوْ كَمَا قَالَتْ فَمُرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهٗ وَاَنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبِّحِي اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَاحْمَدِي اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَبِّرِي اللّٰهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ

حضرت اُمِّ ہانی رضؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسُولَ اللہ میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور ضعیف ہوں کوئی ایسا عمل بتادیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضورؐ نے فرمایا سُبْحَانَ اللّٰہِ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سَوْ غلام عرب آزاد کئے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سَوْ گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لئے دیدیئے اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو یہ ایسا ہے گویا تم نے سَوْ اُونٹ

مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ
هَلِّلِى اللهَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ قَالَ اَبُوْخَلَفٍ
اَحْسِبُهٗ قَالَ تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ
الْاَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ لِاَحَدٍ عَمَلٌ اَفْضَلُ
مِمَّا يُرْفَعُ لَكِ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَ بِمِثْلِ
مَا اَتَيْتِ۔

قربانی میں ذبح کئے اور وہ قبول ہوگئے اور
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب
تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا
ہے اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو
مقبول ہو۔ حضرت ابورافع رضؓ کی بیوی حضرت
سلمیٰ رضؓ نے بھی حضورؐ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ
مختصر سا بتا دیجئے زیادہ لمبا نہ ہو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ دس مرتبہ پڑھا کرو اللہ
جَلَّ شَانُہٗ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے پھر سُبْحَانَ اللّٰہِ دس مرتبہ کہا
کرو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے پھر اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ دس مرتبہ پڑھا کرو
حق تعالیٰ شانُہٗ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مغفرت کردی. دس مرتبہ تم اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ کہو
(دس مرتبہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کردی)

(رواہ احمد باسناد حسن واللفظ لہ والنسائی ولم یقل ولا یرفع الٰی اخرہ والبیھقی بتمامہ
وابن ابی الدنیا فجعل ثواب الرقاب فی التحمید والفرس فی التسبیح وابن ماجۃ بمعناہ
باختصار والطبرانی فی الکبیر بنحو احمد ولم یقل احسبہ وفی الاوسط باسناد
حسن بمعناہ کذا فی الترغیب باختصار قلت رواہ الحاکم بمعناہ وصححہ وعزاہ
فی الجامع الصغیر الٰی احمد والطبرانی والحاکم ورقم لہ بالصحۃ وذکرہ فی مجمع
الزوائد بطرق وقال اسانیدھم حسنۃ وفی الترغیب ایضًا عن ابی امامۃ مرفوعًا
بنحو حدیث الباب مختصرًا وقال رواہ الطبرانی ورواتہ رواۃ الصحیح خلا سلیم
بن عثمان الفوزی یکشف حالہ فانہ لا یحضرنی الاٰن فیہ جرح ولا عدالۃ اھ وفی الباب
عن سلمٰی ام بنی ابی رافع قالت یارسول اللہ اخبرنی بکلمات ولا تکثر علی الحدیث
مختصرًا وفیہ التکبیر والتسبیح عشرًا عشرًا واللّٰھم اغفرلی عشرًا قال المنذری رواہ الطبرانی
ورواتہ محتج بھم فی الصحیح اھ قلت وبمعناہ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ
جَدِّهٖ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِ مَنْ سَبَّحَ لِلّٰهِ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ
حَجَّةٍ الحدیث وجعل فیہ التحمید کمن حمل علٰی مائۃ فرس والتھلیل کمن اعتق
مائۃ رقبۃ من ولد اسمٰعیل ذکرہ فی المشکوۃ بروایۃ الترمذی وقال حسن
غریب)

(১৩) হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছি। এমন কোন আমল বলিয়া দিন, যাহা বসিয়া করিতে থাকিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ একশতবার পড়; ইহার ছওয়াব এমন যেন তুমি একশত আরবী গোলাম আজাদ করিয়া দিলে। আল-হামদুলিল্লাহ একশতবার পড়; ইহার ছওয়াব এমন যেন তুমি একশত ঘোড়া মাল-আছবাব ও লাগাম ইত্যাদি সহ জেহাদে সওয়ারীর জন্য দান করিয়া দিলে। আল্লাহু আকবার একশতবার পড়; ইহা এমন যেন তুমি একশত উট কুরবানী স্বরূপ জবাই করিলে আর উহা কবূল হইয়া গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশতবার পড়; ইহার ছওয়াব তো সমস্ত আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। ইহার চাইতে অধিক মকুবল আর কাহারও কোন আমল নাই। হযরত আবু রাফে' (রাযিঃ)-র স্ত্রী হযরত সালমা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত ওজীফা বলিয়া দিন, যাহা বেশী লম্বা না হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহু আকবার দশবার পড়; আল্লাহ তায়ালা ইহার জবাবে বলেন, ইহা আমার জন্য। অতঃপর সুবহানাল্লাহ দশবার পড়; ইহার জবাবেও আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য। অতঃপর আল্লাহুম্মাগফির লী দশবার পড়। ইহার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হাঁ আমি মাফ করিয়া দিলাম। দশবার তুমি আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী বল (দশবারই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাফ করিয়া দিলাম।)

(তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ দুর্বল ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত জিনিস নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। দেখুন এইরূপ সংক্ষিপ্ত আমল যাহার জন্য তেমন কোন কষ্ট করিতে হয় না বা চলাফেরা করিতে হয় না অথচ কত বড় বড় ছওয়াবের ওয়াদা রহিয়াছে। কত বড় দুর্ভাগ্য হইবে যদি এইগুলি হাসিল না করা হয়।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ,

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার দশবার করিয়া পড় অতঃপর যাহা ইচ্ছা দোয়া কর। আরেক হাদীসে ইহার পর বলিয়াছেন, যাহা ইচ্ছা দোয়া কর। আল্লাহ তায়ালা ঐ দোয়ার উপর বলেন, হাঁ হাঁ (আমি কবুল করিলাম)। কত সহজ ও সাধারণ শব্দ যাহা না মুখস্থ করিতে হয়, না উহার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। সারাদিন আমরা বেহুদা কথাবার্তায় কাটাইয়া দেই, যদি ব্যবসার লেনদেনের সহিত দোকানে বসিয়া বসিয়া অথবা ক্ষেতখামারে জমিনের কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া মুখে এই সমস্ত তসবীহ পড়িতে থাকি তবে দুনিয়া কামাইয়ের সাথে সাথে আখেরাতের কতবড় দৌলত হাসিল হইতে পারে।

(১৪) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً يَّطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَآءِ فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَآءِ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْٓا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں اللہ جل جلالہٗ باوجودیکہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید (بڑائی بیان کرنے اور تعریف کرنے) میں مشغول تھے ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا عرض

اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَّ اَشَدَّ لَهَا طَلَبًا
وَّ اَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ
يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَهَلْ
رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ
لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا
كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّ اَشَدَّ
لَهَا مَخَافَةً فَيَقُوْلُ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ
قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ
الْمَلٰۤئِكَةِ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا
جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى
بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں
مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری
تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے ارشاد
ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں عرض کرتے
ہیں کہ وہ جنّت چاہتے ہیں ارشاد ہوتا
ہے کیا انھوں نے جنّت کو دیکھا ہے عرض
کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے
کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا عرض کرتے
ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنّا
اور اس کی طلب میں لگ جاتے پھر ارشاد
ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے
تھے عرض کرتے ہیں کہ جہنّم سے پناہ مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انھوں نے جہنّم کو
دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو ہے نہیں ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا عرض کرتے
ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ
رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص
اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا ارشاد
ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا لہٰذا
اس کو بھی بخش دیا)

(رواہ البخاری ومسلم والبیہقی فی الاسماء والصفات کذا فی الدر والمشکوٰۃ)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে, যাহারা পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। যেখানেই তাহারা আল্লাহর যিকিরকারী লোকদেরকে দেখিতে পায়, তাহারা পরস্পর একে অপরকে ডাকিয়া সকলেই জমা হইয়া যায় এবং যিকিরকারীদের চতুর্দিকে আসমান পর্যন্ত জমা হইতে থাকে। যখন ঐ মজলিস শেষ হইয়া যায়, তখন তাহারা আসমানে উঠিয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের অমুক জামাতের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদে

(মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসায়) মশগুল ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! তাহারা আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা যদি আমাকে দেখিত, তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা আরও বেশী এবাদতে মশগুল হইত এবং আরও বেশী আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন হইত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি চায়? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জান্নাত চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি জান্নাত দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা তো জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা যদি জান্নাত দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী শওক ও আকাঙ্খা সহকারে উহা পাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কোন্ জিনিস হইতে পানাহ চাহিতেছিল? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিতেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জাহান্নাম দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী উহা হইতে পলায়ন করিত এবং বাঁচার চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক আমি ঐ মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি ঐ মজলিসে ঘটনাক্রমে নিজের কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল ; সে উহাতে শরীক ছিল না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা এমন মোবারক জামাত, যাহাদের সহিত উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না। (কাজেই তাহাকেও মাফ করিয়া দিলাম।)

(মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাদের একটি জামাত যিকিরের মজলিস, যিকিরকারী জামাত ও ব্যক্তিদেরকে তালাশ করিতে থাকে। যেখানেই পায়, সেখানেই তাহারা বসিয়া যায় এবং যিকির শুনিতে থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের ৮ নম্বর হাদীসে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া যিকিরকারীদের কথা কেন আলোচনা করেন, ইহার কারণও সেই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। মজলিসে একব্যক্তি এমনও ছিল যে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। ফেরেশতাদের এরূপ আরজ করার উদ্দেশ্য হইল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা। কারণ এই সময় ফেরেশতারা সাক্ষীর পর্যায়ে রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত

লোকদের ইবাদত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই কারণে উক্ত ব্যক্তির অবস্থা ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ; যাহাতে কোনরূপ প্রশ্ন হইতে না পারে। কিন্তু ইহা আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী যে, যিকিরকারীদের বরকতে তাহাদের নিকট নিজ প্রয়োজনে উপবেশনকারীকেও মাহরূম করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (س توبه رکوع ١٥)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।" (সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ১১৯)

সূফীগণ বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাক। যদি ইহা না হয় তবে ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গে থাক যাহারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাকে। আল্লাহর সঙ্গে থাকার অর্থ হইল, যেমন সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করিতে থাকে, অবশেষে আমি তাহাকে আমার প্রিয়পাত্র বানাইয়া লই। আর যখন আমি প্রিয় বানাইয়া লই তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে, তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে ; সে আমার নিকট যাহা চায় আমি তাহাকে দান করি।

আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত–পা হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, বান্দার সমস্ত কাজ আল্লাহকে রাজী–খুশী করার জন্য হয় ; তাহার কোন আমল আল্লাহর মর্জির খেলাপ হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত সূফীগণের অবস্থা ও তাহাদের বহু ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এইসব ঘটনা এত বেশী পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। 'নুজহাতুল বাসাতীন' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে এইসব অবস্থা ও ঘটনাবলী পাওয়া যায়।

শায়খ আবূ বকর কাত্তানী (রহঃ) বলেন, একবার হজ্জ–মৌসুমে মক্কা মোকাররমায় কিছুসংখ্যক সূফী–সাধক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সের ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)। উক্ত মজলিসে 'আল্লাহর মহব্বত' সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল যে, আশেক কোন্ ব্যক্তি? তাঁহারা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা বলিতেছিলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) চুপ রহিলেন। সকলে তাঁহাকে বলিলেন, তুমিও কিছু বল। তিনি মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আশেক হইল ঐ ব্যক্তি, যে আমিত্বকে মিটাইয়া দিয়াছে, আল্লাহর যিকিরে আবদ্ধ

হইয়া গিয়াছে এবং উহার হক আদায় করে, অন্তর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি দেখে, আল্লাহ তায়ালার হায়বতের নূর তাহার অন্তরকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির তাহার জন্য শরাবের পেয়ালাস্বরূপ হইয়া যায়। সে কথা বলিলে তাহা আল্লাহরই কথা হয় ; যেন আল্লাহ তায়ালাই তাহার জবান দ্বারা কথা বলেন। নড়চড়া করিলে তাহাও আল্লাহরই হুকুমে। শান্তি পাইলে তাহাও আল্লাহরই সঙ্গে। যখন এই অবস্থা হইয়া যায় তখন তাহার খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ, কাজকর্ম সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হইয়া যায়। না দুনিয়ার রসম ও রেওয়াজের প্রতি তাহার কোন লক্ষ্য থাকে, না মানুষের গালমন্দ ও ধিক্কারের কোন পরওয়া সে করে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী এবং বড় মোহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার খেদমতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়াহ নামক এক ব্যক্তি বেশী বেশী যাওয়া-আসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন হাজির হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পর যখন তিনি হাজির হইলেন তখন হযরত সাঈদ (রহঃ) তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিবি মারা গিয়াছে তাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হযরত সাঈদ বলিলেন, আমাদেরকেও জানাইতে, আমরা জানাযায় শরীক হইতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন মজলিস হইতে উঠিয়া রওনা হইলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুনরায় বিবাহ করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হযরত! আমার নিকট কে বিবাহ দিবে? আমার আমদানী ও সামর্থ্য মাত্র দু' তিন আনার মত। তিনি বলিলেন, আমিই দিব। এই বলিয়া তিনি বিবাহের খুতবা পড়িলেন এবং সামান্য আট দশ আনা মহরের বিনিময়ে তাঁহার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। (হানাফীদের মতে যদিও আড়াই রুপীর কম মহর হইতে পারে না কিন্তু অন্য ইমামের মতে জায়েয আছে, তাঁহার নিকটও হয়ত জায়েয হইবে।) বিবাহের পর আমি রওয়ানা হইলাম। একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন, এই বিবাহে আমি কতটুকু আনন্দিত হইয়াছি! খুশীতে চিন্তা করিতেছিলাম স্ত্রীকে উঠাইয়া আনার জন্য কাহার নিকট হইতে ধার করিব আর কি ব্যবস্থা করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঐ দিন আমি রোযা রাখিয়াছিলাম। মাগরিবের সময় রোযা ইফতার করিয়া নামাযের পর ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া রুটি আর যায়তুনের তৈল যাহা ছিল উহা খাইতে বসিলাম। এমন সময় কেহ যেন দরজায় করাঘাত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? উত্তর আসিল, সাঈদ। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোন্ সাঈদ ; হযরতের দিকে

আমার খেয়ালই যায় নাই। কেননা চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি নিজের ঘর ও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া আসা করেন নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)। আমি আরজ করিলাম, আপনি আমাকে ডাকাইতেন। তিনি বলিলেন, আমার আসাই সঙ্গত ছিল। আমি আরজ করিলাম, কি হুকুম বলুন। তিনি বলিলেন, আমার খেয়ালে আসিল, এখন তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে একাকী রাত্রিযাপন ঠিক নয়। তাই তোমার স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি নিজ কন্যাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কন্যা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিলাম এবং বাতির সামনে রাখা সেই রুটি ও তৈল যাহাতে তাহার নজরে না পড়ে, সেইখান হইতে সরাইয়া ফেলিলাম। আমি ঘরের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীদেরকে ডাকিলাম। লোকেরা জমা হইলে আমি বলিলাম, হযরত সাঈদ (রহঃ) তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন এবং এইমাত্র তিনি নিজে তাহার মেয়েকে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁহার কন্যা তোমার ঘরে! আমি বলিলাম, হাঁ। এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। আমার মা-ও জানিতে পারিয়া তখনই আসিয়া বলিতে লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে যদি তুমি তাহাকে স্পর্শ কর তবে আমি তোমার মুখ দেখিব না। তিন দিনের মধ্যে আমরা ইহার জন্য প্রস্তুতি নিব। তিন দিন পর যখন ঐ মেয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তখন দেখিলাম, অত্যন্ত সুন্দরী, কুরআনের হাফেজা, সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কেও অনেক বেশী জ্ঞান রাখে এবং স্বামীর হক সম্পর্কেও খুব সচেতন। এক মাস পর্যন্ত হযরত সাঈদ (রহঃ)ও আমার নিকট আসেন নাই এবং আমিও তাঁহার নিকট যাই নাই। এক মাস পর আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম, তখন মজলিসে লোকজন ছিল। আমি সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম। সমস্ত লোকজন চলিয়া যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মানুষটিকে কেমন পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, খুবই ভাল ; এমন যে, আপনজন দেখিয়া খুশী হয় আর দুশমন দেখিয়া জ্বলিয়া মরে। তিনি বলিলেন, যদি অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখ তবে লাঠি দ্বারা শাসন করিও। আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি একজন লোক পাঠাইলেন, যে আমাকে চব্বিশ হাজার দেরহাম (প্রায় পাঁচ হাজার রুপী) দিয়া গেল।

এই মেয়েকে বাদশাহ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁহার পুত্র যুবরাজ ওলীদের জন্য চাহিয়াছিলেন কিন্তু হযরত সাঈদ (রহঃ) অসম্মতি

প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেই কারণে বাদশাহ আবদুল মালেক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কোন অজুহাতে তাঁহাকে ভীষণ শীতের মধ্যে একশত বেত্রাঘাত করাইয়াছিল এবং কলসীভর্তি পানি তাঁহার উপর ঢালাইয়া দিয়াছিল।

(১৫) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُوْمَةٍ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِيْ أَمْرِهِ وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللّٰهُ فِيْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ پڑھے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصہ میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے (اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو) وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے وہ قیامت کے دن رَدْغَةُ الْخَبَال میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے۔

(رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالهما رجال الصحیح کذا فی مجمع الزوائد قلت اخرجه ابوداود بدون ذکر التسبیح فیه)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পড়িবে সে প্রতি অক্ষরের বদলে দশটি করিয়া নেকী পাইবে। যে ব্যক্তি কোন ঝগড়ায় অন্যায়ের সাহায্য করে সে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে এবং শরীয়তসম্মত শাস্তি বিধানে প্রতিবন্ধক হয় সে আল্লাহর সহিত মোকাবেলা করে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দিল তাহাকে কেয়ামতের দিন 'রাদগাতুল খাবালে' বন্দী করিয়া রাখা হইবে যে পর্যন্ত না সে এই অপবাদের দায় হইতে মুক্ত হইবে। আর সে এই দায়মুক্ত কিভাবে হইবে?

(মাঃ যাওয়ায়িদ ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ আজকাল অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোন একটা বিষয়কে নিজের ভুল ও অন্যায় জানিয়াও আত্মীয়তা ও দলীয় স্বার্থের কারণে উহাকে সমর্থন দিয়া থাকি। আল্লাহ তায়ালার লাখো ক্রোধে পতিত হইতেছি, তাঁহার অসন্তুষ্টির ভাগী হইতেছি, তাহার শাস্তির যোগ্য হইয়া যাইতেছি তবু স্বজনপ্রীতির কারণে এইসব মারাত্মক পরিণতির কোন পরওয়া করিতেছি না, অন্যায়কারীদের প্রতিবাদ করিতে না পারি এই ব্যাপারে চুপ থাকিব তাহাও নয় বরং সবদিক হইতে অন্যায়ের সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা করিব। যদি উহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদকারী খাড়া হয় তখন তাহার মোকাবেলা করিব। কোন বন্ধু চুরি করিল, জুলুম করিল, অন্যায় অবৈধ কাজ করিল, তাহাকে আরো উৎসাহিত করিব। তাহাকে সর্বরকমের সাহায্য করিব। ইহাই কি আমাদের ঈমানের দাবী? ইহাই কি আমাদের দ্বীনদারী? এহেন অবস্থা লইয়া আমরা ইসলামের উপর গর্ব করিতেছি নাকি ইসলামকে অন্যদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছি এবং আল্লাহর নিকট নিজেরা অপদস্থ হইতেছি। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আছবিয়্যাতের প্রতি কাহাকেও আহবান করে অথবা আছবিয়্যাতের উপর লড়াই করে সে আমাদের মধ্যে নহে। অন্য হাদীসে আছে, আছবিয়্যাতের অর্থ হইল, জুলুমের পক্ষে নিজের কওমকে সাহায্য করা।

'রাদগাতুল খাবাল' ঐ কাদা যাহা জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জমা হইয়া সৃষ্টি হয়। কত মারাত্মক দুর্গন্ধময় ও কষ্টদায়ক জায়গা। যাহারা মুসলমানদের উপর অপবাদ দেয় তাহাদেরকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। আজ দুনিয়াতে কাহারো সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা মন্তব্য করা অতি সাধারণ ব্যাপার মনে হইতেছে। অথচ কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন মুখের প্রতিটি কথাকে প্রমাণ করিতে হইবে এবং শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করিতে হইবে দুনিয়াতে যেমন গায়ের জোরে ও মিথ্যা বানোয়ার দ্বারা অন্যকে চুপ করাইয়া দেওয়া হয় সেইখানে উহা মোটেও সম্ভব হইবে না। তখন বুঝিতে পারিবে আমরা কি বলিয়াছিলাম এবং পরিণাম কি দাঁড়াইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ বেপরোয়া হইয়া জবানে এমন কথা উচ্চারণ করিয়া বসে যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক হাদীসে আছে, মানুষ ঠাট্টা করিয়া লোকদেরকে হাসানোর জন্য এমন কথা বলে, যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামের ভিতরে আসমান হইতে জমিন পর্যন্ত দূরত্বে নিক্ষেপ করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন, পা পিছলানো অপেক্ষা জবান পিছলানো অধিক ভয়ঙ্কর।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কৃত পাপের জন্য কাহাকেও লজ্জা দিবে, মৃত্যুর আগে সে ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, ইহা ঐ পাপ যাহা হইতে সে তওবা করিয়াছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নিজের জিহ্বাকে ধরিয়া টানিতেন আর বলিতেন, তোর কারণেই আমরা ধ্বংস হই। বিখ্যাত মোহাদ্দেস ও তাবেয়ী হযরত ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) এন্তেকালের সময় কাঁদিতেছিলেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তেমন কোন গোনাহ করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না কিন্তু কাঁদিতেছি এইজন্য যে, হয়ত এমন কোন কথা বা কাজ হইয়া গিয়াছে, আমি যাহাকে সাধারণ মনে করিয়াছি অথচ আল্লাহর নিকট উহা কঠিন।

(١٦) عَنْ اَبِیْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِیِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ بِاٰخِرِهٖ اِذَا اَرَادَ اَنْ یَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ فَقَالَ رَجُلٌ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِیْمَا مَضٰی قَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا یَكُوْنُ فِی الْمَجْلِسِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اخیر زمانہ عمر شریف میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اُٹھتے تو سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ پڑھا کرتے۔ کسی نے عرض کیا کہ آج کل ایک دعا کا معمول حضورؐ کا ہے پہلے تو یہ معمول نہیں تھا. حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس کا کفارہ ہے. دوسری روایت میں بھی یہ قصہ مذکور ہے. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں حضرت جبرئیلؑ نے مجھے بتائے ہیں.

(رواه ابن ابی شیبة وابوداؤد والنسائی والحاکم وابن مردویه کذا فی الدر وفیه ایضاً بروایة ابن ابی شیبة عن ابی العالیه بزیادة عَلَّمَنِیْهِنَّ جِبْرَئِیْلُ)

(১৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি মজলিস হইতে উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ-

কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল আপনি যে দোয়া

পড়িতেছেন, উহা পূর্বে কখনও পড়িতেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা মজলিসের কাফফারা।

আরেক রেওয়ায়াতেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, এই শব্দগুলি মজলিসের কাফফারা এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইগুলি আমাকে বলিয়াছেন। (দুররে মানসূর ঃ আবু দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মজলিস হইতে উঠিতেন, তখনই এই দোয়া পড়িতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই দোয়া অনেক বেশী পড়িয়া থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, "যে ব্যক্তি মজলিস শেষ হওয়ার পর এই দোয়া পড়িবে, ঐ মজলিসে তাহার যত ভুল-ত্রুটি হইয়াছে উহা সব মাফ হইয়া যাইবে।"

মজলিসে সাধারণতঃ অহেতুক কথাবার্তা ও বেহুদা আলোচনা হইয়াই যায়। কত সংক্ষিপ্ত দোয়া যদি কোন ব্যক্তি এই সকল দোয়াসমূহের মধ্য হইতে কোন একটি দোয়া পড়িয়া লয় তবে সে মজলিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া কত সহজ উপায় দান করিয়াছেন।

(١٧) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ مِنْ تَسْبِيْحِهٖ وَتَحْمِيْدِهٖ وَتَكْبِيْرِهٖ وَتَهْلِيْلِهٖ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَذْكُرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ اَلَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ لَّا يَزَالَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهٖ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ ان کے لئے ہلکی سی آواز (بھنبھناہٹ) ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے۔

(رواه احمد والحاكم وقال صحيح الاسناد قال الذهبي موسى بن سالم قال ابو حاتم منكر الحديث ولفظ الحاكم كدوي النحل يقلن بصاحبهن واخرجه بسند اخر وصححه على شرط مسلم واقره عليه الذهبي وفيه كدوي النحل يذكرن بصاحبهن)

(১৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যাহারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বর্ণনা করে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তাহাদের এই কালেমাগুলি আরশের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে, উহাদের কারণে মৃদু গুঞ্জন হইতে থাকে এবং ইহারা স্বীয় পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বদা তোমাদের আলোচনাকারী কেহ উপস্থিত থাকে—যাহারা তোমাদের প্রশংসা করিতে থাকে। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ যাহারা সরকারী উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সহিত সম্পর্ক রাখে, চেয়ারম্যান নামে পরিচিত তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, বাদশাহ নয় মন্ত্রীও নয় গভর্নর জেনারেলকেও বাদ দিন শুধু গভর্নরের নিকটও যদি তাহাদের প্রশংসা করা হয় তবে খুশীর অন্ত থাকে না, গর্বে আসমানে পৌছিয়া যায়। অথচ এই প্রশংসার দ্বারা না দ্বীনি ফায়দা আছে, না দুনিয়াবী ফায়দা। দ্বীনি ফায়দা না থাকা তো একেবারেই স্পষ্ট। আর দুনিয়াবী ফায়দা না হওয়ার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ এই ধরনের আলোচনার দ্বারা যত ফায়দা হইয়া থাকে উহার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই জাতীয় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া হইয়া থাকে। জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া সূদী করজ লইয়া এই সমস্ত মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। বিনা মূল্যের শত্রুতা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয়। সবধরনের অপমান ভোগ করিতে হয়। নির্বাচন ও ইলেকশনের সময় যে কি দশা হয় তাহা সকলেরই সামনে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আরশে আলোচনা সমস্ত বাদশাহদের বাদশাহ—তাঁহার দরবারে আলোচনা ঐ পবিত্র সত্তার দরবারে আলোচনা। যাহার কুদরতের হাতে দ্বীন, দুনিয়া ও কুল কায়েনাতের অণু-পরমাণু সবকিছু রহিয়াছে। ঐ কুদরতওয়ালার সামনে আলোচনা যাহার মুঠিতে বাদশাহদের দিল রহিয়াছে। শাসকদের ক্ষমতা তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সমস্ত লাভ-ক্ষতির একচ্ছত্র মালিক তিনিই। সমস্ত জগতের মানুষ, শাসক, শাসিত, রাজা-প্রজা একসাথে মিলিয়াও যদি কাহারও ক্ষতি করার চেষ্টা করে আর মহান রাজাধিরাজ যদি উহা না চাহেন তবে তাহারা কেহই একটি পশমও বাঁকা করিতে

পারিবে না। এমনিভাবে যদি সমগ্র জগত মিলিয়া কাহারও উপকার করিতে চাহে আর আল্লাহ পাক না চাহেন তবে তাহারা এক ফোটা পানিও পান করাইতে পারিবে না। দুনিয়ার কোন সম্পদ কি এমন পবিত্র ও মহান সত্তার দরবারের প্রশংসার সমতুল্য হইতে পারে? দুনিয়ার কোন ইজ্জত কি সেই মহান দরবারের ইজ্জতের সমান হইতে পারে? কখনই নয়। তা' সত্ত্বেও যদি কেহ দুনিয়ার মর্যাদাকে মূল্যবান মনে করে তবে ইহা কি নিজের উপর জুলুম নয়?

(۱۸) عَنْ يُسَيْرَةَ رضي الله عنها وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ـ

حضرت یُسَیرہ رضی اللہ عنہا جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح (سُبْحَانَ اللّٰہِ کہنا) اور تہلیل (لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھنا) اور تقدیس (اللہ کی پاکی بیان کرنا مثلاً سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ پڑھنا، یا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ کہنا لازم کرلو اور انگلیوں پر گنا کرو اس لئے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جاوے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کئے اور جواب میں) گویائی دی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا (اگر ایسا کروگی تو اللہ کی رحمت سے محروم کردی جاؤ گی۔

(رواه الترمذی وابوداؤد كذا فی المشكوٰة وفی المنهل اخرجه ایضا احمد والحاكم اهـ وقال الذهبی فی تلخیصه صحیح وكذا رقم له بالصحة فی الجامع الصغیر وبسط صاحب الاتحاف فی تخریجه وقال عبد الله بن عمرو رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ رواه ابوداؤد والنسائی والترمذی وحسنه والحاكم كذا فی الاتحاف وبسط فی تخریجه ثم قال قال الحافظ معنى العقد المذكور فی الحديث احصاء العدد وهو اصطلاح العرب بوضع بعض الانامل على بعض عقد انملة اخرى فالاحاد والعشرات باليمين والمئون والالاف باليسار اهـ)

(১৮) হযরত ইউছাইরাহ (রাযিঃ) হিজরতকারিণী সাহাবিয়াগণের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, হুযূর আকাদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া), তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহর

পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়া) তোমরা নিজেদের উপর জরুরী ও বাধ্যতামূলক করিয়া লও এবং আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা করিয়া পড়। কেননা, কেয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, উহাদের নিকট জবাব চাওয়া হইবে যে, কি আমল করিয়াছে। এবং জবাব দেওয়ার জন্য উহাদেরকে কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর তোমরা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

(মিশকাত ঃ তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কেয়ামতের দিন মানুষের শরীরকে, তাহার হাত, পা–কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কি কি নেক আমল করিয়াছে আর কি কি নাজায়েয ও অন্যায় কাজ করিয়াছে। কুরআনে পাকে বিভিন্ন স্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক আয়াতে আছে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ الاية

অর্থাৎ, যেই দিন তাহাদের জবান, তাহাদের হাত ও পা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্যসমূহের (অর্থাৎ গোনাহসমূহের) সাক্ষ্য দিবে, যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিত। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৪)

আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ الاية

(সূরা হা'মীম সিজদাহ, আয়াত ঃ ১৯)

এই জায়গায় কয়েকটি আয়াতে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহার অর্থ এই যে, যেদিন (অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে) আল্লাহর দুশমনদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে। এক জায়গায় থামাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে আসিয়া যাইবে তখন তাহাদের কান, তাহাদের চক্ষু, তাহাদের শরীরের চামড়া তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (এবং বলিবে, এই ব্যক্তি আমাদের দ্বারা কি কি গোনাহ করিয়াছে।) তখন তাহারা (আশ্চর্যের সহিত) উহাদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই ভোগবিলাসের জন্য গোনাহ করিতাম। উহারা জবাবে বলিবে, আমাদেরকে সেই পবিত্র আল্লাহ তায়ালা কথা বলিবার শক্তি দিয়াছেন যিনি দুনিয়ার সবকিছুকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন। তিনিই তোমাদেরকেও প্রথমবার পয়দা করিয়াছিলেন এখন আবার তাঁহারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিয়াছ।

হাদীসসমূহে এই সাক্ষ্য দেওয়ার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে—"কেয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তি নিজের বদ আমলসমূহ জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, আমি গোনাহ করি নাই। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশী তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সে বলিবে, তাহারা শত্রুতা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে। পুনরায় বলা হইবে, তোমার আত্মীয়–স্বজন সাক্ষ্য দিতেছে। সে তাহাদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে। অতঃপর তাহার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী বানানো হইবে।" এক হাদীসে আছে, "সর্বপ্রথম উরু সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, কি কি অন্যায় কাজ তাহার দ্বারা করানো হইয়াছিল।"

এক হাদীসে আছে—"পুলসিরাতের উপর দিয়া সর্বশেষ যে ব্যক্তি পার হইবে সে এমনভাবে উঠিয়া–পড়িয়া পার হইতে থাকিবে যেমন ছোট বাচ্চাকে পিতা যখন মারিতে থাকে তখন সে কখনও এদিক কখনও ওদিক পড়িয়া যায়। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, তুমি যদি সোজা চলিয়া পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে পার তবে কি তোমার সমস্ত আমলের কথা বলিয়া দিবে? সে ওয়াদা করিয়া বলিবে, আমি সবকিছু সত্য সত্য বলিয়া দিব। এমনকি আল্লাহ তায়ালার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিবে যে, আমি কোনকিছু গোপন করিব না। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং চলিতে থাক। সে অতি সহজে পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে এবং পার হওয়ার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আচ্ছা এখন বল। সে ব্যক্তি চিন্তা করিবে, যদি আমি স্বীকার করিয়া ফেলি তবে এমন না হয় যে, আমাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য সে পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং বলিবে, আমি কোন গোনাহ করি নাই। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, আমরা যদি সাক্ষী উপস্থিত করি? তখন সে এদিক–সেদিক দেখিবে যে, আশেপাশে কোন লোক নাই। সে মনে করিবে যে, এখন সাক্ষী কোথায় হইতে আসিবে, সকলেই তো নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাজেই সে বলিবে, আচ্ছা সাক্ষী আন। তখন তাহার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে এবং উহারা বলিতে শুরু করিবে। বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং নিজেই বলিবে যে, আমার আরও অনেক মারাত্মক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেইগুলি বর্ণনা করা হয় নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম।"

মোটকথা, এই সমস্ত কারণে মানুষের উচিত, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের দ্বারা বেশী বেশী নেক আমল করা। যাহাতে উভয় প্রকারের সাক্ষী মিলিতে পারে। এই

কারণেই উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে গণনা করার হুকুম করিয়াছেন। এমনিভাবে অন্যান্য হাদীসে মসজিদে বেশী বেশী আসা–যাওয়া করিতে হুকুম করিয়াছেন। কেননা, এই পদচিহ্নসমূহও সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং উহার সওয়াব লেখা হয়। কত সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য গোনাহের কোন সাক্ষীই নাই, কেননা কোন গোনাহই করে নাই, অথবা তৌবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ লইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সৎকাজ ও নেকীর সাক্ষী শত সহস্র রহিয়াছে। ইহা হাসিল করার সহজ পন্থা হইল, যখনই কোন গোনাহ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিবে। কেননা, তওবা দ্বারা গোনাহ মুছিয়া যায়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে আর নেক আমলসমূহ বাকী থাকিয়া যায়, ইহার সাক্ষীও থাকে এবং যেইসমস্ত অঙ্গ দ্বারা নেক আমলগুলি করা হইয়াছে উহারাও সাক্ষ্য প্রদান করে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তসবীহ গণনা করিতেন।

ইহার পর উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকার কারণে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে বঞ্চিত থাকে তাহারা আল্লাহর রহমত হইতেও বঞ্চিত থাকে। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে (রহমতের সহিত) স্মরণ করিব।' আল্লাহ তায়ালা নিজের স্মরণকে বান্দার স্মরণের সহিত শর্তযুক্ত করিয়াছেন। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ
عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির হইতে (কুরআন পাক হউক বা অন্য কোন যিকির হউক—জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া যায়, আমি তাহার উপর এক শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। ঐ শয়তান সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। আর ঐ শয়তান তাহার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে লইয়া ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে সোজা পথ হইতে সরাইতে থাকে। আর তাহারা ধারণা করে যে, আমরা হেদায়েতের উপর আছি। (সূরা যুখরুফ, আয়াত ঃ ৩৬–৩৭)

হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে একটি শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে। কাফেরের সহিত এই শয়তান সর্বাবস্থায় থাকে। খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ সকল অবস্থাতেই তাহার সহিত থাকে। কিন্তু মোমেনের নিকট হইতে সেই শয়তান কিছুটা দূরে থাকে এবং অপেক্ষা করিতে থাকে—যখনই তাহাকে যিকির হইতে একটু গাফেল পায় তখনই হামলা করিয়া বসে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ সূরার শেষ পর্যন্ত

(সূরা মুনাফিকূন)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (এমনিভাবে অন্যান্য জিনিস) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ঃ ৯) আমি (ধন-সম্পদ) যাহাকিছু তোমাদেরকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া লও ঐ সময় আসিয়া পড়ার পূর্বেই যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইবে আর যখন দুঃখ ও আফসোসের সহিত বলিবে, হে আমার পরোয়ারদেগার! কিছুদিনের জন্য আমাকে সুযোগ দিলেন না কেন ; যাহাতে আমি দান-খয়রাত করিয়া লইতাম এবং আমি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। আল্লাহ তায়ালা কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে আর সুযোগ দেন না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত আছেন। (অর্থাৎ যেমন করিবে ভাল অথবা মন্দ তেমনই ফল পাইবে।)

আল্লাহ তায়ালার এমনও বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা কখনও যিকির হইতে গাফেল হন না। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, আমি এক জায়গায় দেখিলাম—একজন পাগল লোককে দুষ্ট ছেলেরা ঢিল মারিতেছে। আমি তাহাদেরকে ধমকাইলাম। ছেলেরা বলিতে লাগিল, এই লোকটি বলে আমি আল্লাহকে দেখি। এই কথা শুনিয়া আমি পাগলের নিকটে গেলাম ; তখন সে কি যেন বলিতেছিল। খুব খেয়াল করিয়া শুনিলাম, সে বলিতেছে, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ যে, ছেলেদেরকে আমার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছ। আমি বলিলাম, এই ছেলেরা তোমার উপর একটি অপবাদ দিতেছে। সে বলিল, কি বলে? আমি বলিলাম, তাহারা বলে, তুমি আল্লাহকে দেখ বলিয়া দাবী কর। এই কথা শুনিয়া সে এক চিৎকার দিয়া বলিল, শিবলী! ঐ পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে আপন মহব্বতে ভগ্নাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কখনও তিনি আমাকে নিজের

কাছে আবার কখনও দূরে রাখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সামান্য সময়ের জন্যও তিনি আমার নিকট হইতে গায়েব হইলে (অর্থাৎ উপস্থিতি হাসিল না থাকিলে) আমি বিচ্ছেদ বেদনায় টুকরা টুকরা হইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া এই কবিতা পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল ঃ

خَيَالُكَ فِيْ عَيْنِيْ وَذِكْرُكَ فِيْ فَمِيْ   وَمَثْوَاكَ فِيْ قَلْبِيْ فَاَيْنَ تَغِيْبُ

"তোমার চেহারা আমার চোখে বিরাজমান, তোমার যিকির আমার জবানে সর্বদা উচ্চারিত, তোমার ঠিকানা আমার অন্তরে অবস্থিত, সুতরাং তুমি কোথায় গায়েব হইবে।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করিল। তিনি বলিলেন, আমি ইহা কোন সময়ই ভুলি নাই অর্থাৎ ইহা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করাও যে কখনও ভুলিয়াছে।

হযরত মামশাদ (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার এন্তেকালের সময় নিকটে বসা এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য দোয়া করিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাতের অমুক অমুক নেয়ামত দান করুন। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ জান্নাত তাহার পূর্ণ সাজ–সজ্জাসহ আমার সামনে প্রকাশ হইতেছে। তথাপি আমি একবারও আল্লাহ তায়ালা হইতে নজর হটাইয়া ঐ দিকে তাকাই নাই।

হযরত রোয়াইম (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কালেমা তালকীন করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই কালেমা ছাড়া অন্য কিছু ভাল করিয়া জানিই না।

আহমদ ইবনে খাজরাভিয়া (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, পঁচানব্বই বৎসর যাবৎ একটি দরজায় করাঘাত করিতেছি ; আজ সেই দরজা খুলিবার সময় আসিয়াছে। জানি না উহা সৌভাগ্যের সহিত খুলিবে নাকি দুর্ভাগ্যের সহিত ; এখন আমার কোন কথা বলার অবসর কোথায়।

(١٧) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ

اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اُن کے پاس سے نماز کے لئے

فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ
اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ
عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا
قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ
اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ
وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ
لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ
عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ
عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ۔

تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلے پر بیٹھی
ہوئی تسبیح میں مشغول تھیں، حضورؐ چاشت
کی نماز کے بعد (دوپہر کے قریب) تشریف
لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں
حضورؐ نے دریافت فرمایا تم اسی حال پر
ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا عرض کیا جی
ہاں! حضورؐ نے فرمایا میں نے تم سے جدا
ہونے کے، بعد چار کلمے تین مرتبہ پڑھے
اگر ان کو اس سب کے مقابلہ میں تولا
جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ
غالب ہو جائیں وہ کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ
وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ (اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں
بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر
وزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق)۔

(رواہ مسلم کذا فی المشکوۃ قال القاری وکذا اصحاب السنن الاربعۃ وفی الباب
عن صفیۃ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدی اربعۃ الاف
نواۃ اسبح بھن الحدیث اخرجہ الحاکم وقال الذہبی صحیح)

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍؓ اَنَّهٗ دَخَلَ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى امْرَاَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى
اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكِ
بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا
اَوْ اَفْضَلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا
خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ
عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ
اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سعدؓ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک صحابی عورت کے پاس تشریف
لے گئے ان کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں
یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ تسبیح
پڑھ رہی تھیں حضورؐ نے فرمایا میں تجھے
ایسی چیز بتاؤں جو اس سے سہل ہو (یعنی
کنکریوں پر گننے سے سہل ہو) یا یہ ارشاد
فرمایا کہ اس سے افضل ہو سُبْحَانَ

اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ
أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ
ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
مِثْلَ ذٰلِكَ۔

اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اخیر تک. اللہ کی
تعریف کرتی ہوں بقدر اس مخلوق کے
جو آسمان میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق
کے جو زمین میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق
کے جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی آسمان زمین
کے درمیان ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں بقدر اس کے جس کو وہ پیدا کرنے والا ہے اور اس سب
کے برابر اَللهُ أَكْبَرُ اور اس کے برابر ہی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اسی کے مانند لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ۔

(رواه ابوداؤد والترمذی وقال الترمذی حدیث غریب کذا فی المشکوٰة قال القاری
وفی نسخة حسن غریب اه وفی المنهل اخرجه ایضا النسائی وابن ماجة وابن حبان
والحاکم والترمذی وقال حسن غریب من هذا الوجه اه قلت وصححه الذهبی)

(১৯) উম্মুল মোমেনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। আর তিনি আপন জায়নামাযে বসিয়া (তসবীহ পড়িতেছিলেন।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি) চাশতের নামাযের পর ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখনও একই অবস্থায় বসিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই অবস্থায়ই আছ? যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। তিনি আরজ করিলেন, হাঁ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন—'আমি তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পড়িয়াছি। যদি উহাকে তুমি সকাল হইতে এই পর্যন্ত যাহা কিছু পড়িয়াছ সবকিছুর মোকাবেলায় ওজন করা হয় তবে উহা ভারী হইয়া যাইবে। সেই চার কালেমা এই ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার সৃষ্ট মখলুকের সংখ্যা পরিমাণ এবং তাঁহার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁহার কালেমাসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।" (মিশকাত ঃ মুসলিম)

আরেক হাদীসে আছে, হযরত সাআদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন মহিলা সাহাবিয়ার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব কি যাহা ইহা হইতে সহজ অর্থাৎ কংকর দ্বারা গণনা করা হইতে সহজ হয়। অথবা এরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে উত্তম হয়। তাহা হইল ঃ

سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق
في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما
هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا
اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك.

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, আসমানে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে সৃষ্ট মখলুকের সমপরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ যাহা তিনি সৃষ্টি করিবেন। আর ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'আল্লাহু আকবার', ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ঐসব কিছুর সমপরিমাণ 'ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।" (মিশকাত ঃ আবু দউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এইভাবে তসবীহ উত্তম হওয়ার অর্থ হইল, উল্লেখিত শব্দগুলি সহ যিকির করার দ্বারা আলোচ্য অবস্থা ও গুণাবলীর দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। আর ইহা বলা বাহুল্য যে, চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান যত বেশী হইবে যিকির তত উত্তম হইবে। এইজন্যই চিন্তা ও ফিকিরের সহিত কুরআনের অল্প তেলাওয়াত চিন্তা-ফিকির ব্যতীত বেশী তেলাওয়াত হইতে উত্তম। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, এই ধরনের যিকির উত্তম হওয়ার কারণ হইল, এইগুলিতে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা গণনার ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা বান্দার পরিপূর্ণ আব্দিয়ত অর্থাৎ দাসত্বের পরিচয়। এইজন্য কোন কোন সূফী বলিয়াছেন—'অসংখ্য-অগণিত গোনাহ করিতেছ অথচ আল্লাহর নাম গণিয়া গণিয়া সীমিত সংখ্যায় লইতেছ!' ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর

নাম গণনা করা উচিত নয়। যদি তাহাই হইত তবে বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় তসবীহ গণনা করিয়া পড়ার কথা কেন বলা হইয়াছে? অথচ বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপর বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে। বরং উহার অর্থ হইল কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করা চাই না। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের ওযিফা আদায়ের পর অবসর সময়ে যতসম্ভব অগণিত সংখ্যায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা চাই। কেননা, ইহা এত বড় সম্পদ যাহা সংখ্যার ধরা বাঁধা সীমারও ঊর্ধ্বে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুতায় গাঁথা প্রচলিত তসবীহ জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে বেদআত বলিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীচি অথবা কংকর দ্বারা গণনা করিতে দেখিয়া কোনরূপ বাধা বা অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই মূল বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতায় গাঁথা বা না গাঁথার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই সমস্ত মাশায়েখ ও ফকীহগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে 'নুজহাতুল ফিকার' নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস প্রচলিত তাসবীহ জায়েয হওয়ার সহীহ দলীল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত খেজুরের বিচি ও কংকরের সাহায্যে তাসবীহ পড়িতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইহা একটি শরীয়তসম্মত দলীল। আর সূতায় গাঁথা ও খোলা থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কারণে যাহারা ইহাকে বেদআত বলেন, তাহাদের উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।

সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় প্রচলিত তসবীহকে শয়তানের জন্য চাবুক স্বরূপ বলা হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে পৌছার পরও তাহার হাতে তসবীহ দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে তসবীহের সাহায্যে আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়াছি, উহাকে আমি কি করিয়া ছাড়িতে পারি?

বহু সাহাবায়ে কেরাম হইতে ইহা বর্ণিত আছে, তাহাদের নিকট খেজুরের বীচি অথবা কংকর থাকিত। তাহারা উহা দ্বারা গণনা করিয়া তাসবীহ পড়িতেন। হযরত আবূ সাফিয়্যাহ সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি কংকর দ্বারা গণনা করিয়া তসবীহ পড়িতেন। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে খেজুরের বীচি ও কংকর উভয়টি দ্বারা গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতেও

কংকর দ্বারা তসবীহ গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। 'মেরকাত' কিতাবে লিখা হইয়াছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-র নিকট গিরা লাগানো একটি সূতা ছিল উহা দ্বারা তিনি গণনা করিতেন। আবূ দাঊদ শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-র নিকট খেজুরের বীচি বা কংকর ভর্তি একটি থলি ছিল, তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেন। যখন থলি খালি হইয়া যাইত তখন তাঁহার বাঁদী আবার ভরিয়া তাহার নিকট রাখিয়া দিত। অর্থাৎ তসবীহ গণনার জন্য থলি হইতে বাহির করিতে থাকিতেন। এইভাবে থলি খালি হইয়া যাইত। অতঃপর বাঁদী সেইগুলিকে একত্র করিয়া আবার ভরিয়া রাখিত।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার একটি থলি ছিল। ফজরের নামায পড়িয়া তিনি এই থলি নিয়া বসিতেন এবং থলি খালি না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া পড়িতে থাকিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আবূ সাফিয়্যাহ (রাযিঃ)-র সামনে একটি চামড়া বিছানো থাকিত। উহার উপর বহু কংকর রাখা থাকিত। তিনি জওয়াল অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত এইগুলি দ্বারা পড়িতে থাকিতেন। যখন দুপুর হইয়া যাইত ঐ চামড়া উঠাইয়া নেওয়া হইত। আর তিনি অন্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়া যাইতেন। জোহরের নামাযের পর পুনরায় উহা বিছাইয়া দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি উহা পড়িতে থাকিতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-র পৌত্র বর্ণনা করেন, আমার দাদার নিকট একটি সুতা ছিল। উহাতে দুই হাজার গিরা লাগানো ছিল। তিনি উহার তসবীহ না পড়া পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। হযরত হোসাইন (রাযিঃ)-র কন্যা হযরত ফাতেমা (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁহার নিকট বহু গিরা লাগানো একটি সুতা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেন।

সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট তসবীহকে 'মুজাককিরা' (স্মরণ করাইয়া দিবার বস্তু) বলা হয়। কেননা, ইহা হাতে নিলে এমনিতেই কিছু না কিছু পড়িতে মনে চায়। কাজেই ইহা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সম্পর্কে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তসবীহ কতই না উত্তম মুজাককিরা বা স্মারক। হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে একটি মুসালসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) হইতে উপর পর্যন্ত একের পর এক সকল উস্তাদই তাহার শাগরেদকে একটি করিয়া তসবীহ দান করিয়াছেন এবং

উহাতে পড়ার অনুমতি দিয়াছেন। উপরের দিকে এই ধারা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)–এর এক শাগরেদ পর্যন্ত পৌছে। তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ হযরত জুনায়েদ (রহঃ)–এর হাতে তসবীহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদা লাভের পরও তসবীহ হাতে রাখেন? তিনি বলিলেন, আমি আমার উস্তাদ সিররী ছাকতী (রহঃ)এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম যাহা তুমি করিলে। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার উস্তাদ মারুফ কারখী (রহঃ)–এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আমার উস্তাদ বিশরে হাফী (রহঃ)–এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উস্তাদ ওমর মক্কী (রহঃ)–এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উস্তাদ (সমস্ত চিশতিয়া মাশায়েখদের সরদার) হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর হাতে তসবীহ দেখিয়া আরজ করিলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনার হাতে তসবীহ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাসাউফের শুরুতে ইহা দ্বারাই কাজ লইয়াছিলাম এবং ইহা দ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়াছিলাম। এখন শেষ অবস্থায় উহাকে ছাড়িয়া দিতে মনে চায় না। আমি চাই—দিলে, জবানে, হাতে সর্বভাবে আল্লাহর যিকির করি। অবশ্য মুহাদ্দেসগণের দৃষ্টিতে উক্ত বর্ণনার উপর আপত্তিও করা হইয়াছে।

(٢٠) عَنِ ابْنِ اَعْبُدٍ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ رضی اللہ عنہ اَلَا اُحَدِّثُكَ عَنِّیْ وَعَنْ فَاطِمَةَ رضی اللہ عنہا بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَ فِیْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَ فِیْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاَتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَاَلْتِيْهِ خَادِمًا فَاَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهٗ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ

حضرت علیؓ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمھیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہؓ کا جو حضورؐ کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں. فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی

فَاَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ
حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكَ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ
فِيْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ
فِيْ نَحْرِهَا فَلَمَّا اَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ
اَمَرْتُهَا اَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا
يَقِيْهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيْهِ قَالَ اِتَّقِى اللّٰهَ
يَا فَاطِمَةُ وَاَدِّىْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِىْ
عَمَلَ اَهْلِكِ فَاِذَا اَخَذْتِ مَضْجَعَكِ
فَسَبِّحِىْ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدِىْ ثَلٰثًا
وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرِىْ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ
فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِىَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ
قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَّسُوْلِهٖ
(اخرجه ابوداؤد) وفي الباب عن
الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اُمَّ
الْحَكَمِ اَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ اِحْدٰهُمَا
اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ
اَنَا وَاُخْتِىْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا
اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ
يَّاْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ وَّلٰكِنْ
سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ

خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے میں نے
حضرت فاطمہؓ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب
کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ
تو اچھا ہے سہولت رہے گی وہ گئیں حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں
کا مجمع تھا اس لئے واپس چلی آئیں حضور صلی
اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر
تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی
تھیں وہ چپ ہوگئیں (شرم کی وجہ سے
بول بھی نہ سکیں) میں نے عرض کیا حضور
چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے مشکیزہ بھرنے
کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے جھاڑو
دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں کل
آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے
اس لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک
خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں
سہولت ہو جائے. حضورؐ نے فرمایا فاطمہ
اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی
رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو اور جب
سونے کے لئے لیٹو تو سبحان اللہ ۳۳
مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر ۳۴
مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ خادم سے بہتر ہے
انھوں نے عرض کیا کہ میں اللہ (کی تقدیر)
اور اس کے رسول (کی تجویز) سے راضی
ہوں دوسری حدیث میں حضورؐ کی چچا
زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے

مِنْ ذٰلِكَ تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضورؐ کی بیٹی فاطمہ تینوں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کرکے ایک خادم کی طلب کی حضورؐ نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں میں تمھیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پڑھ لیا کرو یہ خادم سے بہتر ہے۔

(رواه ابوداؤد وفي الجامع الصغير برواية ابن منده عن جليس كان يامر نسائه اذا ارادت احداهن ان تنام ان تحمد الحديث ورقم له بالضعف)

(২০) হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার এক শাগরেদকে বলিলেন, আমি তোমাকে আমার এবং আমার স্ত্রী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)–র ঘটনা শুনাইব কি? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই শুনান। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নিজ হাতে যাতা চালাইতেন। যদ্দরুন হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছিল। নিজেই মশক ভরিয়া পানি বহন করিয়া আনিতেন। যদ্দরুন বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। ফলে, কাপড়–চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল। আমি হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলাম, পিতার নিকট হইতে যদি একজন খাদেম চাহিয়া আনিতে তবে ভাল হইত এবং তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইত। তিনি গেলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে, লোকজন ভর্তি ছিল দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তুমি কাল কি জন্য গিয়াছিলে? হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন (লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না)। (হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাঁতা পিষার কারণে তাহার হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, পানি

ভর্তি মোশক বহন করিয়া আনার কারণে বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড়–চোপড় ময়লা হইয়া থাকে। গতকাল আপনার নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল সেইজন্য আমি নিজেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম একজন খাদেম চাহিয়া আনার জন্য। যাহাতে তাঁহার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। তোমার ফরয আদায় করিতে থাক। আর ঘরের কাজকর্ম করিতে থাক। আর যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন কর তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িয়া নিও। ইহা খাদেম হইতে উত্তম আমল। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার (তাকদীর) ও তাহার রাসূলের (ফয়সালার) উপর সন্তুষ্ট আছি। (আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোনদের ঘটনাও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, আমরা দুই বোন এবং হুযূরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) সহ তিনজন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং নিজেদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া একজন খাদেম চাহিলাম। তখন তিনি এরশাদ ফরমাইলেন—'বদর যুদ্ধে যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদের এতীম সন্তানরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশী হক রাখে। আমি তোমাদের জন্য খাদেমের চাইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি—তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কালেমা তেত্রিশবার করিয়া পড় আর একবার এই কালেমা পড়িয়া লও—ইহা খাদেম হইতে উত্তম।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের লোকদেরকে এবং আত্মীয়–স্বজনকে বিশেষভাবে এই সমস্ত তসবীহ পড়ার জন্য হুকুম করিতেন। এক হাদীসে আছে—'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিদেরকে শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার করিয়া পড়িতে বলিতেন।'

উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবী কষ্ট ও পরিশ্রমের মোকাবেলায় এই সমস্ত তসবীহ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার বাহ্যিক কারণ একেবারে স্পষ্ট যে, মুসলমানের জন্য দুনিয়াবী কষ্ট ও

পরিশ্রম ভ্রূক্ষেপ করার বিষয় নয় ; বরং তাহার জন্য জরুরী হইল সবসময় আখেরাত ও মরণের পরের জীবনের সুখ–শান্তির ফিকির করা। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর দুঃখ–কষ্ট হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আখেরাতের সুখ–শান্তির ছামান বৃদ্ধি করার জন্য মনোযোগী করিয়াছেন। আর এই তসবীহসমূহ আখেরাতে অধিক উপকারী হওয়াটা এই অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে যে, এই সমস্ত তসবীহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেমন দ্বীনি উপকার ও লাভ রাখিয়াছেন তেমনি দুনিয়াবী ফায়দাও রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার পাক কালামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কালামে অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে যেইগুলি দ্বারা আখেরাতের ফায়দার সাথে সাথে দুনিয়ারও ফায়দা হাসিল হয়। যেমন এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের যামানায় ফেরেশতাদের খাদ্যই মুমিনদের খাদ্য হইবে। (অর্থাৎ তাসবীহ তাকদীস সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ পড়া)। যেই ব্যক্তি মুখে এই কালেমাগুলি পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার ক্ষুধার কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। এই হাদীস হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে খানাপিনা না করিয়া শুধু আল্লাহর যিকিরের উপর জীবন–যাপন সম্ভব হইতে পারে। দাজ্জালের সময় সাধারণ মুসলমানের এই সৌভাগ্য লাভ হইবে, কাজেই এই জামানায় খাছ মুমিনদের সেই অবস্থা হাসিল হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। এইজন্যই যে সকল বুযুর্গদের সম্পর্কে এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সামান্য খাদ্যের উপর কিংবা একেবারে না খাইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেন। এইগুলিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

এক হাদীসে আছে, যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তবে বেশী বেশী আল্লাহু আকবার পড়িতে থাক ; ইহা আগুনকে নিভাইয়া দেয়।

'হিসনে হাসীন' কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি যদি কাজকর্মে ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে কিংবা শক্তি পাইতে চায়, তবে সে যেন শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে। অথবা প্রত্যেকটি ৩৩ বার কিংবা যে কোন দুইটি ৩৩ বার ও একটি ৩৪ বার পড়িয়া নেয়। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু সবগুলিই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

যে সকল হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে খাদেমের পরিবর্তে এই তাসবীহসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন উহার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এই কথা বলিয়াছেন যে,

যে ব্যক্তি নিয়মিত এই তাসবীহগুলি পড়িবে সে কোন কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজে ক্লান্তি অনুভব করিবে না। হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ) বলেন, সামান্য ক্লান্তি অনুভব হইলেও কোনরূপ ক্ষতি হইবে না। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই আমল পরীক্ষিত, এই তাসবীহসমূহ শুইবার সময় পাঠ করা ক্লান্তি দূর হওয়া ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'মেরকাতুস সুঊদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, এই সমস্ত তসবীহ খাদেম হইতে উত্তম হওয়া, আখেরাত ও দুনিয়া উভয় হিসাবে হইতে পারে। আখেরাতে এই হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ আখেরাতে যত উপকারী হইবে দুনিয়াতে খাদেম এত উপকারী হইতে পারে না। আর দুনিয়াতে এই হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ পড়ার কারণে কাজে-কর্মে যতটুকু শক্তি ও হিম্মত লাভ হইতে পারে, খাদেম দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

এক হাদীসে আছে, দুইটি আমল এমন আছে, যে ব্যক্তি উহার উপর আমল করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমল দুইটি খুবই সহজ কিন্তু উহার উপর আমলকারী খুবই কম। একটি হইল, এই তসবীহগুলিকে প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশ বার করিয়া পড়িবে। পড়ার মধ্যে তো একশত পঞ্চাশ কিন্তু আমলের পাল্লায় পনেরশত হইবে। দ্বিতীয়টি হইল, শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়িবে। পড়ার মধ্যে তো একশত হয় কিন্তু সওয়াবের দিক হইতে এক হাজার হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার কি কারণ যে ইহার আমলকারী অনেক কম হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, নামাযের সময় শয়তান আসিয়া বলিতে থাকে, তোমার অমুক কাজ আছে, অমুক প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। অনুরূপ শুইবার সময়ও সে বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলে তসবীহ পড়া বাদ পড়িয়া যায়।

এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে ইহাও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জান্নাতী মহিলাগণের সর্দার, দোজাহানের বাদশাহের কন্যা নিজ হাতে আটা পিষিতেন, ফলে তাহার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছিল। নিজেই পানির মোশক বহন করিয়া আনিতেন, ফলে তাঁহার বুকে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু ইত্যাদি সমস্ত কাজ করিতেন, ফলে কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। আটা মলা রুটি পাকানো এককথায়, সমস্ত কাজ তিনি নিজ হাতে করিতেন। আমাদের স্ত্রীগণ এই সমস্ত কাজ তো দূরের কথা ইহার অর্ধেকও কি নিজ হাতে করিয়া থাকেন! যদি না করেন তবে কত লজ্জার কথা যে, যাহাদের

মনিবদের জিন্দেগী এইরূপ তাহাদের নাম ধারণকারী, তাহাদের নামের উপর গর্বকারীদের জিন্দেগী তাহাদের ধারে কাছেও হইবে না? উচিত তো ছিল গোলামদের কাজ এবং তাহাদের পরিশ্রম মনিবদের তুলনায় আরো বেশী হইবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হইল আমরা উহার ধারে–কাছেও নাই। فَاِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (অভিযোগ আল্লাহ পাকের দরবারেই এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।)

পরিশিষ্ট

পরিশেষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। আর ইহারই উপর এই পুস্তিকা সমাপ্ত করিতেছি। উপরে বর্ণিত তসবীহসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে দরকারী ও উপকারী। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা হইয়াছে। এই গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ নামাযের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন যাহা 'সালাতুত তসবীহ' (তসবীহের নামায) নামে প্রসিদ্ধ। এই নামাযের মধ্যে তিনশতবার উক্ত তসবীহ পড়া হয় বলিয়া ইহাকে সালাতুত তসবীহ বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত উৎসাহ প্রদানসহ এই নামায শিক্ষা দিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا اُعْطِيْكَ اَلَا اَمْنَحُكَ اَلَا اُخْبِرُكَ اَلَا اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَاَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ

حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا۔ اے عباس اے میرے چچا کیا میں تمھیں ایک عطیہ کروں ایک بخشش کروں ایک چیز بتاؤں تمھیں دس چیزوں کا مالک بناؤں جب تم اس کام کو کروگے تو حق تعالیٰ شانہٗ تمھارے سب گناہ پہلے اور پچھلے پرانے اور نئے غلطی سے کئے ہوئے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے چھوٹے اور بڑے چھپ کر کئے ہوئے اور کھلم کھلا کئے ہوئے سب ہی مُعاف فرمادیں گے، وہ کام یہ ہے کہ چار رکعت نفل (صلوٰۃ التسبیح کی نیّت باندھ کر) پڑھو اور ہر رکعت میں جب

قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
خَمْسَ عَشَرَةَ ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَ
اَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ
مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ
تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَ اَنْتَ
سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ
مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ
تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ
وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ
ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ
اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ
لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے
سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ
وَاللّٰہُ اَکْبَرُ پندرہ مرتبہ پڑھو پھر جب
رکوع کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر
جب رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ
پڑھو، پھر سجدہ کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو
پھر سجدہ سے اُٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو پھر
جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو دس مرتبہ
اس میں پڑھو پھر جب دوسرے سجدہ سے
اُٹھو تو (دوسری رکعت میں) کھڑے ہونے
سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو۔ ان سب
کی میزان پچھتر ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت
میں پچھتر دفعہ ہوگا اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ
ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو
سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو
یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ
پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں
ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔

(رواہ ابوداود وابن ماجۃ والبیہقی فی الدعوات الکبیر وروی الترمذی عن ابی رافع نحوہ
کذا فی المشکوٰۃ قلت واخرجہ الحاکم وقال ھذا حدیث وصلہ موسی بن عبدالعزیز
عن الحکم بن ابان وقد اخرجہ ابوبکر محمد بن اسحق وابوداؤد وابوعبدالرحمٰن احمد بن
شعیب فی الصحیح ثم قال بعد ما ذکر توثیق رواتہ واما ارسال ابراھیم بن الحکم
عن ابیہ فلا یوھن وصل الحدیث فان الزیادۃ من الثقۃ اولی من الارسال علی ان
امام عصرہ فی الحدیث اسحٰق بن ابراھیم الحنظلی قد اقام ھذا الاسناد عن ابراھیم
بن الحکم ووصلہ اھ قال السیوطی فی اللآلی ھذا اسناد حسن وما قال الحاکم اخرجہ
النسائی فی کتابہ الصحیح لم نرہ فی شیء من نسخ السنن لا الصغری ولا الکبری)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে ফরমাইলেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে একটি দান, একটি বখশিশ দিব? একটি জিনিস বলিয়া দিব? আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাইব? যখন আপনি এই কাজটি করিবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ, নূতন ও পুরাতন গোনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, সগীরা ও কবীরা গোনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ সব মাফ করিয়া দিবেন। সেই কাজটি হইল এই যে, চার রাকাত নফল নামায (সালাতুত তসবীহের নিয়ত বাঁধিয়া) পড়ুন। প্রত্যেক রাকাতে আল-হামদু পড়িয়া সূরা মিলানোর পর রুকূতে যাওয়ার আগে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ১৫ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকূ করিবেন উহাতে ১০ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকূ হইতে দাঁড়াইবেন তখন ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সেজদাহ করুন এবং ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সেজদা হইতে বসিয়া ১০ বার পড়ুন, যখন দ্বিতীয় সেজদায় যাইবেন তখন উহাতে ১০ বার পড়ুন। তারপর যখন দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবেন (তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া ১০ বার পড়ুন। এসব মিলাইয়া মোট ৭৫ বার হইল। এইরূপ প্রতি রাকাতে ৭৫ বার হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন একবার এই নামায পড়িয়া লইবেন। যদি না হয় তবে জুমার দিনে একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে প্রতি বৎসর একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে সারা জীবনে একবার হইলেও এই নামায অবশ্যই পড়িবেন। (মিশকাত ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

(٢) وَعَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ رَّجُلٍ كَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْتِنِىْ غَدًا اَحْبُوْكَ وَاُثِيْبُكَ وَاُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ يُعْطِيْنِىْ عَطِيَّةً قَالَ اِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ وَقَالَ

ایک صحابیؓ کہتے ہیں مجھ سے حضورؐ نے فرمایا کل صبح کو آنا تم کو ایک بخشش کروں گا ایک چیز دوں گا ایک عطیہ کروں گا وہ صحابیؓ کہتے ہیں میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی (مال) عطا فرمائیں گے (جب میں حاضر ہوا) تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو چار رکعت نماز پڑھو اسی طریقہ سے بتایا جو پہلی حدیث میں گذرا ہے اور یہ بھی فرمایا

فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (رواه ابوداؤد)

کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوگے، تو تمھارے گناہ معاف ہو جائیں گے میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔

(২) এক সাহাবী বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি আগামীকাল সকালে আসিও আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি জিনিস দিব, একটি বস্তু দান করিব। সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এই কথার দ্বারা আমি মনে করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। আমি পরদিন আসিয়া হাজির হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দুপুরে যখন সূর্য হেলিয়া যায় তখন চার রাকাত নামায পড়িও। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত নিয়মে পড়িতে বলিলেন। আর ইহাও বলিলেন যে, তুমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের চাইতে বেশী গোনাহগার হও তবু তোমার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ সময়ে পড়িতে না পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দিনে অথবা রাতে যে কোন সময় পার পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

(۳) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ إِلَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَهَبُ لَكَ أَلَا أُبَشِّرُكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أُتْحِفُكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (فذكر نحوه اخرجه الحاكم وقال اسناد صحيح)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت جعفرؓ کو حبشہ بھیج دیا تھا جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضورؐ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا پھر فرمایا میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضورؐ نے فرمایا چار رکعت نماز پڑھ۔ پھر اسی طریقے سے بتائی جو اوپر گذرا۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بھی آیا ہے۔

لاغبار عليه وتعقبه الذهبي بان احمد بن داؤد كذبه الدارقطني كذا في المنهل وكذا قال غيره تبعا للحافظ لكن في النسخة التي بايدينا من المستدرك وقد صحت الرواية عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه جعفرًا ثم ذكر الحديث بسنده وقال في آخره هذا اسناد صحيح لاغبار عليه وهكذا قال الذهبي في اول الحديث وآخره ثم لايذهب عليه ان في هذا الحديث زيادة لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ايضا على الكلمات الاربع)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর (রাযিঃ)কে হাবশায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলেন এবং কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব, একটি সুসংবাদ শুনাইব, একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব? হযরত জাফর (রাযিঃ) বলিলেন, অবশ্যই দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, চার রাকাত নামায পড়। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বলিলেন। এই হাদীসে উক্ত চার কালেমার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম'ও পড়ার কথা আসিয়াছে। (হাকেম)

(۴) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَهَبُ لَكَ اَلَا اُعْطِيْكَ اَلَا اَمْنَحُكَ فَظَنَنْتُ اَنَّهٗ يُعْطِيْنِيْ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا لَمْ يُعْطِهٖ اَحَدًا مِّنْ قَبْلِيْ قَالَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں مجھ سے حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطیہ دوں، ایک چیز عطا کروں. وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی (اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں) پھر آپ نے چار رکعت نماز سکھائی جو اوپر گذری اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب التحیات کے لئے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو پھر التحیات پڑھنا.

(فذكر الحديث وفي آخره غير انك اذا جلست للتشهد قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد الحديث اخرجه الدارقطني في الافراد وابونعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب كذا في اتحاف السادة شرح الاحياء)

(৪) হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব, একটি জিনিস দান করিব? হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে করিলাম, দুনিয়ার এমন কোন জিনিস তিনি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। (এই কারণেই এই ধরনের শব্দসমূহ বখশিশ উপহার ইত্যাদি বারবার বলিতেছেন) অতঃপর তিনি আমাকে চার রাকাত নামায শিখাইলেন, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই কথাও বলিয়াছেন যে, যখন আত্তাহিয়্যাতু'র জন্য বস তখন প্রথমে এই তসবীহগুলি পড়িয়া নিবে পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। (শরহে এহয়া ঃ দারা কুতনী, আবু নুআইম)

(٥) قال الترمذی وقد روی ابن المبارك وغیر واحد من اهل العلم صلوٰة التسبیح وذكروا الفضل فیه حدثنا احمد بن عبدة نا ابو وهب سألت عبد الله بن المبارك عن الصلوٰة التی یسبح فیها قال یكبر ثم یقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالٰی جدك ولا اله غیرك ثم یقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم یتعوذ ویقرأ بسم الله الرحمٰن الرحیم وفاتحة الكتاب وسورة ثم یقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم یركع فیقولها عشرا ثم یرفع رأسه فیقولها عشرا ثم یسجد فیقولها عشرا ثم یرفع رأسه فیقولها عشرا ثم یسجد

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ پڑھنے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ شریف پڑھنے سے پہلے پندرہ دفعہ ان کلموں کو پڑھے پھر اَعُوْذُ اور بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر اَلْحَمْدُ شریف اور پھر کوئی سورت پڑھے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھے پھر رکوع میں دس مرتبہ پھر رکوع سے اٹھ کر، پھر دونوں سجدوں میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دس دس مرتبہ پڑھے یہ پچھتر پوری ہوگئی (لہٰذا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی) رکوع میں پہلے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ اور سجدہ میں پہلے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى پڑھے۔ پھر ان کلموں کو پڑھے (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی

الثَّانِيَةَ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا يُصَلِّيْ اَرْبَعَ اس طریقہ سے نقل کیا گیا ہے)
رَكَعَاتٍ عَلٰى هٰذَا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ تَسْبِيْحَةً فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ
اَبُوْ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ قَالَ يَبْدَأُ فِي الرُّكُوْعِ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِي السَّجْدَةِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلٰثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيْحَاتِ قَالَ
عَبْدُ الْعَزِيْزِ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اِنْ سَهَا فِيْهَا يُسَبِّحُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لَا اِنَّمَا هِيَ ثَلٰثُ مِائَةِ تَسْبِيْحَةٍ اه مختصرا قلت وهٰكذا رواه
الحاكم وقال رواته عن ابن المبارك كلهم ثقات ثبات ولا يتهم عبد الله
ان يعلّمه مالم يصح عنده سنده اه وقال الغزالى فى الاحياء بعد ماذكر
حديث ابن عباس المذكور وفى رواية اخرٰى انه يقول فى اوّل الصّلٰوة سبحانك
اللّٰهمّ ثم يسبّح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة والباقى
كما سبق عشرا عشرا ولا يسبّح بعد السّجود الاخير وهذا هو الاحسن وهو
اختيار ابن المبارك اه قال الزّبيدى فى الاتحاف ولفظ القوت هٰذه الرواية
احبّ الوجهين الىّ اه قال الزبيدى اى لا يسبّح فى الجلسة الاولٰى بين الرّكعتين
ولا فى جلسة التّشهّد شيئا كما فى القوت قال وكذلك روينا فى حديث عبد الله
بن جعفر بن ابى طالب ان النّبىّ صلى الله عليه وسلم علمه صلٰوة التسبيح فذكره
اه ثمّ قال الزّبيدى واما حديث عبد الله بن جعفر فاخرجه الدّارقطنى من
وجهين عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال فى احدهما عن معاوية و
اسمٰعيل بن عبد الله ابنى جعفر عن ابيهما وقال فى الاخرى عن عون بدل
اسمٰعيل عن ابيهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعطيك
فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف وهذه الرواية هى التى اشار اليها صاحب
القوت وهى الثانية عنده قال فيها يفتتح الصلٰوة فيكبر ثم يقول فذكر الكلمات
وزاد فيها الحوقلة ولم يذكر هذا السجدة الثانية عند القيام ان يقولها
قال وهو الذى اختاره ابن المبارك اه قال المنذرى فى الترغيب وروى البيهقى
من حديث ابى جناب الكلبى عن ابى الجوزاء عن ابن عمرو بن العاص فذكر
الحديث بالصفة التى رواها الترمذى عن ابن المبارك ثم قال وهذا يوافق
ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم عن

عمران بن مسلم عن ابی الجوزاء قال نزل علی عبد الله بن عمرو بن العاص
فذكر الحديث وخالفه فی رفعه الی النبی صلی الله علیه وسلم ولم یذکر
التسبیحات فی ابتداء القراءة انما ذکرها بعدها ثم ذکر جلسة الاستراحة
کما ذکرها سائر الرواة اھ قلت حدیث ابی الجناب مذکور فی السنن
علی هذا الطریق طریق ابن المبارك وما ذکر من کلام البیهقی لیس فی
السنن بهذا اللفظ فلعله ذکره فی الدعوات الکبیر وما فی السنن انه
ذکر اولا حدیث ابی جناب تعلیقا مرفوعا ثم قال قال ابوداؤد رواه روح
ابن المسیب وجعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالك النکری عن ابی الجوزاء
عن ابن عباس قوله وقال فی حدیث روح فقال حدیث النبی صلی الله علیه
وسلم اھ وظاهر ان الاختلاف فی السند فقط لا فی لفظ الحدیث وذکر
شارح الاقناع من فروع الشافعیة صلوة التسبیح واقتصر علی صفة
ابن المبارك فقط قال البجیرمی هذه روایة ابن مسعود والذی علیه مشائخنا
انه لا یسبح قبل القراءة بل بعدها خمسة عشر والعشرة فی جلسة الاستراحة
وهذه روایة ابن عباس اھ مختصرا وعلم منه ان طریق ابن المبارك مروی
عن ابن مسعود ایضا لکن لم اجد حدیث ابن مسعود فیما عندی من الکتب
بل المذکور فیها علی ما بسطه صاحب المنهل وشارح الاحیاء وغیرهما
ان حدیث صلوة التسبیح مروی عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله
والفضل ابنا العباس وابوهما عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو
بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابورافع مولی رسول الله صلی
الله علیه وسلم وعلی بن ابی طالب واخوه جعفر بن ابی طالب وابنه عبد الله
بن جعفر وام المؤمنین ام سلمة والانصاری غیر مسمی وقد قیل انه جابر
بن عبد الله قال له الزبیدی وبسط فی تخریج احادیثهم وعلم مما سبق
ان حدیث صلوة التسبیح مروی بطرق کثیرة وقد افرط ابن الجوزی ومن
تبعه فی ذکره فی الموضوعات ولذا تعقب علیه غیر واحد من ائمة الحدیث
کالحافظ ابن حجر والسیوطی والزرکشی قال ابن المدینی قد اساء ابن الجوزی
بذکره ایاه فی الموضوعات کذا فی اللآلی قال الحافظ وممن صححه اوحسنه
ابن منده والف فیه کتابا والاجری والخطیب وابوسعد السمعانی وابو

موسى المدينى وابو الحسن بن المفضل والمنذرى وابن الصلاح والنووى
فى تهذيب الاسماء والسبكى وآخرون كذا فى الاتحاف وفى المرقاة عن ابن
حجر صححه الحاكم وابن خزيمة وحسنه جماعة اه قلت وبسط السيوطى
فى اللآلى فى تحسينه وحكى عن ابى منصور الديلمى صلوٰة التسبيح اشهر الصلوٰة واصحها اسنادًا.

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) ও অন্যান্য বহু ওলামায়ে কেরাম হইতে এই নামাযের ফযীলত নকল করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে এই তরীকা বর্ণিত হইয়াছে ঃ ছানা পড়ার পর ১৫ বার এই কালেমাগুলি পড়িবে। অতঃপর আঊযুবিল্লাহ–বিসমিল্লাহ, আল–হামদু সূরা ও অন্য কোন সূরা মিলানোর পর রুকূতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকূতে ১০ বার পড়িবে। রুকূ হইতে উঠিয়া ১০ বার পড়িবে। দুই সেজদায় ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার মাঝখানে বসিয়া ১০ বার পড়িবে। এইভাবে ৭৫ বার হইয়া গেল। (কাজেই দ্বিতীয় সেজদার পর বসিয়া ১০ বার পড়ার প্রয়োজন রহিল না।) রুকূতে যাইয়া প্রথমে সোবহানা রাব্বিয়াল আজিম এবং সেজদায় যাইয়া প্রথমে সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িবে। উহার পর উক্ত কালেমাগুলি পড়িবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও এই নিয়মে বর্ণনা করা হইয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ১. সালাতুত–তসবীহ্ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ নামায। উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা ইহার অনুমান হইতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ স্নেহ–মহব্বত ও গুরুত্বের সহিত ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম, মোহাদ্দেসীনে কেরাম, ফোকাহায়ে কেরাম ও সূফীয়ায়ে কেরামগণ যুগে যুগে গুরুত্ব সহকারে ইহার উপর আমল করিয়া আসিতেছেন। হাদীসের ইমাম হযরত হাকেম (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইহাও একটি প্রমাণ যে, তাবে–তাবেয়ীনের জমানা হইতে আমাদের জমানা পর্যন্ত অনুসরণীয় বড় বড় হযরতগণ নিয়মিত এই নামায পড়িয়া আসিতেছেন এবং ইহার তালীম দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকও রহিয়াছেন। যিনি ইমাম বোখারী (রহঃ)–এর উস্তাদগণের উস্তাদ। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও আগে ছিলেন হযরত আবুল জাওযা (রহঃ)। যিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও ইহার উপর নিয়মিত আমল করিতেন। প্রতিদিন জোহর নামাযের আজানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মসজিদে যাইতেন আর জামাতের ওয়াক্ত

হওয়া পর্যন্ত ইহাকে পড়িয়া লইতেন। আবদুল আজীজ ইবনে আবী রাওয়াদ (রহঃ) ইনি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও উস্তাদ ছিলেন। বড় এবাদত-গুজার দুনিয়াত্যাগী ও মোত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাইতে চায় সে যেন অবশ্যই সালাতুত-তসবীহকে মজবুত করিয়া ধরে। আবু ওসমান হীরি (রহঃ) বড় দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি মসীবত ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য সালাতুত-তসবীহের মত ফলদায়ক আর কিছু দেখি নাই। আল্লামা তকী সুবকী (রহঃ) বলেন, এই নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কিছুসংখ্যক লোক ইহাকে স্বীকার করে না বলিয়া ধোকায় পড়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই নামাযের সওয়াবের কথা শুনিয়াও অবহেলা করে সে দ্বীনের ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শনকারী এবং নেক লোকদের আমল হইতে দূরে। তাহাকে পাকা লোক মনে করা চাই না। 'মেরকাত' কিতাবে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রত্যেক জুমার দিনে এই নামায পড়িতেন।

ফায়দা ঃ ২. কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসকে এইজন্য অস্বীকার করিয়াছেন যে, মাত্র চার রাকাত নামাযে এত বেশী সওয়াব হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ কবীরা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া। কিন্তু যেহেতু এই হাদীস বহু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে কাজেই অস্বীকার করাও অসম্ভব। অবশ্য অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের কারণে কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার শর্ত থাকিবে।

ফায়দা ঃ ৩. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে নামাযের দুইটি নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি হইল, নামাযে দাঁড়াইয়া আল-হামদু ও সূরা পড়ার পর ১৫ বার উক্ত তসবীহ পড়িবে। অতঃপর রুকূতে যাইয়া 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়ার পর ১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর ১০ বার তসবীহ পড়িবে। অতঃপর দুই সেজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়ার পর ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার মাঝখানে যখন বসিবে তখনও ১০ বার পড়িবে। যখন দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবে তখন আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিবে কিন্তু না দাঁড়াইয়া বসিয়া ১০ বার পড়িবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার না বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। দ্বিতীয় রাকাতের পর এমনিভাবে চতুর্থ রাকাতের পর তসবীহগুলিকে ১০ বার ১০ বার পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে।

দ্বিতীয় নিয়ম হইল, ছানা পড়ার পর আল-হামদু পড়ার পূর্বে ১৫ বার পড়িবে। অতঃপর আল-হামদু ও সূরা মিলানোর পর ১০ বার পড়িবে।

অতঃপর বাকী নামায পূর্বের নিয়মে পড়িবে। অবশ্য এই নিয়মে দ্বিতীয় সেজদার পর বসিতে হইবে না এবং আত্তাহিয়্যাতুর সহিত পড়িতে হইবে না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উত্তম হইল কখনও এই নিয়মে পড়া আবার কখনও ঐ নিয়মে পড়া।

ফায়দা ঃ ৪. যেহেতু এই নামায সাধারণভাবে প্রচলিত নয়, কাজেই এ সম্পর্কিত কিছু মাসায়েল লিখিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে ইহা আদায়কারীদের জন্য সহজ হয় ঃ

মাসআলা-১ ঃ এই নামাযের জন্য কুরআনের কোন সূরা নির্ধারিত নাই। যে কোন সূরা ইচ্ছা পড়া যায়। তবে কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা ছফ, সূরা জুমুআ, সূরা তাগাবুন এই সূরাগুলি হইতে যে কোন চার সূরা দ্বারা পড়িবে। কোন কোন হাদীসে বিশ আয়াত পরিমাণ পড়ার কথা আসিয়াছে। এইজন্য এমন সূরা পড়া চাই যেইগুলিতে বিশ আয়াতের কাছাকাছি থাকে। কেহ কেহ সূরা যিলযাল, আদিয়াত, তাকাছুর, ওয়াল আছর, কাফিরূন, নাছর, ইখলাছ এইগুলি হইতে যে কোন চারটি দ্বারা পড়িতে বলিয়াছেন।

মাসআলা-২ ঃ এই তসবীহগুলিকে মুখে কখনও গণনা করিবে না, কেননা ইহাতে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অঙ্গুলি বন্ধ করিয়া গণনা করা এবং হাতে তসবীহ লইয়া গণনা করা যদিও জায়েয, তবে মকরূহ। উত্তম হইল, অঙ্গুলিসমূহ যেভাবে নিজ নিজ স্থানে থাকে সেইভাবেই রাখিয়া এক এক তসবীহ পড়িয়া এক এক অঙ্গুলি ঐ স্থানেই একটু চাপাইতে থাকিবে।

মাসআলা-৩ ঃ যদি কোন জায়গায় তসবীহ পড়া ভুলিয়া যাওয়া হয়, তবে উহা পরবর্তী রোকনের মধ্যে আদায় করিয়া নিবে। তবে ভুলিয়া যাওয়া তাসবীহের কাজা রুকূ হইতে উঠিয়া বা দুই সেজদার মাঝখানে আদায় করিবে না। এমনিভাবে প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর বসিলে ঐ সময় ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ আদায় করিবে না। বরং শুধু উহারই তসবীহ পড়িবে। ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ উহাদের পরবর্তী রোকনে পড়িবে। যেমন রুকূতে পড়া ভুলিয়া গেলে প্রথম সেজদায় পড়িয়া লইবে। এমনিভাবে প্রথহ সেজদায় ভুলিয়া যাওয়া তাসবীহ দ্বিতীয় সেজদায় পড়িবে। আর দ্বিতীয় সেজদায় ভুলিয়া গেলে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইবে। তারপরও যদি থাকিয়া যায় তবে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর আগে পড়িয়া লইবে।

মাসআলা-৪ ঃ যদি কোন কারণে সাহু সেজদা করিতে হয় তবে উহাতে এই সমস্ত তসবীহ না পড়া চাই। কেননা, ইহার নির্ধারিত পরিমাণ

তিনশতবার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাঁ, যদি কোন কারণে এই সংখ্যা পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে সাহু সেজদার মধ্যে পড়িয়া নিবে।

মাসআলা-৫ ঃ কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, আত্তাহিয়্যাতুর পর সালামের আগে এই দোয়া পড়িবে ঃ (رواه ابو نعيم فى الحلية من حديث ابن عباس و لفظه اذا فرغت قلت بعد التشهد قبل التسليم اللهم الخ كذا فى الاتحاف و قال اورده الطبر انى ايضا من حديث العباس و فى سنده متروك اه قلت زاد فى المرقاة فى اخر الدعاء بعض الالفاظ بعد قوله خالق النورزد تها تكميلا للفائدة)

দোয়াটি এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ
الْهُدٰی وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ وَ
مُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ
اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْیَةِ
وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ
وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَخَافَكَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِیْ
بِهَا عَنْ مَّعَاصِیْكَ وَحَتّٰی اَعْمَلَ
بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ
رِضَاكَ وَحَتّٰی اُنَاصِحَكَ فِی
التَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰی
اُخْلِصَ لَكَ النَّصِیْحَةَ حُبًّا لَّكَ
وَحَتّٰی اَتَوَكَّلَ عَلَیْكَ فِی الْاُمُوْرِ
حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ
رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بِرَحْمَتِكَ
یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

اے اللہ میں آپ سے ہدایت والوں کی
سی توفیق مانگتا ہوں اور یقین والوں کے
عمل اور توبہ والوں کا خلوص مانگتا ہوں
اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے
والوں کی سی کوشش (یا احتیاط) مانگتا ہوں
اور رغبت والوں کی سی طلب اور پرہیزگاروں
کی سی عبادت اور علماء کی سی معرفت تاکہ
میں آپ سے ڈرنے لگوں اے اللہ ایسا
ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے
اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے
عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی
رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں اور
تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے
لگوں اور تاکہ سچا اخلاص آپ کی محبت
کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے
ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ پر توکل کرنے
لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے !

تیری ذات پاک ہے اے ہمارے رَبّ ہمیں کامل نُور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْن اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما۔

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি হেদায়েতপ্রাপ্তদের তাওফীক চাহিতেছি এবং একীনওয়ালাদের আমল ও তওবাকারীদের এখলাস চাহিতেছি। আর ছবরকারীদের মজবুতী ও ভয় করনেওয়ালাদের ন্যায় চেষ্টা (অথবা সাবধানতা) চাহিতেছি। এবং অনুরাগীদের মত উৎসাহ, পরহেজগার লোকদের মত এবাদত, ওলামায়ে কেরামের মত আপনার মারেফত চাহিতেছি। যাহাতে আমি আপনাকে ভয় করিতে থাকি। হে আল্লাহ! এমন ভয় যাহা আমাকে আপনার নাফরমানী হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং যাহাতে আমি আপনার হুকুম মানিয়া এমনভাবে আমল করিতে থাকি যাহার ফলে আপনার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দীর উপযুক্ত হইয়া যাই। এবং যাহাতে আপনার ভয়ে খাঁটি তওবা করিতে থাকি। আর যাহাতে আপনার মহব্বতের কারণে সত্যিকার এখলাস প্রকাশ করিতে পারি। আর আপনার প্রতি ভাল ধারণার কারণে আপনার উপর তাওয়াক্কুল করিতে থাকি। হে নূর পয়দাকরণেওয়ালা! আপনার সত্তা পবিত্র। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান করুন। আপনি আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আরহামুর রাহেমীন! দয়া করিয়া আপনি আমাদের দরখাস্ত কবুল করিয়া নিন। (শরহে এহয়া ঃ তাবারানী)

মাসআলা-৬ ঃ এই নামায মকরূহ ওয়াক্তগুলি ছাড়া দিনে-রাত্রে যে কোন সময় পড়া যায়। অবশ্য সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর পড়া বেশী ভাল। অতঃপর দিনে যে কোন সময়ে তারপর রাত্রিতে পড়া উত্তম।

মাসআলা-৭ ঃ কোন কোন হাদীসে কালেমা সুওমের সহিত লা-হাওলাও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন উপরে ৩নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে যদি কখনও কখনও ইহাকে যোগ করিয়া লওয়া হয় তবে উত্তম।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

যাকারিয়া কান্ধলভী

জুমার রাত্রি, ২৬শে শাওয়াল ঃ ১৩৫৮ হিঃ

সূচীপত্র
হেকায়াতে সাহাবা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও দারিদ্রতার বর্ণনা

চতুর্থ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর তাকওয়া ও পরহেজগারীর বর্ণনা

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং উহাতে খুশু–খজু

ষষ্ঠ অধ্যায়
আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

সপ্তম অধ্যায়
বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ

অষ্টম অধ্যায়

এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা

নবম অধ্যায়

হুযূর (সাঃ)এর আনুগত্য ও হুকুম তামিল করা এবং হুযূর (সাঃ)এর মনোভাব কি তাহা লক্ষ্য করা

দশম অধ্যায়

মহিলাদের দ্বীনি জয্বা

জ্ঞাতব্য বিষয়

হুযূর (সঃ)এর বিবিগণ ও সন্তানগণ

হুযূর (সঃ)এর সন্তান–সন্ততি

একাদশ অধ্যায়

বাচ্চাদের দ্বীনি জয্‌বা

দ্বাদশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)এর প্রতি ভালবাসার নমুনা

পরিশিষ্ট

॥॥॥

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والہ وصحبہ واتباعہ الحماۃ للدین القویم

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার এক মকবূল বান্দা, আমার মুরুব্বী ও আমার উপর এহসানকারী (হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) হিজরী ১৩৫৩ সালে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর কিছু কাহিনী বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্ক সাহাবীগণ ও মহিলা সাহাবিয়াগণের দ্বীনদারী ও দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা উর্দূ ভাষায় লিখিবার জন্য আমাকে হুকুম করেন। যে সমস্ত লোক কিসসা-কাহিনীর প্রতি আগ্রহী তাহারা যেন বেহুদা মিথ্যা কাহিনীর পরিবর্তে এই সমস্ত সত্য ঘটনা পড়িতে পারে, যাহাতে তাহাদের দ্বীন ও ঈমানের তরক্কী হয়। ঘরের মহিলাগণও রাত্রে বাচ্চাদেরকে মিথ্যা কাহিনী না শুনাইয়া এইগুলি শুনাইতে পারে। যাহাতে বাচ্চাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের প্রতি শওক ও জযবা পয়দা হয়। এই আদেশ পালন করা আমার জন্য খুবই জরুরী ছিল। কেননা, আমি তাঁহার এহসানসমূহে ডুবিয়া রহিয়াছি। এ ছাড়া আল্লাহওয়ালাদের সন্তুষ্টি দো জাহানের কামিয়াবীর ওসীলা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার সম্বলহীনতার কারণে এই কাজ তাঁহার মর্জি মোতাবেক আঞ্জাম দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি নাই। এইজন্য চার বৎসর পর্যন্ত বারবার কেবল তাঁহার হুকুম শুনিতে থাকি আর আমার অযোগ্যতার কারণে লজ্জিত হইতে থাকি। এই সময় হিজরী ১৩৫৭ সালের

সফর মাসে একটি অসুখের কারণে আমাকে দেমাগী কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন আমার খেয়াল হইল, এই অবসর দিনগুলিকে এই বরকতপূর্ণ কাজে ব্যয় করিয়া দেই। যদি আমার লেখা পৃষ্ঠাগুলি তাঁহার পছন্দ না হয়, তবুও আমার এই অবসর সময়টুকু তো উত্তম ও বরকতপূর্ণ কাজে কাটিয়াই যাইবে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাদের ঘটনাবলী ও জীবন বৃত্তান্ত এমন একটি বিষয় যাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া জানা এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় হাবীব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণের উপযুক্ত। ইহা ছাড়া আল্লাহওয়ালাদের আলোচনা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ঘটনা ও কাহিনী হইল আল্লাহ তায়ালার একটি বাহিনী। ইহা দ্বারা মুরীদগণের অন্তর শক্তিশালী হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কোন দলীলও আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَآءَكَ فِيْ
هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ ঃ আর আমি পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলী হইতে এইসব ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি ; যাহা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করি। (ইহা একটি উপকার, দ্বিতীয় উপকার হইল,) এই সমস্ত ঘটনা বলিতে এমন এমন বিষয়বস্তু আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকে যাহা সত্য ও বাস্তব এবং মুসলমানদের জন্য বিরাট উপদেশ এবং (নেক আমল করার জন্য) স্মারক বাণী। (বয়ানুল কুরআন)

একটি জরুরী বিষয়—ইহাও অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ, বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী, দ্বীনি মাসায়েলের কিতাবসমূহ কিংবা নির্ভরযোগ্য লোকদের ওয়াজ–নসীহত একবার পড়িয়াই সব সময়ের জন্য উহা বাদ দিয়া দেওয়ার বিষয় নয়। বরং নিজের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে বার বার পড়িতে থাকা উচিত। আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ) এক বুযুর্গ ছিলেন, তিনি বলেন, আমি এক ওয়াজকারীর মজলিসে হাজির হইলাম। তাঁহার ওয়াজ আমার দিলে আছর করিল ; কিন্তু ওয়াজ শেষ হইবার পরই সেই আছর

খতম হইয়া গেল। দ্বিতীয় বার তাঁহার মজলিসে হাজির হইলাম। এইবার ওয়াজ শেষ হইবার পর বাড়ী যাওয়ার পথেও উহার আছর বাকী রহিল। পুনরায় তৃতীয়বার যখন হাজির হইলাম, তখন উহার আছর বাড়ী পৌঁছিবার পরও বাকী রহিল। ঘরে ঢুকিয়া আমি আল্লাহর নাফরমানীর যাবতীয় জিনিসপত্র সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং আল্লাহর পথ গ্রহণ করিয়া লইলাম। দ্বীনি কিতাবাদির অবস্থাও তদ্রূপ ; ভাসাভাসা একবার মাত্র পড়িয়া নিলে আছর কম হয়। এইজন্য নিয়মিত মাঝে মাঝে এইসব কিতাব পড়িতে থাকা উচিত। পাঠকদের সুবিধা এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য আমি কিতাবটিকে বারটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে ভাগ করিয়াছি ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ–কষ্ট ভোগ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহকে ভয় করা যাহা সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও গরিবানা জিন্দেগীর নমুনা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া ও পরহেজগারীর অবস্থা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার এহতেমাম।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ হাম্‌দরদী, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।

সপ্তম অধ্যায় ঃ বাহাদুরী ও বীরত্ব, হিম্মত ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততা ও জ্ঞানচর্চায় মনোযোগের নমুনা।

নবম অধ্যায় ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালন।

দশম অধ্যায় ঃ স্ত্রীলোকদের দ্বীনি জযবা ও বীরত্ব এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তান–সন্ততির বর্ণনা।

একাদশ অধ্যায় ঃ বাচ্চাদের দ্বীনি জযবা এবং শৈশবে দ্বীনের এহতেমাম।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের নমুনা।

পরিশিষ্ট ঃ সাহাবায়ে কেরামের হক ও অধিকার এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ফাযায়েল।

হেকায়াতে সাহাবা

প্রথম অধ্যায়

দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দ্বীন-প্রচারের জন্য যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, উহা সহ্য করা তো দূরের কথা ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করাও আমাদের মত নালায়েকদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। ইতিহাসের কিতাবসমূহ এইসব ঘটনার বিবরণে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করা তো স্বতন্ত্র কথা সেইসব ঘটনা জানার জন্যও আমরা কষ্ট স্বীকার করি না। এই অধ্যায়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে। সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি ঘটনা দ্বারা শুরু করিতেছি। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা বরকতের ওসীলা হইয়া থাকে।

(১) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের ঘটনা

নবুওত পাওয়ার পর নয় বৎসর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোকাররমায় তবলীগ করিতে থাকেন এবং কওমের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন আর কিছু সংখ্যক লোক যাহারা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করিতেছিলেন, তাহারা ছাড়া মক্কার অধিকাংশ কাফের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দিতেছিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত এবং যত রকম নির্যাতন সম্ভব উহা করিতে ত্রুটি করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব সেই সকল হৃদয়বান লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করিতেন। নবুওয়তের দশম বৎসর যখন

আবূ তালেবেরও ইন্তেকাল হইয়া গেল, তখন কাফেরদের জন্য সর্বদিক হইতে আরও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সুযোগ মিলিয়া গেল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে তায়েফ তশরীফ লইয়া গেলেন যে, সেখানে ছকীফ গোত্রের লোকসংখ্যা অনেক ; যদি এই গোত্র মুসলমান হইয়া যায়, তবে মুসলমানরা এই সকল নির্যাতন হইতে নাজাত পাইবে এবং দ্বীন–প্রচারের বুনিয়াদ কায়েম হইয়া যাইবে। সেখানে পৌছিয়া গোত্রের শীর্ষস্থানীয় তিনজন নেতার সহিত কথা বলিলেন, তাহাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের অর্থাৎ নিজের সাহায্যের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু তাহারা দ্বীনের কথা কবূল করা অথবা কমপক্ষে আরবের প্রসিদ্ধ মেহমানদারীর প্রতি খেয়াল করিয়া একজন নবাগত মেহমানের খাতির–যত্ন করার পরিবর্তে পরিস্কার জবাব দিয়া দিল এবং অত্যন্ত রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার করিল। তাহারা ইহাও সহ্য করিল না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করিবেন। যাহাদেরকে সর্দার ও ভদ্র মনে করিয়া কথা বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবত তাহারা সম্ভ্রান্ত হইবে এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ওহ–হো, তোমাকেই আল্লাহ নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও পান নাই, যাহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইতেন? তৃতীয় জন বলিল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিব না, কেননা, সত্যই যদি তুমি নবী হইয়া থাক যেমন তুমি দাবী করিতেছ তবে তোমার কথা অমান্য করিলে বিপদ হইবে। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আমি এইরূপ লোকের সঙ্গে কথা বলিতে চাই না।

অতঃপর তাহাদের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য লোকের সহিত কথা বলার ইচ্ছা করিলেন ; কারণ তিনি ছিলেন ধৈর্য ও হিম্মতের পাহাড়। কিন্তু কেহই তাঁহার দাওয়াত কবূল করিল না। বরং কবুল করার পরিবর্তে তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়া দিল, আমাদের শহর ছাড়িয়া এক্ষুণি বাহির হইয়া যাও এবং যেখানে তোমার চাহিদা হয়, সেইখানে চলিয়া যাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা শহরের ছেলেদেরকে তাঁহার পিছনে লেলাইয়া দিল। তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ঠাট্টা–বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তালি

বাজাইতে লাগিল, পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্ত প্রবাহিত হইবার কারণে তাঁহার উভয় জুতা রঞ্জিত হইয়া গেল। এই অবস্থাতেই তিনি ফিরিয়া চলিলেন। পথে এক জায়গায় আসিয়া যখন ঐ দুষ্টদের হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ
وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ
تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَّتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلٰى
عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِىْ وَلٰكِنْ
عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ
وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ
اَوْ يَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى
حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِكَ كَذَا فِىْ سِيْرَةِ ابْنِ هِشَام
قلت واختلفت الروايات فى
الفاظ الدعاء كما فى قرة العيون

"اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی
کمزوری اور بیکسی کی اور لوگوں میں ذلّت اور
رسوائی کی۔ اے اَرحَمَ الرّاحِمِین تو ہی ضُعفاء کا
رَبّ ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے
کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانہ کے
جو مجھے دیکھ کر ترش رُو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا
ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دیدیا۔
اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے
کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت
مجھے کافی ہے میں تیرے چہرہ کے اُس نور
کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو
گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے
کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے
پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصّہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو
تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے
جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت
ہے نہ قوت۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি আমার কমজোরী ও অসহায়ত্ব ও মানুষের মাঝে অপদস্থতার অভিযোগ করিতেছি। ইয়া আরহামার–রাহেমীন! তুমিই দুর্বলদের রব এবং তুমিই আমার রব। আমাকে তুমি কাহার সোপর্দ করিতেছ, কোন্ অপরিচিত পর মানুষের সোপর্দ করিতেছ, যে আমাকে দেখিয়া বিরক্ত হয়; মুখ বিকৃত করে। নাকি আমাকে এমন কোন দুশমনের সোপর্দ করিতেছ, যাহাকে আমার উপর

ক্ষমতা দিয়াছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না থাক, তবে আমি কাহারও পরওয়া করি না। তোমার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার চেহারার ঐ নূরের ওসীলায়, যাহা দ্বারা সকল অন্ধকার আলোকিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজ দুরুস্ত হইয়া যায়—এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার আক্রোশ হয় অথবা তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও। তোমার অসন্তুষ্টি দূর করা আমার জন্য জরুরী যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও। তুমি ছাড়া কোন শক্তি নাই, কোন ক্ষমতা নাই। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

সমস্ত জগতের বাদশাহীর অনন্ত অধিকারী আল্লাহ তায়ালার গজব ও কহরে জোশ আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হইলেন এবং সালাম দিয়া আরজ করিলেন, কওমের সহিত আপনার কথাবার্তা ও তাহাদের জওয়াব আল্লাহ তায়ালা শুনিয়াছেন। পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত এক ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাকে হুকুম করুন। অতঃপর সেই ফেরেশতা সালাম দিয়া আরজ করিল, আপনি যাহা এরশাদ করিবেন আমি তাহাই পালন করিব। যদি বলেন, দুই দিকের পাহাড়গুলিকে মিলাইয়া দিব যাহাতে ইহারা মাঝখানে নিষ্পেষিত হইয়া যায় অথবা যেরূপ শাস্তি দেওয়ার আপনি আদেশ করিবেন তাহা পালন করিব। কিন্তু দয়ালু নবী জওয়াব দিলেন, আল্লাহর কাছে আমি এই আশা রাখি যে, যদি ইহারা মুসলমান নাও হয় তবু ইহাদের সন্তানদের মধ্যে এমন লোক পয়দা হইবে যাহারা আল্লাহর এবাদত করিবে।

ফায়দা ঃ ইহা হইল সেই দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র, যাঁহার নামে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া থাকি। কেহ সামান্য গালি দিলে, সামান্য কষ্ট পৌছাইলে আমরা এমন উত্তেজিত হইয়া পড়ি যে, সারাজীবনেও উহার প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয় না ; জুলুমের উপর জুলুম করিতে থাকি। ইহার পরও উম্মতে-মুহাম্মদী ও নবীর অনুসারী হইবার দাবী করি। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কঠিন অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন বদ-দোয়া করিলেন না এবং কোন প্রতিশোধও নিলেন না।

(২) হযরত আনাস ইবনে নযর (রাযিঃ)-এর শাহাদত

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাযিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই। এইজন্য তাহার মনে খুবই দুঃখ

ছিল। তিনি নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'ইসলামের সর্বপ্রথম আজীমুশ্বান যুদ্ধ হইয়া গেল, আর তুমি উহাতে শরীক হইতে পারিলে না!' তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, আবার যদি কোন যুদ্ধ হয় তবে মনের বাসনা পূরণ করিব। ঘটনাক্রমে উহুদের যুদ্ধ সামনে আসিয়া গেল। উহাতে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সহিত অংশগ্রহণ করিলেন। উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে তো মুসলমানদের বিজয় হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে একটি ভুলের কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটিল। ভুলটি এই ছিল যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে একটি বিশেষ জায়গায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়–পরাজয় যাহাই হউক না কেন, আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা এই জায়গা ত্যাগ করিবে না। কেননা ঐ দিক হইতে দুশমনের হামলার আশঙ্কা ছিল। যখন প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় হইল এবং কাফেররা পলায়ন করিতে লাগিল তখন তাহারা উক্ত স্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং মনে করিলেন যে, এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই পলায়নরত কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করা হউক এবং গনীমতের মাল হাসিল করা হউক। দলের সর্দার তাঁহাদিগকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া এই জায়গা ত্যাগ করিতে নিষেধও করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ তো শুধু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য ছিল। অতএব তাঁহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের ময়দানে গিয়া পৌঁছিলেন। অপরদিকে পলায়নরত কাফেররা এই স্থান খালি দেখিয়া এ দিক হইতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অতর্কিত ও অপ্রস্তুত আক্রমণে তাহারা পরাজয় বরণ করেন। তাঁহারা উভয় দিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীর ভিতরে পড়িয়া যান। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ পেরেশান হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) দেখিলেন, সম্মুখ দিক হইতে এক সাহাবী হযরত সাআদ বিন মুআয (রাযিঃ) আসিতেছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে সাআদ! কোথায় যাইতেছ? আল্লাহর কসম! উহুদ পাহাড় হইতে জান্নাতের খোশবূ আসিতেছে। এই বলিয়া তিনি উন্মুক্ত তরবারী হাতে কাফেরদের ভীড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিলেন না। শাহাদতের পর দেখা গেল দুশমনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁহার দেহ চালুনীর মত ক্ষত–বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশী আঘাত ছিল। তাঁহার বোন অঙ্গুলীর গিরা দেখিয়া তাঁহাকে

চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ফায়দা ঃ যাঁহারা এখলাস ও সত্যিকার আগ্রহের সহিত আল্লাহর কাজে লাগিয়া যান তাঁহারা দুনিয়াতে জান্নাতের মজা পাইয়া থাকেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) জীবদ্দশায়ই জান্নাতের খোশবূ পাইতেছিলেন। যদি মানুষের মধ্যে এখলাস আসিয়া যায় তবে দুনিয়াতেও তাঁহারা জান্নাতের মজা পাইতে থাকে। আমি হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)এর একজন নির্ভরযোগ্য ও মোখলেছ খাদেমের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'জান্নাতের মজা পাইতেছি।' ফাযায়েলে রমযানের মধ্যে আমি এই ঘটনা লিখিয়াছি।

(৩) হুদাইবিয়ার সন্ধি

হযরত আবূ জান্দাল ও হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হিজরী ষষ্ঠ সনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করিবার এরাদায় মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। মক্কার কাফেররা এই সংবাদ জানিয়া ইহাকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করিল। তাই তাহারা ইহাতে বাধা দিল। ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে থামিতে হইল। জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সঙ্গে ছিলেন। যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন কুরবান করিয়া দেওয়াকে গৌরব মনে করিতেন। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের খাতিরে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রস্তুতি ও বাহাদুরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের এত বেশী খাতির করিলেন যে, তাহাদের সকল শর্তই মানিয়া লইলেন। এইরূপ অপমানজনক সন্ধি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর নিকট অসহনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহারা তো ছিলেন জীবন উৎসর্গকারী ও একান্ত বাধ্যগত, কাজেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সম্মুখে তাহাদের করার কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মত বাহাদুর ব্যক্তিকেও দমিয়া যাইতে হইল। সন্ধির মধ্যে যে সকল শর্ত স্থির হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, কাফেরদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহাকে মক্কায় ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে খোদা না করুন মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম ত্যাগ

করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। সন্ধিপত্র এখনও পূর্ণ লেখা হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত আবু জান্দাল (রাযিঃ) যিনি একজন সাহাবী, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি বিভিন্ন রকম নির্যাতন সহ্য করিতেছিলেন, হাত পা শিকলে বাধা অবস্থায় কোন রকমে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, হয়ত তাহাদের আশ্রয়ে যাইয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবেন। তাহার পিতা সোহাইল যিনি কাফেরদের পক্ষ হইতে এই সন্ধিপত্রের উকিল ছিলেন এবং পরে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে চড় মারিলেন এবং তাহাকে ফেরত লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এখনও তো সন্ধিপত্র পূর্ণরূপে লিখিতও হয় নাই, সুতরাং এখনই উহার পাবন্দী করা জরুরী হইবে কেন? কিন্তু তাহারা ইহাতে অনড় থাকিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন লোক আমাকে ভিক্ষাই দিয়া দাও। কিন্তু তাহারা জিদ ধরিয়া বসিল এবং কিছুতেই মানিল না। হযরত আবূ জান্দাল (রাযিঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চস্বরে ফরিয়াদও করিলেন যে, আমি মুসলমান হইয়া কি নিদারুণ দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি ; এখন আমাকে আবার ফেরত পাঠানো হইতেছে! এই সময় মুসলমানদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়াছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক তাহাকে ফেরত যাইতে হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্য ধারণের নসীহত করিয়া বলিলেন, অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন।

সন্ধিপত্র পূর্ণ হইবার পর অপর এক সাহাবী হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)ও মুসলমান হইয়া মদীনায় গিয়া পৌছিলেন। কাফেরগণ তাঁহাকে ফেরত আনিবার জন্য দুইজন লোক পাঠাইল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা মুতাবিক তাহাকে ফেরৎ দিলেন। আবু বাছীর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাকে আবার কাফেরদের কবলে পাঠাইতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া বলিলেন, ইনশাআল্লাহ, অতি সত্বর তোমাদের জন্য রাস্তা খুলিয়া যাইবে।

হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) দুই কাফেরের সহিত মক্কায় ফিরিয়া

চলিলেন। পথে দুই কাফের দ্বয়ের একজনকে বলিলেন, বন্ধু তোমার তরবারীখানা তো বড়ই চমৎকার মনে হইতেছে! অহংকারী লোক সামান্য কথাতেই ফুলিয়া উঠে। সে তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তরবারী বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, হাঁ, ইহা আমি বহু মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সে তরবারীখানা তাঁহার হাতে দিল। তিনি তরবারী হাতে লইয়া তাহারই উপর উহা পরীক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গী ইহা দেখিয়া ভাবিল, একজনকে তো শেষ করিয়াছে এইবার আমার পালা। সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মদীনায় আসিল এবং হুযূর (সাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল যে, আমার সাথী মারা পড়িয়াছে, এইবার আমার পালা। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফেরত পাঠাইয়া আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত আমার কোন অঙ্গীকার নাই যে, উহা আমাকে পালন করিতে হইবে। ইহারা আমাকে আমার দ্বীন হইতে ফিরাইতে চাহিয়াছে, তাই আমি এইরূপ করিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এ তো দেখিতেছি যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে, হায় যদি এই ব্যক্তির কোন সাহায্যকারী হইত! হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) এই কথার দ্বারা বুঝিয়া গেলেন যে, এখনও যদি কেহ আমাকে নিতে আসে তবে আমাকে আবারও ফেরত পাঠানো হইবে। তাই তিনি মদীনা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলের এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মক্কাবাসী এই ঘটনা জানিতে পারিল। হযরত আবূ জান্দাল (রাযিঃ) যাহার ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিও গোপনে সেখানে পৌঁছিয়া গেলেন। এইভাবে যে কেহ মুসলমান হইত, সে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইত। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহারা একটি ছোটখাট দলে পরিণত হইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে না আছে খানাপিনার কোন ব্যবস্থা, না আছে কোন বাগ-বাগিচা, না আছে কোন বসতি। এমতাবস্থায় তাঁহাদের উপর দিয়া যে কি কঠিন অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

কিন্তু যে সমস্ত জালেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই পথে তাহাদের যে সকল বাণিজ্যিক কাফেলা যাতায়াত করিত তাহাদের সহিত মোকাবেলা ও লড়াই করিতেন। পরিশেষে মক্কার কাফেরগণ কোন উপায় না দেখিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মহান আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়া অত্যন্ত মিনতি সহকারে লোক পাঠাইয়া এই

প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন এই উচ্ছৃঙ্খল দলটিকে নিজের নিকট ডাকিয়া নিয়া যান। যাহাতে উহারাও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং আমাদের জন্যও যাতায়াতের রাস্তা খুলিয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিপত্র যখন তাহাদের নিকট পৌঁছিল তখন হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হুযূরের পত্রখানি তাঁহার হাতে ছিল এমতাবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করিলেন রাযিয়াল্লাহু আনহু। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ মানুষ যদি তাহার সত্য দ্বীনের উপর মজবুত হয় তবে যত বড় শক্তিই হউক তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইতে পারে না। মুসলমান যদি সত্যিকার মুসলমান হয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন বলিয়া ওয়াদা রহিয়াছে।

৪) হযরত বিলাল হাবশী (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতন ভোগ

হযরত বিলাল হাবশী (রাযিঃ) একজন বিখ্যাত সাহাবী। যিনি মসজিদে নববীর স্থায়ী মুআজ্জিন ছিলেন। শুরুতে তিনি একজন কাফেরের গোলাম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁহাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হইত। উমাইয়া ইবনে খালফ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। সে তাহাকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দুপুরের সময় উত্তপ্ত বালুর উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া একটি ভারি পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিত। যাহাতে তিনি নড়াচড়া করিতে না পারেন। আর বলিত যে, হয় এই অবস্থায় মরিবে, আর বাঁচিতে চাহিলে ইসলাম ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু হযরত বিলাল (রাযিঃ) এই অবস্থাতেও 'আহাদ আহাদ' বলিতেন অর্থাৎ আমার মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। রাত্রে শিকলে বাঁধিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত এবং পরদিন উত্তপ্ত জমিনের উপর শোয়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে আরও বেশী ক্ষত-বিক্ষত করা হইত। যেন তিনি অতিষ্ঠ হইয়া ইসলাম ত্যাগ করেন, নতুবা ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নির্যাতনকারীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িত। কখনও আবূ জাহল কখনও উমাইয়া ইবনে খালফ কখনও বা অন্য কেহ পালাক্রমে শাস্তি দিত। প্রত্যেকে শাস্তি দিতে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যয় করিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন।

ফায়দা ঃ যেহেতু আরবের মূর্তিপূজকগণ নিজেদের মূর্তিগুলিকেও মাবুদ বা উপাস্য বলিয়া মনে করিত, তাই উহার মুকাবিলায় ইসলামের

শিক্ষা ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের। এই কারণেই হযরত বিলাল (রাযিঃ)এর মুখে শুধু একত্ববাদেরই যিকির ছিল। ইহা প্রেম ও ভালবাসার বিষয়। আমরা যেখানে মিথ্যা মহব্বতের বেলায় দেখিতে পাই যে, যাহার সহিত মহব্বত হইয়া যায় তাহার নাম উচ্চারণ করিতে মজা লাগে। অনর্থক উহাকে বারবার উচ্চারণ করা হয়। সেখানে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালবাসার ব্যাপারে আর কি বলিব, যাহা দ্বীন দুনিয়া উভয় স্থানে কাজে আসিবে। এই কারণেই যখন হযরত বিলাল (রাযিঃ)কে সর্বপ্রকারে নির্যাতন করা হইত, কঠিন হইতে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত, মক্কার বালকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত আর তাহারা তাহাকে অলিতে গলিতে ঘুরাইতে থাকিত তখন তাঁহার জবানে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' জপ উচ্চারিত হইতে থাকিত।

ইহারই প্রতিদানস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তিনি মুআজ্জিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মদীনায় ও সফরে সর্বাবস্থায় আজান দেওয়ার দায়িত্ব তাহাকে দেওয়া হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মদীনা শরীফে বসবাস করা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান শূন্য দেখা তাহার জন্য কষ্টকর হইয়া গেল। এইজন্য তিনি অবশিষ্ট জীবন জেহাদে কাটাইয়া দেওয়ার মনস্থ করিলেন। সুতরাং জেহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি চলিয়া গেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি আর মদীনা মোনাওয়ারায় ফিরিয়া আসেন নাই। একদিন তিনি স্বপ্নযোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, বিলাল! ইহা কেমন জুলুমের কথা যে, আমার নিকট একেবারেই আসিতেছ না। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় হাজির হইলেন। হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাযিঃ) তাহাকে আযান দেওয়ার অনুরোধ করিলেন। আদরের দুলালদের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। আযান দিতে আরম্ভ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার আযানের আওয়াজ শুনিবামাত্র সমগ্র মদীনায় শোকের রোল পড়িয়া গেল। মহিলাগণ পর্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে হিজরী বিশ সনে দামেশ্‌কে তাঁহার ইন্তেকাল হয়। (উসদুল-গাবাহ)

(৫) হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ও বড় আলেম হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি এমন এলেম হাসিল করিয়াছিলেন যাহা অন্য কেহ হাসিল করিতে অক্ষম কিন্তু তিনি উহাকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)এর নিকট যখন সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সংবাদ পৌছিল তখন তিনি তাহার ভাইকে অবস্থা জানার জন্য এই বলিয়া মক্কা পাঠাইলেন যে, যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমার নিকট ওহী ও আসমানের সংবাদ আসে, তাহার ব্যাপারে সকল তথ্য অবগত হইবে এবং তাহার কথাগুলি গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া শুনিবে। তাহার ভাই মক্কা আগমন করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং ভাইয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, আমি তাহাকে সদাচার ও সচ্চরিত্রের আদেশ করিতে দেখিয়াছি। আর আমি তাহার নিকট এমন কালাম শুনিয়াছি যাহা কোন কবিতাও নয় কোন জ্যোতিষীর কথাও নয়।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) ভাইয়ের এই সংক্ষিপ্ত কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি নিজেই সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং মক্কায় পৌছিয়া সোজা মসজিদে হারামে উপস্থিত হইলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতেন না। কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করাও সঙ্গত মনে করিলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হযরত আলী (রাযিঃ) দেখিলেন, একজন বিদেশী মুসাফির রহিয়াছে। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কেননা, মুসাফির, গরীব ও বিদেশী লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া দেওয়া এই সকল বুযুর্গের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং তাহার মেহমানদারী করিলেন। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন মনে করিলেন না যে, তুমি কে? আর কেন আসিয়াছ? মুসাফির নিজেও কোন কিছু প্রকাশ করিলেন না। পরদিন সকালে তিনি আবার হারাম শরীফে আসিলেন। সারাদিন একই অবস্থায় কাটিল, নিজেও কোন খোঁজ পাইলেন না এবং কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কাফেরদের শত্রুতার বিষয় খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং

তাঁহার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দেওয়া হইত। তিনি ভাবিলেন, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক তথ্য তো পাওয়া যাইবেই না বরং উল্টা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অযথা নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়ও হযরত আলী (রাযিঃ) ভাবিলেন যে, বিদেশী মুসাফির যে প্রয়োজনে আসিয়াছিল সম্ভবতঃ উহা পূরা হয় নাই। সুতরাং আজও তিনি তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং রাত্রে তাহার খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই রাত্রেও তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হইল না। তৃতীয় রাত্রেও আবার সেই একই অবস্থা হইল। এইবার হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি কাজে আসিয়াছ?, তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? হযরত আবূ যর (রাযিঃ) প্রথমে হযরত আলী (রাযিঃ)কে সত্য বলিবার শপথ ও অঙ্গীকার করাইলেন তারপর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। সকালে আমি যখন যাইব তখন তুমিও আমার সহিত চলিও। আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। তবে চরম বিরোধিতা চলিতেছে। অতএব পথ চলিবার সময় যদি এমন কোন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাহার দ্বারা আমার সঙ্গে চলার কারণে তোমার কোন ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় তবে আমি পেশাব করিবার অথবা জুতা ঠিক করিবার ভান করিয়া বসিয়া পড়িব। তুমি সোজা হাঁটিতে থাকিবে। আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইবে না। যেন তুমি আমার সঙ্গে যাইতেছ কেহ এইরূপ ধারণা করিতে না পারে। যাহা হউক, সকাল বেলা তিনি হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি এখনই ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিও না। চুপ চাপ নিজের কওমের নিকট চলিয়া যাও। যখন আমরা জয়লাভ করিব তখন চলিয়া আসিবে। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, ঐ সকল বেঈমানের মাঝে আমি চিৎকার করিয়া তাওহীদের এই কালেমা পাঠ করিব। সুতরাং তখনই তিনি মসজিদে হারামে গিয়া উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন— আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

এই কালেমা পাঠের সাথে সাথে চতুর্দিক হইতে কাফেররা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এত বেশী মারধর করিল যে, ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই হযরত আবূ যর (রাযিঃ)কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কিরূপ জুলুম করিতেছ! এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক। এই গোত্রটি সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে। তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সিরিয়ার সহিত রহিয়াছে। এই ব্যক্তি মারা গেলে সিরিয়া যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে তাহাদেরও খেয়াল হইল যে, সিরিয়া হইতে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হইয়া থাকে, সেখানকার রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়া মুসীবতের কারণ হইবে, এই ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন আবার তিনি হারাম শরীফে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে কালেমা শাহাদত পাঠ করিলেন। লোকেরা এই কালেমা শুনা বরদাশত করিতে পারিত না। এইজন্য তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। দ্বিতীয় দিনও হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ভয় দেখাইয়া সরাইয়া দিলেন।

ফায়দা ঃ স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম সত্ত্বেও হযরত আবূ যর (রাযিঃ) যাহা করিয়াছেন, উহা ছিল সত্যকে প্রকাশ করার প্রতি তাহার প্রবল আবেগ ও আগ্রহ। কারণ, ইহা সত্য দ্বীন, কাহারও বাপের ইজারাদারী নয় যে, তাহার ভয়ে গোপন রাখিতে হইবে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, হয়তো নির্যাতন বরদাশত করিতে পারিবেন না। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অমান্য করার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কিছু আলোচনা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আসিতেছে। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দ্বীন প্রচারের কাজে সবরকম কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, সেহেতু হযরত আবু যর (রাযিঃ) সহজ পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকেই প্রাধান্য দিলেন। এই অনুসরণই এমন এক বস্তু ছিল, যে কারণে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সর্বপ্রকার উন্নতি সাহাবায়ে কেরামের পদচুম্বন করিতেছিল এবং সকল ময়দান তাহাদের আয়ত্তে ছিল। যে কেহ একবার কালেমা শাহাদত পড়িয়া ইসলামী ঝাণ্ডার ছায়াতলে আসিয়া যাইতেন কোন বড় শক্তিই তাঁহাকে

বাধা দিতে পারিত না। চরম কোন নির্যাতন–নিপীড়ন তাঁহাদিগকে দ্বীনের প্রচার হইতে বিরত রাখিতে পারিত না ।

(৬) হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাযিঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ছিলেন সেই সকল সৌভাগ্যবান লোকদের অন্যতম যাহারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় কঠিন হইতে কঠিনতর দুঃখ–কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। শুরুতেই পাঁচ ছয়জনের পর তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। লোহার পোশাক পরাইয়া তাঁহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত। যাহার ফলে গরম আর প্রচণ্ড তাপে ঘামের পর ঘাম বাহির হইতে থাকিত। অধিকাংশ সময় উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত। ফলে কোমরের গোশত পর্যন্ত গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। মহিলা সংবাদ পাইল যে, এই ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাওয়া–আসা করে। উহার শাস্তিস্বরূপ সে লোহা গরম করিয়া তাঁহার মস্তকে দাগ দিত। দীর্ঘদিন পর একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যমানায় হযরত খাব্বাব (রাযিঃ)এর নিকট তাঁহার নির্যাতন ভোগের বিস্তারিত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আরজ করিলেন যে, আপনি আমার কোমর দেখুন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার কোমর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এমন কোমর তো কাহারো কখনও দেখি নাই। হযরত খাববাব (রাযিঃ) আরজ করিলেন, প্রজ্বলিত কয়লার উপর আমাকে শোয়াইয়া টানা–হেঁচড়া করা হইয়াছে। আমার কোমরের চর্বি ও রক্ত দ্বারা ঐ আগুন নিভিয়াছে। এই অবস্থার পরও যখন ইসলামের তরক্কী হইল এবং সচ্ছলতা আসিল তখন উহার উপর ক্রন্দন করিতেন যে, খোদা না করুন আমাদের দুঃখ–কষ্টের বদলা দুনিয়াতেই পাইয়া গেলাম নাতো !

হযরত খাববাব (রাযিঃ) বলেন, একদিন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অভ্যাসের খেলাফ খুব দীর্ঘ নামায পড়িলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, ইহা ছিল আশা ও ভয়ের নামায। আমি এই নামাযের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি বিষয়ে দোয়া করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে দুইটি কবূল হইয়াছে আর একটি কবুল হয় নাই। আমি এই দোয়া করিয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের কারণে আমার সমস্ত উম্মত যেন

ধ্বংস না হইয়া যায়। ইহা কবুল হইয়াছে। দ্বিতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, তাহাদের উপর এমন কোন দুশমন যেন ক্ষমতা লাভ না করে, যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই দোয়াও কবূল হইয়াছে। তৃতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর যেন ঝগড়া–বিবাদ না হয়। এই দোয়া কবূল হয় নাই।

হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) সাঁয়ত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি কুফায় দাফন হইয়াছেন। ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার কবরের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা খাব্বাব (রাযিঃ)এর উপর রহম করুন। নিজের আগ্রহে মুসলমান হইয়াছেন, নিজের খুশীতে হিজরত করিয়াছেন এবং আজীবন জেহাদে কাটাইয়াছেন। বহু দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতকে স্মরণ রাখে এবং হিসাব–নিকাশের প্রস্তুতি নেয়, জীবিকার উপযোগী সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং আপন মাওলাকে রাজী করিয়া নেয়। (উসদুল–গাবাহ)

ফায়দা ঃ বাস্তবিকই মাওলাকে রাজী করা এই সকল সৌভাগ্যবান লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কেননা তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি কাজই ছিল মাওলা পাকের সন্তুষ্টির জন্য।

(৭) হযরত আম্মার ও তাঁহার পিতামাতার ঘটনা

হযরত আম্মার (রাযিঃ) ও তাঁহার মাতা–পিতাকেও কঠিন হইতে কঠিনতর নির্যাতন করা হইয়াছিল। মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় জমিনের উপর তাঁহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইত। সেখান দিয়া যাতায়াতের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার পিতা হযরত ইয়াসির (রাযিঃ) নির্যাতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জালেমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই। অভিশপ্ত আবূ জাহ্‌ল তাহার মাতা হযরত সুমাইয়্যা (রাযিঃ)এর লজ্জাস্থানে একটি বর্শা নিক্ষেপ করে। যাহার আঘাতে তিনি শহীদ হইয়া যান। এতদসত্ত্বেও ইসলাম ত্যাগ করেন নাই অথচ তিনি বৃদ্ধা ও দুর্বল ছিলেন কিন্তু ঐ হতভাগ্য কোন কিছুরই খেয়াল করে নাই। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ হযরত আম্মার (রাযিঃ) তৈয়ার করেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ

লইয়া গেলেন তখন হযরত আম্মার (রাযিঃ) বলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছায়াদার ঘর নির্মাণ করা উচিত ; যেখানে তিনি তাশরীফ রাখিবেন, দুপুর বেলায় আরাম করিবেন এবং নামাযও ছায়ার মধ্যে পড়িতে পারিবেন। অতঃপর কূবা নামক স্থানে হযরত আম্মার (রাযিঃ) প্রথমে পাথর জমা করেন এবং ইহার পর মসজিদ নির্মাণ করেন।

অত্যন্ত জোশের সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিতেন। একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এখন যাইয়া বন্ধুদের সহিত মিলিত হইব ; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত মিলিব। এমন সময় পিপাসা লাগিল, কোন একজনের নিকট পানি চাহিলেন। তিনি দুধ পেশ করিলেন। দুধ পান করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, তুমি দুনিয়াতে সর্বশেষ বস্তু দুধ পান করিবে। ইহার পর পরই তিনি শহীদ হইয়া যান। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৪ বৎসর। কেহ কেহ এক–আধ বৎসর কমও বলিয়াছেন। (উসদুল–গাবাহ)

(৮) হযরত সোহাইব (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সোহাইব (রাযিঃ)ও হযরত আম্মার (রাযিঃ)এর সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আরকাম (রাযিঃ)এর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুইজনই আলাদাভাবে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘটনাক্রমে বাড়ীর দরজায় উভয়েরই সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়েই একে অপরের আগমনের কারণ জানিলেন। দেখা গেল দুইজনের একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া উপকৃত হওয়া উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

এবং ইসলাম গ্রহণের পর তৎকালীন এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল জামাতের উপর যে অত্যাচার হইত তাহাদের বেলায়ও উহার ব্যতিক্রম হইল না। সর্ব প্রকারে নির্যাতন চালানো হইল এবং কষ্ট দেওয়া হইল। অবশেষে হযরত সোহাইব (রাযিঃ) নিরুপায় হইয়া হিজরত করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কাফেররা ইহাও সহ্য করিতে পারিত না যে, কোন মুসলমান অন্য কোথাও যাইয়া শান্তিতে জীবন যাপন করুক। তাই কেহ হিজরত করিতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে পাকড়াও করিবার চেষ্টা করিত, যাহাতে অত্যাচার নিপীড়ন হইতে রেহাই পাইতে না পারে। অতএব তাঁহার

পিছনেও লাগিয়া গেল এবং একদল কাফের তাহাকে পাকড়াও করিতে গেল। তিনি আপন তীর দান সামলাইয়া লইলেন যাহাতে তীর ছিল এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দেখ, তোমরা ভালভাবেই অবগত আছ যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ তীরন্দাজ। একটি তীর বাকী থাকিতেও তোমরা আমার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। আর যখন একটি তীরও অবশিষ্ট থাকিবে না তখন আমি আমার তলোয়ার দ্বারা তোমাদের মুকাবিলা করিব। হাঁ, যখন তলোয়ারও আমার হাতে থাকিবে না, তখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। অতএব, যদি তোমরা চাও তবে আমার জীবনের বিনিময়ে মক্কায় রক্ষিত আমার সমস্ত সম্পদের সন্ধান তোমাদিগকে দিতে পারি। আমার দুইটি বাঁদীও রহিয়াছে। তাহাও তোমরা লইয়া যাও। ইহাতে তাহারা রাজী হইয়া গেল। তিনি তাহার সম্পদ দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। এই সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۚ

অর্থাৎ কিছু লোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন ক্রয় করিয়া লয়। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় কুবায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি হযরত সোহাইব (রাযিঃ)কে দেখিয়া বলিলেন, বড় লাভের ব্যবসা করিয়াছ। হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খেজুর খাইতেছিলেন। আমার চোখে অসুখ ছিল, আমিও তাঁহার সহিত খেজুর খাইতে লাগিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার চোখ উঠিয়াছে আবার খেজুরও খাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, হুযূর ! আমি সেই চোখের পক্ষ হইতে খাইতেছি যাহা ভাল আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জওয়াব শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বড় বেশী খরচ করিতেন বিধায় হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অহেতুক খরচ কর। তিনি আরজ করিলেন, আমি কোথায়ও অন্যায়ভাবে খরচ করি না। হযরত ওমর (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় হযরত সোহাইব (রাযিঃ)কে তাহার জানাযার নামায পড়াইবার জন্য ওসিয়ত করিয়াছিলেন। (উসদুল-গাবাহ)

(৯) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হযরত ওমর (রাযিঃ) যাঁহার পবিত্র নামের উপর মুসলমানরা আজ গৌরব বোধ করে। যাহার ঈমানী জোশের কারণে আজ তেরশত বৎসর পরেও কাফেরদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের বিরোধিতা করা ও তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতেন। একদিন কাফেররা পরামর্শ সভা আহবান করিল যে, এমন কেউ আছে কি যে মুহাম্মদকে কতল করিয়া দিবে? ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমিই করিব। লোকেরা বলিল, নিঃসন্দেহে তোমার পক্ষেই উহা সম্ভব। ওমর (রাযিঃ) তলোয়ার হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রওয়ানা হইলেন। এই খেয়ালে চলিতেছিলেন পথিমধ্যে যুহরা গোত্রের হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। (কেহ কেহ অন্য ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন।) তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমর! কোথায় যাইতেছ? ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করার ফিকিরে আছি। (নাউযুবিল্লাহ) সাআদ বলিলেন, বনু হাশেম, বনু যুহরা ও বনু আবদে মানাফ হইতে তুমি কিভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে? তাহারাও তো তোমাকে ইহার বিনিময়ে হত্যা করিয়া দিবে।

এই উত্তর শুনিয়া ওমর (রাযিঃ) বিগড়াইয়া গেলেন। বলিতে লাগিলেন মনে হইতেছে তুইও বেদ্বীন (অর্থাৎ মুসলমান) হইয়া গিয়াছিস? আয় তোকেই আগে শেষ করি। এই বলিয়া তিনি তলোয়ার বাহির করিলেন। হযরত সাআদও বলিলেন, হাঁ, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনিও তলোয়ার বাহির করিলেন। উভয় দিক হইতে তরবারী চলিবার উপক্রম হইতেই হযরত সাআদ (রাযিঃ) বলিলেন, আগে নিজের ঘরের খবর লও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি দুইজনই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিবার সাথে সাথে ওমর (রাযিঃ) ক্রোধে অধির হইয়া উঠিলেন এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তখন (পূর্বে ৬নং ঘটনায় উল্লেখিত) হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে কুরআন শরীফ পড়াইতেছিলেন। ওমর (রাযিঃ) তাহাদেরকে কপাট খুলিতে বলিলেন। ওমর (রাযিঃ)এর আওয়াজ শুনিবামাত্র হযরত খাববাব (রাযিঃ) তাড়াতাড়ি ভিতরে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ার দরুন কুরআনের আয়াত লিখিত কাগজখানা বাহিরেই থাকিয়া গেল। বোন কপাট খুলিয়া দিলেন আর হযরত ওমর

(রাযিঃ)এর হাতে কোন বস্তু ছিল যাহা দ্বারা বোনের মাথায় আঘাত করিলেন। সাথে সাথে মাথা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। এবং বলিলেন, আপন জানের দুশমন! তুইও বেদ্বীন হইয়া গেলি? অতঃপর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা কি করিতেছিলি? আর ইহা কিসের আওয়াজ ছিল? ভগ্নিপতি বলিলেন, কথাবার্তা বলিতেছিলাম। ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? ভগ্নিপতি বলিলেন, অন্য ধর্ম যদি সত্য হয় তবে? ইহা শুনিবামাত্রই তাহার দাড়ি ধরিয়া সজোরে টান মারিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে মাটির উপর ফেলিয়া বেদম মারপিট করিলেন। বোন তাহাকে ছাড়াইতে গেলে তাহার মুখে এত জোরে থাপ্পড় মারিলেন যে, রক্ত বাহির হইয়া আসিল। যাহাই হউক, তিনিও উমরেরই বোন ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, ওমর! আমাদেরকে এইজন্য মারা হইতেছে যে, আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। হাঁ, নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এবার তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। এই সময়ে হযরত উমরের দৃষ্টি কুরআনের আয়াত লিখিত ঐ কাগজখানার উপর পড়িল, যাহা তাড়াহুড়ার কারণে বাহিরেই রহিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে মারপিট করার দরুন ক্রোধের তীব্রতাও কমিয়া আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া বোনের ঐরূপ রক্তাক্ত হইয়া যাওয়ার কারণে কিছুটা লজ্জাও লাগিতেছিল। বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা উহাতে কি আছে আমাকে দেখাও? বোন বলিয়া উঠিলেন, তুমি অপবিত্র আর অপবিত্র অবস্থায় উহা স্পর্শ করা যায় না। ওমর (রাযিঃ) বারবার বলিতে লাগিলেন কিন্তু বোন ওজু-গোসল ব্যতীত দিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ওমর গোসল করিলেন এবং কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িলেন। উহাতে সূরা ত্বাহা লিখিত ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।

এই পর্যন্ত পড়িতেই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা আমাকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া চল। এই কথা শুনিয়া হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে

ওমর ! আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি যে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! ওমর ও আবূ জাহ্ল-এর মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ হয় তাহার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। (এই দুইজনই শক্তি ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিল।) মনে হইতেছে আপনার সম্পর্কেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া কবূল হইয়াছে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং জুমার দিন সকাল বেলায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কাফেরদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুসলমানগণ সংখ্যায় ছিলেন অতি নগন্য। অপরপক্ষে ছিল সমগ্র মক্কা তথা সমগ্র আরব। কাজেই তাহাদের মধ্যেও নতুন জোশ পয়দা হইল এবং সভা সমিতি ও পরামর্শের মাধ্যমে সভা-সমিতি ও সলাপরামর্শ করিয়া মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা ও তদবীর করা হইত। তবে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণে এতটুকু লাভ অবশ্যই হইয়াছিল যে, মুসলমানগণ মক্কার মসজিদে নামায পড়িতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং তাঁহার খেলাফত ছিল রহমতস্বরূপ। (উসদুল-গাবাহ্)

(১০) মুসলমানদের হাবশায় হিজরত এবং আবু তালিবের ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হওয়া

মুসলমান ও তাহাদের সর্দার ফখ্রে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কাফেরদের পক্ষ হইতে জুলুম-অত্যাচার চলিতে থাকিল এবং প্রত্যহ তাহা কমিবার পরিবর্তে বাড়িতেই থাকিল তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে, তাহারা যেন এইখান হইতে অন্য কোন স্থানে চলিয়া যান। তখন অনেকেই সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় হিজরত করেন। হাবশার বাদশা যদিও খৃষ্টান ছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত মুসলমান হন নাই কিন্তু তাহার নরমদিল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার খ্যাতি ছিল। সুতরাং নবুওতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে প্রথম একটি জামাআত হাবশায় হিজরত করেন। এই দলে এগার বা বারজন পুরুষ এবং চার বা পাঁচজন মহিলা ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের পিছু নিয়াছিল,

যাহাতে তাঁহারা যাইতে না পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে নাই।

মুসলমানগণ হাবশায় পৌঁছার কিছুদিন পরই সংবাদ পাইলেন যে, মক্কাবাসী সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং ইসলামের বিজয় হইয়াছে। এই সংবাদে তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কার নিকটে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল ছিল। মক্কার লোকেরা পূর্বের মতই বরং আগের চাইতে আরও বেশী শত্রুতা ও অত্যাচারে লিপ্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা ভীষণ সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে তাহাদের অনেকে সেখান হইতে আবার হাবশায় ফিরিয়া গেলেন। কেহ কেহ কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন। ইহাকে 'হাবশার প্রথম হিজরত' বলা হয়।

অতঃপর একটি বড় জামাত কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া হাবশায় হিজরত করেন। এই জামাআতে তিরাশিজন পুরুষ ও আঠারজন মহিলা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাকে 'হাবশার দ্বিতীয় হিজরত' বলা হয়। কোন কোন সাহাবী উভয় হিজরত করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ একটিতে শরীক ছিলেন। কাফেররা যখন দেখিল যে, মুসলমানেরা হাবশায় হিজরত করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করিতেছে। ইহাতে তাহাদের গোস্বা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা বহু উপহার-উপঢৌকন সহ হাবশার বাদশা নাজাশীর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠাইল। প্রতিনিধিদল বাদশার উচ্চপদস্থ সভাসদ ও পাদ্রীদের জন্যও বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী সাথে করিয়া লইয়া গেল। তাহারা প্রথমে পাদ্রী ও সভসদদের সহিত সাক্ষাত করিল এবং উপহার সামগ্রী দিয়া বাদশার দরবারে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার ওয়াদা লইল। অতঃপর প্রতিনিধিদল বাদশার দরবারে হাজির হইল। প্রথমে তাহারা বাদশাকে সেজদা করিল। অতঃপর উপঢৌকন পেশ করিয়া নিজেদের দরখাস্ত পেশ করিল এবং ঘুষখোর আমলারা উহা সমর্থন করিল। প্রতিনিধিদল বলিল, হে বাদশাহ! আমাদের কওমের কিছুসংখ্যক নির্বোধ ছেলে নিজেদের পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া একটি নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্ম সম্বন্ধে না আমরা কিছু জানি আর না আপনি কিছু জানেন। তাহারা আপনার দেশে আশ্রয় লইয়াছে। আমাদিগকে মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং তাহাদের বাপ-চাচা ও আত্মীয়-স্বজনরা তাহাদিগকে ফেরত নেওয়ার জন্য আপনার দরবারে পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিন। বাদশাহ বলিলেন, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করা ব্যতীত তোমাদের নিকট তাহাদিগকে সোপর্দ করা সম্ভব

নয়। প্রথমে আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বিষয়টি তদন্ত করিব। যদি তোমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় তবে সোপর্দ করিয়া দিব। সুতরাং মুসলমানদিগকে ডাকা হইল। মুসলমানগণ প্রথমে খুবই পেরেশান হইলেন যে, কি করিবেন। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে সাহায্য করিল। হিম্মতের সহিত তাহারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দরবারে উপস্থিত হইয়া স্পষ্ট কথা বলা উচিত। বাদশার নিকট পৌঁছিয়া তাহারা সালাম করিলেন। কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, শাহী আদব ও রীতি অনুযায়ী তোমরা বাদশাকে সেজদা করিলে না কেন? তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে আমাদের নবী আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও সেজদা করিতে অনুমতি দেন নাই। অতঃপর বাদশাহ তাঁহাদের হাল–অবস্থা জানিতে চাহিলেন। হযরত জাফর (রাযিঃ) অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতায় পতিত ছিলাম। না আল্লাহকে জানিতাম, না তাঁহার রাসূলগণ সম্পর্কে জানিতাম। আমরা পাথর পূজা করিতাম, মৃত জীব–জন্তু খাইতাম, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকিতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিতাম। আমাদের সবলেরা দুর্বলদেরকে ধ্বংস করিয়া দিত। আমরা এই অবস্থার মধ্যে ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন। যাহার বংশ মর্যাদা, সত্যতা, আমানতদারী ও পরহেযগারী সম্পর্কে আমরা ভালরূপ জানি, তিনি আমাদিগকে শরীকবিহীন এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহবান করিলেন এবং পাথর ও মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করিলেন। আমাদিগকে সৎকর্ম করিবার হুকুম দিলেন। মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আমাদেরকে সত্য বলিবার, আমানত রক্ষা করিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিবার, প্রতিবেশীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার হুকুম দিলেন। নামায রোযা সদকা খয়রাত করিতে হুকুম দিলেন এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দিলেন। যিনা–ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, কাহারও প্রতি অপবাদ দেওয়া এবং এই ধরনের সকল মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিলেন। আমাদিগকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম। তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিলাম। এই কারণে আমাদের কওম আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং আমাদেরকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া আমাদের নবীর হুকুম মুতাবেক আমরা আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন, তোমাদের নবী যে কুরআন লইয়া আসিয়াছেন উহার কিছুটা আমাকে শুনাও। হযরত জাফর (রাযিঃ) সূরা মারয়ামের প্রথম কয়েকখানি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন।

যাহা শুনিয়া বাদশাও কাঁদিলেন এবং উপস্থিত তাহার বিপুল সংখ্যক পাদ্রীরাও সকলেই এত কাঁদিল যে, দাড়ি ভিজিয়া গেল।

অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, খোদার কসম! এই কালাম এবং যাহা হযরত মূসা (আঃ) লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা একই নূর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই বলিয়া তিনি মক্কার প্রতিনিধি দলকে পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, আমি ইহাদিগকে কিছুতেই তোমাদের নিকট সোপর্দ করিব না। ইহাতে কাফেররা খুব পেরেশান হইয়া পড়িল, কেননা চরমভাবে অপদস্থ হইতে হইল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল। এক ব্যক্তি বলিল, আগামীকাল আমি এমন চাল চালিব যে, বাদশাহ ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবে। সঙ্গীরা বলিল, এরূপ করা উচিত হইবে না। মুসলমান হইয়া গেলেও তাহারা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু সে কিছুতেই তাহা মানিল না। পরদিন আবার বাদশাহের নিকট যাইয়া বলিল যে, এই মুসলমানগণ হযরত ঈসা (আঃ)এর শানে বেআদবী করিয়া থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)কে তাহারা আল্লাহর বেটা বলিয়া স্বীকার করে না।

বাদশাহ পুনরায় মুসলমানদিগকে তলব করিলেন। সাহাবীগণ বলেন যে, দ্বিতীয় দিন তলব করার কারণে আমরা আরও বেশী পেরেশান হইয়া পড়ি। যাহাই হউক আমরা হাজির হইলাম। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তোমরা কি বল? তাহারা বলিলেন, আমরা উহাই বলিয়া থাকি যাহা আমাদের নবীর উপর তাঁহার শানে নাযিল হইয়াছে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার রূহ ও তাঁহার কালেমা, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সতী সাধ্বী কুমারী মারয়াম (আঃ)এর ভিতরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজাসী বলিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)ও ইহার বেশী বলিতেন না। পাদ্রীরা এই বিষয়ে পরস্পর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। নাজাসী বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে থাক।

অতঃপর বাদশাহ কাফেরদের সকল উপহারসামগ্রী ফেরত দিয়া দিলেন এবং মুসলমানদিগকে বলিলেন যে, তোমরা নিরাপদ। যে কেহ তোমাদেরকে কষ্ট দিবে তাহার জরিমানা দিতে হইবে। আর এই ঘোষণা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ মুসলমানদিগকে কষ্ট দিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এই ঘোষণার পর সেখানে মুসলমানদের আরও বেশী সম্মান হইতে লাগিল। অপরদিকে মক্কার প্রতিনিধিদলকে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ইহার পর মক্কার কাফেরদের গোস্বা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ তাহাদের অন্তরে আরও জ্বালা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা সর্বদা এই ফিকিরে থাকিত যেন মুসলমানদের সহিত লোকদের মেলামেশা বন্ধ হইয়া যায় এবং যে কোন ভাবে ইসলামের বাতি নিভিয়া যায়। এইজন্য মক্কার সরদারদের এক বড় জামাত সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করিল যে, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে হত্যা করাও কোন সহজ কাজ ছিল না। কেননা, বনু হাশেমও সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের অধিকাংশ যদিও মুসলমান হইয়াছিল না, কিন্তু যাহারা মুসলমান ছিল না তাহারাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব ঐ সমস্ত কাফেররা একজোট হইয়া একটি অঙ্গীকার করিল যে, বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সহিত বয়কট করা হউক। কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে নিজের কাছে বসিতে দিবে না, তাহাদের সহিত কেহ বেচাকেনা করিবে না, কথাবার্তা বলিবে না, তাহাদের ঘরে যাইবে না এবং তাহাদেরকে নিজেদের ঘরে আসিতে দিবে না আর ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আপোষ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য সোপর্দ করিবে না। এই অঙ্গীকার শুধু মৌখিক কথার উপরই শেষ হইল না বরং কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া নবুওতের সপ্তম বর্ষের পহেলা মুহররম তারিখে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে প্রত্যেকেই উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও উহাকে মানিয়া চলার চেষ্টা করে। এই বয়কটের কারণে মুসলমানগণ দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত একটি ঘাঁটিতে নজরবন্দী হইয়া থাকেন। না বাহিরের কেহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত, না তাহারা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। না মক্কার কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু খরিদ করিতে পারিতেন, না বাহির হইতে আগত কোন ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। যদি কেহ বাহিরে আসিত তবে তাহাকে মারপিট করা হইত। কাহারও নিকট প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিলে পরিষ্কার না করিয়া দিত। সামান্য খাদ্যদ্রব্য যাহা তাহাদের নিকট ছিল উহাতে আর কতদিন চলিতে পারে? শেষ পর্যন্ত দিনের পর দিন অনাহারে কাটিতে লাগিল। মহিলা ও শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিত এবং চিৎকার করিত। শিশুদের কষ্ট তাহাদের অভিভাবকদিগকে নিজেদের ক্ষুধার যন্ত্রণার চাইতেও অধিক

ব্যথিত করিত।

অবশেষে তিন বছর পর আল্লাহর ফযলে সেই অঙ্গীকারপত্রকে উইপোকায় খাইয়া ফেলিল। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের এই মুসীবত দূর হইল। তিন বছরের এই দিনগুলি এরূপ কঠিন বয়কট ও নজরবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। আর এই অবস্থায় তাহাদের উপর দিয়া কিরূপ দুঃখকষ্ট অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত স্বীয় দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছেন বরং উহার প্রচার–প্রসারেও সচেষ্ট রহিয়াছেন।

ফায়দা ঃ এই সমস্ত দুঃখ–কষ্ট এমন সকল লোকেরা ভোগ করিয়াছেন যাহাদের নামে আজ আমরা পরিচয় লাভ করি এবং নিজেদেরকে তাহাদের অনুসারী বলিয়া দাবী করি এবং আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মত উন্নতির স্বপ্ন দেখি। কিন্তু একসময় একটু চিন্তা করিয়াও দেখা উচিত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) কি পরিমাণ ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করিয়াছেন, আর আমরা দ্বীন ধর্ম ও ইসলামের জন্য কি করিয়াছি। বস্তুতঃ সফলতা ও কামিয়াবী সর্বদা চেষ্টা ও পরিশ্রম অনুপাতে হইয়া থাকে। আমরা চাই আরাম–আয়েশ, বদ–দ্বীনী ও দুনিয়া উপার্জনে কাফেরদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলি আর ইসলামী তরক্কীও আমাদের সঙ্গী হউক। ইহা কিভাবে সম্ভব?

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی   کیں راہ کہ تو میروی بترکستان است

অর্থাৎ, হে আরাবী! আমার ভয় হয় তুমি কাবা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, তুমি যে পথ ধরিয়াছ উহা তুর্কিস্তানের পথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহ পাকের ভয়–ভীতি

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং দ্বীনের খাতিরে স্বীয় জান–মাল, ইয্যত–আবরু সর্বস্ব উজাড় করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও—যাহার কিছু নমুনা ইতিপূর্বে আপনারা দেখিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয়–ভীতি যে পরিমাণ পাওয়া যাইত, আল্লাহ করুন, উহার সামান্য কিছু আমাদের মত গুনাহগারদেরও নসীব হইয়া যায়। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা লেখা হইতেছে।

(১) ঝড়-তুফানের সময় হুযূর (সাঃ)-এর তরীকা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন আকাশে মেঘ, ঝড় ইত্যাদি দেখা দিত তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইত এবং চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া যাইত। এবং ভয়ে কখনও ঘরের ভিতরে যাইতেন কখনও বাহিরে আসিতেন আর এই দোয়া পড়িতে থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ.

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং এই বাতাসের মধ্যে (বৃষ্টি ইত্যাদি) যাহা কিছু আছে উহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং যেই জন্য উহা পাঠানো হইয়াছে ঐসব কিছুর মঙ্গল কামনা করিতেছি। আর এই বাতাসের অমঙ্গল হইতে এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং যেই উদ্দেশ্যে উহা প্রেরিত হইয়াছে ঐসব কিছুর অমঙ্গল হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আর যখন বৃষ্টি শুরু হইয়া যাইত তখন চেহারায় আনন্দ প্রকাশ পাইত। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব লোকই যখন মেঘ দেখে বৃষ্টির আলামত মনে করিয়া খুশী হয় কিন্তু আপনার মধ্যে একপ্রকার বিচলিত ভাব দেখিতে পাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে আয়েশা! আমার নিকট ইহার কি নিশ্চয়তা রহিয়াছে যে, উহার মধ্যে আযাব নাই! কওমে আদকে বাতাসের দ্বারাই আযাব দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মেঘ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল যে, উহা হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে। অথচ উহার মধ্যে আযাব ছিল। (দুররে মানসূর)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ الاية.

অর্থাৎ—আদ জাতি যখন এই মেঘমালাকে নিজেদের বস্তির দিকে আসিতে দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে, এই মেঘমালা তো আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। [(কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন,) না উহা তো বর্ষণকারী নয় বরং উহা তো সেই আযাব যাহার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতে। (অর্থাৎ তোমরা নবীকে বলিতে যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আযাব লইয়া আস।) ইহা একটি ঘূর্ণিবার্তা

যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে, যাহা তাহার রবের হুকুমে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা এই ঘুর্ণিবার্তার ফলে এমনভাবে ধ্বংস হইয়া গেল যে, তাহাদের ঘর-বাড়ীর চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বস্তুতঃ অপরাধীদেরকে আমি এইভাবেই শাস্তি দিয়া থাকি। (বয়ানুল কুরআন)

ফায়দা ঃ খোদাভীতির এই চরম অবস্থা হইল সেই পবিত্র সত্তার যাঁহার সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন হওয়া স্বয়ং তাঁহারই এরশাদ দ্বারা সকলে অবগত হইয়াছে। খোদ কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে, হে নবী! আপনি তাহাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমি কখনও আযাব দিব না। আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা থাকার পরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদাভীতির অবস্থা এই ছিল যে, ঝড়-তুফানের আলামত দেখিলেই পূর্ববর্তী কওমসমূহের আযাবের কথা স্মরণ হইয়া যাইত। সেইসঙ্গে আমাদের অবস্থার প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা উচিত যে, আমরা সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকিয়াও ভূমিকম্প ইত্যাদি আযাব-গযব স্বচক্ষে দেখার পর উহার দ্বারা ভীত হইয়া তওবা-এস্তেগফার ও নামাযে মশগুল হওয়ার পরিবর্তে নানা প্রকার অর্থহীন গবেষণায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি।

(২) অন্ধকারের সময় হযরত আনাস (রাযিঃ)এর আমল

নযর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)এর জীবদ্দশায় একবার দিনের বেলায় ভীষণ অন্ধকার হইয়া গেল। আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও কি এইরূপ অবস্থা হইত? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তো বাতাস একটু জোরে চলিলেই আমরা কিয়ামত আসিয়া গেল কিনা এই ভয়ে দৌড়াইয়া মসজিদে চলিয়া যাইতাম। অপর এক সাহাবী হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, ঘুর্ণিঝড় শুরু হইলে তিনি পেরেশান হইয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন। (জামউল-ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আজ যত বড় বিপদ ও বালা-মুসীবতই আসুক আমাদের কাহারও কি মসজিদের কথা স্মরণ হয়? সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, খাছ ব্যক্তিদের মধ্যেও কি উহার প্রতি কোন গুরুত্ব দেখা যায়? এই প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেই চিন্তা করুন।

(৩) সূর্য গ্রহণের সময় হুযূর (সঃ)-এর আমল

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) চিন্তা করিলেন যে, এই অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করিবেন এবং কি করিবেন তাহা দেখিতে হইবে। যাহারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাহারা কাজ–কর্ম ছাড়িয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। যে সমস্ত যুবক ছেলেরা মাঠে তীর চালনার অনুশীলন করিতেছিল তাহারাও উহা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল যে, এই অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করিবেন তাহা দেখিতে হইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআত সালাতুল কুসুফ বা সূর্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। যাহা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাঁদিতেছিলেন আর এই দোয়া করিতেছিলেন—"হে পরওয়ারদিগার ! আপনি কি আমার সহিত এই ওয়াদা করিয়া রাখেন নাই যে, আমি বর্তমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে আযাব দিবেন না, আর তাহারা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখনও তাহাদেরকে আযাব দিবেন না।"

উল্লেখ্য যে, সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা এই ওয়াদা করিয়াছেন—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে নসীহত করিলেন—যখনই এমন অবস্থা হইবে এবং সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইবে তখন তোমরা ঘাবড়াইয়া নামাযে মনোনিবেশ করিবে। আমি আখেরাতের যেসব অবস্থা দেখিতে পাই যদি তোমরা উহা জানিতে তবে তোমরা কম হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে। যখনই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তখন নামায পড়িবে, দোয়া করিবে ও দান–খয়রাত করিবে।

(৪) সারারাত্র হুযূর (সাঃ)এর ক্রন্দন

একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র ক্রন্দন করিতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত নামাযে এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে থাকেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) আপনি যদি ইহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে এই ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। কেননা, ইহারা আপনার বান্দা আর আপনি তাহাদের মালিক। গোলাম অপরাধ করিলে মালিকের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে এই ব্যাপারেও আপনি স্বাধীন। কেননা আপনি মহাক্ষমতাশালী, ক্ষমা করার উপরও আপনার কুদরত রহিয়াছে। আপনি হিকমতওয়ালা, তাই আপনার ক্ষমা করাও হিকমত অনুযায়ী হইবে। (বয়ানুল কুরআন)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনিও একবার সারারাত্র وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ এই আয়াত পড়িতে থাকেন ও ক্রন্দন করিতে থাকেন। আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, 'কিয়ামতের দিন অপরাধীদের প্রতি হুকুম হইবে যে, দুনিয়াতে তো সকলে মিলিয়া মিশিয়া ছিলে। কিন্তু আজ অপরাধী ও নিরপরাধীরা সকলে পৃথক হইয়া যাও।

এই নির্দেশ শুনিবার পর যত ক্রন্দনই করা হউক না কেন তাহা নিতান্তই কম। কারণ, জানা নাই আমি কি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হইব, না ফরমাবরদারদের মধ্যে গণ্য হইব।

(৫) হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)এর আল্লাহর ভয়

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীদের ব্যতীত সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ হইতে উত্তম। তিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতী হইবেন। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। বরং তাহাকে একদল বেহেশতী লোকের সর্দার বলিয়াছেন। জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতে তাহাকে আহবান করার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আবূ বকর (রাযিঃ)ই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এই সবকিছু সত্ত্বেও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হইত! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি ঘাস হইতাম যাহা জানোয়ার খাইয়া ফেলিত! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন মুমিনের শরীরের পশম হইতাম! একবার একটি বাগানে যাওয়ার পর সেখানে তিনি একটি জানোয়ারকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হে জানোয়ার! তুমি কতই না আরামে আছ! খাও, পান কর, বৃক্ষের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াও এবং আখেরাতে তোমার উপর

হিসাব–নিকাশের কোন বোঝা নাই। হায় ! আবূবকরও যদি তোমার মত হইত ! (তারীখুল খোলাফা)

হযরত রাবীআ আসলামী (রাযিঃ) বলেন, একবার আমার ও হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)এর মধ্যে কোন একটা বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। তিনি আমাকে একটি শক্ত কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে আমি ব্যথা পাইলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি উহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলিয়া দাও, যাহাতে প্রতিশোধ হইয়া যায়। কিন্তু আমি বলিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয়তো তুমি এইরূপ বলিয়া দাও নতুবা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করিব। কিন্তু এবারও আমি প্রতিশোধমূলক কথা বলিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

বনূ আসলামের কিছু লোক আসিয়া বলিতে লাগিল বাহ ! কেমন সুন্দর কথা, নিজেই বাড়াবাড়ি করিলেন আবার উল্টা নিজেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নালিশ করিবেন? আমি বলিলাম, তোমরা কি জান ইনি কে? ইনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হইয়া যান তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। আর তাঁহার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তখন রাবীআর ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকিবে? অতঃপর আমিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম এবং ঘটনা বলিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঠিক আছে ! তোমার প্রতিশোধমূলক জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে তুমি উহার বদলায় এইরূপ বলিয়া দাও যে, হে আবূ বকর ! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

ফায়দা ঃ ইহাই হইল প্রকৃত আল্লাহর ভয়। একটি সাধারণ কথার উপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর এই পরিমাণ ফিকির ও গুরুত্ব পয়দা হইল যে, প্রথমে নিজে অনুরোধ করিলেন এবং পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে চাহিলেন যে, হযরত রাবীআ (রাযিঃ) বদলা লইয়া লয়। আজ আমরা শত শত কটুকথা একে অপরকে বলিয়া ফেলি। কিন্তু কখনও এই খেয়ালও হয় না যে, আখেরাতে উহার বদলা লওয়া হইবে বা উহার হিসাব–নিকাশও হইবে।

(৬) হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর অবস্থা

হযরত ওমর (রাযিঃ) অনেক সময় একটি খড়কুটা হাতে লইয়া

বলিতেন, হায়! আমি যদি এই খড়কুটা হইতাম। কখনও বলিতেন, হায়! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন। একবার তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিয়াছে, আপনি যাইয়া আমার বদলা লইয়া দিন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে একটি চাবুক মারিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি যখন এই কাজের জন্য বসি তখন তুমি আস না আর যখন অন্য কাজে লিপ্ত হই তখন আসিয়া বল যে, আমার বদলা লইয়া দিন। লোকটি চলিয়া গেল। তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার হাতে চাবুক দিয়া বলিলেন, বদলা লও। লোকটি আরজ করিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি ঘরে গিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িয়া নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ওমর! তুই নিকৃষ্ট ছিলি, আল্লাহ তোকে উঁচা করিয়াছেন, তুই গোমরাহ ছিলি, আল্লাহ তোকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তুই অপদস্থ ছিলি, আল্লাহ তোকে ইয্যত দিয়াছেন, অতঃপর মানুষের বাদশাহ বানাইয়াছেন। এখন এক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে, আমার উপর জুলুমের বদলা লইয়া দিন আর তুই তাহাকে মারিয়া দিলি। কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাকে কি জওয়াব দিবি? দীর্ঘক্ষণ তিনি এইভাবে নিজেকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন। (উসদুল-গাবাহ্)

তাঁহার গোলাম হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সঙ্গে (মদীনার নিকটবর্তী হার্রার দিকে যাইতেছিলাম। মরুভূমির এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখা গেল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সম্ভবতঃ কোন কাফেলা হইবে, রাত্র হইয়া যাওয়ার কারণে শহরে যাইতে পারে নাই; বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। চল, তাহাদের খোঁজ-খবর লই। রাত্রে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেখানে পৌঁছিয়া একজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার সাথে কয়েকটি শিশুসন্তান রহিয়াছে। তাহারা কান্নাকাটি ও চিৎকার করিতেছে। আর পানি ভর্তি একটি ডেকচি চুলার উপর বসানো রহিয়াছে, উহার নীচে আগুন জ্বলিতেছে। তিনি সালাম করিলেন এবং অনুমতি চাহিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশুগুলি কাঁদিতেছে কেন? মহিলা জওয়াব দিল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ডেকচির মধ্যে কি আছে? মহিলাটি বলিল, তাহাদেরকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য পানি ভর্তি করিয়া চুলার উপর রাখিয়াছি, যাহাতে কিছুটা সান্ত্বনা পায় এবং ঘুমাইয়া পড়ে।

অতঃপর মহিলাটি বলিল, আমীরুল মুমেনীন ওমর (রাযিঃ) ও আমার মধ্যে আল্লাহর দরবারেই ফয়সালা হইবে। কেননা, তিনি আমার এই অভাব-অনটনের কোন খোঁজ-খবর লন না। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ওমর তোমার এই অবস্থা কি করিয়া জানিবেন? মহিলা বলিল, তিনি আমাদের আমীর হইয়াছেন অথচ আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) আমাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাইতুল মাল হইতে কিছু আটা, খেজুর, চর্বি ও কিছু কাপড় ও দিরহাম লইয়া একটি বস্তায় ভর্তি করিলেন। মোটকথা বস্তাটি খুব ভাল করিয়া বোঝাই করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, ইহা আমার কোমরে উঠাইয়া দাও। আরজ করিলাম, আমি লইয়া যাইব। তিনি বলিলেন, না, আমার কোমরে উঠাইয়া দাও। আমি দুই তিনবার অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিনও কি আমার বোঝা তুমিই বহন করিবে? ইহা আমিই বহন করিয়া লইয়া যাইব। কেননা কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে আমাকেই প্রশ্ন করা হইবে। পরিশেষে আমি বাধ্য হইয়া বস্তা তাঁহার কোমরে উঠাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলাটির নিকট পৌছিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। সেখানে পৌছিয়াই তিনি পাতিলে আটা, কিছু চর্বি ও কিছু খেজুর ঢালিয়া দিলেন এবং নাড়াচাড়া করিতে শুরু করিলেন এবং চুলায় নিজেই ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখিতেছিলাম তাহার ঘন দাড়ির ভিতর দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই 'হারীরা'র মত এক প্রকার খাদ্য তৈয়ার হইয়া গেল। অতঃপর তিনি তাঁহার মুবারক হস্তে সেই খাদ্য বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। তাহারা তৃপ্ত হইয়া খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তিতে মাতিয়া উঠিল। অবশিষ্ট খাদ্য অন্য বেলার জন্য মহিলার হাতে উঠাইয়া দিলেন। মহিলাটি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। হযরত উমরের পরিবর্তে তুমিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তুমি যখন খলীফার নিকট যাইবে তখন সেখানে আমাকেও দেখিতে পাইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া জমিনের উপর বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। এবং বলিলেন, আমি এইজন্য বসিয়াছিলাম যে, প্রথমে তাহাদিগকে আমি ক্রন্দনরত অবস্থায়

দেখিয়াছিলাম। আমার মন চাহিল, তাহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া যাই। (আশহারে মাশাহীর, মুন্তাখাব কানযুল-উম্মাল)

হযরত ওমর (রাযিঃ) ফজরের নামাযে প্রায়ই সূরা কাহাফ, সূরা ত্বাহা ইত্যাদি বড় বড় সূরা পড়িতেন এবং কাঁদিতে থাকিতেন। কান্নার আওয়াজ কয়েক কাতার পর্যন্ত পৌছিয়া যাইত। একবার ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়িতেছিলেন। যখন إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন তখন কাঁদিতে কাঁদিতে এমন অবস্থা হইল যে, তাহার আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। তাহাজ্জুদের নামাযে কখনও কখনও কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া যাইতেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িতেন।

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল সেই মহান ব্যক্তির আল্লাহ–ভীতি যাহার নাম শুনিলে বড় বড় নামজাদা রাজা–বাদশাহ পর্যন্ত ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। সাড়ে তেরশত বছর পর আজও পর্যন্ত তাঁহার শান–শওকত সর্বজন স্বীকৃত। আজ কোন রাজা–বাদশাহ বা উজির–নাজির নয় সাধারণ কোন আমীরও কি প্রজা সাধারণের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে?

(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নসীহত

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর জাহেরী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর একদিন আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিলাম। তিনি মসজিদে হারামে গেলেন। সেখানে একটি মজলিস হইতে ঝগড়ার আওয়াজ আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, আমাকে এই মজলিসের নিকট লইয়া চল। আমি সেইদিকে লইয়া গেলাম। সেখানে পৌছিয়া তিনি সালাম করিলেন। লোকেরা তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বসিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহর খাছ বান্দাদের জামাত হইল ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাঁহার ভয় নিশ্চুপ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহারা অক্ষমও নহেন, বোবাও নহেন। বরং তাহারা সুবক্তা, বাকশক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্বের স্মরণ তাহাদের আকল–বুদ্ধিকে হরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে তাহাদের হৃদয় ভগ্ন থাকে এবং যবান চুপ থাকে। আর এই অবস্থার উপর যখন তাহাদের পরিপক্কতা অর্জন হইয়া যায় তখন উহার কারণে তাহারা নেক কাজে তাড়াতাড়ি করেন। তোমরা তাহাদের হইতে কত দূরে চলিয়া গিয়াছ। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি আর দুই ব্যক্তিকেও এক জায়গায় একত্রে দেখি নাই।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আল্লাহর ভয়ে এত বেশী ক্রন্দন করিতেন যে, সর্বদা অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে চেহারার উপর দুইটি নালি হইয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নেক কাজের উপর এহতেমাম করিবার একটি সহজ ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিবে। ফলে সর্বপ্রকার নেক আমল করা সহজ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এইরূপ আমল নিঃসন্দেহে এখলাসে পরিপূর্ণ থাকিবে। আমরা যদি রাত্রদিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সামান্য একটু সময়ও এই চিন্তা-ফিকিরের জন্য বাহির করিয়া লই তবে ইহা কোনই মুশকিল নহে?

(৮) তাবুকের সফরে কওমে সামুদের বস্তি অতিক্রম

গাযওয়ায়ে তাবুক একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ইহাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইলেন যে, রোম সম্রাট মদীনা শরীফের উপর হামলা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী লইয়া সিরিয়ার পথে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবম হিজরীর ৫ই রজব বৃহস্পতিবার উহার মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। যেহেতু প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল এবং মুকাবিলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন সেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, রোম সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে কাজেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের জন্য চাঁদা উঠাইতে শুরু করিলেন। ইহাই সেই যুদ্ধ যাহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঘরের সমস্ত সামান লইয়া আসেন। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) ঘরের সম্পূর্ণ সামানের অর্ধেক লইয়া আসেন। যাহার বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ নম্বর ঘটনায় আসিতেছে। হযরত ওসমান গনী (রাযিঃ) সমগ্র বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের সম্পূর্ণ সামানের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যের চাইতে বেশীই আনিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও যেহেতু সার্বিকভাবে অভাব অনটন চলিতেছিল সেহেতু দশ দশ ব্যক্তির ভাগে একটি করিয়া উট জুটিয়াছিল। তাহারা পালাক্রমে

উহাতে আরোহণ করিতেন। এইজন্য ইহা 'জাইশুল উসরা' (বা অভাবগ্রস্ত বাহিনী) নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন ছিল। একদিকে সফরও ছিল দূরের, মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। অপরদিকে মদীনা শরীফে তখন খেজুর পাকার ভরা মৌসুম। বাগানের খেজুর সম্পূর্ণ পাকিয়া গিয়াছিল। খেজুরের উপরই মদীনাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করিত। আর সারা বছরের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার ইহাই ছিল একমাত্র মৌসুম। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য ইহা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। একদিকে আল্লাহর ভয় ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, যে কারণে যুদ্ধে না যাইয়া কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে এতসব কঠিন সমস্যা যাহার প্রতিটিই ছিল একেকটি স্বতন্ত্র বাধা। বিশেষতঃ সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল পাকাপোক্তা খেজুরের বাগানসমূহ কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যতীত ছাড়িয়া যাওয়া কত যে কঠিন ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও আল্লাহর ভয় তাহাদের উপর প্রবল ছিল। মুনাফিক ও অক্ষম ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে শিশু ও নারীরাও রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে মদীনা শরীফের প্রয়োজনে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে, অথবা কোন প্রকার সওয়ারীর ব্যবস্থা না হওয়ায় যাহারা ক্রন্দন রত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছেন, যাহাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইয়াছে—

تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ উল্লেখিত কয়েক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সকল সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

অবশ্য তিনজন সাহাবী কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও শরীক ছিলেন না। তাহাদের ঘটনা সামনে আসিতেছে।

পথিমধ্যে কওমে সামূদের বস্তি এলাকা অতিক্রম কালে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় দিয়া নিজ চেহারা মোবারক ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং উটনীকে দ্রুত চালাইলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কেও হুকুম করিলেন, জালেমদের বস্তিগুলি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত অতিক্রম কর। আর এই ভয়ের সহিত অতিক্রম কর যে, খোদা না করুন, সেই আযাব যেন তোমাদের উপরও আসিয়া না পড়ে যাহা তাহাদের উপর নাযিল হইয়াছিল। (ইসলাম, খামীস)

ফায়দা ঃ আল্লাহর পেয়ারা নবী ও রাসূল আযাবের স্থান ভীত–সন্ত্রস্ত হইয়া অতিক্রম করেন এবং জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যাহারা এই কঠিন অবস্থাতেও জীবন উৎসর্গের প্রমাণ দিলেন, তাহাদিগকেও ক্রন্দন করিতে করিতে অতিক্রম করার হুকুম করিলেন। যেন

আল্লাহ না করুন, সেই আযাব তাহাদের উপরও নাজিল হইয়া না যায়। আর আমাদের অবস্থা হইল এই যে, কোন এলাকায় ভূমিকম্প হইলে আমরা উহাকে ভ্রমণের ক্ষেত্র বানাইয়া লই এবং ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের জন্য যাই। কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা, আমরা কান্নার খেয়ালও দিলে আনয়ন করি না।

(৯) তাবূকের যুদ্ধে হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর অনুপস্থিতি ও তওবা

তাবুকের যুদ্ধে অক্ষম মাযুর লোক ছাড়াও আশিজনের চেয়ে বেশী মুনাফিক, আনসারদের মধ্য হইতে ছিল এবং প্রায় সমপরিমাণ বেদুঈন এবং ইহা ছাড়াও বাহিরের লোকদের মধ্য হইতে বেশ একটি বড় দল অংশগ্রহণ করে নাই। ইহারা শুধুমাত্র যুদ্ধে শরীক না হইয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই বরং অন্য লোকদিগকেও لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ 'প্রচণ্ড গরমে তোমরা বাহির হইও না' বলিয়া বাধা দিত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে, 'জাহান্নামের আগুনের গরম আরও প্রচণ্ড ও ভয়াবহ।'

উপরোল্লিখিত লোকজন ছাড়া তিনজন সত্যবাদী খাঁটি মুসলমানও এমন ছিলেন যাহারা বিশেষ কোন ওজর ছাড়াই এই যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই। তাহাদের একজন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ), দ্বিতীয় জন হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাযিঃ) এবং তৃতীয়জন ছিলেন হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী (রাযিঃ)। এই তিনজন সাহাবী কোন প্রকার মুনাফেকী বা উযরের কারণে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন নাই। বরং তাহাদের সচ্ছলতাই যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে হযরত কা'ব (রাযিঃ) নিজেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহা সামনে আসিতেছে।

হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী (রাযিঃ)–এর বাগানে খুব বেশী ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার ধারণা হইল, আমি যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই তবে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাছাড়া আমি তো সবসময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াই থাকি। এইবার না গেলে তেমন আর কি অসুবিধা হইবে? এইজন্য তিনি রহিয়া গেলেন কিন্তু যখন তিনি তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন যেহেতু একমাত্র বাগানই ইহার কারণ হইয়াছিল এইজন্য সমস্ত বাগানই তিনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলেন।

হযরত হেলাল (রাযিঃ)এর পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়–স্বজন বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে তাহারা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইয়া গেলেন। তাহারও এইরূপ ধারণা হইল

যে, সকল যুদ্ধেই তো শরীক হইয়া থাকি, এইবার না গেলে তেমন আর কি অসুবিধা হইবে? এইভাবে তাহারও আর যুদ্ধে যাওয়া হইল না। কিন্তু পরে যখন ভুল বুঝিতে পারিলেন যে, এই সম্পর্কই জেহাদে শরীক হইতে না পারার কারণ হইয়াছে, তখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে মনস্থ করিলেন।

হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর ঘটনা হাদীস শরীফে খুব বেশী আসিয়াছে। তিনি বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা শুনাইতেন। তিনি বলেন, তাবুকের পূর্বে কোন যুদ্ধের সময়ই আমি এত বেশী সচ্ছল ও মালদার ছিলাম না, যতখানি তাবুকের সময় ছিলাম। এই সময়ে আমার নিকট নিজস্ব দুইটি উটনী ছিল। ইতিপূর্বে কখনও আমার নিজস্ব দুইটি উটনীর মালিক হওয়ার সুযোগ হয় নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যেই দিকে যুদ্ধে যাইতে মনস্থ করিতেন, উহা প্রকাশ করিতেন না বরং অন্যান্য দিকের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় যেহেতু গরম ছিল প্রচণ্ড, সফরও বহু দূরের ছিল, তাহা ছাড়া শত্রু সৈন্যও ছিল অনেক বেশী। এইজন্য পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের এত বিশাল জামাআত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হইয়া গেল যে, সকলের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করাও মুশকিল ছিল। আর লোকসংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে কেহ না যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া যাইতে চাহিলেও অসম্ভব ছিল না।

এইদিকে ফল সম্পূর্ণরূপে পাকিয়া আসিতেছিল। আমিও প্রত্যহ সকাল হইতে সফরের সামানপত্র তৈয়ারী করার এরাদা করিতাম কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনপ্রকার তৈয়ারী আর হইয়া উঠিত না। তবে আমি মনে মনে ভাবিতাম যে, আমার সচ্ছলতা রহিয়াছে যখন এরাদা পোক্তা হইয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ তৈয়ারীও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এইভাবে গড়িমসি করিতে করিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিন্তু আমার তৈয়ারী শেষ হইল না। তারপরও আমি এইরূপ খেয়াল করিতে থাকিলাম যে, এক দুইদিনের মধ্যেই তৈয়ার হইয়া যাইয়া মিলিত হইব। এইভাবে আজ নয় কাল করিতে থাকিলাম। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া গেলেন। ঐ সময় আমি চেষ্টাও করিলাম কিন্তু আমার তৈয়ারী হইয়া উঠিল না। এখন আমি মদীনার যেদিকেই তাকাই শুধু কলঙ্কযুক্ত মুনাফিক ও কিছু অক্ষম লোক দেখিতে পাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, কা'বের কি হইল? তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না? এক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার ধনসম্পদ ও সাজসজ্জার অহংকার তাহাকে রুখিয়া দিয়াছে। হযরত মুআয (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। আমি যতটুকু জানি, সে ভাল মানুষ। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ চুপ রহিলেন, কোন কিছুই বলিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর মদীনায় ফিরিয়া আসিবার খবর শুনিলাম। ইহাতে দুঃখ ও অনুতাপ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, আমি খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলাম। মনে নানারকম মিথ্যা অজুহাত উদয় হইতে লাগিল যে, আপাততঃ কোন মিথ্যা অজুহাত খাড়া করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগ হইতে জান বাঁচাইয়া লই। পরে সুযোগমত মাফ চাহিয়া লইব। এই ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে থাকিলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসিয়াই পড়িয়াছেন তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য ছাড়া আর কিছুতেই মুক্তি নাই। সুতরাং সত্য বলিবারই মজবুত এরাদা করিয়া ফেলিলাম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত শরীফ এই ছিল যে, তিনি যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন প্রথমে মসজিদে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িতেন। অতঃপর মানুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে কিছু সময় তশরীফ রাখিতেন। অতএব, অভ্যাস অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। মুনাফিকরা আসিয়া মিথ্যা অজুহাত পেশ করিতে লাগিল ও কসম খাইতে আরম্ভ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক ওজর-আপত্তি কবূল করিতে লাগিলেন এবং বাতেনী অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ করিতে থাকিলেন। ইত্যবসরে আমিও হাজির হইলাম ও সালাম করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজীর ভঙ্গিতে মুচকি হাসিলেন এবং মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি মুখ ফিরাইয়া নিলেন! খোদার কসম! আমি না তো মুনাফিক হইয়া গিয়াছি, আর না আমার ঈমানের মধ্যে কোন সংশয় রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এখানে আস! আমি নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছে? তুমি উটনী কিনিয়া রাখিয়াছিলে না? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

যদি এই মুহূর্তে কোন দুনিয়াদারের নিকট হইতাম তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমি যে কোন যুক্তিসংগত মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাইতাম। কেননা, আল্লাহ পাক আমাকে কথা বলিবার যোগ্যতা দান করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, আজ যদি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া আপনাকে রাজী করিয়াও লই তবে অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। আর যদি সত্য সত্য বলিয়া দেই তাহা হইলে আপনি রাগান্বিত হইবেন বটে কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা আপনার রাগ দূর করিয়া দিবেন। তাই সত্যই বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আমি অন্য সময়ের তুলনায় ঐ সময় সবচাইতে বেশী অবসর এবং সচ্ছল ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, আচ্ছা যাও। তোমার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা করিবেন। সেখান হইতে চলিয়া আসার পর আমার গোত্রের বহু লোক আমাকে তিরস্কার করিল যে, তুমি তো ইতিপূর্বে কোন গোনাহ করিয়াছিলে না, কাজেই কোন ওজর পেশ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইস্তেগফারের দরখাস্ত করিতে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফার তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে ছাড়া এমন আরও কেহ আছে কি, যাহার সহিত অনুরূপ আচরণ করা হইয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ, আরো দুইজন আছে, যাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহারাও উহাই বলিয়াছে আর তাহাদেরকে এই উত্তরই দেওয়া হইয়াছে যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইল, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা অপরজন হইল মুরারা ইবনে রবী। আমি দেখিলাম, এই দুইজন নেককার ও বদরী সাহাবীও আমার সাথে শরীক আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তাও নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন যেন কেহ আমাদের সহিত কথা না বলে। আর ইহাই নিয়মের কথা যে, যাহার সহিত সম্পর্ক থাকে, তাহার উপরই রাগ হয়। আর সতর্কও তাহাকেই করা হয় যাহার মধ্যে সংশোধনের যোগ্যতা থাকে। যাহার মধ্যে সংশোধনের যোগ্যতা নাই তাহাকে সতর্ক কে করে।

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধের পর লোকেরা আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল এবং আমাদের হইতে সরিয়া থাকিতে লাগিল এবং মনে হইল, যেন দুনিয়াটাই

বদলাইয়া গিয়াছে এমনকি পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হইতে লাগিল। সকলকেই অপরিচিত মনে হইতে লাগিল, ঘর–দরজাও যেন অপরিচিত হইয়া গেল। আমার সবচাইতে বেশী চিন্তা এই ব্যাপারে ছিল যে, আমি যদি এমতাবস্থায় মারা যাই, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযার নামায পড়িবেন না। আর আল্লাহ না করুন, যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া যায়, তবে আমি চিরদিনই এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব। কেহই আমার সাথে কথা বলিবে না এবং মৃত্যুর পর জানাযার নামাযও পড়িবে না। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের খেলাফ কেহই করিতে পারে না।

মোটকথা, এইভাবে আমাদের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার সঙ্গীদ্বয় প্রথম হইতেই ঘরে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গিয়াছিল। আমি সকলের মধ্যে শক্তিশালী ছিলাম। চলাফেরা করিতাম, হাটে–বাজারে যাইতাম, নামাযেও শরীক হইতাম। কিন্তু কেহই আমার সহিত কথা বলিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইয়া সালাম করিতাম এবং গভীরভাবে লক্ষ্য করিতাম, হুযূর (সাঃ)এর ঠোঁট মোবারক জবাব প্রদানের উদ্দেশ্যে নড়ে কিনা। নামাযান্তে তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায আদায় করিতাম এবং আড়চোখে দেখিতাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিনা। যখন নামাযে রত থাকিতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাইতেন, কিন্তু যখন আমি তাঁহার দিকে তাকাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া নিতেন মনোযোগ সরাইয়া নিতেন।

মোটকথা, এই অবস্থা চলিতে থাকিল। মুসলমানদের কথাবার্তা না বলা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। একদিন আমি আবু কাতাদার দেওয়ালের উপর আরোহণ করিলাম। সম্পর্কে তিনি আমার চাচাত ভাইও ছিলেন। আর আমার সাথে তাহার গভীর সম্পর্কও ছিল। আমি উপরে উঠিয়া তাহাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি আমার মহব্বত রহিয়াছে? তিনি ইহারও কোন জবাব দিলেন না। দ্বিতীয় বার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয় বার আবার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। এই বাক্য শুনিবার পর আমার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে

একদিন আমি মদীনার বাজারে যাইতেছিলাম। এমন সময় জনৈক কিবতীকে বলিতে শুনিলাম, তোমরা কেহ আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলিয়া দাও। সেই কিবতী নাসরানী ছিল এবং সিরিয়া হইতে মদীনায় শস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। সে আমার কাছে আসিল এবং গাস্সানের কাফের বাদশার পক্ষ হইতে আমাকে একটি চিঠি দিল। উহাতে লেখা ছিল আমরা জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের মনিব তোমার উপর জুলুম করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের স্থানে না রাখুন এবং বরবাদ না করুন। তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আস আমরা তোমার সাহায্য করিব। (দুনিয়ার রীতিও ইহাই যে, বড়দের পক্ষ হইতে যখন ছোটদেরকে শাসন করা হয় তখন প্রতারকরা তাহাদেরকে আরও বেশী ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। এবং হিতাকাঙ্খী সাজিয়া এই ধরনের কথা দ্বারা উস্কানী দিয়াই থাকে। কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি এই চিঠি পড়িয়া ইন্নালিল্লাহ পড়িলাম যে, আমার অবস্থা এই পর্যায় পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত আমার ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে এবং আমাকে ইসলাম হইতেও বিচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহা আরেকটি মুসীবত আসিল। এই চিঠি লইয়া আমি একটি চুলাতে নিক্ষেপ করিলাম। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অসন্তুষ্টির কারণে আজ আমার এই অবস্থা যে, কাফেরও আমার ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে।

এমতাবস্থায় যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আমার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই হুকুম লইয়া আসিল যে, আপন স্ত্রীকেও ত্যাগ কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কি অর্থ? তাহাকে তালাক দিয়া দিব কি? বলিল, না, বরং পৃথক থাক। আমার অপর দুই সঙ্গীর কাছেও ঐ দূতের মাধ্যমে একই নির্দেশ পৌঁছে। আমি স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। যতদিন আল্লাহর তরফ হইতে ইহার কোন ফয়সালা না আসে ততদিন সেইখানেই থাকিবে। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল একেবারে বৃদ্ধ লোক। কোন সাহায্যকারী না থাকিলে তো তিনি ধ্বংস হইয়া যাইবেন। আপনি যদি অনুমতি দেন এবং অসুবিধা মনে না করেন তবে আমি তাহার কিছু কাজকর্ম করিয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

কোন অসুবিধা নাই তবে সহবাস করিবে না। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার তো এই কাজের প্রতি কোন আকর্ষণই নাই, এই ঘটনা যেইদিন হইতে ঘটিয়াছে সেইদিন হইতে কান্নাকাটির ভিতর দিয়াই তাহার সময় অতিবাহিত হইতেছে।

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমাকেও বলা হইল যে, তুমিও যদি হেলাল (রাযিঃ)এর ন্যায় স্ত্রীর খেদমত গ্রহণের অনুমতি লইয়া লইতে, সম্ভবতঃ মিলিয়া যাইত। আমি বলিলাম, তিনি বৃদ্ধ আর আমি যুবক। নাজানি আমাকে কি জবাব দেওয়া হয়। তাই আমি সাহস করি না। যাহা হউক এইভাবে আরো দশদিন কাটিয়া গেল। আমাদের সহিত কথাবার্তা ও মেলামেশা বন্ধ অবস্থার ৫০দিন পূর্ণ হইয়া গেল। ৫০তম দিনে ফজরের নামায আপন ঘরের ছাদের উপর আদায় করিয়া অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। জমিন আমার জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং জীবন ধারণ কঠিন হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সালা' পাহাড়ের চূড়া হইতে এক ব্যক্তি সজোরে চিৎকার করিয়া বলিল, কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা শোনামাত্রই আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম এবং আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম মুসীবত কাটিয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করিলেন। ঘোষণা মাত্রই একব্যক্তি তো পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়া জোরে আওয়াজ দিলেন যাহা সবার আগে পৌঁছিয়া গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাড়াতাড়ি আসিলেন। এই সুসংবাদ দানকারীকে আমি আমার পরিধানের কাপড় দান করিয়া দিলাম। খোদার কসম, ঐ দুইটি কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় আমার মালিকানায় ছিল না। অতঃপর দুইটি কাপড় ধার করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। অপর দুই সঙ্গীর কাছেও এমনিভাবে লোকেরা সুসংবাদ লইয়া গেল। আমি যখন মসজিদে নববীতে হাজির হইলাম লোকজন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিল আমাকে মোবারকবাদ জানাইতে দৌড়িয়া আসিল। সর্বপ্রথম আবু তালহা (রাযিঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানাইয়া মুসাফাহা করিলেন, যাহা আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলাম। তাহার নূরানী চেহারা খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং চেহারায় আনন্দপ্রভা পরিস্কার বুঝা যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

চেহারা মোবারক খুশীর সময় চাঁদের ন্যায় ঝলমল করিত। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবার পরিপূর্ণতা হইল এই যে, আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলাম। (কারণ এই সম্পদই এই মুসীবতের কারণ হইয়াছিল।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলিলেন, ইহাতে কষ্ট হইবে কিছু অংশ নিজের কাছেও রাখিয়া দাও। আমি বলিলাম, আচ্ছা, খায়বারের অংশটুকু আমার থাকুক। সত্যই আমাকে মুক্তি দিয়াছে অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সর্বদাই সত্য বলিব। (দুররে মানসূর, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর আনুগত্য, দ্বীনদারী এবং খোদাভীতির নমুনা। তাঁহারা সব সময় যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একবার অনুপস্থিত থাকিবার কারণে কিরূপ অসন্তুষ্টি হইল ; আর কেমন আনুগত্যের সহিত উহা বরদাশত করিলেন যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন কান্নাকাটির ভিতর দিয়া কাটাইলেন এবং যে সম্পদের কারণে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল উহাও সদকা করিয়া দিলেন। কাফেরদের উস্কানিতে উত্তেজিত না হইয়া আরো অনুতপ্ত হইলেন এবং ইহাও আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন এবং ভাবিলেন যে, আমার দ্বীনি দুর্বলতা এই পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত আমাকে বেদ্বীন বানাইবার লিপ্সা করিতেছে।

আমরাও মুসলমান, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের হুকুম ও নির্দেশাবলীও সামনে রহিয়াছে। নামাযের কথাই ধরুন, ঈমানের পর যাহার সমতুল্য কোন বস্তুই নাই কয়জনই বা এই হুকুমকে পালন করে। আর যাহারা পালন করে তাহারাও কিরূপে করে। ইহার পর যাকাত ও হজ্জের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা উহাতে তো মালও খরচ হয়।

(১০) সাহাবীদের হাসির কারণে হুযূর (সঃ)–এর সতর্ক করা ও কবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তশরীফ আনিলেন। কতিপয় লোক খিলখিল করিয়া হাসিতে ছিল এবং হাসির কারণে তাহাদের দাঁত দেখা যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করিতে তবে যে অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি তাহা সৃষ্টি হইত না। অতএব তোমরা মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ কর। কবরের উপর এমন কোন দিন

অতিবাহিত হয় না যেদিন সে এই ঘোষণা দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, নির্জনতার ঘর, মাটির ঘর, পোকা–মাকড়ের ঘর। যখন কোন মুমেন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন সে বলে, তোমার আগমন মোবারক। তুমি খুব ভাল করিয়াছ আসিয়া গিয়াছ। জমিনের বুকে যত লোক বিচরণ করিত তন্মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলে। আজ তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, তুমি আমার উত্তম আচরণ দেখিবে। অতঃপর যে পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌঁছে ঐ পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হইয়া যায় আর উহার দিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলিয়া যায়। যাহা দ্বারা জান্নাতের হাওয়া ও খোশবূ তাহার দিকে আসিতে থাকে।

আর যখন কোন বদকারকে কবরে রাখা হয় তখন সে বলে, তোর আগমন না–মোবারক, তুই আসিয়া ভাল করিস নাই। জমিনের বুকে যত লোক চলাচল করিত তাহাদের মধ্যে তোর প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুই আমার সোপর্দ হইয়াছিস তখন আমার আচরণও দেখিতে পাইবি। অতঃপর কবর তাহাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, পাঁজরের হাড় একটি অপরটির ভিতর ঢুকিয়া যায় এবং এইরূপ সত্তরটি অজগর তাহার উপর নিযুক্ত হইয়া যায় যে, যদি উহার একটিও জমিনের উপর ফুঁৎকার মারে তবে উহার প্রভাবে জমিনের উপর কোন ঘাস পর্যন্ত বাকী থাকিবে না। সে তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (মিশকাত)

ফায়দা ঃ আল্লাহর ভয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর স্মরণ উহার জন্য উপকারী এইজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যবস্থাপত্র বলিয়া দিয়াছেন। অতএব, কখনও কখনও মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাকা অত্যন্ত জরুরী ও উপকারী।

(১১) হযরত হানযালা (রাযিঃ)এর মুনাফেকীর ভয়

হযরত হানযালা (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে ছিলাম। তিনি ওয়াজ করিলেন। ইহাতে অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিজেদের স্বরূপ আমাদের সামনে প্রকাশ পাইয়া গেল। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস

হইতে উঠিয়া ঘরে আসিলাম, বিবি–বাচ্চা কাছে আসিল এবং দুনিয়ার কিছু আলোচনা শুরু হইয়া গেল, ছেলেমেয়েদের এবং স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা হাসিতামাশা শুরু হইয়া গেল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অন্তরের যে অবস্থা ছিল তাহা আর রহিল না। হঠাৎ মনে হইল যে, আমি পূর্বে কি অবস্থায় ছিলাম আর এখন কি হইয়া গেল। মনে মনে বলিলাম, তুই তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছিস। কারণ প্রকাশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তো পূর্বের অবস্থা ছিল আর এখন ঘরে আসিয়া এই অবস্থা হইয়া গেল। অত্যন্ত চিন্তিত এবং দুঃখিত অবস্থায় এই বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইলাম যে, হানযালা মুনাফেক হইয়া গিয়াছে। সম্মুখ হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আসিতেছিলেন, বলিলাম, হানাযালা তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! কি বলিতেছ? কখনও হইতে পারে না। আমি অবস্থা বর্ণনা করিলাম যে, আমরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে থাকি আর তিনি জান্নাত–জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমরা এমন হইয়া যাই যেন জান্নাত–জাহান্নাম আমাদের সামনে রহিয়াছে আর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া আসি তখন বিবি–বাচ্চা ও ক্ষেত–খামারের ধান্ধায় জড়িত হইয়া উহাকে ভুলিয়া যাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, এমন অবস্থা তো আমারও হয়। অতএব উভয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। হানযালা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? হানযালা (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা যখন আপনার খেদমতে হাজির হই আর আপনি জান্নাত–জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমরা এমন হইয়া যাই যেন জান্নাত–জাহান্নাম আমাদের সামনে রহিয়াছে। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বিবি–বাচ্চা ও ঘর–বাড়ীর ধান্ধায় লিপ্ত হই তখন সব ভুলিয়া যাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ সত্তার কসম যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমার মজলিসে থাকাকালীন সময়ে তোমাদের যে অবস্থা হয় তাহা যদি সবসময় থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে বিছানায় এবং রাস্তায় মুসাফাহা করিতে আরম্ভ করিবে। তবে হানযালা! এই অবস্থাও কখনও কখনও হয়। (সর্বদা থাকে না।) (এহ্ইয়া, মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মানুষের সাথে মানবিক প্রয়োজনসমূহও লাগিয়া আছে, যাহা পুরা করাও জরুরী, খানাপিনা বিবি-বাচ্চা এবং তাহাদের খোঁজ-খবর লওয়া এইগুলিও জরুরী বিষয়। কাজেই এই অবস্থা কখনও কখনও সৃষ্টি হইতে পারে সর্বদা নহে। আর সর্বদা সৃষ্টি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করা চাই না। কেননা ইহা ফেরেশতাদের শান। কারণ তাহাদের অন্য কোন ধান্ধাই নাই, না বিবি বাচ্চা, না রুজি-রোজগারের ফিকির, না দুনিয়ার কোন ঝামেলা। পক্ষান্তরে মানুষের সহিত যেহেতু মানবিক প্রয়োজনসমূহ জড়িত রহিয়াছে সেহেতু তাহারা সর্বদা এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, সাহাবায়ে কেরামদের স্বীয় দ্বীনের কত ফিকির ছিল যে, সামান্য কারনে অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমাদের যেই অবস্থার সৃষ্টি হইত উহা পরে বহাল থাকে না, এই কারণে নিজের ব্যাপারে মুনাফেক হওয়ার ধারণা হইল।

"عشق است و ہزار بدگمانی"

অর্থাৎ কাহারও প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকিলে তাহার সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহ ও চিন্তা হয়। আদরের ছেলে সফরে চলিয়া গেলে সবসময় তাহার নিরাপদ থাকার চিন্তা সওয়ার থাকে। আর যদি শুনা যায় যে, সেখানে মহামারী বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে তবে তো খোদা জানেন কত চিঠি এবং টেলিফোন পৌছিবে।

পরিশিষ্ট

খোদাভীতির বিভিন্ন অবস্থা

কুরআন শরীফের আয়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং বুযুর্গদের ঘটনাবলীতে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া রাখা দরকার যে, দ্বীনের সকল পূর্ণতার সিঁড়ি হইল আল্লাহর ভয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হেকমতের মূল উৎস হইতেছে আল্লাহর ভয়। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) খুব ক্রন্দন করিতেন। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষুও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একবার কেহ এই অবস্থা দেখিয়া ফেলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার ক্রন্দনে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আল্লাহর ভয়ে সূর্যও ক্রন্দন করে। আরেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর ভয়ে চাঁদও ক্রন্দন করে।

এক যুবক সাহাবীর নিকট দিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেছিলেন। ঐ সাহাবী তেলাওয়াত করিতেছিলেন। যখন فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ এই আয়াতে পৌছিলেন তখন তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সে বলিতেছিল, হাঁ, যেইদিন আসমান ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমার কি অবস্থা হইবে, হায় আমার ধ্বংস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ক্রন্দনের কারণে ফেরেশতারাও ক্রন্দন করিতেছে।

এক আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়িলেন। অতঃপর বসিয়া অনেক কাঁদিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে ফরিয়াদ করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তুমি ফেরেশতাদেরকেও কাঁদাইলে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) একজন সাহাবী। তিনি একবার ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন, আপনি যে কারণে কাঁদিতেছেন আমিও সেই কারণে কাঁদিতেছি। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, জাহান্নামের উপর দিয়া তো যাইতে হইবেই, জানিনা নাজাত পাইব নাকি সেখানেই পড়িয়া থাকিব। (কিয়ামুল্লাইল)

যুরারা ইবনে আউফা এক মসজিদে নামায পড়াইতেছিলেন। যখন فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ الاية আয়াতে পৌছিলেন তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং মারা গেলেন। লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া মসজিদ হইতে ঘরে পৌছাইয়া দিল।

হযরত খুলাইদ (রহঃ) একবার নামাযে বার বার كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ পড়িতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের এক কোণ হইতে আওয়াজ আসিল, তুমি ইহা আর কতবার পড়িবে? তোমার বার বার পড়িবার কারণে চারজন জ্বিন মারা গিয়াছে।

আরেক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তেলাওয়াত করিতে করিতে যখন وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ এই আয়াতে পৌছিলেন তখন তিনি এক চিৎকার দিলেন এবং ছটফট করিতে করিতে মারা গেলেন। এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর ভয় সকল প্রকার কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হযরত শিবলী

(রহঃ)এর নাম সকলেই জানেন। তিনি বলেন, যখনই আমি আল্লাহকে ভয় করিয়াছি তখনই ইহার বদৌলতে আমার সামনে হেকমত ও উপদেশের এমন দরজা খুলিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও খুলে নাই।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আপন বান্দার উপর দুইটি ভয় একত্র করি না এবং দুইটি নির্ভয় দান করি না। যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নির্ভীক থাকে তবে কেয়ামতের দিন ভয় প্রদর্শন করি আর যদি দুনিয়াতে ভয় করিতে থাকে তবে আখেরাতে নির্ভয় দান করি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে প্রত্যেক বস্তু তাহাকে ভয় করে। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে তাহাকে প্রত্যেক জিনিস ভয় দেখায়।

ইয়াহয়া ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেন, মানুষ গরীবীকে যে পরিমাণ ভয় করে যদি জাহান্নাম সম্পর্কে সে পরিমাণ ভয় করিত তবে সে সোজা জান্নাতে চলিয়া যাইত।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যেই অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় চলিয়া যায় সেই অন্তর বরবাদ হইয়া যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে চক্ষু হইতে আল্লাহর ভয়ে সামান্য পানিও বাহির হয় ; চাই উহা মাছির মাথা পরিমাণই হউক না কেন এবং উহা চেহারার উপর গড়াইয়া পড়ে আল্লাহ তায়ালা ঐ চেহারাকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর ভয়ে যখন মুসলমানের অন্তর কাঁপে তাহার গোনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক এরশাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তাহার পক্ষে জাহান্নামে যাওয়া এমন অসম্ভব যেমন দুধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, নাজাত এবং মুক্তির পথ কি? তিনি বলিলেন, নিজের জবান সামলাইয়া রাখ, ঘরে বসিয়া থাক এবং আপন গোনাহের জন্য কাঁদিতে থাক। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন লোক আছে কি? যে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের

গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে দুইটি ফোঁটা সর্বাধিক পছন্দনীয়। একটি হইল অশ্রুর ফোঁটা যাহা আল্লাহর ভয়ে বাহির হয়। অপরটি রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহর পথে ঝরিয়া পড়ে।

এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন সাত প্রকার ব্যক্তি এইরূপ হইবে যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তজ্জন্য চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাঁদিতে পারে সে কাঁদিবে আর যে কাঁদিতে পারে না সে কাঁদিবার ভান করিবে।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রহঃ) যখন কাঁদিতেন তখন চোখের পানি চেহারায় ও দাড়িতে মুছিতেন এবং বলিতেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, জাহান্নামের আগুন ঐ জায়গাকে স্পর্শ করে না যেখানে চোখের পানি পৌছিয়াছে।

সাবেত বুনানী (রহঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসক বলিল, আপনি যদি একটি ওয়াদা করিতে পারেন তবে আপনার চক্ষু ভাল হইয়া যাইবে। আর তাহা এই যে, আপনি কাঁদিতে পারিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, সেই চক্ষুতে কোন সৌন্দর্যই নাই যেই চক্ষু ক্রন্দন করে না।

ইয়াযীদ ইবনে মাইসারা (রহঃ) বলেন, ক্রন্দন সাত কারণে হইয়া থাকে। যথা—(১) খুশীর কারণে, (২) উন্মাদনার কারণে, (৩) ব্যথার কারণে, (৪) ভয়ের কারণে, (৫) দেখানোর উদ্দেশ্যে, (৬) নেশার কারণে, (৭) আল্লাহর ভয়ে। এই শেষোক্তটিই হইল ঐ ক্রন্দন যাহার একটি ফোঁটাও আগুনের সমুদ্রকে নিভাইয়া দেয়।

কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করি এবং চোখের পানি আমার চেহারার উপর প্রবাহিত হয়—ইহা আমার কাছে পাহাড় সমান সোনা আল্লাহর পথে সদকা করার চাইতেও অধিক পছন্দনীয়।

এই ধরনের আরো হাজারো বর্ণনা রহিয়াছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর স্মরণে এবং গোনাহের চিন্তায় ক্রন্দন করা পরশমণি তুল্য। আর অত্যন্ত জরুরী এবং উপকারী। আপন গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হওয়া চাই তবে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী ও তাহার রহমতের আশায়ও ত্রুটি না হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত প্রত্যেক জিনিসকে বেষ্টন করিয়া আছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর উক্তি বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, কেবল এক ব্যক্তি ছাড়া সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়া দাও, তবে আমি আল্লাহর রহমত হইতে এই আশা করিব যে, ঐ এক ব্যক্তি আমিই হইব। আর যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তি ছাড়া সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দাও। তবে আমার স্বীয় আমলের ব্যাপারে এই ভয় রহিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি আমিই না হইয়া যাই।

অতএব উভয় বিষয়কে পৃথকভাবে বুঝা ও পৃথক রাখা চাই। বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় রহমতের আশা বেশী হওয়া উচিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর ইন্তিকালের সময় হইলে তিনি নিজ ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে ঐ সমস্ত হাদীস পড়িয়া শুনাও যেগুলি দ্বারা আল্লাহর প্রতি আশা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও দরিদ্রতার বর্ণনা

এই বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ও ঘটনাবলীর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও পছন্দ করা বিষয় ছিল। এই বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে এত অধিক সংখ্যক ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে, যেগুলি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করাও দুস্কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দরিদ্রতা মুমেনের উপঢৌকন।

(১) পাহাড়সমূহকে স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে হুযূর (সাঃ)-এর অস্বীকৃতি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রব আমার নিকট এই প্রস্তাব রাখিয়াছেন যে, মক্কার পাহাড়সমূহকে আমার জন্য সোনায় পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহ! আমার কাছে ইহাই পছন্দনীয় যে, একদিন পেট ভরিয়া আহার করিব আরেক দিন ক্ষুধার্ত থাকিব। যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন আপনার

দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি মিনতি করিব আর আপনাকে স্মরণ করিব। আর যখন পেট পূর্ণ করিয়া আহার করিব তখন আপনার শোকরিয়া আদায় করিব এবং আপনার প্রশংসা করিব। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইহা সেই পবিত্র ব্যক্তির অবস্থা আমরা যাহার নাম লইয়া থাকি, যাহার উম্মত হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকি এবং যাহার প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

(২) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সচ্ছলতা কামনার দরুন তাহাকে সতর্ক করা ও হুযূর (সাঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা

একবার স্ত্রীগণের কিছু বাড়াবাড়ির কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করিয়াছিলেন যে, একমাস পর্যন্ত তাঁহাদের কাছে যাইবেন না, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া যান। অতএব তিনি উপরে একটি পৃথক হুজরায় অবস্থান করিয়াছিলেন। লোকজনের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তখন নিজ ঘরে ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, লোকজন বিভিন্ন জায়গায় বসিয়া আছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোস্বা ও মনক্ষুন্নতার কারণে তাহারা কাঁদিতেছে। বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এখন কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে সর্বদা সাবধান করি নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টিজনক কোন কাজ করিবে না। অতঃপর মসজিদে আসিলেন। সেখানে মিম্বরের কাছে একদল লোক বসিয়া কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ তিনি সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু অত্যধিক চিন্তার দরুন বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেখান হইতে উঠিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হুজরায় অবস্থানরত ছিলেন উহার নিকট আসিলেন এবং হযরত রাবাহ্ নামক গোলামের নিকট যিনি হুজরার সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তিনি খেদমতে হাজির হইয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)এর জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। হযরত রাবাহ আসিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিকট ইহাই বলিলেন যে, আমি আপনার কথা বলিয়াছি কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই। হযরত ওমর

(রাযিঃ) নিরাশ হইয়া মিম্বরের কাছে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু বসিতে পারিলেন না, কিছুক্ষণ পর আবার হযরত রাবাহ-এর মাধ্যমে অনুমতি চাহিলেন। এইভাবে তিনবার হইল। একদিকে অস্থিরতার কারণে গোলামের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিতেছেন আর অপরদিক হইতে উত্তরে শুধু নিরবতা। তৃতীয় বার যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত রাবাহ ডাকিয়া বলিলেন, আপনাকে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত আছেন। উহার উপর কোন কিছু বিছানো নাই। খালি চাটাইয়ে শুইবার কারণে দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সুন্দর শরীরে দাগ স্পষ্টরূপেই দেখা যায়। শিয়রে খেজুরের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ ছিল। (হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন,) আমি সালাম করিয়া সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিবিদেরকে তালাক দিয়াছেন কি? উত্তরে বলিলেন, না। ইহার পর আমি সান্ত্বনাস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোরাইশী পুরুষেরা মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতাম, কিন্তু যখন মদীনায় আসিলাম তখন দেখিতে পাইলাম আনসারী মহিলারা পুরুষদের উপর প্রভাব খাটায়। ইহাদের দেখাদেখি কোরাইশী মহিলারাও এরূপ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আমি আরো কিছু কথা বলিলাম যাহার ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় হাসির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। আমি দেখিলাম ঘরে মোট সামান এই ছিল যে, তিনটি কাঁচা চামড়া ও এক মুষ্টি যব যাহা এক কোণে পড়িয়াছিল। আমি এদিক সেদিক তাকাইয়া দেখিলাম এইগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ইহাতে আমার কান্না আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাঁদিব না কেন? আপনার শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়িতেছে আর আপনার ঘরের মোট আসবাব এই যাহা আমি দেখিতেছি। অতঃপর আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, যেন আপনার উম্মত সচ্ছলতা লাভ করে। এই রোম ও পারস্য যাহারা আল্লাহর এবাদত করে না, বেদ্বীন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য এত প্রাচুর্য। এই কায়সার-কেসরা বাগ-বাগিচা ও নহরের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে আর আপনি আল্লাহর রাসূল তাহার খাছ বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর এই কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ওমর! এখনও কি তুমি এই ব্যাপারে সন্দেহে পড়িয়া আছ? শোন, আখেরাতের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বহু উত্তম। এই কাফেরদের উত্তম খাবার এবং সুখ–সম্ভার দুনিয়াতেই তাহারা পাইয়া গিয়াছে। আর আমাদের জন্য আখেরাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই আমি ভুল করিয়াছি, আমার জন্য ইস্তেগফার করুন।(ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ এই হইল দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনধারা। চাটাইয়ের উপর কোন চাদর বিছানো নাই, শরীরের উপর দাগ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থাও জানা হইয়াছে। তদুপরি এক ব্যক্তি দোয়ার দরখাস্ত করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চামড়ার বিছানা ছিল উহাতে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ)এর কাছেও কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চট ছিল। উহা দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিতাম। একদিন মনে করিলাম যদি চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিই তাহা হইলে বেশী নরম হইবে। এই ভাবিয়া চার ভাঁজ করিয়া দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে কি বিছাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, ঐ চটই ছিল যাহা চার ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই করিয়া দাও। ইহার কোমলতা রাত্রিজাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। (শামায়েল)

এখন আমরা আমাদের নরম নরম এবং তুলার তৈরী তোষকসমূহের প্রতিও দেখি, আল্লাহ তায়ালা কত সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছেন ইহার পরও শোকরিয়ার পরিবর্তে সর্বদা মুখে অভাবেরই অভিযোগ চলিতে থাকে।

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) একবার কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আবু হুরাইরার কথা আর কি বলিব,

সে আজ কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করিতেছে! অথচ আমার ঐ দিনের কথা স্মরণ আছে যখন আমি (আবু হুরাইরা) বেহুঁশ হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর এবং হুজরার মাঝখানে পড়িয়া থাকিতাম। আর লোকেরা পাগল মনে করিয়া পা দ্বারা আমার গর্দান মাড়াইত। অথচ মস্তিস্ক বিকৃতি ছিল না বরং উহা ছিল ক্ষুধার কারণে।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ একাধারে কয়েকদিন অনাহারে থাকার কারণে অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। আর লোকেরা মনে করিত পাগল হইয়া গিয়াছে। বলা হয় সেই যুগে পাগলের চিকিৎসা পা দ্বারা গর্দান মাড়াইয়া করা হইত। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং অল্পেতুষ্ট লোকদের মধ্যে ছিলেন। একাধারে কয়েক দিন না খাইয়া থাকিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আল্লাহ তায়ালা চতুর্দিকে বিজয় দিলেন তখন তাঁহার সচ্ছলতা আসে। তিনি বড় আবেদও ছিলেন। তাঁহার কাছে একটি থলি ছিল। উহাতে খেজুরের দানা ভর্তি থাকিত। ঐগুলির সাহায্যে তসবীহ পড়িতেন। যখন উহা সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইত তখন বাঁদী আবার উহাকে ভরিয়া তাঁহার কাছে রাখিয়া দিত। তাঁহার ইহাও নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজে, স্ত্রী ও খাদেম এই তিনজনের মধ্যে রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া নিতেন এবং পালাক্রমে তিনজনের মধ্য হইতে একজন ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। (তাযকেরাতুল-হুফ্ফাজ) আমি (অর্থাৎ লেখক) আমার আব্বাজানের কাছে শুনিয়াছি, আমার দাদাজীরও প্রায় এই নিয়ম ছিল। রাত্রি ১টা পর্যন্ত আমার আব্বাজান কিতাব মুতালায়া (অধ্যয়ন) করিতেন। ১টার সময় দাদাজান তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হইতেন। তখন তিনি তাগিদ করিয়া আব্বাজানকে শোয়াইয়া দিতেন। আর নিজে তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যাইতেন। রাত্র প্রায় পৌনে এক ঘন্টা বাকী থাকিতে আমার চাচাজানকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাইতেন। আর তিনি সুন্নতের অনুসরণ হিসাবে আরাম করিতেন। (হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাঁহাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।)

(৪) হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাপড়ের ব্যবসা করিতেন এবং ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সকালবেলা কয়েকটি চাদর হাতে লইয়া বিক্রয় করার জন্য বাজারের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত

সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, বাজারে যাইতেছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি যদি ব্যবসায় মশগুল হইয়া যান তবে খেলাফতের কাজ চলিবে কিভাবে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে পরিবার পরিজনকে খাওয়াইব কোথা হইতে? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আবু উবাইদার কাছে চলুন, যাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' উপাধি দিয়াছেন। তিনি আপনার জন্য বাইতুল মাল হইতে কিছু নির্ধারণ করিয়া দিবেন। উভয়ে তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি একজন মুহাজির সাধারণভাবে যে পরিমাণ ভাতা পাইত—বেশীও নয়, কমও নয়—সেই পরিমাণ তাঁহার জন্য নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

একবার তাঁহার স্ত্রী আবেদন করিলেন, কিছু মিষ্টি জিনিস খাইতে মন চাহিতেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আমার কাছে তো খরিদ করার মত পয়সা নাই। স্ত্রী বলিলেন, আমাদের দৈনন্দিন খোরাক হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁচাইয়া রাখিব। কয়েক দিন পর ঐ পরিমাণ হইয়া যাইবে। তিনি অনুমতি দিয়া দিলেন। স্ত্রী কয়েকদিনে অল্প পয়সা জমা করিলেন। তিনি বলিলেন, বুঝা গেল এই পরিমাণ মাল বাইতুল মাল হইতে আমরা অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেছি। এই জন্য স্ত্রী যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন উহাও বাইতুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং আগামীর জন্য নিজের ভাতা হইতে ঐ পরিমাণ কমাইয়া দিলেন যেই পরিমাণ তাঁহার স্ত্রী দৈনিক জমা করিয়াছিলেন।

ফায়দা ঃ এত বড় খলীফা এবং বাদশাহ যিনি পূর্ব হইতে নিজের ব্যবসাও করিতেন আর উহা জীবিকার জন্য যথেষ্টও ছিল। যেমন বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন তখন বলিলেন যে, আমার কওমের লোকেরা জানে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন খেলাফতের কারণে আমি মুসলমানদের কাজে ব্যস্ত হইয়াছি অতএব আমার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া বাইতুল মাল হইতে নির্ধারিত হইবে। এতদসত্ত্বেও যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ইন্তিকাল হইতে লাগিল তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ওসিয়ত করিলেন যে, বাইতুল মাল হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমার কাছে রহিয়াছে সেইগুলি যেন আমার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার নিকট অর্পণ করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার কাছে কোন দীনার–দেরহাম ছিল না। একটি দুধের উটনী, একটি পেয়ালা, একজন খাদেম, কোন কোন বর্ণনায় একটি চাদর ও একটি বিছানার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত জিনিস স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে যখন হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কাছে পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর (রাযিঃ)এর প্রতি রহম করুন, তিনি পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলিয়া গেলেন। (ফাতহুল বারী)

(৫) হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা

হযরত ওমর (রাযিঃ)ও ব্যবসা করিতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হন তখন বাইতুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় লোকজনকে সমবেত করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, আমি ব্যবসা করিতাম। এখন তোমরা আমাকে খেলাফতের কাজে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছ। এখন আমার জীবিকা নির্বাহের কি ব্যবস্থা হইবে। লোকেরা বিভিন্ন পরিমাণ উল্লেখ করিল। হযরত আলী (রাযিঃ) নীরব বসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি রায়। তিনি বলিলেন, মধ্যম পর্যায়ে নির্ধারণ করা হউক যাহা আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট হয়। হযরত ওমর (রাযিঃ) এই রায় পছন্দ করিলেন এবং গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং মধ্যম পর্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইল। উহার পর একবার এক মজলিসে যেখানে হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত ওসমান (রাযিঃ), হযরত যুবাইর (রাযিঃ) ও হযরত তালহা (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন আলোচনা হইল যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ভাতা আরো বৃদ্ধি করা চাই। কারণ, যে পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয় উহাতে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়। কিন্তু তাঁহার কাছে আরজ করিতে সাহস হইল না। তাই তাঁহার কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ) যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হওয়ার কারণে উম্মুল মুমিনীন ছিলেন তাঁহার খেদমতে গেলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর রায় ও অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমাদের নাম যেন জানিতে না পারেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) যখন হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর কাছে এই বিষয় আলোচনা করিলেন তখন তাঁহার চেহারায় গোস্সার আলামত পরিলক্ষিত হইল। হযরত ওমর (রাযিঃ) নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলিলেন, প্রথমে আপনার অভিমত জানা হউক। হযরত ওমর

(রাযিঃ) বলিলেন, আমি যদি তাহাদের নাম জানিতে পারিতাম তবে তাহাদের চেহারা বিকৃত করিয়া দিতাম অর্থাৎ এমন শাস্তি দিতাম যাহার ফলে চেহারায় দাগ পড়িয়া যাইত। তুমিই বল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম পোশাক তোমার ঘরে কি ছিল? তিনি বলিলেন, গেরুয়া রংয়ের দুইটি কাপড় যাহা জুমআর দিন অথবা কোন প্রতিনিধি দল আসিলে পরিধান করিতেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে সর্বোত্তম খানা কি খাইয়াছেন? আরজ করিলেন, আমাদের খাদ্য ছিল যবের রুটি। একবার আমি গরম রুটিতে ঘিয়ের কৌটার তলানী উপুড় করিয়া লাগাইয়া দিলাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তৃপ্তি সহকারে খাইতেছিলেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াইতেছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বোত্তম বিছানা কি ছিল যাহা তোমার ঘরে বিছানো হইত? তিনি বলিলেন, একটি মোটা কাপড় ছিল যাহা গরম কালে চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া নিতেন আর শীতকালে উহার অর্ধেক বিছাইতেন আর অর্ধেক গায়ে দিতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, হে হাফসা, তুমি তাহাদেরকে এই কথা পৌঁছাইয়া দাও যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং (আখেরাতের) আশায় সন্তুষ্ট থাকিয়াছেন। আমিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিব। আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয় অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর উদাহরণ ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যাহারা একই রাস্তায় চলিল। প্রথম ব্যক্তি একটি পাথেয় লইয়া রওয়ানা হইয়াছে এবং মঞ্জিলে পৌঁছিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়জনও প্রথমজনের অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহারই তরীকায় চলিয়াছে, সেও প্রথম ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি চলিতে শুরু করিয়াছে যদি এই ব্যক্তি তাহাদের দুইজনের অনুসরণ করে তবে সেও তাহাদের সাথে যাইয়া মিলিত হইবে আর যদি তাহাদের অনুসরণ না করে তবে তাহাদের সহিত কখনও মিলিত হইতে পারিবে না। (আশহার)

ফায়দা ঃ ইহা এমন এক ব্যক্তির অবস্থা যাহার ভয়ে দুনিয়ার অন্য বাদশাহরা পর্যন্ত ভীত ও কম্পিত হইত। অথচ তিনি কিরূপ সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়াছেন! একবার তিনি খুতবা পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার লুঙ্গিতে বারটি তালি লাগানো ছিল তন্মধ্যে একটি তালি চামড়ারও ছিল। একবার জুমআর নামাযে আসিতে দেরী হইলে তিনি উহার কারণ

বর্ণনা করিলেন যে, আমার কাপড় ধৌত করিতে দেরী হইয়াছে আর এই কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় ছিল না। (আশহার)

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) খানা খাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার গোলাম আসিয়া বলিল, উতবা ইবনে আবি ফারকাদ আসিয়াছেন। তিনি ভিতরে আসার অনুমতি দান করিলেন এবং খানা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি খাওয়ায় শরীক হইলেন কিন্তু এত মোটা রুটি ছিল যে, গিলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, চালা আটার রুটিও তো হইতে পারিত। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সমস্ত মুসলমানই কি ময়দার রুটি খাইবার সামর্থ্য রাখে? উতবা (রাযিঃ) বলিলেন, না সবাই সামর্থ্য রাখে না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আফসোস! তুমি কি চাও যে, আমি সমস্ত স্বাদ দুনিয়াতেই ভোগ করিয়া ফেলি? (উসদুল-গাবাহ্)

এই ধরনের শত সহস্র নয় লাখো ঘটনা এই সমস্ত বুযুর্গের রহিয়াছে। এই যামানায় না তাহাদের অনুসরণ করা সম্ভব আর না প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমীচীন। কেননা, শারীরিক দুর্বলতার কারণে এই যামানায় তাহাদের মত কষ্ট সহ্য করা কঠিন। এই জন্যই বর্তমান যুগে তাসাউফের মাশায়েখগণ এমন মুজাহাদার অনুমতি দেন না যাহার ফলে দুর্বলতা পয়দা হয়, কেননা এমনিই তো দুর্বল। ঐ সমস্ত বুযুর্গকে আল্লাহ তায়ালা শক্তিও দান করিয়াছিলেন। তবে তাহাদের অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইহাতে আরামপ্রিয়তা কিছুটা কমিয়া যাইবে এবং দৃষ্টি নীচু থাকিবে এবং বর্তমান যুগোপযোগী মধ্যম পন্থায় মুজাহাদা করার অভ্যাস পয়দা হইবে। কারণ, আমরা সবসময় দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় অগ্রগামী হইতেছি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চেয়ে অধিক সম্পদশালী লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি, আর এই আক্ষেপে মরিতেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী।

(৬) হযরত বিলাল (রাযিঃ) কর্তৃক হুযূর (সঃ)-এর জন্য এক মুশরেকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ

হযরত বিলাল (রাযিঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খরচপত্রের কি ব্যবস্থা হইত? তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছুই জমা থাকিত না। এই দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যবস্থা এই ছিল যে, কোন ক্ষুধার্ত মুসলমান আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মেহমানদারীর কথা বলিতেন। আমি কোথাও হইতে ঋণ করিয়া

তাহার খানাপিনার ব্যবস্থা করিতাম। কোন বস্ত্রহীন আসিলে আমাকে আদেশ করিতেন আমি কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহার বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। এইভাবেই চলিতে থাকিত।

একবার জনৈক মুশরেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে বলিল, আমার তো আর্থিক সচ্ছলতা আছে। অতএব তুমি অন্য কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ না করিয়া প্রয়োজন হইলে আমার নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করিও। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ইহার চাইতে উত্তম আর কি হইতে পারে। অতএব তাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে শুরু করিলাম। যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম হইত তাহার নিকট হইতে ঋণ লইয়া হুকুম পুরা করিতাম।

একদিন আমি ওযু করিয়া আযান দেওয়ার জন্য মাত্র দাঁড়াইয়াছিলাম। ঐ মুশরিক একদল লোক সহ আসিয়া বলিতে লাগিল, ওহে হাবশী! আমি তাহার দিকে তাকাইতেই সে উত্তেজিত হইয়া গালিগালাজ করিতে শুরু করিল এবং ভালমন্দ যাহা মুখে আসিল বলিল। আর বলিতে লাগিল যে, মাস শেষ হইতে আর কতদিন বাকী আছে? আমি বলিলাম, প্রায় শেষ হওয়ার পথে। সে বলিল, আর মাত্র চার দিন বাকী আছে, মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করিলে তোকে পূর্বের ন্যায় আমার ঋণের বিনিময়ে গোলাম বানাইয়া লইব। আর পূর্বের ন্যায় বকরী চরাইয়া বেড়াইবি। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার উপর সারাদিন যে অবস্থায় কাটিবার কাটিয়াছে। সারাদিন দুঃখ ও বেদনায় মন ভারী হইয়া রহিল। ইশার নামাযান্তে আমি নির্জনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না আপনার কাছে এই সময় ঋণ আদায়ের কোন তড়িৎ ব্যবস্থা আছে আর না আমি এত তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। সে তো অপমান করিবে, কাজেই ঋণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আত্মগোপন করিয়া থাকার অনুমতি দিন। যখন আপনার নিকট কোথাও হইতে কিছু আসিয়া যাইবে তখন আমি হাজির হইয়া যাইব। এই বলিয়া আমি ঘরে আসিয়া পড়িলাম এবং ঢাল তরবারী ও জুতা লইলাম, এইগুলিই সফরের সামান ছিল। ভোরের অপেক্ষা করিতেছিলাম, ভোর হইতেই কোথাও চলিয়া যাইব। ভোর হইতে বেশী দেরী ছিল না এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চল। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তখন দেখিলাম যে, মাল বোঝাই করা চারটি উটনী বসিয়া আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে খুশীর কথা শুনাইব কি? আল্লাহ তায়ালা তোমার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই উটনীসমূহ মালামালসহ তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম। আমার জন্য ফাদাকের সরদার হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলাম এবং আনন্দের সাথে এইগুলি লইয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিলাম। এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অপেক্ষমান ছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, হুযূর! আল্লাহর শোকরিয়া আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন, সামান্য ঋণও বাকী নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সামান হইতে কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে কি? আমি বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহাও বন্টন করিয়া দাও, যাহাতে আমার শান্তি লাভ হয় ; যতক্ষণ ইহা বন্টন না হইয়া যাইবে ততক্ষণ আমি ঘরেও যাইব না। সারাদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ইশার নামাযের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশিষ্ট মাল বন্টন হইয়াছে কিনা? আমি বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। কোন অভাবগ্রস্ত লোক আসে নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই আরাম করিলেন। পরদিন এশার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল কিছু বাকী আছে কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরাম ও স্বস্তি দান করিয়াছেন। সম্পূর্ণ মাল বন্টন হইয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলেন। তিনি এই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, নাজানি আমার মৃত্যু আসিয়া যায় আর কিছু মাল আমার মালিকানাধীন থাকিয়া যায়। অতঃপর তিনি ঘরে যাইয়া বিবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। (বযলুল মজহুদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ সর্বদা ইহাই কামনা করেন যে, তাহাদের মালিকানাধীন যেন কোন সম্পদ না থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নবীদের সরদার এবং ওলীকুল শিরমনি ছিলেন। তিনি এই কামনা কেন করিবেন না যে, আমি দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাই।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এর এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁহার নিকট যখন হাদিয়ার টাকা কিছু জমা হইয়া যাইত তখন গুরুত্বসহকারে সেইগুলি আনাইয়া

সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে পরণের কাপড়–চোপড়ও আপন বিশেষ খাদেম হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)কে দান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এখন তোমার নিকট হইতে ধার করিয়া পরিধান করিব। এমনিভাবে আমার মরহুম পিতা (হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)কে একাধিক বার দেখিতে পাইয়াছি, মাগরিবের পর তাঁহার কাছে যাহা কিছু টাকা পয়সা থাকিত তাহা কোন পাওনাদারকে দিয়া দিতেন। কেননা তিনি কয়েক হাজার টাকার ঋণগ্রস্ত ছিলেন। আর তিনি বলিতেন, ইহা ঝগড়ার বস্তু। রাত্রে আমার নিকট রাখিব না।

এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বুযুর্গদের সম্পর্কে রহিয়াছে। তবে প্রত্যেক বুযুর্গের একই অবস্থা হওয়া জরুরী নহে। বুযর্গদের অবস্থা ও রং বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। বাগানের সব ফুল এক রকম হয় না। এক এক ফুল তাহার রং ও গন্ধে অপরটি হইতে পৃথক ও অনন্য হইয়া থাকে।

(৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)-এর ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, তোমরা যদি ঐ সময় আমাদের অবস্থা দেখিতে যে, আমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো কয়েক বেলা পর্যন্ত এই পরিমাণ খাবার জুটিত না যাহা দ্বারা কোমর সোজা হইতে পারে। আমি ক্ষুধার তাড়নায় জমিনের সহিত কলিজা লাগাইয়া রাখিতাম, কখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, আবার কখনও পেটে পাথর বাঁধিয়া লইতাম।

একবার আমি যাতায়াতের পথে বসিয়া গেলাম। প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) গমন করিলেন। আমি তাহাকে কোন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কথা বলিতে বলিতে ঘরে লইয়া যাইবেন অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে যাহা থাকে মেহমানদারী করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না (সম্ভবতঃ ঐ দিকে তাঁহার খেয়াল যায় নাই অথবা তিনি নিজের ঘরের অবস্থা জানিতেন যে, সেখানেও কিছু নাই)। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) আসিলেন। তাহার সাথেও একই অবস্থা হইল। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিলেন। আমার উদ্দেশ্য এবং অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বলিলেন, আবু হুরাইরা! আমার সাথে আস। আমি তাঁহার সঙ্গী হইয়া

গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও অনুমতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে এক পেয়ালা দুধ রাখা ছিল। উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। উত্তরে বলা হইল, অমুক জায়গা হইতে আপনার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু হুরাইরা! যাও আহলে সুফ্‌ফাকে ডাকিয়া আন। আহলে সুফ্‌ফা ইসলামের মেহমান হিসাবে গণ্য হইতেন। তাঁহাদের না কোন ঘরবাড়ী ছিল, না কোন ঠিকানা আর না ছিল খাওয়া-দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তাঁহাদের সংখ্যা কম-বেশ হইতে থাকিত। তবে এই সময় তাঁহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে দুই দুই, চার চার জনকে কখনও কখনও কোন সচ্ছল সাহাবীর মেহমান বানাইয়া দিতেন। আর তাঁহার নিজের অভ্যাস এই ছিল যে, কোথাও হইতে সদকা আসিলে উহা তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজে উহাতে অংশগ্রহণ করিতেন না। আর যদি কোথাও হইতে হাদিয়া আসিত তবে উহাতে তাঁহাদের সহিত তিনি নিজেও শরীক হইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সবাইকে ডাকিতে বলিলেন। ইহা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হইল। কেননা এই দুধের পরিমানই বা কতটুকু যে সকলকে ডাকিয়া আনিব। সকলের জন্য কি হইবে একজনের জন্যও তো যথেষ্ট হওয়া মুশকিল হইবে। আর ডাকিয়া আনার পর আমাকেই পান করানোর নির্দেশ দেওয়া হইবে, যাহার ফলে আমার পালাও আসিবে সবার শেষে। তখন আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। তাই আমি গেলাম এবং সকলকে ডাকিয়া আনিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লও সকলকে পান করাও। আমি এক একজনের হাতে পেয়ালা দিতাম আর সে খুব তৃপ্তি মিটাইয়া পান করিত এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিত। এমনিভাবে সকলকে পান করাইলাম, সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজ হাতে লইয়া আমার প্রতি দেখিলেন এবং মুচকি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন তো আমি আর তুমিই বাকী আছি। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, লও পান কর। আমি পান করিলাম। বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। অবশেষে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আর পান করিতে

পারিতেছি না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অবশিষ্ট সবটুকু পান করিয়া নিলেন।

(৮) হুযূর (সঃ)এর সাহাবায়ে কেরামের নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আল্লাহর কসম সে এমন যোগ্য লোক যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে, কাহারো সুপারিশ করিলে উহা মঞ্জুর হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া চুপ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তি সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশ্ন করিলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন গরীব মুসলমান, কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে কেহ বিবাহ দিবে না ; কোথাও সুপারিশ করিলে উহা মঞ্জুর হইবে না ; কথা বলিলে কেহ কর্ণপাত করিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত লোক দ্বারা যদি সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া যায় তবু তাহাদের সকলের চাইতে এই ব্যক্তি উত্তম।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নিছক দুনিয়াবী মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন মূল্যই রাখে না। একজন গরীব মুসলমান যাহার দুনিয়াতে কোনই মর্যাদা নাই যাহার কথা কোথাও গ্রাহ্য করা হয় না এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঐ সকল শত শত মর্যাদাবান লোকদের অপেক্ষা উত্তম যাহাদের কথা দুনিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাদের কথা শুনিতে এবং মানিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাহাদের কোন মূল্য নাই। আল্লাহওয়ালাদের বরকতেই দুনিয়া টিকিয়া আছে। হাদীস শরীফে আছে, যেদিন দুনিয়াতে আল্লাহর নাম লওয়ার মত কেহ থাকিবে না সেদিন কেয়ামত ঘটিয়া যাইবে এবং দুনিয়ার অস্তিত্বই শেষ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামেরই বরকত যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা কায়েম রহিয়াছে।

(৯) হুযূর (সঃ)-এর সহিত মহব্বতকারীদের দিকে দরিদ্রতা ধাবিত হওয়া

জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভাবিয়া দেখ কি বলিতেছ। সে পুনরায় একই কথা আরজ করিল যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই উত্তর দিলেন। তিনবার এইরূপ প্রশ্নোত্তর হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি আপন দাবীতে সত্যবাদী হও তবে দারিদ্র্যের চাদর পরিধান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। কেননা যাহারা আমাকে ভালবাসে দরিদ্রতা তাহাদের দিকে এমন বেগে ধাবিত হয় যেমন নিম্নভূমির দিকে পানির স্রোত ধাবিত হয়।

ফায়দা ঃ এইজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অধিকাংশ সময় অভাব-অনটন ও উপবাস অবস্থায়ই কাটাইয়াছেন। বড় বড় মুহাদ্দিস, সুফি ও ফকীহগণও খুব বেশী সচ্ছলতায় জীবন-যাপন করেন নাই।

(১০) আম্বর অভিযানে অভাব-অনটনের অবস্থা

৮ম হিজরীর রজব মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র উপকূলে তিনশত লোকের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহাদের উপর হযরত আবূ উবায়দা (রাযিঃ)কে আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি থলির মধ্যে রসদস্বরূপ কিছু খেজুরও তাহাদেরকে দিলেন। তাহারা পনের দিন সেখানে অবস্থান করিলেন এবং রসদ ফুরাইয়া গেল উক্ত কাফেলার মধ্যে হযরত কায়েস (রাযিঃ) ছিলেন, তিনি মদীনায় ফিরিবার পর মূল্য আদায় করিবার ওয়াদা করিয়া কাফেলার সাথীদের নিকট হইতে উট খরিদ করিয়া জবাই করিতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন তিনটি করিয়া উট জবাই করিতেন কিন্তু তৃতীয় দিন কাফেলার আমীর এই ভাবিয়া যে, সওয়ারী শেষ হইয়া গেলে ফিরিয়া যাওয়া কষ্টকর হইয়া যাইবে।

উট জবাই করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সকলের নিকট তাহাদের নিজেদের যে পরিমাণ খেজুর মওজুদ ছিল তাহা একত্র করিয়া একটি থলিতে রাখিলেন এবং দৈনিক এক একটি করিয়া খেজুর বন্টন করিয়া দিতেন। যাহা চুষিয়া তাহারা পানি পান করিয়া লইতেন এবং রাত পর্যন্ত ইহাই তাহাদের খাবার ছিল। বলিতে তো সহজ কিন্তু যুদ্ধের

ময়দানে যেখানে শক্তি সামর্থ্যেরও প্রয়োজন রহিয়াছে সেখানে একটি খেঁজুরের উপর সারাদিন কাটাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দিল গুর্দার ব্যাপার। সুতরাং হযরত যাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার পর যখন এই ঘটনা লোকদেরকে শুনাইলেন, তখন জনৈক শাগরেদ জিজ্ঞাসা করিল যে, একটি খেজুর দ্বারা কি হইত। তিনি বলিলেন, একটি খেজুরের মূল্য তখন বুঝে আসিল যখন একটি খেজুরও থাকিল না। তখন ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। গাছের শুকনা পাতা ঝাড়িয়া পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া লইতাম। অসহায় অবস্থা মানুষকে সবকিছু করিতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেক কষ্টের পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের পর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্র হইতে তাহাদের নিকট আম্বর নামক একটি মাছ পৌঁছাইয়া দিলেন। মাছটি এত বড় ছিল যে, আঠার দিন পর্যন্ত তাহারা উহা হইতে খাইতে থাকিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছা পর্যন্ত উহার গোশত রসদ স্বরূপ তাহাদের সঙ্গে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন সফরের বিস্তারিত ঘটনা বলা হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি রিযিক ছিল যাহা তোমাদের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

ফায়দা ঃ দুঃখকষ্ট এবং বিপদ-আপদ এই দুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য বিষয়। বিশেষ করিয়া আল্লাহ ওয়ালাগণের উপর বিপদ-আপদ বেশী আসিয়া থাকে। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণকে সর্বাধিক মুসীবতে রাখা হয়। তারপর যাহারা উত্তম তাহাদেরকে এবং তারপর অবশিষ্টদের মধ্যে যাহারা উত্তম হয় তাহাদেরকে অধিক মুসীবতে রাখা হয়। মানুষকে তাহার দ্বীনী যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। আর প্রত্যেক কষ্ট এবং মুসীবতের পর আল্লাহর অনুগ্রহে সহজ অবস্থাও লাভ হয়। ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের বুযুর্গদের উপর কি কি অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে। এই সবকিছুই দ্বীনের স্বার্থে ছিল। যে দ্বীন আমরা নিজ হাতে বিনষ্ট করিতেছি ঐ দ্বীনের প্রসারের জন্য তাঁহারা ক্ষুধার্ত থাকিয়াছেন, গাছের পাতা চিবাইয়াছেন, রক্ত দিয়াছেন। এই সব কিছুর বিনিময়ে দ্বীন প্রচার করিয়াছেন। অথচ আজ আমরা উহা টিকাইয়াও রাখিতে পারিতেছি না।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর তাকওয়া ও পরহেজগারীর বর্ণনা

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রত্যেকটি আদব ও অভ্যাস গ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য। আর হইবেই না কেন? আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য এই জামাতকে নির্বাচন ও বাছাই করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি মানবজাতির সর্বোত্তম যুগে প্রেরিত হইয়াছি।' (শিফা) তাই সর্বদিক দিয়া এই যুগ কল্যাণের যুগ ছিল এবং যুগের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকদেরকে তাঁহার সাহচর্যে রাখা হইয়াছে।

(১) হুযূর (সঃ)এর একটি জানাযা হইতে ফিরিবার পথে একজন মহিলার দাওয়াত

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় জনৈকা মহিলার পক্ষ হইতে খানার দাওয়াত আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন খাদেমদের সহ মহিলার বাড়ীতে গেলেন। অতঃপর খানা সম্মুখে পেশ করা হইলে লোকেরা দেখিতে পাইল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকমা চিবাইতেছেন কিন্তু গিলিতে পারিতেছেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনে হইতেছে এই বকরীর গোশ্ত মালিকের অনুমতি ব্যতীত আনা হইয়াছে। মহিলা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বকরীর পাল হইতে বকরী খরিদ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম সেখানে পাওয়া যায় নাই। আমার প্রতিবেশী বকরী খরিদ করিয়াছিল। আমি তাহার নিকট মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করার জন্য পাঠাইলাম তখন তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার স্ত্রী বকরীটি পাঠাইয়া দিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কয়েদীদেরকে খাওয়াইয়া দাও। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা ও শান হিসাবে একটি সন্দেহযুক্ত খাবার গলায় আটকাইয়া যাওয়া বড় কিছু নয়। যেখানে তাঁহার অনুসারী সাধারণ গোলামদেরও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

(২) সদকার খেজুরের আশঙ্কায় হুযূর (সঃ)-এর সারারাত্র জাগরণ

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র অনিদ্রা অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করিতে থাকেন। বিবিগণের মধ্য হইতে কেহ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনার ঘুম আসিতেছে না? এরশাদ ফরমাইলেন, একটি খেজুর পড়িয়া ছিল। নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া উঠাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন উহা সদকার খেজুর কিনা এই ব্যাপারে আশঙ্কা হইতেছে।

ফায়দা ঃ উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব খেজুর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু সদকার মালও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিত, এই সন্দেহের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারারাত্রি ঘুম আসে নাই যে, খোদা না করুন উহা সদকার হইতে পারে এবং এমতাবস্থায় সদকার মাল খাওয়া হইয়াছে। ইহা হইল আমাদের মনিবের অবস্থা যে, শুধু সন্দেহের উপর সারারাত্র পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন এবং ঘুম আসিল না। এখন তাঁহার গোলামদের অবস্থা দেখুন কেমন আনন্দের সাথে সুদ, ঘুষ, চুরি ও ডাকাতির মাল খাইতেছে। আবার গর্বের সহিত নিজেকে তাঁহার গোলাম বলিয়া দাবী করিতেছে।

(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর এক গণকের খানা খাইবার কারণে বমি করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর একটি গোলাম ছিল। সে দৈনিক উপার্জনের একটা নির্দিষ্ট অংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে দিত। একবার সে কিছু খাবার আনিল আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উহা হইতে এক লোকমা খাইয়া ফেলিলেন। গোলাম বলিল, আপনি তো প্রতিদিন উপার্জনের উৎস জিজ্ঞাসা করিতেন, আজ তো জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি বলিলেন, আজ প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নাই। এখন বল। সে বলিল, জাহেলিয়াতের যুগে আমি এক গোত্রের নিকট গমন করি এবং তাহাদের জন্য মন্ত্র পাঠ করি। তাহারা আমাকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিল। আজ যখন আমি সেখান দিয়া যাইতেছিলাম তখন তাহাদের সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতেছিল। তাহারা আমাকে এই খাবার দিয়াছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে ধ্বংসই করিয়া দিতে। অতঃপর তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমি করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটি মাত্র লোকমা তাহাও প্রচণ্ড ক্ষুধার অবস্থায় খাইয়াছিলেন বাহির হইল না।

কেহ বলিল, পানি দ্বারা বমি হইতে পারে। তিনি বিরাট এক পেয়ালায় পানি আনাইলেন এবং পানি পান করিয়া করিয়া বমি করিতে থাকিলেন, শেষ পর্যন্ত ঐ লোকমা বাহির করিয়া ফেলিলেন। কেহ বলিল, আল্লাহ আপনার উপর রহক করুন, এই একটি লোকমার কারণে এত কষ্ট সহ্য করিলেন? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি উহা বাহির হইয়া আসিত তবু আমি উহা বাহির করিতাম। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয় উহার জন্য জাহান্নামই শ্রেয়। আমার এই ভয় হইল যে, আমার শরীরের কোন অংশ এই লোকমা দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যায়।

(মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল)

ফায়দা ঃ এই ধরনের ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে সতর্কতা ও সাবধানতা ছিল অত্যধিক। সামান্য একটু সন্দেহ হইলেই তিনি বমি করিয়া ফেলিতেন।

বুখারী শরীফে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কোন এক গোলাম জাহেলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে জ্যোতিষীদের মত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উহা সঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই গোলামকে কিছু দিল। সে উহা হইতে নির্ধারিত অংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে দিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উহা খাইলেন এবং পরে যাহা কিছু পেটে ছিল সবই বমি করিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীতে ইহা জরুরী নহে যে, গোলামদের মাল নাজায়েযই হইবে। উভয়টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর অতি সতর্কতা ঐ সন্দেহযুক্ত মালকেও পছন্দ করিল না।

(৪) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সদকার দুধপান করার কারণে বমি করা

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার কিছু দুধপান করিলেন, কিন্তু উহার স্বাদ অস্বাভাবিক ও ভিন্ন রকম মনে হইল। যে ব্যক্তি পান করাইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ কিভাবে ও কোথা হইতে আসিয়াছে? সে বলিল, অমুক মাঠে সদকার উট চরিতেছিল। আমি সেখানে গেলে তাহারা দুধ দোহন করিল। সেই দুধ হইতে তাহারা আমাকেও দিল। হযরত

ওমর (রাযিঃ) মুখে হাত ঢুকাইয়া সমস্ত দুধ বমি করিয়া ফেলিলেন।

(মুআত্তা ইমাম মালেক)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত বুযুর্গের সর্বদা এই চিন্তা থাকিত যে, সন্দেহযুক্ত মালও যেন শরীরের অংশে পরিণত না হয়। সম্পূর্ণ হারাম মালের তো প্রশ্নই আসে না যাহা আমাদের এই যমানায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) সতর্কতা স্বরূপ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বাগান ওয়াক্‌ফ করা

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, বাইতুল–মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আমার মন চাহিতেছিল না। কিন্তু ওমর (রাযিঃ) মানিলেন না এবং বলিলেন যে, ইহাতে কষ্ট হইবে আর আপনার ব্যবসায় মশগুল হওয়ার কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হইবে। এইজন্য বাধ্য হইয়া আমাকে বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে হইল। এখন উহার পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি যেন দিয়া দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং পিতার অসিয়ত অনুযায়ী সেই বাগানটি দান করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমার পিতার উপর রহম করুন। তাহার উদ্দেশ্য হইল যে, কাহাকেও মুখ খুলিবার সুযোগই দিবেন না। (কিতাবুল আমওয়াল)

ফায়দা ঃ চিন্তা করার বিষয় এই যে, প্রথমতঃ উহার পরিমাণই বা কি ছিল যাহা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বাইতুল মাল হইতে লইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ উহাও বিজ্ঞ সাহাবাদের বারবার অনুরোধ ও মুসলমানদের স্বার্থের কারণেই লইয়াছিলেন। তদুপরি ইহাতেও যতটুকু সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল তাহা করিয়াছেন, যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪নং ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাহার স্ত্রী কষ্ট করিয়া কম খাইয়া মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু পয়সা জমা করিলেন, তাহাও তিনি বায়তুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং ঐ পরিমাণ ভাতা হইতে সব সময়ের জন্য কমাইয়া দিলেন। এই সব কিছুর পরেও শেষ কাজ এই করিলেন যে, যাহা লইয়াছিলেন উহারও বিনিময় দিয়া দিলেন।

(৬) হযরত আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ)এর ভাড়া ঘরের মাটি দ্বারা লেখা শুকানো

জনৈক মুহাদ্দিস আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ) বলেন, আমি একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতাম। একবার আমি কিছু লিখিবার পর উহা শুকাইবার জন্য মাটির প্রয়োজন হইল। কাঁচা দেওয়াল ছিল। মনে মনে ভাবিলাম ইহা হইতে কিছু মাটি ঘঁষিয়া লইয়া লিখার উপর ছিটাইয়া দিব। পরে মনে আসিল, ইহা তো ভাড়া ঘর, শুধু থাকার জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে, মাটি ব্যবহার করার জন্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই খেয়ালও আসিল যে, সামান্য একটু মাটি তেমন কি অসুবিধা হইবে। ইহা একটি নগণ্য জিনিস। অতএব মাটি নিলাম। রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিতেছে, কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে ইহা বলা যে, 'সামান্য মাটি কি জিনিস।'

ফায়দা ঃ 'কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে'—ইহার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাকওয়ার অনেক স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে কামেল স্তর নিশ্চয়ই এই ছিল যে, এই সামান্য মাটি গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকা। যদিও ইহা সাধারণতঃ মামুলী জিনিস হিসাবে জায়েযের সীমার ভিতরেই ছিলে।

(এহ্ইয়া)

(৭) হযরত আলী (রাযিঃ)-এর এক কবরের নিকট দিয়া গমন

কুমাইল নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি একবার হযরত আলী (রাযিঃ)এর সাথে যাইতেছিলাম। তিনি একটি ময়দানে পৌঁছিলেন। অতঃপর একটি কবরস্থানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে কবরবাসী! হে জরা–জীর্ণ! হে নির্জনবাসী! তোমাদের কি খবর, কি অবস্থা? ইহার পর বলিলেন, আমাদের খবর তো এই যে, তোমাদের পর সমস্ত ধনসম্পদ বন্টন হইয়া গিয়াছে। সন্তানেরা এতীম হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। ইহা তো আমাদের খবর। তোমাদের নিজেদেরও কিছু শুনাও। অতঃপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমাইল! ইহাদের যদি কথা বলিবার অনুমতি হইত এবং কথা বলিতে পারিত, তবে তাহারা উত্তরে এই বলিত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল তাকওয়া। এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, হে কুমাইল! কবর হইতেছে আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর সময় সব কথা জানা হইয়া যায়।

(মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ সিন্দুকে যেমন মাল সংরক্ষিত থাকে তদ্রূপ মানুষ ভালমন্দ আমল যাহা করে উহা তাহার কবরে সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, নেক আমল সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে এবং মৃত ব্যক্তিকে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তাহার সহিত থাকে। আর মন্দ আমল কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া হাজির হয় যাহা মৃত ব্যক্তির জন্য আরও বেশী কষ্টের কারণ হয়।

এক হাদীসে আছে, মানুষের সাথে তিন জিনিস কবর পর্যন্ত যায় ঃ তাহার মাল, যেমন আরবে ইহার প্রচলন ছিল, তাহার আত্মীয়–স্বজন ও আমল। তন্মধ্যে দুইটি অর্থাৎ মাল ও আত্মীয়–স্বজন দাফনের পর ফিরিয়া আসে আর আমল তাহার সাথে থাকিয়া যায়।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান— তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার–পরিজন এবং মাল ও আমলের উদাহরণ কি? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জানিতে চাহিলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহার উদাহরণ এইরূপ যে, এক ব্যক্তির তিন ভাই আছে এবং মৃত্যুকালে সে এক ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার অবস্থা তোমার জানা আছে যে, আমার উপর দিয়া এখন কি বিপদ অতিবাহিত হইতেছে। এই সময় তুমি আমার কি সাহায্য করিবে? সে বলিল, আমি তোমার সেবাযত্ন করিব, চিকিৎসা করিব, সর্বপ্রকার খেদমত করিব। মৃত্যুর পর গোসল দিব, কাফন পরাইয়া কাঁধে বহণ করিয়া লইয়া যাইব এবং দাফন করিবার পর তোমার প্রশংসা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ভাই হইল পরিবার–পরিজন। অতঃপর দ্বিতীয় ভাইকে একই প্রশ্ন করিলে সে বলে যে, আমার এবং তোমার সম্পর্ক শুধু হায়াতের সহিত। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। এই ভাই হইল মাল। অতঃপর তৃতীয় ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমি কবরে তোমার সঙ্গী হইব, নির্জন স্থানে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব, তোমার হিসাবের সময় নেকীর পাল্লায় বসিয়া উহা ঝুকাইয়া দিব। এই ভাই হইল আমল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন বল কোন্ ভাই উপকারে আসিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তৃতীয় ভাইই উপকারে আসিল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাই কোন উপকারেই আসিল না। (মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল)

(৮) হুযূর (সাঃ)এর এরশাদ-যাহার খানা-পিনা হালাল নয় তাহার দোআ কবুল হয় না

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র আর তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ঐ জিনিসের আদেশ দিয়াছেন যাহার প্রতি স্বীয় রসুলগণকে আদেশ দিয়াছেন। যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হইয়াছে— يَآاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط

اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۔

অর্থাৎ, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস আহার কর এবং নেক আমল কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছি।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে—

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۔

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক হইতে আহার কর।

ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিলেন যে, সে দীর্ঘ সফর করে। (আর মুসাফিরের দুআ কবুল হয়) এবং তাহার চুল এলোমেলো, কাপড় ধুলায় ধূসরিত। (অর্থাৎ পেরেশান অবস্থা) এমতাবস্থায় দুই হাত উপরের দিকে তুলিয়া বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তাহার খাদ্যও হারাম, পানিও হারাম, পরিধানের কাপড়ও হারাম। সর্বদা হারামই খাইয়াছে। অতএব তাহার দোয়া কীভাবে কবুল হইতে পারে? (জামউল ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ লোকেরা সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকে যে, মুসলমানদের দোয়া কেন কবুল হইতেছে না। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস দ্বারা অবস্থার কিছুটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানীর দ্বারা কখনও কাফেরের দোয়াও কবুল করিয়া লন, সেখানে ফাসেকের দোয়া তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তবুও মুত্তাকীদের দোয়াই প্রকৃত দোয়া। এইজন্য মুত্তাকীদের নিকট দোয়া কামনা করা হয়। যাহারা চায় যে, আমাদের দোয়া কবুল হোক, তাহাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী হইল তাহারা যেন হারাম মাল হইতে বিরত থাকে। আর এমন কে আছে, যে এই কামনা করে যে, আমার দোয়া কবুল না হউক।

(৯) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিজ স্ত্রীর দ্বারা মেশ্‌ক ওজন করাইতে অস্বীকৃতি

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেদমতে বাহরাইন হইতে মেশক আসিলে তিনি বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিত। তাঁহার স্ত্রী আতেকা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া দিত তবে আমি বন্টন করিয়া দিতাম। তাঁহার স্ত্রী আবারও বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি নীরব রহিলেন। তৃতীয় বারে বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি নিজ হাতে উহা পাল্লায় রাখিবে। আবার সেই হাত নিজের শরীরে বুলাইয়া লইবে, যদ্দরুন এই পরিমাণ আমার অংশে বেশী হইবে।

ফায়দা ঃ ইহা ছিল তাহার চরম পরহেজগারী এবং নিজকে অপবাদ হইতে মুক্ত রাখার জন্য তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। নচেৎ যে কেহ মাপিবে তাহার হাতে কিছু না কিছু লাগিবেই। এইজন্য উহা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন স্ত্রীর ব্যাপারে ইহা পছন্দ করেন নাই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যাহাকে দ্বিতীয় ওমরও বলা হয়, তাহার যমানায় একবার মেশক ওজন করা হইতেছিল, তখন তিনি নাক বন্ধ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, খোশবূ গ্রহণই মেশকের উদ্দেশ্য। (এহ্ইয়া) ইহাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আমাদের বুযর্গানে দ্বীনের সতর্কতা ও পরহেজগারী।

(১০) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক হাজ্জাজের গভর্নরকে গভর্নর নিযুক্ত না করা

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কোন এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। কেহ বলিল, এই ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে তাহার পক্ষ হইতেও গভর্নর ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সেই গভর্নরকে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, আমি তো হাজ্জাজের শাসনামলে অল্প কয়েক দিন মাত্র কাজ করিয়াছি। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি তাহার সাহচর্যে একদিন বা উহার চাইতেও কম সময় থাকিয়াছ। (এহ্ইয়া)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ সঙ্গে থাকার প্রভাব অবশ্যই পড়ে। যে ব্যক্তি মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকে তাহার উপর অস্বাভাবিকরূপে ও অজ্ঞাতসারে

তাকওয়ার প্রভাব পড়ে। আর যে ব্যক্তি ফাসেকদের সঙ্গে থাকে তাহার উপর নাফরমানীর প্রভাব পড়ে। এই কারণেই খারাপ সঙ্গ হইতে বাধা দেওয়া হয়। মানুষ তো দূরের কথা, সঙ্গে থাকার কারণে জানোয়ারেরও প্রভাব পড়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, উট ও ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে অহংকার থাকে এবং বকরীওয়ালাদের মধ্যে নম্রতা থাকে। (বুখারী)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে, নেককার লোকের সঙ্গে উপবেশনকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে মেশকওয়ালার পাশে বসিয়া আছে, মেশক যদি নাও মিলে তবুও উহার খুশবুতে মস্তিষ্ক সতেজ হইবে। আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত আগুনের চুল্লিওয়ালার মত যদি স্ফুলিঙ্গ নাও পড়ে ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং উহাতে খুশু-খজু

নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কেয়ামতের দিন ঈমানের পরে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কুফর ও ইসলামের মধ্যে নামাযই অন্তরায়। ইহা ছাড়াও এই সম্বন্ধে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো বহু এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যাহা আমার অন্য একটি পুস্তিকায় (ফাযায়েলে নামাযে) উল্লেখ করিয়াছি।

(১) নফল আদায়কারীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমার পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। ফরয ব্যতীত অন্য কোন এবাদত দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আমার নৈকট্য লাভ হয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে। আর নফল আদায় করার দ্বারা বান্দা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে এমনকি আমি তাহাকে আমার প্রিয় বানাইয়া লই। অতঃপর আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে এবং তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে কোন বস্তু ধরে, আর তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার

নিকট কোন কিছু চায় তবে আমি দান করি আর যদি কোন কিছু হইতে আশ্রয় চায় তবে আমি আশ্রয় দান করি। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ চক্ষু, কান ইত্যাদি হওয়ার অর্থ এই যে, তাহার দেখাশুনা এবং চলাফেরা সবকিছু আমার মর্জি মোতাবেক হয় ; কোন কাজই আমার মর্জি ও সন্তুষ্টির খেলাফ হয় না। কতই না সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের ফরয আদায়ের পর অধিক পরিমাণে নফল আদায় করার তৌফীক লাভ হয়, যদ্দরুন এই দৌলত নসীব হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাকে এবং আমার বন্ধুদেরকেও এই সৌভাগ্য নসীব করুন।

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা রাত্র নামায আদায় করা

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখিয়া থাকিলে বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ বিষয় আশ্চর্যজনক ছিল না ; তাঁহার প্রত্যেকটি বিষয়ই তো আশ্চর্যজনক ছিল। একদিন রাত্রে তশরীফ আনিলেন এবং আমার নিকট শুইলেন। কিছুক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন, ছাড় আমি তো আপন রবের এবাদত করিব। এই বলিয়া তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সীনা মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকু করিলেন। উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। তারপর সেজদা করিলেন। উহাতেও অনুরূপভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন, উহাতেও অনুরূপভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। এইভাবে ফজর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকিলেন। ফজরের সময় হযরত বিলাল (রাযিঃ) আসিয়া নামাযের জন্য আওয়াজ দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত কাঁদিতেছেন অথচ আপনি নিষ্পাপ ; আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গোনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি এইরূপ করিব না কেন অথচ আজ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইয়াছে— إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তন বিবর্তনে

জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

আরো বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে এত দীর্ঘ নামায পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পা ফুলিয়া যাইত। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত কষ্ট করেন? অথচ আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (বুখারী)

(৩) হুযূর (সঃ)এর চার রাকাতে ছয় পারা তেলাওয়াত করা

হযরত আওফ (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি মিসওয়াক এবং ওজু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। আমিও তাঁহার সাথে নামাযে শরীক হইয়া গেলাম। তিনি এক রাকাতে সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিলেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসিত তখন দীর্ঘসময় পর্যন্ত রহমতের দোয়া করিতে থাকিতেন। আর যখন আযাবের আয়াত আসিত দীর্ঘসময় পর্যন্ত আযাব হইতে পানাহ চাহিতেন। সূরা শেষ করিয়া রুকুতে গেলেন। রুকুতে ঐ পরিমাণ দেরী করিলেন যে পরিমাণ সময়ে সূরায়ে বাকারা পড়া যায়। রুকুতে سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعَظَمَةِ পড়িতেছিলেন। অতঃপর সেজদাও ঐ পরিমাণ দীর্ঘ করিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে একই নিয়মে সূরায়ে আলি ইমরান তেলাওয়াত করিলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাকাতে এক এক সূরা তেলাওয়াত করিতে থাকিলেন। এইভাবে চার রাকাতে সোয়া ছয় পারা হয়। ইহা কত দীর্ঘ নামায হইবে যাহাতে প্রত্যেক রহমাতের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দোয়া করা হয়। আবার রুকু সেজদাও সেই পরিমাণ দীর্ঘ করা হইয়া থাকে।

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামায পড়া সম্পর্কিত নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, চার রাকাতে চার সূরা অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ উক্ত চার সূরা সোয়া ছয় পারা হয় যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাতে তেলাওয়াত করিয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজবীদ ও তারতীলের সহিত তেলাওয়াত করিতেন, যেমন অধিকাংশ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকে রহমতের আয়াতে ও আযাবের আয়াতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করিতেন এবং অনুরূপভাবে রুকু সেজদাও দীর্ঘ করিতেন। ইহাতে অনুমান করা যায়

যে, এইভাবে চার রাকাতে কি পরিমাণ সময় লাগিয়াছে। কখনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে সূরায়ে বাকারা, আলি ইমরান ও মায়েদা তেলাওয়াত করিয়াছেন যাহা প্রায় পাঁচ পারা। এইরূপ তখনই সম্ভব যখন নামাযের মধ্যে প্রশান্তি এবং চোখের শীতলতা লাভ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁহার অনুসরণের তৌফীক দান করুন।

৪ হযরত আবু বকর, হযরত ইবনে যুবাইর ও হযরত আলী (রাযিঃ) ও অন্যান্যদের নামাযের অবস্থা

মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আবু বকর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, যখন তাহারা নামাযে দাঁড়াইতেন তখন এইরূপ মনে হইত যেন একটি কাষ্ঠখণ্ড মাটিতে গাড়া রহিয়াছে। অর্থাৎ, কোন প্রকার নড়াচড়া করিতেন না। (তারীখুল খোলাফা)

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে নামায শিখিয়াছেন আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্থাৎ যেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেন ঠিক সেভাবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামায পড়িতেন। আর একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) নামায পড়িতেন। ছাবেত (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর নামায এমন হইত যেন কোন স্থানে একটি কাঠ পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে।

এক ব্যক্তি বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) যখন সিজদা করিতেন তখন এত দীর্ঘ এবং এত শান্ত ও অবিচল অবস্থায় সেজদা করিতেন যে, তাঁহার পিঠে পাখি আসিয়া বসিয়া যাইত। কখনও এত দীর্ঘ রুকু করিতেন যে, সমস্ত রাত্রি সকাল পর্যন্ত রুকুতেই কাটাইয়া দিতেন। কখনও সেজদা এতই দীর্ঘ হইত যে, সারা রাত্রি কাটিয়া যাইত। যখন হযরত ইবনে যুবাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একবার একটি গোলা আসিয়া মসজিদের দেওয়ালের একটি অংশ উড়াইয়া লইয়া গেল। যাহা তাঁহার দাড়ি এবং গলদেশের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল। এতদসত্ত্বেও না তিনি বিচলিত হইলেন আর না রুকু সেজদা সংক্ষেপ করিলেন।

একবার তিনি নামাযরত ছিলেন। তাঁহার ছেলে হাশেম নিকটেই

ঘুমাইতেছিল। ছাদ হইতে একটি সাপ পড়িয়া তাহার শরীরে জড়াইয়া গেল। সে চিৎকার করিলে বাড়ীর সমস্ত লোকজন দৌড়িয়া আসিল এবং হৈ গোল শুরু হইয়া গেল। অতঃপর সাপটিকে মারিয়া ফেলা হইল কিন্তু হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) একাগ্রচিত্তে নামায পড়িতে থাকিলেন। সালাম ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন কিছু শোরগোল শুনিতে পাইলাম কি হইয়াছিল? স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, ছেলে তো মারাই যাইতেছিল আর আপনার কোন খবরই নাই! তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক! নামাযের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ দিলে কি উহা নামায থাকিত?

হযরত ওমর (রাযিঃ)কে জীবনের শেষ সময়ে যখন খঞ্জর মারা হইল যাহার ফলে তিনি ইন্তেকাল করিলেন তখন সারাক্ষণ রক্তক্ষরণ হইত। অধিকাংশ সময় বেহুঁশও হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও যখন নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করা হইত তখন ঐ অবস্থায় নামায আদায় করিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, ইসলামে ঐ ব্যক্তির কোন অংশ নাই যে নামায ছাড়িয়া দেয়। হযরত উছমান (রাযিঃ) সারারাত্র জাগিতেন, এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করিতেন। (মুন্তাখাব কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত আলী (রাযিঃ)এর অভ্যাস ছিল, যখন নামাযের ওয়াক্ত হইত তখন তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত এবং চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সেই আমানত আদায়ের সময় হইয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালা আসমান–যমীন এবং পাহাড়–পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু উহারা এই আমানত গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে আর আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি।

খলফ ইবনে আইয়ুব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, নামাযের সময় আপনাকে মাছি বিরক্ত করে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, ফাসেক লোকরা হুকুমতের বেত্রাঘাত সহ্য করে এবং কোন প্রকার নড়াচড়া করে না বরং গর্ব করে, আর নিজের ধৈর্য ও সবরের বাহাদুরী দেখায় যে, আমাকে এতগুলি বেত্রাঘাত করা হইয়াছে আমি একটুও নড়ি নাই। আর আমি আপন রবের সামনে দণ্ডায়মান হইয়াছি আর সামান্য মাছির কারণে নড়াচড়া করিব?

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন তখন ঘরের লোকজনকে বলিতেন, তোমরা কথাবার্তা বলিতে থাক, তোমাদের কথাবার্তায় আমার কোন খবরই থাকিবে না। একবার তিনি বসরার জামে মসজিদে নামায আদায় করিতেছিলেন। মসজিদের একটি অংশ ধসিয়া

পড়িল। লোকজন দৌড়াইয়া সেখানে জমা হইল। শোরগোল হইল কিন্তু তিনি কিছুই টের পাইলেন না।।

হাতেম আসাম্ম (রহঃ)এর নিকট কেহ তাঁহার নামাযের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন অজু করিয়া নামাযের জায়গায় যাইয়া কিছুক্ষণ বসি যাহাতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত হইয়া যায়। অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়াই। এই ধ্যান করি যে, কাবা শরীফ আমার সামনে, পুলসিরাত আমার পায়ের নীচে, ডান দিকে জান্নাত, বামদিকে জাহান্নাম আর মালাকুল-মউত আমার পিছনে দাঁড়ানো। আর মনে করি যে, ইহাই আমার জীবনের শেষ নামায। অতঃপর পূর্ণ একাগ্রতার সহিত নামায পড়ি। অতঃপর আশা ও ভয়ের মাঝে থাকি, কারণ জানিনা আমার নামায কবুল হইল কিনা। (এহ্‌ইয়া)

(৫) জনৈক মুহাজির ও আনসারীর পাহারাদারী এবং আনসারী ব্যক্তির নামাযে তীরবিদ্ধ হওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জেহাদ হইতে ফিরিবার সময় এক স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারা দিবে? একজন মুহাজির আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) এবং একজন আনসারী আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা পাহারা দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পথ দিয়া শত্রুর আগমনের সম্ভাবনা ছিল সেই দিকের একটি পাহাড় দেখাইয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর। উভয় সেখানে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর আনসারী সাহাবী মুহাজিরকে বলিলেন, রাত্রিকে দুই ভাগ করিয়া একভাগে আপনি ঘুমাইবেন আর আমি জাগ্রত থাকিব আরেকভাগে আপনি জাগ্রত থাকিবেন আর আমি ঘুমাইব। কেননা, উভয়ই সারারাত্র জাগ্রত থাকিলে হইতে পারে কোন এক সময় উভয়েরই ঘুম আসিয়া যাইবে। জাগ্রত ব্যক্তি যদি কোন আশঙ্কা বোধ করে তবে আপন সঙ্গীকে জাগাইবে।

রাত্রের প্রথম ভাগে আনসারী সাহাবীর জাগ্রত থাকিবার সিদ্ধান্ত হইল। মুহাজির ঘুমাইয়া পড়িলেন। আনসারী সাহাবী নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি আসিয়া দূর হইতে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। কোন প্রকার নড়াচড়া না দেখিয়া দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। এইভাবে সে তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। প্রতিটি তীর আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইতে থাকিল আর তিনি উহা হাত দ্বারা শরীর হইতে বাহির

করিয়া ফেলিয়া দিতে থাকিলেন।

অতঃপর তিনি ধীরস্থিরভাবে রুকু সেজদা করিলেন এবং নামায শেষ করিয়া সঙ্গীকে জাগাইলেন। শত্রুপক্ষের লোকটি একজনের স্থলে দুইজনকে দেখিতে পাইয়া মনে করিল নাজানি আরো কি পরিমাণ লোক রহিয়াছে তাই সে ভাগিয়া গেল। মুহাজির সঙ্গী জাগ্রত হইয়া দেখিলেন আনসারীর শরীরের তিন স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরিতেছে। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি শুরুতেই আমাকে জাগাইলেন না কেন? আনসারী বলিলেন, আমি নামাযে একটি সূরা (সূরায়ে কাহ্‌ফ) শুরু করিয়াছিলাম। সূরাটি শেষ না করিয়া রুকুতে যাইতে মনে চাহিল না। এখন আমার এই ব্যাপারে ভয় হইল যে, এমন না হয় যে, বারবার তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে আমি মৃত্যুবরণ করি আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহারার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি আমার এই আশঙ্কা না হইত তবে আমি মৃত্যুবরণ করিতাম কিন্তু সূরা শেষ না করিয়া রুকু করিতাম না। (বাইহাকী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এই ছিল ঐ সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তির নামায এবং উহার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ। তীরের পর তীর খাইতেছেন আর রক্তে রঞ্জিত হইতেছেন কিন্তু নামাযের স্বাদে কোন রকম ব্যতিক্রম হইতেছে না। আর আমাদের নামায এইরূপ যে, যদি মশাও কামড় দেয় তবে নামাযের ধ্যান ছুটিয়া যায়। আর ভিমরুলের কথা তো বাদই দিলাম।

এখানে ফেকাহ সম্পর্কিত একটি বিতর্কিত মাসআলা আছে। আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মতে রক্ত বাহির হইলে অযু ভঙ্গ হইয়া যায় আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে অযু ভঙ্গ হয় না। সম্ভবতঃ ঐ সাহাবীর অভিমতও ইহাই ছিল অথবা তখন পর্যন্ত এই মাসআলার তাহ্‌কীক হয় নাই ; কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। অথবা তখন পর্যন্ত এই হুকুম নাযিলই হয় নাই।

(৬) হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)এর নামাযে অন্য ধ্যান আসিয়া যাওয়ার কারণে বাগান ওয়াক্‌ফ করা

হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ) একবার নিজ বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। একটি পাখি উড়িতে লাগিল। কিন্তু ঘন বাগানের কারণে পাখিটি বাহির হওয়ার পথ না পাইয়া কখনও এইদিকে কখনও ঐদিকে উড়িতে থাকিল এবং বহির হওয়ার পথ তালাশ করিতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পড়িল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঐ দিকে ধ্যান চলিয়া

গেল এবং পাখির সাথে তাঁহার দৃষ্টিও এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকিল। হঠাৎ নামাযের ধ্যান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কোন্ রাকাত পড়িতেছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। অত্যন্ত দুঃখ হইল যে, এই বাগানের কারণেই এই মুসীবত আসিয়াছে যে, নামাযে ভুল হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যেহেতু এই বাগানের কারণে আমি এই মুসীবতে পড়িয়াছি, তাই এই বাগান আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা উহা খরচ করিতে পারেন।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে ঘটিয়াছিল। এক আনসারী সাহাবী নিজ বাগানে নামায আদায় করিতেছিলেন। খেজুর পাকার ভরা মৌসুম ছিল। অধিক খেজুরের ভারে কাঁদিগুলি ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। কাঁদিগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িল খেজুরে ভরা হওয়ার কারণে খুবই ভাল লাগিল। ঐদিকে ধ্যান চলিয়া গেল। ফলে নামায কত রাকাত পড়িয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। ইহাতে এত বেশী দুঃখ ও অনুতাপ হইল যে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাগানের কারণে এই মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছি সেই বাগানই আর রাখিব না। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বাগান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে চাই ; আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি সেই বাগান পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উক্ত মূল্য দ্বীনি কাজে ব্যয় করিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ফায়দা ঃ ইহা হইতেছে ঈমানী মর্যাদাবোধ যে, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতে ধ্যান ছুটিয়া যাওয়ার দরুন পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যের একটি বাগান সঙ্গে সঙ্গে দান করিয়া দিলেন।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) 'কওলে জামীল' নামক কিতাবে সুফিয়ায়ে কেরামের নিসবতের (অর্থাৎ আল্লাহর সহিত সম্পর্কের) প্রকারভেদ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, এই নিসবত বা সম্পর্ক হইতেছে আল্লাহর এবাদতকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্তরে ইহার মর্যাদা অনুভব করা। এই সমস্ত বুযর্গের এই কথার উপর ঈমানী মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হইল যে, আল্লাহর এবাদতের সময় অন্যদিকে ধ্যান কেন গেল?

(৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর নামাযের কারণে চক্ষুর চিকিৎসা না করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর চোখে যখন পানি আসিয়া গেল,

তখন চিকিৎসকরা আসিয়া বলিল, অনুমতি দিলে আমরা আপনার চোখের চিকিৎসা করিয়া দিব। তবে পাঁচ দিন একটু সতর্ক থাকিতে হইবে ; মাটিতে সেজদা না করিয়া কোন উঁচু কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমি এক রাকাতও এইভাবে পড়িতে রাজি নই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আমার জানা আছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়িয়া দিবে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ যদিও উযর বশতঃ এইভাবে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে এবং ইহা নামায ত্যাগ করার মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অন্তরে নামাযের প্রতি যে মহব্বত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক আমল করার প্রতি যেরূপ গুরুত্ব ছিল উহার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) চোখের চিকিৎসায় সম্মত হন নাই। তাঁহাদের কাছে সমস্ত দুনিয়া এক নামাযের মোকাবিলায় তুচ্ছ ছিল। আজ আমরা নির্লজ্জতার সহিত এই সকল জীবন উৎসর্গকারীদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ফেলি কিন্তু কাল হাশরের ময়দানে যখন তাহাদের সম্মুখীন হইব আর এই আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণ ময়দানে হাশরের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন তখন হাকীকত বুঝে আসিবে যে, তাঁহারা কি ছিলেন আর আমরা তাঁহাদের সাথে কিরূপ আচরণ করিয়াছি।

(৮) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। জামাতের সময় হইয়া গেলে তিনি দেখিলেন যে, সাথে সাথে সকলেই নিজ নিজ দোকান বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে— رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

সম্পূর্ণ আয়াতের তরজমা হইল—

"এই সকল মসজিদে এমন সমস্ত লোক সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাহাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিশেষ করিয়া নামায আদায় ও যাকাত প্রদান হইতে বেচাকেনা গাফেল করিতে পারে

না। তাহারা এমন দিনের পাকড়াওকে ভয় করেন যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু উলট–পালট হইয়া যাইবে।" (বয়ানুল কুরআন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাহারা ব্যবসা–বাণিজ্য ও নিজেদের কাজকর্মে লিপ্ত হইতেন বটে কিন্তু যখন আযানের আওয়াজ শুনিতেন তখন সবকিছু ছাড়িয়া সাথে সাথে মসজিদে চলিয়া যাইতেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! এই সমস্ত লোক ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাহাদের ব্যবসা তাহাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। লোকজনকে দেখিলেন আযানের সাথে সাথে নিজ নিজ সামানপত্র রাখিয়া নামাযের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল। ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াত দ্বারা স্মরণ করিয়াছেন।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জগতের মখলুককে এক জায়গায় একত্র করিবেন তখন বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা সুখ–দুঃখ উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করিত? তখন একটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পুনরায় বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা রাত্রে জাগ্রত থাকিত এবং ভয় ও আগ্রহের সহিত আপন রবকে স্মরণ করিত? তখন আরেকটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহাদেরকে তাহাদের ব্যবসা–বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিত না? তখন তৃতীয় আরেকটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট লোকদের হিসাব শুরু হইবে। (দুররে মানসূর)

(৯) হযরত খুবাইব (রাযিঃ)এর কতল হওয়ার সময় নামায পড়াঃ হযরত যায়েদ (রাযিঃ) ও হযরত আসেম (রাযিঃ)এর কতল

উহুদের যুদ্ধে যে সমস্ত কাফের নিহত হইয়াছিল তাহাদের আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুলাফার দুই পুত্রও ঐ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাই সে মান্নত

করিয়াছিল, যদি আসেমের মাথা হাতে পাই তবে তাহার মাথার খুলিতে শরাব পান করিব। (কারণ, আসেমই তাহার পুত্রদেরকে হত্যা করিয়াছিল) তাই সে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, যে ব্যক্তি আসেমের মাথা আনিয়া দিবে তাহাকে একশত উট পুরস্কার দিব।

সুফিয়ান ইবনে খালেদ নামক জনৈক কাফের এই পুরস্কারের লোভে পড়িয়া তাঁহার মাথা আনিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। সুতরাং আদল এবং কারা গোত্রের কতিপয় লোককে সে মদীনায় পাঠাইল। তাহারা মদীনায় আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের সঙ্গে কিছু লোক তালীম ও তবলীগের জন্য পাঠইবার আবেদন জানাইল। হযরত আসেমকেও সাথে পাঠাইবার আবেদন জানাইল। কারণ স্বরূপ তাহার ওয়াজ-নসীহত খুবই পছন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করিল। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজন সাহাবীকে কোন বর্ণনা মতে ছয়জন সাহাবীকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে হযরত আসেম (রাযিঃ)ও ছিলেন। পথিমধ্যে ইহারা তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং মোকাবিলার জন্য শত্রুদেরকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা দুইশত লোক ছিল, তন্মধ্যে একশতজন ছিল বিখ্যাত তীরন্দাজ। কোন কোন বর্ণনামতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে মক্কাবাসীদের খবর নেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে বনি লেহইয়ানের দুইশত লোকের সহিত মোকাবিলা হয়। দশজন বা ছয়জনের এই ক্ষুদ্র দলটি এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখিয়া ফাদফাদ নামক এক পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাফেররা বলিল, আমরা তোমাদের রক্তে আমাদের মাটি রঞ্জিত করিতে চাই না। আমরা কেবল তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিতে চাই। তোমরা আমাদের সাথে আস। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করিব না। কিন্তু মুসলমানেরা বলিল, আমরা কাফেরের চুক্তিতে আসিতে চাই না এবং তীরদান হইতে তীর বাহির করিয়া তাহাদের সাথে মোকাবিলা করিলেন। যখন তীর ফুরাইয়া গেল, বর্শা দ্বারা মোকাবিলা করিলেন। হযরত আসেম (রাযিঃ) সঙ্গীদেরকে জোশের সহিত বলিলেন, তোমাদের সহিত প্রতারণা করা হইয়াছে। তবে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই। শাহাদাতকে গনীমত মনে কর। তোমাদের মাহবুব (প্রেমাস্পদ) তোমাদের সঙ্গেই আছেন আর জান্নাতের হুরগণ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বলিয়া পূর্ণ উদ্যমে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করিলেন। যখন বর্শাও ভাঙ্গিয়া গেল তখন তরবারী দ্বারা

মোকাবিলা করিলেন। শত্রু পক্ষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন এবং এই দোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের এই সংবাদ আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাইয়া দিন। তাঁহার এই দোয়া কবুল হইল এবং ঐ মুহূর্তেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হইয়া গেলেন। যেহেতু হযরত আসেম (রাযিঃ) শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, সুলাফা তাহার মাথার খুলিতে শরাব পান করার মান্নত করিয়াছে তাই তিনি মৃত্যুর সময় দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় আমার শিরোশ্ছেদ করা হইতেছে তুমিই উহার হেফাজতকারী। এই দোয়াও কবুল হইল। শাহাদাতের পর কাফেররা যখন তাঁহার মাথা কাটিতে আসিল তখন আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক মৌমাছি কোন বর্ণনা মতে এক ঝাঁক ভীমরুল পাঠাইয়া দিলেন। উহারা তাঁহার শরীরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইল। কাফেররা ভাবিয়াছিল রাত্রে যখন ইহারা চলিয়া যাইবে তখন তাঁহার মাথা কাটিয়া লইব। কিন্তু রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির স্রোত আসিয়া তাঁহার লাশ ভাসাইয়া লইয়া গেল।

এইভাবে সাতজন অথবা তিনজন শহীদ হইয়া গেলেন। কেবল তিনজন জীবিত রহিলেন। তাঁহারা হইতেছেন, খুবাইব (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাযিঃ)। কাফেরেরা এই তিনজনের সহিত পুনরায় অঙ্গীকার করিল যে, তোমরা নীচে আস। তোমাদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না। ইঁহারা তিনজন তাহাদের ওয়াদা অনুসারে নীচে নামিয়া আসিলেন। নীচে নামিয়া আসার পর কাফেররা ধনুকের রশি খুলিয়া তাঁহাদের হাত বাঁধিয়া ফেলিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক বলিলেন, ইহা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি তোমাদের সাথে কখনও যাইব না। এই শহীদগণের অনুসরণই আমার কাছে পছন্দনীয়। কাফেররা তাঁহাকে জোরপূর্বক টানিয়া নিতে চাহিল কিন্তু তিনি অনড় রহিলেন। অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকেও শহীদ করিয়া দিল। কেবল দুইজনকে তাহারা গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল এবং মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিল। একজন হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) যাহাকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা তাহার পিতা উমাইয়ার পরিবর্তে হত্যা করিবার জন্য পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করিল আর হযরত খুবাইব (রাযিঃ)কে হুজাইর ইবনে আবি ইহা তাহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য একশত উটের বিনিময়ে খরিদ করিল। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হারেছ ইবনে আমেরের সন্তানেরা তাহাকে খরিদ করিয়াছিল।

কেননা, তিনি হারেছকে বদরের যুদ্ধে কতল করিয়াছিলেন।

সাফওয়ান আপন কয়েদী হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ)কে তৎক্ষণাৎই হত্যা করিবার জন্য আপন গোলামের হাতে হরম শরীফের বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তাঁহার হত্যাকাণ্ডের তামাশা দেখিবার জন্য বহু লোক সমবেত হয় তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদকে শহীদ করিয়া দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ? তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি সত্য সত্য বল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়, আর তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে তুমি আপন পরিবার পরিজন লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পার। হযরত যায়েদ বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেখানেই তাঁহার শরীরে একটি কাঁটা ফুটুক আর আমি নিজ ঘরে আরামে থাকি। কোরাইশরা এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। আবু সুফিয়ান বলিলেন, মুহাম্মদের প্রতি তাঁহার সাথীদের যে ভালবাসা দেখিয়াছি উহার নজীর আমি আর কোথাও দেখি নাই। অতঃপর হযরত যায়েদকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল।

হযরত খুবাইব (রাযিঃ) কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকেন। হুজাইরের বাঁদী যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, খুবাইব (রাযিঃ) যখন আমাদের কাছে বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন একদিন তাহার হাতে মানুষের মাথা সমান বড় একটি আঙ্গুর ছড়া দেখিলাম তিনি উহা হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন। অথচ মক্কায় তখন কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি বলেন—যখন তাহার কতলের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন তিনি সাফাই করার জন্য একটি ক্ষুর চাহিলেন। তাহাকে একটি ক্ষুর দেওয়া হইল। ঘটনাক্রমে একটি ছোট্ট শিশু খোবাইবের নিকট চলিয়া গেল। লোকজন তাহার হাতে ক্ষুর এবং পাশে ছোট্ট শিশুকে দেখিয়া খুব চিন্তিত হইল। খুবাইব (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা মনে করিতেছ আমি শিশুটিকে হত্যা করিয়া ফেলিব। এইরূপ কখনও করিব না। অতঃপর তাঁহাকে হরম শরীফের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। শূলিতে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার যদি কোন আকাঙ্খা থাকে তবে বল। তিনি বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দেওয়া হউক। কারণ, ইহা দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার সময় এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নিকটবর্তী। তাহাকে নামাযের

সুযোগ দেওয়া হইল। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা যদি ইহা মনে না করিতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করিতেছি তবে আরো দুই রাকাত নামায পড়িতাম। অতঃপর যখন তাঁহাকে শূলে চড়ানো হইল তখন দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ্! এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার আখেরী সালাম পৌছাইবে। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার সালাম পৌছাইয়া দেওয়া হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম হে খুবাইব! তারপর সাহাবীগণকে কোরাইশ কর্তৃক হযরত খুবাইবের কতল করিয়া দেওয়ার সংবাদ জানাইলেন।

হযরত খুবাইবকে যখন শূলিতে চড়ানো হইল তখন চল্লিশজন লোক চারিদিক হইতে তাঁহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিল এবং তাঁহার দেহকে চালনীর মত ঝাঁঝরা করিয়া দিল। ঐ মুহূর্তে কেহ তাঁহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করা হউক আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হউক? উত্তরে তিনি বলিলেন, মহান আল্লাহর কসম, আমার প্রাণের বিনিময়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাটা বিদ্ধ হইবেন—আমি ইহাও পছন্দ করি না। (ফাতহুল বারী, ইসলাম)

ফায়দা ঃ এমনি তো এই সমস্ত ঘটনার প্রতিটি শব্দই উপদেশমূলক কিন্তু এই ঘটনায় দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উপদেশমূলক এবং অতি মূল্যবান। তন্মধ্যে একটি হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মহব্বত ও ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত কিন্তু উহার পরিবর্তে এতটুকু শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেও প্রস্তুত নহেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রকার সাধারণ কষ্টও দেওয়া হোক। কেননা, তাঁহারা হযরত খুবাইব (রাযিঃ) দ্বারা কেবল মৌখিকই বলাইতে চাহিয়াছিল এবং শুধু মুখে বলিলেই হইত। অন্যথা বদলা স্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার শক্তি কাফেরদের ছিল না। বরং তাহারা নিজেরাই সর্বদা কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকিত। কাজেই বদলা লওয়া না লওয়া তো বরাবর ছিল। দ্বিতীয় বিষয় হইল, নামাযের প্রতি তাঁহাদের মর্যাদা ও মহব্বত। এমন অন্তিম মুহূর্তে সাধারণতঃ মানুষ স্ত্রী-সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া থাকে।

তাহাদেরকে এক নজর দেখিতে চায়, তাহাদের কাছে সালাম ও খবর পৌঁছায়। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিদের সালাম ও খবর ছিল হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং আখেরী বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল দুই রাকাত নামায।

(১০) জান্নাতে হুযূর (সঃ)এর সঙ্গ লাভের জন্য নামাযের সাহায্য

হযরত রবীয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রাত্রি যাপন করিতাম। তাহাজ্জুদের সময় অযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ যথা মিসওয়াক, জায়নামায ইত্যাদি রাখিতাম। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খেদমতে খুশী হইয়া বলিলেন, তোমার কি চাহিবার আছে চাও। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গলাভ করিতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কি চাও? বলিলেন, শুধু ইহাই আমার বাসনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে অধিক সেজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করিও। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ এখানে এই বিষয়ের উপর সতর্ক করা হইয়াছে যে, শুধু দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। বরং চেষ্টা ও আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। আর আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে নামায। নামায যত বেশী পড়া হইবে সেজদাও তত বেশী হইবে। যাহারা এই ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে যে, অমুক পীর বা অমুক বুযুর্গের মাধ্যমে দোয়া করাইয়া নিব, ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল। আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে আসবাব ও উপকরণের মাধ্যমে চালাইয়াছেন। যদিও তিনি কোন আসবাব ও উপকরণ ছাড়াই প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং কুদরত জাহের করার জন্য কখনও এইরূপ করিয়াও থাকেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, দুনিয়ার কাজ কারবারকে আসবাব ও উপকরণের সহিত লাগাইয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমরা দুনিয়ার কাজকর্মে তো তকদীর ও দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি না বরং সব ধরনের চেষ্টা চালাইয়া থাকি কিন্তু দ্বীনি কাজের মধ্যে তকদীর ও দোয়া মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাগণের দোয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহা বলিয়াছেন যে, বেশী বেশী সেজদার মাধ্যমে আমার দোয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

ঈছার বা আত্মত্যাগ হইল নিজের প্রয়োজনের সময় অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রথম তো সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃএর প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অভ্যাস এমন ছিল যে, উহার সমকক্ষতা তো দূরের কথা উহার কিঞ্চিৎও যদি কোন ব্যক্তির লাভ হইয়া যায় তবে উহা সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। তদুপরি কতিপয় চরিত্র এবং অভ্যাস এমন অনন্য ছিল যে, উহা কেবল তাঁহাদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তন্মধ্যে একটি ঈছার বা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে উহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই আয়াতে উক্ত গুণের আলোচনা করিয়াছেন যে,

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দান করে যদিও তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে।

(১) এক সাহাবী (রাযিঃ)এর মেহমানের খাতিরে বাতি নিভাইয়া ফেলা

একজন সাহাবী হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ক্ষুধা ও পেরেশানীর অবস্থা জানাইলেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল ঘরে কাহাকেও পাঠাইলেন। কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কেহ আছে কি? যে এক রাত্রির জন্য এই ব্যক্তির মেহমানদারী কবুল করিবে? এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মেহমানদারী করিব। তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং আপন স্ত্রীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। যতদূর সম্ভব তাহার মেহমানদারীতে কোনপ্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন জিনিস লুকাইয়া রাখিবে না। স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম, বাচ্চাদের উপযোগী সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নাই। সাহাবী বলিলেন, বাচ্চাদেরকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দাও এবং যখন তাহারা ঘুমাইয়া যাইবে তখন খানা লইয়া মেহমানের সহিত বসিয়া যাইব আর তুমি বাতি

ঠিক করার বাহানায় উঠিয়া উহা নিভাইয়া দিবে। সুতরাং স্ত্রী তাহাই করিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি কাটাইল। এই প্রেক্ষিতেই আয়াত নাযিল হইল— يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতের তরজমা—"আর তাহারা অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে।

(২) রোযাদারের জন্য বাতি নিভাইয়া দেওয়া

এক সাহাবী রোযার পর রোযা রাখিতেন। ইফতার করার জন্য খাওয়ার কোন কিছু জুটিত না। হযরত ছাবেত নামক এক আনসারী সাহাবী বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রাত্রে একজন মেহমান লইয়া আসিব। যখন খাওয়া আরম্ভ করিব তখন তুমি বাতি ঠিক করার ভান করিয়া নিভাইয়া দিবে। যতক্ষণ মেহমানের পেট না ভরিয়া যাইবে ততক্ষণ আমরা খাইব না। সুতরাং তাহারা এইরূপই করিলেন। মেহমানের সহিত শরীক রহিলেন, যেন খানা খাইতেছেন। সকালে হযরত ছাবেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইলে তিনি বলিলেন, রাত্রে মেহমানের সহিত তোমরা যে আচরণ করিয়াছ তাহা আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে।

(দুর্‌রে মানসূর)

(৩) জনৈক সাহাবীর যাকাতস্বরূপ উট প্রদান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাতের মাল উসূল করিবার জন্য পাঠাইলেন। আমি একব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার মালের বিস্তারিত হিসাব লইলাম। ইহাতে তাহার উপর এক বছরের একটি উটের বাচ্চা ওয়াজিব হইল। আমি তাহার কাছে উহা চাহিলাম। সে বলিতে লাগিল, এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, সওয়ারীর কাজেও আসিবে না। সে একটি মূল্যবান সুন্দর শক্তিশালী উটনী আনিয়া হাজির করিল এবং বলিল, ইহা লইয়া যান। আমি বলিলাম, আমি তো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমার প্রতি উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবার নির্দেশ নাই। হাঁ, যদি আপনি ইহাই দিতে চাহেন তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে আছেন আজ আপনার নিকটেই এক জায়গায় অবস্থান করিবেন তাঁহার খেদমতে যাইয়া পেশ করুন। তিনি যদি গ্রহণ করেন তবে আমার কোন আপত্তি নাই আর না হয় আমি অপারগ। সে উটনীসহ

আমার সহিত রওয়ানা হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিনিধি আমার কাছে যাকাতে মাল উসূল করিবার জন্য আসিয়াছিল। আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত আমার এই সৌভাগ্য হয় নাই যে, আল্লাহর রাসূল অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি আমার মাল গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমি সমস্ত মাল তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহাতে এক বৎসরের একটি উটের বাচ্চা জাকাতস্বরূপ ওয়াজিব হইয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, আরোহণের কাজেও আসিবে না। তাই আমি একটি সুন্দর শক্তিশালী উটনী তাহার সামনে পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য আমি স্বয়ং আপনার খেদমতে উহা লইয়া হাজির হইয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার উপর ওয়াজিব উহাই যাহা সে বলিয়াছে, তবে তুমি যদি উহার চাইতে উত্তম মাল নিজের পক্ষ হইতে দাও তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার সওয়াব দান করুন। সে উহা পেশ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন।

ফায়দা ঃ এই ছিল যাকাতের নমুনা। আজও ইসলামের বহু দাবীদার রহিয়াছে যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতেরও দাবী করিয়া থাকে কিন্তু যাকাত আদায়ে অতিরিক্ত দান করা তো দূরের কথা নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করাও মৃত্যু সমতুল্য মনে করে। যাহারা বড়লোক ও ধনী পরিবার তাহাদের কাছে তো যাকাতের প্রায় আলোচনাই নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং যাহারা নিজেদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করে তাহারাও এই চেষ্টা করে যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অথবা বাধ্য হইয়া অন্য কোন জায়গায় যদি খরচ করিতে হয় তবে উহাতেও যাকাতেরই নিয়ত করিয়া লয়।

(৪) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মধ্যে সদকা করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা

হযরত ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করিবার আদেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আমার কাছে কিছু মাল ছিল। আমি ভাবিলাম আজ আমার নিকট ঘটনাক্রমে মাল মওজুদ আছে। আমি যদি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর তুলনায় কখনও অগ্রগামী হইতে পারি তবে আজই পারিব। এই চিন্তা করিয়া আমি

আনন্দের সহিত ঘরে গেলাম এবং যেই পরিমাণ মাল ঘরে রাখা ছিল উহার অর্ধেক লইয়া আসিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, অর্ধেক মাল রাখিয়া আসিয়াছি।

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঘরে যাহা ছিল সম্পূর্ণ লইয়া আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরওয়ালাদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁহার পবিত্র রাসূলের নামের বরকত ও তাঁহাদের সন্তুষ্টি রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে কখনও অগ্রগামী হইতে পারিব না।

ফায়দা ঃ ভাল গুণ ও নেক কাজে অন্যের তুলনায় আগে বাড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কুরআনে পাকেও এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের সময় ঘটিয়াছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা দানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামর্থ্যের চাইতেও বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

(৫) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অপরের খাতিরে পিপাসায় মৃত্যুবরণ

হযরত আবু জাহম ইবনে হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আপন চাচাত ভাইয়ের তালাশে বাহির হইলাম। কেননা, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সঙ্গে এক মশক পানি লইয়া গেলাম। যাহাতে পিপাসার্ত থাকিলে পান করাইতে পারি। ঘটনাক্রমে তাহাকে একস্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম, তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঢোক পানি দিব কি? সে ইশারায় হাঁ বলিল। এমন সময় তাঁহার নিকটবর্তী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা আর এক ব্যক্তি আহ্ করিয়া উঠিল। আমার চাচাত ভাই তাহার আওয়াজ শুনিয়া আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার ইশারা করিল। আমি তাহার নিকট পানি লইয়া গেলাম। তিনি ছিলেন

হিশাম ইবনে আবিল আস। তাহার নিকট পৌছিবা মাত্রই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি আহ্! করিয়া উঠিল। হেশাম আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার জন্য ইশারা করিলেন। তাহার নিকট পৌছিয়া দেখি, তিনি আর ইহজগতে নাই। অতঃপর হিশামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ; তিনিও ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট আসিলাম ; ইত্যবসরে সেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। (দিরায়াহ্)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রহিয়াছে। এই আত্মত্যাগের কি কোন সীমা আছে যে, আপন ভাই মরণাপন্ন আর পিপাসায় কাতর এমতাবস্থায় অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য করাই তো কঠিন ব্যাপার ; তদুপরি তাহাকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাখিয়া অন্যকে পানি পান করাইবার জন্য চলিয়া যাওয়া। আল্লাহ এই সকল প্রাণ বিসর্জনকারীদের রূহকে অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন যাহারা মৃত্যুকালে যখন জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় তখনও অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইয়া জীবন দান করেন।

(৬) হযরত হামযা (রাযিঃ)এর কাফন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। নিষ্ঠুর কাফেরেরা তাঁহার নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কাটিয়া ফেলে বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করে এবং আরো বিভিন্ন ধরনের জুলুম করে যুদ্ধ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবীগণ শহীদদের লাশ খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হামযা (রাযিঃ)কে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। একটি চাদর দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হযরত হামযা (রাযিঃ)এর সহোদরা বোন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) আপন ভাইয়ের অবস্থা দেখিবার জন্য আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করিলেন, শত হইলেও মেয়ে মানুষ এই ধরনের জুলুমের দৃশ্য সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাই তাহার ছেলে যুবাইরকে বলিলেন, তুমি তোমার মাকে দেখিতে নিষেধ কর। যুবাইর (রাযিঃ) মায়ের নিকট আরজ করিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আমার ভাইয়ের নাক-কান ইত্যাদি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আল্লাহর রাস্তায় তেমন কোন বড়

বিষয় নহে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ সবর করিব। হযরত যুবাইর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া এই কথা শুনাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শুনিয়া তাহাকে দেখিবার অনুমতি দিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং তাঁহার জন্য ইস্তেগফার ও দোয়া করিলেন।

এক রেওয়ায়াত অনুসারে উহুদের যুদ্ধে যেখানে লাশসমূহ রাখা হইয়াছিল, জনৈকা মহিলা ঐ দিকে দ্রুত আসিতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, মহিলাটিকে বাধা দাও। হযরত যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, আমি চিনিয়া ফেলিলাম যে, তিনি আমার মা। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনি শক্তিশালী ছিলেন তাই আমাকে এক ঘুষি মারিয়া বলিলেন, সরিয়া যাও। আমি বলিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেলেন। অতঃপর দুইটি কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, আমি এই দুইটি কাপড় আমার ভাইয়ের কাফনের জন্য আনিয়াছিলাম। কারণ, আমি তাহার ইন্তিকালের খবর শুনিতে পাইয়াছিলাম। এই কাপড়গুলিতে তাহাকে কাফন দিও। আমরা কাপড়গুলি লইয়া হযরত হামযা (রাযিঃ)কে কাফন দিতেছিলাম। পাশেই এক আনসারী শহীদের লাশ পড়িয়াছিল। তাহার নাম হযরত সুহাইল ছিল। হযরত হামযা (রাযিঃ)এর ন্যায় তাহাকেও কাফেররা ঐরূপ অবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের লজ্জা হইল যে, হযরত হামযা (রাযিঃ)কে দুই কাপড় দ্বারা কাফন দিব আর আনসারী সাহাবী একটি কাপড়ও পাইবেন না। তাই প্রত্যেককে এক একটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হইল। কাপড় দুইটির মধ্যে একটি বড় ও অপরটি ছোট ছিল। আমরা লটারীর ব্যবস্থা করিলাম। লটারীর মাধ্যমে যাহার ভাগে যে কাপড় আসিবে উহা দ্বারাই তাহাকে কাফন দেওয়া হইবে। লটারীতে বড় কাপড়টি সুহাইল (রাযিঃ)এর অংশে আসিল আর ছোট কাপড়টি হযরত হামযা (রাযিঃ)এর অংশে আসিল। কাপড়টি তাঁহার দেহের তুলনায় খাট ছিল বিধায় মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পাতা ইত্যাদি দ্বারা পা ঢাকিয়া দাও।

(তারীখে খামীস)

ইবনে সা'দ–এর বর্ণনা অনুসারে হযরত সাফিয়্যা (রাযিঃ) যখন দুইটি

কাপড় লইয়া হযরত হামযা (রাযিঃ)এর লাশের নিকট পৌঁছিলেন তখন তাঁহারই পাশে এক আনসারী সাহাবীর লাশ অনুরূপভাবে পড়িয়াছিল। অতএব উভয়কে এক এক কাপড়ে কাফন দেওয়া হইল এবং হযরত হামযা (রাযিঃ)এর কাপড়টি বড় ছিল। এই রেওয়ায়াতটি পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতটি বিস্তারিত।

ফায়দা ঃ এই ছিল দোজাহানের বাদশার চাচার কাফন। তাহাও আবার এইভাবে যে, এক মহিলা আপন ভাইয়ের জন্য দুইটি কাপড় দিলেন। পাশে এক আনসারী সাহাবী কাফনবিহীন থাকিবে ইহাও বরদাশত হইতেছে না তাই প্রত্যেককে একটি করিয়া বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ছোট কাপড়টি ঐ ব্যক্তির ভাগে পড়িল যিনি বহুদিক হইতে অগ্রগণ্য হওয়ার অধিকার রাখেন। গরীবের বন্ধু এবং সাম্যের দাবীদাররা যদি আপন দাবীতে সত্যবাদী হইয়া থাকে তবে যেন এই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিদের অনুসরণ করে যাহারা শুধু মুখে নয় বরং কাজে পরিণত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের নিজেদেরকে তাহাদের অনুসারী বলাও লজ্জার বিষয়।

(৭) বকরীর মাথা ঘুরিয়া ফেরত আসা

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীকে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা হাদিয়া দিল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার অমুক সাথী অধিক অভাবগ্রস্ত , অনেক সন্তান–সন্ততি রহিয়াছে এবং তাহার পরিবার বেশী অভাবী। অতএব তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও তৃতীয় আরেক ব্যক্তির প্রতি অনুরূপ ধারণা করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে সাত ঘর ঘুরিয়া পুনরায় প্রথম সাহাবীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপকভাবে অভাবগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিও বুঝা যায়। আর ইহাও জানা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন অগ্রগণ্য মনে হইত।

(৮) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর আপন স্ত্রীকে ধাত্রীর কাজে লইয়া যাওয়া

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার খেলাফতের যামানার অধিকাংশ রাত্রে চৌকিদারী স্বরূপ শহরের হেফাজতও করিতেন। এই

অবস্থায় একবার এক ময়দানের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। একটি পশমের তাঁবু খাটানো দেখিলেন যাহা পূর্বে সেখানে দেখেন নাই। তিনি নিকটে যাইয়া দেখিলেন একজন লোক সেখানে বসিয়া আছে আর তাঁবুর ভিতর হইতে কাতরানোর আওয়াজ আসিতেছে। তিনি সালাম করিয়া লোকটির নিকট বসিয়া গেলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল, আমি একজন বেদুঈন মুসাফির। আমীরুল মুমিনীনের নিকট কিছু প্রয়োজনের কথা বলিয়া সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তাঁবু হইতে কিসের আওয়াজ আসিতেছে? লোকটি বলিল, মিয়া! যাও, তুমি নিজের কাজ কর। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, মনে হইতেছে কোন কষ্টের আওয়াজ। লোকটি বলিল, আমার স্ত্রীর প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রসব ব্যথা হইতেছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সাথে অন্য কোন মহিলা আছে কি? লোকটি বলিল, কেহ নাই। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া সোজা ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)কে বলিলেন, একটি বিরাট সওয়াবের কাজ তোমার ভাগ্যে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, একা একজন বেদুঈন মহিলার প্রসব ব্যথা হইতেছে। স্ত্রী বলিলেন, হাঁ, হাঁ, আপনার অনুমতি হইলে আমি প্রস্তুত আছি। আর প্রস্তুত হইবেন না কেন? তিনিও তো হযরত ছাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযিঃ)এর কন্যা ছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, প্রসবকালে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় যেমন তৈল, নেকড়া ইত্যাদি লইয়া লও। আর একটি পাতিল, কিছু ঘি এবং খাদ্য সামগ্রীও সঙ্গে করিয়া লও। তিনি এই সকল জিনিস লইয়া চলিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বয়ং পিছনে পিছনে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) তাঁবুর ভিতরে চলিয়া গেলেন আর হযরত ওমর (রাযিঃ) আগুন জ্বালাইয়া পাতিলে খাদ্য ফুটাইলেন এবং ঘি ঢালিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেল। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) ভিতর হইতে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিন। 'আমীরুল মুমিনীন' শব্দ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গেল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। তিনি পাতিলটি তাঁবুর কাছে রাখিয়া বলিলেন, মহিলাকেও কিছু খাওয়াইয়া দাও। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) মহিলাকে খাওয়াইলেন। অতঃপর পাতিলটি বাহিরে রাখিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বেদুঈনকে বলিলেন, তুমিও কিছু

খাইয়া লও, সারারাত্র তুমি জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়াছ। অতঃপর স্ত্রীকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন আর বেদুঈনকে এই কথা বলিয়া আসিলেন যে, আগামীকাল আসিও, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। (আশ্‌হার)

ফায়দা ঃ আমাদের এই যমানার কোন বাদশাহ বা নেতা নহে কোন সাধারণ পর্যায়ের ধনী ব্যক্তিও কি এমন আছে যে কোন গরীবের, প্রয়োজনে, মুসাফিরের সাহার্য্যার্থে এইভাবে স্ত্রীকে রাত্রে ময়দানে লইয়া যাইবে আর স্বয়ং নিজে চুলা ফুঁকিয়া খানা পাকাইবে।

ধনীদেরকে ছাড়ুন, কোন দ্বীনদার লোকও কি এইরূপ করে? চিন্তা করা উচিত হয় আমরা যাহাদের অনুসারী, প্রত্যেক কাজে তাহাদের মত বরকত পাওয়ার আশা রাখি, কোন একটি কাজও কি আমরা তাহাদের মত করি?

(৯) হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)এর বাগান ওয়াকফ করা

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রাযিঃ) মদীনা মুনাওয়ারাতে সবচাইতে বেশী এবং বড় বাগানের অধিকারী ছিলেন। তাহার বইরাহা নামে একটি বাগান ছিল। বাগানটি তাহার কাছে অত্যধিক প্রিয় ছিল। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এই বাগানটিতে প্রচুর পরিমাণে সুমিষ্ট পানি ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রায় এই বাগানে যাইতেন এবং উহার পানি পান করিতেন। যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল— لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, তোমরা (পূর্ণমাত্রায়) নেকী অর্জন করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এমন বস্তু হইতে খরচ না করিবে যাহা তোমাদের নিকট পছন্দনীয়।

তখন হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, বাইরাহা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাগান। আর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। তাই উহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিতেছি। আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন উহাকে খরচ করিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, খুবই উত্তম মাল। আমি ইহাই ভাল মনে করিতেছি যে, তুমি ইহা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আবু তালহা (রাযিঃ) উহা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ আমরাও কি নিজেদের কোন প্রিয় সম্পদ একটু ওয়াজ-নসীহত শুনিয়া অথবা কুরআন শরীফের দুই একটি আয়াত পাঠ

করিয়া কিংবা শ্রবণ করিয়া নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই? ওয়াকফ করিবার চিন্তা-ভাবনা করিলেও তাহা জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলে অথবা ওয়ারিসদের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া গেলে তাহাদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে হয়। তদুপরি বছরের পর বছর এই চিন্তা করিতে থাকি যে, এমন কোন পথ বাহির হয় কিনা যাহা দ্বারা জীবদ্দশায় উহা আমার উপকারে আসে পরে যাহা হইবার হউক। হাঁ, সুনাম অর্জনের কোন বিষয় হইলে কিংবা বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠান হইলে তখন সুদী ঋণ গ্রহণ করিতেও কোন দ্বিধা থাকে না।

(১০) হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিজ খাদেমকে সতর্ক করা

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ১নং অধ্যায়ে ৫নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। তিনি বড় ধরনের যাহেদ (অর্থাৎ দুনিয়া বিরাগী) ছিলেন। ধন-সম্পদ নিজে জমা করিতেন না, অন্য কেহ জমা করুক ইহাও চাহিতেন না। মালদারদের সাথে সর্বদা তাঁহার ঝগড়া হইত। তাই হযরত উছমান (রাযিঃ)এর নির্দেশে তিনি মরুভূমির 'রাবাযাহ্' নামক স্থানে একটি সাধারণ আবাদিতে বসবাস করিতেছিলেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিকট কয়েকটি উট ছিল এবং একজন দুর্বল রাখাল ছিল। সে উহার দেখাশুনা করিত এবং উহার উপরই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বনু সুলাইম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার খেদমতে থাকিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিল এবং বলিল, আমি আপনার খেদমতে থাকিয়া আপনার ফয়েজ হইতে উপকৃত হইব এবং আপনার রাখালের সহযোগিতা করিব এবং আপনার নিকট হইতে বরকতও হাসিল করিব। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার বন্ধু সেই ব্যক্তি যে আমাকে মানিয়া চলে। তুমি যদি আমাকে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হও তবে আগ্রহের সহিত থাকিতে পার। আর যদি আমার কথা অনুসারে না চলিতে পার তবে তোমার প্রয়োজন নাই। সুলাইমী লোকটি বলিল, কোন্ বিষয়ে আপনার আনুগত্য করিব? হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি যখন কোন মাল খরচ করিবার আদেশ করিব তখন সর্বোত্তম মাল খরচ করিতে হইবে। লোকটি বলিল, ঠিক আছে আমি ইহা মানিয়া লইলাম। এই বলিয়া সে থাকিতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে একদিন কেহ তাঁহার নিকট আলোচনা করিল যে, অমুক জলাশয়ের নিকট কিছু লোক বাস করে। তাহারা অভাবগ্রস্ত। তিনি আমাকে বলিলেন, একটি উট লইয়া আস। আমি যাইয়া দেখিলাম, একটি

উট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান, কাজের উপযোগী ও সওয়ারী হিসাবেও অনুগত। আমি ওয়াদা অনুযায়ী উহাই আনিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু ভাবিলাম যে, ইহা তো গরীব মিসকীনদেরকেই খাওয়ানো হইবে। ইহা অত্যন্ত কাজের উপযোগী, হযরতের এবং তাঁহার সাথীদের প্রয়োজনে লাগিবে। কাজেই ঐ উটটি বাদ দিয়া আরেকটি উট লইয়া যাহা বাকীগুলির তুলনায় উত্তম ছিল তাঁহার কাছে হাজির হইলাম। তিনি দেখিয়াই বলিলেন, তুমি তো খেয়ানত করিয়াছ। আমি ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া ঐ উটটিই লইয়া আসিলাম। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এমন দুইজন লোক আছে কি, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একটি কাজ করিবে? এই কথা শুনিয়া দুইজন লোক দাঁড়াইল এবং নিজেদেরকে পেশ করিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, এই উটটি জবাই কর। তারপর ইহার গোশত কাটিয়া ঐ জলাশয়ের নিকট যত ঘর আবাদ আছে হিসাব কর। আবু যরের ঘরও তন্মধ্যে একটি গণ্য করিয়া সবাইকে সমানভাবে বন্টন করিয়া দাও। আমার ঘরেও ঐ পরিমাণ দিবে যেই পরিমাণ তাহাদের প্রত্যেক ঘরে দিবে। তাহারা নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার যে উপদেশ ছিল উত্তম মাল খরচ করার উহা জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করিয়াছ, নাকি ভুলবশতঃ? যদি ভুলবশতঃ এইরূপ করিয়া থাক তবে তুমি নির্দোষ। আমি বলিলাম, আমি আপনার উপদেশ ভুলি নাই, আমি প্রথমে ঐ উটটিকেই লইয়াছিলাম কিন্তু ভাবিলাম যে, ইহা কাজের খুবই উপযোগী অধিকাংশ সময় আপনার প্রয়োজনে আসে। শুধু এই কারণে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, শুধু আমার প্রয়োজনে রাখিয়া আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, শুধু আপনার প্রয়োজনেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার প্রয়োজনের দিন কোন্‌টি বলিব? আমার প্রয়োজনের দিন সেইদিন, যেইদিন আমি একাকী কবরের গর্তে নিক্ষিপ্ত হইব। ঐ দিনই আমার প্রয়োজন ও অভাবের দিন। মালের মধ্যে তিন জন অংশীদার রহিয়াছে। প্রথম হইতেছে তাকদীর। ইহা মাল লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারো অপেক্ষা করে না এবং ভালমন্দ সবধরনের মালই লইয়া যায়। দ্বিতীয় হইতেছে ওয়ারিস। সে তোমার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। তোমার মৃত্যু হইলেই সে উহা লইয়া যাইবে। তৃতীয় অংশীদার স্বয়ং তুমি। যদি সম্ভব হয় এবং তোমার ক্ষমতায় থাকে তবে তিন অংশীদারেরমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক অক্ষম হইও না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, তোমরা সর্বাধিক প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা পর্যন্ত নেকী লাভ করিতে পারিবে না। তাই যেই মাল আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় উহাকে আমি আমার জন্য আগে পাঠাইয়া দিব যাহাতে ইহা আমার জন্য জমা থাকে।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ তিন অংশীদারের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক বেশী অক্ষম হইও না—এই কথার অর্থ হইল, তুমি যতদূর সম্ভব নিজের জন্য পরকালের সম্বল জমা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, তকদীরের ফয়সালা আসিয়া গেল আর তোমার মাল ধ্বংস হইয়া গেল অথবা তোমার মৃত্যু হইয়া গেল আর সমস্ত মাল অন্যদের হস্তগত হইয়া গেল। কারণ মৃত্যুর পর কেহ কাহারো খবর নিবে না। পরিবার পরিজন স্ত্রী–সন্তান অল্প কিছুদিন কান্নাকাটি করিয়া চুপ হইয়া যাইবে। এমন খুবই কম হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা–খয়রাত করিবে বা তাহাকে স্মরণ করিবে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল উহা যাহা সে খাইয়া ও শেষ করিয়া দিয়াছে অথবা পরিধান করিয়াছে ও পুরাতন করিয়া দিয়াছে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া নিজের জন্য খাজানায় জমা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা অপরের মাল ; অপরের জন্য জমা করিতেছে।

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার নিকট তাহার ওয়ারেছের মাল নিজের মাল অপেক্ষা ভাল লাগে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন লোক কে হইবে যাহার নিকট অন্যের মাল নিজের মাল হইতে বেশী প্রিয় হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের মাল উহাই যাহা সে আগে পাঠাইয়া দেয় আর যাহা রাখিয়া যায় তাহা ওয়ারেছদের মাল।

(১১) হযরত জাফর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হযরত জাফর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাযিঃ)এর আপন সহোদর ভাই ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সকলেই বংশগতভাবে বরং তাহাদের সন্তান–সন্ততিরাও দানশীলতা দয়া বীরত্ব ও বাহাদুরীতে অতুলনীয় ছিলেন। তবে হযরত জাফর (রাযিঃ) বিশেষভাবে গরীব মিসকীনদের সাথে সম্পর্ক রাখিতেন

এবং তাহাদের সহিত উঠাবসা করিতেন। কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানেও কাফেররা তাঁহার পিছু লইলে তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট নিজের সাফাই বর্ণনা করিতে হয়। যাহার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ের ১০নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিবার পথে মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করেন। অতঃপর মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন যাহার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ দিকে আসিতেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া সমবেদনা জানাইবার জন্য তাঁহার ঘরে যান। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদ সকলকে ডাকাইলেন। তাহারা সকলে অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাহাদের মাথায় হাত বুলাইলেন এবং তাহাদের জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। সব ক'জন সন্তানই পিতার গুণে গুণান্বিত ছিল কিন্তু হযরত আবদুল্লাহর মধ্যে দানশীলতার গুণ অত্যন্ত বেশী ছিল। এইজন্যই তাঁহার উপাধি ছিল 'কুত্বুস সাখা' অর্থাৎ দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু।

সাত বৎসর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হন। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মাধ্যমে এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট সুপারিশ করাইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহাতে সে হযরত আবদুল্লাহর নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম হাদিয়া পাঠাইল। তিনি উহা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা আমাদের নেকী বিক্রয় করি না। একবার তাঁহার নিকট কোথাও হইতে হাদিয়া স্বরূপ দুই হাজার দেরহাম আসিয়াছিল। তিনি উহা সেই মজলিসেই বন্টন করিয়া দিলেন। এক ব্যবসায়ী বহু পরিমাণ চিনি লইয়া বাজারে আসিল কিন্তু উহা বাজারে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর আপন কর্মচারীকে বলিলেন, এই ব্যক্তির সমস্ত চিনি খরিদ করিয়া লও এবং মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দাও। রাত্রে গোত্রের মধ্যে যত মেহমান আসিত তাঁহার ঘরেই খানাপিনা ও সবরকমের প্রয়োজন পুরা করিত। (ইসাবাহ্)

হযরত যুবাইর (রাযিঃ) কোন এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একদিন নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে অসিয়ত করিলেন যে, আমার ধারণা হয় আমি আজ শহীদ হইয়া যাইব। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিও এবং অমুক অমুক কাজ করিও। এই অসিয়ত করিবার পর ঐদিনই তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। ছেলে ঋণের হিসাব করিয়া দেখিল যে, উহার পরিমাণ বাইশ লক্ষ দেরহাম। আর এই সমস্ত ঋণ এইভাবে হইয়াছে যে,

তিনি বড় প্রসিদ্ধ আমানতদার ছিলেন। লোকেরা তাঁহার নিকট খুব বেশী পরিমাণে নিজেদের আমানত রাখিত। তিনি বলিতেন, আমানত রাখিবার জায়গা আমার কাছে নাই। ইহা কর্জস্বরূপ আমার কাছে থাকিবে। যখন তোমাদের প্রয়োজন হইবে লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি এই সমস্ত টাকা–পয়সা সদকা করিয়া দিতেন। আর তিনি এই অসিয়তও করিয়াছিলেন যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলে আমার মাওলার কাছে বলিবে। ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আমি মাওলার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার মাওলা কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতাম তখন বলিতাম, হে যুবাইরের মাওলা! অমুক কাজটি হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ ঐ কাজ সমাধা হইয়া যাইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বলিলাম, আমার পিতার কর্জের তালিকায় দশ লক্ষ দেরহাম আপনার জিম্মায় লিখা আছে। তিনি বলিলেন, যখন ইচ্ছা নিও। পরে জানিতে পারিলাম, ইহা আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তাহার নিকট যাইয়া বলিলাম, উহা তো আপনিই তাহার নিকট পাওনা রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, আমি মাফ করাইতে চাই না। তিনি বলিলেন, যখন তোমার সুযোগ হয় পরিশোধ করিয়া দিও। আমি বলিলাম, ইহার পরিবর্তে জমিন গ্রহণ করুন। গনীমতের মাল হিসাবে অনেক জমিন লাভ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা দিতে পার। আমি তাহাকে সাধারণ এক খণ্ড জমি দিয়া দিলাম যাহাতে পানি ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি সাথে সাথে গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং গোলামকে বলিলেন, এই জমিনে জায়নামায বিছাইয়া দাও। সে জায়নামায বিছাইয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উহাতে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়িয়া রহিলেন। নামায হইতে ফারেগ হইয়া গোলামকে বলিলেন, এই জায়গাটি খনন কর। সে খনন করিতে শুরু করিল। সাথে সাথে একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। (উসদুল গাবাহ্)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের জন্য এই ঘটনা ও এই ধরনের অন্যান্য ঘটনা যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তেমন বড় কিছু ছিল না ; বরং তাঁহাদের সাধারণ অভ্যাসই ছিল এইরকম।

সপ্তম অধ্যায়

বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ

যাহার অনিবার্য ফল হইল বীরত্ব কেননা মানুষ যখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া নেয় তখন সবকিছুই করিতে পারে। সবরকম কাপুরুষতা, চিন্তা-ভাবনা বাঁচিয়া থাকার জন্যই হইয়া থাকে। যখন মৃত্যুর শওক ও আগ্রহ পয়দা হইয়া যায় তখন না সম্পদের মহব্বত থাকে, না শত্রুর ভয় থাকে। হায়! এই সমস্ত সত্যবাদীদের অসীলায় যদি আমারও এই দৌলত নসীব হইত।

(১) ইবনে জাহ্শ ও ইবনে সা'দের দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শ (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, হে সাদ! চল আমরা একসঙ্গে মিলিয়া দোয়া করি। প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন অনুসারে দোয়া করিবে এবং অপরজন আমীন বলিবে। কেননা এইভাবে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। উভয়ই এক কোণে যাইয়া দোয়া করিলেন। প্রথমে হযরত হযরত সা'দ (রাযিঃ) দোয়া করিলেন, 'হে আল্লাহ! আগামীকাল যখন যুদ্ধ হইবে তখন আমার মোকাবেলায় একজন বড় বীরকে নির্ধারণ করিও যে আমার উপর কঠিন হামলা করিবে আর আমিও তাহার উপর জোরদার হামলা করিব। অতঃপর তুমি আমাকে তাহার উওর জয়ী করিও আর আমি তাহাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করিব। এবং তাহার গনীমত লাভ করিব।' হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, আমীন।

ইহার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) দোয়া করিলেন, 'হে আল্লাহ! আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে আমাকে এক বাহাদুরের সহিত মোকাবেলা করাইও যে প্রচণ্ড হামলাকারী হইবে। আমি তাহার উপর প্রচণ্ড হামলা করিব আর সেও আমার উপর প্রচণ্ড হামলা করিবে অতঃপর সে আমাকে শহীদ করিয়া দিবে। তারপর সে আমার নাক কান কাটিয়া ফেলিবে। কেয়ামতের দিন যখন আমি তোমার দরবারে হাজির হইব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ওহে আবদুল্লাহ! তোমার নাক কান কেন কাটা হইয়াছে? আমি বলিব, 'হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের রাস্তায় কাটা হইয়াছে। তুমি বলিবে, সত্যিই আমারই রাস্তায় কাটা হইয়াছে।' হযরত সাদ (রাযিঃ) বলিলেন, আমীন।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ হইল। উভয়ের দোয়া ঠিক যেভাবে তাহারা করিয়াছিলেন সেইভাবেই কবুল হইল। (খামীস) সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দোয়া আমার দোয়া হইতে উত্তম ছিল। আমি সন্ধ্যায় দেখিলাম তাহার নাক কান একটি সুতায় গাঁথা। উহুদের যুদ্ধে তাহার তরবারীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে গাছের একটি ডাল দিলেন যাহা তাহার হাতে যাইয়া তরবারীতে পরিণত হইয়া গেল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উহা তাহার কাছে ছিল। পরবর্তীতে ইহা দুইশত দীনারে বিক্রয় করা হইল। (ইসাবাহ)

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনায় যেমন একদিকে পূর্ণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ সাহসী দুশমনের সহিত মোকাবিলা করার আকাঙ্খা করা হইতেছে। তেমনি অপরদিকে পূর্ণ ইশ্‌ক ও মহব্বত অর্থাৎ মাহবুবের রাস্তায় শরীর খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার আকাঙ্খা করা হইতেছে এবং শেষে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এইসব কেন হইয়াছে? তখন বলিব তোমার জন্য কাটা হইয়াছে।

رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں
مرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں

"কেহ তো জুলুম-অত্যাচারের স্মৃতিতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, আমার মরদেহের টুকরাগুলি শত মাজারে দাফন করিও।"

(২) উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাযিঃ)এর বীরত্ব

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা পরাজয় হইয়াছিল। যাহার প্রধান কারণ ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নির্দেশের উপর আমল না করা। যাহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ঘটনায় করা হইয়াছে। ঐ সময় মুসলমানগণ চারিদিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীতে আসিয়া গেলে অনেকে শহীদও হইয়া যান আবার কিছুসংখ্যক পলায়নও করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাফেরদের একটি দলের বেষ্টনীতে পড়িয়া যান। কাফেররা ইহা রটাইয়া দিয়াছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পেরেশান হইয়া পড়েন। আর এই কারণে অনেকেই ময়দান ছাড়িয়া চলিয়াও যান এবং এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমার

দৃষ্টি হইতে আড়াল হইয়া গেলেন তখন আমি সর্বপ্রথম তাঁহাকে জীবিতদের মধ্যে তালাশ করিলাম। সেখানে পাইলাম না। অতঃপর শহীদগণের মধ্যে যাইয়া খুঁজিলাম। সেখানেও তাঁহাকে পাইলাম না, তখন আমি মনে মনে বলিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন ইহা তো কখনও হইতে পারে না। সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমলের কারণে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপন পাক রসূলকে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাই এখন সর্বোত্তম কাজ ইহাই যে, আমিও একটি তরবারী লইয়া কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইব এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিব। আমি তরবারী লইয়া হামলা করিলাম। এমনকি কাফেররা মাঝখান হইতে সরিয়া যাইতে থাকিল। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের উপর আমার নজর পড়িল। তখন আমার খুশীর সীমা রহিল না। আমি বুঝিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহার প্রিয়নবীর হেফাজত করিয়াছেন। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কাফেরদের দলের পর দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হামলা করিতে আসিল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে আলী! ইহাদেরকে বাধা দাও। আমি একাই সেই দলের মোকাবেলা করিলাম এবং তাহাদেরকে ফিরাইয়া দিলাম এবং কয়েকজনকে হত্যা করিলাম। ইহার পর আরেকটি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তিনি পুনরায় হযরত আলী (রাযিঃ)এর প্রতি ইশারা করিলেন। তিনি আবার একাকী ঐ দলের মোকাবিলা করিলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিয়া হযরত আলী (রাযিঃ)এর বীরত্ব ও সাহায্যের প্রশংসা করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

إِنَّهُ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ অর্থাৎ, আলী আমার আর আমিও আলীর। অর্থাৎ পূর্ণ একাত্মতার দিকে ইশারা করিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন— وَأَنَا مِنْكُمَا অর্থাৎ আমিও আপনাদের দুইজনের মধ্যে রহিয়াছি। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ একা একজন মানুষের পক্ষে একটি দলের মোকাবেলা করা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাইয়া জান দেওয়ার জন্য কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়া একদিকে যেমন হুযূরের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও মহব্বতের পরিচয় দেয় তেমনি অপরদিকে পূর্ণ বাহাদরী ও বীরত্বেরও পরিচয় বহন করে।

(৩) হযরত হানযালা (রাযিঃ)এর শাহাদত

হযরত হানযালা (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে প্রথম হইতে শরীক ছিলেন না। বলা হয় যে, তাহার নূতন বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত মিলনের পর গোসলের প্রস্তুতি লইতেছিলেন। এমনকি গোসলের জন্য বসিয়া মাথা ধৌত করিতেছিলেন। এমন সময় মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ঐ অবস্থায়ই তরবারী হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন এবং কাফেরদের উপর হামলা করিলেন। বরাবর সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ঐ অবস্থায় শহীদ হইয়া গেলেন।

যেহেতু শহীদগণকে যদি কোন কারণে গোসল ওয়াজিব হইয়া না থাকে তবে গোসল ছাড়াই দাফন করিতে হয়, এইজন্য তাঁহাকেও এইভাবেই করা হইল, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন যে, ফেরেশতারা তাঁহাকে গোসল দিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট ফেরেশতাদের গোসল দেওয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আবু সাঈদ সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনিয়া হানযালাকে যাইয়া দেখিলাম তখন তাহার মাথা হইতে পানি ঝরিতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া তাহার গোসল না করিয়া যাওয়ার কথা জানিতে পারিলেন। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ ইহাও চরম পর্যায়ের বীরত্ব। বীরপুরুষের জন্য নিজের সিদ্ধান্তে দেরী করা কষ্টকর হয়। তাই এইটুকু অপেক্ষাও করিলেন না যে, গোসল করিয়া লইবেন।

(৪) আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)এর শাহাদত বরণের আকাঙ্খা

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) খোড়া ছিলেন। তাঁহার চার পুত্র ছিল। যাহারা অধিকাংশ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও হাজির হইতেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিতেন। উহুদের যুদ্ধে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)এর আগ্রহ পয়দা হইল যে, আমিও যাইব। লোকেরা বলিল, তুমি তো মাজুর মানুষ খোঁড়া হওয়ার কারণে তোমার চলাফেরা করা কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইহা কত বড় খারাপ কথা যে, আমার ছেলেরা জান্নাতে যাইবে আর আমি থাকিয়া যাইব! তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে উত্তেজিত করার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আমি তো দেখিতেছি যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া

ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমর (রাযিঃ) ইহা শুনিয়া অস্ত্র লইলেন এবং কেবলার দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ "হে আল্লাহ! আমাকে আর পরিবারবর্গের দিকে ফিরাইয়া আনিও না।"

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আপন কওমের লোকদের নিষেধ করা এবং নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করিলেন। আর বলিলেন যে, আমি আশা করি আমি আমার খোড়া পাই লইয়া জান্নাতে চলাফেরা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে অক্ষম করিয়াছেন। কাজেই তুমি না গেলে কি অসুবিধা? তিনি পুনরায় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়া দিলেন। আবু তালহা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, তিনি বীরদর্পে যাইতেছিলেন আর বলিতেছিলেন খোদার কসম! আমি জান্নাতের আগ্রহী। তাঁহার এক পুত্রও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। পিতাপুত্র উভয়ই যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদত বরণ করিলেন।

তাহার স্ত্রী স্বামী এবং ছেলের লাশ উটের পিঠে উঠাইয়া মদীনায় দাফন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতে লাগলেন। কিন্তু উট বসিয়া পড়িল, অতি কষ্টে উটকে মারপিট করিয়া উঠাইলেন এবং মদীনায় আনার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উট উহুদের দিকেই ফিরিয়া থাকিল, তাহার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, উটের প্রতি এই নির্দেশই রহিয়াছে। আমর কি রওনা হওয়ার সময় কিছু বলিয়াছিল? স্ত্রী আরজ করিলেন যে, কেবলার দিকে মুখ করিয়া তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন—اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবার- পরিজনের নিকট আর ফিরাইয়া আনিও না।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইজন্যই উট ঐদিকে যাইতেছে না। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ ইহারই নাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ আর ইহাই হইল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সেই প্রকৃত ভালবাসা যাহার ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) কোথা হইতে কোথায় পৌছিয়া গিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরও তাঁহাদের সেই প্রেরণা ঐরূপেই থাকিয়া যাইত। যতই চেষ্টা করিতেন যাহাতে উট চলে, কিন্তু উট বসিয়া পড়িত অথবা উহুদের দিকে চলিত।

(৫) হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর শাহাদত

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত আদর যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং ধনী ছেলেদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাহার পিতা তাঁহাকে দুইশত দেরহামের কাপড় জোড়া খরিদ করিয়া পরাইতেন। যুবক বয়সের ছিলেন, অত্যন্ত আদর-যত্নে ও মাল-ঐশ্বর্যে লালিত হইতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই পরিবারের লোকজনকে না জানাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন এবং এইভাবেই রহিলেন। কেহ যাইয়া পরিবারের লোকদেরকে জানাইয়া দিলো। তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া কয়েদ করিয়া রাখিল। কিছুদিন এইভাবে কাটাইবার পর কোন এক সুযোগে গোপনে পালাইয়া গেলেন এবং হাবশার দিকে হিজরতকারীদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যময় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এতই অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন যে, একবার হযরত মুসআব (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহার পরনে কেবল একটি মাত্র চাদর ছিল তাহাও কয়েক জায়গায় ছিঁড়া। এক জায়গায় কাপড়ের পরিবর্তে চামড়ার তালি লাগানো ছিল, তাঁহার বর্তমান অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

উহুদের যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। যখন মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি অবিচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকেন। জনৈক কাফের নিকটে আসিয়া তরবারী দ্বারা তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলে যেন ঝাণ্ডা নিচে পড়িয়া যায় এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য পরাজয় হইয়া যায়। তিনি সাথে সাথে অপর হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন। কাফের তাহার অপর হাতটিও কাটিয়া ফেলিল, তখন তিনি উভয় বাহুর সাহায্যে বুকের সহিত ঝাণ্ডা আঁকড়াইয়া ধরিলেন যাহাতে পড়িয়া না যায়। সে কাফের তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডাটি মাটিতে পড়িতে দেন নাই। অতঃপর ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তাহা উঠাইয়া লইল।

দাফনের সময় তাহার নিকট একটি মাত্র চাদর ছিল। উহা দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা যাইতেছিল না। মাথা ঢাকিতে গেলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিতে গেলে মাথা খুলিয়া যাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পায়ের দিকে ইযখির পাতা দ্বারা ঢাকিয়া দাও। (কুররাতুল উয়ূন, ইসাবাহ্)

ফায়দা ঃ ইহা হইল ঐ ব্যক্তির জীবনের শেষ সময়। যিনি অত্যন্ত আদর–যত্নে ও আরাম–আয়েশে লালিত–পালিত হইয়াছিলেন। দুইশত দেরহাম মূল্যের কাপড় জোড়া পরিধান করিতেন আর আজ কাফনের জন্য একটি পূর্ণ চাদরও তাহার মিলিতেছে না। আর অপর দিকে হিম্মত ও সাহসের অবস্থা এই যে, জীবন থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডা হাত হইতে পড়িতে দেন নাই। উভয় হাত কাটা যাওয়ার পরও ঝাণ্ডা ছাড়িলেন না। অত্যন্ত আদর–যত্নে লালিত–পালিত হইয়াছিলেন কিন্তু ঈমান তাহাদের মধ্যে এতই দৃঢ়ভাবে স্থান করিয়া লইত যে, এই ঈমান তাহাদিগকে টাকা পয়সা আরাম–আয়েশ হইতে সরাইয়া নিজের মধ্যে মগ্ন করিয়া নিত।

(৬) কাদেসিয়ার যুদ্ধে হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর চিঠি

ইরাকের যুদ্ধের সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)এর স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল। সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত এই পরামর্শ চলিতেছিল যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সমীচীন হইবে, নাকি মদীনায় থাকিয়া সৈন্য পাঠাইবার কাজে মশগুল থাকা সমীচীন হইবে। সাধারণ লোকদের রায় ছিল তাঁহার স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। আর বিশিষ্ট লোকদের রায় ছিল মদীনায় থাকিয়া সৈন্য প্রেরণের কাজ আঞ্জাম দেওয়া। পরামর্শকালে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)–এর সম্পর্কেও আলোচনা হয়, তাহাকে সকলে পছন্দ করিলেন যে যদি তাহাকে পাঠানো হয় তবে খুবই ভালো হইবে এবং তখন আর হযরত ওমর (রাযিঃ)এর যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না। হযরত সা'দ (রাযিঃ) অত্যন্ত বীরপুরুষ ও আরবের সিংহ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ফলকথা সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত সা'দ (রাযিঃ)কে পাঠানো হইল। তিনি যখন কাদেসিয়া নামক স্থানে হামলা করার উদ্দেশ্যে পৌঁছেন তখন ইরানের সম্রাট বিখ্যাত পাহলোয়ান রোস্তমকে তাঁহার মোকাবেলায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রোস্তম আপ্রাণ চেষ্টা করিল যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য। সম্রাটের কাছে আবেদন করিল, আমি আপনার কাছে থাকিলেই ভাল হইবে। আসলে সে বড় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিতেছিল যে, এখান হইতে আমি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিব এবং প্রয়োজনীয় শলাপরামর্শে আপনাকে সহযোগিতা করিব। কিন্তু

সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ তাহার আবেদন গ্রহন করিল না এবং বাধ্য হইয়া তাহাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইল। (আশহার)

হযরত সা'দ (রাযিঃ) যখন রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

"সা'দ! এই ধারণা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলিয়া না দেয় যে, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আল্লাহ তায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা ধৌত করেন না বরং মন্দকে উত্তম দ্বারা ধৌত করেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। তাঁহার দরবারে কেবল বন্দেগীই গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চ বংশীয় নিচ বংশীয় সকলেই সমান। সকলেই তাঁহার বান্দা এবং তিনি সকলের পালনকর্তা। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয় বন্দেগীর মাধ্যমে। প্রত্যেক কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা কি ছিল তাহা লক্ষ্য রাখিবে। আর উহাই করণীয়। আমার এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে। তোমাকে একটি মহান কাজের উদ্দেশ্যে পাঠানো হইতেছে। একমাত্র হকের অনুসরণের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে। নিজেকে এবং নিজের সাথীদেরকে উত্তম কাজের অভ্যস্ত বানাইবে, আল্লাহর ভয় এখতিয়ার করিবে। আল্লাহর ভয় দুই জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়—তাঁহার আনুগত্য ও গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে। আল্লাহর আনুগত্য যাহার ভাগ্যেই নসীব হইয়াছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি ভালবাসার কারণেই নসীব হইয়াছে। (আশহার)

ইহার পর হযরত সা'দ (রাযিঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন যাহা রোস্তমের প্রতি তাঁহার প্রেরিত চিঠি দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি লিখেন—

فَإِنَّ مَعِىَ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّوْنَ الْاَعَاجِمُ الْخَمْرَ

"নিশ্চয়ই আমার সহিত এমন এক বাহিনী রহিয়াছে যাহারা মৃত্যুকে এইরূপ ভালবাসে যেমন তোমরা শরাব পান করাকে ভালবাস।"

(তাফসীরে আযীযী ঃ ১ম খণ্ড)

ফায়দা ঃ শরাবের আসক্ত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, শরাবে কি স্বাদ রহিয়াছে? আর যাহারা মৃত্যুকে ঐরূপ ভালবাসে, কামিয়াবী তাহাদের পদ চুম্বন করিবে না কেন?

(৭) উহুদের যুদ্ধে হযরত ওহ্ব ইবনে কাবুসের শাহাদতবরণ

হযরত ওহ্ব ইবনে কাবুস (রাযিঃ) একজন সাহাবী। যিনি কোন একসময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন এক গ্রামে নিজ বাড়ীতে বসবাস করিতেন। গ্রামে বকরী চরাইতেন। আপন ভাতিজাসহ বকরীগুলি এক রশিতে বাঁধিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে গিয়াছেন। বকরীর পাল সেখানে রাখিয়াই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। এমন সময় কাফেরদের একটি দল আক্রমনরত অবস্থায় আগাইয়া আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। হযরত ওহ্ব (রাযিঃ) বীরবিক্রমে তরবারী চালাইতে শুরু করিলেন এবং সকলকে হটাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বার আবার ঐরূপ হইল। তৃতীয়বারও ঐরূপ হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিলেন। ইহা শুনিয়াই তিনি তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আমি লড়াইয়ের ময়দানে ওহ্ব (রাযিঃ)এর মত বীরত্ব ও সাহসিকতা আর কাহারো দেখি নাই। তাঁহার শাহাদতের পর আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, ওহ্বের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মোবারক হাতে তাঁহাকে দাফন করিলেন। যদিও এই যুদ্ধে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আহত হইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিতেন, ওহ্বের আমলের উপর আমার যত ঈর্ষা হইয়াছে আর কাহারও আমলের উপর এইরূপ ঈর্ষা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হয় তাহার মত আমলনামা লইয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হই। (ইসাবাহ, কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ তাঁহার উপর ঈর্ষা হওয়ার কারণ হইল, তিনি জীবনকে তুচ্ছ মনে করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নচেৎ স্বয়ং হযরত ওমর (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবীদের ইহার চাইতেও অনেক বড় কীর্তি রহিয়াছে।

(৮) বীরে মাঊনার যুদ্ধ

বীরে মাঊনার একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। যাহাতে সত্তর জন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর একটি বিরাট জামাত সম্পূর্ণরূপে শহীদ হইয়াছেন। তাঁহারা 'কুররা' নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ তাঁহারা সকলেই কুরআনের হাফেজ ছিলেন। কয়েকজন মুহাজির ব্যতীত অধিকাংশ আনসারী সাহাবী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কেননা, তাঁহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় জিকির ও তেলাওয়াতে কাটাইতেন এবং দিনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ঘরের প্রয়োজনসমূহ যেমন লাকড়ী পানি ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিতেন। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের এই জামাতকে নজদের অধিবাসী বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি যাহার নাম আমের ইবনে মালেক এবং উপনাম ছিল আবু বারা, সে তাঁহাদেরকে নিজের আশ্রয়ে তাবলীগ ও ওয়াজ–নসীহতের নামে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াও ছিলেন যে, আমি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা করিতেছি। কিন্তু সে ব্যক্তি জোরদারভাবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্তরজন সাহাবীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং বনি আমেরের সর্দার আমের ইবনে তুফাইলের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠিও দিয়া দিলেন। তাঁহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বীরে মাঊনায় পৌঁছিয়া থামিলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে উমাইয়া ও মুনযির ইবনে ওমর এই দুইজন সকলের উটগুলিকে লইয়া চরাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। এবং হযরত হারাম (রাযিঃ) দুইজন সঙ্গীসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া চিঠি লইয়া আমের ইবনে তুফাইলের নিকট গেলেন। কাছাকাছি পৌঁছিয়া হযরত হারাম (রাযিঃ) দুই সাথীকে বলিলেন, তোমরা এইখানে অবস্থান কর, আমি আগে যাইতেছি। যদি আমার সাথে কোন প্রতারণা বা গাদ্দারী না করা হয়, তবে তোমরাও চলিয়া আসিও নতুবা তোমরা এখান হইতে ফেরত চলিয়া যাইও। কেননা তিনজন মারা যাওয়ার চাইতে একজন মারা যাওয়া ভাল।

আমের ইবনে তুফাইল উক্ত আমের ইবনে মালেকের ভাতিজা ছিল, যিনি এই সকল সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে এই আমের ইবনে তুফাইলের চরম দুশমনী ছিল। হযরত হারাম (রাযিঃ) আমের ইবনে তুফাইলের কাছে চিঠি

হস্তান্তর করিলে সে ক্রোধে চিঠি না পড়িয়াই একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া হযরত হারাম (রাযিঃ)-এর দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। হযরত হারাম (রাযিঃ)—فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ "কা'বার রবের কসম! আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।" এই বলিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। সে ইহারও কোন পরওয়া করিল না যে, কোন দূতকে হত্যা করা কোন জাতির কাছেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সে ইহারও পরওয়া করিল না যে, আমার চাচা তাঁহাদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছে। হযরত হারামকে শহীদ করিবার পর সে গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদেরকেও উত্তেজিত করিল যে, একজন মুসলমানকেও তোমরা জীবিত রাখিও না। কিন্তু তাহারা আবুল বারা অর্থাৎ আমের ইবনে মালেকের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি লইয়া একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাই সে আশেপাশের অন্যান্য লোকদেরকে সমবেত করিয়া বিরাট একটি দল লইয়া ঐ সত্তরজন সাহাবীর মোকাবিলা করিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবী বিরাট কাফেরদলের সাথে কতক্ষণ আর মোকাবিলা করিতে পারেন। উপরন্তু তাহারা চারদিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন।

অবশেষে কেবল একজন সাহাবী কা'ব ইবনে যায়েদ ব্যতীত সকলেই শহীদ হইয়া যান। কা'ব ইবনে যায়েদের সামান্য নিঃশ্বাস বাকী ছিল। কাফেররা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হযরত মুনযির ও হযরত ওমর (রাযিঃ) এই দুইজন উট চরাইতে গিয়াছিলেন। তাহারা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন মৃতখাদক পাখী উড়িতেছে। তাঁহারা উভয়েই এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন যে, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাস্থলে আসিয়া সকল সাথীদেরকে শহীদ অবস্থায় পাইলেন। আর কাফেরদের ঘোড়সওয়ারদেরকে রক্তে রঞ্জিত তরবারী লইয়া তাহাদের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে দেখিলেন। এই পরিস্থিতি দেখিয়া তাঁহারা থমকিয়া গেলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিলেন কি করা উচিত। ওমর ইবনে উমাইয়া বলিলেন, চল ফিরিয়া যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর জানাই। কিন্তু হযরত মুনযির বলিলেন, খবর তো হইয়াই যাইবে। আমার মন চাহিতেছে না যে, শাহাদাতকে বর্জন করি এবং এই স্থান হইতে চলিয়া যাই। যেখানে আমাদের বন্ধুরা পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সামনের দিকে অগ্রসর হও এবং সাথীদের সাথে যাইয়া মিলিত হও। অতএব উভয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হযরত মুনযির শহীদ হইয়া গেলেন আর হযরত ওমর ইবনে উমাইয়্যা গ্রেফতার

হইলেন। যেহেতু আমেরের মা কোন এক কারণে গোলাম আযাদ করার মান্নত করিয়াছিল, সেই মান্নত আদায়ের উদ্দেশ্যে আমের তাহাকে আযাদ করিয়া দিল। (ইসলাম)

ঐ সকল শহীদানদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাও ছিলেন। তাঁহার ঘাতক জাব্বার ইবনে সালমা বলেন যে, আমি যখন তাহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করি এবং তিনি শহীদ হইয়া যান তখন বলিলেন— فُزْتُ وَاللّٰهِ খোদার কসম! আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।

অতঃপর আমি দেখিলাম তাহার লাশ আকাশের দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি পরে মানুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি নিজে তাহাকে বর্শা মারিয়াছি আর তিনি মারা গেলেন, কিন্তু তারপরও তিনি বলিলেন, 'আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।' এই কামিয়াবী কি ছিল? লোকেরা বলিল যে, ঐ কামিয়াবী ছিল জান্নাতের। ইহাতে আমি মুসলমান হইয়া গেলাম। (খামীস)

ফায়দা ঃ ইহারাই হইলেন ঐসব লোক যাহারা যথার্থ অর্থেই ইসলামের জন্য গৌরব ছিলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যু তাঁহাদের কাছে শরাবের চাইতে অধিক প্রিয় ছিল। আর এইরূপ হইবেই না কেন? তাঁহারা তো দুনিয়াতে এমন কাজ করিয়াছেন যাহা দ্বারা আল্লাহর কাছে তাহাদের কামিয়াবী ও সফলতা নিশ্চিত ছিল। এইজন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিতেন তিনি সফল হইতেন।

(৯) হযরত উমাইর (রাযিঃ)-এর উক্তি 'খেজুর খাওয়া দীর্ঘ জীবন'

বদরের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা উঠ এবং অগ্রসর হও এমন জান্নাতের দিকে যাহার প্রস্থ আসমান-যমীনের চাইতেও বহু গুণ বেশী, যাহা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে। হযরত উমাইর ইবনে হামাম এক সাহাবী এইকথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহ্! বাহ্! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কেন বাহ! বাহ! বলিলে? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আকাঙ্খা হয় আমিও তাহাদের মধ্য হইতে হইতাম! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্য হইতে। অতঃপর তিনি থলি হইতে কিছু খেজুর বাহির করিয়া খাইতে শুরু

করিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, হাতের খেজুরগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনেক দীর্ঘ জীবন। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব। এই বলিয়া খেজুর ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার হাতে লইয়া ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই জান্নাতের কদর করিয়াছেন এবং উহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদেরও যদি অনুরূপ একীন নসীব হইয়া যায় তবে সবকিছু সহজ হইয়া যাইবে।

(১০) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর হিজরত

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তাঁহার বাহাদুরী সম্পর্কে জানে এবং তাহার সাহসীকতাকে স্বীকার করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সকল মুসলমানরা দুর্বল ছিল তখন স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মুসলমান হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছেন। আর সেই দোয়া কবুলও হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা কা'বাঘরের নিকট নামায পড়িতে পারিতাম না। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি লুকাইয়া হিজরত করিয়াছে। যখন হযরত ওমর (রাযিঃ) হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন গলায় তরবারী ঝুলাইয়া এবং হাতে বহু তীর ও ধনুক লইয়া সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করিলেন। ধীরস্থিরভাবে তাওয়াফ করিলেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে নামায আদায় করিলেন। অতঃপর কাফেরদের সমাবেশে যাইয়া বলিলেন যে, যাহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, তাহার মা ক্রন্দন করুক, তাহার স্ত্রী বিধবা হউক এবং তাহার সন্তানরা এতীম হউক, সে যেন মক্কার বাহিরে আসিয়া আমার সাথে মোকাবেলা করে। ভিন্ন ভিন্ন দলকে এই কথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন। কোন এক ব্যক্তিরও তাহাকে বাধা দেওয়ার হিম্মত হয় নাই। (উসদুল গাবাহ)

(১১) মুতা যুদ্ধের ঘটনা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বাদশাহদের নিকট তাবলীগী দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি পত্র হযরত হারেস ইবনে উমাইর অযদী (রাযিঃ)এর হাতে বুসরার বাদশার নিকটও

পাঠাইয়াছিলেন। যখন তিনি মূতা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন শুরাহবীল গাস্‌সানী নামক কায়সারের জনৈক গভর্নর তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। দূতকে হত্যা করা কাহারও নিকটেই পছন্দনীয় নহে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তিনি তিন হাজারের এক বাহিনী তৈয়ার করিয়া হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাযিঃ)কে তাহাদের উপর আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি যায়েদ ইবনে হারেসা শহীদ হইয়া যায় তবে জাফর ইবনে আবি তালেব আমীর নিযুক্ত হইবে। আর সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর নিযুক্ত হইবে। সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে মুসলমানগণ যাহাকে পছন্দ করে আমীর বানাইয়া লইবে। এক ইহুদী এইসব কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, এই তিনজন অবশ্যই শহীদ হইয়া যাইবেন। কেননা পূর্ববর্তী নবীগণের এই ধরনের কথার অর্থ ইহাই হইত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা ঝাণ্ডা তৈরী করিয়া হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে দিলেন এবং নিজে এক জামাত সহকারে তাহাদেরকে বিদায় জানাইতে গেলেন। বিদায় দানকারীগণ যখন শহরের বাহিরে গিয়া বিদায় জানাইয়া ফিরিবার সময় মুজাহিদদের জন্য দোয়া করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিরাপদে সফলতার সাথে ফিরাইয়া আনেন এবং সমস্ত বিপদ-আপদ হইতে হেফাজত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) ইহার জবাবে তিনটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই—

"আমি তো আমার রবের নিকট গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি আর এই কামনা করিতেছি যে, একটি তরবারী যেন এমন হয় যাহা দ্বারা আমার রক্তের ফুয়ারা বইতে থাকে অথবা এমন একটি বর্শা হয় যাহা দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ও কলিজা চিরিয়া বাহির হইয়া আসে। আর যখন মানুষ আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তখন যেন এইকথা বলে যে, হে গাজী! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম করুন। আর বাস্তবিকই তুমি হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম ছিলে।

অতঃপর তাহারা রওয়ানা হইয়া গেলেন। শুরাহবীল তাঁহাদের এই রওয়ানা হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া একলক্ষ সৈন্যের একটি দল লইয়া মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া জানিতে পারিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাকলও এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মোকাবিলা করিবার জন্য আসিতেছে। এই খবরে তাঁহারা একটু দ্বিধাগ্রস্ত

হইয়া পড়িলেন যে, এই বিরাট বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা হইবে নাকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা কিসের ভয় করিতেছ? তোমরা কী উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছ? তোমাদের উদ্দেশ্যই তো হইল শহীদ হইয়া যাওয়া। আমরা কখনও শক্তি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করি নাই। আমরা তো কেবল ঐ দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করিয়াছি যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মান দান করিয়াছেন। সম্মুখে অগ্রসর হও দুইটি সফলতার যে কোন একটি অবশ্যই লাভ করিবে। হয়ত শহীদ হইবে নতুবা বিজয়ী হইবে। এই কথা শুনিয়া মুসলমানগণ সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হইলেন এবং মূতা নামক স্থানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) পতাকা হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। শুরাহবীলের ভাই নিহত হইল এবং অন্যান্য সাথী পালাইয়া গেল। শুরাহবীল নিজেও পালাইয়া এক দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং হিরাকলের কাছে সাহায্য চাহিয়া লোক পাঠাইল। হিরাকল প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য পাঠাইল। প্রচণ্ড লড়াই চলিতে থাকিল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। অতঃপর হযরত জাফর (রাযিঃ) পতাকা ধারণ করিলেন এবং নিজেই আপন ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন যাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার কল্পনাও মনে না আসে। অতঃপর কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই—

"হে লোকসকল! জান্নাত কতই না সুন্দর আর জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া কতই না উত্তম, কতই না উত্তম জিনিস আর কতই না সুশীতল উহার পানি। রোমকদের উপর শাস্তির সময় আসিয়া গিয়াছে। তাহাদেরকে কতল করা আমার জন্যও জরুরী হইয়া গিয়াছে।"

এইসব কবিতাসমূহ পাঠ করিলেন, আর নিজের ঘোড়ার পা তো নিজেই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার খেয়ালও অন্তরে না আসিতে পারে, তারপর তরবারী লইয়া কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমীর হওয়ার কারণে ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। প্রথমে ঝাণ্ডা ডান হাতে ধারণ করিয়াছিলেন। কাফেররা তাঁহার হাতটি কাটিয়া ফেলিল যাহাতে ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাতে নিলেন। যখন বাম হাতও কাটিয়া ফেলিল তখন উভয় বাহুর সাহায্যে পতাকা আটকাইয়া রাখিলেন এবং দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া রাখিলেন। এক ব্যক্তি পিছন হইতে হামলা করিয়া তাঁহাকে দুই টুকরা

করিয়া দিল ফলে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, পরে যখন আমরা অন্যান্য লাশ হইতে হযরত জাফরের লাশ বাহির করিলাম তখন তাহার শরীরের সম্মুখভাগে নব্বইটি জখম দেখিতে পাইলাম। তাহার শাহাদতের পর লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ডাক দিল। তিনি বাহিনীর এক কোণে গোশতের একটি টুকরা খাইতেছিলেন, কেননা তিন দিন যাবৎ কিছু মুখে দেওয়ার মত মিলে নাই। ডাক শুনামাত্রই তিনি গোশতের টুকরা ফেলিয়া দিয়া নিজেকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, জাফর তো শহীদ হইয়া গিয়াছে আর তুমি দুনিয়া লইয়া মশগুল আছ। এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ঝাণ্ডা লইয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। হাতের একটি আঙ্গুলে আঘাত লাগিয়া উহা ঝুলিতে লাগিল। তিনি আঙ্গুলটি পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে হাত টান দিলেন। উহা পৃথক হইয়া গেল। উহা ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ ও অস্থির অবস্থায় মনে কিছুটা সংশয় ও দ্বিধারও সঞ্চার হইল যে, না হিম্মত না মোকাবিলা করার শক্তি। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবস্থায় কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল অতঃপর নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মন! তোর কোন্ জিনিসের সখ বাকী রহিয়াছে যাহার ফলে এই সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে? যদি স্ত্রীর সখ থাকিয়া থাকে তবে স্ত্রী তিন তালাক। আর যদি গোলাম বাঁদীর সখ থাকিয়া থাকে তবে তাহারা আযাদ। আর যদি বাগ-বাগিচার শখ থাকিয়া থাকে তবে তাহা সবই আল্লাহর রাস্তায় সদকা। অতঃপর তিনি কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ—

"আল্লাহর কসম হে মন! তোমাকে সন্তুষ্টচিত্তে হউক বা অসন্তুষ্ট চিত্তে হউক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। দীর্ঘ এক যুগ তুমি নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইয়াছ। চিন্তা করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত তুমি এক ফোটা বীর্যই তো। লক্ষ্য কর কাফেররা মুসলমানদের উপর চড়াও হইয়া আসিতেছে। তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করিতেছ না। তুমি যদি কতল না হও তবে এমনিতেও একদিন মরিবেই।"

এই বলিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার চাচাতো ভাই এক টুকরা গোশত আনিয়া বলিলেন, এইটুকু খাইয়া কোমর সোজা করিয়া লও। কেননা কয়েকদিন যাবৎ তুমি কিছু খাও নাই। তিনি গোশতের টুকরাটি হাতে নিলেন। এমন সময় একদিক হইতে হামলার আওয়াজ আসিল। গোশতের টুকরাটি ফেলিয়া দিলেন এবং তরবারী হাতে লইয়া

ভীড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত তরবারী চালাইতে থাকিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর পুরা জিন্দেগীর ইহাই নমুনা। তাহাদের প্রতিটি ঘটনাই এইরূপ যাহা দুনিয়ার স্থায়িত্ব ও হীনতা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহের শিক্ষা দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তো প্রশ্নই উঠে না, তাবেয়ীগণও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

একটি ভিন্ন রকম ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। এতক্ষণ শত্রুর মোকাবিলা করার নমুনা দেখিয়াছেন, এখন শাসকের সামনে হক কথা বলার একটি নমুনা দেখুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"সর্বোত্তম জেহাদ হইল জালেম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) ও হাজ্জাজের কথোপকথন ঃ

হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অবশ্য তখনকার বাদশাহরা জালেম হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজও করিত। তথাপি দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের তুলনায় তাহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইত। তাই মানুষ তাহাদিগকে অপছন্দ করিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)ও ইবনুল আশআসের সহিত মিলিয়া হাজ্জাজের মোকাবিলা করিয়াছেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ হইতে গভর্নর ছিল। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। হুকুমত এবং বিশেষ করিয়া হাজ্জাজের তাহার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা ছিল। যেহেতু তিনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাই শত্রুতা থাকাই স্বাভাবিক। যুদ্ধে হাজ্জাজ তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারে নাই। তিনি পরাজিত হওয়ার পর আত্মগোপন করিয়া মক্কা মুকাররমায় চলিয়া যান। হুকুমত মক্কার আগের গভর্নরকে অপসারণ করিয়া নিজের লোককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করিল। নবনিযুক্ত গভর্নর সেখানে খুতবা পাঠ করে। খুতবার শেষে বাদশাহ আবদুল মালিকের এই ঘোষণাও শুনাইয়া দিল যে, যে ব্যক্তি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে আশ্রয় দিবে তাহার মঙ্গল হইবে না। ইহার পর গভর্নর নিজের পক্ষ হইতেও কসম খাইয়া এই ঘোষণা দিল যে, যাহার ঘরে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে পাওয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার ঘর

প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ীসহ ধ্বংস করিয়া দিব। যাহা হউক গভর্নর বড় কষ্টে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া হাজ্জাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। হাজ্জাজ নিজের আক্রোশ মিটাইবার ও তাঁহাকে হত্যা করার সুযোগ পাইয়া তাহাকে সামনে ডাকিল ও প্রশ্ন করিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ—

হাজ্জাজ ঃ তোমার নাম কি?

সাঈদ ঃ আমার নাম সাঈদ।

হাজ্জাজ ঃ কাহার পুত্র?

সাঈদ ঃ জুবাইরের পুত্র। (সাঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান আর জুবাইর অর্থ সংশোধিত। যদিও নামে সাধারণতঃ অর্থ লক্ষণীয় থাকে না তবু হাজ্জাজের কাছে তাঁহার ভাল অর্থযুক্ত নাম পছন্দনীয় হয় নাই। এইজন্য সে বলিল) তুমি হইতেছ শাকী বিন কাসীর। (শাকী অর্থ হতভাগা আর কাসীর অর্থ ভগ্নবস্তু।)

সাঈদ ঃ আমার মা আমার নাম তোমার চেয়ে ভাল জানিতেন।

হাজ্জাজ ঃ তুমিও হতভাগা, তোমার মাও হতভাগা।

সাঈদ ঃ গায়েবের খবর তুমি ব্যতীত অন্য কেহ জানেন অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা।

হাজ্জাজ ঃ দেখ, আমি এখন তোমাকে হত্যা করিব।

সাঈদ ঃ তাহা হইলে আমার মা আমার নাম ঠিক রাখিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ এখন আমি তোমাকে জীবনের পরিবর্তে কেমন জাহান্নামে পাঠাইতেছি।

সাঈদ ঃ আমি যদি জানিতাম ইহা তোমার ইচ্ছাধীন তবে তোমাকে মাবুদ বানাইয়া লইতাম।

হাজ্জাজ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তোমার আকীদা কি?

সাঈদ ঃ তিনি রহমতের নবী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ছিলেন, যিনি সর্বোত্তম উপদেশ সহ বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ খলীফাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

সাঈদ ঃ আমি তাঁহাদের রক্ষক নহি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জিম্মাদার।

হাজ্জাজ ঃ আমি তাহাদিগকে ভাল বলি, না মন্দ বলি?

সাঈদ ঃ যে বিষয় সম্পর্কে আমার জানা নাই সে সম্পর্কে আমি কি বলিতে পারি? আমার শুধু নিজের অবস্থা সম্বন্ধেই জানা আছে।

হাজ্জাজ ঃ তাঁহাদের মধ্যে তোমার মতে সর্বোত্তম কে?

সাঈদ ঃ যিনি আমার মালিককে সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন। কোন কোন কিতাবে এইরূপ উত্তর উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাঁহাদের অবস্থা হিসাবে একজন অপরজনের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য।

হাজ্জাজ ঃ তাঁহাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন কে?

সাঈদ ঃ ইহা তিনিই জানেন যিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন।

হাজ্জাজ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) জান্নাতে আছেন, না জাহান্নামে?

সাঈদ ঃ আমি যদি জান্নাতে এবং জাহান্নামে যাই এবং সেখানকার লোকদিগকে প্রত্যক্ষ করি তবে ইহা বলিতে পারিব।

হাজ্জাজ ঃ আমি কেয়ামতের দিন কেমন ব্যক্তি হইব?

সাঈদ ঃ আমি গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ।

হাজ্জাজ ঃ তুমি আমার সাথে সত্য কথা বলিতে চাহিতেছ না।

সাঈদ ঃ আমি মিথ্যাও বলি নাই।

হাজ্জাজ ঃ তুমি কখনও হাস না কেন?

সাঈদ ঃ হাসির কোন বিষয় দেখিতেছি না। আর ঐ ব্যক্তি কি হাসিবে যে মাটি হইতে সৃষ্টি, যাহাকে কেয়ামতের দিন হাজির হইতে হইবে আর যে দুনিয়ার ফেতনায় সর্বদা আক্রান্ত?

হাজ্জাজ ঃ আমি তো হাসি।

সাঈদ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি তোমাকে হত্যা করিব।

সাঈদ ঃ আমার মৃত্যুর ওসীলা বানানেওয়ালা নিজের কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি আল্লাহর কাছে তোমার চাইতে বেশী প্রিয়।

সাঈদ ঃ আল্লাহর উপরে কেহই এ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারে না যতক্ষণ না সে আপন মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়। আর গায়েবের বিষয় একমাত্র আল্লাহই জানেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি এই সাহসিকতা কেন প্রদর্শন করিতে পারিব না অথচ আমি জামাতের বাদশাহের সঙ্গে আছি আর তুমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছ।

সাঈদ ঃ আমি জামাত হইতে পৃথক নহি আর আমি নিজেই ফেতনা পছন্দ করি না। আর যাহা তকদীরে আছে তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না।

হাজ্জাজ ঃ আমরা যাহা কিছু আমীরুল মুমিনীনের জন্য জমা করি উহাকে তুমি কিরূপ মনে কর?

সাঈদ ঃ আমি জানিনা তোমরা কি সঞ্চয় করিয়াছ। (হাজ্জাজ সোনা রূপা কাপড় চোপড় ইত্যাদি তাঁহার সামনে উপস্থিত করিল)

সাঈদ ঃ এইসব জিনিস ভাল যদি শর্ত মাফিক হয়।

হাজ্জাজ ঃ শর্তটি কি?

সাঈদ ঃ শর্ত হইল, তুমি এইগুলি দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করিবে যাহা বিভীষিকাময় দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন শান্তি এবং নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। নচেৎ প্রত্যেক দুগ্ধদানকারিণী দুগ্ধপায়ীকে ভুলিয়া যাইবে, গর্ভপাত ঘটিয়া যাইবে এবং কোন মানুষেরই নেক আমল ব্যতীত অন্য কিছু কোনপ্রকার উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

হাজ্জাজ ঃ আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহা ভাল জিনিস নয় কি?

সাঈদ ঃ তুমি যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ভাল-মন্দ তুমিই বুঝিতে পার।

হাজ্জাজ ঃ তুমি কি এইসব বস্তুর কোনটি নিজের জন্য পছন্দ করো?

সাঈদ ঃ আমি কেবল ঐ বস্তুই পছন্দ করি যাহা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

হাজ্জাজ ঃ তুমি ধ্বংস হও।

সাঈদ ঃ ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যাহাকে জান্নাত হইতে সরাইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়।

হাজ্জাজ ঃ (বিরক্ত হইয়া বলিল) বল আমি তোমাকে কিভাবে হত্যা করিব?

সাঈদ ঃ যেভাবে নিজের ব্যাপারে কতল হওয়া পছন্দ করো।

হাজ্জাজ ঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব কি?

সাঈদ ঃ আল্লাহর ক্ষমা হইল প্রকৃত ক্ষমা। তোমার ক্ষমা কিছুই নহে।

হাজ্জাজ জল্লাদ প্রতি তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। যখন তাঁহাকে বাহিরে আনা হয় তখন তিনি হাসিতেছিলেন। এই সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌঁছিলে পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

হাজ্জাজ ঃ তুমি হাসিলে কেন?

সাঈদ ঃ আল্লাহর উপর তোমার দুঃসাহস এবং তোমার প্রতি আল্লাহর ধৈর্য দেখিয়া।

হাজ্জাজ ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। অতঃপর জল্লাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমার সামনে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও।

সাঈদ ঃ আমি দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া নিবো। দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া কেবলামুখী হইয়া বলিলেন—

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আমি অন্যসব কিছু হইতে বিমুখ হইয়া স্বীয় মুখ আল্লাহর দিকে ফিরাইতেছি যিনি আসমান –যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

হাজ্জাজ ঃ ইহার চেহারা কেবলার দিক হইতে সরাইয়া নাসারাদের কেবলার দিকে ফিরাইয়া দাও। কেননা তাহারাও নিজের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

সাঈদ ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ الْكَافِيْ بِالسَّرَائِرِ

"তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ রহিয়াছেন। যিনি গোপন রহস্যসমূহ জানেন।"

হাজ্জাজ ঃ তাহাকে উপুড় করিয়া দাও। (অর্থাৎ জমিনের দিকে মুখ করিয়া দাও) কেননা আমরা তো জাহেরের উপর আমল করার জিম্মাদার।

সাঈদ ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى.

"আমি তোমাদিগকে মাটি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি আর উহার মধ্যে তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনিব। অনন্তর মাটি হইতেই তোমাদিগকে পুনরায় উঠাইব।"

হাজ্জাজ ঃ একে হত্যা করিয়া ফেল।

সাঈদ ঃ আমি তোমাকে এই কথার সাক্ষী বানাইতেছি—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

তুমি এই বিষয়টি সংরক্ষণ করিও। যখন আমি কেয়ামতের দিন তোমার সহিত মিলিত হইব তখন লইয়া লইব।

অতঃপর তাঁহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। হত্যা করার পর তাঁহার দেহ হইতে এত বেশী রক্তক্ষরণ হইয়াছে যাহা দেখিয়া স্বয়ং হাজ্জাজও বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সে নিজের চিকিৎসককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চিকিৎসক বলিল, হত্যার সময় তিনি অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। মনে কোন প্রকার ভয় ছিল না। তাই রক্ত

আপন অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য মানুষের রক্ত ভয়ের কারণে আগেই শুকাইয়া যায়। (ওলামায়ে সল্‌ফ, কিতাবুল ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ)

ফায়দা ঃ বিভিন্ন কিতাবে প্রশ্নোত্তর **সম্পর্কে কিছু বেশকম** রহিয়াছে। যেহেতু আমার উদ্দেশ্য কেবল নমুনা পেশ করা, তাই এতটুকুই বর্ণনা করিলাম। তাবেয়ীগণের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ মনীষী হক কথা বলার দরুন সর্বদা কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তবু কখনও হক ত্যাগ করেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা

যেহেতু দ্বীনের মূল বিষয় হইল কালিমায়ে তৌহীদ আর উহাই যাবতীয় গুণাবলীর বুনিয়াদ, যতক্ষণ উহা না হইবে কোন নেক আমল কবুল হইবে না। এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষ করিয়া ইসলামের প্রথম যুগে কালিমায়ে তৌহীদের প্রচারে ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। ঐসময় তাহারা একাগ্রতার সহিত এলেমের চর্চার জন্য পুরাপুরি অবসর ছিলেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সকল ব্যস্ততার সহিত এলমের প্রতি তাহাদের মগ্নতা, শওক আগ্রহ এই পরিমাণ ছিল যে, উহার ফলস্বরূপ আজ চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের এলম অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রহিয়াছে। যাহা একটি প্রকাশ্য বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার পর যখন তাঁহারা কিছুটা অবসর হইলেন এবং মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল তখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়—

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

অর্থ ঃ মুসলমানদের জন্য ইহা সঙ্গত নহে যে, সবাই একসঙ্গে বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেক বৃহৎ দল হইতে একটি ক্ষুদ্র দল বাহির হইবে যাহাতে অবশিষ্ট লোকরা দ্বীনের সমঝ-বুঝ হাসিল করিতে থাকে এবং যাহাতে তাহারা যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিবে তখন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভয় দেখাইবে যেন তাহারা সতর্ক হয়। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا "তোমরা বাহির হও সর্বাবস্থায়—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় অথবা নিরস্ত্র অবস্থায়।"

আর—اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا— "যদি তোমরা বাহির না হও তবে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।"

এইসব আয়াত দ্বারা যে ব্যাপক হুকুম বুঝা যাইতেছে তাহা مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً দ্বারা মনসুখ অর্থাৎ রহিত হইয়া গিয়াছে।

সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তায়ালা বহু গুণের সমষ্টি দান করিয়াছিলেন। আর তখনকার জন্য ইহার প্রয়োজনও ছিল। কেননা এই একটি ক্ষুদ্র দলই দ্বীনের সমস্ত কাজ সামলাইতেছিলেন। কিন্তু তাবেয়ীনের যুগে যখন ইসলাম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বিরাট দল তৈরী হইয়া গেল আবার সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় বিভিন্নমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও বাকী রহিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক পয়দা করিলেন। মুহাদ্দিসীনগণের একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহাদের কাজ ছিল হাদীসের সংরক্ষণ ও প্রসার। ফুকাহায়ে কেরামের একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইল। (যাহাদের কাজ ছিল মাসআলা উদঘাটন করা।) এমনিভাবে সুফী, কারী, মুজাহিদ মোটকথা দ্বীনের প্রতিটি বিভাগকে স্বতন্ত্রভাবে সামলানেওয়ালা সৃষ্টি হইল। তখনকার জন্য ইহাই সমীচীন ও আবশ্যকীয় ছিল। নতুবা প্রত্যেক বিভাগের উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া পড়িত। কেননা একই ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করা খুবই দুষ্কর। এই গুণ আল্লাহ তায়ালা কেবল নবীগণকে বিশেষ করিয়া নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ঘটনাবলী ছাড়াও অন্যদের ঘটনাও বর্ণনা করা হইবে।

(১) ফতোয়ার কাজ করনেওয়ালা জামাতের তালিকা

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জেহাদে এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও ইলমী কাজেও সর্বদা মগ্ন ছিলেন এবং তাহারা প্রত্যেকে যখন যাহা অর্জন করিতেন উহা প্রচার করা ও পৌছানই তাহাদের কাজ ছিল, তথাপি তাঁহাদের একটি জামাত ফতোয়ার কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহারা খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

যুগেও ফতোয়ার কাজ করিতেন। তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), হযরত ওমর (রাযিঃ), হযরত ওসমান (রাযিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাযিঃ), হযরত হুযাইফা (রাযিঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ), হযরত আবু মূসা (রাযিঃ), হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ)। (তাল্‌কীহ)

ফায়দা ঃ ইঁহা ঐ সকল বুযুর্গদের এলেমের পরিপূর্ণতার পরিচয়, যাহাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই আহলে ফতোয়া বা মুফতী হিসাবে গণ্য করা হইত।

(২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর সংরক্ষিত হাদীসসমূহ জ্বালাইয়া দেওয়া

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পাঁচশত হাদীসের একটি ভাণ্ডার জমা করিয়াছিলেন। একরাত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অস্থিরতার সাথে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন কষ্ট হইতেছে, না কোন দুঃসংবাদ শুনিয়াছেন কিনা? মোটকথা, সারারাত্র এইভাবে অস্থিরতার মধ্যে কাটাইলেন এবং ভোরে আমাকে বলিলেন, তোমার কাছে যেসব হাদীস রাখিয়াছিলাম সেইগুলি লইয়া আস। আমি সেইগুলি লইয়া আসিলাম। তিনি সেইগুলি পুড়াইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন জ্বালাইয়া ফেলিলেন? তিনি বলিলেন, আমার আশংকা হইল যে, এমন না হইয়া যায় যে, আমি মরিয়া যাই আর এইগুলি আমার নিকট থাকিয়া যায়, কারণ এইগুলির মধ্যে অন্যেদের নিকট হইতে শোনা হাদীসও রহিয়াছে যাহা হয়ত আমি নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছি অথচ বাস্তবে উহা নির্ভরযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বর্ণনার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে উহার দায় আমাকে বহন করিতে হইবে। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর পাঁচশত হাদীসের একটি কিতাব সংকলন করা তাহার এলেমের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও সীমাহীন আগ্রহের আলামত। আর পরবর্তীতে উহা পুড়াইয়া ফেলা ছিল

তাহার চরম সতর্কতা। বিশিষ্ট সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বনের এই অবস্থাই ছিল। এইজন্যই অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম হইতে হাদীস খুব কম বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে আমাদের ঐসব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাহারা মিম্বরে বসিয়া বেধড়ক হাদীস বলিয়া দেন। অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবসময়ের সাথী ছিলেন। বাড়ীতে সফরে এমনকি হিজরতেরও সঙ্গী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন বাইয়াত গ্রহণের প্রশ্ন আসিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ভাষণ দিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আনসারদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্বলিত কোন আয়াত বা হাদীস তাহার সেই ভাষণে বলিতে বাদ রাখেন নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার কুরআন সম্পর্কে কেমন জ্ঞান ছিল এবং কি পরিমাণ হাদীস মুখস্থ ছিল! এতদসত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক হাদীসই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতেও কমসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর তবলীগ

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) যাঁহার এক ঘটনা সপ্তম অধ্যায়ের পাঁচ নম্বরে বর্ণনা করা হইয়াছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তালীম ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার ঐ জামাতের সহিত পাঠাইয়াছিলেন যাহারা মিনার ঘাঁটিতে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মদীনায় সর্বদা তালীম ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। লোকদের কুরআন পড়াইতেন ও দ্বীনের কথা শিখাইতেন। আসআদ ইবনে যুরারা (রাযিঃ)এর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মুকরী (শিক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রাযিঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাযিঃ) উভয়ই সর্দার ছিলেন। এই বিষয়টি তাহাদের নিকট অপ্রিয় লাগিল। সা'দ (রাযিঃ) উসাইদ (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি আসআদের নিকট যাইয়া বল, আমরা শুনিয়াছি তুমি একজন বিদেশী লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, সে আমাদের দুর্বল লোকদিগকে নির্বোধ বানাইতেছে

এবং ধোকা দিতেছে। তিনি আসআদের নিকট গেলেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই কথা বলিলেন। আসআদ বলিলেন, তুমি আগে তাহার কথাবার্তা শুন। যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় তবে কবুল করিও, আর যদি পছন্দ না হয় তবে তাহাকে বাধা দিতে কোন আপত্তি নাই। উসাইদ বলিলেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা। অতঃপর তিনি কথা শুনিতে লাগিলেন। হযরত মুসআব (রাযিঃ) ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করিলেন এবং কুরআনের আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) বলিলেন, কতই না উত্তম কথা আর কতই না উত্তম কালাম। আচ্ছা, তোমরা যখন কাহাকেও তোমাদের দ্বীনে দাখিল কর তখন কিরূপে কর? উত্তরে বলা হইল, তুমি গোসল কর, পবিত্র কাপড় পরিধান কর এবং কালিমায়ে শাহাদত পড়। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ এইসব কাজ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

অতঃপর তিনি হযরত সাদ (রাযিঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। হযরত সাদ (রাযিঃ)এর সাথেও অনুরূপ কথাবার্তা হইল। সাদ ইবনে মুয়ায (রাযিঃ)ও মুসলমান হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গোত্র বনুল আশহালের নিকট গিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের দৃষ্টিতে কেমন ব্যক্তি? তাহারা বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের নারী–পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান না হইবে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনিবে, আমার জন্য তোমাদের সহিত কথা বলা হারাম। এই কথা শুনিয়া উক্ত গোত্রের নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মুসলমান হইয়া গেল। হযরত মুসআব (রাযিঃ) তাহাদের দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে লাগিয়া গেলেন। (তালকীহ্)

ফায়দা ঃ ইহা সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ রীতি ছিল যে, যে কেহ মুসলমান হইতেন তিনি একজন মুবাল্লিগ হইয়া যাইতেন, ইসলাম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিতেন তাহা প্রচার করিতেন এবং অন্যের কাছে পৌছাইয়া দিতেন। ইহা তাঁহাদের জীবনের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যাহার জন্য কোন ব্যবসা–বাণিজ্য ক্ষেত খামার চাকুরী বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত না।

⑷ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর তালীম

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং প্রসিদ্ধ কারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হইতে তিনি লেখাপড়া জানিতেন। আরব

দেশে সাধারণভাবে লেখার প্রচলন ছিল না, ইসলামের পর ইহার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু তিনি পূর্ব হইতে লেখা জানিতেন তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া ওহীও লিখিতেন। কুরআন সম্বন্ধে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ঐ সকল লোকদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন হিফজ করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কা'ব আমার উম্মতের বড় কারী। তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে আট রাত্রিতে কুরআন শরীফ খতম করার এহতেমাম করিতেন।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন তোমাকে কুরআন শরীফ শুনাই। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম লইয়া বলিয়াছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তোমার নাম লইয়া বলিয়াছেন। এইকথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিতে লাগিলেন—

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

"আমার আলোচনা আমার চাইতে উত্তম, যাহা ঐ মহফিলে হইতেছে।"

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখন এলেম হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা তাইয়্যেবায় উপস্থিত হইলাম তখন মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষা দানকারী অনেকেই ছিলেন এবং প্রত্যেক উস্তাদের নিকটই শাগরেদদের পৃথক পৃথক মজলিস ছিল। আমি সেসব মজলিস অতিক্রম করিয়া একটি মজলিসে পৌছিলাম, সেখানে একজন লোক মুসাফির বেশে কেবল দুইটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় বসিয়া হাদীস পড়াইতেছিলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কোন বুযুর্গ? উত্তরে বলা হইল যে, মুসলমানদের সরদার উবাই ইবনে কা'ব। আমি তাঁহার মজলিসে বসিয়া গেলাম। যখন তিনি হাদীসের ছবক হইতে অবসর হইয়া ঘরে যাইতেছিলেন আমিও তাঁহার পিছনে চলিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম একটি পুরাতন ঘর জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। অতি সাধারণ আসবাব-পত্র এবং অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন। (তাবাকাত)

হযরত উবাই (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার পরীক্ষা স্বরূপ) এরশাদ ফরমাইলেন যে, কুরআন শরীফে (বরকত ও ফযীলতের দিক হইতে) সবচেয়ে বড় আয়াত

কোন্‌টি? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন। আদবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় একই উত্তর দিলাম। তৃতীয় বার যখন প্রশ্ন করিলেন তখন বলিলাম, আয়াতুল কুরসী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য তোমার এলেমকে মোবারক করুন।

একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াইতেছিলেন। নামাযে একটি আয়াত ছুটিয়া গেল। হযরত উবাই (রাযিঃ) লুকমা দিলেন। নামায শেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বলিয়া দিয়াছে? হযরত উবাই (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি বলিয়া দিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও ধারণা করিয়াছিলাম তুমিই বলিয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) এলেমের এই মশগুলি ও কুরআনের বিশেষ খেদমতে থাকা সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রত্যেক জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হুযূরের কোন জিহাদ এমন নাই যাহাতে তিনি শরীক হন নাই।

(৫) হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর গুরুত্ব সহকারে ফেতনার এলম অর্জন করা

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল সাহেবুস–সির বা গোপন রহস্যবিদ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মুনাফেকদের এবং বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে জানাইয়া দিয়াছিলেন। বলা হয় যে, একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যত ফেতনা আসিবে সব ধারাবাহিকভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কোন ফেতনা সম্পর্কে যাহাতে তিনশত লোক শরীক হইবে, বলিতে ছাড়েন নাই। বরং উক্ত ফেতনার অবস্থা ও উহার নেতৃত্ব দানকারীর নাম, তাহার পিতার নাম, গোত্রের নামসহ সবকিছু স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছিলেন। হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভাল ও কল্যাণের বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত আর আমি জিজ্ঞাসা করিতাম অকল্যাণ ও অশুভ বিষয় সম্পর্কে যাহাতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

একবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে আমরা

আপনার বরকতে যে কল্যাণ ও মঙ্গলের উপর রহিয়াছি, ইহার পরও কি কোন মন্দ অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, ইহার পর মন্দ অবস্থা আসিবে। আমি আরজ করিলাম, উক্ত মন্দের পর কি পুনরায় ভাল অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হুযাইফা! তুমি আল্লাহর কালাম পড়, উহার মর্ম ও অর্থের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা কর এবং উহার হুকুম–আহকাম মানিয়া চল। (আমার মাথায় যেহেতু ঐ চিন্তাই চাপিয়াছিল কাজেই) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উক্ত মন্দের পর কি ভাল অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, পুনরায় ভাল অবস্থা আসিবে। কিন্তু অন্তর ঐ রকম থাকিবে না যেমন পূর্বে ছিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ভাল অবস্থার পর আবারও কি মন্দ আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, এমন লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিবে এবং জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই যুগে যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে আমি কি করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি মুসলমানদের কোন ঐক্যবদ্ধ জামাত থাকে এবং তাহাদের কোন বাদশাহ থাকে তবে তাহার সহিত শরীক হইয়া যাইও। নচেৎ সমস্ত দল বর্জন করিয়া একা এক কোণে বসিয়া যাইও অথবা কোন বৃক্ষের গোড়ায় বসিয়া যাইও এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকিও।

যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুনাফেকদের সম্বন্ধে সবকিছু বলিয়া দিয়াছিলেন, তাই হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, আমার গভর্নরদের মধ্যে কোন মুনাফেক নাই তো? একবার হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলিলেন, একজন মুনাফেক আছে তবে আমি তাহার নাম বলিব না। হযরত ওমর (রাযিঃ) ঐ মুনাফেককে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিনিয়া থাকিবেন। কাহারও মৃত্যু হইলে হযরত ওমর (রাযিঃ) খোঁজ লইতেন যে, হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) জানাযাতে শরীক আছেন কিনা। যদি শরীক হইতেন তবে হযরত ওমর (রাযিঃ)ও তাহার জানাযার নামায পড়িতেন নচেৎ তিনিও পড়িতেন না।

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় অত্যন্ত ভীত ও অস্থির হইয়া কাঁদিতেছিলেন। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমি দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতেছি এই জন্য কাঁদিতেছি না বরং মৃত্যু আমার

প্রিয় জিনিস। তবে আমি কাঁদিতেছি এইজন্য যে, জানি না আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাইয়া দুনিয়া হইতে যাইতেছি, নাকি তাঁহার সন্তুষ্টি লইয়া। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা আমার দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত। হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব তোমার সহিত আমার সাক্ষাতের মধ্যে বরকত দান কর। (আবূ দাউদ, উসদুল গাবাহ)

(৬) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) একজন বিখ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। তাহার নিকট হইতে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্য কোন সাহাবী হইতে এত অধিক বর্ণিত হয় নাই। লোকেরা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেন যে, তিনি সপ্তম হিজরীতে মুসলমান হইয়া আসেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করিয়াছেন একাদশ হিজরীতে। প্রায় চার বছরের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক হাদীস কিভাবে মুখস্থ হইয়াছে? ইহার কারণ স্বয়ং আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, লোকেরা বলিয়া থাকে আবু হুরাইরা অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে। আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহাদের হাটে–বাজারে যাওয়া–আসা করিতে হইত। আর আমার আনসারী ভাইরা ক্ষেত–খামারে কাজ করিতেন। তাহারা উহা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আর আবু হুরায়রা ছিল সুফ্ফাবাসী মিসকীনদের মধ্য হইতে একজন মিসকীন। যে সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাহা কিছু খাবার ভাগ্যে জুটিত উহার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া পড়িয়া থাকিত। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিত যখন তাহারা উপস্থিত থাকিত না এবং এমন বিষয় মুখস্থ করিয়া লইত যাহা তাহারা করিতে পারিত না।

একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে স্মরণশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছাইলাম। তিনি দুই হাতে উহার মধ্যে কি যেন ইশারা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, চাদরটি মিলাইয়া লও। আমি চাদরটি বুকের সহিত মিলাইয়া লইলাম। ইহার পর হইতে আমি আর কোন জিনিস ভুলি নাই। (বুখারী)

ফায়দা ঃ আসহাবে সুফফা ঐ সমস্ত লোককে বলা হয়, যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানকার অধিবাসীদের মত ছিলেন। তাহাদের জীবিকার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। তাহারা যেন হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান ছিলেন। কোথাও হইতে কোন হাদিয়া বা সদকা আসিলে উহা দ্বারাই অধিকাংশ সময় তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)ও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কখনও কখনও কয়েক বেলা অনাহারেও কাটিয়া যাইত। কখনও ক্ষুধার কারণে পাগলের মত অবস্থা হইয়া যাইত। (যাহা ৩য় অধ্যায়ের ৩নং ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিক মাত্রায় হাদীস মুখস্থ করা তাঁহার কাজ ছিল। যাহার বদৌলতে আজ সর্বাধিক হাদীস তাঁহার নিকট হইতেই বর্ণিত বলিয়া বলা হয়। ইবনে জাওযী (রহঃ) তালকীহ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ হাজার তিনশত চুহাত্তরটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

একবার হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) জানাযা সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়িয়া আসিয়া যায় তাহার এক কীরাত সাওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্যেও শরীক হয় তাহার দুই কীরাত সাওয়াব লাভ হয়। আর এক কীরাত উহুদ পাহাড় হইতেও বেশী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) এই হাদীস সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, আবু হুরাইরা! আপনি একটু চিন্তা করিয়া বলুন। এইকথা শুনিয়া তিনি রাগান্বিত হইয়া গেলেন এবং সোজা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া আরজ করিলেন, আমি আপনাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই কীরাত সম্পর্কিত হাদীস কি আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, হাঁ, শুনিয়াছি। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলিতে লাগিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাকে না বাগানে কোন গাছ লাগাইতে হইত, না বাজারে মাল বিক্রয় করিতে হইত। আমি তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম আর শুধু এই কাজ ছিল যে, কোন হাদীস মুখস্থ করার জন্য মিলিয়া যায় আর কোন কিছু খাওয়ার জন্য মিলিয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের তুলনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অধিক সময় উপস্থিত থাকিতেন আর আমাদের চাইতে অধিক হাদীস আপনার জানা আছে। (আহমদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) এই কথাও বলেন যে, 'আমি দৈনিক বার হাজার বার ইস্তেগফার করি।' তাঁহার কাছে একটি সূতা ছিল। উহাতে

এক হাজার গিঁট লাগানো ছিল। রাত্রে সুবহানাল্লাহর তাসবীহ দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ করার পূর্ব পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। (তাযকিরাহ্)

(৭) মুসাইলামা কায্যাবের হত্যা ও কুরআন সংকলন

মুসাইলামা কায্যাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেহেতু ঐ সময় আরব দেশে মুরতাদ হওয়া অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করা জোরে–শোরে শুরু হইয়া গিয়াছিল তাই এই ফেতনা আরও জোরদার হইয়া উঠিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তি দান করিলেন এবং মুসাইলামা কায্যাব নিহত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে সাহাবাদেরও একটি বড় জামাত শহীদ হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া কুরআনে পাকের হাফেজগণের এক বড় জামাতও শহীদ হইয়া যান। হযরত ওমর (রাযিঃ) আমীরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া আরজ করিলেন, এই যুদ্ধে বহু কারী শহীদ হইয়া গিয়াছেন। যদি এইভাবে দুই একটি যুদ্ধে আরো শহীদ হইয়া যায় তবে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার ভয় রহিয়াছে। তাই উহা এক জায়গায় লিখিয়া সংরক্ষণ করা দরকার। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি এমন কাজের সাহস কিরূপে করিতেছ, যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? হযরত ওমর (রাযিঃ) বার বার বলিতে থাকেন এবং প্রয়োজন তুলিয়া ধরিতে থাকেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)ও একমত হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)কে ডাকাইলেন। যাহার ঘটনা একাদশ অধ্যায়ের আঠার নম্বর বর্ণনায় আসিতেছে। যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম, তখন সেখানে হযরত ওমর (রাযিঃ)ও ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রথমে আমাকে তাঁহার এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছে উহা শুনাইলেন। তারপর বলিলেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণাও নাই। ইহাছাড়াও তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও ওহী লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলে। তাই এই কাজ তুমি কর। লোকদের নিকট হইতে কুরআন সংগ্রহ করিয়া উহা এক জায়গায় একত্র করো।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমাকে এই হুকুম দিতেন যে, অমুক পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া এই দিক হইতে ঐদিকে স্থানান্তরিত করিয়া দাও তবে এইরূপ হুকুমও আমার জন্য কুরআনে পাক জমা করা অপেক্ষা সহজ ছিল। আমি আরজ করিলাম, আপনারা এইরূপ কাজ কিভাবে করিতেছেন যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? তাঁহারা আমাকে বুঝাইতে থাকিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে বলিলেন, যদি তুমি উমরের সহিত একমত হও তবে আমি তোমাকে এই কাজের আদেশ করিব নচেৎ আমিও এই কাজের ইচ্ছা করিব না। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) বলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরেও কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ঢালিয়া দিলেন। অতএব আমি আদেশ পালনার্থে লোকদের নিকট যে সমস্ত অংশ বিক্ষিপ্তভাবে লিখা ছিল এবং যেসব অংশ সাহাবা কেরামদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল অর্থাৎ মুখস্ত ছিল সবগুলি তালাশ করিয়া জমা করি।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনায় প্রথমতঃ তাহাদের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব অনুমান করা যায় যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেন নাই এমন কাজ করা হইতে তাহাদের নিকট পাহাড় সরাইয়া ফেলা সহজ ছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা জানা যায় যে, পবিত্র কালাম সংকলন করা যাহা দ্বীনের মূল ভিত্তি আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আমলনামায় রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় জিনিস এই যে, হযরত যায়েদ (রাযিঃ) এই ব্যাপারে এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, কোন অলিখিত আয়াত গ্রহণ করিতেন না বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেসব আয়াত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল শুধু সেগুলিই গ্রহণ করিতেন এবং হাফেজদের সীনায় মুখস্থ কুরআনের সহিত মিলাইয়া দেখিতেন। যেহেতু সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ ছিল এই কারণে সংগ্রহ করিতে যদিও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ; তবুও সব অংশই পাওয়া গিয়াছে। উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) যাহাকে স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে পাকের সবচেয়ে বেশী পারদর্শী বলিয়া ছিলেন তিনি তাহার সহযোগিতা করিতেন। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁহারা সর্বপ্রথম কুরআন পাক জমা করেন।

(৮) হাদীস বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর সতর্কতা অবলম্বন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বিখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনি ফতোয়াদানকারী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতও করিয়াছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। খাছ খাদেম হওয়ার কারণে সাহেবুন্না'ল (জুতা বহনকারী) সাহেবুল–বিসাদা (বালিশ বহনকারী) সাহেবুল–মিতহারা (অযুর পানি বহনকারী) এই সকল উপাধিও তাহার ছিল। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইসব কাজগুলি অধিকাংশ সময় তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমি যদি পরামর্শ ব্যতীত কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করি তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে নিযুক্ত করিব। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমার জন্য সর্বদা আমার মজলিসে হাজির হওয়ার অনুমতি রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কেহ যদি কুরআনে পাক যেভাবে নাযিল হইয়াছে ঠিক সেইভাবে পড়িতে চায় তবে সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিয়ম অনুযায়ী পড়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ইবনে মাসউদ যে হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করে উহা সত্য বলিয়া মনে করিবে।

আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন ইয়ামন হইতে আসিলাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের মধ্য হইতে মনে করিতে থাকি। কেননা তিনি এবং তাহার মাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ঘরের লোকদের ন্যায় অধিক পরিমাণে যাওয়া আসা করিতেন। (বুখারী) কিন্তু এতদসত্ত্বেও আবু আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট রহিয়াছি, কখনও তাঁহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা বলিতে শুনি নাই। তবে কখনও যদি কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিতেন তবে তাঁহার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হইয়া যাইত।

আমর ইবনে মাইমুন (রাযিঃ) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট আসিতে থাকি, কিন্তু

কখনও তাঁহাকে কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া বলিতে শুনি নাই। একবার হাদীস বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়া ফেলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা বলিয়াছেন, তখনই শরীর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, কপাল ঘর্মাক্ত হইয়া গেল এবং রগ ফুলিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, ইনশাআল্লাহ এমনই বলিয়াছেন অথবা ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার চাইতে কিছু বেশী বা কম বলিয়াছেন। (মুকাদ্দামা আওজায, আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতা। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে করিয়া লয়। এই ভয়েই তাঁহারা যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও জীবনী হইতেই মাসআলা বলিতেন তবু ইহা বলিতেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ বলিয়াছেন। কারণ খোদা না করুন মিথ্যা না হইয়া যায়। অপরদিকে আমাদের অবস্থা হইল, কোন প্রকার যাচাই–বাছাই না করিয়া নির্দ্বিধায় হাদীস বলিয়া দেই একটুও ভয় করি না। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা বলা বড় কঠিন যিম্মাদারী। উল্লেখ্য যে, হানাফী ফিকার অধিকাংশ বিষয়ই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে গৃহীত।

(৯) হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্য গমন

কাছীর ইবনে কাইস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আমি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে কেবল একটি হাদীসের জন্য আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি যে, উহা আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। আবু দারদা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছিল না তো? সে বলিল, না। আবু দারদা (রাযিঃ) আবারো জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না তো? সে বলিল, না, কেবল হাদীসটি জানার জন্যই আসিয়াছি। আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করিয়া

দেন আর ফেরেশতারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য আপন ডানা বিছাইয়া দেয়। তালেবে ইলমের জন্য আসমান এবং যমীনের অধিবাসীরা ইস্তেগফার করে। এমনকি পানির মাছও তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করে। আর আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন যেমন চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকার উপর। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস, নবীগণ দীনার-দেরহামের ওয়ারিস বানান না বরং তাহারা ইলমের ওয়ারেস বানান। যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করে সে এক বিরাট সম্পদ হাসিল করে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) ফকীহ সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন। তাহাকে হাকীমুল উম্মত বলা হয়। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত কালে ব্যবসা করিতাম। মুসলমান হওয়ার পর এবাদত এবং ব্যবসা উভয়টি একসঙ্গে করিতে চাহিলাম। কিন্তু দুইটি সক সঙ্গে সম্ভবপর হইল না। কাজেই আমাকে ব্যবসা ত্যাগ করিতে হইল। এখন আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, একেবারেই মসজিদের দরজার সামনেই একটি দোকান হইবে যদ্দরুন এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটিবে না আর প্রতিদিন চল্লিশ দীনার করিয়া লাভ হইবে এবং আমি উহা আল্লাহর পথে সদকা করিয়া দিব। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এমন ব্যবসার প্রতি কেন অসন্তুষ্ট হইলেন যাহাতে নামাযও ছুটিবে না তদুপরি এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রতিদিন আল্লাহর পথে খরচ হইবে? তিনি বলিলেন, হিসাব তো দিতে হইবেই।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) আরো বলেন, আমি মৃত্যুকে ভালবাসি আপন মাওলার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে, দরিদ্রতাকে ভালোবাসি বিনয় ও নম্রতার উদ্দেশ্যে আর রোগকে ভালোবাসি গোনাহ ধৌত হওয়ার কারণে। (তাযকেরাহ্)

উপরোক্ত ঘটনায় একটি মাত্র হাদীসের খাতিরে কত দীর্ঘ সফর করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে হাদীস অর্জনের জন্য সফর করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল না। একটি হাদীস শুনা ও জানার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্তের সফর তাহাদের কাছে অতি সহজ ব্যাপার ছিল।

শা'বী (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও কুফার অধিবাসী ছিলেন। একবার নিজের কোন শাগরেদকে একটি হাদীস শুনাইলেন এবং বলিলেন নাও ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে মিলিয়া গেল। নতুবা ইহার চাইতে সামান্য বিষয়ের জন্যও মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত সফর করিতে হইত। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় মদীনা তাইয়্যেবাই ছিল হাদীসের ভাণ্ডার।

যাহারা এলেমের অনুরাগী ছিলেন তাহারা এলেম অর্জনের উদ্দেশ্যে বড় বড় সফর করিয়াছেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, আমি একটি হাদীসের খাতিরে রাতের পর রাত দিনের পর দিন পায়দল সফর করিয়াছি।

ইমামকুল শিরমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর ২০৫ হিজরীতে অর্থাৎ মাত্র ১১ বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন করিতে শুরু করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ)এর সকল গ্রন্থ বাল্যকালেই মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। আপন শহরে যত হাদীস পাওয়া যাইতে পারে সেইগুলি সংগ্রহ করার পর ২১৬ হিজরীতে সফর শুরু করেন। পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল তাই এতিম ছিলেন। সফরে মাতা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উহার পর বলখ, বাগদাদ, মক্কা মোকাররমা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামেশক প্রভৃতি শহর সফর করেন এবং সকল স্থানে হাদীসের যে পরিমাণ সম্ভার মিলিয়াছে উহা হাসিল করিলেন। এত অল্প বয়সে হাদীসের উস্তায হইয়া যান যে, তখনও তাঁহার মুখে একটি দাড়িও গজায় নাই। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন আঠার বছর তখন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ফয়সালা নামক গ্রন্থ রচনা করি।

হাশেদ (রহঃ) এবং তাহার এক সঙ্গী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) আমাদের সহিত উস্তাযের নিকট যাইতেন। আমরা লিখিতাম আর তিনি এমনি আসিয়া যাইতেন। কিছুদিন পর আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আপনি অযথা সময়ের অপচয় করিতেছেন। তিনি চুপ রহিলেন। কয়েকবার বলার পর তিনি বলিলেন, আপনারা আমাকে বিরক্ত করিতেছেন। দেখি আপনারা কি লিখিয়াছেন। আমরা হাদীসের সমষ্টি বাহির করিয়া দেখাইলাম যাহার সংখ্যা পনের হাজারের চাইতেও অধিক ছিল। তিনি এইসব হাদীস মুখস্থ শুনাইয়া দিলেন। আমরা তখন বিস্মিত হইয়া গেলাম।

(১০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর আনসারীর নিকট গমন করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি এক আনসারীকে বলিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে

কিন্তু এখনও সাহাবীদের বড় জামাত বর্তমান রহিয়াছে। চলুন আমরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মাসআলাসমূহ মুখস্থ করিয়া লই। উক্ত আনসারী বলিলেন, সাহাবাদের জামাত বর্তমান থাকিতে লোকেরা কি তোমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে? যাহা হউক তিনি হিম্মত করিলেন না। আমি মাসআলা সংগ্রহের পিছনে লাগিয়া গেলাম। যাহার সম্বন্ধেই শুনিতে পাইতাম যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে অমুক হাদীস শুনিয়াছেন, তাহার নিকট যাইয়া উহা অনুসন্ধান করিতাম। এইভাবে মাসআলার বিরাট এক ভাণ্ডার আনসারীদের নিকট হইতে পাইলাম। কাহারও কাছে যাইয়া দেখিতাম তিনি ঘুমাইয়া আছেন। তখন চাদর বিছাইয়া তাহার দরজার সামনে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতাম। বাতাসের কারণে মুখে শরীরে ধুলিবালি উড়িয়া আসিয়া পড়িত কিন্তু আমি সেখানে বসিয়া থাকিতাম। যখন তিনি জাগ্রত হইতেন তখন যাহা জিজ্ঞাসা করার তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। তাহারা বলিতেন, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হইয়া কেন এত কষ্ট করিলে? আমাকে ডাকিলেই পারিতে। কিন্তু আমি বলিতাম, আমি এলেম শিক্ষার্থী, অতএব উপস্থিত হওয়ার বেশী উপযুক্ত ছিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কতক্ষণ যাবৎ বসিয়া আছ? আমি বলিতাম দীর্ঘক্ষণ যাবৎ। তিনি বলিতেন, ইহা ভাল কর নাই। আমাদেরকে জানাইলে না কেন? আমি বলিতাম, আমার কাছে ইহা ভাল মনে হয় নাই যে, আমার কারণে আপনি নিজ প্রয়োজন হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই আসিয়া যাইবেন। অবশেষে একদিন এমন এক সময় আসিল যে, লোকেরা আমার নিকট এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্যে জমা হইতে লাগিল। তখন ঐ আনসারী ব্যক্তিরও আফসোস হইল, বলিলেন, এই ছেলেটি আমাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান ছিল। (দারিমী)

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল ঐ বস্তু যাহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে তাঁহার যুগে হিবরুল উম্মাহ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আলেম) ও বাহরুল এলেম (অর্থাৎ এলমের সাগর) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। ইন্তিকালের সময় তিনি তায়েফে ছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ)এর পুত্র মুহাম্মদ (রহঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং বলিলেন, আজ এই উম্মতের ইমামে রাব্বানী বিদায় হইয়া গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আয়াতের শানে নুযূল জানার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে আলেমগণের শ্রেষ্ঠ কাতারে স্থান দিতেন। এইসব

তাঁহার সেই কঠোর শ্রম ও সাধনারই ফল ছিল। নতুবা যদি তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হওয়ার গর্ব লইয়া বসিয়া থাকিতন তবে এই মর্যাদা কিরূপে লাভ হইত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল করিবে তাহার সহিত বিনয় দেখাইবে। বুখারী শরীফে মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এলেম শিখিতে লজ্জাবোধ করে অথবা অহংকার করে সে এলেম হাসিল করিতে পারিবে না।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে একটি অক্ষরও পড়াইয়াছে আমি তাহার গোলাম। সে আমাকে বিক্রিও করিতে পারে আযাদও করিতে পারে। ইয়াহয়া ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এলেম আরাম আয়েশের মাধ্যমে লাভ হয় না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উদাসীনতার সহিত এলেম শিক্ষা করে সে কামিয়াব হইতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি বিনয় ও দরিদ্রতার সহিত এলেম হাসিল করিতে চাহে সে কামিয়াব ও সফলকাম হইতে পারে। মুগীরা (রহঃ) বলেন, আমরা আমাদের উস্তায ইবরাহীম (রহঃ)কে এমন ভয় করিতাম যেমন কোন বাদশাহকে ভয় করা হয়। ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন বহুত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের যেরূপ সম্মান করিতেন তাহা আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, আমি বুযর্গদের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি উস্তাদের কদর করে না সে কৃতকার্য হয় না।

উপরোক্ত ঘটনায় একদিকে যেমন উস্তাযগণের সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর বিনয় ও নম্রতাসুলভ আচরণের কথা বুঝা যায় অপরদিকে এলেমের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ও অনুরাগের কথাও বুঝা যায়। যাহার কাছেই কোন হাদীস আছে বলিয়া জানিতে পারিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে চলিয়া যাইতেন এবং উহা হাসিল করিতেন। চাই উহাতে যত কষ্ট পরিশ্রমই হউক না কেন। আর ইহাও সত্য যে, বিনা পরিশ্রম ও বিনা কষ্টে এলেম তো দূরের কথা সাধারণ বস্তুও হাছিল হয় না। প্রবাদ আছে—

مَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهِرَ اللَّيَالِى

"যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা কামনা করিবে সে রাত্রি জাগরণ করিবে।"

হারেছ ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে শুবরুমা, কা'কা এবং মুগীরা (রাযিঃ) তাঁহারা চারজন ইশার পর এলেমের বিষয় আলোচনা শুরু করিতেন।

ফজরের আযান পর্যন্ত একজনও পৃথক হইতেন না। লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী (রহঃ) ইশার পর অযুর সহিত হাদীসের আলোচনা শুরু করিতেন আর এই অবস্থায় সকাল করিয়া দিতেন। (দারিমী)

দারাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ)কে দেখিয়াছি, মসজিদে নববীতে ইশার নামাযের পর হইতে এক মাসআলা লইয়া বিতর্ক শুরু করিতেন, না তাহাদের মধ্যে কোনরূপ তিরস্কার বা ভর্ৎসনা হইত, আর না ভুল ধরাধরি হইত। এই অবস্থায় সকাল হইয়া যাইত এবং সেখানেই তাঁহারা ফজরের নামায আদায় করিতেন। (মুকাদ্দামা)

ইবনে ফুরাত বাগদাদী একজন মুহাদ্দিস ইন্তিকালের সময় আঠার সিন্দুক কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার নিজ হাতে লেখা ছিল। আর তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, মুহাদ্দিসগণের নিকট বর্ণনার বিশুদ্ধতা হিসাবে তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

ইবনে জাওযী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনবছর বয়সে তাঁহার পিতা মারা যান। এতীম অবস্থায় লালিত পালিত হন। তিনি এত মেহনত করিতেন যে, জুমআর নামায ব্যতীত বাড়ী হইতে দূরে যাইতেন না। একবার মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি এই অঙ্গুলির সাহায্যে দু'ই হাজার কিতাব খণ্ড লিখিয়াছি। তাঁহার স্বরচিত কিতাব ছিল আড়াই শতের উপর। কথিত আছে যে, তাঁহার সামান্য সময়ও নষ্ট হইত না। দৈনিক চার অংশ করিয়া লেখার নিয়ম ছিল। তাঁহার মজলিসে কখনও এক লক্ষেরও অধিক শাগরেদ অংশগ্রহণ করিত। রাজা-বাদশাহ এবং মন্ত্রীরাও তাঁহার দরসে বসিতেন। স্বয়ং ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, এক লক্ষ লোক আমার হাতে বয়াত হইয়াছে এবং বিশ হাজার লোক আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এতদসত্ত্বেও সেই যুগে শিয়াদের প্রভাব থাকার দরুন তাঁহাকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। (তাযকেরাহ) হাদীস লেখার সময় কলম কুচি জমা করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার গোসলের পানি যেন উহা দ্বারা গরম করা হয়। বর্ণিত আছে, এইগুলি দ্বারা গোসলের পানি গরম করার পরও কিছু অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) হাদীসের বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখিয়াছি।

ইবনে জারীর তবরী (রহঃ) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি সাহাবা এবং তাবেঈগণের জীবনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করিয়া অভ্যাস ছিল। তাঁহার এন্তেকালের পর শাগরেদগণ প্রতিদিনের লিখার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গড়ে দৈনিক তাঁহার লেখা চৌদ্দ পৃষ্ঠা করিয়া হয়। তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পাওয়া যায়। যখন উহা রচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস পাইলে তো তোমরা আনন্দিত হইবে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আনুমানিক কত বড় হইবে? তিনি বলিলেন, প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা। লোকেরা বলিল, ইহা সমাপ্ত করিবার আগে জিন্দেগী শেষ হইয়া যাইবে। তিনি বলিতে লাগিলেন; ইন্না লিল্লাহ! লোকদের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে অতঃপর সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলেন। এমনিভাবে তাঁহার তাফসীর লিখার সময়ও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার তাফসীর গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বত্র পাওয়া যায়।

দারা কুতনী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতনামা লেখক। হাদীস সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি বাগদাদ, বসরা, কুফা, ওয়াসেত, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করিয়াছেন। একবার তিনি উস্তাদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। উস্তাদ হাদীস পড়িতেছিলেন। আর তিনি কোন কিতাব নকল করিতেছিলেন। জনৈক সহপাঠী আপত্তি করিল যে, তুমিও অন্যমনস্ক হইয়া আছ। তিনি বলিলেন, আমার আর তোমাদের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। বলত উস্তাদ এই পর্যন্ত কয়টি হাদীস শুনাইয়াছেন? সে চিন্তা করিতে লাগিল। দারা কুতনী (রহঃ) বলিলেন, শায়খ আঠারটি হাদীস শুনাইয়াছেন। প্রথমটি এই ছিল, দ্বিতীয়টি এই ছিল, এইরূপে ধারাবাহিকভাবে সব কয়টি হাদীস সনদ সহ শুনাইয়া দিলেন।

হাফেজ আছরাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস মুখস্থ করিবার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। একবার তিনি হজ্জ পালন করিতে গেলেন। সেখানে খোরাসানের দুইজন প্রসিদ্ধ হাদীসের উস্তাযও আসিয়াছিলেন এবং হরম শরীফে উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হাদীসের দরস দিতেছিলেন। প্রত্যেকের নিকট ছাত্রদের বিরাট ভীড় ছিল। হাফেজ আছরাম উভয়ের মাঝখানে বসিয়া গেলেন এবং উভয়ের হাদীসসমূহ একই সময়ে লিখিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস

শিক্ষার ব্যাপারে তাহার মেহনত ও কষ্ট কাহারও অজানা নাই। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি চার হাজার উস্তাযের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছি। আলী ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন, একরাত্রে প্রচণ্ড শীত ছিল। আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মসজিদ হইতে ইশার পর বাহির হইলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া একটি হাদীস লইয়া পরস্পর আলোচনা শুরু হইয়া গেল। উক্ত হাদীস সম্পর্কে তিনিও কিছু মন্তব্য করিতেছিলেন আর আমিও কিছু মন্তব্য করিতেছিলাম। এইভাবে দাঁড়ানো অবস্থাতেই ফজরের আযান হইয়া গেল।

হুমাইদী (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ একত্র করিয়াছেন, সারা রাত্র জাগিয়া লিখিতেন। গ্রীষ্মকালে যখন গরমে বেশী কষ্ট পাইতেন, তখন একটি টবে পানি রাখিয়া উহাতে বসিয়া লিখিতেন। তিনি লোকসংশ্রব হইতে পৃথক থাকিতেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাহার কবিতা—

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئًا ... سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيْلٍ وَّقَالٍ

فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا ... لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ اِصْلَاحِ حَالٍ

অর্থাৎ, লোকজনের সহিত মোলাকাতের দ্বারা শুধু অনর্থক কথাবার্তা ও গল্পগুজব ছাড়া কোন ফায়দা হয় না। অতএব তুমি লোকদের সহিত সাক্ষাৎ কমাইয়া দাও। তবে এলেম হাসিলের জন্য উস্তাদের সহিত এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পার।

ইমাম তাবারানী (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বহু কিতাব রচনা করিয়াছেন। কেহ তাঁহার লিখিত এত বেশী পরিমাণ কিতাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিভাবে লিখিলেন? উত্তরে বলিলেন, আমি ত্রিশ বছর চাটাইয়ের উপর কাটাইয়াছি। অর্থাৎ তিনি দিবারাত্র চাটাইয়ের উপর পড়িয়া থাকিতেন। আবুল আব্বাস সিরাজী (রহঃ) বলেন, আমি তাবারানী (রহঃ) হইতে তিন লক্ষ হাদীস লিখিয়াছি।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নাসেখ (রহিতকারী) হাদীস অত্যন্ত কঠোরভাবে যাচাই করিতেন। কুফা নগরীকে তদানীন্তন কালে এলেমের ঘর বলা হইত। তিনি সেখানকার সমস্ত মুহাদ্দিসীনের হাদীসসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন আর যখন বহিরাগত কোন মুহাদ্দিস আসিতেন তখন তিনি ছাত্রদিগকে হুকুম করিতেন খোঁজ লইয়া দেখ যে, তাহার নিকট এমন কোন হাদীস আছে কিনা যাহা আমাদের নিকট নাই। ইমাম সাহেবের সেখানে একটি এলমী মজলিস ছিল। উহাতে মুহাদ্দিস, ফকীহ ও

ভাষাবিদগণের সমাগম ছিল। যে কোন মাসআলা উপস্থিত হইত তখন ঐ মজলিসে উহার উপর আলোচনা হইত। কোন কোন সময় একমাস পর্যন্তও আলোচনা চলিতে থাকিত। অবশেষে যাহা সিদ্ধান্ত হইত উহা মাযহাব হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হইত।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)এর নাম কে না জানে। হাদীস মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা তাঁহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি দৃষ্টান্তমূলক ছিল। জনৈক মুহাদ্দিস তাঁহার পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন চল্লিশটি হাদীস শুনাইলেন যাহা সকলের জানা ছিল না। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহা হুবহু শুনাইয়া দিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি মক্কা মোকাররমার পথে এক শায়খের লিখিত হাদীসসমূহের দুইটি খণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে স্বয়ং উক্ত শায়খের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমি দরখাস্ত করিলাম যে, ঐ উভয় খণ্ডের হাদীসগুলি সরাসরি উস্তাদের নিকট হইতে শুনিয়া লইব। তিনি রাজী হইলেন। আমার ধারণা ছিল যে, ঐ দুইটি খণ্ড আমার সঙ্গেই রহিয়াছে। কিন্তু যখন তাঁহার নিকট গেলাম তখন দেখিলাম ঐগুলির পরিবর্তে দুইটি সাদা খাতা হাতে রহিয়াছে। উস্তাদ হাদীস শুনাইতে শুরু করিলেন। হঠাৎ আমারহাতে সাদা খাতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমার লজ্জা হয় না? আমি বিষয়টি খুলিয়া বলিলাম এবং এই আরজ করিলাম যে, আপনি যাহা শুনান তাহার আমার মুখস্থ হইয়া যায়। উস্তাদের বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, শুনাও। আমি সমস্ত হাদীস শুনাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, এইগুলি হয়ত তোমার পূর্ব হইতে মুখস্থ ছিল। আমি আরজ করিলাম কোন নূতন হাদীস শুনাইয়া দিন। তিনি আরও চল্লিশটি হাদীস শুনাইয়া দিলেন। আমি ঐগুলিও সাথে সাথে শুনাইয়া দিলাম এবং একটিও ভুল করিলাম না। মুহাদ্দিসগণ হাদীস মুখস্থ করা ও উহার প্রচারের ব্যাপারে যেসব মেহনত ও কষ্ট করিয়াছেন উহার অনুসরণ তো দূরের কথা হিসাব করাও দুস্কর।

কারতামা (রহঃ) নামেও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তত প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার জনৈক শাগরেদ দাউদ (রহঃ) বলেন, লোকেরা আবু হাতেম প্রমুখের স্মৃতিশক্তির কথা বর্ণনা করে। আমি কারতামা (রহঃ) হইতে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী কাহাকেও দেখি নাই। একবার আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কিতাব হইতে যেটি তোমার মনে চায় উঠাইয়া লও আমি শুনাইয়া দিব। আমি কিতাবুল

আশরিবা উঠাইয়া লইলাম। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ দিক হইতে শুরুর দিকে পড়িয়া গেলেন এবং পুরা কিতাব শুনাইয়া দিলেন।

আবু যুরআ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) বলেন, আমি এক লক্ষ হাদীস সংকলন করিয়াছি। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার হাদীস আমার মুখস্থ আছে। খাফ্‌ফাফ (রহঃ) বলেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) আমাদিগকে এগার হাজার হাদীস মুখস্থ লিখাইয়াছেন। অতঃপর সেগুলি ধারাবাহিকভাবে শুনাইয়াছেন। কোন একটি অক্ষরও বেশ কম হয় নাই।

আবু সাদ ইস্পাহানী বাগদাদী (রহঃ) ষোল বছর বয়সে আবু নসর (রহঃ)এর নিকট হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়াই চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহার সনদ কোথায় পাইব! চরম দুঃখে চিৎকার করিয়া কান্না তখনই আসিতে পারে যখন কোন জিনিসের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মহব্বত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ তাঁহার মুখস্থ ছিল এবং শাগরেদদিগকে মুখস্থই লিখাইতেন। এগার বার হজ্জ করিয়াছেন। খানা খাইতে বসিলে চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত।

আবু ওমর যারীর (রহঃ) জন্মান্ধ ছিলেন। তথাপি হাদীসের হাফেজ ছিলেন। ফিকাহ, ইতিহাস, ফারায়েয এবং অংকে পারদর্শী ছিলেন।

আবুল হোসাইন ইস্পাহানী (রহঃ)এর বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয়টি মুখস্থ ছিল। বিশেষ করিয়া বুখারী শরীফের অবস্থা এই ছিল যে, যে কেহ সনদ পড়িলে মতন অর্থাৎ হাদীস পড়িয়া দিতেন। আর হাদীস পড়িলে সনদ পড়িয়া দিতেন।

শাইখ তকী উদ্দীন বালাবাক্কী (রহঃ) চার মাসে সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন। এমনিভাবে জমা বাইনাস-সাহীহাইনেরও হাফেজ ছিলেন। (জমা' বাইনাস সাহীহাইন হইল, আল্লামা হুমাইদী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত কিতাব, ইহাতে বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবের হাদীস সংকলন করা হইয়াছে।)

তাঁহার কারামত প্রকাশ পাইত। তিনি কুরআনে পাকেরও হাফেয ছিলেন। বলা হয়, তিনি সম্পূর্ণ সূরা আনআম একদিনে হিফজ করিয়াছিলেন।

ইবনুস সুন্নী (রহঃ) ইমাম নাসায়ী (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ শাগরেদ ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস লিখার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার ছেলে বলেন, আমার পিতা হাদীস লিখিতে লিখিতে এক পর্যায়ে দোয়াতে

কলম রাখিয়া দোয়ার জন্য হাত উঠাইলেন এবং এই অবস্থায়ই তাঁহার ইন্তিকাল হইয়া গেল।

আল্লামা সাজী (রহঃ) বাল্যকালেই এলমে ফিকাহ হাসিল করিয়াছিলেন। অতঃপর এলমে হাদীসে মনোনিবেশ করেন। হিরাতে দশবছর অবস্থান করেন এবং তথায় অবস্থানকালে ছয় বার তিরমিযী শরীফ নিজ হাতে লিখিয়াছেন।

ইবনে মান্দাহ (রহঃ)এর নিকট গারায়েবে শূরা নামক হাদীস গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। এই অবস্থায় এশার নামাযের পর ইবনে মান্দাহ (রহঃ)এর ইন্তিকাল হইয়া যায়। শাগরেদের চাইতেও উস্তাদের এলমী অনুরাগ লক্ষণীয়। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পড়াইতে থাকিলেন।

আবু আমর খাফফাক (রহঃ)এর এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ)এর উস্তায আসেম ইবনে আলী (রহঃ) যখন বাগদাদে পৌঁছেন, তখন শিক্ষার্থীদের এত ভিড় হইত যে, অধিকাংশ সময় ছাত্রসংখ্যা এক লাখেরও অধিক হইয়া যাইত। একবার আনুমানিক হিসাব করা হইলে এক লক্ষ বিশ হাজার হইল। এই জন্যই কোন কোন শব্দ একাধিকবার বলিতে হইত। তাঁহার এক শাগরেদ বলেন, একবার 'হাদ্দাছানাল্লাইছ' বাক্যটি চৌদ্দবার বলিতে হইয়াছে। স্বাভাবিক কথা, সোয়া লক্ষ মানুষের নিকট আওয়াজ পৌঁছাইতে হইলে কোন কোন শব্দ একাধিকবার বলিতেই হইবে।

আবু মুসলিম বসরী (রহঃ) যখন বাগদাদে পৌঁছেন তখন বিরাট এক মাঠে হাদীসের দরস শুরু হয়। সাত জন লোক দাঁড়াইয়া লিখাইত, যেমনভাবে ঈদের তাকবীরসমূহ বলা হইয়া থাকে। সবক শেষে দোয়াত গণনা করা হইলে তাহা চল্লিশ হাজারেরও অধিক ছিল। আর যাহারা কেবল শুনিয়াছে তাহারা উহাদের হইতে অতিরিক্ত। ফিরয়াবী (রহঃ)এর মজলিসে যাহারা লিখাইতেন তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' ষোল। ইহাতে ছাত্রসংখ্যার অনুমান আপনা আপনিই হইয়া যায়। এই মেহনত ও কষ্টের বদৌলতেই এই পবিত্র এলেম আজ পর্যন্ত জিন্দা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি ছয় লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া বুখারী শরীফ লিখিয়াছি। ইহাতে সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তরটি হাদীস আছে। প্রতিটি হাদীস লিখার সময় দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিয়া লিখিয়াছি। যখন বাগদাদ পৌঁছেন তখন সেখানকার মুহাদ্দিসগণ এইরূপে তাঁহার পরীক্ষা লইলেন যে, দশজন লোক নির্ধারিত হইলেন। প্রত্যেকেই দশটি করিয়া হাদীস বাছাই করিলেন এবং সেইগুলিকে উলট

পালট করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে 'আমার জানা নাই' বলিতে থাকিলেন। যখন দশজনের প্রত্যেকের প্রশ্ন করা শেষ হইল তখন তিনি সর্বপ্রথম প্রশ্নকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি সর্বপ্রথম এই হাদীস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুল, উহার বিশুদ্ধ বর্ণনা এইরূপ। এমনি ভাবে দ্বিতীয় হাদীস এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উহা আপনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুল, উহার বিশুদ্ধ বর্ণনা এইরূপ। মোটকথা এমনিভাবে একশতের একশত হাদীসই ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়া দিলেন। প্রত্যেকটি হাদীস প্রথমে ঐভাবে পড়িতেন যেভাবে পরীক্ষক পড়িয়াছিলেন। অতঃপর বলিতেন যে, ইহা ভুল এবং বিশুদ্ধ এইরূপে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) চৌদ্দ বৎসর বয়সে হাদীস পড়িতে শুরু করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত উহাতেই মশগুল থাকেন। নিজেই বলেন যে, আমি তিন লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া মুসলিম শরীফ রচনা করিয়াছি। ইহাতে বার হাজার হাদীস রহিয়াছে।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি পাঁচ লক্ষ হাদীস শুনিয়াছি, উহার মধ্য হইতে বাছাই করিয়া সুনানে আবু দাউদ শরীফ রচনা করিয়াছি, উহাতে চার হাজার আটশ হাদীস রহিয়াছে।

ইউসুফ মিয্‌যী (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আসমাউর রিজাল অর্থাৎ সনদ সম্পর্কিত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। প্রথমে নিজ শহরে ফিকাহ ও হাদীস শিক্ষা করেন। তারপর মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, হলব, হামাত, বালা বাক্কা প্রভৃতি শহর সফর করেন। বহু কিতাব তিনি হাতে লিখিয়াছেন। 'তাহযীবুল কামাল' দুইশ খণ্ডে এবং 'কিতাবুল আতরাফ' আশি খণ্ডেরও ঊর্ধ্বে রচনা করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। কাহারো সহিত কথাবার্তা খুবই কম বলিতেন। অধিকাংশ সময় কিতাব দেখার মধ্যে মশগুল থাকিতেন। হিংসুক লোকদের হিংসার শিকারও হইয়াছেন। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

এই সমস্ত মনীষীর জীবনী পুরাপুরি বর্ণনা করা কঠিন কাজ। বড় বড় কিতাবও তাঁহাদের জীবনী ও সাধনার কথা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এখানে কেবল নমুনাস্বরূপ দুই চারটি ঘটনা এইজন্য বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যাহাতে এই কথা বুঝা যায় যে, এলমে হাদীস যাহা আজ সাড়ে তেরশ' বৎসর যাবৎ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত টিকিয়া রহিয়াছে তাহা কোন মেহনত ও সাধনার বদৌলতেই টিকিয়া রহিয়াছে। আজ

যাহারা এলেম হাসিল করিবার দাবী করে এবং নিজেদেরকে তালেবে এলেম বলিয়া দাবী করে তাহারা উহার জন্য কতটুকু মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করে। আমাদের যদি এই কামনা হয় যে, আমাদের ভোগবিলাসিতা, আরাম-আয়েশ, বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ ঠিক থাকুক এবং আমরা দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকি আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কালামের প্রচার প্রসারও ঐভাবেই ঘটিতে থাকুক, তবে ইহা শুধু অবাস্তব কল্পনা ও পাগলামী ব্যতীত আর কি হইতে পারে।

নবম অধ্যায়

হুযূর (সাঃ)এর আনুগত্য ও হুকুম তামিল করা এবং হুযূর (সাঃ)এর মনোভাব কি তাহা লক্ষ্য করা

এমনিতেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের প্রতিটি কাজ আনুগত্য ছিল। পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহ দ্বারাও এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবু বিশেষ করিয়া কয়েকটি ঘটনা এই অধ্যায়ে এইজন্য বর্ণনা করা হইতেছে, যাহাতে আমরা এইসব ঘটনার সহিত নিজেদের অবস্থাকে বিশেষভাবে তুলনা করিয়া দেখিতে পারি যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহের আনুগত্য কতটুকু করি। যেহেতু আমরা সবসময় ইহারও আশা করি যে, যেই সকল বরকত, উন্নতি ও ফলাফল সাহাবায়ে কেরামগণ লাভ করিতেন আমরাও যেন উহা লাভ করিতে পারি। বাস্তবিকই যদি আমরা উহার আশা করিয়া থাকি তবে আমাদেরও উহাই করা উচিত যাহা তাঁহারা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ)এর চাদর জ্বালাইয়া ফেলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একবার সফরে ছিলাম। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। আমার গায়ে ছিল হালকা কুসুম রংয়ের একটি চাদর ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া বলিলেন, ইহা কি গায়ে দিয়া রাখিয়াছ? এই প্রশ্ন হইতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করিলাম। আমি পরিবারের লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, ঐ সময় তাহারা চুলা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। আমি চাদরটি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া দিলাম।

দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, চাদরটি কোথায়? আমি ঘটনা শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে কাহাকেও পরিধান করিতে দিলে না কেন? মহিলাদের পরিধান করিতে তো কোন অসুবিধা ছিল না। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ যদিও চাদর জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যাহার অন্তরে কাহারো অসন্তুষ্টির আঘাত লাগিয়া আছে তাঁহার এতটুকু চিন্তা করারও ধৈর্য থাকে না যে, ইহার জন্য অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও হইতে পারে কিনা। তবে আমার মত অযোগ্য হইলে নাজানি কত ধরনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিতাম। যেমন, ইহা কোন ধরনের অসন্তুষ্টি অথবা জিজ্ঞাসা করিয়া লই যে, অন্য কোনভাবে ব্যবহারের অনুমতি হইতে পারে কিনা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নিষেধ তো করেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) এক আনসারী সাহাবীর ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি উঁচু কুব্বা (অর্থাৎ গম্বুজবিশিষ্ট ঘর) দেখিতে পাইলেন। সাথীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তাহারা আরজ করিলেন, অমুক আনসারী কুব্বা বানাইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন। অন্য এক সময় ঐ আনসারী খিদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া নিলেন, সালামের উত্তরও দিলেন না। তিনি মনে করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত খেয়াল করেন নাই। দ্বিতীয় বার সালাম করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবারও মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং উত্তর দিলেন না। এই অবস্থা তাহার কিরূপে সহ্য হইতে পারে? সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্যে যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, খোঁজ নিলেন যে, কি হইয়াছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আপনার কুব্বা দেখিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহা কাহার? ইহা শুনিয়া আনসারী (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন এবং পুনরায় আসিয়া বলিলেনও না। ঘটনাক্রমে হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কোন এক সময় ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তখন দেখিলেন যে, সেই কুব্বাটি আর সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সাহাবা (রাযিঃ)গণ আরজ করিলেন যে, কয়েক দিন পূর্বে আনসারী ব্যক্তি আপনার অসন্তুষ্টির কথা আলোচনা করিয়াছিল আমরা বলিয়াছিলাম, তিনি আপনার কুব্বা দেখিয়াছেন। তিনি আসিয়া উহা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক নির্মিত ঘরই মানুষের জন্য বিপদ তবে ঐ নির্মিত ঘর যাহা নিতান্ত প্রয়োজনে অপারগতার কারণে নির্মাণ করা হয়। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা পরিপূর্ণ প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপার যে, তাহারা ইহা সহ্যই করিতে পারিতেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারাকে মলিন দেখিবেন অথবা নিজের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্ট ভাব পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত সাহাবী কুব্বাটি ভাঙ্গিয়া ফেলার পর ইহাও করিলেন না যে, আসিয়া সংবাদ দিবেন এবং বলিবেন যে, আপনাকে খুশী করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। বরং ঘটনাক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করিয়া অর্থ অপচয় অপছন্দ করিতেন। বহু হাদীসে ইহার বর্ণনা আসিয়াছে। স্বয়ং বিবিগণের ঘর খেজুর ডালের তৈরী বেড়ার ছিল। যাহার উপর পর্দার জন্য চট ঝুলিয়া থাকিত। যাহাতে বেগানা লোকের নজর ভিতরে না যাইতে পারে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও সফরে গেলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর সেই সময় কিছু অর্থ আসিল। তিনি তাহার ঘরে খেজুরের ডালের পরিবর্তে কাঁচা ইট লাগাইয়া লইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি করিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, উহাতে বেপর্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেসব কাজে মানুষের অর্থ ব্যয় হয় তন্মধ্যে নিকৃষ্টতম হইল পাকা ঘর তৈরী করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি ও আমার মাতা আমাদের ঘরের একটি দেওয়াল যাহা খারাপ হইয়া গিয়াছিল মেরামত করিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া বলিলেন, এই দেওয়াল পড়িয়া যাওয়া হইতেও মৃত্যু অধিক নিকটবর্তী। (আবূ দাউদ)

(৩) সাহাবায়ে কেরামের লাল চাদর খুলিয়া ফেলা

হযরত রাফে' (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। আমাদের উটগুলির উপর লাল রঙের ডোরাযুক্ত চাদর ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমাদের উপর লাল রং প্রভাব বিস্তার করিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা বলামাত্রই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম যে, আমাদের ছুটাছুটি দেখিয়া উটগুলিও এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমরা তৎক্ষণাৎ উটের উপর হইতে চাদরগুলি নামাইয়া ফেলিলাম। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এই ধরনের ঘটনা তেমন কোন গুরুত্ব রাখে না। হাঁ, আমাদের জীবন হিসাবে এইগুলির উপর আশ্চর্যবোধ হয়। তাঁহাদের স্বাভাবিক জীবন এইরূপই ছিল। হযরত ওরোয়া ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের পক্ষ হইতে দূতস্বরূপ আসিয়াছিলেন (যাহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের তিন নম্বর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে) তখন তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কায় ফিরিয়া যাইয়া কাফেরদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমি বড় বড় বাদশাহদের দরবারে দূত হিসাবে গিয়াছি, রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বাদশাহদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু কোন বাদশাহকে দরবারের লোকেরা এই পরিমাণ সম্মান করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা তাহার সম্মান করে। কখনও তাঁহার থুথু মাটিতে পড়িতে দেয় না। কাহারো না কাহারো হাতে পড়ে এবং সে উহা মুখে ও শরীরে মাখিয়া লয়। যখন তিনি কোন আদেশ করেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি উহা পালন করার জন্য দৌড়িয়া যায়। যখন তিনি অযু করেন তখন অযুর পানি শরীরে মাখিবার ও লইবার জন্য এমনভাবে দৌড়াইতে থাকে যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া বাঁধিয়া যাইবে। আর যখন তিনি কথা বলেন তখন সবাই চুপ হইয়া যায়। তাঁহার মহত্ব ও মর্যাদার কারণে কেহ তাঁহার দিকে চোখ উঠাইয়া তাকাইতে পারে না। (বুখারী)

(৪) যুবাব শব্দের কারণে হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ)এর চুল কাটিয়া ফেলা

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলাম। আমার

মাথার চুল বেশ লম্বা ছিল। আমি সামনে আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যুবাব, যুবাব। আমি মনে করিলাম যে, আমার চুল সম্পর্কে বলিয়াছেন। আমি ফিরিয়া গেলাম এবং উহা কাটাইয়া ফেলিলাম। পরদিন যখন খিদমতে হাজির হইলাম তখন বলিলেন, আমি তোমাকে বলি নাই, তবে ইহা ভাল করিয়াছ। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ 'যুবাব' শব্দের অর্থ অশুভও হয় এবং খারাপ বস্তুও হয়। ইহা তো ইশারার উপর প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ব্যাপার। মনোভাব বুঝিবার পর যদিও উহা ভুলই বুঝিয়াছিলেন উহার উপর আমল করিতে দেরী করিতেন না। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াই দিয়াছেন যে, আমি তোমাকে বলি নাই কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের সম্বন্ধে বুঝিয়াছেন সেইহেতু সাধ্য কি যে দেরী হইবে?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল পরে উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। তিনি পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সালাম করিলেন। যেহেতু নামাযে কথাবলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন নাই। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব না দেওয়াতে নতুন পুরাতন সমস্ত বিষয়ের চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কখনও ভাবিতেছিলাম, অমুক বিষয়ের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কখনও ভাবিতেছিলাম, অমুক বিষয়ের দরুন অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাইলেন এবং বলিলেন যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাই আমি সালামের জবাব দেই নাই। তখন আমার জানে পানি আসিল।

(৫) হযরত সুহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাযিঃ)এর অভ্যাস এবং খুরাইম (রাযিঃ)এর চুল কাটাইয়া দেওয়া

দামেশকে সুহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাযিঃ) নামে এক সাহাবী বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি থাকিকেন। কাহারো সহিত মেলামেশা খুব কম করিতেন এবং কোথাও যাওয়া-আসাও করিতেন না। সারাদিন নামাযে মশগুল থাকিতেন অথবা তাসবীহ ও অযীফা পাঠে মগ্ন থাকিতেন। মসজিদে যাতায়াতের পথে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেন। আবু দারদা (রাযিঃ) বলিতেন, কোন

ভালকথা শুনাইয়া যাও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, আমাদের উপকার হইয়া যাইবে। তখন তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার কোন ঘটনা বা কোন হাদীস শুনাইয়া দিতেন। একদিন আবু দারদা (রাযিঃ) অভ্যাস অনুযায়ী আরজ করিলেন, কোন ভালকথা শুনাইয়া যাও। তিনি বলিতে লাগিলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, খুরাইম আসাদী ভাল মানুষ যদি তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় না হইত। একটি হইল, তাহার মাথার চুল বেশী লম্বা থাকে, দ্বিতীয়টি হইল সে টাখনুর নীচে লুঙ্গি পরে। তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা পৌঁছা মাত্রই চাকু লইয়া কানের নীচের চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি পরিতে শুরু করিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন বর্ণনামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে এই দুইটি কথা বলিয়াছেন। আর তিনি কসম খাইয়া বলিয়াছেন যে, এখন হইতে এইরূপ হইবে না। তবুও উভয় বর্ণনায় মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নাই। কেননা হইতে পারে যে, স্বয়ং তাহাকেও বলিয়াছেন এবং অনুপস্থিতিতেও বলিয়াছেন এবং যাহারা শুনিয়াছেন তাহারা তাহার নিকট যাইয়া বলিয়াছেন।

(৬) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর আপন পুত্রের সহিত কথা না বলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) একবার বলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন যে, তোমরা মহিলাদিগকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও। ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর জনৈক পুত্র বলিলেন, আমরা তো অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তাহারা ভবিষ্যতে ইহাকে অবাধে চলাফেরা এবং ফেতনা ও খারাবীর বাহানা বানাইয়া লইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং কঠোর ভাষায় বকাবকি করিলেন ও বলিলেন যে, আমি তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি আর তুমি বলিতেছ যে, অনুমতি দিতে পারি না। ইহার পর হইতে সব সময়ের জন্য সেই ছেলের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ 'ফেতনার বাহানা বানাইয়া লইবে' ছেলের এই উক্তি তখনকার অবস্থা দৃষ্টে ছিল। তাই হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই যমানার মহিলাদের অবস্থা দেখিতেন তবে অবশ্যই মহিলাদের মসজিদে যাইতে নিষেধ করিয়া

দিতেন। অথচ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর যমানা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে তেমন বেশী পরের নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর ইহা সহ্য হইল না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়া উহাতে কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ করা হইবে। শুধু এই কারণে যে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অমান্য করিয়াছে। সারাজীবন কথা বলেন নাই। আর এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দেরকেও কষ্ট করিতে হইয়াছে কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বের কারণে, যাহা তাঁহাদের নিকট প্রাণতুল্য ছিল, মহিলাদেরকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করাও মুশকিল ছিল। অপরদিকে যমানার ফেতনা ফাসাদের ভয় যাহা তখন হইতে শুরু হইয়া গিয়াছিল। মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াও মুশকিল ছিল। যেমন হযরত আতেকা (রাযিঃ) যাহার একাধিক বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিতও বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মসজিদে যাইতেন। আর হযরত ওমর (রাযিঃ)এর জন্য ইহা কষ্টদায়ক হইত। কেহ তাহাকে বলিল যে, উমর (রাযিঃ)এর কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, যদি তাহার কষ্ট হয় তবে নিষেধ করিয়া দিক।

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর হযরত যুবাইর (রাযিঃ)এর সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার নিকটও ইহা কষ্টদায়ক ছিল কিন্তু নিষেধ করার হিম্মত হয় নাই। তখন একবার যে রাস্তা দিয়া আতেকা (রাযিঃ) এশার নামাযের জন্য যাইতেন সেই রাস্তায় বসিয়া গেলেন এবং যখন তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত যুবাইর (রাযিঃ) তাঁহাকে উত্যক্ত করিলেন। স্বামী হিসাবে তাঁহার জন্য ইহা জায়েয ছিল। কিন্তু তিনি অন্ধকারের দরুন বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ব্যক্তি কে? ইহার পর হইতে তিনি মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। অন্য সময় হযরত যুবাইর (রাযিঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে কেন? তিনি বলিলেন, এখন আর সেই যামানা নাই।

(৭) 'কসর নামায কুরআনে নাই' এই বলিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর নিকট প্রশ্ন করা

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআনে কারীমে মুকীমের নামায সম্পর্কেও উল্লেখ আছে এবং ভয়-ভীতির অবস্থায় নামাযেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু মুসাফিরের নামাযের উল্লেখ নাই। তিনি বলিলেন, ভাতিজা! আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা অজ্ঞ ছিলাম কিছুই জানিতাম না। সুতরাং আমরা তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহাই করিব।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরী নয় বরং আমলের জন্য হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমাকে কোরআন শরীফ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সমপরিমাণ আরো হুকুম–আহকাম দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই এমন এক সময় আসিবে যে, উদরপূর্ণ লোকেরা নিজের গদির উপর বসিয়া বলিবে যে, শুধু কুরআনকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। উহাতে যে সকল হুকুম–আহকাম আছে উহার উপর আমল কর। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ 'উদরপূর্ণ' কথাটির মর্ম হইল, এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সম্পদের নেশার কারণেই পয়দা হইয়া থাকে।

(৮) কংকর লইয়া খেলার কারণে হযরত ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ)এর কথা বন্ধ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ)এর অল্পবয়স্ক এক ভাতিজা কংকর লইয়া খেলিতেছিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন যে, ভাতিজা! এইরূপ করিও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উহা দ্বারা কোন উপকার হয় না ; ইহার দ্বারা না শিকার করা যায় আর না শত্রুর কোন ক্ষতি করা যায়। যদি কাহারও গায়ে লাগিয়া যায় তবে হয়ত চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে অথবা দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভাতিজা কমবয়সী ছিল তাই যখন চাচাকে অসতর্ক দেখিল আবার খেলায় লাগিয়া গেল। তিনি দেখিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি তুমি আবার ঐ কাজ করিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমার সহিত কখনও কথা বলিব না। অপর এক ঘটনায় উহার পর বলিয়াছেন যে, আল্লাহর কসম আমি তোমার জানাযায় শরীক হইব না এবং তোমার অসুস্থতায় দেখিতে যাইব না। (দারিমী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ কংকরি দ্বারা খেলার অর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ছোট কঙ্কর রাখিয়া উহা আঙ্গুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করা। বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই ধরনের খেলাধুলার প্রবণতা হইয়া থাকে। ইহা এমন নয় যে, কোন কিছু শিকার করা যাইতে পারে ; তবে ঘটনাক্রমে কাহারও চোখে লাগিয়া

গেলে জখম করিয়াই দিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইবার পরও সেই ছেলে পুনরায় এই কাজ করিবে। আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত এরশাদ শুনিয়া থাকি এবং উহার উপর কতটুকু গুরুত্ব দিয়া থাকি? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যাপারে ফয়সালা করিতে পারে।

⑨ হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ)এর সওয়াল না করার প্রতিজ্ঞা

হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কিছু চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দান করিলেন। তিনি আবার কোন এক সময় কিছু চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও দান করিলেন। তৃতীয় বার আবার চাহিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, হাকীম এই মাল সবুজ বাগান স্বরূপ। দেখিতে বড়ই মিষ্টি জিনিস, কিন্তু ইহার নিয়ম হইল যদি ইহা লোভশূন্য অন্তরের সহিত পাওয়া যায় তবে বরকত হয় আর যদি লোভ-লিপ্সার সহিত অর্জন হয় তবে ইহাতে বরকত হয় না। বরং গো-ক্ষুধার রোগীর মত এমন অবস্থা হয় যে, সর্বদা খাইতে থাকে কিন্তু পেট ভরে না। হাকীম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে আর কাহাকেও বিরক্ত করিব না। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফত আমলে হযরত হাকীম (রাযি)কে বাইতুল মাল হইতে কিছু মাল দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। তাহার পরে হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন খেলাফত আমলে তাহাকে মাল দেওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। (বুখারী)

ফায়দা ঃ এই কারণেই আজ আমাদের মালে বরকত হয় না। কেননা, লোভ-লালসা আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

⑩ হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে যাওয়া

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে একদিকে মক্কার কাফের ও অন্যান্য বহু গোত্রের কাফের যাহারা আমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিয়াছিল এবং হামলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে স্বয়ং

মদীনা মুনাওয়ারাতে বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের সহিত শত্রুতা করিতে এক পায়ে খাড়া ছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে সবসময় আশংকা ছিল যে, কখনও মদীনা মুনাওয়ারাকে খালি দেখিয়া তাহারা আমাদের পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া দেয়। আমরা যুদ্ধের জন্য মদীনার বাহিরে পড়িয়া ছিলাম। মুনাফেকের দল বাড়ীঘর শূন্য ও একলা হওয়ার বাহানা করিয়া অনুমতি লইয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কেহই অনুমতি চাহিতেছিল তাহাকে অনুমতি দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একরাত্রে এমন প্রচণ্ড বেগে তুফান আসিল যে, না পূর্বে কখনও এইরূপ আসিয়াছে আর না পরে। এমন ভীষণ অন্ধকার ছিল যে, পাশের ব্যক্তি তো দূরের কথা নিজের হাতও দেখা যাইতেছিল না। বাতাসের বেগ এত প্রচণ্ড ছিল যে, উহার আওয়াজ বজ্রের মত গর্জন করিতেছিল। মুনাফেকরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল। আমরা তিন শত লোকের একটি দল সেখানেই রহিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজনের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং এই অন্ধকারের মধ্যেই সবদিকে খোঁজ-খবর রাখিতেছিলেন। ইত্যবসরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। আমার নিকট না তো শত্রু হইতে আত্মরক্ষার কোন হাতিয়ার ছিল আর না শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন বস্ত্র ছিল। কেবল ছোট একটি চাদর ছিল যাহা দ্বারা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যাইত। উহাও আমার নয় বরং আমার স্ত্রীর ছিল। উহা গায়ে দিয়া হাঁটু গাড়িয়া জমিনের সহিত মিশিয়া বসিয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে? আমি বলিলাম, হুযাইফা। কিন্তু শীতের কারণে আমার দ্বারা দাঁড়ানো সম্ভব হইল না এবং লজ্জায় মাটির সহিত লাগিয়া রহিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠিয়া দাঁড়াও এবং শত্রুদলের ভিতরে যাইয়া তাহাদের খবর লইয়া আস যে, সেখানে কি হইতেছে। আমি তখন ভয় ও শীতের কারণে সবচেয়ে বেশী দুরাবস্থাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রওয়ানা হইয়া গেলাম। যখন আমি রওয়ানা হইলাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ وَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ عَنْ شِمَالِهٖ وَ مِنْ فَوْقِهٖ وَ مِنْ تَحْتِهٖ

"হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে হেফাজত করুন সম্মুখ হইতে, পিছন হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে, উপর হইতে, নীচ হইতে।"

হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার পর হইতে যেন আমার নিকট হইতে ভয়ভীতি ও শীত একেবারেই দূর হইয়া গেল। প্রতি কদমে আমার মনে হইতেছিল, যেন গরমের মধ্যে চলিতেছি। রওয়ানা হওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানে কোন কিছু না ঘটাইয়া ফিরিয়া আসিও। কি হইতেছে চুপচাপ দেখিয়া চলিয়া আসিও।

আমি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আগুন জ্বলিতেছে এবং লোকেরা আগুন পোহাইতেছে। এক ব্যক্তি আগুনে হাত গরম করিয়া উহা কোমরে বুলাইতেছে। আর চারিদিক হইতে ফিরিয়া চল, ফিরিয়া চল আওয়াজ আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রকে ডাকিয়া বলিতেছে, ফিরিয়া চল। আর বাতাসের তীব্রতার কারণে চারিদিক হইতে তাহাদের তাঁবুর উপর পাথর বর্ষণ হইতেছিল। তাঁবুর রশিগুলি ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলি মারা যাইতেছিল। আবু সুফিয়ান যে ঐ সময় সমগ্র বাহিনীর দলপতি ছিল আগুন পোহাইতেছিল। মনে মনে ভাবিলাম যে, ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ, তাহাকে খতম করিয়া দেই। তূনীর হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে স্থাপন করিয়াও ফেলিলাম কিন্তু তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, 'সেখানে কোন কিছু ঘটাইও না, দেখিয়া চলিয়া আসিও' মনে পড়িল। তাই তীরটি তূনীরে রাখিয়া দিলাম। তাহাদের সন্দেহ হইল, কাজেই বলিতে লাগিল যে, তোমাদের মধ্যে কোন গুপ্তচর আছে। প্রত্যেকেই নিজের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির হাত ধরিয়া লও। আমি তাড়াতাড়ি এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে বলিতে লাগিল, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে চিন না? আমি তো অমুক।

আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। যখন অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিলাম তখন প্রায় বিশজন পাগড়ী পরিহিত ঘোড়সওয়ার লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিলেন, তোমার মনিবকে বলিয়া দিও, আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট চাদর গায়ে দিয়া নামায পড়িতেছেন। ইহা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস ছিল যে, যখনই কোন পেরেশানী বা দুঃশ্চিন্তার সম্মুখীন হইতেন তখনই নামাযে মগ্ন হইয়া যাইতেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমি সেখানে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা আরজ করিলাম। গুপ্তচর সম্পর্কিত ঘটনা

শুনিয়া তিনি মুচকি হাসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পায়ের কাছে শোয়াইয়া দিলেন এবং নিজ চাদরের কিছু অংশ আমার গায়ের উপর দিয়া দিলেন। আমি আমার বুক তাঁহার পায়ের তালুর সহিত জড়াইয়া লইলাম। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ এইসব মনীষীদের জন্যই ছিল এই সৌভাগ্য এবং তাঁহাদের জন্যই ইহা শোভনীয় ছিল যে, এত কষ্ট ও দুর্যোগের মধ্যে তাহাদের নিকট হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন করা দেহ–মন জানমাল সবকিছু হইতে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ তায়ালা কোনরূপ যোগ্যতা ছাড়াই আমি অধমকেও যদি তাঁহাদের অনুসরণের কিছু অংশ দান করেন তবে ইহা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

দশম অধ্যায়
মহিলাদের দ্বীনি জয্‌বা

বাস্তব এই যে, মহিলাদের মধ্যে যদি দ্বীনের প্রতি উৎসাহ ও নেক আমলের প্রতি আগ্রহ পয়দা হইয়া যায়, তবে সন্তানের উপর উহার প্রভাব অবশ্যই পড়িবে। পক্ষান্তরে আমাদের যমানায় সন্তানদেরকে শুরুতেই এমন পরিবেশে রাখা হয় যেখানেতাহাদের উপর দ্বীন বিরোধী প্রভাব পড়ে অথবা কমপক্ষে দ্বীনের প্রতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি হইয়া যায়—যখন এইরূপ পরিবেশে প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হইবে তবে ইহার ফলাফল কি হইবে তাহা সুস্পষ্ট।

(১) হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর তাসবীহাত

হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার এক শাগরেদকে বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নিজের এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘটনা শুনাইব কি? শাগরেদ বলিল, অবশ্যই শুনান। তিনি বলিলেন, সে নিজ হাতে জাঁতা ঘুরাইত, যাহার ফলে হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং নিজে পানি ভরা মশক বহন করিয়া আনিত যাহার ফলে বুকে মশকের রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং ঘরের ঝাড়ু ইত্যাদিও নিজেই দিত, যাহার ফলে সমস্ত কাপড় চোপড় ময়লাযুক্ত থাকিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম–বাঁদী আসিল। আমি ফাতেম (রাযিঃ)কে বলিলাম, তুমিও যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একজন খাদেম চাহিয়া লও। যাহাতে তোমার কিছুটা সাহায্য হয়। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, সেখানে লোকের সমাগম ছিল। আর সে স্বভাবগত অনেক বেশী লাজুক ছিল। সকলের সম্মুখে পিতার নিকটও চাহিতে লজ্জাবোধ করিল এবং ফিরিয়া আসিল।

পরদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাশরীফ আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাতেমা! তুমি গতকাল কি কাজের জন্য গিয়াছিলে? সে লজ্জায় চুপ রহিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার অবস্থা এই যে, জাঁতা ঘুরানোর কারণে হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, পানির মশক বহন করার কারণে বুকে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছে। সর্বদা কাজকর্ম করিবার কারণে কাপড়-চোপড় ময়লাযুক্ত থাকে। আমি গতকাল তাহাকে বলিয়াছিলাম, আপনার কাছে খাদেম আসিয়াছে তাই সেও একজন চাহিয়া লয়। এইজন্য গিয়াছিল।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আর আলীর নিকট একটি মাত্র বিছানা। তাহাও একটি দুম্বার চামড়া। রাত্রে উহা বিছাইয়া শয়ন করি আর সকালে উহাতেই ঘাসদানা রাখিয়া উটকে খাওয়াই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মা! ধৈর্যধারণ কর। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট দশ বছর যাবৎ একটি বিছানাই ছিল। আর তাহাও হযরত মূসা (আঃ)এর জুব্বা। রাত্রে উহা বিছাইয়াই শয়ন করিতেন। তুমি তাকওয়া অর্জন কর। আল্লাহকে ভয় কর। আপন পরোয়ারদিগারের হুকুম আদায় করিতে থাক। ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে থাক। আর যখন ঘুমানোর জন্য শয়ন করিবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করিও। ইহা খাদেম হইতে উত্তম বস্তু। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে যাহা পছন্দ করিবেন উহা আমি খুশীর সহিত গ্রহন করিব। ইহা ছিল দু'জাহানের বাদশাহর কন্যার জীবন। আজ আমাদের কাহারও কাছে যদি দুই-চারটি পয়সা হইয়া যায় তবে তাহার গৃহিনী ঘরের কাজকর্ম তো দূরের কথা নিজের কাজটুকুও করিতে পারে না। পায়খানায় বদনাটিও চাকরানীকেই রাখিয়া আসিতে হয়।

উল্লেখিত ঘটনায় কেবল শয়নকালে উক্ত তাসবীহ পাঠের কথা বর্ণিত

রহিয়াছে। অপর হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর তিনটি কালেমা ৩৩ বার করিয়া এবং ১ বার لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ পড়ার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

(২) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সদকা করা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে দেরহাম ভর্তি দুইটি বস্তা পেশ করা হইল। উহাতে এক লক্ষেরও বেশী দেরহাম ছিল। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একটি থালা আনাইলেন এবং উহা ভরিয়া ভরিয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সব শেষ করিয়া ফেলিলেন। একটি দেরহামও অবশিষ্ট রাখিলেন না। তিনি নিজে রোযা ছিলেন। ইফতারের সময় বাঁদীকে বলিলেন, ইফতারের জন্য কিছু আন। সে একটি রুটি ও যয়তুনের তৈল লইয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, কত ভাল হইত যদি এক দেরহাম দিয়া কিছু গোশতই আনাইয়া লইতেন। আজ আমরা গোশত দ্বারা ইফতার করিতাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন বলিলে কি হইবে ঐ সময় স্মরণ করাইলে আমি খরিদ করাইয়া লইতাম। (তাযকেরাহ)

ফায়দা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর খেদমতে এই ধরনের হাদিয়া আমীর মুয়াবিয়া (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে পেশ করা হইত। কেননা তখন অত্যন্ত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার যুগ ছিল। ঘরের মধ্যে শস্যের ন্যায় স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ পড়িয়া থাকিত। এতদসত্ত্বেও নিজেদের জীবন খুবই সাদাসিধা এবং অতি সাধারণভাবে যাপন করা হইত। এমনকি ইফতারের কথাও চাকরানীর স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মত বিতরণ করিয়া ফেলিলেন কিন্তু তারপরও এই কথা মনে পড়িল না যে, আমি রোযা রাখিয়াছি এবং গোশত খরিদ করিতে হইবে।

আজকাল এই ধরনের ঘটনা এত বিরল হইয়া গিয়াছে যে, এইসব ঘটনা সত্য হওয়ার ব্যাপারেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। কিন্তু তখনকার সাধারণ জীবন–যাপনের চিত্র যাহাদের সামনে রহিয়াছে তাহাদের কাছে ইহা এবং এই ধরনের শত শত ঘটনাও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর এই ধরনের আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে। একবার তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন, ঘরে একটি রুটি ব্যতীত কিছুই ছিল না। জনৈক ভিক্ষুক আসিয়া সওয়াল করিল। খাদেমাকে বলিলেন, রুটিটি তাহাকে দিয়া দাও। সে বলিল, ইফতারের জন্য ঘরে কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, কি অসুবিধা, ঐ রুটি তাহাকে দিয়া দাও। সে দিয়া দিল। (মুআত্তা)

একবার তিনি একটি সাপ মারিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছ। তিনি বলিলেন, মুসলমান হইলে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট আসিত না। সে বলিল, কিন্তু পর্দা অবস্থায় আসিয়াছিল। ইহাতে বিচলিত হইয়া জাগ্রত হইলেন। অতঃপর বার হাজার দেরহাম সদকা করিলেন যাহা একজন মানুষের হত্যার বদলা হইয়া থাকে।

ওরোয়া (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি তাঁহাকে সত্তর হাজার দেরহাম দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার জামায় তালি লাগানো ছিল।

(তাবাকাত)

(৩) হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) কর্তৃক হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে সদকা করা হইতে বাধা দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বলিতে গেলে তিনিই বোনপুত্রকে লালন–পালন করিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর দানশীলতায় তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, যাহা কিছু আসে সাথে সাথে সবকিছু দান করিয়া ফেলেন এবং নিজে কষ্টভোগ করেন। একবার বলিয়া ফেলিলেন যে, খালাম্মার হাতকে কোন প্রকারে রুখিয়া দেওয়া চাই। এই কথা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর কানেও পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন যে, আমার হাত রুখিতে চায় এবং তাহার সহিত কথা না বলার মান্নত স্বরূপ কসম খাইলেন। খালার অসন্তুষ্টিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর অত্যন্ত দুঃখ হইল। অনেক লোকের মাধ্যমে সুপারিশ করাইলেন। কিন্তু তিনি নিজের কসমের উযর পেশ করিলেন। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) যখন অত্যন্ত পেরেশান হইলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃবংশের দুইজন ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসাবে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহারা উভয়ে অনুমতি লইয়া ভিতরে গেলেন, তিনিও লুকাইয়া তাঁহাদের সহিত গেলেন। যখন তাঁহারা দুইজন পর্দার পিছনে এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) পর্দার ভিতরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন তখন তিনি দ্রুত পর্দার ভিতরে যাইয়া খালাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং খুব কাঁদিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিলেন। উক্ত দুই ব্যক্তিও সুপারিশ করিতে থাকিলেন এবং মুসলমানের সহিত কথোপকথন বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ স্মরণ করাইতে থাকিলেন এবং এই সম্পর্কে যে

সকল নিষেধাজ্ঞা হাদীসে আসিয়াছে তাহা শুনাইতে থাকিলেন। যদ্দরুন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) মুসলমানের সহিত কথা বন্ধ রাখা সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে সকল নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অবশেষে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সেই কসমের কাফফারা স্বরূপ বারবার গোলাম আযাদ করিতে থাকেন এমনকি চল্লিশজন গোলাম পর্যন্ত আযাদ করিলেন। যখনই ঐ কসম ভঙ্গ করিবার কথা স্মরণ হইত তখন এত কাঁদিতেন যে, চোখের পানিতে ওড়না পর্যন্ত ভিজিয়া যাইত। (বুখারী)

ফায়দা ঃ আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে কত কসম করিয়া থাকি এবং উহার কতটুকু পরওয়া করি ইহার জবাব নিজেদেরই ভাবিয়া দেখার বিষয় ; অন্য আর কে সবসময় সঙ্গে থাকিবে যে বলিয়া দিবে? কিন্তু যাহাদের অন্তরে আল্লাহর নামের মর্যাদা রহিয়াছে এবং যাহাদের নিকট আল্লাহর সহিত ওয়াদা করিবার পর তাহা পূর্ণ করা জরুরী তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, ওয়াদা পুরা না হইলে মনের কি অবস্থা হয়। এই কারণেই যখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর উক্ত ঘটনা মনে পড়িত তখন অত্যাধিক কাঁদিতেন।

(৪) আল্লাহর ভয়ে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পরিমাণ মহব্বত ছিল উহা কাহারও নিকট গোপন নহে। এমনকি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি সবচেয়ে বেশী কাহাকে ভালবাসেন? তখন তিনি বলিলেন, আয়েশাকে। সেই সঙ্গে তিনি মাসায়েল সম্পর্কেও এত অধিক অবগত ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণও মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার খেদমতে হাজির হইতেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিতেন। জান্নাতেও হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। মুনাফেকরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে কোরআন শরীফে তাঁহার পবিত্রতা অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, দশটি বৈশিষ্ট্য আমার এমন রহিয়াছে, যাহাতে অন্য কোন বিবিগণ শরীক নাই। ইবনে সাদ (রহঃ) সেই সবগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সদকার অবস্থা তো পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহে জানা হইয়াছেই কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও খোদাভীতির এই অবস্থা ছিল যে, তিনি বলিতেন, হায়!

আমি যদি বৃক্ষ হইতাম ; সর্বদা তাসবীহ পাঠে রত থাকিতাম আর আখেরাতে আমার কোন হিসাব হইত না। হায়! আমি যদি পাথর হইতাম, হায়! আমি মাটির ঢিলা হইতাম, হায়! আমি যদি পয়দাই না হইতাম। হায়! আমি যদি গাছের পাতা হইতাম, হায়! আমি যদি কোন ঘাস হইতাম। (বুখারী)

ফায়দা ঃ খোদাভীতির এই অবস্থা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ নম্বর ঘটনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের সাধারণ অবস্থা ছিল। আল্লাহকে ভয় করা তাহাদেরই ভাগ্যে ছিল।

(৫) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর স্বামীর দোয়া ও হিজরত

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে সাহাবী হযরত আবু সালমা (রাযিঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল যাহা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। একবার উম্মে সালামা (রাযিঃ) আবু সালামা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই জান্নাতী হয় এবং স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কোন স্বামী গ্রহণ না করে তবে এই স্ত্রী জান্নাতে সেই স্বামীরই সঙ্গ লাভ করিবে। এমনিভাবে স্বামী যদি অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ না করে তবে ঐ স্ত্রীই জান্নাতে তাহার সঙ্গলাভ করিবে। তাই আসুন আমরা উভয়েই এই মর্মে অঙ্গীকার করি যে, আমাদের মধ্য হইতে যে আগে মৃত্যুবরণ করিবে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করিবে না। আবু সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি আমার কথা মানিবে কি? উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তো এই জন্যই পরামর্শ করিতেছি যে, আপনার কথা মানিব। আবু সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি আমার মৃত্যুর পর বিবাহ করিয়া নিও। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার পরে উম্মে সালামাকে আমার চাইতে উত্তম স্বামী দান করুন—যে তাহাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই এক সহিত সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদীনায় হিজরত করেন। যাহার বিস্তারিত ঘটনা হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আবু সালামা (রাযিঃ) যখন হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন নিজের উটের পিঠে সামান উঠাইলেন

এবং আমাকে ও আমার পুত্র সালামাকে উটের পিঠে বসাইলেন আর নিজে উটের রশি ধরিয়া চলিতে শুরু করিলেন। আমার পিতৃবংশ বনু মুগীরার লোকেরা দেখিয়া ফেলিল। তাহারা আবু সালামা (রাযিঃ)কে বলিল, তুমি নিজের ব্যাপারে স্বাধীন হইতে পার কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েকে তোমার সহিত কেন যাইতে দিব যে, দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিবে? এই বলিয়া আবু সালামা (রাযিঃ)এর হাত হইতে উটের রশি ছিনাইয়া লইল এবং আমাকে জোরপূর্বক লইয়া গেল। এই ঘটনা যখন আমার শ্বশুরালয় বনু আবদুল আসাদের লোকেরা—যাহারা আবু সালামার আত্মীয়—জানিতে পারিল, তখন তাহারা আমার পিতৃবংশ বনু মুগীরার লোকদের সহিত এই বলিয়া ঝগড়া শুরু করিল যে, তোমাদের মেয়ের ব্যাপারে তো তোমাদের অধিকার আছে কিন্তু যখন তোমরা তোমাদের মেয়েকে তাহার স্বামীর সহিত যাইতে দিলে না তখন আমরা আমাদের ছেলে সালামা (রাযিঃ)কে তোমাদের নিকট কেন ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া আমার ছেলে সালামা (রাযিঃ)কেও আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিল। এখন আমি, আমার ছেলে সালামা এবং আমার স্বামী তিনজনই পৃথক হইয়া গেলাম। স্বামী তো মদীনায় চলিয়া গেলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে রহিয়া গেলাম আর ছেলে তাহার দাদার বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল। আমি দৈনিক ময়দানে বাহির হইয়া যাইতাম আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রন্দন করিতাম। এইভাবে পূর্ণ এক বৎসর আমার কাঁদিয়া অতিবাহিত হইল, না আমি স্বামীর কাছে যাইতে পারিলাম, আর না সন্তানকে পাইলাম। একদিন আমার এক চাচাত ভাই আমার অবস্থার উপর দয়াপরবশ হইয়া আপন লোকজনকে বলিল, এই অসহায় মেয়েটির উপর কি তোমাদের দয়া আসে না? তোমরা তাহাকে সন্তান এবং স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছ; তাহাকে ছাড়িয়া দাও না কেন?

অবশেষে আমার চাচাত ভাই বলিয়া কহিয়া এই ব্যাপারে সবাইকে সম্মত করিল। তাহারা আমাকে অনুমতি দিয়া দিল যে, তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাইতে চাহিলে চলিয়া যাও। ইহা দেখিয়া বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও ছেলেকে দিয়া দিল। আমি একটি উট জোগাড় করিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া একাই উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলাম। তিন চার মাইল অতিক্রম করিবার পর তানয়ীম নামক স্থানে উছমান ইবনে তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একা কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাইতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার সহিত আর কেহ নাই। আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি আমার উটের রশি ধরিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলেন। আল্লাহর কসম! উছমানের চাইতে অধিক ভদ্র লোক আমি আর কাহাকেও পাই নাই। যখন উট হইতে নামিবার সময় হইত তখন তিনি উটকে বসাইয়া দূরে কোন গাছের আড়ালে চলিয়া যাইতেন, আমি উট হইতে নামিয়া যাইতাম। আর যখন সওয়ার হওয়ার সময় হইত তখন আসবাবপত্র উটের পিঠে তুলিয়া আমার নিকটে বসাইয়া দিতেন। আমি উহার উপর সওয়ার হইলে তিনি আসিয়া উটের রশি ধরিয়া আগে আগে চলিতে থাকিতেন। এইভাবে আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিয়া গেলাম। কোবায় পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী এখানেই আছেন। ঐসময় আবু সালামা (রাযিঃ) কোবায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। উছমান আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া নিজে মক্কা মুকাররমায় ফিরিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, উছমান ইবনে তালহার চাইতে অধিক ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই। ঐ বৎসর আমি এত দুঃখ–কষ্ট সহ্য করিয়াছি যাহা আর কেহ হয়ত করে নাই। (উসুদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহর উপর ভরসার কারণেই একাকী হিজরতের এরাদায় রওয়ানা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্যের ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাহার সাহায্য করেন। সমস্ত বান্দার অন্তর তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

হিজরত যদি ফরয হয় তবে কোন মাহরাম না থাকিলে একাকীও সফর করা জায়েয। তাই তাহার একাকী সফর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নহে।

⑥ খাইবারের যুদ্ধে কয়েকজন মহিলার সহিত হযরত উম্মে যিয়াদের অংশগ্রহণ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় পুরুষদের তো জেহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ ছিলই, যাহার ঘটনাসমূহ ব্যাপকহারে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এইক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে পিছনে ছিলেন না। তাহারা সবসময় আগ্রহী থাকিতেন এবং যেখানেই সুযোগ পাইতেন পৌঁছিয়া যাইতেন। উম্মে যিয়াদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা ছয়জন মহিলা খাইবারের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হইলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারায় গোসসার আলামত

পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার অনুমতি লইয়া আসিয়াছ এবং কাহার সহিত আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা পশম বুনিতে জানি। জেহাদে ইহার প্রয়োজন হয়। আমাদের সহিত জখমের ঔষধও রহিয়াছে। আর কিছু না হোক মুজাহিদদের তীর আগাইয়া দেওয়ার কাজে সাহায্য করিব। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার সেবা-শুশ্রূষার কাজে সাহায্য করা যাইতে পারে। ছাতু ইত্যাদি গুলানো এবং পান করানোর ব্যাপারে সাহায্য করিব। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা তখনকার মহিলাদের মধ্যেও এমন আগ্রহ ও সাহস পয়দা করিয়াছিলেন যাহা আজকাল পুরুষদের মধ্যেও নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তাহারা নিজ আগ্রহে নিজেরাই পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং কতগুলি কাজ নিজেরা করার সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করিলেন। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা তাঁহার গর্ভে ছিলেন। সাথে একটি খঞ্জর রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের জন্য? তিনি বলিলেন, যদি কোন কাফের আমার নিকট আসিয়া যায় তবে তাহার পেটে ঢুকাইয়া দিব। তিনি ইতিপূর্বে উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আহতদের চিকিৎসা এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ও উম্মে সুলাইম (রাযিঃ)কে দেখিয়াছি, তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মশক ভরিয়া আনিতেন এবং আহতদিগকে পান করাইতেন। আর যখন মশক খালি হইয়া যাইত আবার পূর্ণ করিয়া আনিতেন।

(৭) হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ)এর সামুদ্রিক যুদ্ধে শরীক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খালা ছিলেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁহার ঘরে তশরীফ নিতেন এবং কখনও দুপুরে সেখানেই বিশ্রাম করিতেন। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে আরাম করিতেছিলেন হঠাৎ মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার

পিতামাতা কোরবান হউক আপনি কি জন্য মুচকি হাসিতেছিলেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে আমার উম্মতের কিছুলোক দেখানো হইয়াছে, যাহারা সমুদ্র পথে যুদ্ধের জন্য এমনভাবে সওয়ার হইয়াছে যেন সিংহাসনে বাদশাহ বসিয়া আছে। উম্মে হারাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্যে শামিল থাকিবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘুমাইলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুনরায় অনুরূপ উত্তর দিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) পনুরায় পূর্বের ন্যায় দরখাস্ত করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন যেন আমিও তাহাদের মধ্যে হই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি প্রথম দলে থাকিবে। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, জাযায়েরে কাবরাস বা সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণের অনুমতি চাহিলেন। হযরত উছমান (রাযিঃ) অনুমতি দিয়া দিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিঃ) একদল সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলেন। যাহাতে উম্মে হারাম (রাযিঃ) ও তাহার স্বামী উবাদা (রাযিঃ) সহ সৈন্য দলে শরীক ছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার হইতেছিলেন। এমতাবস্থায় খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল আর তিনি উহার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং মৃত্যুবরণ করিলেন আর সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হইল। (বুখারী)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ ও প্রেরণা। প্রত্যেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণের দোয়া চাহিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধে যেহেতু তাঁহার ইন্তিকাল নির্ধারিত ছিল, তাই দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই আর এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে তাহার অংশগ্রহণের জন্য দোয়াও করেন নাই।

(৮) সন্তানের মৃত্যুতে হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ)এর আমল

উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ)এর মা ছিলেন। তিনি তাহার প্রথম স্বামী অর্থাৎ হযরত আনাস (রাযিঃ)এর পিতার ইন্তেকালের পর বিধবা হইয়া যান এবং হযরত আনাস (রাযিঃ)এর লালন পালনের কথা ভাবিয়া কিছু দিন যাবত অন্যত্র বিবাহ বসেন নাই। অতঃপর হযরত

আবু তালহা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে এক পুত্র আবু উমাইর জন্মগ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদের ঘরে যাইতেন তখন তাহার সহিত হাসি–তামাশাও করিতেন। ঘটনাক্রমে আবু উমাইর (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) তাহাকে গোসল দিলেন, কাফন পরাইলেন এবং একটি খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। আবু তালহা (রাযিঃ) রোযা ছিলেন। উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) তাঁহার জন্য খানাপিনা তৈরী করিলেন এবং তিনি স্বয়ং নিজেও সাজ–সজ্জা করিলেন খুশবু ইত্যাদি লাগাইলেন। রাত্রে স্বামী আসিলেন, খানাপিনাও খাইলেন। সন্তানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন তো শান্ত মনে হইতেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। স্বামী রাত্রে সহবাসও করিলেন। ভোরে যখন তিনি উঠিলেন তখন বলিতে লাগিলেন যে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কেহ যদি কাহাকেও কোন জিনিস ধার স্বরূপ দেয় তারপর সে উহা ফেরত নিতে চাহিলে তখন কি উহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত, না ফেরত না দিয়া আটকাইয়া রাখা উচিত? তিনি বলিলেন, অবশ্যই ফিরাইয়া দেওয়া চাই, আটকাইয়া রাখিবার কোন অধিকার নাই। ধার করা বস্তু তো ফেরত দিতেই হইবে। এইকথা শুনিয়া উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) বলিলেন, আপনার ছেলে যাহা আল্লাহর আমানত ছিল উহা আল্লাহ ফেরত নিয়াছেন। আবু তালহা (রাযিঃ) ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে খবরও দিলে না? সকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) সমস্ত ঘটনা আরজ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া দিলেন এবং বলিলেন, হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা সেই রাত্রির মধ্যে বরকত দান করিবেন। আর তাহাই হইল। এক আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকত দেখিয়াছি যে, ঐ রাত্রের গর্ভধারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা জন্মগ্রহণ করেন, যিনি নয়টি পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং সকলেই কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ বড়ই ধৈর্য ও হিম্মতের বিষয় যে, আপন সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে আর এইভাবে উহাকে বরদাশত করিবে যে, স্বামীকেও বুঝিতে দিবে না। আর যেহেতু স্বামী রোযা ছিলেন তাই মনে করিলেন যে, জানিতে পারিলে খানা খাওয়াও মুশকিল হইবে।

(৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর আপন পিতাকে বিছানায় বসিতে না দেওয়া

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহ্শের স্ত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরতও একত্রেই করিয়াছেন। সেখানে যাওয়ার পর স্বামী মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হইয়া যায় এবং ঐ মুরতাদ অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) এই বিধবা জীবন হাবশাতেই অতিবাহিত করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বিবাহের পয়গাম পাঠান এবং হাবশার বাদশাহর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের বর্ণনায় আসিবে। বিবাহের পর তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় চলিয়া আসেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার পিতা আবু সুফিয়ান সন্ধির বিষয়টি আরো পাকা করিবার উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আলাপ আলোচনার প্রয়োজন ছিল বিধায় মদীনা তাইয়্যেবায় আসেন। মেয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। সেখানে বিছানা বিছানো ছিল। তিনি উহাতে বসিতে চাহিলে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বিছানা উল্টাইয়া দিলেন। পিতা আশ্চর্য হইলেন যে, যে ক্ষেত্রে বিছানা বিছানোর কথা সেক্ষেত্রে সে বিছানো বিছানাকেও গুটাইয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিছানা আমার উপযোগী ছিল না এইজন্য গুটাইয়া ফেলিয়াছ, নাকি আমি এই বিছানার যোগ্য ছিলাম না? উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর পবিত্র ও প্রিয় রাসূলের বিছানা আর আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে নাপাক। সুতরাং আপনাকে কিভাবে উহার উপর বসাইতে পারি! পিতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তোমার স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল সেইদিকে লক্ষ্য করিলে তিনি ইহা কিভাবে পছন্দ করিতে পারেন যে,কোন অপবিত্র মুশরিক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসিবে, চাই সে বাপ অথবা যে কেহ হউক না কেন?

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চাশতের বার রাকাতের ফযীলত শুনিয়াছেন। অতঃপর আজীবন উহা নিয়মিত আদায় করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতাও যাহার ঘটনা এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, পরবর্তীতে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার ইন্তেকালের তৃতীয় দিন খুশবো আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমার খুশবো ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন মহিলার জন্য আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও বেলায় তিনদিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নহে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করিতে হয়। তাই খুশবো ব্যবহার করিতেছি যাহাতে শোক বুঝা না যায়।

যখন তাহার ইন্তিকালের সময় হইল তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমার এবং তোমার মধ্যে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আর সতীনদের মধ্যে পরস্পর কোন না কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হইয়াই থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও মাফ করুন তোমাকেও মাফ করুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সবকিছু মাফ করিয়া দিন। এইকথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও আনন্দিত ও সুখে রাখুন। অতঃপর এমনিভাবে উম্মে সালামা (রাযিঃ)–এর কাছেও এই মর্মে লোক পাঠাইয়াছেন। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ সতীনদের পরস্পর যে ধরনের সম্পর্ক থাকে সেই হিসাবে একজন অপরজনের চেহারাও দেখিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের ইহার প্রতি গুরুত্ব ছিল যে, দুনিয়ার ব্যাপার দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাক ; আখেরাতে যেন ইহার বোঝা বহন করিতে না হয়। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা কতটুকু ছিল তাহা বিছানার ঘটনা হইতেই অনুমান করা গিয়াছে।

(১০) অপবাদের ঘটনায় হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পক্ষে সাক্ষ্য দান করা

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ) সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। তিনি প্রথম দিকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্রও ছিলেন। তাই তাঁহাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলা হইত। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সহিত হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বনিবনা না হওয়ার কারণে তিনি তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন। জাহিলিয়্যাতের

যুগে এই প্রথা ছিল যে, পালকপুত্রকে সম্পূর্ণরূপে আপন পুত্রের ন্যায় মনে করা হইত এবং তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাতের এই কুপ্রথাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট নিজের বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ) জওয়াব দিলেন, আমি আমার রবের সহিত পরামর্শ করিয়া লই। এই বলিয়া তিনি অযু করিলেন এবং নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন যাহার বরকতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর সহিত করিয়া দিলেন এবং কুরআন পাকের আয়াত নাযিল হইল—

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ
اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

"অতঃপর যায়েদ যখন তাহার হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া নিল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম, যাহাতে পালকপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে মুমেনদের উপর কোন সংকীর্ণতা না থাকে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া লইয়াছে। আর আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ হইয়াই থাকিল।"

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)কে বিবাহের সুসংবাদ দেওয়া হইল তখন তিনি তাহার পরিধানে যে সমস্ত অলংকার ছিল তাহা খুলিয়া সুসংবাদদানকারীকে দিয়া দিলেন এবং নিজে সেজদায় পড়িয়া গেলেন আর দুই মাসের রোযা মান্নত করিলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)–এর জন্য ইহা যথার্থই গর্বের বিষয় ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিবিদের বিবাহের ব্যবস্থা তাহাদের আত্মীয়–স্বজনরা করিয়াছে কিন্তু হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বিবাহ আসমানে হইয়াছে এবং কুরআনে পাকে নাযিল হইয়াছে। এই কারণেই হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর সহিত অনেক সময় মোকাবেলার পালাও আসিয়া যাইত। কেননা তাহারও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী হওয়ার গর্ব ছিল। আর হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এরও আসমানে বিবাহ হওয়ার গর্ব ছিল। এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্যদের মধ্যে যখন যয়নাব (রাযিঃ)কেও জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি আরজ করিলেন যে, আমি আয়েশা সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু জানি না। ইহা ছিল প্রকৃত দ্বীনদারী, নতুবা

সতীনকে বদনাম করার ও স্বামীর চোখে খাটো করার ইহা একটি সুযোগ ছিল। বিশেষ করিয়া ঐ সতীনকে যে স্বামীর নিকট সর্বাধিক প্রিয়ও ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জোরালো ভাষায় তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন এবং প্রশংসা করিলেন।

হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত বুযুর্গ ছিলেন। অধিক পরিমাণে রোযাও রাখিতেন, অধিক পরিমাণে নফল নামাযও পড়িতেন। নিজ হাতে উপার্জনও করিতেন এবং যাহা কিছু আয় হইত তাহা সদকা করিয়া দিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় বিবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কোন্ বিবি আপনার সহিত মিলিত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার হাত লম্বা হইবে। তাহারা কাষ্ঠখণ্ড লইয়া হাত মাপিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়ার অর্থ অধিক দান-খয়রাত করা ছিল। অতএব সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এরই ইন্তিকাল হইল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট তাহার অংশের বার হাজার দেরহাম পাঠাইলেন তখন তিনি মনে করিলেন যে, ইহা সবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন যে, বন্টন করার জন্য তো অন্যান্য বিবিগণ উপযুক্ত ছিলেন। বাহক বলিলেন, এইসব আপনার অংশ এবং সারা বছরের জন্য। তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন সুবহানাল্লাহ! এবং কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন যেন এই মাল দেখিতেও না হয়। অতঃপর বলিলেন, ঘরের কোণে রাখিয়া দাও এবং উহার উপর একটি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়াইলেন। তারপর এই ঘটনার বর্ণনাকারী বারযা (রাযিঃ)কে বলিলেন, ইহা হইতে এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস, এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস। মোটকথা, এইভাবে আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব ও বিধবাদের মধ্যে এক এক মুষ্টি করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন। পরে যখন সামান্য পরিমাণ মাল অবশিষ্ট রহিয়া গেল তখন বারযা (রাযিঃ)ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, কাপড়ের নিচে যাহা রহিয়া গিয়াছে তাহা তুমি লইয়া যাও। বারযা (রাযিঃ) বলেন, যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল তাহা আমি লইয়া গণিয়া দেখিলাম চুরাশি দেরহাম ছিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আগামী বৎসর যেন এই মাল আমার নিকট না আসে। কেননা ইহা ফেৎনার বস্তু। সুতরাং পরবর্তী বৎসরের ভাতা

আসিবার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বার হাজার দেরহাম শেষ করিয়া দিয়াছেন তখন তিনি আরও এক হাজার দেরহাম পাঠাইলেন, যাহাতে নিজের প্রয়োজনে খরচ করিতে পারেন। তিনি উহাও সঙ্গে সঙ্গে বন্টন করিয়া দিলেন। অনেক বেশী সচ্ছলতা সত্ত্বেও ইন্তেকালের সময় না কোন দেরহাম রাখিয়া গেলেন, না কোন সম্পদ? পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু ঐ ঘরটি ছিল যাহাতে তিনি থাকিতেন। অধিক দান খয়রাত করিতেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল 'গরীবের আশ্রয়'। (তাবাকাত)

এক মহিলা বর্ণনা করেন, আমি হযয়ত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট ছিলাম। আমরা গেরুয়া রঙ দ্বারা কাপড় রঙ করিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন। আমাদিগকে কাপড় রঙ করিতে দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ) মনে করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহা অপছন্দ হইয়াছে, তাই যে সমস্ত কাপড় রঙ করা হইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া ফেলিলেন। পরবর্তীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসিয়া দেখিলেন যে, সেই রঙের কোন দৃশ্য নাই তখন ভিতরে তশরীফ আনিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের বিশেষ করিয়া ধন-সম্পদের উপর যতখানি মহব্বত হয় তাহা অজানা নহে, এমনিভাবে রঙ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কেও বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহারাও তো মহিলাই ছিলেন—যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখা জানিতেনই না আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য একটু ইশারা পাইয়া সমস্ত রঙ ধুইয়া ফেলিলেন।

(১১) চার পুত্রসহ হযরত খানসা (রাযিঃ)এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত খানসা (রাযিঃ) বিখ্যাত কবি ছিলেন। স্বীয় গোত্রের কতিপয় লোকের সহিত মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, তাহার পূর্বে ও পরে কোন মহিলা তাহার চেয়ে সুন্দর কবিতা রচনা করেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে ১৬ হিজরীতে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খানসা (রাযিঃ) তাহার চার পুত্রসহ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের একদিন পূর্বে ছেলেদেরকে বহু উপদেশ দিলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্য খুব বেশী উৎসাহিত করিলেন। বলিতে লাগিলেন, হে আমার

ছেলেরা ! তোমরা নিজের খুশীতে মুসলমান হইয়াছ এবং নিজের খুশীতেই তোমরা হিজরত করিয়াছ। সেই যাতের কসম, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যেমনিভাবে তোমরা এক মায়ের সন্তান, অনুরূপভাবে এক পিতার সন্তান। আমি না তোমাদের পিতার সহিত খেয়ানত করিয়াছি আর না তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিয়াছি। না আমি তোমাদের মান–মর্যাদায় কোন কলঙ্ক লাগাইয়াছি। না তোমাদের বংশকে নষ্ট করিয়াছি। তোমরা জান যে, কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য কি কি সওয়াব রাখিয়াছেন। তোমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আখেরাতের অফুরন্ত জীবন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ইরশাদ— يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! কষ্টে ধৈর্যধারণ কর এবং (কাফেরদের মোকাবিলায়) অটল থাক আর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সম্পূর্ণরূপে কামিয়াব হও।" (বঃ কুরআন)

অতএব আগামীকাল ভোরে যখন তোমরা সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় উঠিবে, তখন অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং আল্লাহর কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে মদদ চাহিয়া অগ্রসর হইবে। আর যখন তোমরা দেখিবে যে, যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন সেই উত্তপ্ত আগুনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে এবং কাফেরদের সর্দারের সহিত মোকাবিলা করিবে। ইনশাআল্লাহ সসম্মানে জান্নাতের মধ্যে কামিয়াব হইয়া থাকিবে।

সুতরাং সকালে যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল তখন চার ছেলের প্রত্যেকে একের পর এক মায়ের উপদেশকে কবিতায় আবৃত্তি করতঃ জোশের সহিত সামনে অগ্রসর হইতেছিল। যখন একজন শহীদ হইয়া যাইতেছিল তখন অনুরূপভাবে আরেকজন অগ্রসর হইতেছিল এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়িতেছিল। অবশেষে চারজনই শহীদ হইয়া গেল। মা যখন চারজনের মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন তখন বলিলেন, আল্লাহর শোকর যিনি তাহাদের শাহাদতের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, এই চারজনের সহিত আমিও তাহার রহমতের ছায়ায় থাকিব। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহর বান্দীদের মধ্যে এমন মাও হইয়া থাকেন, যিনি

চারজন জোয়ান ছেলেকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার উৎসাহ দান করেন। আর যখন চারজনেই শহীদ হইয়া যায় এবং একই সময় সকলে মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করেন।

(১২) হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) কর্তৃক একাই এক ইহুদীকে হত্যা করা

হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু এবং হামযা (রাযিঃ)এর আপন বোন ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুসলমানরা যখন কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেন এবং পলায়ন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাহাদের মুখের উপর বর্শা মারিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মহিলাদিগকে একটি দূর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন আর হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)কে পাহারাদার স্বরূপ সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ভিতরের শত্রু ইহুদীদের জন্য ইহা ছিল বড় সুবর্ণ সুযোগ। একদল ইহুদী মহিলাদের উপর হামলা করার এরাদা করিল এবং এক ইহুদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুর্গের নিকট পৌঁছিল। হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) কোথাও হইতে দেখিতে পাইয়া হযরত হাস্‌সান (রাযিঃ)কে বলিলেন, এই ইহুদী সুযোগ খুঁজিতে আসিয়াছে। তুমি দুর্গের বাহিরে যাও এবং তাহাকে হত্যা কর। তিনি দুর্বল ছিলেন। দুর্বলতার কারণে তাঁহার সহাস হইল না। তখন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে লইলেন এবং নিজেই বাহিরে যাইয়া ইহুদীর মাথা চূর্ণ করিয়া দিলেন। অতঃপর দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া হযরত হাস্‌সানকে বলিলেন, যেহেতু ঐ ইহুদী পুরুষ ছিল এবং পরপুরুষ হওয়ার কারণে আমি তাহার সামান ও পোশাক খুলিয়া আনিতে পারি নাই, তুমি তাহার সব পোশাক খুলিয়া আন এবং তাহার মাথাও কাটিয়া আন। হযরত হাস্‌সান (রাযিঃ) দুর্বলতার কারণে ইহারও হিম্মত করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি দ্বিতীয়বার গেলেন এবং তাহার মাথা কাটিয়া আনিলেন আর দেওয়ালের উপর দিয়া ইহুদীদের ভীড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তো আগে হইতেই ধারণা করিতেছিলাম যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে সম্পূর্ণ একা ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, অবশ্যই তাহাদের পাহারাদার হিসাবে পুরুষলোক ভিতরে মওজুদ রহিয়াছে। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ ২০ হিজরীতে হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল হয়।

ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর ছিল। খন্দকের যুদ্ধ হইয়াছে পঞ্চম হিজরীতে। সেই হিসাবে ঐ সময় তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর ছিল। আজকাল এই বয়সের মহিলাদের জন্য ঘরের কাজকর্ম করাই মুশকিল হইয়া পড়ে, একা একজন পুরুষকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাহাও আবার এমন অবস্থায় যে, একদিকে শুধু মহিলারা আর অপরদিকে ইহুদীদের বিরাট দল।

(১৩) হযরত আসমা (রাযিঃ) কর্তৃক মহিলাদের সওয়াব সম্পর্কে প্রশ্ন করা

আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারী (রাযিঃ) একজন মহিলা সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কোরবান হউন, আমি মুসলমান মেয়েদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আপনার খেদমতে হাজির হইয়াছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। এইজন্য আমরা মহিলারা আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু আমরা মহিলারা ঘরে আবদ্ধ থাকি, পর্দায় বন্দী থাকি। পুরুষদের ঘরে সঙ্গিনী হইয়া থাকি এবং পুরুষদের খায়েশ আমাদের দ্বারা পুরা করা হয়, আমরা তাহাদের সন্তানকে পেটে ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও পুরুষরা বহু সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকেন। তাহারা জুমআর নামাযে শরীক হন, জমাতের নামাযে শরীক হন, রোগীদের দেখাশোনা করেন, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেন। হজ্জের পর হজ্জ করিতে থাকেন। এই সবকিছুর চাইতে বড় কাজ তাহারা জেহাদ করিতে থাকেন। আর যখন তাহারা হজ্জ, ওমরা বা জেহাদের জন্য যান তখন আমরা মহিলারা তাহাদের মালের হেফাজত করি। তাহাদের জন্য কাপড় বুনি, তাহাদের সন্তানদের লালন পালন করি। এমতাবস্থায় আমরা কি তাহাদের সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হইব না? ইহা শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দ্বীন সম্পর্কে এই মহিলার চাইতে কি উত্তম প্রশ্ন করিতে কাহাকেও শুনিয়াছ? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মহিলা এমন প্রশ্ন করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণাও ছিল না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা (রাযিঃ)এর প্রতি

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি খুব মনোযোগের সহিত শোন এবং বুঝিয়া লও আর যে সকল মহিলারা তোমাকে পাঠাইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, তাহার সন্তুষ্টি তালাশ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা ঐ সব আমলের সওয়াবের সমান। আসমা (রাযিঃ) এই উত্তর শুনিয়া অতি আনন্দের সহিত ফিরিয়া গেলেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, তাহাদের অনুগত হইয়া চলা ও হুকুম পালন করা অতি মূল্যবান বিষয়। কিন্তু মহিলারা ইহা হইতে অত্যন্ত গাফেল।

একবার সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন যে, অনারব লোকেরা তাহাদের বাদশাহ এবং সর্দারদেরকে সেজদা করে। আপনি ইহার বেশী উপযুক্ত যে, আমরা আপনাকে সেজদা করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও সেজদার আদেশ করিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করিতাম যেন তাহারা তাহাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, কোন মহিলা আপন রবের হক ঐ পর্যন্ত আদায় করিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর হক আদায় না করিবে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একটি উট আসিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যখন এই পশু আপনাকে সেজদা করিতেছে। তখন আমরা আপনাকে সেজদা করিবার বেশী উপযুক্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন এবং ইহা-ই বলিলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করিবার আদেশ করিতাম তবে স্ত্রীলোককে হুকুম করিতাম তাহার স্বামীকে সেজদা করিতে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এক হাদীসে আছে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আলাদা রাত্রি যাপন করে তবে ফেরেশতারা তাহার উপর লা'নত করিতে থাকে।

এক হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তির নামায কবুল হওয়ার জন্য আসমানের দিকে মাথার উপর অতিক্রম করে না—একজন হইল, আপন মনিব হইতে পলাতক গোলাম। অপরজন হইল, ঐ মহিলা যে স্বামীর নাফরমানী করে।

(১৪) হযরত উম্মে উমারা (রাযিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত উম্মে উমারা আনসারিয়া (রাযিঃ) ঐ সকল মহিলাদের মধ্যে যাহারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হইয়াছেন এবং বাইয়াতে আকাবায় শরীক হইয়াছেন। 'আকাবা' অর্থ গিরিপথ। প্রথমতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে মুসলমান করিতেন। কারণ কাফের ও মুশরিকরা নতুন মুসলমানদেরকে কঠিন কষ্ট দিত। মদীনার কিছু লোক হজ্জের সময় আসিত এবং মীনার একটি গিরিপথে গোপনে মুসলমান হইত। তৃতীয় দফায় যাহারা মদীনা হইতে আসিলেন তাহাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হিজরতের পর যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল তখন তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে শরীক হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া উহুদ, হুদাইবিয়া, খাইবার, ওমরাতুল কাযা, হুনাইন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে। উহুদের যুদ্ধের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি মুসলমানদের অবস্থা দেখিবার জন্য পানির মশক ভরিয়া উহুদের দিকে চলিলাম। যদি কোন পিপাসিত এবং আহত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই তবে পানি পান করাইব। ঐ সময় তাহার বয়স ৪৩ বৎসর ছিল। তাঁহার স্বামী এবং দুইপুত্রও যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুসলমানদের বিজয় হইতেছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যখন কাফেরদের বিজয় প্রকাশ হইতে লাগিল তখন আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেলাম এবং যে কোন কাফের এইদিকে আসিত তাহাকে হটাইয়া দিতাম। প্রথম দিকে তাঁহার নিকট ঢালও ছিল না, পরে একটি ঢাল পাইলেন যাহা দ্বারা কাফেরদের হামলা প্রতিহত করিতেন। কোমরে একটি কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যাহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের কাপড়ের টুকরা ভর্তি ছিল। যখন কেহ আহত হইত একটি টুকরা বাহির করিয়া জ্বালাইয়া জখমে ভরিয়া দিতেন। তাহার নিজেরও বার তের জায়গায় জখম হয়, তন্মধ্যে একটি জখম মারাত্মক ছিল। উম্মে সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহার কাঁধে একটি গভীর ক্ষত দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিভাবে হইয়াছিল? বলিতে লাগিলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন লোকেরা পেরেশান হইয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল তখন ইবনে কামিয়্যা এই বলিয়া অগ্রসর হইল যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় আছে, কেহ আমাকে দেখাইয়া দাও। সে যদি আজ বাঁচিয়া যায় তবে আমার রক্ষা নাই। মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) এবং আরো কয়েকজন লোক তাহার মুকাবিলায় আসিয়া গেলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সে আমার কাঁধের উপর আঘাত করিল, আমিও তাহার উপর কয়েকবার আঘাত করিলাম। কিন্তু

তাহার শরীরে দুই পাল্লা বর্ম ছিল। এইজন্য বর্মের উপর আঘাত ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই ক্ষত এত মারাত্মক ছিল যে, পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা করিবার পরও ভাল হয় নাই। ঐ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল–আসাদ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়া দিলেন। উম্মে উমারা (রাযিঃ)ও কোমর বাধিয়া তৈয়ার হইয়া গেলেন কিন্তু যেহেতু পূর্বের জখম সম্পূর্ণ তাজা ছিল, এই কারণে শরীক হইতে পারিলেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হামরাউল আসাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন সর্বপ্রথম উম্মে উমারা (রাযিঃ)এর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সুস্থ আছেন জানিয়া খুবই খুশী হইলেন। উক্ত জখম ছাড়াও উহুদের যুদ্ধে আরো বহু জখম হইয়াছিল। উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, আসলে তাহারা ছিল ঘোড়সওয়ার আর আমরা ছিলাম পদাতিক। তাহারাও যদি আমাদের মত পদাতিক হইত তবেই তো সত্যিকার অর্থে মোকাবেলা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিত। যখন ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া কেউ আসিত এবং আমার উপর আঘাত করিত তখন আমি ঢালের সাহায্যে তাহার আঘাত ফিরাইতে থাকিতাম। আর যখন সে আমার দিক হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যাইত তখন আমি ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত করিতাম এবং ঘোড়ার পা কাটিয়া যাইত। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া যাইত, আরোহী ব্যক্তিও পড়িয়া যাইত। যখন সে পড়িয়া যাইত তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার ছেলেদেরকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি এবং তাহারা উভয়ে মিলিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম।

উম্মে উমারা (রাযিঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমার বাম বাহুতে আঘাত লাগিল এবং রক্ত বন্ধ হইতেছিল না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাতে পট্টি বাঁধিয়া দাও। আমার মা আসিয়া তাহার কোমর হইতে কিছু কাপড় বাহির করিয়া পট্টি বাঁধিলেন এবং পট্টি বাঁধিয়াই বলিতে লাগিলেন, কাফেরদের সহিত মোকাবিলা কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, হে উম্মে উমারা! তোমার মত এত সাহস কাহার আছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের জন্য কয়েকবার দোয়াও করিলেন এবং প্রশংসাও করিলেন। উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, ঐ মুহূর্তে এক কাফের সামনে আসিল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, এই সেই ব্যক্তি, যে তোমার ছেলেকে আহত করিয়াছে। আমি

অগ্রসর হইলাম এবং তাহার পায়ের গোছার উপর আঘাত করিলাম। ইহাতে সে আহত হইয়া সাথে সাথে বসিয়া পড়িল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, ছেলের প্রতিশোধ নিয়া নিলে। অতঃপর আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিলাম।

উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের জন্য দোয়া করিলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গ নসীব করেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার জন্য দোয়া করিলেন তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, দুনিয়াতে আমার উপর কি মুসীবত গিয়াছে, আমি এখন আর উহার কোন পরওয়া করি না।

উহুদ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং বীরত্ব দেখাইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মুর্তাদ হওয়ার হিড়িক পড়িয়া গেল এবং ইয়ামামায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। উহাতে উম্মে উমারা (রাযিঃ) শরীক ছিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহার একটি হাতও কাটিয়া গিয়াছিল। ইহাছাড়াও শরীরে এগারটি জখম হইয়াছিল। আর ঐ জখম লইয়াই তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিলেন। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ ইহা একজন মহিলার বীরত্ব, যাহার বয়স উহুদের যুদ্ধের সময় ছিল তেতাল্লিশ বছর। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। আর ইয়ামামার যুদ্ধের সময় তাহার বয়স প্রায় বায়ান্ন বছর। এই বয়সে এত যুদ্ধে এই রকম বীরত্বের সহিত অংশগ্রহণ করা কারামতই বলা যাইতে পারে।

(১৫) হযরত উম্মে হাকীম (রাযিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

উম্মে হাকীম বিনতে হারেস (রাযিঃ) যিনি ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের স্ত্রী ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হইতে উহুদের যুদ্ধেও শরীক হইয়াছিলেন। যখন মক্কা মুকাররমা বিজয় হয় তখন মুসলমান হইয়া যান। স্বামীর সহিত অত্যন্ত ভালবাসা ছিল কিন্তু তিনি তাহার পিতার প্রভাবের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং যখন মক্কা বিজয় হয় তখন ইয়ামন পালাইয়া গিয়াছিলেন। উম্মে হাকীম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার স্বামীর জন্য নিরাপত্তা চাহিলেন এবং নিজে ইয়ামন পৌছিলেন এবং স্বামীকে বহু কষ্টে মদীনায় আসিতে রাজী করিলেন। বলিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারি হইতে তাঁহার আঁচলেই আশ্রয় মিলিতে পারে। তুমি আমার সহিত চল। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় ফিরিয়া আসিয়া মুসলমান

হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুখে-শান্তিতে রহিলেন। পরে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে যখন রোমের যুদ্ধ হইল তখন সেই যুদ্ধে ইকরিমা (রাযিঃ) শরীক হইলেন এবং তাহার স্ত্রীও সাথে ছিলেন। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর খালেদ ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) উম্মে হাকীম (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন এবং ঐ সফরেই মারজুস-সাফফার নামক স্থানে বাসর যাপন করিতে চাহিলে উম্মে হাকীম (রাযিঃ) বলিলেন, এখনও শত্রুদের ভিড় রহিয়াছে ইহা শেষ হইতে দিন। স্বামী বলিলেন, এই যুদ্ধে আমার শহীদ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। ইহাতে তিনিও চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর সেখানেই এক মঞ্জিলে তাঁবুর ভিতর বাসর যাপন হইল। সকালে অলীমার আয়োজন মাত্র হইতেছিল এমন সময় রোম বাহিনী হামলা করিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। উহাতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) শহীদ হইলেন। উম্মে হাকীম (রাযিঃ) ঐ তাঁবুটি খুলিয়া ফেলিলেন যাহাতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন এবং নিজের সমস্ত আসবাবপত্র বাঁধিলেন আর তাঁবুর খুঁটি লইয়া নিজেও মোকাবিলা করিলেন এবং একাই সাতজনকে হত্যা করিলেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আমাদের যমানার কোন মহিলা তো দূরের কথা কোন পুরুষও এই রকম সময় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইত না। আর যদি বিবাহ হইয়াও যাইত তবে নাজানি এইভাবে হঠাৎ শহীদ হইয়া যাওয়ার কারণে কাঁদিতে কাঁদিতে কত দিন শোকে কাটাইয়া দিত। আল্লাহর এই বান্দী নিজেও জেহাদ শুরু করিয়া দিলেন এবং মহিলা হইয়াও সাতজনকে হত্যা করিলেন।

(১৬) হযরত সুমাইয়্যা উম্মে আম্মার (রাযিঃ)-এর শাহাদত

সুমাইয়্যা বিনতে খাইয়্যাত হযরত আম্মার (রাযিঃ)-এর মাতা ছিলেন। তাঁহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের ৭নং কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনিও তাহার পুত্র আম্মার (রাযিঃ) স্বামী হযরত ইয়াসির (রাযিঃ)এর মত ইসলামের খাতিরে বহু কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করিতেন। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত মহব্বত যাহা অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল উহাতে সামান্যতমও ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহাকে প্রচণ্ড গরমের সময় রৌদ্রের মধ্যে কংকরের উপর ফেলিয়া রাখা হইত। লোহার পোশাক পরাইয়া রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত যাহাতে রৌদ্রে লোহা গরম হইতে থাকে আর উহার গরমে কষ্ট আরো বেশী হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ পথে

যাইতেন তখন সবরের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করিতেন।

একবার হযরত সুমাইয়্যা (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া ছিলেন। আবু জাহল তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তাঁহাকে গালি-গালাজ করিল এবং রাগান্বিত হইয়া তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্শা মারিল। যাহার আঘাতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন। ইসলামের খাতিরে সর্বপ্রথম তিনিই শাহাদত বরণ করেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের এই পরিমাণ ধৈর্য হিম্মত ও দৃঢ়তা ঈর্ষাযোগ্য বিষয়। আসল ব্যাপার হইল, যখন মানুষের অন্তরে কোন বিষয় বসিয়া যায়, তখন তাহার জন্য সব কিছু সহজ হইয়া যায়। এখনও প্রেম ও ভালবাসার এমন বহু ঘটনা শুনা যায় যে, উহার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু এই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যদি আল্লাহর রাস্তায় হয়, দ্বীনের খাতিরে হয় তবে পরবর্তী জীবনে যাহা মৃত্যুর পরেই শুরু হইয়া যাইবে, সম্মান ও সফলতার কারণ হইবে। আর যদি দুনিয়ার কোন স্বার্থে হয় তবে দুনিয়া তো গেলই, আখেরাতও বরবাদ হইল।

(১৭) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ)-এর জীবন-যাপন ও অভাব-অনটন

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) যিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর কন্যা, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর মাতা এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সৎ বোন ছিলেন। প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবিয়াগণের মধ্যে ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সতেরজনের পর মুসলমান হইয়াছিলেন। হিজরতের সাতাইশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছিয়া গেলেন তখন হযরত যায়েদ (রাযিঃ) সহ কয়েকজনকে মক্কা হইতে উভয়ের পরিবারের লোকজনকে লইয়া আসার জন্য পাঠাইলেন। তাহাদের সহিত হযরত আসমা (রাযিঃ)ও চলিয়া আসিলেন। যখন কুবায় পৌঁছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর জন্ম হয়। হিজরতের পর সর্বপ্রথম তাঁহারই জন্ম হয়। তখনকার সময়ের ব্যাপক দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন যেমনই প্রসিদ্ধ ছিল তেমনি সেই যুগের হিম্মত কষ্ট সহিষ্ণুতা বীরত্ব সাহসিকতাও নজীরবিহীন ছিল।

বুখারী শরীফে হযরত আসমা (রাযিঃ)এর জীবন ধারণের অবস্থা তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুবাইরের সহিত যখন আমার

বিবাহ হইল তখন তাঁহার নিকট না মাল ছিল, না বিষয় সম্পত্তি, না কোন কাজের লোক ছিল, না অন্য কোন জিনিস। একটি উট ছিল পানি বহন করিয়া আনিবার জন্য, আর একটি ঘোড়া ছিল। আমিই উটের জন্য ঘাস ইত্যাদি যোগাড় করিয়া আনিতাম এবং খেজুরের বীচি চূর্ণ করিয়া খাদ্য হিসাবে খাওয়াইতাম। আমি নিজেই পানি বহন করিয়া আনিতাম এবং পানির ডোল ফাটিয়া গেলে নিজেই উহা সেলাই করিতাম। আর নিজেই ঘোড়ার খেদমত ঘাস, খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতাম। ঘরের সমস্ত কাজকর্মও নিজেই করিতাম। এই সব কাজের মধ্যে ঘোড়ার দেখাশুনা ও খেদমতই আমার জন্য বেশী কষ্টকর ছিল। রুটি অবশ্য আমি ভালরূপে তৈরী করিতে জানিতাম না। আটা খামির করিয়া প্রতিবেশী আনসারী মহিলাদের নিকট লইয়া যাইতাম। তাহারা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মহিলা ছিলেন। তাহারা আমার রুটিও তৈরী করিয়া দিতেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিয়া যুবাইর (রাযিঃ)কে একখণ্ড জমিন জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। উহা প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল। আমি সেখান হইতে খেজুরের বীচি মাথায় বহন করিয়া লইয়া আসিতাম। একবার আমি এইভাবে বোঝা মাথায় করিয়া আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি উটের উপর আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন। আনসারদের একটি দল সঙ্গে ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া উট থামাইলেন এবং উহাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে আমি উহার উপর আরোহণ করি। পুরুষদের সহিত যাইতে আমার লজ্জাবোধ হইল। আর ইহাও মনে পড়িল যে, যুবাইর (রাযিঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশী—তাহার নিকটও হয়ত ইহা অপছন্দনীয় হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আমি উহার উপর আরোহণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া গেলেন। আমি ঘরে আসিলাম, যুবাইর (রাযিঃ)কে ঘটনা শুনাইলাম যে, এইভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং ইহাও বলিলেন যে, আমার লজ্জাবোধ হইল আর তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথাও মনে পড়িল। যুবাইর (রাযিঃ) বলিলেন, খোদার কসম, তোমার খেজুরের বীচির বোঝা মাথায় বহন করা আমার কাছে উহার চাইতেও বেশী কষ্টদায়ক। (কিন্তু ইহা অপারগতার কারণে ছিল। কেননা তাঁহারা অধিকাংশ সময় জেহাদে এবং অন্যান্য দ্বীনিকাজে ব্যস্ত

থাকিতেন এই জন্যই সাধারণতঃ মেয়েলোকদেরকেই ঘরের কাজকর্ম করিতে হইত।)

ইহার পর আমার পিতা আবু বকর (রাযিঃ) আমার জন্য একজন খাদেম যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, পাঠাইয়া দিলেন। ফলে ঘোড়ার খেদমত হইতে আমি রেহাই পাইলাম, মনে হইল যেন কঠিন বন্দীদশা হইতে আমি মুক্ত হইয়া গেলাম। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ প্রাচীনকালেও আরবের নিয়ম ছিল এবং এখনও রহিয়াছে যে, তাহারা খেজুরের দানা চূর্ণ করিয়া অথবা যাঁতায় পিষিয়া পানিতে ভিজাইয়া খাদ্য হিসাবে পশুকে খাওয়াইয়া থাকে।

(১৮) হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর সমস্ত মাল লইয়া যাওয়া এবং হযরত আসমা (রাযিঃ)এর নিজের দাদাকে সান্ত্বনা দান করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর হিজরতের সময় যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সঙ্গে ছিলেন সেহেতু তিনি পথিমধ্যে প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া পাঁচ ছয় হাজার দেরহাম পরিমাণ যাহা ঐ সময় মওজুদ ছিল সমুদয় মাল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর অন্ধ পিতা যিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না, নাতনীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আসিলেন এবং আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমার ধারণা হয় যে, আবু বকর (রাযিঃ) তাহার চলিয়া যাওয়ার ব্যথাও তোমাদেরকে দিয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত মালও লইয়া গিয়াছে। ইহা আরেকটি কষ্ট তোমাদের উপর চাপাইয়া গিয়াছে।

আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না দাদা, আব্বা তো বহু কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া আমি ছোট ছোট পাথর জমা করিয়া ঘরের ঐ তাকের মধ্যে ভরিলাম যেখানে আবু বকর (রাযিঃ)এর দেরহামসমূহ পড়িয়া থাকিত। তারপর ঐগুলি একটি কাপড় বিছাইয়া দিয়া ঐ কাপড়ের উপর দাদার হাত রাখিয়া দিলাম যাহা দ্বারা তিনি অনুমান করিলেন যে, তাকটি দেরহামে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, যাহা হউক ইহা সে ভাল করিয়াছে। তোমাদের চলার ব্যবস্থা ইহা দ্বারা হইয়া যাইবে। আসমা (রাযিঃ) বলেন, খোদার কসম, তিনি কিছুই রাখিয়া গিয়াছিলেন না, কিন্তু আমি দাদার সান্ত্বনার জন্য এই পন্থা

অবলম্বন করিয়াছিলাম যাহাতে তিনি উহার কারণে মনক্ষুন্ন না হন।

(মুসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল হিম্মত ও মনোবলের বিষয় ; নতুবা দাদার তুলনায় ঐ মেয়েদেরই বেশী ব্যথিত হওয়ার কথা ছিল আর ঐ মুহূর্তে দাদার কাছে যতই অভিযোগ করিত উহা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা ঐ সময় বাহ্যিকভাবে তাহার উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং দৃশ্যত তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করারও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কারণ, একে তো পিতার বিচ্ছেদ দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবন ধারণের কোন ব্যবস্থাও নাই। উপরন্তু মক্কাবাসীরা সকলে শত্রু ও নিঃসম্পর্ক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পুরুষ হউক বা মহিলা এক একটি গুণ এমন দান করিয়াছিলেন যাহা ঈর্ষা করার মতই ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রথমে অত্যন্ত ধনী এবং অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম এবং আল্লাহর পথে এমন খরচ করিয়াছেন যে, তবুকের যুদ্ধে ঘরে যাহা কিছু ছিল সবকিছুই আনিয়া দিয়াছিলেন। যেমন ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ নম্বর ঘটনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কাহারো মাল দ্বারা এত উপকৃত হই নাই যত আবু বকরের মাল দ্বারা উপকৃত হইয়াছি। আমি সকলের এহসান ও উপকারের বিনিময় দিয়াছি কিন্তু আবু বকরের এহসানের বিনিময় আল্লাহ তায়ালাই দিবেন।

(১৯) হযরত আসমা(রাযিঃ)এর দানশীলতা

হযরত আসমা (রাযিঃ) বড় দানশীলা ছিলেন। প্রথমে তিনি যাহা কিছূ খরচ করিতেন আনুমানিক হিসাব করিয়া খরচ করিতেন, কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, বাঁধিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে না এবং হিসাব করিবে না সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করিতে থাক। তারপর খুব খরচ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন কন্যাদিগকে এবং ঘরের অন্যান্য মহিলাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে এবং সদকা করিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার এবং বাঁচিয়া যাওয়ার অপেক্ষা করিও না। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার অপেক্ষা করিতে থাক তবে তাহা কখনও হইবার নহে। (কেননা প্রয়োজন স্বয়ং বাড়িতে থাকে।) আর যদি সদকা করিতে থাক তবে সদকার মধ্যে খরচ করিয়া দেওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত থাকিবে না। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ এই সকল ব্যক্তির যত অভাব ও দরিদ্রতা ছিল ততই

দান-খয়রাত এবং আল্লাহর পথে খরচ করিবার ব্যাপারে উদারতা ও প্রশস্ততা ছিল। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অভাব-অনটনের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এমন কোন দল কি পাওয়া যাইবে, যাহারা পেটে পাথর বাঁধিয়া জীবন ধারণ করে অথবা তাহাদের উপর একাধারে কয়েক দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়া যায়?

(২০) হুযূর (সাঃ)এর কন্যা হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর হিজরত ও ইন্তেকাল

দোজাহানের সরদার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েদের মধ্যে সবার বড় হযরত যয়নাব (রাযিঃ) নবুওতের দশ বছর পূর্বে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ত্রিশ বছর ছিল জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবী-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হিজরতের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সহিত অংশগ্রহণ করে এবং বন্দী হয়। মক্কাবাসীরা যখন তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য মুক্তিপণ পাঠায় তখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)ও তাহার স্বামীর মুক্তির জন্য মাল পাঠান। তন্মধ্যে ঐ হারটিও ছিল যাহা হযরত খাদীজা (রাযিঃ) মেয়েকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহা দেখিলেন তখন হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল এবং তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। অতঃপর সাহাবা (রাযিঃ)দের সহিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে এই শর্তে ছাড়িয়া দিয়া দেওয়া হইবে যে, সে ফিরিয়া যাইয়া যয়নাব (রাযিঃ)কে মদীনা তাইয়্যেবায় পাঠাইয়া দিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নাবকে আনিবার জন্য দুইজন লোককে সঙ্গে করিয়া দিলেন যে, তাহারা মক্কার বাহিরে অবস্থান করিবে আর আবুল আস যয়নাবকে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

সুতরাং হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাহার দেবর কেনানার সহিত উটের উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। কাফেররা যখন ইহা জানিতে পারিল তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একদল বাধা দেওয়ার জন্য পৌঁছিয়া গেল। যাহাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর চাচাত ভাইয়ের ছেলে হুবার ইবনে আসওয়াদ ছিল। এই হিসাবে হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ভাই হইল। সে এবং তাহার সহিত আরো এক ব্যক্তি ছিল। তাহাদের উভয়ের

মধ্য হইতে কোন একজন আর অধিকাংশের মতে হুবার হযরত যয়নাব (রাযিঃ)কে বর্শা নিক্ষেপ করিল যাহার ফলে তিনি আহত হইয়া উট হইতে পড়িয়া গেলেন। যেহেতু তিনি গর্ভবতী ছিলেন এই কারণে গর্ভপাতও হইয়া গেল। কেনানা তীরের সাহায্যে মোকাবেলা করিল। আবু সুফিয়ান তাঁহাকে বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কন্যা হইয়া এইভাবে প্রকাশ্যে চলিয়া যাইবে ইহা বরদাশত করিবার মত নয়। এখন ফিরিয়া যাও অন্য সময় গোপনে পাঠাইয়া দিও। কেনানা মানিয়া নিল এবং ফিরিয়া আসিল। দুই-একদিন পর আবার রওয়ানা হইলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর এই জখম কয়েক বৎসর পর্যন্ত থাকিল এবং কয়েক বৎসর ইহাতে অসুস্থ থাকিয়া ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, সে আমার সবচেয়ে ভাল মেয়ে ছিল। কারণ, আমার মহব্বতের কারণে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। দাফনের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কবরে নামিলেন এবং দাফন করিলেন। কবরে নামিবার সময় তিনি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। যখন উঠিয়া আসিলেন তখন চেহারা উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যয়নাবের দুর্বলতার ব্যাপারে আমার চিন্তা ছিল। আমি দোয়া করিলাম, কবরের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা হইতে যেন তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহা কবুল করিয়াছেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ; আবার দ্বীনের খাতিরে এত কষ্ট উঠাইলেন যে, ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণও করিলেন তারপরও কবরের সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার প্রয়োজন হইল। সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো প্রশ্নই উঠে না ! এইজন্য মানুষকে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে মুক্তির জন্য দোয়া করা উচিত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে পানাহ চাহিতেন। হে আল্লাহ ! আমাদিগকে আপন অনুগ্রহে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন।

(২১) হযরত রুবাইয়্যি বিনতে মুওয়াওয়েজ (রাযিঃ)-এর দ্বীনী মর্যাদাবোধ

রুবাইয়্যি বিনতে মুওয়াওয়েজ (রাযিঃ) একজন আনসারী মহিলা সাহাবিয়া ছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং নিহত ও শহীদদের লাশ উঠাইয়া আনিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার ঘরে গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকটি বালিকা আনন্দ ও খুশিতে কবিতা পাঠ করিতেছিল উহাতে আনসারদের ইসলামী কৃতিত্ব ও তাহাদের বড়দের আলোচনা ছিল যাহারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন এই চরণও পাঠ করিল— وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ অর্থাৎ, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রহিয়াছেন, যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পড়িতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ ভবিষ্যতের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।

রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর পিতা মুয়াওয়েয আবু জাহ্‌লের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আসমা নাম্নী এক মহিলা যে আতর বিক্রয় করিত। সে একবার আরো কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া হযরত রুবাইয়্যি (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে গেল এবং মহিলাদের অভ্যাস অনুযায়ী সে তাহার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিয়া দিলেন। তাহার পিতার নাম শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, আচ্ছা, তুমি আপন সরদারের হত্যাকারীর মেয়ে? যেহেতু আবু জাহলকে আরবদের সরদার গণ্য করা হইত এইজন্য আপন সরদারের হত্যাকারী বলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর রাগ উঠিয়া গেল এবং বলিতে লাগিলেন যে, আমি আপন গোলামের হত্যাকারীর মেয়ে। আবু জাহলকে আপন পিতার সরদার বলিতে শুনিয়া রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধে লাগিল এইজন্য তিনি আপন গোলাম শব্দ বলিয়াছেন। আবু জাহল সম্পর্কে গোলাম শব্দ শুনিয়া আসমার খুব গোস্বা হইল। সে বলিতে লাগিল যে, তোমার কাছে আতর বিক্রয় করা আমার জন্য হারাম। রুবাইয়্যি (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জন্যও তোর নিকট হইতে আতর ক্রয় করা হারাম। আমি তোর আতর ব্যতীত আর কাহারও আতরে নাপাকী ও দুর্গন্ধ দেখি নাই।(উঃ গাবা)

ফায়দা ঃ রুবাইয়্যি (রাযিঃ) বলেন, 'দুর্গন্ধ' শব্দটি আমি তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। ইহা ছিল দ্বীনি মর্যাদাবোধ যে, দ্বীনের এতবড় শত্রু সম্পর্কে সরদার শব্দ ব্যবহার করা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আজকাল দ্বীনের বড় বড় দুশমনদের ক্ষেত্রেও ইহার চেয়ে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর কেহ যদি নিষেধ করে তবে

তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা মুনাফেককে সরদার বলিও না। যদি সে তোমাদের সরদার হইয়া থাকে তবে তোমরা আপন রবকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ। (আবূ দাঊদ)

জ্ঞাতব্য বিষয়

হুযূর (সঃ)এর বিবিগণ ও সন্তানগণ

আপন মনিব ও দুজাহানের সরদার হুযূর আকরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তানদের অবস্থা জানার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার আর প্রত্যেক মুসলমানের হওয়াও চাই। তাই তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা লেখা হইতেছে। কেননা, বিস্তারিত অবস্থা আলোচনার জন্য বিরাট কিতাবের প্রয়োজন। মুহাদ্দিসীন এবং ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ এগার জন মহিলার সহিত হইয়াছে। ইহার বেশী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। আর এই ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, সর্বপ্রথম বিবাহ হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছে যিনি বিধবা ছিলেন। ঐ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর আর হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) ছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজা (রাযিঃ) হইতে হইয়াছে। যাহাদের বিবরণ পরে আসিবে।

(১) হযরত খাদীজা (রাযিঃ)

হযরত খাদীজা (রাযিঃ)–এর বিবাহের সর্বপ্রথম প্রস্তাব ওরাকা বিন নাউফালের সহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ইহার পর দুই ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। তবে উক্ত দুইজনের মধ্যে প্রথমে কাহার সহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে সর্বপ্রথম আতীক বিন আয়েযের সহিত বিবাহ হয়। যাহার ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল হিন্দ। তিনি বড় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সন্তানের জননীও হন। আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, আতীকের ঔরসে একটি ছেলেও জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ বা আবদে মানাফ।

আতীকের পর পুনরায় হযরত খাদীজা (রাযিঃ)–এর বিবাহ আবু হালার সহিত হয়। তাহার ঔরসে হিন্দ ও হালা নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ

করে। অধিকাংশের মতে উভয়ই পুত্র সন্তান ছিল। আবার কাহারও মতে হিন্দ পুত্র ছিল হালা কন্যা ছিলেন। হিন্দ হযরত আলী (রাযিঃ)এর খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবু হালার ইন্তিকালের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহ হয়। ঐ সময় হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। পঁচিশ বছর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীন থাকিয়া নবুয়তের ১০ম বৎসর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। ইসলামের পূর্ব হইতেই তাঁহার উপাধি ছিল তাহেরা (পবিত্র)। এইজন্য অন্যান্য স্বামীর ঔরসে তাঁহার যেসব সন্তান জন্মলাভ করে তাহাদিগকে 'বনু তাহেরা' বলা হয়।

হাদীসের কিতাবসমূহে তাহার বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ইন্তিকালের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহার কবরে অবতরণ করিয়া তাহাকে দাফন করিয়াছিলেন। তখনও জানাযার নামাযের প্রথা শরীয়তে চালু হইয়াছিল না।

তাহার ইন্তিকালের পর ঐ বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হযরত সাওদা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। উহাদের মধ্যে কাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর বিবাহ প্রথমে আর কাহারও মতে হযরত সাওদা (রাযিঃ)–এর সহিত প্রথমে হইয়াছে এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর সহিত পরে হইয়াছে।

(২) হযরত সাওদা(রাযিঃ)

হযরত সাওদা (রাযিঃ)ও বিধবা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যামআ ইবনে কাইস। প্রথমে হযরত সাওদা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল চাচাত ভাই সাকরান ইবনে আমরের সহিত। উভয় মুসলমান হন এবং হিজরত করিয়া হাবশায় চলিয়া যান। অতঃপর হাবশায় সাকরানের ইন্তিকাল হইয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মক্কায় ফিরিয়া আসিবার পর ইন্তিকাল হয়। তাহার ইন্তিকালের পর নবুয়তের দশম বৎসর হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহার সহিত বিবাহ হয়। আর সকলের মতে তাঁহার রোখসতি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর রোখসতির পূর্বেই হইয়াছে।

অধিক পরিমাণে নামাযে মশগুল থাকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলই। একবার তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন যে, রাত্রে আপনি এত দীর্ঘ রুকু করিয়াছেন যে, আমার নাক হইতে রক্ত বাহির হওয়ার আশংকা হইয়া গেল। (তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলেন। যেহেতু ভারী শরীরের ছিলেন সেহেতু সম্ভবত বেশী কষ্ট হইয়াছিল।)

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামীর খাহেশ নাই। কিন্তু বেহেশতে আপনার বিবিদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার আকাংখা রাখি, তাই আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। আমি আমার পালা আয়েশা (রাযিঃ)কে দিয়া দিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা কবুল করিয়া নিলেন। আর এই কারণে তাঁহার পালার দিন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর ভাগে আসিয়া যায়।

৫৪ অথবা ৫৫ হিজরীতে এবং কাহারও মতে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলের শেষ ভাগে ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছাড়াও সওদা নামে কোরাইশ বংশীয় আরও একজন মহিলা ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি আরয করিলেন যে, আপনি সমগ্র দুনিয়াতে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তবে আমার পাঁচ–ছয়জন সন্তান রহিয়াছে। আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তাহারা আপনার শিয়রের নিকট বসিয়া কান্নাকাটি করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা পছন্দ করিলেন ও তাহার প্রশংসা করিলেন এবং বিবাহের ইচ্ছা মুলতবী করিয়া দিলেন।

(৩) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সহিতও হিজরতের পূর্বে নুবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসে মক্কা মোকাররমায় বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল ছয় বৎসর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে শুধু তিনিই এমন ছিলেন যাহার সহিত কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়। আর অন্যান্য সবার সহিত বিধবা অবস্থায় বিবাহ হয়। নবুওয়তের চার বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর যখন তাহার বয়স নয় বৎসর ছিল তখন তাহার রোখসতী হয় এবং ১৮ বছর বয়সের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় আর ৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে ১৭ই রমযান মঙ্গলবার রাত্রে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। তিনি নিজেই অসিয়ত

করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে যেন সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হয় যেখানে অন্যান্য বিবিদেরকে দাফন করা হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হুজরা শরীফে দাফন করিবে না। সুতরাং তাঁহাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

আরবে প্রচলিত ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ অশুভ হয়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার বিবাহও হইয়াছে শাওয়াল মাসে এবং আমার রোখসতীও হইয়াছে শাওয়াল মাসে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে আমার চাইতে ভাগ্যবতী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার চাইতে অধিক প্রিয় কে ছিল?

হযরত খাদীজা (রাযিঃ)–এর ইন্তিকালের পর খাওলা বিনতে হাকীম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিবাহ করিবেন না? তিনি বলিলেন, কাহাকে? খাওলা বলিল, কুমারীও আছে বিধবাও আছে যাহাকে আপনি পছন্দ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুমারী হইল আপনার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর কন্যা আয়েশা (রাযিঃ) আর বিধবা হইল সাওদা বিনতে যামআ (রাযিঃ)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে আলোচনা করিয়া দেখ। তিনি সেইখান হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ঘরে আসিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে রোমানকে বলিলেন যে, আমি একটি বড় কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। উম্মে রোমান (রাযিঃ) বলিলেন, সে তো তাঁহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে বিবাহ হইতে পারে? ঠিক আছে আবু বকর (রাযিঃ)কে আসিতে দাও। ঐ সময় হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ঘরে ছিলেন না। তিনি ঘরে আসিলে তাঁহার সহিতও এই বিষয় আলোচনা করিলেন। তিনিও একই কথা বলিলেন, সে তো তাহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে বিবাহ হইতে পারে? খাওলা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া এইকথা শুনাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে আমার ইসলামী ভাই। তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ জায়েয আছে। খাওলা (রাযিঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত আবু বকর

(রাযিঃ)কে এইকথা শুনাইলেন। সেখানে আর দেরীর কি ছিল? তৎক্ষণাৎ বলিলেন, যাও তাঁহাকে লইয়া আস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ লইয়া গেলেন এবং বিবাহ হইয়া গেল। হিজরতের কয়েক মাস পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিলেন, আপনি আপনার স্ত্রী আয়েশাকে কেন উঠাইয়া নিতেছেন না? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকার কথা জানাইলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কিছু হাদিয়া পেশ করিলেন যাহা দ্বারা ব্যবস্থা হইয়া গেল। ১ম বা ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে চাশতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ঘরেই রোখসতী হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তিনটি বিবাহ হিজরতের পূর্বে হইয়াছে, বাকী সব বিবাহ হিজরতের পরে হইয়াছে।

(৪) হযরত হাফসা(রাযিঃ)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর পর হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। হযরত হাফসা (রাযিঃ) নবুওতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ মক্কাতেই খুনাইস ইবনে হুযায়ফা (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনিও প্রবীণ মুসলমান। প্রথমে আবিসিনিয়া অতঃপর মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ যুদ্ধেই অথবা উহুদের যুদ্ধে এমনভাবে আহত হইলেন যে, উহা হইতে আর আরোগ্য লাভ করিলেন না এবং ২য় বা ৩য় হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ)ও তাহার স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবাতেই আসিয়া গিয়াছিলেন। যখন বিধবা হইয়া গেলেন তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রথম হযরত আবুবকর (রাযিঃ)–এর নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, আমি হাফসা (রাযিঃ)এর বিবাহ আপনার সহিত করিতে চাহিতেছি। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কিছু না বলিয়া নিরব থাকিলেন। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)–এর বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইল তখন হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই মুহূর্তে আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি হাফসার জন্য

উছমানের চাইতে উত্তম স্বামী এবং উছমানের জন্য হাফসার চাইতে উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করিতেছি। অতঃপর ২য় বা ৩য় হিজরীতে হযরত হাফসাকে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করিলেন এবং হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বিবাহ আপন কন্যা উম্মে কুলছুমের সহিত করিয়া দিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর প্রথম স্বামী কখন ইন্তিকাল করিয়াছেন সেই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে যে, বদরের যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে শহীদ হইয়াছেন, না উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন। বদরের যুদ্ধ হইয়াছে ২য় হিজরীতে আর উহুদের যুদ্ধ হইয়াছে ৩য় হিজরীতে। এই কারণে তাহার বিবাহের ব্যাপারেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, যখন তুমি হাফসা (রাযিঃ)এর বিবাহের আলোচনা করিয়াছিলে তখন আমি নিরব থাকিয়াছিলাম। ইহাতে তুমি হয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে কিন্তু যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবাহের বিষয় আমার নিকট আলোচনা করিয়াছিলেন এইজন্য আমি না কবুল করিতে পারিতেছিলাম আর না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় প্রকাশ করিতে পারিতেছিলাম। এইজন্য আমি নিরবতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতেন তবে আমি অবশ্যই বিবাহ করিতাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আবু বকর (রাযিঃ)এর নীরবতা আমার নিকট উছমান (রাযিঃ)এর অস্বীকৃতি হইতেও দুঃখজনক ছিল।

হযরত হাফসা (রাযিঃ) অত্যন্ত এবাদত গুজার ছিলেন। অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণ করিতেন, দিনের বেশীর ভাগ রোযা রাখিতেন। কোন কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক তালাকও দিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত উমর (রাযিঃ)এর অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। আর এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত জিবরাইল (আঃ) আসিয়া আরজ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এই যে, আপনি হাফসাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিন। কারণে সে বড় রাত্রি জাগরণকারী ও অধিক পরিমাণে রোযা রাখিয়া থাকে। অপরদিকে হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খাতির করাও উদ্দেশ্য ছিল, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিলেন।

৪৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ৪১ হিজরীতে ৬০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৫) হযরত যয়নাব (রাযিঃ)

হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া- সাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাঁহার পিতার নাম খুযাইমা। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)-এর প্রথম বিবাহ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি যখন উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। যাহা ৭ম অধ্যায়ের ১ম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। তখন হুযূর (সাঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কেহ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তোফাইল ইবনে হারেছের সহিত। সে তালাক দিয়া দিলে তাঁহার ভাই উবাইদা ইবনে হারেছ (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। যিনি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সহিত হিজরতের একত্রিশ মাস পর ৩য় হিজরীর রমযান মাসে বিবাহ হয়। আটমাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে থাকিয়া ৪র্থ হিজরীর রবিউস সানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ও হযরত যয়নব (রাযিঃ) এই দুইজনই শুধু এমন ছিলেন, যাহাদের ইন্তেকাল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হইয়াছে। বাকী ৯ জন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় জীবিত ছিলেন, যাহারা পরে ইন্তেকাল করেন। হযরত যয়নব (রাযিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। এইজন্য ইসলামের পূর্বেও তাহার নাম উম্মুল মাসাকীন (গরীবের মা) ছিল।

(৬) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)

হযরত যয়নাব (রাযিঃ)-এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর সহিত হয়। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) আবু উমাইয়ার কন্যা ছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ আপন চাচাত ভাই আবু সালামা (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে যাওয়ার পর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যাহার নাম সালামা ছিল। আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করেন। ইহার বিস্তারিত বিষয় এই অধ্যায়ের ৫নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। মদীনায় পৌঁছার

পর একটি পুত্রসন্তান ওমর (রাযিঃ) ও দুইটি কন্যাসন্তান দুররা ও যয়নাব জন্মগ্রহণ করে। আবু সালামা (রাযিঃ) দশজনের পর মুসলমান হইয়াছিলেন। বদর এবং উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের যুদ্ধে একটি আঘাত লাগিয়াছিল যাহার দরুন খুব যন্ত্রণা ভোগ করেন। অতঃপর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে একটি যুদ্ধে গমন করেন। ফিরার সময় উক্ত ক্ষত পুনরায় তাজা হইয়া উঠিল এবং ঐ অবস্থায় ৪র্থ হিজরীতে ৮ই জুমাদাস সানী মাসে ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) ঐ সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। যয়নাব তাঁহার গর্ভে ছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে উম্মে সালামা (রাযিঃ)–এর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাকে বিবাহ করার আগ্রহ করিলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করিলেন। ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, আমার সন্তান–সন্ততিও রহিয়াছে অপর দিকে আমার স্বভাবে আত্মগর্বও খুব বেশী। আর আমার কোন ওলী বা অভিভাবকও এখানে নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সন্তানদের হেফাজতকারী আল্লাহ। আর এই আত্মগর্বও ইনশাআল্লাহ দূর হইয়া যাইবে। আর তোমার কোন অভিভাবক ইহা অপছন্দ করিবেন না। তখন তিনি আপন পুত্র সালামাকে বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দাও। ৪র্থ হিজরীতে শাওয়াল মাসের শেষ ভাগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কেহ ৩য় হিজরীতে, আর কেহ ২য় হিজরীতে লিখিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি কোন মুসীবতে পড়িয়া এই দোয়া করে—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا "হে আল্লাহ! আমাকে এই মুসীবতে ছাওয়াব দান করুন এবং ইহার উত্তম বদলা আমাকে দান করুন।"

তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকো সর্বোত্তম বদলা দান করেন। আবু সালামা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর আমি এই দোয়া পড়িতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে, আবু সালামার চাইতে উত্তম ব্যক্তি আর কে হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, তাহার রূপের খুব খ্যাতি ছিল। বিবাহের পর আমি লুকাইয়া কোন এক বাহানায় যাইয়া তাঁহাকে

দেখিলাম। যেমন শুনিয়াছিলাম তাহার চাইতে বেশী পাইলাম। আমি হাফসার নিকট ইহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, না, যত ছড়াইয়াছে তত রূপসী নয়। ৫৯ বা ৬২ হিজরীতে উম্মুল মো'মেনীনদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৪ বৎসর। এই হিসাবে তাঁহার জন্ম নবুওতের প্রায় নয় বছর পূর্বে হইয়াছে। হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর তাহার সহিত বিবাহ হয় এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি পাত্রে কিছু যব, একটি জাঁতা এবং পাতিলও দেখিতে পান। তিনি স্বয়ং যব পিষিয়া চর্বি ঢালিয়া হালুয়া জাতীয় একপ্রকার খাবার তৈরী করিলেন এবং প্রথম দিনেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ খাবার খাওয়াইলেন যাহা বিবাহের দিন নিজ হাতে তিনি পাকাইয়াছিলেন।

(৭) হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিঃ)

হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ)এর সহিত করিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তাঁহাকে তালাক দেওয়ার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ করাইয়া দেন। সূরায়ে আহযাবেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বিবাহ হয় ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসে। কোন কোন বর্ণনায় ৩য় হিজরীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তবে ৫ম হিজরীর বর্ণনাই সঠিক। এই হিসাবে তাঁহার জন্ম হইয়াছে নবুওতের ১৭ বছর পূর্বে। তাহার এই বিষয়ে গর্ব ছিল যে, সকল বিবিগণের বিবাহের ব্যবস্থা তাহাদের অভিভাবকরা করিয়াছেন আর তাহার বিবাহের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) যখন তাঁহাকে তালাক দিলেন এবং ইদ্দত অতিবাহিত হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত পরামর্শ না করা পর্যন্ত কিছুই বলিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি অযু করিয়া নামাযের নিয়ত করিলেন এবং এই দোয়া

করিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন। আমি যদি তাঁহার উপযুক্ত হই তবে আমার বিবাহ তাঁহার সহিত করাইয়া দিন।"

এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআনে শরীফের আয়াত নাযিল হইল—فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ পাঠাইলেন, হযরত যয়নাব খুশীতে সেজদায় পড়িয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত তাঁহার বিবাহের ওলীমা করিলেন। ছাগল জবাই করিয়া রুটি-গোশতের দাওয়াত করিলেন। এক একদলকে ডাকা হইত এবং তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে আরেক দলকে ডাকা হইত। এইভাবে সবাই পেট ভরিয়া খানা খাইলেন।

হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ও পরিশ্রমী ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহা সদকা করিয়া দিতেন। তাঁহার ব্যাপারেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম আমার সহিত সেই মিলিত হইবে যাহার হাত লম্বা হইবে। এই কথা শুনিয়া বিবিগণ সবাই বাহ্যিক লম্বা হওয়া মনে করিয়া কাঠ লইয়া সকলের হাত মাপিতে শুরু করিলেন। দেখিতে হযরত সাওদা (রাযিঃ)এর হাত সবচেয়ে লম্বা প্রমাণিত হইল। কিন্তু যখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল সর্বপ্রথম হইল তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়া বলিতে অধিক সদকা ও দান করাকে বুঝানো হইয়াছে। তিনি অনেক বেশী রোযাও রাখিতেন। ২০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইয়াছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৫০ বৎসর। তাহার সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ১০নং ঘটনাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাযিঃ)

হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিঃ)এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ ইবনে আবি যেরার (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনি মুরাইসীর যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং গনীমতের অংশ হিসাবে হযরত কাইস ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পূর্বে মুসাফে ইবনে সাফওয়ানের বিবাহাধীন ছিলেন। হযরত ছাবেত (রাযিঃ) নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দেন। মুকাতাব ঐ গোলাম

অথবা বাঁদীকে বলা হয় যাহার সহিত এই চুক্তি করা হয় যে, তুমি যদি আমাকে এত মূল্য দিতে পার তবে তুমি আযাদ বা মুক্ত হইয়া যাইবে। এক উকিয়া চল্লিশ দেরহামের সমান। এক দেরহাম হইল, প্রায় সাড়ে তিন আনা। এই হিসাবে নয় উকিয়া ৭৮ ভরি ১২ আনার সমান হয়। আর যদি এক দেরহাম চার আনা সমান হয় তবে নয় উকিয়া ৯০ ভরির সমান হয়।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপন গোত্রের সর্দার হারেছের কন্যা জুওয়াইরিয়া। আমার উপর যে মুসীবত আসিয়াছে তাহা আপনি জানেন। এই পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে আমি মুকাতাব হইয়াছি। উহা পরিশোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তাই আপনার খেদমতে সাহায্যের আশা লইয়া আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে ইহার চাইতেও উত্তম পন্থা বলিতেছি। আমি অর্থ পরিশোধ করিয়া তোমাকে আযাদ (মুক্ত) করিয়া দিব এবং তোমাকে বিবাহ করিয়া লইব। তাহার জন্য ইহার চাইতে উত্তম পন্থা আর কি ছিল। তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া লইলেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ৫ম হিজরীতে আর কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, বনু মুসতালেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরালয় হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা এই আত্মীয়তার সম্মানার্থে নিজ নিজ গোলামদেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বলা হয় যে, শুধু হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ)এর কারণে একশ' পরিবার মুক্ত হইয়া যায়, যাহাতে প্রায় সাতশ' লোক ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বিবাহের মধ্যেও এই ধরনের কল্যাণ নিহিত ছিল।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। চেহারায় লাবণ্যতা ছিল। বর্ণিত আছে, তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িলে আর উঠিত না। হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) এই যুদ্ধের তিন দিন আগে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনা হইতে একটি চাঁদ চলিতে চলিতে আমার কোলের মধ্যে আসিয়া গেল। তিনি বলেন, আমি যখন বন্দী হই তখন আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হওয়ার আশা করিতেছিলাম। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল ২০ বছর। বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তিনি ৫০ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মদীনা তাইয়্যেবাতে ইন্তিকাল করেন। কাহারো মতে ৫৬ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

(৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে রামলাহ আর কাহারও মতে হিন্দ। তাহার প্রথম বিবাহ উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের সহিত মক্কা মুকাররমাতে হইয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উভয়ই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়া স্বামী খৃষ্টান হইয়া যায়। কিন্তু হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ইসলামের উপর অটল থাকেন। তিনি ঐ রাত্রেই স্বপ্নযোগে স্বামীকে অত্যন্ত কুৎসিত অবস্থায় দেখিতে পান। ভোরে জানিতে পারিলেন যে, সে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ একাকী অবস্থায় তাহার উপর কি অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আনিয়া তাঁহাকে উহার উত্তম বদলা দান করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশীর নিকট এই বার্তা পাঠাইলেন যে, তাহার বিবাহ আমার সহিত করিয়া দাও। বাদশাহ আবরাহা নাম্নী এক মহিলাকে উক্ত পয়গাম দিয়া তাহার খবর লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহা শুনামাত্র তিনি আনন্দে উভয় হাতে যে চুড়ি পরিহিত ছিলেন উহা তাহাকে দিয়া দিলেন এবং পায়ের খাড়ু ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন। নাজাশী বিবাহ সম্পাদন করিয়া দিলেন এবং নিজের পক্ষ হইতে চারশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) মহর স্বরূপ আদায় করিলেন। আরো বহু জিনিস দিলেন। যাহারা বিবাহের মজলিশে উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকেও স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন ও খানা খাওয়াইলেন। অধিকাংশের মতে তাঁহার বিবাহ ৭ম হিজরীতে হইয়াছে আর কাহারও কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হইয়াছে। তারিখে খামীস নামক কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, তাহার বিবাহ ৬ষ্ঠ হিজরীতে হইয়াছে এবং ৭ম হিজরীতে মদীনায় পৌঁছার পর রোখসতী হইয়াছে।

নাজাশী বিবাহের পর বহু খুশবো দ্রব্য এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ও যৌতুক ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইয়া দেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থ এবং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর এই বিবাহ তাঁহার পিতা সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা তাঁহার পিতা তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না। তিনি এই ঘটনার পর মুসলমান হইয়াছেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর একটি ঘটনা এই অধ্যায়ের ৯ নম্বরে বর্ণিত

হইয়াছে। তাঁহার ইন্তেকাল সম্পর্কে বহু মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪৪ হিজরীতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ৪২ হিজরী, ৫৫ হিজরী, ৫০ হিজরী ইত্যাদির কথাও উল্লেখ আছে।

(১০) হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) হুয়াইয়ের কন্যা এবং হযরত মূসা (আঃ)এর ভাই হারূন (আঃ)এর বংশধর ছিলেন। প্রথমে সাল্লাম ইবনে মিশকামের বিবাহাধীন ছিলেন তারপর কেনানা ইবনে আবি হুকাইকের সঙ্গে বিবাহ হয়। এই দ্বিতীয় বিবাহ যখন হয় তখন খাইবারের যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্বামী ঐ যুদ্ধে নিহত হয়। খাইবারের যুদ্ধের পর দিহ্ইয়া কালবী (রাযিঃ) নামক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি বাঁদী চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যাকে দিয়া দিলেন। কিন্তু মদীনায় বনু কুরাইযা ও বনু নাযীর নামে দুইটি গোত্র বাস করিত এবং হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) ইহুদী সরদারের কন্যা ছিলেন। এইজন্য লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, ইহা অনেক মানুষের নিকটই অপছন্দনীয় হইবে। সফিয়্যা (রাযিঃ)কে যদি স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বিবাহে গ্রহণ করিয়া লন তবে ইহা অনেকের সন্তুষ্টির কারণ হইবে। এইজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিহইয়া কালবী (রাযিঃ)কে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করিয়া তাঁহাকে লইয়া লইলেন। এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইলেন। খাইবার হইতে ফিরিবার পথে এক মঞ্জিলে তাহার রোখসতী হয়। সকাল বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার কাছে যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে উহা লইয়া আস। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকট বিভিন্ন জিনিস খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি যাহা ছিল লইয়া আসিলেন। একটি চামড়ার দস্তরখান বিছাইয়া উহার উপর ঐসব খাবার রাখা হইল এবং সকলে একত্রে খাইলেন। ইহাই ছিল ওলিমা। কোন কোন বর্ণনামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন যে, তুমি যদি আপন কওমের সঙ্গে এবং নিজ দেশে থাকিতে চাও তবে তুমি মুক্ত, চলিয়া যাইতে পার। আর যদি আমার নিকট আমার বিবাহাধীনে থাকিতে চাও তবে থাকিতে পার। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিরক অবস্থায় আপনার আকাংখা করিতাম এখন মুসলমান হইয়া কিরূপে চলিয়া যাইতে পারি। এই কথা দ্বারা হয়ত তিনি

ঐ স্বপ্নকে বুঝাইয়াছেন, যাহা একবার তিনি মুসলমান হওয়ার পূর্বে দেখিয়াছিলেন যে, এক খণ্ড চাঁদ তাঁহার কোলে পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী কেনানার নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করিলে সে তাঁহার মুখের উপর এত জোরে একটি চড় মারিল যে, চোখের উপর উহার দাগ পড়িয়া গেল। অতঃপর বলিল, তুই ইয়াছরিবের বাদশার সহিত বিবাহ বসার আকাঙ্খা করিতেছিস?

একবার স্বপ্ন দেখিলেন যে, সূর্য তাঁহার বুকের উপর। ইহাও স্বামীর নিকট বর্ণনা করেন। স্বামী অনুরূপ কথাই বলিল যে, তুই ইয়াছরিবের বাদশাহর বিবাহে যাইতে চাহিতেছিস? একবার তিনি চাঁদকে কোলের মধ্যে দেখিয়া পিতার কাছে বলিলে সেও একটি চড় মারিয়া বলিল যে, তোর দৃষ্টি ইয়াছরিবের বাদশাহর প্রতি যাইতেছে। হইতে পারে চাঁদ সম্পর্কিত একই স্বপ্ন পিতা ও স্বামী উভয়ের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন অথবা স্বপ্নে চাঁদ দুইবার দেখিয়াছেন।

বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। তিনি নিজে বর্ণনা করেন, আমি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আসি তখন আমার বয়স সতর বছর পূর্ণ হইয়া ছিল না।

(১১) হযরত মাইমূনা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রাযিঃ) ছিলেন হারেছ ইবনে হাযনের মেয়ে। তাঁহার আসল নাম ছিল বাররা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন করিয়া মাইমূনা রাখেন। প্রথমে আবু রুহম ইবনে আবদুল উয্যার বিবাহে ছিলেন। ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের অভিমত। প্রথম স্বামীর নামের ব্যাপারে আরো অনেক উক্তি রহিয়াছে। কাহারও মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেও দুই বিবাহ হইয়াছিল। বিধবা হইয়া যাওয়ার পর ৭ম হিজরীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামা যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছিলেন যে, ওমরাহ শেষ করিয়া মক্কাতে রোখছতী হইবে। কিন্তু মক্কাবাসীরা অবস্থান করিতে অনুমতি দিল না। এইজন্য ফিরার পথে সারিফ নামক জায়গাতেই রোখছতী হইল। আবার বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সারিফ নামক স্থানের ঐ জায়গাতেই যেখানে রোখছতীর তাঁবু ছিল। ৫১ হিজরীতে তাহার ইন্তিকাল হয়, আর কেহ কেহ

৬১ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৮১ বছর। অতঃপর সেই জায়গাতেই তাহার কবর হয়। ইহা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এবং ইতিহাসের আশ্চর্য বিষয় যে, একই জায়গায় এক সফরে বিবাহ হয় অপর সফরে রোখছতী হয় আবার দীর্ঘদিন পর ঠিক ঐ জায়গাতেই সমাহিত হন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মায়মূনা (রাযিঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার কাজ ছিল সবসময় নামায পড়া অথবা ঘরের কাজকর্ম করা। যখন এই দুইকাজ হইতে অবসর হইতেন তখন মিসওয়াক করিতে থাকিতেন। যেসব মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারে মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকগণ একমত, তাহাদের মধ্যে হযরত মাইমুনা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইল সর্বশেষ বিবাহ। এইসবের মধ্যবর্তী ধারাবাহিকতা র মধ্যে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে। যাহা ঐ সকল বিবাহের তারিখ সম্পর্কে যেমন সংক্ষেপে জানা গেল।

এগারজন বিবিদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন হইলেন হযরত খাদীজা (রাযিঃ) অপরজন হইলেন হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা। অবশিষ্ট নয়জন বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় জীবিত ছিলেন।

উপরে বর্ণিত বিবাহ ছাড়া কতক মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক আরো কয়েকটি বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কেবল সর্বসম্মত বিবাহগুলিই আলাচনা করা হইয়াছে।

হুযূর (সঃ)এর সন্তান-সন্ততি

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার মেয়ে ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশের বিশুদ্ধ মত হইল সকলের বড় ছিলেন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)। অতঃপর হযরত রোকাইয়্যা। তারপর হযরত উম্মে কুলছুম, তারপর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)। পুত্রসন্তানদের ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল তাঁহারা সকলে শৈশবকালেই ইন্তিকাল করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া আরবে তখন ইতিহাস লেখার প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হইত না। আর তখন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও তত অধিক ছিল না, যাহাতে প্রত্যেক বিষয় পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিবেন। অধিকাংশের

মতে পুত্রসন্তানদের মধ্যে ছিলেন হযরত কাসেম (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) ও হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) এই তিনজন। কতকের মতে চতুর্থ পুত্র ছিলেন হযরত তৈয়্যব (রাযিঃ) আর পঞ্চম পুত্র ছিলেন হযরত তাহের (রাযিঃ)। এই হিসাবে পাঁচজন হইলেন। কতকের মতে তৈয়্যব ও তাহের একজনেরই নাম। এই হিসাবে চারজন হইলেন। আর কাহারও মতে আবদুল্লাহর নামই তৈয়্যব এবং তাহের। এই হিসাবে তিন পুত্রই হইল। আর কেহ কেহ মুতাইয়্যাব ও মুতাহ্হার নামে আরো দুই পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৈয়্যব ও মুতাইয়্যাব এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আর তাহের ও মুতাহ্হার একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে সাতপুত্র হইল। তবে অধিকাংশের মতে পুত্র সংখ্যা তিন। একমাত্র হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) ব্যতীত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজার গর্ভ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(১) হযরত কাসেম (রাযিঃ)

পুত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেম (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তবে হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাঁহার চেয়ে বড় ছিলেন, না ছোট ছিলেন এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত কাসেম (রাযিঃ) শিশুকালেই ইন্তিকাল করিয়াছেন। অধিকাংশই তাঁহার বয়স দুই বৎসর লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহার চেয়ে কম বা বেশীও লিখিয়াছেন।

(২) হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)

দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নবুওতের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর এই কারণে তাঁহার নাম তৈয়্যব এবং তাহেরও প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। তিনি শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালে আর কতকের মতে হযরত কাসেম (রাযিঃ)এর ইন্তিকালে কাফেররা ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত খুশী হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা বন্ধ হইয়া গেল। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-কাউছার নাযিল হয়। আর কাফেরদের এই কথার যে, যখন বংশধারা শেষ হইয়া গেল তখন কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার নামও মিটিয়া যাইবে, এই জবাব মিলিল যে, আজ সাড়ে তের শত বছর পর পর্যন্তও তাঁহার নামের উপর জীবন উৎসর্গকারী কোটি কোটি মানুষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)

তৃতীয় পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে

৮ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় তাইয়্যেবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদী মারিয়া (রাযিঃ)এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সন্তান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম দিনে তাঁহার আকীকা করেন এবং দুইটি ভেড়া জবাই করেন। চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করিয়া দেন এবং চুলগুলি দাফন করাইয়া দেন। আবু হিন্দ বায়াযী (রাযিঃ) তাঁহার মাথার চুল মুড়াইয়াছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পিতার নামে নাম রাখিয়াছি। তিনিও ১৬ মাস বয়সে ১০ম হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ১৮ মাস বয়সের কথা বলিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ইবরাহীমের জন্য জান্নাতে দুধপানকারিণী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

(১) হযরত যয়নাব (রাযিঃ)

কন্যাদের মধ্যে সকলের বড় হইলেন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)। যে সকল ঐতিহাসিক ইহার ব্যতিক্রম লিখিয়াছেন উহা ভুল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের ৫ বৎসর পর যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল তখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার কোলে বড় হন এবং মুসলমান হন। অতঃপর আপন খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবীর সহিত বিবাহ হয়। বদরের যুদ্ধের পর হিজরত করেন। হিজরত কালে মুশরেকদের ঘৃণ্য আচরণে আহত হন, যাহা এই অধ্যায়ের ২০ নম্বর ঘটনায় বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত আঘাতের কারণে সবসময় অসুস্থ থাকিতেন। শেষ পর্যন্ত ৮ম হিজরীর শুরুতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্বামীও ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম হিজরীতে মুসলমান হইয়া মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাহারই বিবাহ বন্ধনে রহিলেন। তাহার দুইজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে একজন পুত্র এবং একজন কন্যা। পুত্রের নাম ছিল আলী (রাযিঃ)। যিনি মাতার ইন্তিকালের পর প্রায় পরিণত বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উটনীর উপর যিনি সাওয়ার ছিলেন তিনি এই হযরত আলী (রাযিঃ)ই ছিলেন। আর মেয়ের নাম ছিল উমামা (রাযিঃ)। যাহার সম্পর্কে হাদীছের কিতাবসমূহে বহু ঘটনা আসিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সেজদা করিতেন তখন তিনি তাঁহার

কোমরের উপর চড়িয়া বসিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাহার খালা হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযিঃ)--এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর তাঁহার বিবাহ মুগীরা ইবনে নাওফাল (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাহার গর্ভ হইতে হযরত আলী (রাযিঃ)এর কোন সন্তান হয় নাই। অবশ্য মুগীরা (রাযিঃ) হইতে ইয়াহইয়া নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নিজেই এই অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর যেন হযরত আলী (রাযিঃ)এর বিবাহ বোনের মেয়ের সহিত করানো হয়। ৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(২) হযরত রুকাইয়্যা (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২য় কন্যা রোকাইয়্যা (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি আপন বোন যয়নাব (রাযিঃ)এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। কেহ কেহ হযরত রুকাইয়্যা (রাযিঃ)কে হযরত যয়নাব (রাযিঃ) হইতে বড় বলিয়াছেন। কিন্তু সঠিক ইহাই যে, তিনি হযরত যয়নাব (রাযিঃ) হইতে ছোট ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাবের পুত্র উতবার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যখন সূরা তাব্বাৎ নাযিল হইল তখন আবু লাহাব আপন পুত্র উতবা এবং তাহার ভাই উতাইবাকে যাহার সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল। বলিল যে, তোমাদের দুইজনের সহিত আমার দেখা করা হারাম হইবে যদি তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদিগকে তালাক না দাও। ইহাতে তাহারা উভয়েই তালাক দিয়া দিল। এই দুইটি বিবাহ বাল্যকালে হইয়াছিল। রোখসুতীর সুযোগই হয় নাই। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর স্বামী উতবা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই যেহেতু স্ত্রীকে তালাক দিয়া ফেলিয়াছিলেন সেহেতু হযরত উসমান (রাযিঃ)এর সহিত হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর অনেক দিন আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

হযরত উছমান (রাযিঃ) ও হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) দুইবারই আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। যাহার বর্ণনা ১ম অধ্যায়ের ১০

নম্বর ঘটনায় গত হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইরশাদ করিলেন যে, আমাকেও হিজরতের হুকুম দেওয়া হইবে এবং মদীনা মুনাওয়ারা আমার হিজরতের স্থান হইবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত শুরু করিয়া দিলেন। ঐ সময় এই দুইজনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে যাইতেছিলেন তখন হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) অসুস্থ ছিলেন। এই কারণে তাঁহার পরিচর্যার জন্য হযরত উছমান (রাযিঃ)কে মদীনায় রাখিয়া যান। বদরের যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা তাইয়্যেবাতে এমন সময় পৌঁছিল যখন তাহারা হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)কে দাফন করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দাফন কার্যে শরীক হইতে পারেন নাই।

হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর যেহেতু প্রথম স্বামীর সহিত রোখসুতীই হইতে পারে নাই কাজেই সন্তানের কোন প্রশ্নই আসে না। অবশ্য হযরত উছমান (রাযিঃ)এর ঔরসে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নামে এক ছেলে আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার ইন্তিকালের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং ছয় বছর বয়সে চতুর্থ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কাহারো মতে মাতার ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। ইহাছাড়া হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর অন্য কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

(৩) হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা ছিলেন হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর মধ্যে কে বড় ছিলেন এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) বড় ছিলেন। প্রথমে উতাইবা ইবনে আবু লাহাবের সহিত বিবাহ হয় কিন্তু রোখসতী হইয়াছিল না। যেহেতু সূরায়ে 'তাব্বাত ইয়াদা' নাযিল হওয়ার কারণে তালাক হইয়া যায়। যাহা হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)এর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্বামী পরে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উতাইবা হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)কে তালাক দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া চরম বেআদবী ও অশোভনীয় কথাবার্তা বলে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বদদোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনার কুকুরদের মধ্য হইতে একটি কুকুর তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিন। আবু তালেব তখন জীবিত ছিলেন। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও ভয় পাইয়া গেলেন এবং বলিলেন যে, তাহার বদদোয়া হইতে তোর রক্ষা নাই। অতঃপর উতাইবা একবার সিরিয়া সফরে যাইতেছিল, তাহার পিতা আবু লাহাব সর্বপ্রকার বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও বলিতে লাগিল যে, আমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়ার ভয় হইতেছে। কাফেলার সবাই যেন আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কাফেলা এক মঞ্জিলে পৌঁছিল যেখানে অনেক বাঘ ছিল। রাত্রে সমস্ত কাফেলার আসবাবপত্র একত্র করিয়া টিলার মত বানাইয়া উহার উপর উতাইবাকে শোয়াইল এবং কাফেলার সমস্ত লোক চারিদিকে শয়ন করিল। রাত্রে একটি বাঘ আসিল এবং সকলের মুখ শুঁকিল। অতঃপর এক লাফে ঐ টিলার উপর পৌঁছিয়া উতাইবার মাথা দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে একটি চিৎকার দিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। আর এই ঘটনা প্রথম ভাইয়ের সহিত ঘটিয়াছিল। হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) ও হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর স্বামীদের মধ্য হইতে একজন মুসলমান হইয়াছেন অপরজনের সহিত এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহওয়ালাগণের সহিত দুশমনী রাখার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

"যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয় তাহার প্রতি আমার পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল।"

হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহও হযরত উছমান (রাযিঃ)এর সঙ্গে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি উম্মে কুলছুমের বিবাহ উছমানের সহিত আসমানী ওহীর নির্দেশে করাইয়াছি। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) এবং হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) উভয়ের সম্পর্কে ইহা এরশাদ করিয়াছেন। প্রথম স্বামীর ঘরে যাওয়াই হয় নাই আর হযরত উছমান (রাযিঃ) হইতেও তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। তিনি ৯ম হিজরীর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার

ইন্তিকালের পর এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমার একশত মেয়ে থাকিত আর মৃত্যুবরণ করিত তবে আমি এইভাবে একের পর এক সকলের বিবাহ ওছমান (রাযিঃ)এর সঙ্গে দিতাম।

(৪) হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ কন্যা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ), যিনি অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তিনি নবুওতের এক বছর পর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৪১ বৎসর ছিল জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৫ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে, তাঁহার নাম ফাতেমা ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে রাখা হইয়াছে। 'ফাত্‌ম' অর্থ, হেফাজত করা। অর্থাৎ, তিনি জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতপ্রাপ্ত। হিজরী ২য় সনের মুহাররম অথবা সফর অথবা রজব অথবা রমযান মাসে হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের সাত মাস পনের দিন পর স্বামীর ঘরে যান। এই বিবাহও আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হইয়াছে। উল্লেখ আছে যে, বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল পনের বছর পাঁচ মাস। ইহা হইতেও তাঁহার জন্ম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪১ বছর বয়সে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর হযরত আলী (রাযিঃ)এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস অথবা ২৪ বছর দেড় মাস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যাদের সকলের মধ্যে তাঁহাকে বেশী ভালবাসিতেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাইতেন তখন সবশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতেন আর যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁহার কাছে যাইতেন। হযরত আলী (রাযিঃ) আবু জাহলের কন্যার সহিত দ্বিতীয় বিবাহ করিতে চাহিলে তিনি ইহাতে মনক্ষুন্ন হন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ফাতেমা আমার শরীরের টুকরা। যে তাহাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। এইজন্য হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাহার বোনের মেয়ে হযরত উমামা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। যাহার আলোচনা হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বর্ণনায় গত

হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ছয় মাস পর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং একদিন খাদেমাকে বলিলেন, আমি গোসল করিব, পানি আনিয়া রাখ। গোসল করিলেন, নতুন কাপড় পরিলেন অতঃপর বলিলেন, আমার বিছানা ঘরের মাঝখানে করিয়া দাও। তিনি বিছানায় গিয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া ডান হাত গালের নীচে রাখিলেন এবং বলিলেন, বস্ আমি এখন মরিতেছি। এই বলিয়া ইন্তিকাল করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা তাঁহার পক্ষ হইতেই চলিয়াছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। তাঁহার ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে তিনজন ছেলে তিনজন মেয়ে। সর্বপ্রথম হযরত হাসান (রাযিঃ) বিবাহের ২য় বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ৩য় বৎসরে অর্থাৎ হিজরী ৪র্থ সনে হযরত হোসাইন (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর মুহাস্সিনা (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই মারা যান। কন্যাদের মধ্যে হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল শৈশবেই হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার উল্লেখই করেন নাই। দ্বিতীয়া কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)। এর প্রথম বিবাহ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে এক ছেলে যায়েদ (রাযিঃ) ও এক কন্যা রোকাইয়া (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহ আউন ইবনে জাফর (রাযিঃ)–এর সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার ভাই মুহাম্মদ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শৈশবেই মারা যান। তাহার ইন্তিকালের পর তাহার তৃতীয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহারই বিবাহে থাকিয়া হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল হয়। আর ঐ দিনই তাহার ছেলে যায়েদ (রাযিঃ)এরও ইন্তিকাল হয়। উভয় জানাযা একই সাথে বহন করিয়া নেওয়া হয় এবং বংশের ধারাবাহিকতা তাহার দিক হইতে চলে নাই।

এই তিন ভাই আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদ (রাযিঃ) যাহাদের ঘটনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইলেন—হযরত আলী (রাযিঃ)এর ভাতিজা এবং হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ)এর পুত্র। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর তৃতীয়া কন্যা হযরত যয়নাব (রাযিঃ) ছিলেন।

তাঁহার বিবাহ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর সহিত হয়। আবদুল্লাহ ও আউন নামে তাঁহার দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করে। আর তাহারই বিবাহে থাকাকালীন ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর বিবাহ তাহার বোন হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছিল। ইহারা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর সন্তান। ইহা ছাড়া হযরত আলী (রাযিঃ)এর অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষ হইতে আরো সন্তান রহিয়াছে। যাহারা পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ হযরত আলী (রাযিঃ)এর সর্বমোট সন্তান সংখ্যা বত্রিশজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ষোলজন ছেলে ও ষোলজন মেয়ে। আর হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ)এর পনেরজন ছেলে ও আটজন মেয়ে এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর ছয়জন ছেলে ও তিনজন মেয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

বাচ্চাদের দ্বীনি জয্‌বা

নবীন ও অল্পবয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে যে দ্বীনি প্রেরণা ছিল তাহা মূলতঃ অভিভাবকদের প্রতিপালনের ফল ছিল। পিতামাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ যদি বাচ্চাদেরকে আদর–স্নেহে নষ্ট না করিয়া প্রথম হইতেই তাহাদের দ্বীনি অবস্থার খোঁজখবর রাখেন এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তবে দ্বীনী বিষয়সমূহ শিশুদের অন্তরে বসিয়া যাইবে এবং বড় হইয়া ঐসব বিষয় তাহাদের জন্য অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা উহার বিপরীত বাচ্চা মনে করিয়া তাহাদের প্রত্যেক মন্দ কাজকে এড়াইয়া যাই এমনকি অত্যধিক মহবতের কারণে উহাতে খুশি হই আর দ্বীনের ব্যাপারে যত ত্রুটি–বিচ্যুতি দেখি নিজের মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেই যে, বড় হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অথচ যে বীজ শুরুতে বপন করা হইয়াছে বড় হইয়া উহা আরও পরিপক্ক হইয়া যায় আপনি ছোলার বীজ বপন করিয়া উহা হইতে গম উৎপন্ন করিতে চাহেন, তাহা অসম্ভব। আপনি যদি চান যে, বাচ্চাদের মধ্যে ভাল অভ্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি হউক, দ্বীনের প্রতি যত্নবান হউক এবং দ্বীনদার হউক তবে বাচ্চা বয়সেই তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি যত্নবান হওয়ার অভ্যস্ত করিতে হইবে। সাহাবায়ে

কেরাম (রাযিঃ)গণ শৈশব কাল হইতেই নিজ সন্তানদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং দ্বীনী কাজের অভ্যাস করাইতেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আনা হইল। সে রমযান মাসে মদ পান করিয়াছিল এবং রোযা রাখিয়া ছিল না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোর ধ্বংস হউক, আমাদের তো বাচ্চারাও রোযা রাখে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, তুই এত বড় হইয়াও রোযা রাখিস না? অতঃপর তাহাকে শরাব পান করার শাস্তিস্বরূপ আশি চাবুক মারিলেন এবং মদীনা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়া সিরিয়ার দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

(১) বাচ্চাদিগকে রোযা রাখানো

রুবাইয়্যে বিনতে মুওয়াউবিয (রাযিঃ) যাহার ঘটনা ১ম অধ্যায়ের শেষ দিকে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করাইলেন যে, আজ আশুরার দিন সবাই যেন রোযা রাখে। উহার পর হইতে আমরা সর্বদা উক্ত তারিখে রোযা রাখিতাম এবং নিজ বাচ্চাদেরকেও রোযা রাখাইতাম। যখন তাহারা ক্ষুধার কারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিত তখন আমরা তুলা দিয়া খেলনা তৈরী করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতাম এবং ইফতারের সময় পর্যন্ত এইভাবে তাহাদিগকে খেলাধূলায় লাগাইয়া রাখিতাম। (বুখারী)

ফায়দা ঃ কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, মায়েরা দুধপানকারী শিশুদিগকে দুধপান করাইতেন না। যদিও তখনকার মানুষ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল আর বর্তমান যুগের মানুষ অতি দুর্বল। সে যুগের মানুষ ও তাহাদের বাচ্চাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যতটুকু করার সামর্থ্য রহিয়াছে ততটুকুই বা কোথায় করা হইতেছে। সামর্থ্যের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু এখন যতটুকুর সামর্থ্য আছে ততটুকুর ব্যাপারে ত্রুটি করা অবশ্যই সমীচীন নহে।

(২) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর হাদীছ বর্ণনা ও আয়াত অবতীর্ণ হওয়া

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছয় বছর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আসেন। মক্কা মোকাররমায় বিবাহ হয় এবং নয় বছর বয়সে মদীনা তাইয়্যেবায় স্বামীগৃহে গমন করেন। অতঃপর

আঠার বছর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হয়। আঠার বছর বয়সই বা কি! কিন্তু এই বয়সেও এত বেশী দ্বীনি মাসায়েল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমলসমূহ তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করা হয় যাহার কোন সীমা নাই। মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি বড় বড় সাহাবা (রাযিঃ)দেরকে দেখিয়াছি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতেন। আতা (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) মাসায়েল সম্পর্কে পুরুষদের চাইতেও বেশী অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমরা কোন ইলমী সমস্যার সম্মুখীন হইলে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া তাহার সমাধান পাইতাম। (ইসাবাহ) হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত দুই হাজার দুই শত হাদীছ পাওয়া যায়। (তালকীহ) তিনি নিজে বলেন, আমি মক্কা মোকাররমায় শৈশবকালে খেলিতেছিলাম। ঐসময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরায়ে কামারের এই আয়াত নাযিল হয়—

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আট বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় থাকিয়াছেন। এত অল্প বয়সে ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয় জানা তারপর আবার মুখস্থও রাখা দ্বীনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকার দরুনই সম্ভব হইতে পারে। নচেৎ আট বছর বয়সই বা কতটুকু!

৩ হযরত উমাইর (রাযিঃ)এর জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ

হযরত উমাইর (রাযিঃ) আবিল লাহমের গোলাম ছিলেন এবং কম বয়সের বালক ছিলেন। তখনকার ছোট বড় সকলের নিকট জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল। তিনি খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মনিবরাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সুপারিশ করিলেন যে, তাহাকে অনুমতি দেওয়া হউক। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং একটি তরবারী দান করিলেন যাহা তিনি গলায় ঝুলাইয়া লইলেন। কিন্তু তরবারী বড় ও শরীর খাট হওয়ার কারণে উহা যমিনের উপর হেঁচড়াইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু ছোট ছিলেন এবং গোলামও ছিলেন এই কারণে গনীমতের পুরা অংশ তো পান নাই তবে দানস্বরূপ কিছু সামান

পাইয়াছেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ তাঁহাদের ইহাও জানা ছিল যে, গনীমতের মধ্যে আমাদের জন্য পুরা অংশও নাই। এতদসত্ত্বেও এই পরিমাণ আগ্রহ ছিল যে, অন্যের মাধ্যমে সুপারিশ করাইতেন দ্বীনী প্রেরণা এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া ইহার আর কি কারণ হইতে পারে?

(৪) হযরত ওমাইর (রাযিঃ)এর বদরের যুদ্ধে আত্মগোপন

হযরত ওমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) একজন অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ)এর ভাই ছিলেন। হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার ভাই উমাইরকে বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যখন লশকর রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি চলিতেছিল তখন সে এদিক-ওদিক লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন? সে বলিতে লাগিল, আমার আশংকা হইতেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া ফেলিবেন এবং ছোট মনে করিয়া জেহাদে যাইতে নিষেধ করিয়া দিবেন, ফলে আমি যাইতে পারিব না। আমার আকাংখা যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধে শরীক হইব। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকেও কোন প্রকারে শাহাদাতের সুযোগ দান করিবেন। অবশেষে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সৈন্যদল উপস্থিত হইল তখন যে বিষয়ের আশংকা ছিল উহাই দেখা দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কারণে সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আগ্রহ ও ক্রন্দনের কথা জানিতে পারিয়া অনুমতি দিয়া দিলেন। যুদ্ধে শরীক হইলেন এবং দ্বিতীয় আকাংখাও পূর্ণ হইল। ঐ যুদ্ধেই শহীদ হইলেন। তাঁহার ভাই সা'দ (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার ছোট হওয়ার এবং তরবারী বড় হওয়ার কারণে আমি উহার ফিতায় বার বার গিরা লাগাইয়া দিতাম যাহাতে তরবারী উঁচা হইয়া যায়। (ইসাবাহ)

(৫) দুই আনসারী বালকের আবু জাহলকে হত্যা করা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ ও বড় সাহাবা

(রাযিঃ)দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের কাতারে দাঁড়াইয়া ছিলাম। দেখিলাম যে, আমার ডানে এবং বামে দুইজন আনসারী কমবয়স্ক বালক রহিয়াছে। ভাবিলাম যে, আমি যদি শক্তিশালী ও মজবুত লোকদের মাঝে থাকিতাম তবে ভাল হইত কেননা প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য করিতে পারিতাম। আমার দুই পাশে দুইটি বালক উহারা কি সাহায্য করিবে। ইত্যবসরে তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একজন আমার হাত ধরিয়া বলিল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বলিলাম, হাঁ, চিনি। তোমার কি দরকার? সে বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে পৃথক হইব না যতক্ষণ সে না মরিবে অথবা আমি না মরিব। তাহার প্রশ্নোত্তর শুনিয়া আমি হতবাক হইয়া গেলাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়জন একই প্রশ্ন করিল এবং প্রথম জন যাহা বলিয়াছিল সেও তাহাই বলিল। ঘটনাক্রমে আমি আবু জাহলকে ময়দানে ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের উভয়কে বলিলাম, তোমরা যাহার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে তোমাদের সেই কাঙ্খিত ব্যক্তি ঐ যাইতেছে। ইহা শুনামাত্র উভয়ে তরবারী হাতে লইয়া মুহূর্তে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং যাইয়াই তাহার উপর তরবারী চালাইতে শুরু করিল। অবশেষে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। (বুখারী)

ফায়দা ঃ এই দুই বালক ছিলেন মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) এবং মুয়ায ইবনে আফরা (রাযিঃ)। মুয়ায ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি লোকদের নিকট শুনিতাম যে, আবু জাহলকে কেহ হত্যা করিতে পারিবে না কারণ, সে অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। আমার তখন হইতে খেয়াল ছিল যে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। এই দুই বালক ছিলেন পদাতিক আর আবু জাহল ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। সে সৈন্যদের কাতার ঠিক করিতেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) দেখিলেন, ইহারা দুইজন ছুটিয়া গেল যেহেতু ঘোড় সওয়ারের উপর সরাসরি আক্রমণ করা মুশকিল ছিল। এইজন্য একজন ঘোড়ার উপর আক্রমণ করিল আর অপরজন আবু জাহলের পায়ের গোছায় আঘাত করিল। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া গেল এবং আবু জাহলও এমনিভাবে পড়িয়া গেল যে, আর উঠিতে পারিল না। এই দুইজন তাহাকে এমন অবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, সে আর উঠিতে সক্ষম হয় নাই,

সেখানেই পড়িয়া ছটফট করিতে থাকিল। কিন্তু তাহাদের ভাই মুওয়াওবিয ইবনে আফরা (রাযিঃ) তাহাকে আরো একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন যাহাতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে না পারে। কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণরূপে শেষ করিলেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) একেবারে শিরোশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

মুয়ায ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহার পায়ের গোছায় আঘাত করিলাম তখন তাহার পুত্র ইকরিমা সঙ্গে ছিল। সে আমার কাঁধের উপর আঘাত করিল। ইহাতে আমার হাত কাটিয়া গেল এবং শুধু চামড়ার সহিত ঝুলিয়া রহিল। (উসদুল গাবাহ) আমি এই ঝুলন্ত হাতকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিলাম এবং সারাদিন অপরহাতে যুদ্ধ করিতে থাকিলাম কিন্তু যখন উহা ঝুলিয়া থাকার কারণে অসুবিধা হইল তখন আমি উহাকে পায়ের নীচে রাখিয়া জোরে টান মারিলাম যাহাতে ঐ চামড়াও ছিঁড়িয়া গেল যাহার সহিত হাত ঝুলিয়া ছিল। অতঃপর আমি উহাকে দূরে ফেলিয়া দিলাম। (খামীস)

(৬) হযরত রাফে' (রাযিঃ) ও ইবনে জুনদুব (রাযিঃ)এর প্রতিযোগিতা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইতেন তখন মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে যাইয়া সৈন্যদল পরিদর্শন করিতেন। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের প্রয়োজনসমূহ দেখিতেন এবং সৈন্যদলের সংশোধন করিতেন। অল্পবয়সী বালকদেরকে ফিরাইয়া দিতেন যাহারা অত্যধিক আগ্রহের কারণে বাহির হইয়া পড়িতেন। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদের যুদ্ধে রাওয়ানা হইলেন তখন এক জায়গায় পৌঁছিয়া সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন এবং বালকদিগকে অল্পবয়স হওয়ার কারণে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত সাহাবীগণ ছিলেন—

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ), উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ), বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ), আমর ইবনে হাযাম (রাযিঃ), উসাইদ ইবনে যুহাইর (রাযিঃ), ইরাবা ইবনে আউস (রাযিঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযিঃ)। ইঁহাদের বয়স প্রায় তের চৌদ্দ বছরের মত ছিল। যখন তাহাদের প্রতি ফিরিয়া যাওয়ার হুকুম হইল তখন হযরত খাদীজ (রাযিঃ) সুপারিশ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলে রাফে' তীর চালনা খুব

ভালো জানে। আর স্বয়ং রাফে' (রাযিঃ)ও অনুমতি পাওয়ার আগ্রহে পায়ের উপর ভর করিয়া বার বার উঁচু হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন যাহাতে লম্বা মনে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিয়া দিলেন। তখন সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) তাহার সৎ পিতা মুর্‌রা ইবনে সিনানের নিকট বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রাফে (রাযিঃ)কে অনুমতি দান করিলেন আর আমাকে অনুমতি দিলেন না। অথচ আমি রাফে (রাযিঃ)এর চাইতে শক্তিশালী। যদি আমার ও তাহার মধ্যে মোকাবিলা হয় তবে আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা করাইলেন। সামুরা (রাযিঃ) রাফে(রাযিঃ)কে সত্যই পরাস্ত করিয়া দিলেন। অতএব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা (রাযিঃ)কেও অনুমতি দিয়া দিলেন। ইহার পর অন্যান্য বালকরাও চেষ্টা করিলেন এবং আরো অনেকেই অনুমতি পাইয়া গেলেন। এইসব বিষয় সমাধা করিতে করিতে রাত্র হইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বাহিনীর হেফাজতের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চাশ জনকে পুরা বাহিনীর পাহারার জন্য নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন আমার পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, যাকওয়ান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা বসিয়া যাও। আবার বলিলেন, আমার পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, আবু সাবু (সাবু এর পিতা)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও। তৃতীয় বার পুনরায় এরশাদ হইল, আমার পাহারাদারী কে করিবে? আবার এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইবনে আবদে কাইস (রাযিঃ) (আবদে কাইসের পুত্র)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা বসিয়া যাও। কিছুক্ষণ পর এরশাদ করিলেন, তিনজনই চলিয়া আস। তখন এক ব্যক্তি হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দুই সঙ্গী কোথায় গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিন বারই আমিই দাঁড়াইয়াছিলাম। হুযূর (সাঃ) তাঁহাকে দোয়া দিলেন এবং পাহারার হুকুম দিলেন। সারারাত্র তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু পাহারা দিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ছিল তাহাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা। ছোট বড় প্রত্যেকেই এমনই আত্মহারা ছিলেন যে, প্রাণ উৎসর্গ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্যই কামিয়াবী ও সফলতা তাঁহাদের পদচুম্বন করিত। হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযিঃ) বদরের যুদ্ধেও নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনুমতি পাইয়াছিলেন না। পুনরায় উহুদের যুদ্ধে নিজেকে পেশ করিলেন যাহার আলোচনা এখন করা হইল। ইহার পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁহার বুকে একটি তীর বিদ্ধ হয়। যখন উহাকে টান দেওয়া হইল তখন তীরের সম্পূর্ণ অংশ বাহির হইয়া আসিল কিন্তু ফলার অংশ কিছুটা ভিতরে থাকিয়া গেল। যাহা যখমের রূপ ধারণ করিয়া রহিল। শেষ জীবনে বার্ধক্যের কাছাকাছি এই জখমই তাজা হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

(উসদুল গাবাহ)

(৭) কুরআনের কারণে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর অগ্রগণ্য হওয়া

হিজরতের সময় হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)এর বয়স এগার বছর ছিল। তিনি ছয় বছর বয়সে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশ করেন কিন্তু অনুমতি মিলে নাই। পুনরায় উহুদের যুদ্ধে বাহির হইলেন। কিন্তু ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সামুরা (রাযিঃ) ও রাফে (রাযিঃ) উভয়েরই অনুমতি হইয়াছিল যেমন এই মাত্র পূর্বের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে এই কারণে তাঁহাকেও অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধেই শরীক হইতে থাকেন। তবুকের যুদ্ধে বনু মালেকের ঝাণ্ডা হযরত উমারা (রাযিঃ)এর হাতে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমারা (রাযিঃ) হইতে লইয়া হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে দিয়া দিলেন। উমারা (রাযিঃ) চিন্তিত হইলেন, সম্ভবতঃ আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়া গিয়াছে অথবা কোন অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিয়াছে। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন অভিযোগ আসিয়াছে কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, না, ব্যাপার ইহা নহে। বরং যায়েদ তোমার চেয়ে কুরআন শরীফ বেশী পড়িয়াছে। কুরআন তাঁহাকে ঝাণ্ডা বহনে অগ্রগণ্য করিয়া দিয়াছে।

(উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস ছিল, মর্যাদার ব্যাপারে দ্বীন অনুপাতে অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে যদিও

যুদ্ধের ব্যাপার ছিল ঝাণ্ডা বহনে কুরআন শিক্ষায় বেশী হওয়ার কোন দখল ছিল না। এতদসত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন অধিক জানার কারণে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এমনকি কোন কারণে যদি একাধিক লোককে একই কবরে দাফন করিতে হইত তবে যাহার কুরআন অধিক জানা থাকিত তাহাকে অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন উহুদের যুদ্ধে করিয়াছেন।

(৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)এর পিতার ইন্তেকাল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের জন্য পেশ করা হইল। আমার বয়স ছিল তের বছর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করিলেন না। আমার পিতা সুপারিশও করিলেন যে, তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে এবং হাড়ও মোটা আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি উঠাইতেছিলেন আবার নামাইতেছিলেন। অবশেষে অল্পবয়সের কারণে অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। কোন ধনসম্পদ কিছুই ছিল না। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হইলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, যে সবর চায় আল্লাহ তাহাকে সবর দান করেন, যে আল্লাহ তায়ালার নিকট পবিত্রতা চায় আল্লাহ তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি সচ্ছলতা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সচ্ছলতা দান করেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া আর কিছু না চাহিয়াই চুপচাপ ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ঐ মর্যাদা দান করিলেন যে, কম বয়সের সাহাবীগণের মধ্যে তাঁহার মত বড় মর্তবার আলেম আরেকজন পাওয়া অত্যন্ত দুস্কর ব্যাপার। (ইসাবাহ, ইস্তীআব)

ফায়দা ঃ বাচ্চা বয়স, তদুপরি পিতার শোক ছাড়াও অভাবের সময়, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সাধারণ উপদেশ শুনিয়া চুপচাপ চলিয়া আসা এবং নিজের পেরেশানী প্রকাশও না করা আজকাল কোন পূর্ণবয়স্ক লোকও করিতে পারিবে কি? আসল কথা হইল, আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূলের সাহচর্যের জন্য এমন লোকদেরকেই নির্বাচন করিয়াছিলেন যাহারা ইহার যোগ্য ছিলেন।

এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের মধ্য হইতে আমার সাহাবীদিগকে বাছাই করিয়াছেন। (বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্টে আসিতেছে।)

(৯) গাবায় হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ)এর দৌড়

গাবা মদীনা তাইয়্যেবাহ হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি আবাদী ছিল। সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উট চরিত। কাফেরদের একদল লোকসহ আবদুর রহমান ফাযারী উটসমূহ লুট করিয়া নিল, উটের রাখালকে হত্যা করিয়া ফেলিল। এই লুটতরাজকারীরা ঘোড়ায় সওয়ার ছিল এবং সশস্ত্র ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) সকালবেলায় তীর ধনুক লইয়া পায়ে হাটিয়া গাবার দিকে যাইতেছিলেন। হঠাৎ লুটেরাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বালক ছিলেন এবং খুব দৌড়াইতে পারিতেন। কথিত আছে, তাহার দৌড় অতুলনীয় ও প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি দৌড়াইয়া ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিতেন, কিন্তু ঘোড়া তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। সেই সঙ্গে তীর চালনায়ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া লুটতরাজের কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন। তীর–ধনুক তো সাথে ছিলই, স্বয়ং ঐ সকল লুটেরাদের ধাওয়া করিলেন। এমন কি তাহাদের নিকট পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেন এবং তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এমন দ্রুত একের পর এক তীর ছুঁড়িলেন যে, তাহারা ভাবিল যে, বিরাট দল রহিয়াছে। যেহেতু তিনি একা ছিলেন এবং পায়দলও ছিলেন এইজন্য যখন কেহ ঘোড়া ফিরাইয়া তাঁহার দিকে আসিত তখন তিনি কোন গাছের আড়ালে লুকাইয়া যাইতেন এবং আড়াল হইতে তাহার ঘোড়াকে তীর মারিতেন। ইহাতে ঘোড়া আহত হইত আর সেই ব্যক্তি এই মনে করিয়া ফিরিয়া যাইত যে, যদি ঘোড়া পড়িয়া যায় তাহলে আমি ধরা পড়িয়া যাইব। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) বলেন, মোটকথা, তাহারা পালাইতে থাকিল আর আমি ধাওয়া করিতে থাকিলাম। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উটগুলি তাহারা লুট করিয়াছিল উহা আমার পিছনে পড়িয়া গেল ইহা ছাড়া তাহারা নিজেদের ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটি চাদরও ফেলিয়া গেল। এমন সময় উয়াইনা ইবনে হিসন একটি দলসহ সাহায্যের জন্য তাহাদের নিকট পৌছিয়া গেল। ইহাতে উক্ত লুণ্ঠনকারীদের শক্তি বাড়িয়া গেল। আর ইহাও তাহারা জানিতে পারিল যে, আমি একা।

তাহারা কয়েকজন মিলিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করিল। আমি একটি পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেলাম। তাহারাও উঠিল। তাহারা যখন আমার নিকটে আসিয়া গেল তখন আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, একটু থাম প্রথমে আমার একটি কথা শুন। তোমরা কি আমাকে চিন, আমি কে? তাহারা বলিল, বল তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি ইবনে আকওয়া। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি আমাকে ধরিতে চায় তবে ধরিতে পারিবে না। আর আমি যদি তোমাদের কাহাকেও ধরিতে চাই তবে আমার হাত হইতে সে কখনও ছুটিতে পারিবে না। যেহেতু তাঁহার সম্পর্কে সাধারণভাবে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি খুব বেশী দৌড়াইতে পারেন। এমনকি আরবী ঘোড়াও তাঁহার মোকাবিলা করিতে পারে না। কাজেই এইরূপ দাবী কোন আশ্চর্য কিছু ছিল না। সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি এইভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকি আর আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট তো সাহায্য পৌঁছিয়া গিয়াছে ; মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমার সাহায্যও আসিয়া পৌঁছুক। কারণ, আমি মদীনায় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলাম।

মোটকথা, আমি তাহাদের সহিত ঐভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলাম আর গাছের ফাঁক দিয়া মদীনা মুনাওয়ারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ঘোড়সওয়ারদের একটি দল দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে সকলের আগে আখরাম আসাদী (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি আসা মাত্রই আবদুর রহমান ফাযারীর উপর হামলা করিলেন। আবদুর রহমানও তাঁহার উপর হামলা করিল। তিনি আবদুর রহমানের ঘোড়ার উপর আক্রমণ করিয়া উহার পা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ঘোড়া পড়িয়া গেল। আবদুর রহমান পড়িতে পড়িতে তাহার উপর হামলা করিয়া দিল। ইহাতে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া গেল। তাঁহার পিছনে আবু কাতাদা (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আক্রমন শুরু করিয়া দিলেন। আবদুর রহমান আবু কাতাদা (রাযিঃ)এর ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত করিল যাহার ফলে ঘোড়া পড়িয়া গেল এবং আবু কাতাদা (রাযিঃ) পড়িতে পড়িতে আবদুর রহমানের উপর আক্রমণ করিলেন, ফলে সে নিহত হইল। অতঃপর আবু কাতাদা (রাযিঃ) সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘোড়ার উপর যাহা আখরাম আসাদী (রাযিঃ)এর কাছে ছিল এবং এখন যাহার উপর আবদুর রহমান সাওয়ার ছিল চড়িয়া বসিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত সালামা (রাযিঃ) আখরাম আসাদী (রাযিঃ)কে আক্রমণ করিতে বাধাও দিয়াছিলেন যে, একটু অপেক্ষা করুন আমাদের দলের আরও লোকদের আসিতে দিন। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমাকে শহীদ হইতে দাও। বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই শাহাদত বরণ করেন এবং কাফেরদের বহু লোক এই যুদ্ধে মারা যায়। ইহার পর মুসলমানদের বিরাট দল আসিয়া পৌঁছে এবং তাহারা (কাফেররা) পালাইয়া যায়। সালামা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করিলেন যে, আমার সঙ্গে একশত লোক দিন আমি তাহাদের ধাওয়া করিব। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা নিজেদের দলে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রাযিঃ)এর বয়স তখন বার কি তের বছর ছিল। বার–তের বছরের বালকের ঘোড় সওয়ারদের এক বিরাট দলকে এইভাবে পালাইতে বাধ্য করে যে, তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। যাহা কিছু লুঠ করিয়াছিল উহাও ছাড়িয়া যায়, এমনকি নিজেদেরও সামানপত্র ছাড়িয়া যায়। ইহা ঐ এখলাসের বরকত ছিল যাহা আল্লাহ তায়ালা উক্ত জামাতকে দান করিয়াছিলেন।

(১০) বদরের যুদ্ধ এবং হযরত বারা (রাযিঃ)এর আগ্রহ

বদরের যুদ্ধ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল। কেননা ইহাতে মোকাবিলা বড় কঠিন ছিল আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অতি নগন্য। সর্বমোট তিনশত পনের জন লোক ছিলেন। যাহাদের নিকট মাত্র তিনটি ঘোড়া, ছয় অথবা নয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ও সত্তরটি উট ছিল। এক একটি উটের উপর পালাক্রমে কয়েকজন সওয়ার হইতেন এবং কাফেরদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল। যাহাদের সঙ্গে একশত ঘোড়া, সাতশত উট এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সামান ছিল। এইজন্য তাহারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে বাদ্যযন্ত্র এবং গায়িকা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিল। অপরদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। কেননা, মুসলমানগণ খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দলের অবস্থা অনুমান করিলেন তখন দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! এই সমস্ত মুসলমান নগ্ন পা, আপনিই ইহাদের সওয়ারী দানকারী। ইহারা বস্ত্রহীন,

আপনিই ইহাদের বস্ত্রদানকারী। ইহারা ক্ষুধার্ত, আপনিই ইহাদের অন্নদানকারী। ইহারা অভাবগ্রস্ত, আপনিই ইহাদেরকে সচ্ছলতা দানকারী।”

সুতরাং এই দোয়া কবুল হইল। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) উভয়ে যুদ্ধে শরীক হওয়ার আগ্রহে ঘর হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে রাস্তা হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (খামীস) এই উভয়জনকে উহুদের যুদ্ধ হইতেও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। উহুদের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের একবছর পর হইয়াছে। যখন উহাতেও বাচ্চাদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে বদরে তো আরও বেশী বাচ্চা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কেননা ছোটবেলা হইতেই এই আগ্রহ ও চেতনা অন্তরে ঢেউ খেলিত। তাই প্রত্যেক জেহাদে শরীক হওয়ার এবং অনুমতি লাভের চেষ্টা করিতেন।

(১১) হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর আপন পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সহিত আচরণ

৫ম হিজরীতে বনুল মুসতালিকের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহাতে একজন মুহাজের ও একজন আনসারীর মধ্যে পরস্পর লড়াই হইয়া গেল। সাধারণ বিষয় ছিল কিন্তু বড় আকার ধারণ করিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওমের নিকট অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিল। উভয় পক্ষে দল সৃষ্টি হইয়া গেল এবং পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। এমন সময় কিছু লোক মধ্যস্থতা করিয়া উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকদের সর্দার ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুনাফেক এবং মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিত বিধায় তাহার সহিত খারাপ আচরণ করা হইত না। আর ঐ সময় মুনাফেকদের সহিত সাধারণতঃ এই ব্যবহারই করা হইত। সে যখন এই ঘটনার খবর শুনিতে পাইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীমূলক উক্তি করিল এবং আপন বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই সমস্ত কিছু তোমাদেরই কর্মফল। তোমরা তাহাদিগকে নিজেদের শহরে স্থান দিয়াছ, নিজেদের সম্পদসমূহকে তাহাদের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন করিয়া দিয়াছ। তোমরা যদি তাহাদের সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দাও তবে এখনও তাহারা চলিয়া যাইবে এবং ইহাও বলিল যে, আল্লাহর কসম! আমরা যদি মদীনায় পৌঁছিয়া যাই তবে

আমরা সম্মানী ব্যক্তিগণ মিলিয়া এইসব অপদস্থ লোকদেরকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিব। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহা শুনিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! তুই অপদস্থ। তোকে তোর গোত্রের মধ্যেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তোর কোন সাহায্যকারী নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও সম্মান দান করা হইয়াছে এবং আপন গোত্রের মধ্যেও তিনি সম্মানিত।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আরে! চুপ থাক। আমি তো এমনিই ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলাম। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আবেদনও করিলেন যে, এই কাফেরের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন জানিতে পারিল যে, এই ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে তখন সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কসম খাইতে লাগিল যে, আমি এইরূপ কোন শব্দ বলি নাই। যায়েদ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আনসারদের মধ্য হইতেও কিছু লোক খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারাও সুপারিশ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ গোত্রের সর্দার ও একজন সম্মানী ব্যক্তি। একটি ছেলের কথা তাহার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নহে। হইতে পারে ভুল শুনিয়াছে অথবা ভুল বুঝিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাফাই গ্রহণ করিয়া নিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) যখন এইকথা জানিতে পারিলেন যে, সে মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেকে সত্যবাদী এবং যায়েদ (রাযিঃ)কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে তখন লজ্জায় বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। লজ্জায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

অবশেষে সূরায়ে মুনাফিকুন নাযিল হইল, যাহা দ্বারা হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সত্যবাদিতা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মিথ্যা কসমের অবস্থা প্রকাশ পাইয়া গেল। পক্ষ-বিপক্ষ সকলের দৃষ্টিতেই হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ঘটনাও সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। যখন মদীনা মুনাওয়ারা নিকটবর্তী হইল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র যাহার নামও আবদুল্লাহ ছিল

এবং বড় খাঁটি মুসলমান ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে তরবারী উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন আর পিতাকে বলিতে লাগিলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করিতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই কথা স্বীকার না করিবে যে, তুমিই অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল যে, এই ছেলে তো সর্বদাই পিতার সহিত অত্যন্ত সম্মানসুলভ ও উত্তম আচরণ করিত কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবিলায় সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে সে বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিল যে, আল্লাহর কসম আমি অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। ইহার পর মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিল। (খামীস)

(১২) হামরাউল আসাদ নামক যুদ্ধে হযরত জাবের (রাযিঃ)এর অংশগ্রহণ

উহুদের যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া মুসলমানগণ মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছিলেন। সফর এবং যুদ্ধের ক্লান্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছা মাত্রই এই সংবাদ পাইলেন যে, আবু সুফিয়ান যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হইয়াছে এইরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা এমন সুযোগ পুনরায় আর আসিবে কিনা জানা নাই। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাউজুবিল্লাহ হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে পুনরায় হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শুধু যাইবে এবং পুনরায় হামলা করিবার জন্য যাইতে হইবে। যদিও মুসলমানগণ ঐ সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সকলেই প্রস্তুত হইয়া গেলেন। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, শুধু যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই যাইবে তাই হযরত জাবের (রাযিঃ) আবেদন করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবারও আকাংখা ছিল কিন্তু আমার পিতা এই বলিয়া অনুমতি দেন নাই যে, আমার সাতটি বোন রহিয়াছে, অন্য কোন পুরুষ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে হইতে একজনকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। আর তিনি নিজে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়া ফেলিয়াছিলেন এই কারণে আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন না। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এখন আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন। তিনি ব্যতীত এমন আর কোন ব্যক্তি যান নাই যিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক হন নাই।

(খামীস)

ফায়দা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ)এর এইরূপ আগ্রহ ও আকাংখা সহকারে অনুমতি চাওয়া কতই না ঈর্ষাযোগ্য যে, মাত্র পিতার ইন্তিকাল হইয়াছে, পিতার যিম্মায় করজও অনেক বেশী। তাহাও আবার ইহুদী হইতে লওয়া হইয়াছিল যে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিত এবং বিশেষভাবে তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেছিল। ইহা ছাড়াও বোনদের ভরণপোষণের চিন্তা, কেননা পিতা সাতটি বোনও রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাদের কারণে পিতা তাহাকে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতিও দিয়াছিলেন না। যাহাদের কারণে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সবকিছুর উপর জেহাদের প্রেরণা ছিল প্রবল।

(১৩) রোমের যুদ্ধে হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর বীরত্ব

হিজরী ২৬ সনে হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে মিশরের প্রথম গভর্নর হযরত আমর ইবনে আ'স (রাযিঃ)এর স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ (রাযিঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বিশ হাজারের একটি সৈন্যদল সহ বাহির হইলেন। রোমক সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রোমক সেনাপতি জারজীর ঘোষণা করিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহকে যে ব্যক্তি হত্যা করিবে তাহার সহিত আমার কন্যাকে বিবাহ দিব এবং এক লক্ষ দীনার পুরস্কারও দিব। এই ঘোষণার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই। আমাদের পক্ষ হইতেও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, যে ব্যক্তি জারজীরকে হত্যা করিবে তাহার সহিত জারজীরের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইবে এবং এক লক্ষ দীনার পুরস্কার দেওয়া হইবে। উপরন্তু তাহাকে ঐ সমস্ত শহরের আমীরও বানাইয়া দেওয়া হইবে।

মোটকথা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লড়াই চলিতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ

(রাযিঃ) দেখিলেন যে, জারজীর সৈন্যদলের পিছনে রহিয়াছে এবং সৈন্যরা তাহার সামনে রহিয়াছে। দুইজন বাঁদী তাহাকে ময়ূরের পাখা দ্বারা ছায়াদান করিতেছে। তিনি অতর্কিতে সৈন্যদল হইতে সরিয়া একাকী যাইয়া তাহার উপর হামলা করিলেন। সে ভাবিতেছিল যে, এই লোকটি একা আসিতেছে হয়ত কোন সন্ধির খবর লইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি সোজা নিকটে পৌছিয়া তাহার উপর হামলা করিয়া দিলেন এবং তরবারী দ্বারা শিরোচ্ছেদ করিয়া বর্শার মাথায় উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। সবাই হতবাক হইয়া শুধু দেখিতেই রহিয়া গেল।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) অল্প বয়স্কই ছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম সন্তান তিনিই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কেননা, এক বৎসর যাবৎ কোন মুহাজিরের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তখন ইহুদীরা বলিয়াছিল যে, আমরা মুহাজিরদের উপর যাদু করিয়াছি, তাহাদের পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ বাচ্চাদেরকে বায়াত করিতেন না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)কে সাত বৎসর বয়সে বায়াত করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। এই বয়সে দুই লক্ষ সৈন্যের বাধা ডিঙাইয়া এইভাবে সেনাপতির শির কাটিয়া আনা সাধারণ ব্যাপার নহে।

(১৪) কুফর অবস্থায় হযরত আমর ইবনে সালামা (রাযিঃ)এর কুরআন পাক মুখস্থ করা

আমর ইবনে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমরা মদীনা তাইয়্যেবার পথে এক জায়গায় বসবাস করিতাম। মদীনায় যাতায়াতকারীগণ আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন। যাহারা মদীনা মুনাওয়ারাহ হইতে ফিরিয়া আসিতেন আমরা তাহাদের নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতাম, সেখানকার লোকদের কি অবস্থা, যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিতেছেন তাহার কি খবর? তাহারা অবস্থা বর্ণনা করিতেন যে, তিনি বলেন, আমার উপর ওহী আসে এবং এই সমস্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে। আমি অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম তাহারা যাহা বলিত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। এইভাবে মুসলমান হওয়ার আগেই আমার বেশ পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আরবের সমস্ত লোকেরা মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কাবাসীদের অপেক্ষা করিতেছিল। যখন মক্কা বিজয় হইয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্র

ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। আমার পিতাও আপন গোত্রের কিছুসংখ্যক লোকসহ গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া খেদমতে হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে শরীয়তের আহকামসমূহ বলিয়া দিলেন, নামায শিখাইলেন, জামাতে নামায আদায় করিবার নিয়ম বর্ণনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কুরআন শরীফ যাহার বেশী পরিমাণে মুখস্থ আছে সেই ইমামতির জন্য উত্তম। আমি যেহেতু আগন্তুকদের নিকট হইতে সবসময় কুরআনের আয়াতসমূহ শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম এইজন্য আমারই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ ছিল। সকলেই খোঁজ লইয়া দেখিল যে, গোত্রের মধ্যে আমার চাইতে অধিক কুরআন আর কাহারো মুখস্থ নাই। তখন তাহারা আমাকেই ইমাম বানাইয়া লইল। তখন আমার বয়স ছিল ছয় কি সাত বৎসর। কোন অনুষ্ঠান হইলে অথবা জানাযার নামাযের প্রয়োজন হইলে আমাকেই ইমাম বানানো হইত। (বুখারী, আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা দ্বীনের প্রতি স্বভাবগত ঝোঁক ও আসক্তির ফল ছিল যে, এই বয়সে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই কুরআন শরীফের বহু অংশ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। বাকী বাচ্চা ছেলের ইমামতির বিষয়। ইহা একটি মাসআলা সংক্রান্ত ব্যাপার। যাহাদের মতে জায়েয আছে তাহাদের নিকট আপত্তি নাই। আর যাহাদের মতে জায়েয নহে তাহারা বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাহাদের অর্থাৎ বালেগ ও বয়স্কদেরকেই বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যাহার কুরআন অধিক মুখস্থ আছে। ইহা দ্বারা বাচ্চাগণ উদ্দেশ্য ছিল না।

(১৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর আপন গোলামের পায়ে বেড়ি পরানো

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর গোলাম হযরত ইকরিমা (রহঃ) বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের আহকাম শিখানোর জন্য আমার পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কোথাও যাওয়া-আসা করিতে না পারি। তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়াইতেন ও হাদীস শরীফ পড়াইতেন। (বুখারী, ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ প্রকৃতপক্ষে পড়াশুনা এইভাবেই হইতে পারে। যাহারা পড়াশুনার সময় ঘুরাফেরা এবং হাটে-বাজারে বেড়াইতে আগ্রহী তাহারা

অনর্থক জীবন বরবাদ করে। এই কারণেই গোলাম ইকরিমা হযরত ইকরিমায় রূপান্তরিত হইলেন এবং বাহরুল উম্মাহ, হিবরুল উম্মাহ এই উপাধিতে মানুষ তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিল। কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, সমস্ত তাবেয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম চারজন, তন্মধ্যে হযরত ইকরিমা (রহঃ) একজন।

(১৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর শৈশবে কুরআন হিফয করা

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমার কাছে তাফসীর জিজ্ঞাসা কর। আমি বাল্যকালে কুরআন শরীফ হিফয করিয়াছি। অপর এক হাদীসে আছে, আমি দশ বৎসর বয়সে সর্বশেষ মঞ্জিল পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ ঐ যমানার শিক্ষা এইরূপ ছিল না, যেমন এই যমানায় আমরা ভিন্নভাষীদের রহিয়াছে। বরং যাহা কিছু পড়িতেন উহা তফসীর সহকারে পড়িতেন। এইজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাফসীরের বহু বড় ইমাম হইয়াছিলেন। কেননা, বাল্যকালের মুখস্থ বিষয় খুব ভালরূপে মনে থাকে। তাই তাফসীর সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, অন্যদের হইতে ইহার চেয়ে অনেক কম বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির হইতেছেন ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। আবু আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলেন, যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আমাদিগকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তাঁহারা বলিতেন, সাহাবা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কুরআনে পাকের দশটি আয়াত শিখিতেন। এই দশ আয়াত অনুযায়ী এলেম এবং আমল না হওয়া পর্যন্ত অপর দশ আয়াত শিখিতেন না। (মুন্তাখাব কাঃ উম্মাল)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর বয়স ছিল তের বৎসর। এই অল্প বয়সে তিনি তাফসীর ও হাদীস জ্ঞানে যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট কারামত এবং ঈর্ষাযোগ্য বিষয়। তিনি তাফসীরের ইমাম ছিলেন। বড় বড় সাহাবীগণ তাঁহার নিকট তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

অবশ্য ইহা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই দুয়ার বরকত ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেঞ্জায় তশরীফ লইয়া গেলেন। এস্তেঞ্জা হইতে ফিরিয়া দেখেন লোটাভরা পানি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কে রাখিয়াছে? উত্তরে বলা হইল, ইবনে

আব্বাস রাখিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই খেদমত ভাল লাগিল এবং দোয়া করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দ্বীনের জ্ঞান এবং কুরআনের বুঝ দান করুন। ইহার পর একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়িতেছিলেন। তিনিও নিয়ত বাঁধিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাত দ্বারা টানিয়া বরাবরে দাঁড় করাইলেন। কেননা, মুক্তাদী একজন হইলে ইমামের বরাবর দাঁড়ানো চাই। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল হইয়া গেলেন। তিনি খানিকটা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার বরাবরে আমি কিরূপে দাঁড়াইতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম ও দ্বীনি সমঝের জন্য দোয়া করিলেন। (ইসাবাহ)

(১৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) ঐ সকল এবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা দৈনিক কুরআন মজীদ এক খতম করিতেন। সারারাত্র এবাদতে মশগুল থাকিতেন এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এত অধিক মেহনতের উপর সতর্কও করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, ইহাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সারারাত্রি জাগ্রত থাকার কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শরীরেরও হক রহিয়াছে, পরিবার-পরিজনেরও হক রহিয়াছে এবং সাক্ষাতকারীদেরও হক রহিয়াছে। তিনি বলেন, আমার নিয়ম ছিল প্রতিদিন এক খতম করিতাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক মাসে এক খতম পড়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যৌবন ও শক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে বিশ দিনে এক খতম কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা অনেক কম, আমাকে আমার যৌবন ও শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। মোটকথা এইভাবে আরজ করিতে থাকিলাম। অবশেষে তিন দিনে এক খতম করিবার অনুমতি হইল।

তাহার অভ্যাস ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যাহাতে স্মরণ থাকে। এমনিভাবে তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিপিবদ্ধ হাদীসসমূহের একটি সংকলন ছিল উহার নাম তিনি 'সাদেকা' রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিতাম উহা মুখস্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম। লোকেরা আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো একজন মানুষ। কখনও রাগ ও নারাজীর কারণে কাহাকেও কিছু বলেন। কখনও খুশী এবং হাসি কৌতুক অবস্থায়ও কিছু বলেন, সুতরাং সব কথা লিখিও না। আমি লেখা বন্ধ করিয়া দিলাম। একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহা ব্যক্ত করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লিখিতে থাক, ঐ পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, এই মুখ হইতে খুশী বা নারাজী কোন অবস্থাতেই হক ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না। (আহমদ, ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বড় ধরনের আবেদ ও অধিক ইবাদতকারী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, সাহাবাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া আমার চাইতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কেহ নাই। কেননা তিনি লিখিতেন আমি লিখিতাম না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার বর্ণনা আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর চাইতেও অনেক বেশী। যদিও আমাদের যুগে হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর হাদীস তাহার চেয়েও অনেক বেশী পাওয়া যায়। ইহার অনেক কারণ রহিয়াছে। কিন্তু এত অধিক ইবাদত সত্ত্বেও ঐ যামানায় তাহার বর্ণিত প্রচুর হাদীস মওজুদ ছিল।

(১৮) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)এর কুরআন হিফয করা

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) ঐ সকল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা সেই যুগের বড় আলেম ও বড় মুফতী হিসাবে পরিগণিত হইতেন। বিশেষ করিয়া তিনি ফারায়েয শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ফতোয়া, বিচার, ফারায়েয ও কেরাত বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় লোকদের মধ্যে গণ্য হইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া

মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন ঐ সময় তিনি অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল এগার বৎসর। এইজন্যই প্রথম দিকের যুদ্ধসমূহ যেমন বদর প্রভৃতিতে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণের অনুমতি পান নাই। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে ছয় বৎসর বয়সে তিনি এতীমও হইয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছিলেন তখন অন্যান্য লোক যেমন তাঁহার খেদমতে হাজির হইতেছিলেন এবং বরকত হাসিলের জন্য বাচ্চাদিগকেও সঙ্গে আনিতেছিলেন তখন যায়েদ (রাযিঃ)কেও তাহার খেদমতে হাজির করা হইল। যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইল তখন আরজ করা হইল যে, এই ছেলেটি নাজ্জার গোত্রের। সে আপনার আগমনের পূর্বেই কুরআনে পাকের সতরটি সূরা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সূরায়ে কা'ফ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলাম। তিনি আমার পড়া পছন্দ করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নিকট যে সমস্ত চিঠি পাঠাইতেন সেইগুলি ইহুদীরাই লিখিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, ইহুদীদের দ্বারা যে সকল চিঠিপত্র লিখা হয় উহাতে আমার পূর্ণ আস্থা হয় না। হয়ত তাহারা কোন বেশকম করিয়া ফেলে। তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখিয়া লও। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি পনের দিনের মধ্যে তাহাদের হিব্রুভাষায় পারদর্শী হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে যেই সকল পত্র তাহাদের প্রতি পাঠানো হইত উহা আমিই লিখিতাম এবং যেই সকল পত্র ইহুদীদের পক্ষ হইতে আসিত উহা আমিই পড়িতাম।

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে কোন কোন লোকের নিকট সুরিয়ানী ভাষায় পত্র লিখিতে হয়, তাই আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখিতে বলিলেন। আমি সতর দিনে সুরিয়ানী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। (ফাতহুল বারী, ইসাবাহ)

(১৯) হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ)এর শৈশবে এলেম চর্চা

সাইয়্যেদ হযরত হাসান (রাযিঃ)এর জন্ম অধিকাংশের মতে ৩য় হিজরীর রমযান মাসে হয়। এই হিসাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁহার বয়স সাত বৎসর আরও কয়েক মাস

হয়। সাত বৎসর বয়সই বা কি, যাহাতে কোন ইলমী কৃতিত্ব অর্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার নিকট হইতে হাদীসের কয়েকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত রহিয়াছে। আবুল হাওরা নামক এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলাম। পথে সদকার খেজুরের একটি স্তূপ পড়িয়াছিল। আমি সেখান হইতে একটি খেজুর তুলিয়া মুখে দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাখ্, খাখ্। আর আমার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমরা সদকার মাল খাই না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শিখিয়াছি। (আহমদ)

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিতর নামাযে পড়িবার জন্য এই দোয়া শিখাইয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى
عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"হে আল্লাহ! আপনি যাহাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাকেও হেদায়াত দান করুন। আপনি যাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি আমার সমস্ত কাজের জিম্মাদার হইয়া যান যেমন আপনি আরো বহুলোকের জিম্মাদার রহিয়াছেন। আর যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন উহাতে বরকত দান করুন। আর যাহা কিছু আমার তকদীরে রাখিয়াছেন উহার ক্ষতি হইতে আমাকে বাঁচান ; আপনি যাহা চান তাহা করিতে সক্ষম। আপনার বিরুদ্ধে কেহ কোন ফয়সালা করিতে পারেনা। আপনি যাহার অভিভাবক হইয়া যান সে কখনও লাঞ্ছিত হইতে পারে না। আপনার সত্তা বরকতময় এবং সর্বোচ্চ ও সর্বমহান।"

ইমাম হাসান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানে বসিয়া থাকিবে সে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি পাইবে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) কয়েকবার পায়দল হজ্জ করিয়াছেন এবং

বলিতেন, আমার এই ব্যাপারে লজ্জা হয় যে, মৃত্যুর পর আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিব অথচ তাঁহার ঘরে পায়ে হাঁটিয়া যাই নাই।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পরহেযগার ছিলেন। মুসনাদে আহমদ কিতাবে তাঁহার নিকট হইতে একাধিক রেওয়ায়াত নকল করা হইয়াছে। তালকীহ নামক কিতাবের গ্রন্থকার তাঁহাকে ঐ সমস্ত সাহাবীর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যাহাদের নিকট হইতে তেরটি হাদীস নকল করা হইয়াছে। সাত বৎসর বয়সই বা কি, ঐ বয়সে এতগুলি হাদীস মুখস্থ রাখা এবং বর্ণনা করা প্রখর স্মরণশক্তি এবং চরম আগ্রহের প্রমাণ। আফাসোসের বিষয় যে, আমরা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আপন সন্তানদেরকে দ্বীনের সাধারণ বিষয়ও শিক্ষা দেই না।

(২০) হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর শৈশবকালে এলেমের প্রতি অনুরাগ

সাইয়্যেদ হযরত হুসাইন (রাযিঃ) আপন ভাই হযরত হাসান (রাযিঃ) হইতে এক বৎসরের ছোট ছিলেন। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স আরো কম ছিল, অর্থাৎ ছয় বৎসর কয়েক মাস। ছয় বৎসর বয়সের বাচ্চা দ্বীনি কথা কতটুকুই বা স্মরণ রাখিতে পারে কিন্তু হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতসমূহও হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মুহাদ্দিসগণ তাঁহাকে ঐ সমস্ত সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাহাদের নিকট হইতে আটটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমান পুরুষ হউক বা মহিলা যদি কোন মুসীবতে আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘদিন পর ঐ মুসীবতের কথা স্মরণ হয় আর সে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তবে তাহাকে তখনও ঐ পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে যেই পরিমাণ মুসীবতের সময় দেওয়া হইয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার উম্মত যখন নদীপথে কোন যানবাহনে সওয়ার হয় এবং সওয়ার হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করে—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে ইহা ডুবিয়া যাওয়া হইতে নিরাপত্তার কারণ হইবে।

হযরত হুসাইন (রাযিঃ) পায়ে হাঁটিয়া পঁচিশ বার হজ্জ করিয়াছেন। নামায, রোযা অধিক পরিমাণে আদায় করিতেন। সদকা-খাইরাত ও দ্বীনের অন্যান্য আমল অধিকহারে করার প্রতি যত্নবান ছিলেন।

রবীয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত হুসাইন (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিান বলিলেন, হাঁ, আমি একটি জানালার উপর উঠিলাম। সেখানে কিছু খেজুর রাখা ছিল। উহা হইতে আমি একটি খেজুর মুখে দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ফেলিয়া দাও, আমাদের জন্য সদকা জায়েয নয়।

হযরত হুসাইন (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হইল অনর্থক কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া। (উসুদুল গাবাহ, ইস্তীআব)

ইহা ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীস তাঁহার মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে যে, তাঁহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সংঘটিত বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা মুখস্থ রাখিয়াছেন।

মাহমূদ ইবনে রবী (রাযিঃ) নামক জনৈক সাহাবী যাহার বয়স হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় পাঁচ বৎসর ছিল তিনি বলেন, আমি সারাজীবন এই কথা ভুলিব না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের এখানে একটি কূপ ছিল। উহার পানি দ্বারা আমার মুখে একটি কুলি নিক্ষেপ করিলেন। (ইসাবাহ)

আমরা বাচ্চাদেরকে আজেবাজে ও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত করি, মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী শুনাইয়া বেকার জিনিস দ্বারা তাহাদের দেমাগ অস্থির করিয়া ফেলি। যদি আল্লাহওয়ালাদের কিচ্ছা কাহিনী তালাশ করিয়া তাহাদেরকে শুনান হয়, জিন–ভূত ইত্যাদির ভয় না দেখাইয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাই এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির গুরুত্ব ও ভয় তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি করি, তবে ইহা দুনিয়াতেও তাহাদের কাজে আসিবে আর আখেরাতে তো উপকারী হইবেই। বাচ্চা বয়সে স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ থাকে, তাই ঐ সময়কার মুখস্থ করা বিষয় কোন সময় ভুলে না। এই সময় যদি কুরআন হিফজ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে কোন কষ্টও হয় না সময়ও ব্যয় হয় না। আমি আমার পিতার নিকটও একাধিকবার শুনিয়াছি, আর আমাদের ঘরের বৃদ্ধাদের কাছেও শুনিয়াছি যে, আমার পিতার যখন দুধ ছাড়ানো হয় তখনই তাঁহার পোয়া পারা কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আর সাত বৎসর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ করিয়া ফেলেন। তিনি তাঁহার পিতা অর্থাৎ আমার দাদাকে না জানাইয়া

কয়েকটি ফারসী কিতাব যেমন, বুস্তাঁ, সেকান্দারনামা প্রভৃতিও পড়িয়া নিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, হিফয শেষ হওয়ার পর আমার পিতা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, দৈনিক এক খতম তেলাওয়াত করিবার পর তোমার ছুটি। আমি গরমের মওসুমে ফজরের নামাযের পর ঘরের ছাদের উপর বসিতাম এবং ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে পূর্ণ এক খতম তেলাওয়াত করিয়া দুপুরের খানা খাইতাম এবং বিকালে নিজের ইচ্ছাতে ফারসী পড়িতাম। ছয় মাস পর্যন্ত অবিরাম এই নিয়মই চলিতে থাকে। অর্থাৎ দৈনিক এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সাথে সাথে অন্যান্য সবক পড়িতে থাকা। উহাও আবার সাত বৎসর বয়সে, ইহা কোন মামুলী কথা নহে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, কুরআন শরীফের কোন অংশ ভুলিয়া যাওয়া বা এক আয়াত পড়িতে যাইয়া অন্য আয়াতে চলিয়া যাওয়া এমন কখনও হইত না। যেহেতু বাহ্যিক জীবিকা কিতাবের ব্যবসার উপর ছিল এবং কুতুবখানার অধিকাংশ কাজকর্ম নিজ হাতেই করিতেন তাই এইরূপ কখনও হইত না যে, হাতে কাজ করার সময় মুখে কুরআন তেলাওয়াত করিতেছেন না। আবার কখনও কখনও একই সঙ্গে আমাদিগকে যাহারা মাদ্রাসা হইতে আলাদা সময় পড়িতাম সবকও পড়াইয়া দিতেন। এইভাবে একসাথে তিনটি কাজ করিতেন। তবে তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের সহিত ঐরূপ ছিল না যেরূপ মাদ্রাসায় সবক পড়ানো হইত। সাধারণ মাদ্রাসাসমূহের প্রচলিত নিয়ম হইল সব কাজই উস্তাদের জিম্মায় থাকে। বরং বিশেষ ছাত্রদের ক্ষেত্রে তাহার নিয়ম এই ছিলে যে, ছাত্র কিতাব পড়িবে, তরজমা করিবে মতলব বয়ান করিবে। অর্থ সঠিক হইলে বলিতেন সামনে চল, আর যদি ভুল হইত তবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার মত হইলে সতর্ক করিয়া দিতেন আর বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইলে বলিয়া দিতেন। ইহা পুরাতন যুগের ঘটনা নহে ; এই শতাব্দীরই ঘটনা। অতএব এই কথা বলা যাইবে না যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ন্যায় শক্তি ও হিম্মত এখন কোথায় পাওয়া যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)এর প্রতি ভালবাসার নমুনা

যদিও এই পর্যন্ত যত ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে সবগুলি মহব্বতেরই আশ্চর্য দৃষ্টান্ত ছিল। মহব্বতই তাঁহাদের আবেগপূর্ণ জীবনের উৎস ছিল যাহার দরুন না জানের পরোয়া ছিল, না জীবনের আকাঙ্খা, না মালের

খেয়াল ছিল, না দুঃখ কষ্টের চিন্তা, না মৃত্যুর ভয়। ইহা ছাড়া মহব্বত ও ভালবাসা বর্ণনা করিবার বিষয় নহে। উহা এমন একটি অবস্থা যাহা ভাষা ও বর্ণনার বহু ঊর্ধ্বে। মহব্বতই এমন এক জিনিস যাহা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার পর মাহবূব অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেয়। উহার মোকাবিলায় লজ্জা শরম, মান মর্যাদা কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। আল্লাহ তায়ালা যদি স্বীয় অনুগ্রহে এবং আপন মাহবূবের অসীলায় তাঁহার এবং তাঁহার পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মহব্বত ও ভালবাসা দান করেন, তবে প্রত্যেক এবাদতে স্বাদ পাওয়া যাইবে এবং দ্বীনের জন্য সকল কষ্টই আরাম মনে হইবে।

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ইসলামের ঘোষণা ও নির্যাতন ভোগ

ইসলামের প্রথম যুগে যাঁহারা মুসলমান হইতেন তাঁহারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে যথাসাধ্য গোপন রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতেও কাফেরদের নির্যাতনের কারণে গোপন রাখার উপদেশ দেওয়া হইত। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ঊনচল্লিশে পৌঁছিয়া যায় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আবেদন জানাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বার বার অনুরোধের কারণে অবশেষে অনুমতি দিলেন এবং মুসলমানদিগকে লইয়া কাবাঘরে তাশরীফ লইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাবলীগি খুতবা পাঠ শুরু করিলেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম খুতবা। ঐ দিনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা (অর্থাৎ শহীদগণের সরদার) হযরত হামযা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার তিনদিন পর হযরত ওমর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। খুতবা শুরু হইতেই কাফের– মুশরেকরা চতুর্দিক হইতে আসিয়া মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যাহার সম্মান ও মর্যাদা মক্কার সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে, তাঁহার সম্পূর্ণ চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গেল। নাক কান রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাঁহাকে চেনা যাইতেছিল না। জুতা ও লাথি দ্বারা আঘাত করিল, পদদলন করিল। যাহা করা উচিত ছিল না সবই করিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বেহুঁশ হইয়া

গেলেন। তাঁহার গোত্র বনি তামীমের লোকেরা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। কাহারো এই ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না যে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এই পাশবিক অত্যাচার হইতে জীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারিবেন না। বনু তামীম মসজিদে আসিল এবং ঘোষণা করিল যে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যদি এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন তবে আমরা তাঁহার বদলায় উতবা ইবনে রবীয়াকে হত্যা করিব। উতবা হযরত ছিদ্দীকে আবকর (রাযিঃ)কে নির্যাতন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। ডাকাডাকি সত্ত্বেও সাড়া দিতে বা কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। সন্ধ্যায় অনেক ডাকাডাকির পর তিনি কথা বলিলেন। তবে সর্বপ্রথম কথা এই ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা এই ব্যাপারে তাঁহাকে বহু তিরস্কার করিল যে, তাহার সঙ্গে চলার কারণেই তো তোমার উপর এই বিপদ আসিয়াছে এবং সারাদিন মৃত্যুমুখে থাকিবার পর কথা বলিলে তো তাহাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই জযবা এবং তাঁহারই আকাঙ্খা! অতঃপর লোকজন তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কেননা বিরক্তিও ছিল আর ইহাও ছিল যে, শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন যেহেতু কথা বলিতে পারিয়াছেন। তাহারা হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে খাইরকে বলিয়া গেল যে, তাহার জন্য কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করুন। তিনি কিছু তৈরী করিয়া আনিলেন এবং খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর সেই একই কথা ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন, তাঁহার কি অবস্থা? তাহার মাতা বলিলেন, তিনি কেমন আছেন তাহা তো আমি জানি না। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, উম্মে জামীল (হযরত উমর (রাযিঃ)এর বোন)এর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাঁহার কি অবস্থা। সে বেচারী তাঁহার পুত্রের নির্যাতিত অবস্থায় ব্যাকুল মনের আবেদন পুরা করিবার জন্য উম্মে জামীলের নিকট গিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তখন পর্যন্ত নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কি জানি কে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর কে আবু বকর (রাযিঃ)? তবে তোমার ছেলের কথা শুনিয়া দুঃখ হইয়াছে। যদি তুমি বল তবে আমি যাইয়া তাহার অবস্থা দেখিতে পারি। উম্মে খাইর ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত গেলেন এবং হযরত আবু বকর

(রাযিঃ)এর অবস্থা দেখিয়া সহ্য করিতে পরিলেন না। বেদমভাবে কাঁদিতে শুরু করিলেন যে, পাপিষ্ঠরা কি অবস্থা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করুন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? উম্মে জামীল (রাযিঃ) হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর মাতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাঁহার ব্যাপারে ভয় করিও না। তখন উম্মে জামীল (রাযিঃ) ভাল খবর শুনাইলেন এবং বলিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? উম্মে জামীল (রাযিঃ) বলিলেন, আরকাম (রাযিঃ)এর ঘরে অবস্থান করিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জন্য খোদার কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন জিনিস খাইব, না পান করিব যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ না করিব। তাঁহার মায়ের অস্থিরতা ছিল যে, সে কিছু আহার করুক আর তিনি কসম খাইলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎ না করিব কিছুই খাইব না। কাজেই মাতা সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন যে, লোকদের চলাচল বন্ধ হইয়া যাক কারণ আবার কেহ দেখিয়া ফেলিলে কষ্ট দিতে পারে। যখন রাত্র গভীর হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে লইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরকাম (রাযিঃ)এর বাড়ীতে পৌঁছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন এবং সমস্ত মুসলমানগণও কাঁদিতে লাগিলেন। কেননা, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর অবস্থা দেখিয়া সহ্য করার মত ছিল না। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আবেদন করিলেন যে, ইনি আমার মাতা আপনি তাহার জন্য হেদায়েতের দোয়াও করুন এবং তাহাকে ইসলামের তাবলীগও করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দোয়া করিলেন অতঃপর তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ সুখ-শান্তি ও আনন্দের সময় মহব্বতের দাবীদার অসংখ্য পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত মহব্বত উহাই যাহা বিপদ ও কষ্টের সময়ও অটুট থাকে।

(২) হুযূর (সঃ)এর ইন্তিকালে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর শোকাবেগ

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর অতুলনীয় শক্তি, সাহস বীরত্ব ও বাহাদুরী যাহা আজ সাড়ে তের শত বৎসর পরও বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। আর ইসলামের প্রকাশ তাহার ইসলাম গ্রহণের কারণেই হইয়াছে। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখা বরদাশত করেন নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার মহব্বতের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এই যে, এত বাহাদুরী সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের অবস্থা সহ্য করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় খোলা তরবারি হাতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে, তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন রবের নিকট তাশরীফ লইয়া গিয়াছেন যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে তাশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিবেন। এবং ঐ সমস্ত লোকদের হাত–পা কাটিয়া দিবেন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মিথ্যা খবর রটাইতেছে। হযরত ওসমান (রাযিঃ) একেবারে নির্বাক ছিলেন, দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। চলাফেরা করিতেন কিন্তু কোন কথা বলিতেন না। হযরত আলী (রাযিঃ)ও নীরব ও নির্বাক বসিয়া রহিলেন। দেহে যেন স্পন্দনও ছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মধ্যেই দৃঢ়তা ছিল। তিনি সেই সময়ের পাহাড় সমতুল্য সমস্যার মোকাবিলা করিলেন এবং নিজের সেই মহব্বত সত্ত্বেও যাহা পূর্ববর্তী ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে আসিয়া প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মোবারকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, বসিয়া যাও। তার পর খুতবা পাঠ করিলেন, যাহার সারমর্ম এই ছিল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা জীবিত আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতঃপর তিনি কালামে পাকের এই আয়াত وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন (খামীস)।

"মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র (তিনি তো খোদা নহেন যে তাহার মৃত্যু আসিতে পারে না।) তাহার যদি ইন্তিকাল হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদও হইয়া যান তবে তোমরা কি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করিবে না (নিজেরই ক্ষতি করিবে) আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে প্রতিদান দিবেন।" (বয়ানুল কুরআন)

ফায়দা ঃ যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর দ্বারা খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লইবেন তাই সেই সময় এই অবস্থাটিই তাঁহার উপযোগী ছিল। এই কারণেই সেই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মধ্যে যতটুকু ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল তাহা আর কাহারো মধ্যে ছিল না। সেই সঙ্গে মীরাছ অর্থাৎ উত্তরাধিকার, দাফন ইত্যাদি বিষয়ে ঐ সময়ের উপযোগী মাসায়েল যে পরিমাণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)এর জানা ছিল সামগ্রিকভাবে আর কাহারো জানা ছিল না। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল যে, মক্কা মুকাররমায় দাফন করা হইবে নাকি মদীনা মুনাওয়ারায়, নাকি বাইতুল মোকাদ্দাসে তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, নবীর কবর ঐ জায়গায়ই হয় যেখানে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। অতএব যেখানে তাঁহার ইন্তিকাল হইয়াছে সেখানেই কবর খনন করা হউক। তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, আমাদের (নবীগণের) কোন ওয়ারিছ হয় না। আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাই তাহা সদকা স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর সে বেপরওয়াভাবে অবহেলা করিয়া অন্য কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করে, তাহার উপর লা'নত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, কোরাইশগণ এই বিষয়ের অর্থাৎ হুকুমতের জিম্মাদার হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩ হুযূর (সঃ)এর সংবাদ জানার জন্য এক মহিলার অস্থিরতা

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক কষ্টও ভোগ করিয়াছেন এবং অনেক লোক শহীদও হইয়াছেন। এই মর্মান্তিক খবর মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছিলে মহিলাগণ খবরা-খবর জানার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘর হইতে

বাহির হইয়া পড়েন। এক আনসারী মহিলা একটি দলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? দলের মধ্য হইতে কেহ বলিল, তোমার পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং ব্যাকুল হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতিমধ্যেই কেহ তাহার স্বামীর কেহ তাহার ছেলের কেহ তাহার ভাইয়ের ইন্তেকালের কথা শুনাইল, ইহারা সকলেই শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল আছেন এবং আসিতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে বলুন তিনি কোথায় আছেন। লোকেরা ইশারা করিয়া বলিল, ঐ দলের মধ্যে আছেন। তিনি দৌড়াইয়া গেলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভে চক্ষু শীতল করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর সমস্ত মুসীবত হালকা ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এক বর্ণনায় আছে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় ধরিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউক, আপনি যখন জীবিত ও সুস্থ আছেন তখন আর কাহারো মৃত্যুর পরোয়া নাই। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা ঐ সময়ে ঘটিয়াছে। তাই ঐতিহাসিকদের মধ্যে নামের ব্যাপারে মতভেদও রহিয়াছে। তবে সঠিক হইল, এই ধরনের ঘটনা একাধিক মহিলার সহিত ঘটিয়াছে।

(৪) হুদাইবিয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত মুগীরা (রাযিঃ)এর আচরণ এবং সাধারণ সাহাবীগণের কর্মধারা

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর এক বিরাট জামাত সহ রওয়ানা হইয়াছিলেন। মক্কার কাফেরদের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে হইবে। এই জন্য তাহারা বিরাট আকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিল এবং মক্কার বাহিরের লোকদিগকেও তাহাদের সহিত শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিল এবং বিরাট দল লইয়া মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। যুল হুলাইফা নামক স্থান হইতে এক

ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর লওয়ার জন্য পাঠাইলেন যিনি মক্কা হইতে বিস্তারিত অবস্থা জানিয়া উসফান নামক স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলিলেন যে, মক্কাবাসীরা বিরাট আকারে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য বাহির হইতেও বহু লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। এক পন্থা এই হইতে পারে যে, সমস্ত লোক বাহির হইতে সাহায্য করার জন্য গিয়াছে তাহাদের ঘর বাড়ীর উপর হামলা করা, যখন তাহারা এই সংবাদ পাইবে মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবে। অন্য পন্থা হইল সোজা সামনের দিকে চলা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুহূর্তে আপনি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য তো ছিলই না। তাই সামনের দিকে অগ্রসর হউন। তাহারা যদি আমাদিগকে বাধা দেয় তবে মোকাবিলা করিব নতুবা নহে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় পৌছিলে বুদাইল ইবনে ওরকা খুযায়ী একদল লোকসহ আসিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাইল যে, কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল উমরা করা। তাছাড়া দৈনন্দিন যুদ্ধ–বিগ্রহ কোরাইশদেরকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহারা সম্মত হইলে আমি তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে চুক্তি হইয়া যাক যে, তাহারা আমার পিছনে পড়িবে না আমিও তাহাদের পিছনে পড়িব না এবং আমাকে অন্যদের সহিত বুঝাপড়া করিবার সুযোগ দিক। আর যদি তাহারা কিছুতেই রাজী না হয় তবে ঐ জাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী না হইবে অথবা আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হইবে। বুদাইল বলিল, আচ্ছা, আমি আপনার পয়গাম তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিতেছি। সে ফিরিয়া গেল এবং যাইয়া পয়গাম পৌছাইল। কিন্তু কাফেররা রাজী হইল না। এমনিভাবে উভয় পক্ষ হইতে আসা যাওয়া চলিতে থাকিল। তন্মধ্যে একবার ওরোয়া ইবনে

মাসউদ সাকাফী কাফেরদের পক্ষ হইতে আসিলেন। তখনও তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন না, পরে মুসলমান হইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিতও একই আলোচনা করিলেন যাহা বুদাইলের সহিত করিয়াছিলেন। ওরোয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যদি আরবদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান তবে ইহা সম্ভব নহে। আপনি কি কখনও শুনিয়াছেন যে, আপনার পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি অতীত হইয়াছে, যে কিনা আরবদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে? আর যদি বিপরীত অবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারা আপনার উপর বিজয়ী হয় তবে মনে রাখুন, আমি আপনার সহিত ভদ্র শ্রেণীর লোকজন দেখিতেছি না, এদিক সেদিকের নিম্নশ্রেণীর লোকজন আপনার সহিত রহিয়াছে। বিপদের সময় সকলেই পালাইয়া যাইবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তুই তোর মাবুদ লাত–এর লজ্জাস্থান চাট। আমরা কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে পালাইয়া যাইব? এবং তাহাকে একা ছাড়িয়া দিব? ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার একটি অতীত অনুগ্রহ আমার উপর রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে দিতে পারি নাই যদি ইহা না হইত নতুবা এই গালির জবাব দিতাম। এই বলিয়া ওরোয়া পুনরায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তায় মশগুল হইয়া গেলেন এবং আরবদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কথাবার্তার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকের দিকে হাত বাড়াইতেন। কেননা খোশামোদ কারর সময় দাড়িতে হাত লাগাইয়া কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সাহাবা (রাযিঃ) ইহা কিভাবে সহ্য করিতে পারেন। ওরোয়ার ভাতিজা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিয়া অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তরবারীর বাট দ্বারা ওরোয়ার হাতে আঘাত করিয়া বলিলেন, হাত দূরে রাখ। ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুগীরা। ওরোয়া বলিলেন, হে গাদ্দার! তোর গাদ্দারীর ফল আমি এখন পর্যন্ত ভুগিতেছি আর তোর এই ব্যবহার। (হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন। উহার রক্তপণ

ওরোয়া আদায় করিয়াছিল। তিনি ঐদিকে ইঙ্গিত করিলেন। মোটকথা, তিনি দীর্ঘক্ষণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের অবস্থা পর্যবেক্ষণও করিয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর ফিরিয়া গিয়া কাফেরদের নিকট বলিলেন, হে কুরাইশ! আমি বড় বড় রাজা বাদশাহদের দরবারে গিয়াছি, কিসরা, কাইসার ও নাজাশীর দরবারও দেখিয়াছি এবং তাহাদের রীতি–নীতিও দেখিয়াছি, খোদার কসম! আমি কোন বাদশাহকে দেখি নাই যে, তাহার লোকেরা তাহার এইরূপ সম্মান করে যেরূপ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) লোকেরা তাহার সম্মান করে। যদি তিনি থু থু ফেলেন তবে যাহার হাতে পড়িয়া যায়, সে উহাকে শরীরে ও মুখে মাখিয়া লয়। যে কথা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুখ হইতে বাহির হয় উহা পালন করিবার জন্য সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাঁহার অযুর পানি পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া বন্টন করিয়া লয়, মাটিতে পড়িতে দেয় না। যদি কেহ পানির ফোটা না পায় তবে অন্যের ভিজা হাতে হাত মলিয়া নিজের মুখে মাখিয়া লয়। তাঁহার সামনে অত্যন্ত নিচু আওয়াজে কথা বলে, উচ্চ আওয়াজে কথা বলে না। আদবের কারণে তাঁহার দিকে চক্ষু উঠাইয়া দেখে না। যদি তাহার কোন দাড়ি বা চুল ঝরিয়া পড়ে তবে বরকতের জন্য উহা উঠাইয়া লয় এবং উহার সম্মান করে। মোটকথা আমি কোন দলকেই আপন মনিবের সহিত এত মহব্বত করিতে দেখি নাই, যত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর লোকজন তাঁহার সহিত করিয়া থাকে। এই অবস্থা চলাকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান (রাযিঃ)কে নিজের পক্ষ হইতে দূত হিসাবে মক্কার সরদারদের নিকট পাঠাইলেন। হযরত উছমান (রাযিঃ) মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহার ব্যাপারে তেমন আশংকা ছিল না। এই কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্বাচন করিয়াছিলেন। তিনি মক্কায় গেলেন। সাহাবীদের ঈর্ষা হইল যে, উছমান (রাযিঃ) তো আনন্দের সহিত কাবাঘর তাওয়াফ করিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আশা করি না যে, সে আমাকে ছাড়া তাওয়াফ করিবে। সুতরাং হযরত উছমান (রাযিঃ) যখন মক্কায় পৌঁছিলেন তখন আবান ইবনে সাঈদ তাঁহাকে নিরাপত্তা দিল এবং তাহাকে বলিল যে, যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার কেহ তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না। হযরত উছমান (রাযিঃ) আবু সুফিয়ান ও মক্কার

অন্যান্য সরদারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছাইতে থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন তখন কাফিররা নিজেরাই অনুরোধ করিল যে, তুমি মক্কা আসিয়াছ সুতরাং তাওয়াফ করিয়া যাও। তিনি জওয়াব দিলেন যে, ইহা আমার দ্বারা সম্ভব নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো বাধা দেওয়া হইয়াছে আর আমি তাওয়াফ করিব। কুরাইশরা এই উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত উছমান (রাযিঃ)কে আটক করিয়া রাখিল। মুসলমানদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, তাহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট হইতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করিয়া যাওয়ার বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। কাফেররা এই সংবাদ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেল এবং হযরত উছমান (রাযিঃ)কে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিল। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ঘটনায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর উক্তি, হযরত মুগীরা (রাযিঃ) কর্তৃক আঘাত করা, সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ যাহা ওরোয়া গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, হযরত উছমান (রাযিঃ)এর তাওয়াফ করিতে অস্বীকার করা—প্রত্যেকটি বিষয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অকৃত্রিম ও পরম ভালবাসার পরিচয় দেয়। উল্লেখিত ঘটনায় যে বায়াতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহাকে 'বায়াতুশ-শাজারা' বলা হয়। কুরআনে পাকেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ফাত্‌হের لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الاٰية আয়াতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ণ আয়াত তরজমাসহ পরিশিষ্টে আসিবে।

(৫) হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর রক্তপান

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শিংগা লাগাইলেন। উহার ফলে যে রক্ত বাহির হইল উহা কোথাও মাটির নীচে চাপা দেওয়ার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)কে দিলেন। তিনি গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চাপা দিয়া আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? তিনি বলিলেন, আমি পান করিয়া ফেলিয়াছি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাহার শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করিবে জাহান্নামের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার জন্যও মানুষের দ্বারা ধ্বংস রহিয়াছে আর

মানুষের জন্য তোমার দ্বারা। (খামীস)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহনির্গত জিনিস পায়খানা–প্রস্রাব ইত্যাদি পাক। এইজন্য ইহাতে কোন আপত্তি নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলিয়াছেন, 'ধ্বংস রহিয়াছে' ইহার অর্থ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, বাদশাহী ও হুকুমতের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ হুকুমত হইবে এবং লোকেরা উহাতে বাধা প্রদান করিবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)–এর জন্মের সময়ও এইরূপ একটি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নেকড়ে বাঘের দলের মধ্যে একটি দুম্বা। আর সেই নেকড়ে বাঘগুলি কাপড় পরিহিত হইবে। পরিশেষে ইয়াযীদ ও আবদুল মালিকের সহিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর বিখ্যাত যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন।

(৬) হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাযিঃ)এর রক্তপান

উহুদের যুদ্ধে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অথবা মাথা মুবারকে লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) দ্রুত আগাইয়া আসিলেন এবং অপরদিক হইতে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং আগে বাড়িয়া লোহার উক্ত কড়া দাঁত দ্বারা টানিতে আরম্ভ করিলেন। একটি কড়া বাহির করিলেন যদ্দরুন হযরত আবু ওবায়দা (রাযিঃ)এর একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উহার পরোয়া করিলেন না। অপর কড়াটি টান দিলেন আরেকটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সেই কড়াটি বাহির করিয়াই আনিলেন। ঐ কড়াগুলি বাহির হওয়ার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)এর পিতা মালেক ইবনে সিনান (রাযিঃ) নিজের ঠোঁটের সাহায্যে ঐ রক্ত চুষিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাহার রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিতে পারিবে না। (কুর্‌রাতুল উয়ূন)

(৭) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ)এর আপন পিতাকে অস্বীকার করা

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ) জাহিলিয়াতের যুগে তাহার

মাতার সহিত নানার বাড়ীতে যাইতেছিলেন। বনু কাইসের লোকেরা কাফেলাকে লুণ্ঠন করিল। তন্মধ্যে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)ও ছিলেন, তাহাকে মক্কার বাজারে বিক্রয় করিয়া দিল। হাকীম ইবনে হিযাম তাঁহাকে আপন ফুফী হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর জন্য খরিদ করিয়া নিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইল তখন তিনি হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা পুত্রের বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। আর এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা সন্তানের মহব্বত জন্মগত জিনিস। তিনি হযরত যায়েদের বিচ্ছেদে কাঁদিতেন আর শোকের কবিতা পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অধিকাংশ সময় যে সমস্ত কবিতা পাঠ করিতেন সেইগুলির মোটামুটি অর্থ এই—

'আমি যায়েদের স্মরণে কাঁদিতেছি, আর ইহাও জানিনা যে, সে কি জীবিত আছে, তবে তাহার আশা করিতাম। নাকি মৃত্যু তাহাকে শেষ করিয়া দিয়াছে। খোদার কসম, আমি ইহাও জানি না, হে যায়েদ! তোমাকে কোন নরম জমিন ধ্বংস করিয়াছে নাকি কোন পাহাড় ধ্বংস করিয়াছে? হায়! যদি জানিতে পারিতাম যে, জীবনে কোন দিন তুমি ফিরিয়া আসিবে কিনা! সারা দুনিয়াতে আমার একমাত্র আকাঙ্খা তোমার ফিরিয়া আসা। যখন সূর্যোদয় হয় তখনও যায়েদ স্মরণে আসে। যখন বৃষ্টি বর্ষণের সময় হয় তখনও তাহারই স্মরণ আমাকে ব্যথিত করে। যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তখন উহাও তাহার স্মৃতিকে জাগরিত করে। হায়! আমার চিন্তা ও দুঃখ কতই না দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার তালাশ এবং চেষ্টায় সারা পৃথিবীতে উটের দ্রুতগতিকে ব্যবহার করিব এবং সমগ্র দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব ক্লান্ত হইব না। উট চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যায় তো যাইবে কিন্তু আমি কখনও ক্লান্ত হইব না। আমি সারাজীবন এইভাবে শেষ করিয়া দিব। হাঁ, যদি আমার মৃত্যুই আসিয়া যায় তবে তো ভাল। কেননা মৃত্যু সবকিছুকেই ধ্বংস করিয়া দেয়। মানুষ চাই যত আশাই করুক কিন্তু আমি আমার পরে অমুক অমুক আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদিগকে অসিয়ত করিয়া যাইব যেন তাহারাও এমনিভাবে যায়েদকে তালাশ করিয়া ফিরে।'

মোটকথা তিনি এই সমস্ত কবিতা পড়িতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার গোত্রের কিছুলোক হজ্জে গেল এবং তাহারা যায়েদ (রাযিঃ)কে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল। তাঁহাকে

পিতার অবস্থা শুনাইল কবিতা শুনাইল এবং তাহার স্মরণ ও বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী শুনাইল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তাহাদের মাধ্যমে পিতার নিকট তিনটি কবিতা বলিয়া পাঠাইলেন যাহার অর্থ এই ছিল—

"আমি এখানে মক্কায় আছি ভাল আছি। আপনারা আমার জন্য কোন দুঃখ ও চিন্তা করিবেন না। আমি অত্যন্ত দয়ালু লোকদের গোলামীতে আছি।"

তাহারা যাইয়া হযরত যায়েদের হাল অবস্থা তাহার পিতাকে জানাইল এবং যায়েদ (রাযিঃ) যে কবিতাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেইগুলিও শুনাইল এবং ঠিকানা বলিয়া দিল। যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা ও চাচা কিছু মুক্তিপণ লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় পৌছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিলেন এবং আরজ করিলেন, হে হাশেমের বংশধর! এবং আপন গোত্রের সরদার, হরম শরীফের অধিবাসী এবং আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা স্বয়ং কয়েদীদেরকে মুক্ত করেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন। আমরা আমাদের ছেলের তালাশে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, দয়া করুন এবং মুক্তিপণ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিন। বরং মুক্তিপণ যাহা আসে উহার চাইতেও বেশী গ্রহন করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি ব্যাপার? তাহারা বলিল, আমরা যায়েদের খোঁজে আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুধু এই ব্যাপার! তাহারা আরজ করিলেন, হুযূর, শুধু ইহাই উদ্দেশ্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর যদি সে তোমাদের সহিত যাইতে চায় তবে মুক্তিপণ ছাড়াই তাহাকে দান করিলাম। আর যদি যাইতে না চায়, তবে আমি এমন ব্যক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারি না যে নিজেই যাইতে চাহে না। তাহারা বলিল, আপনি আমাদের দাবীর চেয়ে বেশী অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমরা ইহা খুশীতে মানিয়া লইলাম।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) কে ডাকা হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে চিন? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ, চিনি। ইনি আমার পিতা আর ইনি আমার চাচা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমার অবস্থা সম্পর্কে জান। এখন তোমার ইচ্ছা, যদি আমার কাছে থাকিতে চাও তবে আমার কাছে থাক, ইহাদের সহিত যাইতে চাহিলে অনুমতি আছে।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর! আমি কি আপনার

মোকাবিলায় অন্য কাহাকেও পছন্দ করিতে পারি? আপনি আমার পিতাতুল্য ও চাচাতুল্যও। পিতা ও চাচা বলিল, হে যায়েদ! তুমি আযাদীর তুলনায় গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতেছ আর বাপ, চাচা ও পরিবারের লোকদের চেয়ে গোলাম থাকাকেই পছন্দ করিতেছ? হযরত যায়েদ (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করিয়া) বলিলেন, আমি তাঁহার মধ্যে এমন বিষয় দেখিতে পাইয়াছি যাহার মোকাবিলায় অন্য কোন বস্তুকেই পছন্দ করিতে পারি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুনিয়া তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে আপন পুত্র বানাইয়া লইলাম। যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা এবং চাচাও এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং খুশিমনে তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। (খামীস)

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) ঐ সময় বাচ্চা ছিলেন। বাচ্চা অবস্থায় পিতামাতা পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া গোলাম থাকাকে পছন্দ করা কতখানি মহব্বতের পরিচয় দেয় তাহা পরিস্কার বুঝা যায়।

(৮) উহুদের যুদ্ধে হযরত আনাস ইবনে নজর (রাযিঃ)এর আমল

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতেছিল তখন কেহ এই গুজব রটাইয়া দিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এই ভয়াবহ সংবাদের যেইরূপ প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের উপর পড়ার ছিল তাহা সুস্পষ্ট। এই কারণে মুসলমানরা আরো বেশী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হযরত আনাস ইবনে নজর (রাযিঃ) হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের মধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ) এবং হযরত তালহা (রাযিঃ)এর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে মুসলমানদেরকে চিন্তিত দেখা যাইতেছে কেন? তাহারা বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তোমরাই বা জীবিত থাকিয়া কি করিবে? তরবারী হাতে লও এবং যাইয়া মৃত্যুবরণ কর। সুতরাং হযরত আনাস (রাযিঃ) নিজে তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন যতক্ষণ শহীদ না হইলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য ছিল, যাহার দর্শন লাভের জন্য বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল, যখন তিনিই থাকিলেন না তখন আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? সুতরাং এই কথার উপরে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

(৯) উহুদ যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে রবী (রাযিঃ)এর পয়গাম

এই উহুদের যুদ্ধেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সা'দ ইবনে রবী এর অবস্থা জানা গেল না, তাহার কি হইল? অতঃপর এক সাহাবী (রাযিঃ)কে তাহার খোঁজে পাঠাইলেন। তিনি শহীদগণের মধ্যে তালাশ করিতেছিলেন এবং নাম ধরিয়া ডাকিতেও ছিলেন এই মনে করিয়া যে, হয়ত জীবিত আছেন। অতঃপর চিৎকার দিয়া বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠাইয়াছেন সাদ ইবনে রবী–এর খবর নেওয়ার জন্য। তখন এক জায়গা হইতে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ আসিল। তিনি ঐদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) সাতজন শহীদের মধ্যে পড়িয়া আছেন এবং সামান্য নিঃশ্বাস বাকী আছে। যখন তিনি নিকটে পৌঁছিলেন তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সালাম আরজ করিবে আর বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে অতি উত্তম বদলা যাহা দান করিয়াছেন আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে উহার চাইতেও উত্তম বদলা দান করুন। আর মুসলমানদেরকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে যে, যদি কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি চক্ষুও দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে অর্থাৎ জীবিত থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। এই বলিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে এমন বিনিময় দান করুন যাহা কোন সাহাবীকে কোন নবীর উম্মতের পক্ষ হইতে দান করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই এই সকল জীবন উৎসর্গকারীগণ প্রাণ উৎসর্গের বাস্তব প্রমাণ দিয়াছেন (আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের কবর নূরে পরিপূর্ণ করিয়া দিন।) জখমের উপর জখম লাগিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে তথাপি কোন অভিযোগ কোন ভয়–ভীতি কোন পেরেশানীর অবকাশ নাই। কোন আকাংখা বা আগ্রহ থাকিলে তাহা শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জন্য জান কোরবান করার। হায়! আমার মত অধমেরও যদি ঐ মহব্বতের কিছু অংশ লাভ হইত!

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর দেখিয়া এক মেয়েলোকের মৃত্যু

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট একজন মেয়েলোক আসিয়া বলিল, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারক যিয়ারত করাইয়া দিন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুজরা শরীফ খুলিলেন। সে যিয়ারত করিল এবং যিয়ারত করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুবরণ করিল। (শিফা)

ফায়দা ঃ এমন এশ্‌ক ও মহব্বতের নজীর কি কোথাও মিলিবে? কবর যিয়ারত ও সহ্য করিতে পারিল না এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল।

(১১) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মহব্বতের বিভিন্ন ঘটনা

হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার মহব্বত কি পরিমাণ ছিল? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, খোদায়ে পাকের কসম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ হইতে, আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে, আমাদের মাতাগণ হইতে এবং কঠিন পিপাসার অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় ছিলেন।

ফায়দা ঃ সত্য বলিয়াছেন। বাস্তবে সাহাবায়ে কেরামদের এই অবস্থাই ছিল। আর হইবে না কেন? যখন তাঁহারা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ছিলেন, আর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

অর্থ—আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর ঐ ধনসম্পদ যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, আর ঐ ব্যবসা যাহার মধ্যে লোকসানের আশংকা কর আর ঐ ঘরবাড়ী যাহা তোমরা ভালবাস যদি (এইসব কিছু) তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং তাঁহার

রাসূল ও তাঁহার পথে জেহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য লোকদিগকে তাহাদের মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছান না। (বয়ানুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত এই সমস্ত জিনিস হইতে কম হওয়ার ব্যাপারে ভয় দেখানো হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট আমার মহব্বত ও ভালবাসা তাহার পিতা, সন্তান–সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ হইতে বেশী না হইবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, উপরোক্ত হাদীসে মহব্বত দ্বারা এখতিয়ারী মহব্বত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত মহব্বতকে বুঝানো হইয়াছে। গায়ের এখতেয়ারী অর্থাৎ স্বভাবসুলভ বা অনিচ্ছাকৃত মহব্বত এখানে উদ্দেশ্য নহে। ইহাও হইতে পারে যে, যদি স্বভাবসুলভ মহব্বত উদ্দেশ্য হয় তবে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ দর্জার ঈমান উদ্দেশ্য হইবে—যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মধ্যে ছিল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি বস্তু এমন যে ব্যক্তির মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে ঈমানের স্বাদ ও ঈমানের মজা তাহার নসীব হইয়া যাইবে। এক ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত অন্য সমস্ত জিনিস হইতে বেশী হইবে। দুই ঃ কাহাকেও ভালবাসিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসিবে। তিন ঃ কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার কাছে এমন কষ্টকর ও মুশকিল মনে হয় যেমন আগুনে পতিত হওয়া।

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার জান ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বেশী প্রিয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মহব্বত তাহার নিকট তাহার জানের চাইতেও বেশী না হইব। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমার নিকট আমার জানের চাইতেও বেশী প্রিয়। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনে, এখন হে ওমর!

আলেমগণ এই কথার দুইটি অর্থ বলিয়াছেন। একটি হইল এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপরটি হইল সতর্ক করা হইয়াছে অর্থাৎ

এতক্ষণে তোমার মধ্যে এই জিনিস পয়দা হইয়াছে যে, আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, অথচ ইহা তো প্রথম হইতেই হওয়া উচিত ছিল।

সুহাইল তুস্তারী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের অভিভাবক মনে না করে এবং নিজের নফসকে নিজের মালিকানায় মনে করে সে সুন্নতের স্বাদ পাইতে পারে না।

এক সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন যে, কেয়ামত কখন আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ যে, উহার অপেক্ষা করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অধিক পরিমাণ নামায, রোযা ও সদকা তো তৈয়ার করিয়া রাখি নাই, তবে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত আমার অন্তরে রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি তাহারই সহিত থাকিবে যাহার সহিত মহব্বত রাখিয়াছ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, "মানুষের হাশর তাহারই সহিত হইবে যাহার সহিত তাহার মহব্বত রহিয়াছে।" এই হাদীস কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ), সাফওয়ান (রাযিঃ), আবু যর (রাযিঃ) প্রমুখ রহিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এই এরশাদ শুনিয়া যত খুশি হইয়াছেন আর কোন কিছুতেই এত খুশী হন নাই। আর ইহা স্পষ্ট বিষয় যে, এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তো তাহাদের শিরা-উপশিরায় গাঁথা ছিল। সুতরাং তাহারা কেন খুশী হইবেন না।

হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘর প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটু দূরে ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার মনে চাহিতেছিল যে, তোমার ঘর যদি একেবারে নিকটে হইত। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, হারেছা (রাযিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে। তাহাকে বলিয়া দিন, সে যেন আমার ঘরের সহিত বিনিময় করিয়া লয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সহিত আগেও বিনিময় হইয়াছে এখন তো

লজ্জা হইতেছে। হারেছা (রাযিঃ) এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে হওয়া চাহিতেছেন। এইগুলি আমার ঘর। এইগুলি হইতে নিকটবর্তী আর কোন ঘর নাই। যেই ঘরটি পছন্দ হয় বিনিময় করিয়া নিন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এবং আমার মাল তো আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের জন্যই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! খোদার কসম আপনি যে মাল নিয়া নিবেন উহা আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ঐ মাল হইতে যাহা আমার কাছে থাকিয়া যাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন এবং ঘর বিনিময় করিয়া লইলেন। (তাবাকাত)

এক সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আপনার মহব্বত আমার নিকট আমার জানমাল এবং পরিবার–পরিজনের চাইতে বেশী। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়ে তখন সহ্য করিতে পারি না যেই পর্যন্ত আপনার খেদমতে হাজির হইয়া আপনার যিয়ারত না করিব। আমার চিন্তা হয় যে, মৃত্যু তো আপনারও আসিবে আমারও অবশ্যই আসিবে। ইহার পর আপনি নবীদের মর্তবায় চলিয়া যাইবেন। আমার ভয় হয় আর আপনাকে দেখিতে পাইব না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার উত্তরে চুপ থাকিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং এই আয়াত শুনাইলেন—

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

অর্থ—যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করিবে তাহারাও জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকের সহিত থাকিবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ। আর ইহারা অতি উত্তম সঙ্গী এবং তাহাদের সঙ্গলাভ একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে খুব ভালরূপে অবগত আছেন।

এই ধরনের ঘটনা বহু সাহাবীর জীবনে ঘটিয়াছে। আর এইরূপ হওয়া জরুরী ছিল। কেননা যেখানে মহব্বত সেখানে হাজারো সন্দেহ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীর উত্তরে এই আয়াতই শুনাইলেন।

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আপনার সহিত এইরূপ মহব্বত যে, যখন আপনার কথা মনে পড়ে যদি ঐ সময় যিয়ারত না করিয়া লই তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু আমার চিন্তা হইল যে, আমি যদি জান্নাতে দাখিলও হই তবুও আপনার নিচের দরজায় থাকিব। আপনার দীদার ব্যতীত আমার জন্য জান্নাতও বড় কষ্ট হইবে। তখন তিনি উক্ত আয়াতই শুনাইলেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি চিন্তাযুক্ত কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি চিন্তায় আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চিন্তা? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সকাল–বিকাল আপনার খেদমতে হাজির হই, আপনার যিয়ারত করিয়া আনন্দ লাভ করি, আপনার খেদমতে বসি। কাল কিয়ামতে তো আপনি নবীদের মর্তবায় পৌঁছিয়া যাইবেন, আমরা তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিব না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকিলেন। যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আনসারী (রাযিঃ)কেও ডাকিলেন এবং তাহাকে ইহার সুসংবাদ দিলেন।

এক হাদীসে আছে, বহু সাহাবী এই ধরনের প্রশ্ন করিয়াছেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এই আয়াত শুনাইয়াছেন।

এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো সুস্পষ্ট বিষয় যে, নবীর মর্যাদা উম্মতের উপরে রহিয়াছে। জান্নাতে তাঁহারা উপরের দরজায় থাকিবেন। তাহা হইলে একত্র হওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উপরের স্তরের লোকেরা নিচের স্তরের লোকদের নিকট আসিবে, তাহাদের নিকটে বসিবে কথাবার্তা বলিবে। (দুররে মানসূর)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার সহিত অধিক মহব্বতকারী কিছুলোক এমন হইবে যাহারা আমার পরে জন্মগ্রহণ

করিবে এবং তাহাদের এই আকাংখা হইবে যে, যদি সমস্ত ধনসম্পদ ও পরিবার–পরিজনের বিনিময়েও আমাকে দেখিতে পারিত!

খালেদ (রাযিঃ)এর কন্যা আবদা বলেন, আমার পিতা যখনই ঘুমানোর জন্য শুইতেন ঘুম না আসা পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ মহব্বত ও আগ্রহে বিভোর হইয়া থাকিতেন আর মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের নাম লইয়া স্মরণ করিতে থাকিতেন আর বলিতেন যে, ইহারাই আমার মূল ও শাখা। (অর্থাৎ বড় এবং ছোট)। তাহাদের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে। হে আল্লাহ! আমাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিয়া দিন, যাহাতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। এই বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া যাইতেন।

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার পিতার মুসলমান হওয়ার চেয়ে আপনার চাচা আবু তালেবের মুসলমান হইয়া যাওয়া বেশী কাম্য। কেননা উহাতে আপনি বেশী খুশী হইবেন। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা মুসলমান হওয়ার চেয়ে অধিক খুশীর বিষয়। কেননা আপনার ইসলাম গ্রহণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার রাত্রিবেলায় পাহারা দিতেছিলেন। একটি ঘর হইতে বাতির আলো দেখিতে পাইলেন এবং এক বৃদ্ধার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। সে পশম ধুনিতেছিল আর কবিতা পাঠ করিতেছিল, যাহার অর্থ এই—

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নেকলোকদের দুরূদ পৌছুক এবং পাক–পবিত্র পুণ্যবান লোকদের তরফ হইতে দুরূদ পৌছুক। নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাত্রিবেলায় এবাদতকারী ছিলেন এবং শেষ রাত্রে ক্রন্দনকারী ছিলেন। হায়! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আমি ও আমার মাহবুব কখনও একত্রিত হইতে পারিব কিনা। কারণ মৃত্যু বিভিন্ন অবস্থায় আসে। জানিনা আমার মৃত্যু কেমন অবস্থায় আসিবে। আর মৃত্যুর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা।

হযরত ওমর (রাযিঃ)ও এই কবিতাসমূহ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত বিলাল (রাযিঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন তাঁহার ইন্তিকালের সময় হইল, তখন তাঁহার স্ত্রী বিচ্ছেদের শোকে অস্থির হইয়া

বলিতে লাগিলেন, হায় আফসোস! তিনি বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! কতই না আনন্দের বিষয়! কাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করিব এবং তাঁহার সাহাবীগণের সহিত মিলিত হইব।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর ঘটনা—(যাহা ৫ম অধ্যায় ৯নং ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে) যখন তাঁহাকে শূলিতে চড়ানো হইতেছিল তখন আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, আমরা তোমাকে মুক্ত করিয়া দেই আর (খোদা না করুন) তোমার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যবহার করি? তখন যায়েদ (রাযিঃ) উত্তরে বলিলেন, খোদার কসম, আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরে থাকা অবস্থায় কাঁটাবিদ্ধ হইবেন আর উহার পরিবর্তে আমি আমার ঘরে আরামে থাকিতে পারিব। আবু সুফিয়ান বলিতে লাগিল, আমি কখনও কোন ব্যক্তির সহিত কাহাকেও এই পরিমাণ মহব্বত করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার সঙ্গীদের মহব্বত রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার বিভিন্ন আলামত উল্লেখ করিয়াছেন। কাযী ইয়ায বলেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে মহব্বত করে সে উহাকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। মহব্বতের অর্থ ইহাই। এইরূপ না হইলে উহা মহব্বত নহে বরং মহব্বতের দাবী মাত্র। অতএব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলামত হইল তাঁহার অনুসরণ করা, তাঁহার তরীকা অবলম্বন করা এবং তাঁহার কথা ও কাজ অনুযায়ী চলা, তাঁহার হুকুমসমূহ পালন করা, তিনি যেসব বিষয় হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাকা। সুখে–দুঃখে, অভাবে–সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় তাঁহার তরীকার উপর চলা। কুরআনে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ—আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসিয়া থাক তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন আর আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়াবান।

পরিশিষ্ট

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সহিত ব্যবহার ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর এই কয়েকটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ লেখা হইয়াছে, নতুবা তাহাদের অবস্থা বড় বড় কিতাবেও সংকুলান হইবে না। উর্দুতেও এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট কিতাবাদি পাওয়া যায়। কয়েক মাস হইল এই কিতাবটি লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু মাদ্রাসার ব্যস্ততা এবং অন্যান্য সাময়িক অসুবিধার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিয়াই শেষ করিতেছি, যেন যাহা লেখা হইয়াছে তাহা উপকারী হয়।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া একান্ত জরুরী মনে করিতেছি। আর তাহা এই যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে যেইক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের অন্যান্য বহু বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে সেইক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর হক এবং তাহাদের আদব এহতেরামের ব্যাপারেও সীমাহীন ত্রুটি হইতেছে। বরং ইহা অপেক্ষাও মারাত্মক হইল দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন কিছু লোক তো তাহাদের শানে বেয়াদবী পর্যন্ত করিয়া বসে। অথচ সাহবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইলেন দ্বীনের বুনিয়াদ। সর্বপ্রথম তাঁহারাই দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন। সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাদের হক আদায় করিতে পারিব না। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাঁহাদের প্রতি লাখো রহমত নাযিল করুন। কেননা তাঁহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দ্বীন হাসিল করিয়া আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। তাই এই পরিশিষ্টে কাযী ইয়ায (রহঃ)এর শিফা নামক কিতাবের একটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত তরজমা যাহা এই ক্ষেত্রে উপযোগী, উল্লেখ করিতেছি এবং ইহার উপরেই এই পুস্তিকা সমাপ্ত করিতেছি।

তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে তাঁহার সাহাবীগণকে সম্মান করা, তাঁহাদের হক জানা, তাঁহাদের অনুসরণ করা, তাঁহাদের প্রশংসা করা, তাঁহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তাঁহাদের পারপস্পরিক মতানৈক্য সম্পর্কে সমালোচনা না করা। ঐতিহাসিক, শিয়া, বেদআতী এবং জাহেল বর্ণনাকারীদের ঐ সমস্ত বর্ণনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, যাহা তাঁহাদের

সম্পর্কে অবমাননাকর। যদি এই ধরনের কোন বর্ণনা কানে আসে তবে উহার কোন ভাল ব্যাখ্যা করিবে এবং কোন ভাল অর্থ নির্ধারণ করিবে যাহা তাঁহাদের শানের উপযোগী হয়। তাঁহাদের কোন দোষ বর্ণনা করিবে না বরং তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিবে এবং দোষণীয় বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিবে। যেমন হুযূর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমার সাহাবীদের (মন্দ) আলোচনা হয় তখন চুপ থাক।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ—মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর যাহারা তাহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদের মোকবিলায় অত্যন্ত কঠোর আর পরস্পরে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে তাহারা কখনও রুকু অবস্থায় আছে কখনও সেজদারত আছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির তালাশে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের বন্দেগীর আলামত তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুট হইয়া আছে। তাহাদের এইসব গুণ তাওরাতে রহিয়াছে আর ইঞ্জিলে তাহাদের এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন শস্য যাহা প্রথমে আপন অঙ্কুর বাহির করিল, অতঃপর উহা আপন অংকুরকে শক্তিশালী করিল, অর্থাৎ উক্ত শস্য মোটা তাজা হইল। তারপর উহা আরও মোটা তাজা হইল অতঃপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা দাঁড়াইয়া গেল, ফলে কৃষকদের আনন্দবোধ হইতে লাগিল। (তদ্রূপ সাহাবাদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল, অতঃপর দিন দিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে এই জন্য এইরূপ ক্রমোন্নতি দান করিলেন) যেন কাফেরদিগকে হিংসার আগুনে বিদগ্ধ করেন। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল ব্যক্তিদের সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন।

'তাওরাত' শব্দের উপর যদি আয়াত শেষ হয় তবে এরূপ তরজমা হইবে যাহা উপরে করা হইয়াছে। আর আয়াতের পার্থক্যের কারণে অর্থেও পার্থক্য হইয়া যাইবে, যাহা তফসীরের কিতাবসমূহ হইতে বুঝা যাইতে পারে। উক্ত সূরারই অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝ وَّمَغَانِمَ
كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন (যাহারা আপনার সফরসঙ্গী), যখন তাহারা আপনার সহিত গাছের নীচে অঙ্গীকার করিতেছিল এবং তাহাদের অন্তরে যাহা কিছু (এখলাছ ও মজবুতি) ছিল উহাও আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে একটি নিকটবর্তী বিজয়ও দান করিলেন। (ইহা দ্বারা খায়বরের বিজয়কে বুঝানো হইয়াছে, যাহা উহার একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হইয়াছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বড় যবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(সূরা ফাত্‌হ, রুকূ-৩)

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ব্যাপারে এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

অর্থ—ঐ সকল মুমেনের মধ্যে কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিল উহাতে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতক এমন রহিয়াছে যাহারা আপন মান্নত পূর্ণ করিয়াছে (অর্থাৎ শহীদ হইয়া গিয়াছে।) আর কতক তাহাদের মধ্যে উহার জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষায় রহিয়াছে (এখনও শহীদ হয় নাই) এবং নিজেদের এরাদার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটায় নাই।

এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

অর্থ—যে সমস্ত মুহাজির এবং আনসারগণ (ঈমান আনয়ন ক্ষেত্রে সকল উম্মত হইতে) অগ্রবর্তী আর যে সকল লোক এখলাসের সহিত তাহাদের অনুগামী হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তাহারা সকলে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন যেইগুলির তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত হইবে যাহাতে তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং ইহা বড় কামিয়াবী।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের প্রশংসা এবং তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসেও অত্যধিক পরিমাণে তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার পর আবু বকর (রাযিঃ) ও ওমর (রাযিঃ)এর অনুসরণ করিও। এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ তারকার ন্যায়। তোমরা যাহারই অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দেসগণের আপত্তি রহিয়াছে। এইজন্যই কাযী ইয়ায (রহঃ) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। তবে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হইতে পারে একাধিক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে উক্ত হাদীস তাঁহার নিকট নির্ভরযোগ্য অথবা ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। (কেননা ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস সামান্য দুর্বলতা সত্ত্বেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার সাহাবীদের দৃষ্টান্ত খাদ্যের মধ্যে লবণের ন্যায় যেমন খাদ্য লবণ ব্যতীত সুস্বাদু হইতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাহাদিগকে সমালোচনার পাত্র বানাইও না। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি মহব্বত রাখে, আমার মহব্বতের কারণে তাহাদের প্রতি মহব্বত রাখে আর যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে তাহাদিগকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় অতিসত্বর পাকড়াও হইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে,

আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ খরচ করে তবে উহা সাওয়াবের দিক হইতে সাহাবাদের এক মুদ বা আধা মুদের সমানও হইতে পারে না। (এক মুদ প্রায় এক সের–এর সমান)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সাহাবীদিগকে গালি দিবে তাহার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত। না তাহার ফরয কবুল হইবে, না নফল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নবীগণ ব্যতীত অন্য সমস্ত মানুষ হইতে আমার সাহাবীদিগকে বাছাই করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে চারজনকে স্বাতন্ত্র দান করিয়াছেন–আবু বকর (রাযিঃ), ওমর (রাযিঃ), ওসমান (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ)। তাহাদিগকে আমার সাহাবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আবু বকর (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনকে সোজা করিল, যে ওমর (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনের সুস্পষ্ট রাস্তা পাইল, যে ওসমান (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত হইল আর যে আলী (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনের মজবুত রশি ধারণ করিল। যে সাহাবীগণের প্রশংসা করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত আর যে সাহাবীদের সহিত বেআদবী করে সে বেদআতী, মুনাফেক ও সুন্নতের বিরোধী। আমার আশংকা হয় যে, তাহার কোন আমল কবুল হইবে না, যে পর্যন্ত তাহাদের সকলের প্রতি মহব্বত না রাখিবে এবং তাহাদের সম্পর্কে দিল সাফ না হইবে।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকেরা! আমি আবু বকরের প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা তাহার মর্যাদা বুঝিও। আমি ওমর, আলী, ওসমান, তালহা, যুবাইর, সা'দ, সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)এর প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা তাহাদের মর্যাদা বুঝিও। হে লোকেরা! আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে এবং হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে আর ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে যাহাদের কন্যারা আমার বিবাহের মধ্যে আছে অথবা আমার কন্যারা যাহাদের বিবাহের মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, তাহারা কেয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ করিয়া বসে। কেননা উহা মাফ

করা হইবে না।

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবী এবং আমার জামাতাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিও। যে ব্যক্তি তাহাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া আখেরাতে হেফাজত করিবেন আর যে ব্যক্তি তাহাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিবে না আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত, অসম্ভব নয় যে, সে কোন আযাবে পাকড়াও হইয়া যাইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার হেফাজতকারী হইব।

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে সে আমার নিকট হাউজে কাউসারে পৌছিতে পারিবে আর যে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে না সে আমার নিকট হাউজ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না এবং আমাকে শুধু দূর হইতে দেখিবে।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সম্মান করে না সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই ঈমান আনে নাই।

আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাঁহার শাস্তি এবং আপন মাহবুবের অসন্তুষ্টি হইতে আমাকে, আমার বন্ধু-বান্ধবকে, আমার হিতাকাঙ্খীদেরকে, আমার সহিত সাক্ষাতকারীদেরকে আমার শাইখ ও ছাত্রদিগকে ও সমস্ত মুমেন মুসলমানকে রক্ষা করুন এবং আমাদের অন্তরসমূহকে সাহাবায়ে কেরামদের মহব্বতে পরিপূর্ণ করিয়া দিন—আমীন

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلٰى اَتْبَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهِمْ حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ

যাকারিয়া উফিয়া আনহু কান্ধলভী

মুকীম ঃ মাদ্রাসা মাযাহেরে উলূম, সাহারানপুর

১২ই শাওয়াল, ১৩৫৭ হিঃ, সোমবার

॥ ॥ ॥

সূচীপত্র

ফাযায়েলে রমযান

॥॥॥

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ حَمَلَةِ الدِّیْنِ الْقَوِیْمِ

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর। এই কিতাবে রমযানুল মুবারকের সহিত সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ করা হইয়াছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে যে সকল ফযীলত ও উৎসাহমূলক হাদীস এরশাদ করিয়া গিয়াছেন উহার আসল শোকরিয়া ও কদর তো এইভাবেই হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা নিজেদের জান কোরবান করিয়া উহার উপর আমল করি। কিন্তু দ্বীনের প্রতি আমাদের অলসতা ও গাফলতী এমনভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, উহার উপর আমল তো দূরের কথা ; এই সমস্ত হাদীসের প্রতি আমরা এমন উদাসীন ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছি যে, এইসব বিষয় সম্পর্কে এখন মানুষের এলেমের পরিমাণও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখার উদ্দেশ্য হইল, মসজিদের ইমাম, তারাবীর হাফেয সাহেবান এবং দ্বীনের প্রতি কোন পর্যায়ে অনুরাগী শিক্ষিত লোকেরা রমযান মাসের শুরুর দিনগুলিতে এই কিতাবখানা বিভিন্ন মসজিদে ও মজলিসে পড়িয়া শুনাইবেন। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত হইতে অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, এরূপ করার দ্বারা আল্লাহর মাহবুব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও ইরশাদের বরকতে আমাদের অন্তরে এই মুবারক মাসের কিছু না কিছু কদর পয়দা হইবে এবং এই মুবারক মাসের অফুরন্ত বরকতের প্রতি আমাদের কিছু না কিছু মনোযোগ সৃষ্টি হইবে। বেশী বেশী নেক আমল করার এবং বদ আমল কমিয়া যাওয়ার উপায় হইয়া যাইবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার ওসীলায় এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত নসীব করেন, তবে ইহা তোমার জন্য অনেকগুলি লাল উট (যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে) পাওয়ার

চাইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইবে।

মাহে রমযান মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় নেয়ামত ও পুরস্কার। কিন্তু ইহা তখনই হইবে যখন এই পুরস্কারের কদর করা হইবে। নতুবা আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য কেবল 'রমযান' 'রমযান' বলিয়া এক মাস যাবৎ চিৎকার করিতে থাকা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

এক হাদীসে আছে, মানুষ যদি জানিত যে, রমযান কি জিনিস ; তাহা হইলে আমার উম্মত এই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, সারা বৎসর যেন রমযান হইয়া যায়। এই কথা প্রত্যেকেই বুঝে যে, সারা বৎসর রোযা রাখা কত কঠিন! তা সত্ত্বেও রমযানের সওয়াবের মোকাবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছেন যে, মানুষ ইহার আকাঙ্ক্ষা করিত।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি (চন্দ্র) মাসের তিন দিনের রোযা দিলের ময়লা ও ওয়াসওয়াসা দূর করিয়া দেয়। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, নতুবা জিহাদের সফরে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এহতেমাম ও গুরুত্বের সহিত কেন রোযা রাখিতেন। এমনকি তাহাদেরকে হুকুম করিয়া নিষেধ করিতে হইয়াছিল।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের সফরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল, অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সকলের নিকট রৌদ্রের গরম হইতে বাঁচিবার মত কাপড়ও ছিল না। অনেকেই হাত দ্বারা ছায়া করিয়া রৌদ্র হইতে মাথা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তাহারা রোযাদার ছিলেন। অনেকে রোযার দরুন দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত ছিল, যাহারা প্রায় সব সময় সারা বৎসর রোযা অবস্থায়ই থাকিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শত শত রেওয়ায়াতে বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। সবগুলি পুরাপুরি বর্ণনা করা আমার মত অধমের শক্তির বাহিরে। আবার ইহাও মনে হয় যে, এইসব রেওয়ায়াত যদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করি, তবে পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইবেন। কেননা, বর্তমান যমানায় দ্বীনি বিষয়ে যে পরিমাণ অবহেলা করা হইতেছে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এলেম ও আমল উভয় দিক হইতে কি পরিমাণ বেপরওয়াভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা লইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। এইজন্য

মাত্র একুশটি হাদীস তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—রমযানের ফযীলত ; ইহাতে দশটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শবে কদরের বিবরণ ; ইহাতে সাতটি হাদীস রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—এতেকাফের বর্ণনা ; ইহাতে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতঃপর পরিশিষ্টে একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করিয়া কিতাবখানা সমাপ্ত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা নিজ ক্ষমাগুণে এবং তাঁহার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে ইহাকে কবূল করিয়া নিন এবং আমি অধম গোনাহগারকেও ইহার বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন। فَإِنَّهُ بَرٌّ جَوَادٌ كَرِيْمٌ

ফাযায়েলে রমযান

প্রথম পরিচ্ছেদ
রমযান মাসের ফাযায়েল

(١) عَنْ سَلْمَانَؓ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ
يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُّبَارَكٌ
شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ
شَهْرٍ شَهْرٌ جَعَلَ اللهُ صِيَامَهٗ
فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ
تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ
اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْ مَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى
فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً
فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ
ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِىْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيْهِ
مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً
لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ
وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ
اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئٌ قَالُوْا
يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ
مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى اللهُ

حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو
وعظ فرمایا کہ تمھارے اوپر ایک مہینہ آرہا
ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک
مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے،
(شبِ قدر) جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ
تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس
کے رات کے قیام (یعنی تراویح) کو ثواب کی
چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی
کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے
جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو
شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے
وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستّر فرض
ادا کرے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ
جنّت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ
غمخواری کرنے کا ہے اس مہینہ میں مومن
کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار
کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں
کے مُعاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب
ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو

هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى
تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ اَوْ مَذْقَةِ
لَبَنٍ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَّ
اَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ
مِّنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ
فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ
وَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ
خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا
رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ
عَنْهُمَا فَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ
تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ اَنْ
لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَاَمَّا
الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ
عَنْهُمَا فَتَسْئَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَ
تَعَوَّذُوْنَ بِهٖ مِنَ النَّارِ وَمَنْ سَقٰى
صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ
شَرْبَةً لَّا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
(رواه ابن خزيمة فى صحيحه و
قال ان صح الخبر ورواه البيهقى و
رواه ابو الشيخ ابن حبان فى الثواب
باختصار عنهما و فى اسانيدهم
على بن زيد بن جدعان ورواه ابن
خزيمة ايضا والبيهقى باختصار عنه
من حديث ابى هريرة وفى اسناده
كثير بن زيد كذا فى الترغيب قلت
على بن زيد ضعفه جماعة وقال

ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب
سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہؓ نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر
شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ
دار کو افطار کرائے تو آپؐ نے فرمایا کہ
(پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں) یہ
ثواب تو اللہ جل شانہٗ ایک کھجور سے
کوئی افطار کرادے یا ایک گھونٹ پانی
پلادے یا ایک گھونٹ لسی پلادے اس
پر بھی مرحمت فرمادیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ
ہے کہ اس کا اوّل حصہ اللہ کی رحمت ہے
اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ
آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینہ میں
ہلکا کردے اپنے غلام (وخادم) کے بوجھ کو
حق تعالیٰ شانہٗ اس کی مغفرت فرماتے ہیں
اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور چار چیزوں
کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے دو
چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں
ایسی ہیں کہ جن سے تمھیں چارہ کار نہیں پہلی
دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو
وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری
دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور
آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو
پانی پلائے حق تعالیٰ (قیامت کے دن)
میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں
گے جس کے بعد جنت میں داخل

الترمذی صدوق وصحح له حدیثا   ہونے تک پیاس نہیں لگے گی .
فی الاسلام وحسن له غیر ما حدیث وکذا کثیر ضعفه النسائی وغیرہ قال
ابن معین ثقة وقال ابن عدی لم ار بحدیثه باسا واخرج بحدیثه
ابن خزیمة فی صحیحه کذا فی رجال المنذری صـ۲۴ لکن قال العینی
الخبر منکر فتامل)

(১) হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদিগকে নসীহত করিয়াছেন যে, তোমাদের উপর এমন একটি মাস আসিতেছে, যাহা অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও বরকতময়। এই মাসে এমন একটি রাত্র (শবে কদর) রহিয়াছে, যাহা হাজারো মাস হইতে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসে রোযা রাখাকে ফরজ করিয়াছেন এবং এই মাসের রাত্রগুলিতে নামায (অর্থাৎ তারাবীহ) পড়াকে সওয়াবের কাজ বানাইয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এই মাসে কোন নফল এবাদত করিল, সে যেন রমযানের বাহিরে একটি ফরজ আদায় করিল। আর যে ব্যক্তি এই মাসে কোন ফরজ আদায় করিল সে যেন রমযানের বাহিরে সত্তরটি ফরজ আদায় করিল। ইহা ছবরের মাস আর ছবরের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত রাখিয়াছেন। ইহা মানুষের সহিত সহানুভূতির মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, ইহা তাহার জন্য গোনাহমাফী ও জাহান্নাম হইতে মুক্তির কারণ হইবে এবং সে রোযাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবের মধ্যে কোন কম করা হইবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তো এমন সামর্থ্য রাখে না যে, রোযাদারকে ইফতার করাইতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, (পেট ভর্তি করিয়া খাওয়াইতে হইবে না) এই সওয়াব তো আল্লাহ তায়ালা একটি খেজুর খাওয়াইলে অথবা এক ঢোক পানি পান করাইলে অথবা এক চুমুক দুধ পান করাইলেও দান করিবেন। ইহা এমন মাস যে, ইহার প্রথম অংশে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মধ্যের অংশে গোনাহ মাফ করা হয় এবং শেষ অংশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে আপন গোলাম (ও কর্মচারী বা খাদেম)এর কাজের বোঝা হালকা করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দেন এবং জাহান্নামের আগুন

হইতে মুক্তি দান করেন। এই মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করিতে থাক। তন্মধ্যে দুইটি কাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য আর দুইটি কাজ এইরূপ যাহা না করিয়া তোমাদের উপায় নাই। প্রথম দুই কাজ যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করিবে উহা এই যে, অধিক পরিমাণে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িবে এবং এস্তেগফার করিবে। আর দুইটি কাজ হইল, আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত পাওয়ার জন্য দোয়া করিবে এবং জাহান্নাম হইতে মুক্তির জন্য দোয়া করিবে। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি পান করাইবে, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আমার হাউজে কাউসার হইতে এইরূপ পানি পান করাইবেন যাহার পর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসা লাগিবে না।

(তারগীব ঃ ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করিলেও প্রথমতঃ ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসের ব্যাপারে ঐটুকু মন্তব্য সহনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়বস্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়—

প্রথম বিষয় ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের বিশেষ এহতেমাম করিয়াছেন, যে কারণে তিনি রমযানের পূর্বে শাবান মাসের শেষ তারিখে ইহার গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে নসীহত করিয়াছেন এবং লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, রমযানুল মুবারকের একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় বা অবহেলার মধ্যে কাটিয়া না যায়। এই নসীহতের মধ্যে তিনি পূরা মাসের ফযীলত বয়ান করিয়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল, শবে কদর। এই শবে কদর প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত্র (ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পৃথকভাবে আসিতেছে)। অতঃপর তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসের রোযা ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তারাবীর নামাযকে সুন্নত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাবীর নামাযের হুকুমও স্বয়ং আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন যে, তারাবীহকে আমি সুন্নত করিয়াছি, ইহার অর্থ হইল, গুরুত্ব দেওয়া। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার প্রতি অনেক বেশী

গুরুত্ব দিতেন। এই কারণেই সকল ইমাম ইহার সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে একমত। 'বুরহান' কিতাবে আছে, একমাত্র রাফেজী সম্প্রদায় ছাড়া এই নামাযকে আর কেহ অস্বীকার করে না।

হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) 'মা ছাবাতা বিস-সুন্নাহ' কিতাবে কোন কোন ফেকার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন যে, কোন শহর বা এলাকার লোকেরা যদি তারাবীর নামায ছাড়িয়া দেয়, তবে ইহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে মুসলমান শাসনকর্তা তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে পড়িতে বাধ্য করিবেন।

এইখানে বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অনেকেরই ধারণা যে, তাড়াহুড়া করিয়া আট দশ দিনে কুরআন খতম শুনিয়া লইবে অতঃপর ছুটি। ইহা খেয়াল রাখিবার বিষয় যে, এইখানে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সুন্নত রহিয়াছে—একটি হইল পুরা কুরআন শরীফ তারাবীতে পড়া বা শোনা। আর দ্বিতীয়টি হইল পুরা রমযান মাস তারাবীহ পড়া। সুতরাং এমতাবস্থায় একটি সুন্নতের উপর আমল হইল আর অন্য সুন্নতটি বাদ পড়িয়া গেল। অবশ্য যে সমস্ত লোকের রমযান মাসে সফর ইত্যাদি কিংবা অন্য কোন কারণে এক এলাকায় থাকিয়া তারাবীর নামায আদায় করা মুশকিল হয় তাহাদের জন্য উত্তম হইল, রমযানের শুরুর দিকেই কয়েক দিনে তারাবীর নামাযের মধ্যে পুরা কুরআন শরীফ শুনিয়া লইবেন। যাহাতে কুরআন শরীফ অসম্পূর্ণ থাকিয়া না যায়। অতঃপর যেখানে সময় সুযোগ হইবে সেখানে তারাবীহ পড়িয়া লইবেন। এইভাবে করিলে কুরআন শরীফের খতমও অসম্পূর্ণ থাকিবে না এবং নিজের কাজ-কর্মেরও কোন ক্ষতি হইবে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও তারাবীর আলোচনার পর অন্যান্য ফরজ ও নফল এবাদতসমূহের এহতেমাম করিবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মাসে একটি নফলের সওয়াব অন্যান্য মাসের ফরজের সমান এবং একটি ফরজের সওয়াব অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমান।

এইখানে আমাদের নিজ নিজ এবাদতসমূহের প্রতিও একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, এই মোবারক মাসে আমরা ফরজ এবাদতগুলির কতটুকু এহতেমাম করিয়া থাকি এবং নফল এবাদত আমরা কতটুকু বাড়াইয়া দেই। ফরজ আদায়ের ব্যাপারে আমাদের এহতেমামের অবস্থা তো এই যে, সেহরী খাওয়ার পর যে ঘুমাইয়া যাওয়া হয় ইহাতে অধিকাংশ সময় ফজরের নামায কাজা হইয়া যায়। আর তা না হইলে অন্ততঃ

জামাতে নামায আদায় তো অধিকাংশ লোকেরই ছুটিয়া যায়। এইভাবে যেন আমরা সেহরী খাওয়ার শোকরিয়া আদায় করিলাম যে, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজকে একেবারে কাজা করিয়া দিলাম। অথবা উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়া দিলাম। কেননা শরীয়তের মূলনীতিবিদগণ জামাত ছাড়া নামায আদায়কে অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এক হাদীসে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—যাহারা মসজিদের নিকটে থাকে তাহাদের নামায মসজিদ (অর্থাৎ জামাত) ছাড়া (যেন) আদায়ই হয় না। 'মাজাহিরে হক' কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জামাত ছাড়া নামায পড়ে তাহার জিম্মা হইতে ফরজ তো আদায় হইয়া যায় কিন্তু সে নামাযের সওয়াব পায় না।

এইভাবে আরেক নামায মাগরিবের জামাতও অনেকের ইফতারের দরুন ছুটিয়া যায়—প্রথম রাকাত বা তাকবীরে উলার তো প্রশ্নই উঠে না। আবার অনেকেই তারাবীর বাহানায় এশার জামাত ওয়াক্তের আগেই পড়িয়া লয়। ইহা তো হইল রমযান মুবারকে আমাদের নামাযের অবস্থা, যে নামায সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। অর্থাৎ এক ফরজ (রোযা) পালন করিতে গিয়া উহার বদলে তিন ফরজ অর্থাৎ তিন ওয়াক্ত নামায বরবাদ করা হইল। এই তিন ওয়াক্ত তো প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। আর যোহরের নামায (কায়লূলা অর্থাৎ) দুপুরের বিশ্রামের খাতিরে এবং আছরের জামাত ইফতারীর সামান খরিদ করিবার পিছনে যে কোরবানী হইয়া যায় তাহা তো চোখের সামনে দেখা গিয়াছে। এইভাবে অন্যান্য ফরজ এবাদতের বিষয় নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, রমযানের মুবারক মাসে সেইগুলির কতটুকু এহতেমাম করা হয়।

যখন ফরজ এবাদতগুলিরই এই অবস্থা তখন নফল এবাদতের তো আর প্রশ্নই উঠে না। এশরাক ও চাশতের নামায তো রমযানের ঘুমের জন্যই উৎসর্গ হইয়া যায়। আওয়াবীন নামাযের এহতেমাম কিভাবে হইবে যখন এইমাত্র রোযা খোলা হইল আবার একটু পরেই তারাবীহ আসিতেছে। আর তাহাজ্জুদ নামাযের সময় তো একেবারে সেহরী খাওয়ার সময়ই। কাজেই নফল এবাদতের সুযোগ কোথায়? কিন্তু এই সবকিছু অবহেলা এবং আমল না করার বাহানা মাত্র।

ع "تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں"

"তুমি নিজেই যদি কাজ করিতে না চাও, তবে ইহার জন্য হাজারো যুক্তি খাড়া করিতে পার।"

আল্লাহ তায়ালার কত বান্দা এমন রহিয়াছেন, যাহাদের জন্য এই সময়ের ভিতরেই সবকিছু করিবার সুযোগ হইয়া যায়। আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)কে একাধিক রমযানে দেখিয়াছি যে, স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও মাগরিবের পর নফলের মধ্যে সোয়া পারা পড়িতেন অথবা শুনাইতেন। অতঃপর আধা ঘন্টার মধ্যেই খানাপিনা ইত্যাদি জরুরত হইতে ফারেগ হইয়া হিন্দুস্থানে অবস্থান কালে প্রায় দুই সোয়া দুই ঘন্টা তারাবীর নামাযে ব্যয় করিতেন। আর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান কালে এশা ও তারাবীর নামাযে প্রায় তিন ঘন্টা লাগিয়া যাইত। ইহার পর তিনি মৌসুমের তারতম্য হিসাবে দুই অথবা তিন ঘন্টা আরাম করিয়া তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত করিতেন এবং ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আধা ঘন্টা আগে সেহরী খাইতেন। সেহরীর পর ফজরের নামায পর্যন্ত কখনও মুখস্থ তেলাওয়াত করিতেন, আর কখনও ওজীফা ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। সকালের আলো পরিষ্কার হইয়া গেলে ফজরের নামায পড়িয়া এশরাক পর্যন্ত মুরাকাবা করিতেন। এশরাকের পর প্রায় এক ঘন্টা আরাম করিতেন। ইহার পর হইতে প্রায় বারটা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে একটা পর্যন্ত 'বযলুল-মাজহূদ' কিতাব লিখিতেন এবং চিঠিপত্র দেখিতেন ও জবাব লিখাইতেন। অতঃপর যোহরের নামায পর্যন্ত আরাম করিতেন। যোহরের নামাযের পর হইতে আছর পর্যন্ত তেলাওয়াত করিতেন। আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির ও তসবীহে মশগুল থাকিতেন এবং উপস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্তাও বলিতেন। 'বযলুল মাজহূদ' কিতাব লেখা শেষ হইবার পর সকালের কিছু সময় তেলাওয়াতে ও বিভিন্ন কিতাব পড়িয়া কাটাইতেন। এই সময় প্রায়ই 'বযলুল-মাজহূদ' ও 'ওয়াফাউল-ওয়াফা' কিতাব দুইখানা পড়িতেন। রমযান মুবারকে তাঁহার মামূলাত বা নিয়মিত আমলে বিশেষ কোন রদ-বদল হইত না। কেননা, এই পরিমাণ নফলের অভ্যাস তাঁহার অন্যান্য সময়েও ছিল ; সারা বৎসর তিনি এইসব আমলের এহতেমাম করিতেন। অবশ্য নামাযের রাকাতগুলি রমযান মাসে দীর্ঘ হইত। না হয় অন্যান্য আকাবির বুযুর্গগণের রমযান মাসে আরও ভিন্ন ও খাছ মামূলাত ছিল, যেগুলির পুরাপুরি অনুসরণ করা সকলের জন্য সহজ নয়।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) তারাবীর পর হইতে ফজর পর্যন্ত সারারাত্র নফল নামাযে মশগুল থাকিতেন এবং একের পর এক কয়েকজন হাফেজে কুরআনের পিছনে কুরআন মজীদ শুনিতে থাকিতেন। হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পূরী

(রহঃ)এর দরবারে তো পূরা রমযান মাস দিন–রাত্র কেবল তেলাওয়াতই চলিতে থাকিত। এই সময় ডাক–যোগাযোগ ও চিঠিপত্রের আদান–প্রদান বন্ধ থাকিত। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করাও পছন্দ করিতেন না। কোন কোন খাছ খাদেমকে শুধু এতটুকু অনুমতি দেওয়া ছিল যে, তারাবীর পর যতটুকু সময় তিনি দুই এক পেয়ালা রং চা পান করিবেন তখন তাহারা সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। আল্লাহওয়ালাদের অভ্যাস ও মামুলাতসমূহ মামুলী দৃষ্টিতে পড়িয়া নেওয়া বা দু' একটি মুখরোচক কথা বলিয়া দেওয়ার জন্য লিখা হয় না বরং, এইজন্য লিখা হয় যেন নিজ নিজ হিম্মত অনুযায়ী তাঁহাদের অনুসরণ করা হয় এবং এইসব মামূলাত পূরা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কেননা, আল্লাহওয়ালাদের প্রত্যেকেরই তরীকা ও নিয়ম–পদ্ধতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি অপরটি হইতে উত্তম। যাহারা দুনিয়াবী ঝামেলা হইতে মুক্ত তাহাদের জন্য কত চমৎকার সুযোগ যে, দীর্ঘ এগারটি মাস বৃথা কাটাইয়া দেওয়ার পর একটি মাত্র মাস আল্লাহর এবাদতে প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়া যাইবে। যাহারা চাকুরীজীবী ; সকাল দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত অফিসে থাকিতে বাধ্য, তাহারা ফজর হইতে দশটা পর্যন্ত অন্ততঃ রমযান মাসটি যদি তেলাওয়াতের মধ্যে কাটাইয়া দেন তবে এক মাসের জন্য ইহা এমন কি কঠিন কাজ ! নিজের দুনিয়াবী কাজের জন্য তো অফিসের বাহিরে অবশ্য সময় করিয়াই লওয়া হয়। (তাহা হইলে দ্বীনের জন্য ও এবাদতের জন্য সময় বাহির করিতে কি মুশকিল হইবে।)

যাহারা কৃষিজীবী তাহারা তো কাহারও অধীনস্থ নহেন এবং সময় পরিবর্তন করার ব্যাপারেও তাহাদের কোন বাধা নাই। এমনকি ক্ষেত–খামারে বসিয়াও তাহারা কুরআন তেলাওয়াত করিতে পারেন।

আর যাহারা তেজারত ও ব্যবসা–বাণিজ্যে রহিয়াছেন, তাহাদের জন্য তো রমযান মাসে দোকানদারীর সময় একটু কম করিয়া নেওয়া মোটেও কঠিন নয়। অথবা দোকানে বসিয়াই ব্যবসার সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াতের কাজও করিয়া নিবেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালামের সাথে এই মুবারক মাসের বড় বেশী খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে।

এই কারণেই আল্লাহ তায়ালার সব কয়টি কিতাব সাধারণতঃ এই মাসেই নাযিল হইয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফূজ হইতে দুনিয়ার আসমানে সম্পূর্ণত এই মাসেই নাযিল হইয়াছে। সেখান হইতে প্রয়োজন মত অল্প অল্প করিয়া তেইশ বৎসরে দুনিয়াতে নাযিল হইয়াছে। ইহা ছাড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সহীফাসমূহ এই মাসেই

পহেলা তারিখে অথবা তেসরা (অর্থাৎ তিন) তারিখে নাযিল হইয়াছে। হযরত দাউদ (আঃ)কে ১৮ই রমযানে অথবা ১২ই রমযানে যাবূর কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ)কে ৬ই রমযানে তাওরাত কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে ১২ অথবা ১৩ই রমযানে ইঞ্জীল দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কালামের সহিত এই মাসের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কারণেই এই মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং বুযুর্গ মাশায়েখগণ ইহাকে নিজেদের আদর্শ ও নিয়মিত আমল বানাইয়া লইয়াছেন।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বৎসর রমযান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনাইতেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিতেন। হাফেজদের দুই দুইজন মিলিয়া কুরআন শরীফ 'দাওর' করার যে নিয়ম চালু আছে, উপরোক্ত দুই হাদীস মিলাইয়া ওলামায়ে কেরাম এই নিয়মকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। মোটকথা, যতবেশী সম্ভব কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ এহতেমাম করিবে। আর তেলাওয়াতের পর যে সময় বাঁচিয়া যায় উহাও নষ্ট করা ঠিক হইবে না। কেননা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের শেষ অংশে চারটি জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ; এই মাসে এই কাজগুলি বেশী বেশী পরিমাণে করিবার হুকুম করিয়াছেন। কাজগুলি হইল—কালেমা তাইয়্যিবাহ, এস্তেগফার, জান্নাত হাসিল করার ও জাহান্নাম হইতে বাঁচার দোয়া করা। কাজেই যতটুকু সময়ই পাওয়া যায় উহাকে এই চার আমলের মধ্যে খরচ করা নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করিবে। এরূপ করার দ্বারাই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি ভক্তি ও কদর করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আর ইহা এমন কি কঠিন ব্যাপার যে, নিজের দুনিয়াবী কাজে মশগুল থাকিয়াও জবানে দুরূদ শরীফ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িতে থাকিবে। কাল কিয়ামতের দিন এই কথা বলিবার যেন মুখ থাকে—

میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار　　لیکن تمھاری یاد سے غافل نہیں رہا

অর্থাৎ, যদিও আমি জমানার অত্যাচারে জর্জরিত ছিলাম, তবুও তোমার স্মরণ হইতে (হে আল্লাহ! একেবারে) গাফেল থাকি নাই।

অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আদবের কথা এরশাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা

ছবরের মাস। অর্থাৎ রোযা রাখার কারণে যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে এই কষ্ট খুশী মনে সহ্য করা চাই। ধর–মার হাঁক–ডাক যেন না হয়, যেমন গরমের দিনের রোযায় অনেককেই এইরূপ করিতে দেখা যায়। এমনিভাবে যদি কখনও সেহরী না খাওয়া হইয়া থাকে, তবে তো সকাল হইতেই রোযার শোক–মাতম শুরু হইয়া যায়। তদ্রূপ রাত্রে তারাবীতে যদি কষ্ট হয় খুশী মনে উহা সহ্য করা চাই। ইহাকে আপদ বা মুসীবত মনে করিবে না ; এইরূপ মনে করা খুবই মারাত্মক মাহরূমী ও বঞ্চনার আলামত। যেখানে আমরা সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য খানাপিনা, আরাম–আয়েশ সবই ছাড়িয়া দিতে পারি, সেখানে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মোকাবিলায় এইসব বস্তুর কি মূল্য থাকিতে পারে?

অতঃপর এরশাদ হইয়াছে যে, ইহা সহানুভূতির মাস। অর্থাৎ গরীব–মিসকীনদের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার করার মাস। নিজের ইফতারীর জন্য যদি দশ রকমের জিনিস তৈয়ার করিয়া থাকি, তবে গরীবের জন্য তো অন্ততঃ দুই চার রকমের হওয়া উচিত। আসল নিয়ম তো ছিল তাহাদেরকে ভালটাই দিয়া দেওয়া ; তা না হইলে অন্ততঃ সমান করা। কাজেই যতখানি হিম্মত হয় নিজের সেহরী ও ইফতারীতে গরীবদেরও একটি অংশ অবশ্যই রাখা উচিত। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) উম্মতের জন্য আমলী নমুনা ছিলেন। দ্বীনের প্রতিটি কাজ তাঁহারা বাস্তবে করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন যে কোন আমল করিতে হয় ; ইহার জন্য তাঁহাদের আমলের সুপ্রশস্ত রাজপথ খোলা রহিয়াছে ; উহাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেই হইবে। 'ঈছার' অর্থাৎ অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ; নিজের উপর অন্যকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা করা—এইসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মত মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করার জন্যও সাহসী মানুষের দরকার। শত শত হাজার হাজার ঘটনা তাঁহাদের এমন আছে যেগুলি শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা লিখিতেছি—হযরত আবূ জাহ্ম (রাযিঃ) বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম এবং এই মনে করিয়া এক মশক পানিও সঙ্গে লইলাম যে, যদি তাঁহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসও বাকী থাকে, তবে তাঁহাকে পানি পান করাইব এবং হাত–মুখ ধোয়াইয়া দিব। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পানির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইশারায় পানি চাহিলেন। এমন সময় সামনের দিক হইতে আরেকজন আহত ব্যক্তি আহ্ করিয়া উঠিলেন। তখন আমার চাচাত ভাই নিজে পানি পান

না করিয়া সেই ব্যক্তিকে পানি পান করাইতে ইশারা করিলেন। তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তিনিও পিপাসার্ত এবং পানি চাহিতেছেন। এমন সময় তাহার পার্শ্বের আরেক ব্যক্তি ইশারায় পানি চাহিলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও পানি পান না করিয়া ঐ (তৃতীয়) ব্যক্তির নিকট যাইতে ইশারা করিলেন। আমি এই শেষ ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়াই দেখিতে পাইলাম তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ফিরিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসিলাম। দেখিলাম তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ফিরিয়া চাচাত ভাইয়ের নিকট পৌঁছিলাম। এইখানেও আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বার্থ-ত্যাগ ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার নমুনা। নিজেরা পিপাসায় কাতর হইয়া জীবন দিয়া দিলেন ; তবু অপরিচিত ভাইয়ের আগে পানি পান করা পছন্দ করিলেন না। আল্লাহ তাঁহাদের উপর রাজী হইয়া যান, তাঁহাদেরকে খুশী করুন এবং আমাদেরকে তাহাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

'রূহুল বয়ান' কিতাবে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)এর 'জামে সগীর' এবং আল্লামা সাখাবী (রহঃ)এর 'মাকাসেদ' কিতাবদ্বয়ের বরাত দিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় পাঁচশত বাছাই করা বুযুর্গ বান্দা এবং চল্লিশজন আবদাল থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিলে তখনই অন্য একজন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সকল লোকের বিশেষ আমলসমূহ কি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাহারা জুলুমকারীদেরকে মাফ করিয়া দেন, দুর্ব্যবহারকারীদের সাথেও তাহারা সদ্ব্যবহার করেন এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিকের দ্বারা তাহারা মানুষের সঙ্গে দয়া ও সহানুভূতির আচরণ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত কিতাবে আরেক হাদীস হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে রুটি খাওয়াইবে, বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাইবে অথবা মুসাফিরকে রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা দিবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাহাকে আশ্রয় দান করিবেন। ইয়াহ্ইয়া বারমাকী (রহঃ) সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)এর জন্য প্রতি মাসে একহাজার দেরহাম খরচ করিতেন। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) সেজদায় এই বলিয়া দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ!

ইয়াহইয়া আমার দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইয়াছে, তুমি মেহেরবানী করিয়া তাহার আখেরাতের প্রয়োজন মিটাইয়া দাও। ইহাহ্ইয়া বারমাকী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর লোকেরা তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। তাহার হাল-অবস্থা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুফিয়ান সাওরীর দোয়ার বদওলতে আমার মাগফেরাত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে ইফতার করাইবার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি হালাল কামাই দ্বারা রমযান মাসে কাহাকেও ইফতার করায়, তাহার উপর রমযানের রাত্রসমূহে ফেরেশতারা রহমত পাঠাইতে থাকেন এবং শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহার সহিত মোসাফাহা করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) যাহার সহিত মোসাফাহা করেন, তাহার দিলে নম্রতা পয়দা হয় এবং তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে। হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন ; তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশজন রোযাদারকে ইফতার করাইতেন।

ইফতারের ফযীলত বর্ণনা করিবার পর এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই মাসের প্রথম অংশ রহমত ; অর্থাৎ এই অংশে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ও পুরস্কার আগাইয়া আসিতে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার এই ব্যাপক রহমত সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য হইয়া থাকে। অতঃপর যাহারা এই রহমতের জন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে তাহাদের উপর রহমতের বর্ষণ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা শোকর করিলে অবশ্যই আমি (নেয়ামত ও পুরস্কার) বাড়াইয়া দিব। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৭)

এই মাসের মাঝের অংশ হইতে মাগফেরাত অর্থাৎ গোনাহমাফী শুরু হইয়া যায়। কারণ, রোযার কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়াছে ; উহার বদলা ও সম্মান স্বরূপ মাগফেরাত শুরু হইয়া যায়। আর এই মাসের শেষ অংশে তো আগুন হইতে একেবারে মুক্তিই হয়।

আরও অনেক রেওয়ায়াতে রমযান খতম হওয়ার সময় (জাহান্নামের) আগুন হইতে মুক্তির সুসংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

রমযানকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস হইতে জানা গিয়াছে। অধম বান্দার মতে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম হইতে মুক্তি—এই তিন অংশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—এক, ঐ সমস্ত লোক যাহাদের উপর গোনাহের বোঝা নাই ; এই সমস্ত লোকের জন্য তো রমযানের শুরু হইতেই রহমত

এবং নেয়ামত ও পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সমস্ত লোক যাহারা মামুলী গোনাহগার ; তাহাদের জন্য রমযানের কিছু অংশ রোযা রাখিবার পর এই রোযার বরকতে ও বদলায় মাগফেরাত হয়। আর তৃতীয় প্রকার ঐ সমস্ত লোক যাহারা বেশী গোনাহগার ; তাহাদের জন্য রমযানের বেশীর ভাগ রোযা রাখিবার পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি হয়। আর যাহাদের জন্য রমযানের শুরু হইতেই রহমত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাহাদের গোনাহ্ মাফ হইয়াছিল তাহাদের জন্য যে কি পরিমাণ আল্লাহর রহমতের স্তূপ লাগিয়া যাইবে, উহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি জিনিসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। উহা হইল এই যে, যাহারা মালিক বা মনিব অর্থাৎ যাহাদের অধীনে শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যেন এই মাসে কর্মচারীদের কাজ হালকা করিয়া দেন। কেননা, তাহারাও তো রোযাদার ; আর রোযা অবস্থায় কাজ বেশী হইলে রোযা রাখা কঠিন হয়। অবশ্য যদি কাজের পরিমাণ বেশী হয় তবে শুধু রমযান মাসে এক-আধজন কর্মচারী সাময়িকভাবে বাড়াইয়া নিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা তখনই করা হইবে যখন কর্মচারীগণও রোযাদার হয়। রোযাদার না হইলে তাহাদের জন্য তো রমযান মাস ও অন্যান্য মাস এক বরাবর। আর যে মালিক নিজেই রোযা রাখে না ; বেহায়া মুখে রোযাদার কর্মচারীদের দ্বারা কাজ নেয় এবং নামায-রোযার কারণে কাজে একটু শিথিলতা হইলে অকথ্য বর্ষণ শুরু করিয়া দেয় তাহাদের জুলুম ও নির্লজ্জতার কথা আর কি বলার আছে !

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ জালেমরা অতিসত্বর জানিতে পারিবে—তাহারা কোন্ ভয়াবহ স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে। (সূরা শু'আরা, আয়াত ঃ ২২৭)

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করার হুকুম করিয়াছেন। প্রথমতঃ কালেমায়ে শাহাদত। অনেক হাদীসে এই কালেমায়ে শাহাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলা হইয়াছে। মিশকাত শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া বলিয়া দিন যাহার দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং দোয়া করিব। আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কথা বলিয়া দেওয়া হইল। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহ ! এই কালেমা তো

আপনার সকল বান্দাই পড়িয়া থাকে ; আমি তো এমন একটি দোয়া বা যিকির চাই, যাহা শুধু আমার জন্যই খাছ হইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, হে মূসা ! আমাকে ব্যতীত সাত আসমান ও উহার আবাদকারী সমস্ত ফেরেশতা এবং সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় কালেমা তাইয়্যেবাকে রাখা হয় তবে কালেমা তাইয়্যেবার পাল্লাই ভারী হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কালেমা পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আরশ পর্যন্ত এই কালেমা পৌঁছিতে কোন বাধা থাকে না ; তবে ইহার পাঠকারীকে কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত আদত ও নিয়ম হইল যে, সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ তিনি প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন এবং ব্যাপক করিয়া থাকেন। গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে যে জিনিসের প্রয়োজন যত বেশী সেই জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা ততই ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। যেমন পানি একটি ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস ; আল্লাহ তায়ালা অসীম রহমতে ইহাকে কত ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন ! অথচ 'কিমিয়া' (মাটি, তামা ইত্যাদি কম মূল্যের পদার্থকে স্বর্ণ বানাইবার প্রক্রিয়া)–এর মত অনর্থক ও বেকার বিষয়কে কত দুষ্প্রাপ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে কালেমায়ে তাইয়্যেবা হইল সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির— বহু হাদীস দ্বারা এই কথা জানা যায় যে, সমস্ত যিকির–আযকারের উপর কালেমা তাইয়্যেবার প্রাধান্য রহিয়াছে। ইহাকে সকলের জন্য ব্যাপক ও সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যাহাতে কেহই মাহরূম না থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ মাহরূম থাকে তবে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য। মোটকথা, বহু হাদীসে কালেমা তাইয়্যেবার ফযীলতে বর্ণিত হইয়াছে ; কিতাব সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না।

দ্বিতীয় কাজ যাহা রমযান মাসে বেশী পরিমাণে করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে, তাহা হইল, এস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। বহু হাদীসে এস্তেগফারেরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে—' যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার করিবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন অভাব ও সংকটের সময় তাহার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন, যে কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য এমন রুজি–রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।' আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মানুষ

মাত্রই গোনাহগার ; তবে গোনাহগারদের মধ্যে উত্তম হইল ঐ ব্যক্তি যে তওবা করিতে থাকে।' এক হাদীসে আছে—'মানুষ যখন গোনাহ করে তখন একটি কালো বিন্দু তাহার দিলের মধ্যে লাগিয়া যায়। যদি সে ঐ গোনাহ হইতে তওবা করে তবে উহা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায় ; নতুবা বাকী থাকিয়া যায়।'

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি জিনিস চাহিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন, যে দুইটি জিনিস ছাড়া কোন উপায় নাই। একটি হইল, জান্নাত পাওয়ার দোয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার দোয়া। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাদের সকলকে উহা দান করুন, আমীন।

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيَتْ
اُمَّتِىْ خَمْسَ خِصَالٍ فِىْ رَمَضَانَ
لَمْ تُعْطَهُنَّ اُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوْفُ
فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ
رِيْحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ
حَتّٰى يُفْطِرُوْا - وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ
كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ يُوْشِكُ
عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ اَنْ يُّلْقُوْا عَنْهُمُ
الْمُؤْنَةَ وَيَصِيْرُوْا اِلَيْكِ وَتُصَفَّدُ
فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَخْلُصُوْا
فِيْهِ اِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ اِلَيْهِ فِىْ
غَيْرِهٖ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ قِيْلَ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ
لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى
اَجْرَهٗ اِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ - رواه احمد
والبزار والبيهقى و رواه ابو الشيخ
ابن حبان فى كتاب الثواب الا

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان
شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص
طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں
ملی ہیں (۱) یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک
مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے (۲) یہ کہ
ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں
اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔
(۳) جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی
ہے پھر حق تعالیٰ شانہٗ فرماتے ہیں کہ قریب
ہے کہ میرے نیک بندے (دنیا کی) مشقتیں
اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں
(۴) اس میں سرکش شیاطین قید کر دیئے
جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں
کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف
غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں (۵) رمضان
کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے
مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا

ان عنده و تستغفر لهم الملائكة
بدل الحيتان. كذا في الترغيب)

کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا
نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام
ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے"

(২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতকে রমযান শরীফের ব্যাপারে পাঁচটি জিনিস বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে দান করা হয় নাই। ১. রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌কের ঘ্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। ২. তাহাদের জন্য নদীর মাছও দোয়া করে এবং ইফতার পর্যন্ত করিতে থাকে। ৩. প্রতিদিন তাহাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, অতিসত্বর আমার নেক বান্দারা নিজেদের উপর হইতে (দুনিয়ার) কষ্ট–ক্লেশ সরাইয়া তোমার কাছে আসিবে। ৪. এই মাসে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ফলে, অন্যান্য মাসে তাহারা যেই সমস্ত খারাপ কাজ পর্যন্ত পৌছিতে পারিত এই মাসে সেই পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। ৫. রমযানের সর্বশেষ রাত্রে রোযাদারদিগকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই রাত্র কি শবে কদর? উত্তরে বলিলেন, না, বরং নিয়ম হইল কাজ শেষ হইলে মজদুরকে তাহার মজদুরী দেওয়া হয়।

(তারগীব ঃ আহমদ, বাইহাকী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যেগুলি আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে এই উম্মতকে দান করিয়াছেন। পূর্ববর্তী উম্মতের রোযাদারদেরকে দেওয়া হয় নাই। আফসোস! আমরা যদি এই নেয়ামতের কদর করিতাম এবং ইহা হাসিল করিবার জন্য চেষ্টা করিতাম!

এক ঃ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ যাহা ক্ষুধা অবস্থায় সৃষ্টি হয় আল্লাহ তায়ালার কাছে মেশ্‌কে আম্বরের চাইতেও বেশী প্রিয়। হাদীস ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই কথাটির আটটি অর্থ হইতে পারে। সবকয়টিই আমি 'মুয়াত্তা' কিতাবের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। তবে আমি অধম (লেখক)–এর দৃষ্টিতে এইগুলির মধ্যে তিনটি অর্থ অগ্রগণ্য। একটি হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে এই দুর্গন্ধের বদলা ও সওয়াব এমন খুশবু দ্বারা দান করিবেন যাহা মেশকের চাইতেও অধিক উত্তম ও মস্তিষ্ক সতেজকারী হইবে। এই অর্থ একেবারেই স্পষ্ট এবং ইহা অসম্ভবও কিছু

নহে। তদুপরি 'দুররে মনছুর' কিতাবের এক হাদীসে ইহার স্পষ্ট বর্ণনাও রহিয়াছে। সুতরাং এই অর্থকে প্রায় নিশ্চিত বলা যায়।

দ্বিতীয়টি হইতেছে, কেয়ামতের দিন যখন কবর হইতে উঠিবে তখন এই আলামত হইবে যে, রোযাদারের মুখ হইতে এক প্রকার খুশবু বাহির হইবে যাহা মেশ্‌কে আম্বরের চাইতেও উত্তম হইবে।

তৃতীয়টি হইতেছে, দুনিয়াতেই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌কের চাইতে প্রিয়। অধমের মতে এই অর্থই সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়। ইহা মহব্বতের ব্যাপার। কেহ যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয় তবে তাহার দুর্গন্ধও নিজের কাছে হাজার খুশবুর তুলনায় অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়।

اے حافظ مسکین چہ کنی مشکِ ختن را
از گیسوئے احمد بستان عطرِ عدن را

অর্থাৎ হে অসহায় হাফেজ (কবির নাম)! তুমি খোতানের মেশক আনিয়া কি করিবে, আহমদের এলো কেশ শুঁকিয়া তুমি আদনের মন-মাতানো আতরের খুশবু ভোগ কর।

ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করিয়া আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইয়া যায়। রোযা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় এবাদত। এইজন্যই (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময় ফেরেশতারা দান করে আর রোযার বিনিময় আমি নিজে দান করি, কেননা ইহা একমাত্র আমারই জন্য। কোন বর্ণনায় হাদীসের শব্দ أُجْزٰى بِهٖ বর্ণিত রহিয়াছে যাহার অর্থ 'আমি নিজেই রোযার বিনিময়'! স্বয়ং মাহবুব এবং প্রেমাস্পদই যদি লাভ হইয়া যায় তবে ইহার চাইতে উত্তম বদলা ও বিনিময় আর কি হইতে পারে?

এক হাদীসে আছে, সমস্ত এবাদতের দরজা হইল রোযা। অর্থাৎ রোযার কারণে দিল নূরানী ও আলোকিত হইয়া যায়, যাহার ফলে অন্যান্য এবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে ইহা তখনই হইবে যখন আসল ও খাঁটি রোযা হইবে। অর্থাৎ শুধু ক্ষুধার্ত থাকিলে হইবে না; বরং রোযার ঐ সমস্ত আদব ও নিয়ম পালন করিতে হইবে। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৯নং হাদীসে আসিতেছে।

এখানে একটি জরুরী মাসআলা বয়ান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা এই যে, উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন ইমাম রোযাদারকে বিকালের দিকে মিসওয়াক করিতে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে মুখের দুর্গন্ধ

দূর না হইয়া যায়। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়াক্তেই মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কেননা মিসওয়াক দ্বারা দাঁতের দুর্গন্ধ দূর হয়। আর হাদীসে যে দুর্গন্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা পাকস্থলী খালি হওয়ার কারণে হয়। ইহা দাঁতের দুর্গন্ধ নহে। সুতরাং রোযাদারের জন্য মিসওয়াক নিষিদ্ধ করার কোন যুক্তিগত কারণ নাই। হানাফীগণের দলীল হাদীস ও ফিকাহর কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, রোযাদারদের জন্য মাছ এস্তেগফার করে। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদারের জন্য দোয়া ও এস্তেগফারকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এস্তেগফার করে। আমার চাচাজান (অর্থাৎ, মাওলানা ইলিয়াস রহঃ) বলিয়াছেন, মাছের কথা বিশেষভাবে এইজন্য বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ অচিরেই (অর্থাৎ দুনিয়াতেই) তাহাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৯৬)

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস। অতএব জিবরাঈল (আঃ) নিজে তাহাকে ভালবাসেন এবং আসমানে এই ঘোষণা দিয়া দেন যে, অমুক বান্দা আল্লাহর কাছে প্রিয় তোমরা সবাই তাহাকে ভালবাস। অতএব সমস্ত আসমানবাসী তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করে। এইভাবে জমীনেও তাহার মহব্বত ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তিকে তাহার আশেপাশের লোকেরাই মহব্বত করিয়া থাকে কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির মহব্বত ও জনপ্রিয়তা এতই ব্যাপক হইয়া যায় যে, শুধু আশেপাশের লোকেরাই নহে বরং পানিতে ও সাগর-নদীতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যেও তাহার প্রতি ভালবাসা পয়দা হইয়া যায়। অতএব উহারাও তাহার জন্য দোয়া করে। তাহার প্রতি মহব্বত এত ব্যাপক হয় যে, স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া পানি জগতে পৌঁছিয়া যায়, যাহা জনপ্রিয়তার সর্বশেষ স্তর। ইহাতে বনের প্রাণীরাও যে রোযাদারের জন্য দোয়া করে তাহাও বুঝে আসিয়া গেল।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। এই বিষয়টিও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, বৎসরের শুরু হইতেই রমযানের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করার কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। আর সাধারণ নিয়মও ইহাই যে, যে ব্যক্তির আগমনের গুরুত্ব যত বেশী হয় সেই অনুপাতেই পূর্ব হইতে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা কয়েক মাস পূর্ব হইতেই শুরু করা হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, চরম দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানকে কয়েদ করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজে জোর কমিয়া যায়। যেহেতু রমযান মাস অধিক রহমত ও এবাদতের মাস, কাজেই এই মাসে শয়তানের অবিরাম চেষ্টা ও মেহনতের ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজ সবচাইতে বেশী হওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তুলনামূলক গোনাহ খুব কম হইয়া থাকে। বহু শরাবী–কাবাবী লোক আছে যাহারা রমযান মাসে শরাব পান হইতে বিরত থাকে। এমনিভাবে স্পষ্ট দেখা যায় যে, অন্যান্য গোনাহও কমিয়া যায়। এতদসত্ত্বেও গোনাহ অবশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণে উল্লেখিত হাদীসে কোন প্রশ্ন দেখা দিবে না। কেননা, হাদীসে বলা হইয়াছে চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানকে কয়েদ করা হয়। অতএব সাধারণ শয়তান কয়েদমুক্ত থাকিয়া গোনাহের কাজে লিপ্ত করে ; তাই কোন প্রশ্ন থাকে না। অবশ্য অন্যান্য হাদীসে 'চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী' শব্দটির উল্লেখ না করিয়া শুধু শয়তানের কথা বলা হইয়াছে। যদি এই সকল হাদীস দ্বারাও চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানই উদ্দেশ্য হয় তবে তো আর কোন প্রশ্ন থাকিল না। কারণ অনেক সময় অতিরিক্ত অর্থবোধক শব্দ উল্লেখ না করিলেও অপরাপর হাদীস দ্বারা তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যায়। আর যদি এই সকল হাদীস দ্বারা সব ধরনের শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ করার কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় তবুও গোনাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ প্রশ্ন ও জটিলতা থাকিবে না। কেননা গোনাহ যদিও সাধারণতঃ শয়তানের ধোকার কারণে হইয়া থাকে কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর শয়তানের সহিত মেলামেশা এবং তাহার বিষক্রিয়া ছড়াইয়া যাওয়ার কারণে নফসের সম্পর্ক শয়তানের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া যায় যে, এখন কিছুক্ষণের জন্য শয়তানের অনুপস্থিতি অনুভূত হয় না, বরং শয়তানী খেয়াল স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। তাই দেখা যায় রমযান ছাড়া অন্য সময় যাহাদের দ্বারা গোনাহের কাজ বেশী হয় রমযান মাসে তাহাদের দ্বারাই বেশী হয়—নফস যেহেতু সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকে তাই উহার প্রভাবও সর্বদা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যখন কোন গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। ইহার পর যদি সে খাঁটি তওবা করে তবে ঐ দাগ দূর হইয়া যায় নতুবা উহা লাগিয়াই থাকে। পুনরায় যদি গোনাহ করে তবে অনুরূপ আরেকটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে দাগ পড়িতে পড়িতে তাহার অন্তর সম্পূর্ণ কালো হইয়া যায়। অতঃপর ভাল কথা তাহার অন্তরে স্থান পায় না। ইহাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমের এই আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন— كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত অন্তর গোনাহের দিকে নিজেই ধাবিত হয়। এই কারণেই বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কোন এক ধরনের গোনাহ নির্দ্বিধায় করিয়া ফেলে কিন্তু ঐ ধরনেরই অন্য কোন গোনাহ যখন সম্মুখে আসে তখন অন্তর তাহা করিতে রাজি হয় না। যেমন, শরাবখোরকে যদি শূকরের গোশত খাইতে বলা হয় তবে সে খাইতে চাহিবে না। অথচ গোনাহের দিক হইতে উভয়টি সমান। অনুরূপভাবে রমযান ছাড়া অন্য সময় যখন গোনাহ করিতে থাকে তখন তাহাদের অন্তর উক্ত গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অতঃপর রমযান আসার পর আর শয়তানের প্রয়োজন হয় না ; এমনিতেই গোনাহ হইতে থাকে।

মোটকথা, হাদীস দ্বারা যদি সবধরনের শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয় তবু রমযান মাসে গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের কারণ থাকে না। আর যদি শুধু চরম দুষ্ট ও বিদ্রোহী শয়তানকে আবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয় তবে তো কোন প্রশ্ন থাকেই না। অধমের খেয়ালে এই ব্যাখাই উত্তম।

যে কোন লোক চিন্তা করিতে পারে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে যে, অন্য মাসে নেক কাজ করার জন্য এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যতটুকু জোর লাগাইতে হয় রমযান মাসে ততটুকু করিতে হয় না। বরং সামান্য একটু হিম্মত করিলে এবং খেয়াল করিলেই যথেষ্ট হইয়া যায়।

হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ)–এর অভিমত হইল, হাদীস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে আসিয়াছে। ফাসেক ও গোনাহগারদের জন্য শুধু দুষ্ট শয়তানদিগকে আবদ্ধ করা হয় আর নেককারদের জন্য সবধরণের শয়তানকেই আবদ্ধ করা হয়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রমযানের সর্ব শেষ রাত্রে রোযাদারদিগকে

মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়টি প্রথম হাদীসেও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু রমযান মাসে শবে কদর সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্র তাই সাহাবায়ে কেরামের মনে এই খেয়াল উদয় হইয়াছে যে, এত বড় ফযীলত তো শবে কদরের জন্যই হইতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ফযীলত, যাহা রমযান শেষ হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে।

(۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقٰى دَرَجَةً قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِىْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ اٰمِيْنَ - (رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد كذا فى الترغيب وقال السخاوى رواه ابن حبان فى ثقاته وصححه والطبرانى فى الكبير والبخارى فى بر الوالدين له والبيهقى فى الشعب وغيرهم ورجاله ثقات و

کعبؓ بن عُجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضورؐ نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اُترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے (منبر پر چڑھتے ہوتے) ایسی بات سُنی جو پہلے کبھی نہیں سُنی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسوقت جبرئیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو) انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اسکی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپکا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں

داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔   بسط طرقه وروى الترمذى عن ابى

هريرة بمعناه وقال ابن حجر طرقه

كثيرة كما فى المرقاة)

(৩) হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা মিম্বরের কাছে আসিয়া যাও। আমরা মিম্বরের কাছে আসিয়া গেলাম। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখন বলিলেন, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তিনি খুৎবা ও বয়ান শেষ করিয়া মিম্বর হইতে নামিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে মিম্বরে উঠিবার সময় এমন কিছু কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা পূর্বে কখনও শুনি নাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে রমযানের মোবারক মাস পাইল তাহার গোনাহ মাফ হইল না। আমি বলিলাম, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্তু সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়ে না। আমি বলিলাম, আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল কিন্তু তাহারা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম, আমীন। (তারগীব ঃ হাকিম, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, বাইহাকী ঃ শু'আব, বুখারী ঃ বিররুল ওয়ালিদাইন নামক কিতাব)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তিনটি বদদোয়া করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটি বদদোয়ার উপর আমীন বলিয়াছেন।। প্রথমতঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর মত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার বদদোয়াই যথেষ্ট ছিল তারপর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীন ইহার সহিত যোগ হইয়া আরও কত কঠিন বানাইয়া দিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই তিন জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকার তওফীক দান করুন এবং এই সমস্ত গোনাহ হইতে রক্ষা করুন ; নচেৎ ধ্বংসের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে।

'দুররে মানসূর' নামক কিতাবের কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমীন বলার জন্য বলিয়াছেন অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে এই বদদোয়া সম্পর্কে আরো বেশী গুরুত্ব বুঝা যায়।

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যাহার উপর রমযানের মুবারক মাস অতিবাহিত হইয়া যায় কিন্তু তাহার গোনাহ মাফ হয় না। অর্থাৎ রমযান মোবারক এত বরকত ও কল্যাণের মাস, যে মাসে মাগফেরাত ও আল্লাহর রহমত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকে, এমন মাসও গোনাহ ও গাফলতির মধ্য কাটিয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তির রমযান মাস এইভাবে কাটিয়া যায় যে, নিজের বদআমলী ও ত্রুটির কারণে মাগফেরাত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায় তবে আর কোন্ সময়টি তাহার মাগফেরাতের জন্য হইবে? এবং তাহার ধ্বংসের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? মাগফেরাতের পন্থা হইল, এই মাসে যে সমস্ত আমল রহিয়াছে, যেমন রোযা, তারাবীহ এইগুলি অত্যন্ত এহতেমামের সাথে আদায় করার পর স্বীয় গোনাহ হইতে বেশী বেশী তওবা ও এস্তেগফার করা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহার জন্য বদদোয়া করা হইয়াছে সে হইল যাহার সম্মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দুরূদ পড়ে না। এই বিষয়টি আরো অনেক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তাই কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হয় তখনই শ্রবণকারীদের উপর দুরূদ পড়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর দুরূদ পড়ে না তাহার ব্যাপারে আরো বহু ধমকি ও হুঁশিয়ারীর কথা উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরও অনেক হাদীসে আসিয়াছে। কোন কোন হাদীসে এইরূপ ব্যক্তিকে অত্যন্ত হতভাগা ও বখীল বলা হইয়াছে। কোথাও তাহাকে জালেম ও জান্নাতের রাস্তাহারা বলা হইয়াছে। এমনকি তাহাকে বদদ্বীন ও জাহান্নামে প্রবেশকারীও বলা হইয়াছে। এমনও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখিতে পাইবে না। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম যদিও এই সমস্ত রেওয়ায়াতের সহজ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তবুও এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, যে ব্যক্তি দুরূদ পড়ে না তাহার সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদসমূহের বাহ্যিক এতই কঠিন যাহা সহ্য করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

আর এইরূপ কেনই বা হইবে না? উম্মতের উপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহসান ও অনুগ্রহ এতই অপরিসীম যাহা লিখায় ও কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহাছাড়া উম্মতের উপর তাঁহার হক ও অধিকার এত বেশী যে, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দুরূদ বর্জনকারী সম্বন্ধে যে কোন ধমকি ও হুঁশিয়ারী যথার্থই মনে হয়। কেবল দুরূদ শরীফ পড়ার যে ফযীলত রহিয়াছে তাহা হইতে মাহরূম থাকাই স্বতন্ত্র একটা বদনসীবি ও দুর্ভাগ্য। ইহার চাইতে বড় ফযীলত আর কি হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহতায়ালা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। তদুপরি ফেরেশতাদের দোয়া, গোনাহ মাফ হওয়া, দরজা বুলন্দ হওয়া, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব লাভ হওয়া, শাফাআত ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি অতিরিক্ত। ইহা ছাড়াও বিশেষ সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করার দরুন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তাঁহার গজব হইতে মুক্তিলাভ, কেয়ামতের বিভীষিকা হইতে নাজাত লাভ, মৃত্যুর আগেই জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখা ইত্যাদি বিষয়ের ওয়াদাও রহিয়াছে। এইসব কিছু ছাড়াও দুরূদ শরীফ পড়িলে দারিদ্র ও অভাব দূর হয়, আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে নৈকট্য লাভ হয়, দুশমনের মোকাবিলায় সাহায্য লাভ হয়, অন্তর মোনাফেকী ও মরিচামুক্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে তাহার ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়া সম্বন্ধে হাদীস শরীফে আরো অনেক সুসংবাদ রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরজ এবং এই ব্যাপারে সকল মাযহাবের ওলামাগণ একমত। অবশ্য বার বার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হইলে প্রত্যেক বার দরুদ পড়া ওয়াজিব কি না এই ব্যাপারে দ্বিমত রহিয়াছে। কতকের মতে ওয়াজিব আর কতকের মতে মুস্তাহাব।

তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল কিন্তু তাহাদের এই পরিমাণ খেদমত করিল না যাহা দ্বারা সে জান্নাতের উপযুক্ত হইতে পারে। পিতামাতার হকের ব্যাপারে বহু হাদীসে তাকিদ আসিয়াছে। ওলামায়ে কেরাম পিতামাতার হক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, জায়েয বিষয়ে তাহাদের কথা মানা জরুরী। ইহাও লিখিয়াছেন, পিতামাতার সহিত বেআদবী করিবে না, তাহাদের সহিত অহঙ্কার করিবে না, যদিও তাহারা মুশরেক হয়। নিজের আওয়াজ তাহাদের আওয়াজের চাইতে বড় করিবে না, তাহাদের নাম ধরিয়া

ডাকিবে না, কোন কাজে তাহাদের চেয়ে আগে বাড়িবে না, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধের ক্ষেত্রেও তাহাদের সহিত নম্রতা অবলম্বন করিবে। যদি তাহারা না মানে তবে সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করিতে থাকিবে। মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখিবে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দরজা হইতেছে পিতা। তোমার মন চাহিলে উহাকে হেফাজত করিতে পার অথবা উহাকে নষ্ট করিতে পার। জনৈক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামাতার হক কি? তিনি বলিলেন, তাহারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টি জান্নাত আর তাহাদের অসন্তুষ্টি জাহান্নাম। এক হাদীসে আছে, বাধ্যগত ছেলে যদি মহব্বতের দৃষ্টিতে পিতামাতার দিকে একবার তাকায় তবে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ হইবে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ ছাড়া যত ইচ্ছা মাফ করেন কিন্তু পিতামাতার নাফরমানী ও অবাধ্যতার সাজা মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে দিয়া দেন।

জনৈক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? উত্তরে বলিলেন, জ্বি হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার খেদমত কর ; তাহার পায়ের নীচে তোমার জান্নাত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ ছাড়া আরো বহু হাদীসে পিতামাতার আনুগত্য ও খেদমতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যাহারা গাফিলতি করিয়া এইসব বিষয়ে ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্তমানে তাহাদের পিতামাতা জীবিত নাই এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়তে ইহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, কাহারো পিতামাতা যদি এমতাবস্থায় মারা গিয়া থাকে যে, সে তাহাদের অবাধ্যতা করিত, তবে তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া ও এস্তেগফার করিলে সে বাধ্যগত বলিয়া গণ্য হইবে। আরেক হাদীসে আছে, উত্তম সদ্ব্যবহার হইল পিতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার করা।

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَّحَضَرَ رَمَضَانُ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ وَيُبَاهِيْ بِكُمْ مَلٰٓئِكَتَهٗ فَاَرُوا اللّٰهَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ خَيْرًا فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ.

(رواه الطبراني ورواته ثقات الا محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل كذا في الترغيب)

حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہٗ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمتِ خاصّہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔

(৪) হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রমযান মাসের নিকটবর্তী সময়ে একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, রমযানের মাস আসিয়া গিয়াছে। যাহা অতি বরকতের মাস। এই মাসে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন, বিশেষ রহমত নাযিল করেন, গোনাহ মাফ করেন এবং দোয়া কবুল করেন। তোমাদের তানাফুসকে (অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা) দেখেন এবং ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে তোমাদের নেক কাজ দেখাও। ঐ ব্যক্তি বড়ই হতভাগা যে এইমাসেও আল্লাহর রহমত হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ 'তানাফুস' শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় বেশী করার আগ্রহ লইয়া কাজ করা। যাহারা গর্ব ও প্রতিযোগিতা করিতে চায় তাহারা এই ক্ষেত্রে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাক। আমি গর্বস্বরূপ নহে বরং নেয়ামতের প্রকাশ ও শোকরিয়া স্বরূপ বলিতেছি, নিজের অযোগ্যতার কারণে যদিও কিছু করিতে পারি না কিন্তু আমার ঘরের মহিলাদের অবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হই যে, তাহাদের অধিকাংশই তেলাওয়াতের ব্যাপারে একে অপরের তুলনায় আগে বাড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে। ঘরের কাজকর্ম সত্ত্বেও দৈনিক ১৫/২০ পারা সহজে পড়িয়া নেয়। আল্লাহ তায়ালা

দয়া করিয়া এইটুকু কবুল করিয়া নিন এবং আরো বেশী আমল করিবার তওফীক দান করুন।

(৫) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰہِ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عُتَقَاءَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ وَّلَیْلَۃٍ یَعْنِیْ فِیْ رَمَضَانَ وَاِنَّ لِکُلِّ مُسْلِمٍ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ وَّلَیْلَۃٍ دَعْوَۃً مُّسْتَجَابَۃً۔ (رواہ البزار کذا فی الترغیب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے (جہنم کے) قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রমযান মাসের প্রতি দিবারাত্রে আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে (জাহান্নামের) কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রতি দিবারাত্রে প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া অবশ্যই কবুল করা হয়। (তারগীব ঃ বায্যার)

ফায়দা ঃ বহু হাদীসে রোযাদারের দোয়া কবুল হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমরা ঐ সময় এইভাবে খাওয়ার পিছনে পড়ি যে, অন্য দোয়া করার সুযোগ তো দূরের কথা খোদ ইফতারের দোয়াই মনে থাকে না। ইফতারের প্রসিদ্ধ দোয়া এই—

اَللّٰھُمَّ لَکَ صُمْتُ وَبِکَ اٰمَنْتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَعَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোযা রাখিয়াছি, আপনার প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, আপনার উপরই ভরসা করিয়াছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করিতেছি।

হাদীসের কিতাবসমূহে এই দোয়াটি সংক্ষিপ্তভাবেই পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাযিঃ) ইফতারের সময় এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِیْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে স্বীয় গোনাহমাফীর দরখাস্ত করিতেছি, আপনার ঐ রহমতের ওসীলায় যাহা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে।

কোন কোন কিতাবে স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই দোয়া বর্ণিত আছে—

يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ হে সুপ্রশস্ত অনুগ্রহের মালিক ! আমাকে মাফ করুন।

আরো অন্যান্য দোয়াও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশেষ কোন দোয়াই পড়িতে হইবে এমন নহে। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার সময়। অতএব আপন প্রয়োজন অনুসারে দোয়া করিবেন। আর স্মরণ হইলে এই গোনাহগারকেও দোয়ায় শরীক করিয়া লইবেন, কেননা আমি একজন সওয়ালকারী। আর সওয়ালকারীর হক রহিয়াছে। (কবির ভাষায়—)

چشمۂ فیض سے گر ایک اشارا ہو جائے لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے

অর্থ ঃ আপনার দয়ার ভাণ্ডার হইতে যদি একটু ইশারা হইয়া যায় তবে আমি দয়াপ্রাপ্ত হইব। আপনার একটু মেহেরবানী হইল আর আমার কাজ হইয়া গেল।

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ.

(رواه احمد فی حدیث والترمذی وحسنه وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحهما کذا فی الترغیب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہٗ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے۔

(৬) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক. ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া। দুই. ন্যায়বিচারক বাদশাহের দোয়া। তিন. মাজলুম ব্যক্তির দোয়া ; আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া মেঘের উপর উঠাইয়া লন। আসমানের সকল দরজা উহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমার ইয্যতের কসম ! আমি অবশ্যই

তোমার সাহায্য করিব। যদিও (কোন মঙ্গলের কারণে)কিছুটা বিলম্ব ঘটে।

ফায়দা ঃ 'দুররে মানসূর' কিতাবে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযান মাস আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা বদলাইয়া যাইত। তাঁহার নামাযের পরিমাণ বাড়িয়া যাইত এবং দোয়ার মধ্যে খুবই কাকুতি-মিনতি করিতেন। আল্লাহর ভয় ও ভীতি বৃদ্ধি পাইয়া যাইত। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) অন্য এক রেওয়ায়াতে বলেন, রমযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বিছানায় আসিতেন না।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ পাক রমযান মাসে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন যে, তোমরা নিজ নিজ এবাদত-বন্দেগী ছাড়িয়া রোযাদারদের দোয়ার সাথে সাথে আমীন বলিতে থাক। বহু হাদীস দ্বারা রমযানের দোয়া বিশেষভাবে কবূল হওয়ার কথা জানা যায়। আর ইহা নিশ্চিত কথা যে, রমযানে দোয়া কবূল করার ব্যাপারে যখন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে এবং তাঁহার সত্য রাসূল উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন এই ওয়াদা পূরণ হইবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, কেহ কোন উদ্দেশ্য নিয়া দোয়া করিয়া থাকে অথচ তাহার দোয়ায় কোন কাজ হয় না। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাহার দোয়া কবূল হয় নাই। বরং দোয়া কবূল হওয়ার অর্থ বুঝিয়া লওয়া দরকার।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ বা কোন পাপকাজ ব্যতীত কোন দোয়া করে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে তিনটি বিষয়ের কোন একটি অবশ্যই পাইয়া থাকে। হয়তো সে যে বিষয়ে দোয়া করিয়াছে যথাযথ উহাই পাইয়া যায়। অথবা উহার পরিবর্তে তাহার উপর হইতে কোন মুসীবত দূর করিয়া দেওয়া হয়। অথবা ঐ পরিমাণ সওয়াব আখেরাতে তাহার আমলনামায় লিখিয়া দেওয়া হয়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে দোয়া করার হুকুম দিয়াছিলাম এবং উহা কবূল করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। তুমি কি আমার নিকট দোয়া করিয়াছিলে? বান্দা আরজ করিবে, দোয়া করিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইবেন, তুমি এমন কোন দোয়া কর নাই যাহা আমি কবূল করি নাই। তুমি দোয়া করিয়াছিলে যে, তোমার অমুক কষ্ট ও অসুবিধা দূর হইয়া যাক। আমি দুনিয়াতে উহা দূর করিয়া দিয়াছিলাম। তুমি অমুক পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য দোয়া

করিয়াছিলে। কিন্তু উহা কবূল হওয়ার কোন আলামত তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি উহার পরিবর্তে তোমার জন্য এই পরিমাণ সওয়াব ও প্রতিদান নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, এইভাবে তাহাকে প্রত্যেকটি দোয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে এবং উহার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি দুনিয়াতে পুরা হইয়াছে আর কোন্ কোন্‌টির জন্য আখেরাতে কি পরিমাণ বদলা ও প্রতিদান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিয়া দেওয়া হইবে। তখন বান্দা এত বেশী সওয়াব ও প্রতিদান দেখিয়া আফসোস করিয়া বলিবে যে, হায় ! দুনিয়াতে যদি তাহার একটি দোয়াও পূরণ না হইত ! মোটকথা, দোয়া নেহায়েত আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোয়ার ব্যাপারে গাফলতি ও উদাসীনতা মারাত্মক লোকসান ও ক্ষতির কারণ। যদি জাহেরীভাবে দোয়া কবূল হওয়ার আলামত না দেখা যায়, তবু নিরাশ হইতে নাই।

এই কিতাবের শেষ দিকে যে দীর্ঘ হাদীস আসিতেছে উহা দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বান্দার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বান্দা যাহা চাহিয়াছে উহা যদি তাহার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তিনি উহা দিয়া দেন, আর যদি উহা তাহার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে তিনি তাহা দেন না। ইহাও আল্লাহ তায়ালার এক বড় অনুগ্রহ। কেননা অনেক সময় আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এমন জিনিসের দোয়া করিয়া থাকি যাহা আমাদের জন্য মুনাসিব ও সংগত নয়। আরও একটি জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, অনেক পুরুষ এবং বিশেষ করিয়া মহিলারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে যে, প্রায় সময়েই তাহারা রাগ-গোস্বা ও ক্ষোভে-দুঃখে নিজের সন্তান ইত্যাদিকে বদদোয়া দিয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার সুমহান দরবারে এমন কিছু বিশেষ সময় রহিয়াছে যে, তখন যাহা চাওয়া হয় তাহাই কবূল হইয়া যায়। অতএব এই আহমক রাগ-গোস্বায় প্রথমে তো নিজের সন্তানের জন্য বদদোয়া করে, আর যখন সন্তান মরিয়া যায় বা কোন বিপদে পড়িয়া যায় তখন সে কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ ইহা চিন্তাও করে না যে, এই মুসীবত তো সে নিজেই বদদোয়া করিয়া চাহিয়া লইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজের উপর, নিজের সন্তানের উপর এমনকি নিজের মাল-সম্পদ ও খাদেমদের উপর বদদোয়া করিও না। হয়তো তোমার এই বদ-দোয়া কোন খাছ কবুলিয়াতের সময়ে হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রমযানুল মোবারকের পুরাটা মাসই হইল দোয়া

কবূলের মাস। এই সময়ে কোন বদদোয়া করা হইতে খুবই সতর্কতার সহিত বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রমযান মাসে আল্লাহর স্মরণকারী ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মাসে আল্লাহর নিকট দোয়াকারী ব্যক্তি ব্যর্থ হয় না।

'তারগীব' কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযানের প্রত্যেক রাত্রে একজন আহবানকারী ফেরেশতা ডাকিয়া বলিতে থাকে যে, হে নেকী অন্বেষণকারী! নেককাজে মনোযোগ দাও এবং অগ্রসর হও। হে পাপাচারী! ক্ষান্ত হও, চোখ খুলিয়া দেখ! অতঃপর সেই ফেরেশতা আবার ঘোষণা করিতে থাকে যে, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী যাহাকে ক্ষমা করা হইবে! কে আছ তওবাকারী যাহার তওবা কবূল করা হইবে! কে আছ দোয়াকারী যাহার দোয়া কবূল করা হইবে! কে আছ সওয়ালকারী যাহার সওয়াল পূরণ করা হইবে!

উপরোক্ত আলোচনার পর এই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীস শরীফে দোয়া কবূল হওয়ার জন্য কিছু শর্তও বর্ণিত হইয়াছে। এই শর্তগুলি পাওয়া না গেলে অনেক সময়ই দোয়া কবূল হয় না। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি হইল খাদ্য হালাল হইতে হইবে। কেননা, হারাম খাদ্যের কারণেও দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, বহু দুর্দশাগ্রস্ত লোক আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে থাকে এবং ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অথচ তাহার খানাপিনা হারাম, লেবাস-পোশাক হারাম। এমতাবস্থায় তাহার দোয়া কিভাবে কবূল হইবে?

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, কুফা নগরীতে এক জামাত ছিল যাহাদের দোয়া কবূল হইত। যখনই কোন শাসনকর্তা তাহাদের উপর জুলুম করিত তখন তাহারা বদদোয়া করিতেন ফলে সেই শাসনকর্তা ধ্বংস হইয়া যাইত। জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ গভর্নর নিযুক্ত হইলে সে একদিন দাওয়াতের আয়োজন করিল। এই অনুষ্ঠানে উপরোল্লিখিত আল্লাহওয়ালাদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত করিয়া আনিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর হাজ্জাজ বলিয়া উঠিল যে, আমি এই সকল বুযুর্গ লোকদের বদদোয়া হইতে নিরাপদ হইয়া গেলাম। কেননা তাহাদের পেটে হারাম খাদ্য ঢুকিয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের যমানায়

হালাল রুজির বিষয়ে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন যেখানে সর্বদাই সুদকে পর্যন্ত হালাল করিবার চেষ্টা চলিতেছে, চাকরীজীবীগণ ঘুষ গ্রহণকে এবং ব্যবসায়ীগণ ধোকা–প্রবঞ্চনাকে উত্তম মনে করিতেছে।

(৭) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ. (رواه الطبرانى فى الاوسط و ابن حبان فى صحيحه كذا فى الترغيب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہٗ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔

(৭) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এবং তাহার ফেরেশতাগণ সেহরী খানেওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন।

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও অনুগ্রহ যে, রোযা শুরু করিবার পূর্বের খানা যাহাকে সেহরী বলা হয় রোযার বরকতে উহাকেও তিনি উম্মতের জন্য সওয়াবের বিষয় বানাইয়া দিয়াছেন এবং উহাতেও মুসলমানদেরকে নেকী ও সওয়াব দিয়া থাকেন। বহু হাদীসে সেহরী খাওয়ার ফযীলত ও উহার সওয়াবের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন, আল্লামা আইনী (রহঃ) সতরজন সাহাবায়ে কেরাম হইতে সেহরীর ফযীলত সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার উপর উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। অলসতার দরুন অনেকেই এই ফযীলত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায়। আবার কেহ কেহ তারাবীর নামাযের পর খানা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং সে উহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকে। কেননা, অভিধানে সেহরী বলা হয় ঐ খানাকে যাহা সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খাওয়া হয়। যেমন 'আল–কামূস' নামক অভিধান গ্রন্থে ইহাই লেখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, অর্ধরাত হইতেই সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত শুরু হইয়া যায়। 'কাশ্শাফ' গ্রন্থের লেখক রাত্রের শেষ ষষ্ঠাংশকে সেহরীর ওয়াক্ত বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত রাত্রকে ছয় ভাগে ভাগ করিবার পর শেষ অংশকে সেহরী বলে। যেমন সূর্যাস্ত হইতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যদি বার ঘন্টা হয় তবে শেষ দুই ঘন্টা হইবে সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত। আর এই দুই ঘন্টার মধ্যেও শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া উত্তম। তবে শর্ত হইল, এত দেরী যেন না হয় যে, রোযার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও বহু হাদীসে সেহরীর ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাদের এবং ইয়াহুদ–নাসারাদের রোযার মধ্যে সেহরী খাওয়ার দ্বারাই পার্থক্য হইয়া থাকে। কেননা তাহারা সেহরী খায় না। অন্য এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সেহরী খাও, কেননা ইহাতে বরকত রহিয়াছে। আরেক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রহিয়াছে—১. জামাত, ২. ছারীদ ও ৩. সেহরী খাওয়ার মধ্যে। এই হাদীসে জামাত শব্দটি ব্যাপক অর্থে আসিয়াছে। নামাযের জামাত হউক বা প্রত্যেক ঐ কাজ যাহা মুসলমানগণ জামাতবদ্ধ হইয়া করিয়া থাকে। এই জামাতের সহিত আল্লাহর সাহায্য রহিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। ছারীদ বলা হয় গোশত ও রুটি দ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার খাদ্যকে, যাহা খুবই সুস্বাদু হইয়া থাকে। তৃতীয় হইল সেহরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে নিজের সহিত সেহরী খাওয়ার জন্য ডাকিতেন তখন এইরূপ এরশাদ করিতেন যে, আস ! বরকতের খানা খাও। এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন যে, সেহরী খাইয়া রোযার জন্য শক্তি হাসিল কর এবং দুপুরে ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে উঠিবার ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ কর।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযিঃ) এক সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এমন এক সময়ে হাজির হইলাম যে, তখন তিনি সেহরী খাইতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা একটি বরকতের জিনিস, যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন ; ইহা কখনও ছাড়িও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সেহরীর খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন। এমনকি তিনি এইরূপও এরশাদ করিয়াছেন যে, আর যদি কিছু নাও খাইতে পার তবে অন্ততঃ একটি খেজুর হইলেও খাইয়া লও অথবা এক ঢোক পানি হইলেও পান করিয়া লইও। কেননা ইহাতে রোযাদারের যেমন পেট ভরে তেমনি সওয়াবও হয়। কাজেই বিশেষভাবে এই খানার এহ্‌তেমাম করা চাই। কারণ, উহাতে নিজেরই আরাম এবং নিজেরই ফায়দা এবং বিনা কষ্টে সওয়াবও পাওয়া যায়। তবে এতটুক অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সব কাজে অতিমাত্রা ও অতি কম উভয়ই ক্ষতিকর। তাই এত কম খাইবে না যে, এবাদত–বন্দেগীতে দুর্বলতা অনুভব হয়। আর এত বেশীও খাইবে না যে, সারাদিন চুকা ঢেকুর আসিতে থাকে। ‘একটি খেজুর বা এক ঢোক পানির

কথা' বলিয়া উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্যান্য হাদীসেও বেশী খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আসিয়াছে। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেহরীর বরকত বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। যেমন ইহাতে সুন্নতের অনুসরণ করা হয় এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী–নাসারাদের বিরোধিতা করা হয়। কেননা তাহারা সেহরী খায় না। আর আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের বিরোধিতা করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও সেহরী খাওয়ার দ্বারা এবাদতে শক্তি লাভ হয় এবং অধিক একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত অতিমাত্রায় ক্ষুধার কারণে অনেক সময় মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, সেহরী খাওয়ার দ্বারা ইহারও প্রতিরোধ হয়। সেহরী খাওয়ার সময় যদি কোন অভাবী লোক আসিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্য করা যায়। পাড়া–প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ফকীর বা গরীব মানুষ থাকিলে তাহারও সাহায্য করা যায়। সর্বোপরি ইহা বিশেষভাবে দোয়া কবূল হওয়ার সময়। সেহরীর বদৌলতে এই সময় দোয়া ও যিকিরের তওফীক হয়। ইহা ছাড়াও সেহরীর আরও অনেক উপকারিতা রহিয়াছে।

ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন, সূফী–সাধকগণের মধ্যে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, ইহা রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত ; কেননা রোযার উদ্দেশ্য হইল পেট ও লজ্জাস্থানের খাহেশকে দুর্বল করিয়া দেওয়া। অথচ সেহরী এই উদ্দেশ্যের খেলাফ। কিন্তু সহীহ কথা এই যে, সেহরী এতবেশী পরিমাণে খাওয়া যাহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় ইহা তো ভাল নয়। ইহা ছাড়া খাওয়ার পরিমাণ অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। অধমের নাকেস খেয়ালেও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত অভিমত ইহাই যে, সেহরী ও ইফতার কম খাওয়াই উত্তম। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী উহাতে ব্যতিক্রম হইয়া যায়। যেমন, তালেবে এলেমদের জন্য খানার পরিমাণ কম করিলে রোযার উপকারিতা হাসিল হইবে বটে কিন্তু তাহাদের এলেম হাসিলের মধ্যে ক্ষতি হইবে। তাই তাহাদের জন্য উত্তম হইল যে, তাহারা কম খাইবে না। কেননা শরীয়তে ইলমেদ্বীন হাসিল করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এমনিভাবে জাকেরীনদের জামাত ও অন্যান্য জামাত যাহারা কম খাওয়ার কারণে কোন দ্বীনি কাজে গুরুত্ব সহকারে মশগুল হইতে পারিবে না, তাহাদের জন্যও কম না খাওয়াই উত্তম।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জিহাদে

যাওয়ার সময় ঘোষণা করেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখার মধ্যে নেকী নাই। অথচ তখন রমযানের রোযা ছিল। কিন্তু সেখানে জিহাদের প্রয়োজন সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য রোযার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজে যদি দুর্বল হইবার আশংকা না থাকে, তবে খানার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়াই উত্তম।

'শরহে ইকনা' কিতাবে আল্লামা শা'রানী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'আমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে যে, পেট ভরিয়া খানা খাইব না ; বিশেষ করিয়া রমযানের রাত্রসমূহে।' অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে খানা কমাইয়া দেওয়াই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি ইফতার ও সেহরীর সময় পেট ভরিয়া খাইল তাহার রোযার দ্বারা কি ফায়দা হইল। মাশায়েখগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ভুকা থাকিবে, আগামী রমযান পর্যন্ত এক বৎসর শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে। আরও অনেক বুযুর্গ মাশায়েখ হইতেও এই ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম বর্ণিত হইয়াছে।

'এহয়াউল উলূম' কিতাবের ব্যাখ্যায় 'আওয়ারিফ' কিতাবের বরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তারী (রহঃ) পনর দিনে একবার খানা খাইতেন আর রমযান মাসে মাত্র এক লোকমা খানা খাইতেন। অবশ্য সুন্নতের উপর আমল করিবার জন্য প্রতিদিন শুধু পানি দ্বারা ইফতার করিতেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন ; তবে (আল্লাহওয়ালা) বন্ধু–বান্ধবদের মধ্য হইতে কেহ আসিলে রোযা খুলিতেন এবং বলিতেন, এইরূপ বন্ধু–বান্ধবদের সহিত খাওয়া–দাওয়া করার ফযীলত রোযার ফযীলত হইতে কোনপ্রকার কম নয়। আরও অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের হাজারো ঘটনা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাহারা খানা কমাইয়া দিয়া নিজেদের নফসকে শায়েস্তা করিতেন। কিন্তু শর্ত ইহাই যে, এই কারণে যেন দ্বীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষতি না হইয়া যায়।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهَرُ.

(رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائى)

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ اُن کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ اُن کو رات کے جاگنے (کی مشقت) کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔

وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال على شرط البخاري ذكر لفظهما المنذري في الترغيب بمعناه)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন আছে, যাহাদের রোযার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আবার অনেক রাত্রি জাগরণকারী এমন আছে, যাহাদের রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত আছে। এক ঃ ইহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে সারাদিন রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে ; রোযা রাখার দ্বারা যে পরিমাণ সওয়াব হইয়াছিল হারাম মাল খাওয়ার গোনাহ্ উহা হইতে বেশী হইয়া গেল। সুতরাং দিনভর শুধু অনাহারে থাকা ছাড়া তাহার আর কোন লাভ হইল না।

দ্বিতীয় অভিমত হইল, ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা রাখে ; কিন্তু গীবত–শেকায়েত অর্থাৎ অন্যের দোষ–চর্চায় লিপ্ত থাকে। ইহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

তৃতীয় অভিমত হইল, ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা রাখিয়াও গোনাহ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ ও বাণীসমূহ খুবই ব্যাপক ও বহুল অর্থবিশিষ্ট হয় ; এইসব অভিমত এবং আরও অন্যান্য অভিমতও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এমনিভাবে রাত্রি জাগরণের অবস্থা। সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইল ; কিন্তু আমোদ–ফুর্তির জন্য একটু গীবত করিল কিংবা অন্য কোন আহাম্মকী কাজ করিল, যাহাতে তাহার সমস্ত রাত্রি–জাগরণ বেকার হইয়া গেল। যেমন ফজরের নামাযই কাজা করিয়া দিল অথবা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য বা সুনাম অর্জনের জন্য রাত্রি–জাগরণ করিল ফলে উহা বেকার হইল।

(৯) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لئے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔

(رواه النسائی وابن ماجة وابن خزیمة والحاکم وصححه علی شرط البخاری

والفاظهم مختلفة حکاها المنذری فی الترغیب)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ উহাকে ফাড়িয়া না ফেলে।

ফায়দা ঃ ঢাল হইবার অর্থ হইল, মানুষ যেভাবে ঢাল দ্বারা নিজের হেফাজত করে ঠিক তেমনিভাবে রোযার দ্বারাও নিজের দুশমন অর্থাৎ শয়তান হইতে আত্মরক্ষা হয়। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, রোযা আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা করে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রোযা জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া রাখে। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোযা কোন্ জিনিসের দ্বারা ফাড়িয়া যায়? তিনি ফরমাইলেন, মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা। উপরোক্ত দুইটি রেওয়ায়াত এবং এইরূপ আরও বিভিন্ন রেওয়াতে রোযা রাখা অবস্থায় এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ আসিয়াছে এবং এই কাজগুলিকে যেন রোযা বিনষ্টকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আমাদের এই যুগে রোযা রাখিয়া আজে–বাজে কথাবার্তায় মশগুল হওয়াকে সময় কাটানোর উপায় মনে করা হয়। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে মিথ্যা ও গীবত দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই দুইটি বিষয় এই সকল ওলামায়ে কেরামের নিকট খানাপিনা ইত্যাদি অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী জিনিসের মতই। আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও রোযা ভঙ্গ হয় না কিন্তু রোযার বরকত নষ্ট হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

মাশায়েখগণ রোযার ছয়টি আদব লিখিয়াছেন। রোযাদার ব্যক্তির জন্য এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

১নং, দৃষ্টির হেফাজত করা। যেন কোন অপাত্রে দৃষ্টিপাত না হয়। এমনকি স্ত্রীর প্রতিও যেন কামভাবের দৃষ্টি না পড়ে। সুতরাং বেগানা মহিলার তো প্রশ্নই উঠে না। এমনিভাবে কোন খেলাধুলা ইত্যাদি নাজায়েয কাজের দিকেও যেন দৃষ্টি না যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্য হইতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উহা হইতে বাঁচিয়া চলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন ঈমানী নূর দান করিবেন যাহার মিষ্টতা ও স্বাদ সে তাহার দিলের মধ্যে অনুভব করিবে। সূফীয়ায়ে কেরাম 'অপাত্রে দৃষ্টিপাত করা' এর ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন যে, এমন যে কোন জিনিসের

প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইহার অন্তর্ভুক্ত, যাহা অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা হইতে সরাইয়া দিয়া অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট করিয়া দেয়।

২নং. জবানের হিফাজত করা। মিথ্যা, চুগলখোরী, বেহুদা কথাবার্তা, গীবত, অশ্লীল কথাবার্তা, ঝগড়া–বিবাদ ইত্যাদি সবকিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই রোযাদারের উচিত, সে যেন তাহার জবান দ্বারা কোন অশ্লীল বা মূর্খতার কথাবার্তা যেমন ঠাট্টা–বিদ্রূপ, ঝগড়া–বিবাদ ইত্যাদি না করে। যদি কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তবে বলিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার। অর্থাৎ যদি কেহ আগে বাড়িয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দেয় তবুও তাহার সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইবে না। যদি লোকটি বুদ্ধিমান হয় তবে তাহাকে বলিয়া দিবে যে, আমি রোযা রাখিয়াছি। আর যদি লোকটি বেওকুফ ও নির্বোধ হয় তবে নিজের অন্তরকে বুঝাইয়া দিবে যে, তুই রোযা রাখিয়াছিস ; তোর জন্য এই সকল বেহুদা কথাবার্তার জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া গীবত ও মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা অনেক ওলামায়ে কেরামের নিকট ইহা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দুইজন মহিলা রোযা রাখিয়াছিল। রোযা অবস্থায় তাহাদের এমন তীব্র ক্ষুধা লাগিল যে, সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রাণ নাশ হইবার উপক্রম হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করিলে তিনি তাহাদের নিকট একটি পেয়ালা পাঠাইয়া দিলেন এবং দুইজনকেই উহাতে বমি করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ে বমি করিলে দেখা গেল যে, উহার সহিত গোশতের টুকরা এবং তাজা রক্ত বাহির হইয়াছে। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহারা আল্লাহর দেওয়া হালাল রুজির দ্বারা রোযা রাখিয়াছিল বটে ; কিন্তু পরে হারাম জিনিস ভক্ষণ করিয়াছে। অর্থাৎ দুই মহিলাই মানুষের গীবতে লিপ্ত ছিল। এই হাদীসের দ্বারা আরও একটি বিষয় জানা যায় যে, গীবত করার কারণে রোযার কষ্ট খুব বেশী অনুভব হয়। যেমন এই দুই মহিলা রোযার কারণে মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য গোনাহের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। অভিজ্ঞতার দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদাভীরু মুত্তাকী লোকদের উপর রোযার কষ্টের সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না। পক্ষান্তরে ফাসেক লোকদের প্রায়ই খারাপ অবস্থা হইতে দেখা যায়।

অতএব যদি কেহ চায় যে, রোযার কষ্ট তাহার অনুভব না হউক, তবে ইহার জন্য উত্তম পন্থা হইল যে, রোযা অবস্থায় যাবতীয় গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে ; বিশেষতঃ গীবতের গোনাহ হইতে, যাহাকে লোকেরা রোযা অবস্থায় সময় কাটাইবার একটি উপায় মনে করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হাদীস শরীফেও এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যেগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহার গীবত করা হয় প্রকৃত পক্ষেই তাহার গোশত ভক্ষণ করা হয়। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুসংখ্যক লোককে দেখিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা দাঁতে খেলাল করিয়া লও। তাহারা আরজ করিল, আমরা তো আজ গোশত খাই নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের দাঁতে অমুক ব্যক্তির গোশত লাগিয়া রহিয়াছে। পরে জানা গেল যে, তাহারা ঐ ব্যক্তির গীবত করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। কেননা, এই বিষয়ে আমরা খুবই গাফেল ও উদাসীন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা ; খাছ লোকেরাই ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। যাহাদেরকে দুনিয়াদার বলা হয় তাহাদের কথা বাদ দিলেও যাহাদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের মজলিসও সাধারণতঃ গীবত হইতে খুব কমই মুক্ত থাকে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হইল, অধিকাংশ লোকই ইহাকে গীবত বলিয়াই মনে করে না। যদি নিজের অথবা কাহারো মনে একটু খট্‌কা লাগেও তখন উহাকে 'বাস্তব ঘটনা বলিতেছি' বলিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, গীবত কি জিনিস? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, গীবত হইল কাহারও পশ্চাতে এমন কথা বলা যাহা তাহার কাছে অপছন্দনীয়। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, যাহা বলা হইল যদি বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এই বিষয়টি থাকে তবে কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তবেই তো ইহা গীবত হইবে। আর যদি বিষয়টি আসলেই তাহার মধ্যে না থাকে তবে তো উহা মিথ্যা অপবাদ। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় এরশাদ ফরমাইলেন, এই দুই কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হইতেছে। একজনকে এইজন্য যে, সে মানুষের গীবত করিত। অপরজন পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সূদের সত্তরটিরও বেশী স্তর রহিয়াছে।

এইগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন ও হালকা স্তরটি নিজের মায়ের সহিত জেনা করার সমতুল্য। আর সূদের একটি দেরহাম পঁয়ত্রিশবার জেনার চেয়েও অধিক মারাত্মক। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে ঘৃণ্যতম সূদ হইল মুসলমানের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করা। হাদীস শরীফে গীবত এবং মুসলমানের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করার উপর কঠোর হইতে কঠোর ধমকি আসিয়াছে। আমার দিল চাহিতেছিল যে, এইগুলি হইতে বেশকিছু পরিমাণ রেওয়ায়াত এখানে একত্রিত করিয়া দেই। কারণ, আমাদের মজলিসগুলি এই সকল বিষয়ের দ্বারা খুব বেশী ভরপুর থাকে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়ার কারণে এখানেই শেষ করিতেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই মুসীবত হইতে রক্ষা করুন। বিশেষ করিয়া বুযুর্গ মুরুব্বী ও দোস্ত-আহবাবদের দোয়ার বদৌলতে আমি গোনাহগারকেও হেফাজত করুন। কেননা আমি বাতেনী রোগ-ব্যাধিতে খুবই আক্রান্ত রহিয়াছি।

کبر و نخوت جہل و غفلت حقد و کینہ بد ظنی — کذب و بد عہدی ریا و بغض و غیبت دشمنی

کون بیماری ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی — عافنی من کل داء واقض عنی حاجتی

ان لی قلبا سقیما انت شاف للعلیل

অর্থাৎ হে আল্লাহ! অহংকার, আত্মগরিমা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা, মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী, রিয়াকারী, জিদ মিটানো, গীবত, দুশমনী এমন কোন্ রোগ আছে, যাহা আমার মধ্যে নাই। হে আল্লাহ! আমাকে সমস্ত রোগ-ব্যাধি হইতে আরোগ্য দান করুন, আমার হাজত-জরুরত পুরা করিয়া দিন। আমার অন্তর রোগাক্রান্ত ; আপনি উহাকে সুস্থ করিয়া দিন।

৩নং. জিনিস যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া রোযাদারের জন্য জরুরী উহা হইল, কানের হেফাজত। প্রত্যেক অপ্রিয় বিষয় যাহা মুখে বলা বা জবান হইতে বাহির করা নাজায়েয উহার প্রতি কর্ণপাত করাও নাজায়েয। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই গুনাহের মধ্যে অংশীদার হয়।

৪নং. জিনিস শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করা। যেমন হাতকে নাজায়েয বস্তু ধরা হইতে, পা কে নাজায়েয বস্তুর দিকে যাওয়া হইতে বিরত রাখা। অনুরূপভাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকেও বিরত রাখা। এমনিভাবে ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাবার হইতে হেফাজত করা। যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে,

তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত, যে কোন রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করে, কিন্তু উহার সাথে সামান্য বিষও মিশাইয়া লয়, ফলে তাহার সেই রোগের জন্য ঔষধটি উপকারী হইবে কিন্তু সাথে সাথে এই বিষ তাহাকে ধ্বংসও করিয়া দিবে।

৫নং. জিনিস ইফতারের সময় হালাল মাল হইতেও এত বেশী না খাওয়া, যাহার দ্বারা পেট পুরাপুরি ভরিয়া যায়। কেননা, ইহাতে রোযার উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। রোযার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কামপ্রবৃত্তি ও পশু শক্তিকে দুর্বল করা এবং নূরানী ও ফেরেশতাসুলভ শক্তিকে বৃদ্ধি করা। এগার মাস পর্যন্ত অনেক কিছু খাওয়া হইয়াছে ; এখন যদি একমাস কিছুটা কমাইয়া দেওয়া হয়,তাহা হইলে কি জান বাহির হইয়া যাইবে? কিন্তু আমাদের অবস্থা তো এই যে, ইফতারের সময় পিছনের কাজা সহ এবং সেহরীর সময় সামনের অগ্রিম সহ এতবেশী পরিমাণে খাইয়া লই যে, রমযান ছাড়া এবং রোযা না রাখা অবস্থায়ও এত পরিমাণ খাওয়ার সুযোগ আসে না ; রমযানুল মোবারক যেন আমাদের জন্য ভোজের উৎসব হইয়া যায়।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, মানুষ যদি ইফতারের সময় অধিক ভোজন করিয়া ক্ষতির পরিমাণ পোষাইয়া নেয়, তবে রোযার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নফসের খাহেশ ও শয়তানের শক্তি দমন করা কিভাবে হাসিল হইতে পারে! আসলে আমরা শুধু খানার সময় পরিবর্তন করিয়া দেই, ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই পরিবর্তন করি না। বরং খানার বিভিন্ন পদ আরও বাড়াইয়া লই, অন্য মাসে যাহা সহজে করা হয় না। মানুষের অভ্যাস কতকটা এমন হইয়া গিয়াছে যে, ভাল ভাল বস্তু রমযানের জন্য রাখিয়া দেয়। আর নফস সারাদিন ভুকা থাকার পর যখন এইগুলি সামনে পায় তখন খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করে। ফলে কামপ্রবৃত্তি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরও উত্তেজিত হইয়া জোশে আসিয়া যায়। এইভাবে রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়া যায়। রোযার মধ্যে শরীয়ত যে সকল উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রাখিয়াছে উঁহা তখনই হাসিল হইতে পারে যখন কিছুটা ক্ষুধার্তও থাকা হইবে। বড় উপকার তো উহাই যাহা উপরে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কামভাব ও পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করা। আর ইহাও কিছু সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকার উপরই নির্ভর করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। তোমরা ক্ষুধার দ্বারা উহার চলাচল বন্ধ করিয়া দাও। নফস ক্ষুধার্ত থাকিলেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৃপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে নফস যখন

পরিতৃপ্ত হয় তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভুকা থাকে। রোযার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল গরীব দুঃখীদের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং তাহাদের অবস্থা অনুভব করা। এই উদ্দেশ্য তখনই হাসিল হইতে পারে যখন সেহরীর সময় দুধ জিলাপী দিয়া পেট এত বেশী না ভরে যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধাই না লাগে। গরীব-দুঃখীদের সহিত মিল ও সামঞ্জস্য তখনই হইবে যখন কিছু সময় ভুকা থাকিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাও ভোগ করিবে। এক ব্যক্তি বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি শীতে কাঁপিতেছেন। অথচ তাঁহার নিকট তখন শীতের কাপড় ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি কাপড় খুলিয়া রাখার সময়? তিনি বলিলেন, বহু গরীব মানুষ রহিয়াছে, তাহাদেরকে সাহায্য করিবার মত শক্তি আমার নাই। অন্তত এইটুকু সহানুভূতি তো প্রকাশ করিতে পারি যে, আমি তাহাদের মত একজন হইয়া যাই।

সূফী মাশায়েখগণ ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। ফকীহগণও এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 'মারাকিল ফালাহ' কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সেহরীতে এত বেশী খাইবে না যেমন ভোগবিলাসীরা খাইয়া থাকে। কেননা ইহা রোযার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, এইখানে রোযার উদ্দেশ্য বলিতে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, যেন কিছুটা ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব হয় যাহাতে উহা অধিক সওয়াব লাভের কারণ হয় এবং গরীব-দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কোন পেট পূর্ণ করা আল্লাহর নিকট এত অপছন্দনীয় নয়, যত অপছন্দনীয় উদর পূর্ণ করা। এক জায়গায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষের জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট যাহা তাহার কোমর সোজা রাখিতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি খাইতেই চায় তবে তাহার জন্য ইহার চেয়ে বেশী যেন না হয় যে, পেটের তিনভাগের একভাগ খানার জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ পানির জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ খালি রাখিবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখিতেন মাঝে কোন কিছুই আহার করিতেন না ; ইহার কোন তাৎপর্য তো অবশ্যই থাকিবে।

আমি আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)কে দেখিয়াছি যে, পুরা রমযান মুবারকে তাহার ইফতার ও সেহরী এই দুই ওয়াক্তের খাওয়ার পরিমাণ আনুমানিক দেড়খানা চাপাতি রুটির

বেশী হইত না। কোন খাদেম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, ক্ষুধা হয় না ; বন্ধুবান্ধবদের খাতিরে তাহাদের সহিত বসিয়া যাই। আর ইহার চাইতেও বড় ব্যাপার হইল হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরী (রহঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি যে, একাধারে তাঁহার কয়েকদিন এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, ইফতার ও সেহরীর জন্য সারারাত্রে খাবারের পরিমাণ দুধবিহীন কয়েক কাপ চা ব্যতীত আর কিছুই হইত না। একবার হযরতের নিষ্ঠাবান খাদেম হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব (রহঃ) বিনয়ের সহিত আরজ করিলেন, হযরত! আপনি তো কিছুই আহার করিতেছেন না, এইভাবে তো আপনি খুবই দুর্বল হইয়া যাইবেন। হযরত বলিলেন—'আল–হামদুলিল্লাহ, জান্নাতের স্বাদ হাসিল হইতেছে।' আল্লাহতায়ালা যদি আমাদের ন্যায় গোনাহগারদিগকেও এই সকল বুযুর্গদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন তবে তাহাও অনেক সৌভাগ্যের কথা। শেখ সাদী (রহঃ) বলেন—

ندارند تن پروراں آگہی　　　کہ پُر معدہ باشد ز حکمت تہی

অর্থ ঃ পেটপূজারীরা জানে না যে, ভরা পেট হেকমত ও প্রজ্ঞা হইতে খালি হইয়া থাকে।

৬নং যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা একজন রোযাদারের জন্য জরুরী তাহা এই যে, রোযা রাখার পর এই ভয়ে ভীত হওয়া যে, নাজানি এই রোযা কবূল হইতেছে কিনা। অনুরূপভাবে প্রত্যেক এবাদত শেষ করার পর এই ধারণা পোষণ করা চাই যে, যে সকল ভুলত্রুটির প্রতি সাধারণতঃ নজর যায় না নাজানি সেইরকম কিছু ঘটিয়া যাওয়ার কারণে এই এবাদত আমার মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয় কিনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'কুরআন তেলাওয়াতকারী অনেকেই এমন আছে যাহাদের উপর কুরআন লানত করিতে থাকে।' তিনি আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের ফয়সালা হইবে তাহাদের মধ্যে একজন শহীদও থাকিবে। তাহাকে ডাকা হইবে এবং দুনিয়াতে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল সেইগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে আর সে ঐ সমস্ত নেয়ামত স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত নেয়ামতের সে কি হক আদায় করিয়াছে। সে আরজ করিবে তোমার রাস্তায় জিহাদ করিয়াছি ; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, বরং জিহাদ এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে

তোমাকে বাহাদুর বলিবে। আর তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর হুকুম হইবে ফলে তাহাকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অনুরূপভাবে একজন আলেমকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও ঠিক একইভাবে আল্লাহ তায়ালার সকল নেয়ামত স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সকল নেয়ামত লাভের বদলায় সে কি আমল করিয়াছে। সে আরজ করিবে, এলেম শিখিয়াছি এবং মানুষকে শিখাইয়াছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। বরং তুমি উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বড় আলেম বলিবে। সুতরাং দুনিয়াতে উহা বলা হইয়াছে। তাহার ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। এমনিভাবে একজন ধনবানকে ডাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের দ্বারা সে কি আমল করিয়াছে। সে বলিবে, নেক কাজের কোন রাস্তা আমি ছাড়ি নাই যেখানে মাল খরচ করি নাই। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এবং তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহার ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। এই সবকিছুই হইল এখলাস না থাকার পরিণতি।

এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। এইজন্য রোযাদার ব্যক্তির উচিত, নিজের নিয়তের হেফাজত করিবার সাথে সাথে কবুলিয়তের ব্যাপারে ভয়ও করিতে থাকিবে এবং দোয়াও করিতে থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার রোযাকে আপন সন্তুষ্টির কারণ বানাইয়া লন। কিন্তু সাথে সাথে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখিবে যে, নিজের আমলকে কবুল হওয়ার যোগ্য মনে না করা ভিন্ন জিনিস আবার দয়াময় মনিবের মেহেরবানীর উপর দৃষ্টি রাখা একটি ভিন্ন বিষয়। তাহার মেহেরবানী ও করুণার রীতি–নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ; তিনি কখনও গোনাহের উপরও সওয়াব দিয়া দেন, সেইক্ষেত্রে আমল্লের ত্রুটি–বিচ্যুতির কথা না বলিলেও চলে।

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست   بسیار شیوہ ہاست بتاں را کہ نام نیست

অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গী ও লাস্যময় চালচলনই কেবল তাহার সৌন্দর্য মাধুরী নহে, বরং প্রিয়ার আরো কত যে নাম না জানা মনমাতানো ভাবভঙ্গী রহিয়াছে !

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সাধারণ নেককারদের জন্য জরুরী। আর খাছ লোক ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গদের জন্য এইগুলির সাথে আরও একটি সপ্তম বিষয়কে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল, অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে দিবে না। এমনকি রোযা রাখা অবস্থায় এই খেয়ালও করিবে না যে, ইফতারের জন্য কোন কিছু আছে কিনা। কারণ, ইহাও দোষণীয় বলা হইয়াছে।

কোন কোন মাশায়েখ লিখিয়াছেন যে, রোযা অবস্থায় সন্ধ্যায় ইফতারের জন্য কোন জিনিস হাসিলের ইচ্ছা করাও দোষণীয়। কেননা ইহাতেও আল্লাহর রিযিক দেওয়ার ওয়াদার উপর ভরসা কম আছে বলিয়া বুঝা যায়। 'শরহে এহইয়া' গ্রন্থে কোন কোন মাশায়েখের ঘটনা লিখা হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট ইফতারের ওয়াক্তের পূর্বে কোথাও হইতে কিছু আসিয়া যাইত তবে তাহা অপর কাহাকেও এইজন্য দিয়া দিতেন যে, হয়ত অন্তর উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাওয়াক্কুলের মধ্যে কোন প্রকারের কমি হইয়া যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা হইল বড় মরতবার লোকদের জন্য। আমাদের মত লোকদের জন্য এইরূপ উঁচু বিষয়ের লোভ করাও অবান্তর। এই মর্তবায় পৌঁছিবার আগে এমন পন্থা অবলম্বন করার অর্থ হইল নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা।

মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন যে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে' আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম দ্বারা মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই রোযা ফরয করা হইয়াছে। সুতরাং জিহবার রোযা হইল মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কানের রোযা হইল যাবতীয় নাজায়েয কথা শ্রবণ করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। চোখের রোযা হইল সকল প্রকার নাজায়েয ও অহেতুক জিনিসের প্রতি নজর করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যও রোযা আছে। যেমন নফসের রোযা হইল, লোভ-লালসা ও জৈবিক চাহিদা হইতে বাঁচিয়া থাকা। দিলের রোযা হইল দুনিয়ার মহবত হইতে দিলকে খালি রাখা। আত্মার রোযা হইল আখেরাতের স্বাদ ও সুখ-শান্তির কামনা হইতেও বাঁচিয়া থাকা। আর সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাছ রোযা হইল গায়রুল্লার অস্তিত্বের কল্পনা হইতেও বাঁচিয়া থাকা।

(১০) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص (قصداً) بلا کسی شرعی عذر کے ایک

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کرے غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

(رواہ احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجۃ والدارمی والبخاری فی ترجمۃ باب کذا فی المشکوٰۃ قلت وبسط الکلام علی طرقہ العینی فی شرح البخاری)

(১০) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতীত রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করিবে, সে রমযানের বাহিরে সারাজীবন রোযা রাখিলেও উহার বদলা হইবে না।

ফায়দা ঃ কোন কোন আলেম যাহাদের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীও রহিয়াছেন, এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের অভিমত হইল, যে ব্যক্তি বিনা কারণে রমযান মুবারকের কোন রোযা হারাইল আদায় করিল না, উহার কাযা কিছুতেই হইতে পারে না যদিও সে সারাজীবন রোযা রাখিতে থাকে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদি কেহ রমযানের রোযা না রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে এক রোযার পরিবর্তে এক রোযার দ্বারাই কাযা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি রোযা রাখার পর ভাঙ্গিয়া থাকে তবে একটি রোযার পরিবর্তে কাফ্‌ফারা হিসাবে একাধারে দুইমাস রোযা রাখিলে তাহার ফরয জিম্মা হইতে আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য রমযান মুবারকের বরকত ও ফযীলত লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। আর উপরোক্ত হাদীসের অর্থ ইহাই যে, রমযান শরীফে রোযা রাখিলে যে বরকত হইত, উহা সে আর কখনও হাসিল করিতে পারিবে না। এই অবস্থা তো শুধু তাহাদের জন্য যাহারা রোযা ভঙ্গ করার পর কাযা করিয়া নেয়। আর যাহারা আদৌ রোযা রাখেই না—যেমন বর্তমান যমানায় অনেক ফাসেকের অবস্থা এইরূপ রহিয়াছে ; ইহাদের গোমরাহীর কথা কী আর বলিবার আছে?

রোযা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর। সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ও রেসালাতকে স্বীকার করা। অতঃপর ইসলামের অন্যান্য চারটি প্রসিদ্ধ রুকন হইল নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। বহু

মুসলমান এমন আছে যাহারা আদমশুমারীতে মুসলমান হিসাবে গণ্য হইলেও ইসলামের এই পাঁচটি মূল ভিত্তির একটিও তাহাদের মধ্যে নাই। সরকারী কাগজপত্রে তাহাদেরকে মুসলমান লিখা হইলেও আল্লাহর তালিকায় তাহারা মুসলমানরূপে গণ্য হইতে পারে না। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলামের ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর—কালেমায়ে শাহাদত, নামায ও রোযা। যে ব্যক্তি এই তিনটি ভিত্তির মধ্যে একটিও ছাড়িয়া দিবে, সে কাফের। তাহাকে হত্যা করা হালাল ও বৈধ। ওলামায়ে কেরাম যদিও এই ধরনের রেওয়ায়াতের সাথে ফরযকে অস্বীকার করার শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন কিংবা অন্য কোন ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু ইহা বাস্তব যে, এই সমস্ত লোকের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হইতে কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কাজেই আল্লাহ তায়ালার ফরয আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা ও ত্রুটিকারীদের উচিত, তাহারা যেন আল্লাহর আজাব ও গজবকে খুব বেশী ভয় করে। কারণ, মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। দুনিয়ার সুখ-শান্তি,ভোগ-বিলাস তো অতি সত্বর খতম হইয়া যাইবে ; একমাত্র আল্লাহর এতায়াত ও আনুগত্যই কাজে আসিবে। অনেক জাহেল লোক আছে তাহারা রোযা না রাখার উপরই ক্ষান্ত থাকে ; কিন্তু অনেক বদদ্বীন এইরূপ রহিয়াছে যে, যাহারা মুখেও এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহা তাহাদেরকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। যেমন বলিয়া থাকে যে, রোযা তো তাহারাই রাখিবে যাহাদের ঘরে খাবার নাই। অথবা এইরূপ বলে যে, আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া আল্লাহর কী লাভ? ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথাবার্তা বলা হইতে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এবং গভীর মনোযোগ সহকারে একটি মাসআলা বুঝিয়া লওয়া চাই যে, দ্বীনের ছোট হইতে ছোট যে কোন বিষয় নিয়া উপহাস ও ঠাট্টা করা কুফরের কারণ হইয়া যায়। যদি কেহ সারা জীবন নামায না পড়ে, কখনও রোযা না রাখে, এমনকি অন্য কোন ফরযও আদায় না করে, কিন্তু এইগুলিকে অস্বীকার না করে, তবে সে কাফের হইবে না ; বরং ফরয আমল আদায় না করার জন্য তাহার গোনাহ হইবে। আর যে ফরযগুলি আদায় করিয়াছে সেইগুলির সওয়াব ও পুরস্কার পাইবে। কিন্তু দ্বীনের কোন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা কুফর। ফলে তাহার সমগ্র জীবনের অন্যান্য নামায রোযা ও নেক আমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখিবার বিষয়। অতএব রোযার ব্যাপারেও যেন এরূপ কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির

না হয় এবং উপহাস ও বিদ্রূপ করা না হয়। এতদসত্ত্বেও কোন কারণ ব্যতীত রোযা ভঙ্গকারী ফাসেক হইবে। ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত রমযান মাসে প্রকাশ্যভাবে খাওয়া দাওয়া করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে। ইসলামী হুকূমত ও আমীরুল মুমেনীন না থাকার কারণে যদিও কতলের বিধান নাই কিন্তু তাহার এই নাপাক কর্মকাণ্ডের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা সকলেরই দায়িত্ব। কেননা, অন্তরে ঘৃণাপোষণ করার নীচে ঈমানের আর কোন স্তর নাই। আল্লাহ তায়ালা তাহার নেক বান্দাদের তোফায়েলে আমাকেও নেক আমল করার তওফীক দান করুন। কারণ, আমিও অধিক ভুলত্রুটিকারীদের মধ্যে শামিল রহিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এই দশটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। কেননা যাহারা মানিয়া চলে তাহাদের জন্য একটি হাদীসই যথেষ্ট ; সেইক্ষেত্রে এখানে পরিপূর্ণ দশটি হাদীস আলোচনা করা হইল। আর যাহারা মানিয়া চলে না তাহাদের জন্য যতই লেখা হইবে সবই বেকার। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে আমল করার তওফীক দান করুন ; আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরের বয়ান

রমযান মাসের রাত্রগুলির মধ্য হইতে একটি রাত্রকে শবে কদর বলা হয়। যাহা খুবই বরকত ও কল্যাণের রাত্র। কালামে পাকের মধ্যে উহাকে হাজার মাস হইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। হাজার মাসে তিরাশি বৎসর চার মাস হয়। অত্যন্ত ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাহার এই রাত্রে এবাদত করার তওফীক হইয়া যায়। কারণ, যে ব্যক্তি এই রাত্রটি এবাদতের মধ্যে কাটাইয়া দিল সে যেন তিরাশি বছর চার মাসের বেশী সময় এবাদতে কাটাইয়া দিল। আর এই বেশীরও পরিমাণ আমাদের জানা নাই যে, ইহা হাজার মাসের চাইতেও কত মাস বেশী উত্তম। যাহারা এই মোবারক রাত্রের কদর বুঝিয়াছে তাহাদের জন্য বাস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি বড় মেহেরবানী যে, তিনি দয়া করিয়া এমন একটি অপরিসীম নেয়ামত দান করিয়াছেন। 'দুররে মানসূর' কিতাবে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা শবে কদর আমার উম্মতকেই দান করিয়াছেন ; পূর্ববর্তী উম্মতগণ উহা পায় নাই। কি কারণে এই নেয়ামত দেওয়া হইয়াছে এই ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোন

কোন হাদীসে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ দুনিয়াতে দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতেন আর সেই তুলনায় এই উম্মতের হায়াত খুবই কম, এমতাবস্থায় কেহ যদি তাহাদের সমান নেক আমল করিতেও চায় তথাপি উহা সম্ভব নয়। বিষয়টি চিন্তা করিয়া আল্লাহর পেয়ারা নবীর খুবই কষ্ট হইল। বস্তুতঃ এই ক্ষতিপূরণের জন্যই এই রাত্রি দান করা হইয়াছে। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি দশটি শবে কদরও পাইয়া যায় আর সে এইগুলিকে এবাদত–বন্দেগীতে কাটাইয়া দেয় তবে সে যেন আটশত তেত্রিশ বছর চার মাসেরও অধিক সময় পুরাপুরিভাবে এবাদতে কাটাইয়া দিল। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি একহাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরামের মনে ঈর্ষা হইল। অতঃপর তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রটি দান করিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের চারজন নবী—হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত যাকারিয়্যা (আঃ), হযরত হিযকীল (আঃ) ও হযরত ইউশা (আঃ)এর আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আশি বৎসর করিয়া এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং চোখের এক পলক পরিমাণ সময়ও আল্লাহর নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) সূরায়ে কদর লইয়া হুযূরের খেদমতে হাজির হইলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এইসব রেওয়ায়াতে বিভিন্নতার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে, একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিবার পর যখন কোন আয়াত নাযিল হয় তখন প্রত্যেক ঘটনাকেই উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বলা যাইতে পারে। এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ যাহাই হউক না কেন, এই রাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে উম্মতে মুহম্মদীর প্রতি এক বিরাট দান ও বিরাট রহমত। আর এই রাত্রে এবাদত–বন্দেগীর সুযোগও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার তওফীকেই হইয়া থাকে।

تہیدستانِ قسمت را چہ سُود از راہبر کامل
کہ خضر از آبِ حیواں تشنہ می آرد سکندر را

অর্থাৎ, কিসমত যাহাদের শূন্য, তাহাদের জন্য যোগ্য পথপ্রদর্শক

থাকিলেই বা কি হইবে, যেমন খিজির (আঃ) সেকান্দর বাদশাকে আবে হায়াতের নিকট হইতে পিপাসার্ত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

কত সৌভাগ্যবান ঐ সকল মাশায়েখ যাহারা এই কথা বলিতে পারেন যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে আমার কখনও শবে কদরের এবাদত ছুটে নাই। তবে এই মুবারক রাত্র ঠিক কোন্‌টি? এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দীর্ঘ মত-পার্থক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি অভিমত আছে। সবগুলির আলোচনা করা খুবই কঠিন। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ অভিমতগুলির আলোচনা সামনে আসিতেছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই রাত্রির বিভিন্ন রকমের ফযীলত সম্বলিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। উহারও কিছু কিছু এখানে পেশ করা হইবে। কিন্তু এই রাত্রির ফযীলত যেহেতু স্বয়ং কুরআনে পাকে উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে একটি পৃথক সূরাও নাযিল হইয়াছে, কাজেই প্রথমে এই সূরার তফসীর লিখিয়া দেওয়া উত্তম মনে হইতেছে। আয়াতের অর্থ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর 'তফসীরে বয়ানুল কুরআন' হইতে এবং ফায়দাসমূহ অন্যান্য কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি এই কুরআনকে কদরের রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি। (সূরা কদর, আয়াত ঃ ১)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কুরআনে পাক লওহে মাহফূজ হইতে এই রাত্রিতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই একটি মাত্র বিষয়ই এই রাত্রির ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, কুরআনের ন্যায় এমন মহামর্যাদাশীল জিনিসও এই রাত্রিতে নাযিল হইয়াছে। তদুপরি ইহার সহিত আরও বহু বরকত ও ফযীলতও শামিল রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রির প্রতি শওক ও আগ্রহ আরও বাড়াইবার জন্য এরশাদ করিতেছেন—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

আপনি কি জানেন শবে কদর কত বড় জিনিস? (সূরা কদর, আয়াতঃ ২)

অর্থাৎ, এই রাত্রের মহত্ত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আপনার কি জানা আছে যে, ইহার মধ্যে কত গুণ-গরিমা ও কি পরিমাণ ফাযায়েল রহিয়াছে! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই কয়েকটি ফাযায়েল উল্লেখ করেন।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

শবে কদর হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৩)

অর্থাৎ হাজার মাস এবাদত করিলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে এক শবে কদরে এবাদত করিলে উহার চাইতেও বেশী সওয়াব হাসিল হইবে। আর এই বেশী যে কত বেশী তাহা কাহারও জানা নাই।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ

'এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন।' (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৪)

আল্লামা রাযী (রহঃ) লিখেন যে, ফেরেশতারা সৃষ্টির শুরুতে যখন তোমাকে দেখিয়াছিল, তখন তোমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিল যে, আপনি এমন এক জিনিস সৃষ্টি করিতছেন যাহারা দুনিয়াতে ফেৎনা–ফাসাদ ও রক্তপাত করিবে। অতঃপর যখন পিতামাতা বীর্যের আকারে প্রথম দেখিয়াছিল তখন তোমাকে ঘৃণা করিয়াছিল, এমনকি যদি তাহা কাপড়ে লাগিয়া যাইত তবে ধুইয়া ফেলিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন এই বীর্য–ফোটাকে উত্তম আকৃতি দান করিলেন তখন পিতামাতাও তাহাকে স্নেহ ও পেয়ার করিতে লাগিল। তদ্রূপ, আজ যখন তুমি আল্লাহর তওফীকে পুণ্যময় শবে কদরে আল্লাহর মারেফাত ও এবাদত–বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়াছ তখন ফেরেশতারাও তাহাদের পূর্বেকার মন্তব্যের ওজর পেশ করিতে দুনিয়াতে অবতরণ করে।

وَالرُّوحُ فِيهَا

'এবং এই রাত্রিতে রূহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও অবতরণ করেন।' (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৪)

রূহ শব্দের অর্থ কি? এই সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত উহাই যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ রূহ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা রাযী (রহঃ) এই অভিমতকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই ফেরেশতাদেরকে উল্লেখ করিবার পর খাছভাবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেক বড় একজন ফেরেশতা, যাহার নিকট সমস্ত আসমান যমীন একটি লোকমার সমান। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রূহ দ্বারা ফেরেশতাদের একটি খাছ জামাতকে বুঝানো হইয়াছে যাহাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণও শুধু শবে কদরেই দেখিয়া থাকেন। চতুর্থ অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কোন খাছ মখলুককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা খানাপিনা করেন ; কিন্তু

ফেরেশতাও নহেন মানুষও নহেন। পঞ্চম অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। তিনি উম্মতে মুহম্মদীর এবাদত বন্দেগী দেখিবার জন্য ফেরেশতাদের সহিত অবতরণ করেন। ষষ্ঠ অভিমত হইল, রূহ্ আল্লাহ তায়ালার একটি খাছ রহমত। অর্থাৎ, এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন এবং তাহাদের পর আল্লাহ তায়ালার খাছ রহমত নাযিল হয়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

'সুনানে বায়হাকী' কিতাবে হযরত আনাস (রাযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের একটি দলের সহিত অবতরণ করেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে যিকির বা অন্যান্য এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল দেখিতে পান, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন।

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদিগারের হুকুমে প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর বিষয় লইয়া জমিনের দিকে অবতরণ করেন। (সূরা কদর ঃ ৪)

'মাযাহিরে হক' কিতাবে আছে, এই কদরের রাত্রেই ফেরেশতাদের জন্ম হইয়াছে এবং এই রাত্রেই হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি উপাদানসমূহ জমা হইতে শুরু হইয়াছে। এই রাত্রেই জান্নাতে গাছ লাগানো হইয়াছে। আর এই রাত্রে অত্যধিক পরিমাণে দোয়া ইত্যাদি কবুল হওয়া তো অনেক রেওয়ায়াতেই আসিয়াছে। 'দুররে মানসূরে'র এক রেওয়ায়াতে আছে, এই রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠান হইয়াছে এবং এই রাত্রেই বনী ইসরাঈল গোত্রের তওবা কবূল হইয়াছে।

سَلَٰمٌ

'এই রাত্রটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সালাম ও শান্তি।'

অর্থাৎ সারা রাত্র ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে মুমিনদের উপর সালাম বর্ষিত হইতে থাকে। কারণ, রাত্রভর ফেরেশতাদের এক জামাআত আসিতে থাকে এবং অপর জামাত যাইতে থাকে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে এইভাবে ফেরেশতাদের একের পর এক জামাআত আসা–যাওয়ার কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, এই রাত্রটি পরিপূর্ণরূপে শান্তিময় ; যে কোন ফেৎনা–ফাসাদ ইত্যাদি হইতে নিরাপদ।

هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

'এই রাত্র (উল্লেখিত বরকতসমূহ সহ) সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকে।'

(সূরা কদর, আয়াত ঃ ৫)

এমন নয় যে, এই বরকত রাত্রের কোন বিশেষ অংশে থাকে আর অন্যান্য অংশে থাকে না, বরং সমানভাবে সকাল পর্যন্তই এই বরকতসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। এই পবিত্র সূরার আলোচনার পর যাহাতে স্বয়ং আল্লাহ পাক এই রাত্রের কয়েক প্রকার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা এরশাদ করিয়াছেন আর হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু হাদীস শরীফেও এই রাত্রের বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ঐ সমস্ত হাদীস হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হইতেছে।

(١) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. (كذا في الترغيب عن البخاري ومسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کیلئے) کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের নিয়তে এবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

ফায়দা ঃ দাঁড়াইবার অর্থ হইল, সে নামায পড়ে। অনুরূপভাবে অন্যান্য এবাদত যেমন তেলাওয়াত যিকির ইত্যাদি এবাদতে মশগুল হওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। সওয়াবের নিয়ত ও আশা রাখিবার অর্থ হইল, রিয়া অর্থাৎ মানুষকে দেখান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না দাঁড়ায়। বরং এখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করা ও সওয়াব হাসিল করার নিয়তে দাঁড়াইবে। খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, বুঝিয়া শুনিয়া সওয়াবের একীন করিয়া মনের আনন্দ ও শওকের সহিত দাঁড়াইবে। বোঝা মনে করিয়া মনের অনিচ্ছায় নয়। আর ইহা তো স্পষ্ট কথা যে, সওয়াবের একীন যত বেশী হইবে এবাদতে কষ্ট সহ্য করা ততই সহজ হইবে। এই কারণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে যত বেশী তরক্কী করিতে থাকে এবাদত-বন্দেগীতে তাহার মগ্নতা ততই বাড়িয়া যায়।

এখানে এই কথাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, উপরোল্লিখিত হাদীস বা অন্যান্য যেসব হাদীসে গোনাহ মাফের কথা বলা হইয়াছে, ওলামায়ে কেরামের মতে উহার দ্বারা সগীরা গোনাহকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা কুরআন পাকে যেখানে কবীরা গোনাহের কথা আসিয়াছে সেখানেই إِلَّا مَنْ تَابَ অর্থাৎ, 'তবে যাহারা তওবা করে' এই বাক্যসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হইল, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। সুতরাং হাদীস শরীফে যেখানেই গোনাহ মাফের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামায়ে কেরাম সেই গোনাহগুলিকে সগীরা গোনাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমার আব্বাজান (রহঃ) বলিতেন, হাদীস শরীফে গোনাহ দ্বারা সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও সগীরা গোনাহের কথা দুই কারণে উল্লেখ করা হয় না। প্রথমতঃ মুসলমানের এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না যে, তাহার উপর কবীরা গোনাহের কোন বোঝা থাকিতে পারে। কেননা, তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হইয়া গেলে তওবা না করা পর্যন্ত সে স্থির হইতেই পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ যখন শবে কদরের মত এবাদতের বিশেষ কোন সুযোগ আসে মুসলমান সওয়াবের নিয়তে এবাদত-বন্দেগী করে তখন প্রকৃত মুসলমান নিজের বদআমলসমূহের জন্য অবশ্যই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এইভাবে আপনা আপনিই তাহার তওবা হইয়া যায়। কেননা বিগত গোনাহসমুহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার পাকা এরাদা ও দৃঢ় অঙ্গীকার করার নামই হইল তওবা। সুতরাং যদি কাহারও দ্বারা কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে জরুরী হইল, শবে কদর বা দোয়া কবূলের অন্য কোন সময়ে নিজের গোনাহসমূহের জন্য মনে প্রাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আন্তরিক ও মৌখিকভাবে তওবা করিয়া নেওয়া। যাহাতে আল্লাহ তায়ালার পুরাপুরি রহমত তাহার উপর বর্ষিত হয় এবং সগীরা ও কবীরা সকল প্রকার গোনাহ মাফ হইয়া যায়। যদি স্মরণ আসিয়া যায় তবে অধম গোনাহগারকেও আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ায় শরীক করিবেন।

(٢) عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص

مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوْمٌ (رواه ابن ماجة واسناده حسن انشاء الله كذا فى الترغيب وفى المشكوة عنه الاكل محروم)

اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقۃً محروم ہی ہے

(২) হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের নিকট একটি মাস আসিয়াছে। উহাতে একটি রাত্র আছে যাহা হাজার মাস হইতেও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্র হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল সে যেন সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল। আর এই রাত্রির কল্যাণ হইতে কেবল ঐ ব্যক্তিই মাহরূম থাকে যে প্রকৃতপক্ষেই মাহরূম।

(তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এত বড় নেয়ামত নিজের হাতে ছাড়িয়া দেয় প্রকৃতপক্ষেই তাহার মাহরূম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। একজন রেল–কর্মচারী যদি কয়েকটি কড়ির জন্য সারারাত্র জাগিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে আশি বৎসরের এবাদতের জন্য একমাস রাত্র জাগিয়া থাকিলে অসুবিধার কি আছে? আসল কথা হইল দিলের মধ্যে সেই জ্বালা ও তাড়নাই নাই। তবে কোনক্রমে একটু স্বাদ পাইয়া গেলে এক রাত্র কেন শত শত রাত্রও জাগিয়া থাকা যায়।

اُلفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

‘মহব্বতের জগতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও ভঙ্গ করা উভয় সমান। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই মজা পাওয়া যায় যদি অন্তরে মজা থাকে।’

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ ও উচ্চ মর্যাদার ওয়াদা ছিল, যেগুলির প্রতি তাঁহার পুরাপুরি একীন থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এত লম্বা নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা মুবারক ফুলিয়া যাইত, নিশ্চয়ই ইহার কোন কারণ ছিল। আমরা তাঁহারই মহব্বতের দাবীদার হইয়া কি করিতেছি? তবে হাঁ, যাহারা এইসব বিষয়ের কদর করিয়াছেন তাঁহারা সবকিছুই করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরা নমুনা হইয়া উম্মতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। কাহারও এই কথা বলার আর সুযোগ থাকে নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় এবাদত করার সাহস কে করিতে পারে আর কাহার দ্বারাই বা সম্ভব? আসলে মনে ধরার ব্যাপার, ইচ্ছা থাকিলে পাহাড় খুঁড়িয়াও দুধের নহর বাহির করা

মুশকিল নয়। কিন্তু এই জিনিস হাসিল হওয়া কাহারও জুতা সিধা করা ব্যতীত (অর্থাৎ কোন আল্লাহওয়ালার হাতে নিজেকে সোপর্দ করা ব্যতীত) খুবই মুশকিল।

تمنا دردِ دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

'অন্তরে দরদ হাসিল করিতে হইলে ফকীর–দরবেশ আল্লাহওয়ালাদের খেদমত কর, কেননা এই মহামূল্য মণিমুক্তা রাজা–বাদশার ভাণ্ডারেও পাইবে না।'

হযরত ওমর (রাযিঃ) কি কারণে এশার নামাযের পর বাড়িতে গিয়া সকাল পর্যন্ত নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) দিনভর রোযা রাখিতেন এবং সারারাত্র নামাযে কাটাইয়া দিতেন ; শুধু রাত্রের প্রথম অংশে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন। রাত্রে এক এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। 'শরহে এহইয়া' কিতাবে আবূ তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চল্লিশজন তাবেয়ী সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত আছে, যে, তাঁহারা এশার নামাযের ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়িতেন। হযরত শাদ্দাদ (রহঃ) রাত্রে শুইতেন আর এপাশ ওপাশ করিতে করিতে সকাল করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ! আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) রমযান মাসে শুধু মাগরিব ও এশার মাঝখানে সামান্য সময় ঘুমাইতেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন। হযরত সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহঃ) সারা রাত্র নামায পড়িতেন আর সকালে এই দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত চাহিবার যোগ্য তো নই। শুধু এতটুকু দরখাস্ত করিতেছি যে, আমাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া দিন। হযরত কাতাদা (রহঃ) পুরা রমযান মাসে প্রতি তিন রাত্রে কুরআন শরীফ এক খতম করিতেন। আর শেষ দশ দিন প্রতি রাত্রে এক খতম করিতেন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন, ইহা এত প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, ইহাকে অস্বীকার করিলে ইতিহাসের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি এই শক্তি কিভাবে অর্জন করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নামসমূহের তোফায়েলে এক বিশেষ তরিকায় দোয়া করিয়াছিলাম। ইমাম আবূ হানীফা

(রহঃ) শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন ; তিনি বলিতেন, হাদীস শরীফে 'কায়লুলা' করার কথা এরশাদ হইয়াছে। বস্তুতঃ দুপুরে শোয়ার মধ্যেও সুন্নতের অনুসরণের নিয়ত থাকিত। কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় তিনি এত কাঁদিতেন যে, প্রতিবেশীদেরও দয়া আসিয়া যাইত। একবার بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ الخ এই আয়াত পড়িতে পড়িতে সারারাত্র কাঁদিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) রমযান মাসে রাত্রেও ঘুমাইতেন না এবং দিনেও ঘুমাইতেন না। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) পুরা রমযান মাসে দিবা-রাত্রির নামাযে ষাটবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। এইগুলি ছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীনের আরও শত শত ঘটনা রহিয়াছে। তাহারা আল্লাহর বাণী 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি' ইহার অর্থকে সত্যে পরিণত করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা এবাদত করিতে চায় তাহাদের জন্য এইরূপ এবাদত করা কোন মুশকিল নয়। এই হইল আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ঘটনাবলী। তবে এবাদতকারী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ববর্তীদের মত মুজাহাদা না হউক ; কিন্তু নিজেদের যমানা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নমুনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার অনুসরণকারীদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহাদের জন্য আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা কোনটাই তাহাদের এবাদতের মগ্নতায় বাধা হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'হে আদম সন্তান ! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতায় ভরিয়া দিব, তোমার অভাব-অনটন দূর করিয়া দিব। নতুবা তোমার অন্তরকে বিভিন্ন ব্যস্ততার দ্বারা ভরপুর করিয়া দিব এবং তোমার অভাব-অনটনও দূর হইবে না।' প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাবলী এই সত্য বাণীর সাক্ষ্য দিতেছে।

(٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیلؑ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اُس شخص کیلئے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے (اور عبادت میں مشغول ہے) دعائے رحمت

يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ
بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهٗ فَقَالَ
يَا مَلٰئِكَتِيْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى
عَمَلَهٗ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى
اَجْرَهٗ عہ قَالَ مَلٰئِكَتِيْ عَبِيْدِيْ
وَاِمَائِيْ قَضَوْا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ
وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ
وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ
اِرْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ
سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ
مَغْفُوْرًا لَّهُمْ. (رواه البيهقى فى شعب
الايمان كذا فى المشكوٰة)

عہ بالنصب وقیل بالرفع کذا فی المرقات ۱۲

کرتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے
تو حق تعالیٰ جل شانہٗ اپنے فرشتوں کے سامنے
بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں (اسلیئے
کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا) اور اُن
سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو اس
مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کردے
کیا بدلہ ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے
رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اُس کی اُجرت
پوری دیدی جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو!
میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے
فریضہ کو پورا کردیا پھر دعا کے ساتھ چلاّتے
ہوئے (عیدگاہ کی طرف) نکلے ہیں میری
عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری
بخشش کی قسم میرے عُلوِّ شان کی قسم میرے
بلندیٔ مرتبہ کی قسم میں ان لوگوں کی دُعا ضرور

قبول کروں گا پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمھارے گناہ معاف کردیئے ہیں اور تمھاری بُرائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের একটি জামাতের সহিত অবতরণ করেন। যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আল্লাহর যিকির করিতে থাকে বা এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের দিন হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে বান্দাদের এবাদত–বন্দেগী লইয়া গর্ব করেন। কেননা, ফেরেশতারা মানুষকে দোষারোপ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন—হে ফেরেশতারা! যে মজদুর

নিজ দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করিয়া দেয় তাহার বদলা কি হইতে পারে? ফেরেশতারা আরজ করেন, হে আমাদের রব্ব! তাহার বদলা এই যে, তাহাকে পুরা পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে ফেরেশতারা! আমার বান্দা ও বান্দীগণ আমার দেওয়া ফরয হুকুমকে পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছে, এখন উচ্চস্বরে দোয়া করিতে করিতে ঈদগাহের দিকে যাইতেছে। আমার ইয্যতের কসম, আমার প্রতাপের কসম, আমার বখশিশের কসম, আমার সুমহান শানের কসম, আমার সুউচ্চ মর্যাদার কসম, আমি তাহাদের দোয়া অবশ্যই কবূল করিব। তারপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, যাও আমি তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের গোনাহগুলিকে নেকীর দ্বারা বদলাইয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা ঈদগাহ হইতে নিষ্পাপ হইয়া ফিরিয়া আসে। (মিশকাত ঃ বাইহাকী ঃ শুআব)

ফায়দা ঃ ফেরেশতাদের সহিত হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর আগমন স্বয়ং কুরআনে পাকেও উল্লেখিত হইয়াছে, যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। বহু হাদীসেও ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিতাবের সর্বশেষ হাদীসেও এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদেরকে তাগাদা করিয়া প্রত্যেক এবাদতকারী লোকের ঘরে ঘরে যাইতে এবং তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিতে বলেন।

'গালিয়াতুল মাওয়ায়েজ' কিতাবে হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর 'গুনিয়া' কিতাব হইতে নকল করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর হাদীসে আছে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর এই তাগাদা দেওয়ার পর ফেরেশতাগণ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং যে কোন ঘর বা ছোট বড়, ময়দান এমনকি পানির উপরে নৌকায় আল্লাহর কোন মুমিন বান্দা থাকেন ফেরেশতারা তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিতে যান। কিন্তু যেসব ঘরে কুকুর, শূকর, জীবজন্তুর ফটো লটকানো থাকে এবং হারাম কাজে গোসল ফরয হইয়াছে এমন লোক থাকে সেইসব ঘরে প্রবেশ করেন না। মুসলমানদের বহু ঘর এমন রহিয়াছে, যেখানে শুধু সৌন্দর্যের জন্য তাহারা প্রাণীর ফটো টানাইয়া রাখে এবং আল্লাহর এত বড় রহমত ও নেয়ামত হইতে নিজ হাতেই নিজেদের বঞ্চিত রাখে। ছবি হয়ত দুই একজনেই টানাইয়া থাকে কিন্তু ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণে সে নিজের সহিত, ঘরের সকলকেও রহমত ও নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখে।

(۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (مشكوٰة عن البخاري)

حضرت عائشہ رض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা রমযান মুবারকের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস ২৯ দিনে হউক বা ৩০ দিনে হউক শেষ দশ দিন একুশতম রাত্র হইতে শুরু হয়। এই হিসাবে উল্লেখিত হাদীস মুতাবিক শবে কদর ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের রাত্রগুলিতে তালাশ করা উচিত। যদি মাস ২৯ দিনেই হয় তবুও এই দিনগুলিকেই শেষ দশদিন বলা হইবে। কিন্তু আল্লামা ইবনে হায্‌ম (রহঃ) বলেন, 'আশারা' শব্দের অর্থ হইল দশ। সুতরাং রমযানের চাঁদ যদি ত্রিশা হয় তবে তো একুশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত দিনগুলিকে শেষ দশ দিন বলা হইবে। কিন্তু চাঁদ যদি ঊনত্রিশা হয় তবে শেষ দশ দিন বিশতম রাত্রি হইতে শুরু হইবে। এই হিসাবে বেজোড় রাত্রি হইবে ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের তালাশে রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। আর এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, উহা একুশতম রাত্রি হইতে শুরু হইত। এইজন্য অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে একুশতম রাত্র হইতে বেজোড় রাত্রগুলিতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ও অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। অবশ্য অন্যান্য রাত্রগুলিতেও শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই উভয় উক্তি অনুযায়ী শবে কদরের তালাশ তখনই সম্ভব হইবে যখন ২০তম রাত্র হইতে ঈদের রাত্র পর্যন্ত প্রতিটি রাত্র জাগিয়া থাকিয়া শবে কদরের ফিকিরে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি শবে কদরের সওয়াবের আশা রাখে তাহার জন্য মাত্র দশ এগারটি রাত্র জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

عُرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال   صد سال میتواں بہ تمنا گریستن

অর্থ ঃ হে উরফী ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি বন্ধুর মিলন লাভ হয় তবে এই

আশায় শত বৎসরও কাঁদিয়া কাটানো যায়।

(٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى
رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ
خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ
فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَّفُلَانٌ فَرُفِعَتْ
وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ
فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ
وَالْخَامِسَةِ (مشكوة عن البخاري)

حضرت عُبادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ
ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں مگر دو
مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرتؐ نے
ارشاد فرمایا کہ میں اسلئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر
کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا
ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین
اٹھالی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے
علم میں بہتر ہو لہٰذا اب اس رات کو نویں
اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

(৫) হযরত উবাদা (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ জানাইবার জন্য বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। এই সময় দুইজন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, আমি তোমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল বিধায় নির্দিষ্ট তারিখ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। হয়ত এই উঠাইয়া লওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—সর্বপ্রথম যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, ঝগড়া কত বড় অনিষ্টকর যে, ইহার জন্যই শবে কদরের তারিখ চিরদিনের জন্য উঠাইয়া লওয়া হইল। শুধু ইহাই নয় বরং ঝগড়া–বিবাদ সর্বদাই বরকত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদি হইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন— অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পরস্পর সদ্ব্যবহার সবচাইতে উত্তম জিনিস। আত্মকলহ ও ঝগড়া–বিবাদ

দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া দেয় অর্থাৎ ক্ষুর দ্বারা যেমন মাথার চুল সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হইয়া যায়, তেমনিভাবে পারস্পর ঝগড়া–বিবাদের দ্বারা দ্বীনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় হইল, দ্বীন সম্পর্কে বেখবর অর্থাৎ দুনিয়াদার লোকদের কথা বাদই দিলাম বহু লম্বা লম্বা তসবীহ পাঠকারী, দ্বীনদারীর দাবীদার লোকেরাও সর্বদা পরস্পর কলহ–বিবাদে লিপ্ত থাকে। তাই প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন অতঃপর নিজের সেই দ্বীনদারীর বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার অহংকারে (এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে) ঝগড়া মিটাইবার জন্য নত হওয়ার তওফীক হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে রোযার আদবের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের ইয্যত নষ্ট করাকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সুদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন তুমুল ঝগড়া–বিবাদে লিপ্ত যে, না কোন মুসলমানের ইয্যত–সম্মানের খাতির করি, না আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর কোন পরওয়া করি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا الاٰية অর্থাৎ তোমরা পরস্পর কলহ–বিবাদ করিও না। অন্যথা হিম্মতহারা হইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৪৬) যাহারা সবসময় অপরের ইযযত নষ্ট করার চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহাদের একটু নিরবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, ইহার দ্বারা তাহারা স্বয়ং নিজেদের মান–সম্মানের উপর কত বড় আঘাত হানিতেছে। উপরন্তু নিজেদের এই নাপাক ও নিকৃষ্ট কর্মের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে কত অপদস্থ হইতেছে ; ইহা ছাড়া দুনিয়ার যিল্লতি তো আছেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে আর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে সোজা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দাদের আমল পেশ করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বারা (নেক আমলসমূহের বদৌলতে) মুশরিক ব্যতীত অন্যদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থাকে তাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হয় যে, তাহাদের পরস্পর সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখ। অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয়। এই সময় তওবাকারীদের তওবা ও

এস্তেগফারকারীদের এস্তেগফার কবূল করা হয়। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া-কলহকারীদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক হাদীসে আছে, শবে বরাতে আল্লাহ তায়ালার রহমত ব্যাপকভাবে সকলের দিকে রুজু হয় এবং সামান্য সামান্য বাহানায় ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না—এক. কাফের, দুই. যে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের নামায কবূল হওয়ার জন্য তাহাদের মাথার আধা হাত উপরেও উঠে না। তন্মধ্যে তাহাদের পরস্পর কলহ-বিবাদকারীদের কথাও বলিয়াছেন।

এখানে এই বিষয়ের সমস্ত হাদীস একত্র করার অবকাশ নাই। তবে কিছু হাদীস এইজন্য উল্লেখ করা হইল যে, বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো বটেই বরং যাহারা খাছ লোক, যাহাদেরকে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলা হয় এবং দ্বীনদার মনে করা হয় তাহাদের মজলিস, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিও এই হীনকর্ম দ্বারা ভরপুর থাকে। আল্লাহর দরবারেই অভিযোগ করি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখানে আরও একটি কথা জানা দরকার যে, এইসব ঝগড়া-বিবাদ ও দুশমনী তখনই নিন্দিত হইবে যখন উহা দুনিয়ার জন্য হইবে। আর যদি কাহারও গোনাহের কারণে কিংবা কোন দ্বীনী কাজের খাতিরে কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে উহা জায়েয আছে। একবার হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তাঁহার ছেলে এমন একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ হাদীসের উপর আপত্তি মনে হইতেছিল। এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) মৃত্যু পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর জীবনে এই ধরনের আরও বহু ঘটনা পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন-দেখেন, তিনি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, কে দ্বীনের খাতিরে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে আর কে নিজের অহংকার ও বড়াই প্রকাশের জন্য করিয়াছে। নতুবা প্রত্যেকেই দ্বীনের খাতিরে দুশমনী করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারে।

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গিয়াছে তাহা হইল, হেকমতে এলাহীর সামনে পুরাপুরিভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার যে কোন হুকুমকে গ্রহণ করিয়া লওয়া ও উহার প্রতি

আত্মসমর্পণ করা চাই। কেননা শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি উঠিয়া যাওয়া বাহ্যত একটি বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়া মনে হইলেও যেহেতু উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘটিয়াছে, কাজেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, হয়ত ইহাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বদাই মেহেরবান ও অনুগ্রহশীল। কোন পাপের কারণে বান্দা যদি মুসীবতে পড়িয়া যায় অতঃপর সে আল্লাহর দিকে সামান্যও রুজু হয় ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, তবে মহান আল্লাহর দয়া তাহাকে ঘিরিয়া লয় এবং সেই মুসীবতকেও তাহার জন্য বড় কল্যাণের কারণ বানাইয়া দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন কিছুই মুশকিল নয়।

অতএব, শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার মধ্যেও বেশ কিছু হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন।

এক. শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে অনেক দুর্বল মনের লোক এমন হইত যাহারা অন্যান্য রাত্রের এবাদত একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিত। বর্তমান অবস্থায় আজই শবে কদর হইতে পারে এই সম্ভাবনায় অনুসন্ধানকারীদের জন্য বিভিন্ন রাত্রে এবাদত করার তওফীক নসীব হইয়া যায়।

দুই. অনেক মানুষ এমন আছে যাহারা গোনাহ না করিয়া থাকিতেই পারে না। শবে কদর নির্দিষ্ট হইলে ঐ নির্দিষ্ট রাত্র জানা থাকার পরও যদি গোনাহের দুঃসাহস করিত তবে তাহারা নিশ্চিত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনার পর দেখিলেন যে, জনৈক সাহাবী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি তাহাকে জাগাইয়া দাও যেন সে ওযূ করিয়া নেয়। হযরত আলী (রাযিঃ) লোকটিকে জাগাইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নেক কাজে তো আপনি খুবই দ্রুত আগাইয়া যান কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি নিজে তাহাকে জাগাইলেন না কেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি জাগাইতে গেলে (ঘুমের ঘোরে) হয়ত সে অস্বীকার করিয়া বসিত। আর আমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে তোমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করিলেন না যে, এই মহান মর্যাদাবান রাত্রটির

কথা জানার পর কোন বান্দা উহাতে গোনাহের দুঃসাহস করুক।

তিন. শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে কাহারও এই রাত্রটি ছুটিয়া যাইত, তবে মনোকষ্টের দরুন তাহার জন্য আর কোন রাত্র জাগরণই নসীব হইত না। এখন তো অন্তত রমযানের দুই একটি রাত্র জাগা সকলের ভাগ্যে জুটিয়াই যায়।

চার. যতগুলি রাত্র শবে কদরের তালাশে জাগিয়া থাকিবে প্রত্যেকটির জন্যই পৃথক পৃথক সওয়াব লাভ করিবে।

পাঁচ. পূর্বে এক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রমযানের এবাদতের উপর আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া থাকেন। শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় গর্ব করার সুযোগ বেশী হয়। কেননা, তারিখ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বান্দা রাত্রের পর রাত্র জাগিয়া এবাদতে মশগুল হইয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইত যে, এই রাত্রই শবে কদর, তবে কি তাহারা এত রাত্র জাগ্রত থাকিয়া এবাদত করিতে চেষ্টা করিত?

এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য কল্যাণও থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এই সব কারণে আল্লাহ্ তায়ালার বিধান এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তিনি গোপন করিয়া রাখেন। যেমন ইস্‌মে আজমকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে জুমার দিনে দোয়া কবূল হওয়ার খাছ ওয়াক্তকেও গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অনুরূপভাবে আরও বহু বিষয়ই তিনি গোপন রাখিয়া দিয়াছেন। অবশ্য এখানে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ঝগড়ার কারণে শুধুমাত্র সেই রমযানেই শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর উল্লেখিত অন্যান্য হেকমত ও কল্যাণের কারণে চিরদিনের জন্যই অনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি এই পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে তাহা এই যে, শবে কদর নবম, সপ্তম ও পঞ্চম এই তিনটি রাত্রে তালাশ করিতে বলা হইয়াছে। অন্যান্য রেওয়ায়াত মিলাইলে এইটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, এই তিনটি রাত্রই শেষ দশকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারপরও আরও কয়েকটি সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, শেষ দশ দিনকে যদি শুরু হইতে গণনা করা হয় তবে হাদীসের অর্থ ২৯, ২৭ ও ২৫তম রাত্রি হয়। আর যদি শেষ দিক হইতে গণনা করা হয় যেমন হাদীসের কোন কোন শব্দের দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় এবং চাঁদ ঊনত্রিশা হয় তবে ২১, ২৩ ও ২৫তম রাত্রি হইবে। পক্ষান্তরে চাঁদ ত্রিশা হইলে তিন রাত্রি ২২, ২৪ ও

২৬তম রাত্রি হইবে।

ইহা ছাড়াও শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের রেওয়ায়াত রহিয়াছে। আর এই কারণেই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের প্রায় ৫০টির মত উক্তি রহিয়াছে। অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে রেওয়ায়াতের মধ্যে এত বেশী পার্থক্যের কারণ এই যে, এই রাত্রটি কোনো বিশেষ তারিখের সহিত নির্দিষ্ট নয়। বরং বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন রাত্রে হইয়া থাকে। এ কারণেই রেওয়ায়াতও বিভিন্ন রকম আসিয়াছে। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বৎসর ঐ বৎসরেরই বিভিন্ন রাত্রে তালাশ করার হুকুম করিয়াছেন। আবার কোন কোন বৎসর নির্দিষ্ট করিয়াও বলিয়াছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শবে কদরের আলোচনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ কোন্ তারিখ? আরজ করা হইল, আজ ২২ তারিখ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রেই তালাশ কর। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, শবে কদর কি শুধু নবীর যমানাতেই হইয়া থাকে, নাকি তাঁহার পরেও হয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, উহা রমযানের কোন অংশে হয়? তিনি বলিলেন, প্রথম ও শেষ দশকে উহা তালাশ কর। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য প্রসঙ্গে কথা বলিতে শুরু করিলেন। পরে আমি সুযোগ বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতটুকু তো বলিয়া দিন যে শবে কদর দশকের কোন্ অংশে হয়। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি এত বেশী নারাজ হইলেন যে, ইহার পূর্বে বা পরে তিনি আমার প্রতি আর কখনও এত নারাজ হন নাই। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যদি ইহা মর্জী হইত তবে জানাইয়া দিতেন। শেষের সাত রাত্রিতে উহা তালাশ কর। অতঃপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

জনৈক সাহাবীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩তম রাত্রির কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একরাত্রে আমি ঘুমাইতে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে কেউ বলিল যে, উঠ! আজ শবে কদর। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম হইতে উঠিয়া হযরত নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিতেছিলেন। আর এই রাত্রটি ছিল ২৩তম রাত্রি। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ২৪তম রাত্রির কথাও জানা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বৎসর রাত্রি জাগরণ করিবে, সে শবে কদর পাইবে। অর্থাৎ শবে কদর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেহ ইবনে কা'ব (রাযিঃ)কে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর এই কথা নকল করিয়া শুনাইলে তিনি বলিলেন যে, ইহার দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন একরাত্রির উপর ভরসা করিয়া বসিয়া না থাকে। অতঃপর তিনি কসম খাইয়া বলিলেন যে, কদর রমযানের ২৭তম রাত্রিতে হইয়া থাকে। এমনিভাবে অনেক সাহাবী (রাযিঃ) ও তাবেঈর মতে ২৭তম রাত্রিতেই কদর হয়। ইহাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর অভিমত হইল, যে ব্যক্তি সারা বৎসর জাগিয়া থাকিবে সেই উহা পাইতে পারে। 'দুর্‌রে মানসূর' কিতাবের এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরূপই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন। ইমামগণের মধ্যে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ মত হইল যে, উহা সারা বৎসরই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর দ্বিতীয় অভিমত হইল উহা পুরা রমযানে ঘুরিতে থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মত হইল, উহা রমযান মাসের কোন এক রাত্রে আসে—যাহা নির্দিষ্ট ; কিন্তু আমাদের জানা নেই। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণের জোরদার মত হইল, উহা ২১তম রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর অভিমত হইল উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে আসে। একেক বৎসর একেক তারিখে হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ২৭তম রাত্রিতেই উহার বেশী আশা করা যায়। শায়খুল আরেফীন মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ঐসব লোকের অভিমতই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয় যাহারা বলেন যে, উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেননা, আমি শাবান মাসে উহা দুইবার দেখিয়াছি। একবার ১৫ তারিখে আরেক বার ১৯ তারিখে। আর দুইবার রমযান মাসের মধ্য দশকের ১৩ ও ১৮ তারিখে দেখিয়াছি। এছাড়া রমযান মাসের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রগুলিতেও দেখিয়াছি। তাই আমার একীন হইল যে, উহা বৎসরের সকল রাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া থাকে। তবে

রমযান মাসেই বেশী আসে। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) বলেন, "শবে কদর বৎসরে দুইবার হয়। একটি হইল ঐ রাত্র, যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম–আহকাম নাযিল হয়। আর এই রাত্রেই কুরআন শরীফ লওহে মাহফূজ হইতে নাযিল হইয়াছে। এই রাত্রটি রমযানের সহিত খাছ নয় বরং সারাবৎসরই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। তবে যে বৎসর পবিত্র কুরআন নাযিল হইয়াছে, সেই বৎসর উহা রমযানুল মুবারকেই ছিল। আর উহা অধিকাংশ সময় রমযানুল মুবারকেই হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় শবে কদর হইল ঐ রাত্র, যাহাতে রূহানী জগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমিনে নাযিল হয়। শয়তান দূরে থাকে। দোয়া ও এবাদতসমূহ কবূল হয়। ইহা প্রত্যেক রমযানে হইয়া থাকে এবং অদল বদল হইয়া রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতেই হয়।" আমার আব্বাজান (রহঃ) এই মতটিকেই প্রাধান্য দিতেন।

মোটকথা, শবে কদর একটি হউক বা দুইটি হউক ; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের হিম্মত, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সারা বৎসর উহার তালাশে চেষ্টা করা উচিত। এতখানি সম্ভব না হইলে অন্তত পুরা রমযান মাস অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি ইহাও মুশকিল হয় তবে শেষ দশ দিনকে তো গনীমত মনে করাই চাই। আর যদি এতটুকুও না হয় তবে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিকে তো কোনভাবেই হাতছাড়া করিবে না। খোদা না করুন যদি ইহাও না হয় তবে একেবারে কমপক্ষে ২৭তম রাত্রটিকে তো অবশ্য গনীমত মনে করিতেই হইবে। যদি আল্লাহর রহমত শামিল থাকে এবং কোন খোশ–নসীব বান্দার ভাগ্যে উহা জুটিয়া যায় তাহা হইলে তো সমস্ত দুনিয়ার নেয়ামত ও আরাম আয়েশ উহার মুকাবিলায় কিছুই নয়। আর যদি শবে কদর নাও পায় তবুও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সারা বৎসরই মাগরিব ও এশার নামায মসজিদে জামাতের সহিত আদায় করার এহতেমাম করা খুবই জরুরী। যদি ভাগ্যক্রমে শবে কদরের রাত্রে এই দুই ওয়াক্ত নামায জামাতের সহিত আদায় করা নসীব হইয়া যায়, তবে কত অসংখ্য নামায জামাতে আদায় করার সওয়াব পাইয়া যাইবে। আল্লাহর কত বড় মেহেরবানী যে, যদি কোন দ্বীনী কাজের জন্য চেষ্টা করা হয় তবে উহাতে কামিয়াব না হইলেও আমলকারী ব্যক্তি চেষ্টার সওয়াব অবশ্যই পাইয়া যায়। কিন্তু এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কতজন হিম্মতওয়ালা মানুষ এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহারা দ্বীনের জন্য লাগিয়াই থাকেন ; দ্বীনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

ও মেহনত করেন। অথচ ইহার বিপরীতে দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে চেষ্টা–তদবীরের পর উদ্দেশ্য হাসিল না হইলে সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রম বেকার হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কত মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ হাসিলের জন্য বেফায়দা লক্ষ্যের পিছনে জান ও মাল দুইটিই বরবাদ করিয়া চলিয়াছে।

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بکجا

অর্থাৎ, দেখ, পথের ব্যবধান কতদূর—কোথা হইতে কোথা পর্যন্ত!

(٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهٗ
سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ
فِیْ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاِنَّهَا
فِیْ لَيْلَةِ وِتْرٍ فِیْ اِحْدٰی وَعِشْرِيْنَ
اَوْ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ
اَوْ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ
اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ مَنْ
قَامَهَا اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمِنْ اَمَارَاتِهَا
اَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ
سَاجِيَةٌ لَا حَارَّةٌ وَّلَا بَارِدَةٌ كَاَنَّ
فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا وَّلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ
اَنْ يُّرْمٰی بِهٖ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ
وَمِنْ اَمَارَاتِهَا اَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ
صَبِيْحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَةً
كَاَنَّهَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَحَرَّمَ
اللّٰهُ عَلَى الشَّيْطَانِ اَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا
يَوْمَئِذٍ ۔ (در منثور عن احمد و
البیهقی و محمد بن نصر وغیرهم)

حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے شبِ قدر کے بارے
میں دریافت کیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ
رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں
ہے ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ یا رمضان کی
آخر رات میں، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب
کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے
اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو
جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں
کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار
ہوتی ہے، صاف شفاف نہ زیادہ گرم
نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ مُعتدل گویا کہ اس
میں (انوار کی کثرت کی وجہ سے) چاند کھلا
ہوا ہے اس رات میں صبح تک آسمان
کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے
نیز اُس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس
کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے
طُلوع ہوتا ہے ایسا بالکل ہموار ٹکیہ کی
طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند
اللہ جلّ شانہٗ نے اس دن کے آفتاب

کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ
طلوعِ آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔

(৬) উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরশাদ ফরমান যে, উহা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখে বা রমযানের শেষ রাত্রে হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ় একীনের সহিত সওয়াবের আশায় এই রাত্রে এবাদতে মশগুল হয়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। এই রাত্রের অন্যান্য আলামতের মধ্যে একটি হইল, এই রাত্রটি নির্মল ঝলমলে হইবে, নিঝুম, নিথর—না অধিক গরম, না অধিক ঠাণ্ডা ; বরং মধ্যম ধরনের হইবে। (নূরের আধিক্যের কারণে) চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রের ন্যায় মনে হইবে। এই রাত্রে সকাল পর্যন্ত শয়তানের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। উহার আরো একটি আলামত এই যে, পরদিন সকালে সূর্য কিরণবিহীন একেবারে গোলাকার পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদিত হয়। আল্লাহ পাক সেইদিনের সূর্যোদয়ের সময় উহার সহিত শয়তানের আত্মপ্রকাশকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (পক্ষান্তরে অন্যান্য দিন সূর্যোদয়ের সময় সেখানে শয়তান আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।) (দুররে মানসূর ঃ আহমদ, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের প্রথম বিষয়বস্তু তো পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহেও আসিয়াছে। হাদীসের শেষ অংশে শবে কদরের কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যেগুলির অর্থ ও মতলব অত্যন্ত পরিস্কার। কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আরও কিছু আলামত বিভিন্ন রেওয়ায়াত এবং ঐ সকল লোকদের বর্ণনায় আসিয়াছে, যাহাদের এই পুণ্যময় রজনীর অফুরন্ত দৌলত নসীব হইয়াছে। বিশেষতঃ এই রাত্রের পর 'ভোরবেলায় সূর্য কিরণবিহীন উদিত হয়' এই কথাটি হাদীসের বহু রেওয়ায়াতে আসিয়াছে এবং এই আলামতটি সর্বদাই পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য আলামত পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। আবদাহ ইবনে আবী লুবাবা (রাযিঃ) বলেন, আমি রমযানের ২৭তম রাত্রিতে সমুদ্রের পানি মুখে দিয়া দেখিয়াছি। উহা সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। আইয়ুব ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হয়, আমি সমুদ্রের পানিতে গোসল করি। এই সময় পানি সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। ইহা রমযানের ২৩তম রাত্রির ঘটনা।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, শবে কদরে প্রতিটি বস্তু সিজদা করে।

এমনকি বৃক্ষসমূহ যমীনের উপর সিজদায় পড়িয়া যায়। আবার নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াইয়া যায়। তবে এই সকল বিষয় অন্তর্চক্ষুর সহিত সম্পর্ক রাখে, যে কোন মানুষ অনুভব করিতে পারে না।

(৭) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِي اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (رواه احمد وابن ماجة والترمذى وصححه كذا فى المشكوة)

حضرت عائشہ رضہ نے حضورؐ سے پوچھا کہ یارسول اللہ اگر مجھے شبِ قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں حضورؐ نے اَللّٰھُمَّ سے اخیر تک دعا بتلائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ تو بیشک مُعاف کرنیوالا ہے اور پسند کرتا ہے مُعاف کرنے کو، پس مُعاف فرمادے مجھ سے بھی۔

(৭) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি যদি শবে কদর পাইয়া যাই, তবে কি দোয়া করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন—এই দোয়া করিও—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

(মিশকাত ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

ফায়দা ঃ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ দোয়া! আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আখেরাতের জবাবদেহিতা হইতে মুক্তি দিয়া দিলে উহার চাইতে বড় নেয়ামত আর কী হইতে পারে!

من نگویم کہ طاعتم بپذیر   قلم عفو بر گناھم کش

অর্থাৎ, আমি এই কথা বলি না যে, আমার এবাদত কবূল কর ; আমার সবিনয় আরজ এই যে, হে আল্লাহ! আমার সমুদয় গোনাহ-খাতা মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দাও।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, এই রাত্রে দোয়ায় মশগুল থাকা অন্য যে কোন এবাদতের চাইতে উত্তম। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, শুধু দোয়া নয় বরং বিভিন্ন প্রকারের এবাদত করাই উত্তম। যেমন নামায, তেলাওয়াত, দোয়া, মুরাকাবা ইত্যাদি। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সবগুলি এবাদতই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কারণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে নামায, যিকির ইত্যাদি কয়েকটি এবাদতেরই বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের বর্ণনা

এতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলে। হানাফীগণের নিকট এতেকাফ তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার—ওয়াজিব এতেকাফ, যাহা কোন কাজের উপর মান্নত করার কারণে ওয়াজিব হয়। যেমন কেহ বলিল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হইয়া যায়, তবে আমি এতদিন এতেকাফ করিব। অথবা কোন কাজের শর্ত ব্যতীত এমনিতেই এইরূপ মান্নত করিল যে, আমি আমার উপর এতদিনের এতেকাফ জরুরী করিয়া নিলাম। অর্থাৎ আমি অবশ্যই এতদিন এতেকাফ করিব—এইভাবে বলিলেও এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যতদিনের নিয়ত করিবে ততদিনের এতেকাফ করা জরুরী হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার—সুন্নত এতেকাফ, যাহা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনগুলিতে এতেকাফ করিতেন।

তৃতীয় প্রকার—নফল এতেকাফ, ইহার জন্য কোন সময় বা দিনকাল নির্দিষ্ট নাই। যতক্ষণ বা যতদিন ইচ্ছা করা যাইবে এমনকি কেহ সারাজীবন এতেকাফের নিয়ত করিলেও জায়েয হইবে। তবে কম সময়ের জন্য এতেকাফের নিয়তের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর মতে একদিনের কম এতেকাফ জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে সামান্য সময়ের জন্যও এতেকাফ করা জায়েয আছে। আর এই মতের উপরই ফতওয়া। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিত হইল, যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিবে। তাহা হইলে যতক্ষণ সে নামায ইত্যাদি অন্যান্য এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ সে এতেকাফেরও সওয়াব পাইয়া যাইবে।

আমি আমার আব্বাজান (রহঃ)কে সর্বদা এই এহ্তেমাম করিতে দেখিয়াছি যে, তিনি যখন মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন তখন ডান পা মসজিদে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিতেন।

খাদেমগণকে তালীম দেওয়ার জন্য কখনও কখনও আওয়াজ করিয়াও নিয়ত করিতেন।

এতেকাফের সওয়াব অনেক বেশী। এতেকাফের ফযীলত ইহার চাইতে বেশী আর কী হইবে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ইহার এহ্‌তেমাম করিতেন। এতেকাফকারীর দৃষ্টান্ত হইল ঐ ব্যক্তির মত যে কাহারও দরজায় গিয়া পড়িয়া রহিল আর বলিতে থাকিল যে, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান হইতে যাইব না।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے　　یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

অর্থ ঃ তোমার পদতলে আমার জীবন শেষ হউক—ইহাই আমার হৃদয়ের আকুতি, ইহাই আমার পরম প্রাপ্তি।

প্রকৃতপক্ষেই যদি কাহারও অবস্থা এ–ই হয় তবে চরম নিষ্ঠুর হৃদয়ও না গলিয়া পারে না। আর অসীম দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তো দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। বরং কোন বাহানা ছাড়াই দান করিয়া থাকেন।

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے　　در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

অর্থ ঃ হে দয়াময়! তুমি তো এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার রহমতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال　　کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

অর্থ ঃ আল্লাহর দানের অবস্থা হযরত মূসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আগুন আনিতে যাইয়া পয়গাম্বরী পাইয়া গেলেন।

অতএব, কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার যাবতীয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া মহান আল্লাহর দরবারে আছড়াইয়া পড়িবে তখন তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যাপারে কি কোন দ্বিধা থাকিতে পারে! আল্লাহ্ তায়ালা যখন কাহাকেও দিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার ভরপুর খাযানার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কাহার আছে? ইহা হইতে বেশী বলিতে আমি অক্ষম যে, নাবালেগ কি কখনও বালেগ হওয়ার স্বাদ বর্ণনা করিতে পারে? তবে হাঁ, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়া নিবে যেমন কবি বলেন—

جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں　　یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے

অর্থ ঃ যে ফুলকে হৃদয় দিয়াছি, যে ফুলের জন্য আমি কুরবান, সেই ফুল হয়ত হাতে আসিবে ; নতুবা জীবন পাখী পিঞ্জর ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইবে।

ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেন, এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং উহার প্রাণ হইল, অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার পাক যাতের সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করিয়া নেওয়া যে, পার্থিব সকল মোহ ছিন্ন হইয়া আল্লাহ পাকের সহিত মিলিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত ধ্যান-খেয়ালের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ পাকের ধ্যান-খেয়ালে নিমগ্ন হইয়া যায়। গায়রুল্লার সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া এমনভাবে আল্লাহর অনন্ত সান্নিধ্যে ডুবিয়া যাইবে যে, সকল চিন্তা-চেতনা ও কল্পনায় একমাত্র তাঁহারই পাক যিকির এবং তাঁহারই মহব্বত প্রবিষ্ট হইয়া যায়। মাখলুকের ভালবাসা বিদূরিত হইয়া শুধু আল্লাহর সুনির্মল ভালবাসাই হৃদয়-মনে সৃষ্টি হইয়া যাইবে। এই ভালবাসাই নির্জন কবরের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কাজে আসিবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ তায়ালার পাক যাত ব্যতীত একান্ত বন্ধু ও সান্ত্বনা দানকারী আর কেহ থাকিবে না। পূর্ব হইতেই যদি তাহার সহিত মনের সম্পর্ক কায়েম হইয়া থাকে তবে সেখানে কি আনন্দ-উপভোগেই না সময় কাটিবে।

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن — بیٹھا رہوں تصوّرِ جاناں کئے ہوئے

অর্থ ঃ আমার মন সেই সুবর্ণ সুযোগ খুঁজিতেছে, যাহাতে রাত্রদিন প্রেমাস্পদের ধ্যানে বসিয়া থাকি।

'মারাকিল ফালাহ'এর গ্রন্থকার বলেন, এতেকাফ যদি এখলাসের সহিত হয় তবে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। উহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনাতীত। কারণ, ইহাতে সংসার জগতের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন করা হয়। স্বীয় নফসকে মাওলা পাকের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়া মনিবের দুয়ারে পড়িয়া থাকা হয়।

پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں — سر زیرِ بارِ منّتِ درباں کئے ہوئے

অর্থ ঃ আবার মন চায়, দারোয়ানের দয়ার বোঝা মাথায় লইয়া কাহারো দুয়ারে পড়িয়া থাকি।

তদুপরি উহাতে সবসময় এবাদতে মগ্ন থাকা হয়। কেননা, এতেকাফকারীকে ঘুমন্ত জাগ্রত সর্বাবস্থায় এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয় ; এইভাবে সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যমান থাকে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।'

ইহা ছাড়াও এতেকাফে আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা হয় এবং দয়ালু মেজবান সর্বদা নিজ মেহমানের সম্মান করিয়াই থাকেন। সর্বোপরি, এতেকাফকারী আল্লাহর দূর্গে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে যেখানে শত্রু প্রবেশ করিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের আরও অসংখ্য ফাযায়েল ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য এতেকাফের সর্বোত্তম স্থান হইল মক্কার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, তারপর মদীনার মসজিদে নববী, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। অতঃপর জামে মসজিদ, অতঃপর স্থানীয় মহল্লার মসজিদ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর মতে এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে মসজিদ হওয়াই যথেষ্ট। জামাআত না হইলেও এতেকাফের ক্ষতি হইবে না। মহিলাগণ নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে এতেকাফ করিবেন। যদি ঘরে নামাযের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান না থাকে তবে এতেকাফের জন্য কোন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবেন। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এতেকাফ অধিকতর সহজ। কেননা, তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মেয়ে বা অন্য কাহারও দ্বারা সংসারের কাজকর্মও করাইতে পারেন, আবার অনায়াসে এতেকাফের সওয়াবও হাসিল করিতে পারেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহিলাগণ এই সুন্নত হইতে প্রায় বঞ্চিতই থাকিয়া যান।

(১) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِىْ
قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ اَطْلَعَ رَأْسَهٗ
فَقَالَ اِنِّىْ اَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ
اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اَعْتَكِفُ
الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ
لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ
اِعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ
الْاَوَاخِرَ فَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ

ابوسعید خدری رضؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے
پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے
عشرہ میں بھی پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف
فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا
کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر
کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا پھر
اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا،
پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتہ)
نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے لہٰذا
جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں

ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ
فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا
فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ
الْتَمِسُوْا فِي كُلِّ وِتْرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ
السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ
عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ
عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلٰى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَ
الطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ
(مشكوة عن المتفق عليه باختلاف
اللّفظ)

وہ اخیر عشرہ کا بھی اِعتکاف کریں مجھے
یہ رات دکھلادی گئی تھی پھر بھلادی گئی (اس
کی علامت یہ ہے) کہ میں نے اپنے آپ کو
اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ
کرتے دیکھا۔ لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ
کی طاق راتوں میں تلاش کرو راوی کہتے
ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی، اور مسجد
چھپّر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں
سے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی پیشانی
مبارک پر کیچڑ کا اثر اکیس ۲۱ کی صبح کو دیکھا۔

হাদীস-১ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানুল মুবারকের প্রথম দশকে এতেকাফ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এতেকাফ করিলেন। অতঃপর তুর্কি তাঁবু (যাহাতে তিনি এতেকাফ করিতেছিলেন) হইতে মাথা মুবারক বাহির করিয়া এরশাদ করিলেন, আমি প্রথম দশকে শবে কদরের তালাশেই এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এই একই উদ্দেশ্যে এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমাকে একজন (ফেরেশতা) বলিল যে, উহা শেষ দশকে। সুতরাং যাহারা আমার সহিত এতেকাফ করিতেছে, তাহারা যেন শেষ দশকেও এতেকাফ করে। এই রাত্রটি আমাকে দেখানো হইয়াছিল। পরে আবার ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে উহার আলামত এই যে, আমি আমাকে এই রাত্র শেষে সকালবেলা কাদা মাটিতে সেজদা করিতে দেখিয়াছি। কাজেই তোমরা উহাকে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে তালাশ কর। বর্ণনাকারী বলেন, সেই রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। মসজিদ ছাপড়া হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ভিতরে টপকাইয়া পড়িয়াছিল। আমি একুশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মুবারকে স্বচক্ষে কাদামাটির চিহ্ন দেখিয়াছি।

(মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। এই বৎসর পুরা রমযান মাস এতেকাফ

করিয়াছেন এবং ওফাতের বছর বিশ দিন এতেকাফ করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ রমযানের শেষ দশকেই এতেকাফ করিতেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইল, শেষ দশ দিন এতেকাফ করাই সুন্নতে মুআক্কাদা। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, এই এতেকাফের বড় উদ্দেশ্য হইল শবে কদর তালাশ করা। বস্তুতঃ শবে কদর পাওয়ার জন্য এতেকাফ খুবই উপযোগী আমল। কারণ, এতেকাফ অবস্থায় বান্দা যদি ঘুমাইয়াও থাকে তবুও তাহাকে এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয়।

ইহা ছাড়াও এতেকাফ অবস্থায় যেহেতু চলাফেরা ও কাজকর্ম বলিতে কিছু থাকে না সুতরাং এই সময় দয়াময় মাওলার স্মরণ ও এবাদত-বন্দেগী ব্যতীত আর কোন চিন্তা বা কাজও থাকিবে না, তাই শবে কদর তালাশকারীদের জন্য এতেকাফের চাইতে উত্তম কোন সুযোগ ও পন্থা নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা রমযান মাসই অধিক পরিমাণে এবাদত-বন্দেগী করিতেন। কিন্তু শেষ দশকে এত বেশী করিতেন যে, ইহার কোন সীমা থাকিত না। রাত্রে নিজেও জাগিতেন এবং পরিবারের লোকদিগকেও বিশেষভাবে জাগাইবার এহ্‌তেমাম করিতেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের বহু রেওয়ায়াত হইতে ইহা জানা যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করিতেন। পরিবারের লোকদিগকেও জাগাইয়া দিতেন। 'লুঙ্গি মজবুত করিয়া বাঁধা'র অর্থ এবাদতে অধিক পরিমাণে চেষ্টা ও এহতেমাম করাও হইতে পারে অথবা স্ত্রীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকার অর্থও হইতে পারে।

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ فِی الْمُعْتَکِفِ ھُوَ یَعْتَکِفُ الذُّنُوْبَ وَ یُجْرٰی لَہٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ کُلِّھَا (مشکوۃ عن ابن ماجۃ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اُس کے لئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لئے۔

হাদীস-২ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এতেকাফকারী যাবতীয় গোনাহ হইতে মুক্ত থাকে এবং তাহার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লিখা হয় যে পরিমাণ আমলকারীর জন্য লিখা হইয়া থাকে। (মিশকাত ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে এতেকাফের দুইটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রথমতঃ এতেকাফের কারণে গোনাহ হইতে হেফাজত হয়। কেননা কোন কোন সময় গাফলত ও ভুল-ক্রুটির কারণে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায়, যাহাতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আর এই মুবারক সময়ে গোনাহ হইয়া যাওয়া কত বড় অন্যায় ! এতেকাফের ওসীলায় এইসব গোনাহ হইতে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ এতেকাফে বসিবার কারণে রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক হওয়া ইত্যাদি বহু নেক কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এতেকাফের ওসীলায় এইসব এবাদত না করিয়াও সে এইগুলির সওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহু আকবার কত বড় দয়া ! আর কত বড় রহমত ! মানুষ এবাদত করে একটি আর সওয়াব পাইতে থাকে দশটির। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত শুধু বাহানাই তালাশ করে ; সামান্য আগ্রহ ও চাহিদামাত্রই মুষলধারে বর্ষিত হইতে থাকে।

بہانہ مے دہد بہانے دہد

অর্থ ঃ সামান্য বাহানায় অনেক কিছু দিয়া দেন আবার অনেক যোগ্যতার উপরও কিছুই দেন না।

কিন্তু আমাদের নিকট উহার কোন কদরই নাই ; উহার প্রয়োজনই নাই, কাজেই দয়া কে করিবে? আর কেনই বা করিরে? আমাদের অন্তরে তো দ্বীনের কোন গুরুত্বই নাই।

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

অর্থাৎ, হে শহীদি ! আল্লাহর অপার অনুগ্রহ তো সকলের প্রতিই সমান বর্ষিত হয়। যদি তুমি যোগ্য হইতে তবে তোমার প্রতি তো তাহার কোন জিদ ছিল না।

(۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهٗ كَانَ مُعْتَكِفًا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ رض يَا فُلَانُ اَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِيْنًا قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ لِفُلَانٍ عَلَىَّ حَقٌّ وَلَا وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هٰذَا

حضرت ابن عباس رض ایک مرتبہ مسجد نبوی عَلٰی صَاحِبِہِ الصَّلوٰۃ وَالسَّلَام میں مُعتکِف تھے آپکے پاس ایک شخص آیا اور سلام کرکے (چُپ چاپ) بیٹھ گیا۔ حضرت ابنِ عباس رض نے اُس سے فرمایا کہ میں تمھیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے اُس نے کہا اے رسولُ اللہ کے چچا کے بیٹے میں

الْقَبْرِ مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَفَلَا اُكَلِّمُهُ فِيْكَ قَالَ اِنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ اَنَسِيْتَ مَا كُنْتَ فِيْهِ قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهْدُ بِهٖ قَرِيْبٌ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ وَبَلَغَ فِيْهَا كَانَ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ اِعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِيْنَ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلٰثَ خَنَادِقَ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ (رواه الطبرانی فی الاوسط والبیہقی واللفظ له والحاکم مختصرا وقال صحیح الاسناد وکذا فی الترغیب وقال السیوطی فی الدر صححه الحاکم وضعفه البیہقی)

بیشک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ اطہر کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابنِ عباسؓ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں اُس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباسؓ یہ سُنکر جوتہ پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سُنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گذرا (یہ لفظ کہتے ہوئے) ابن عباسؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضورؐ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کیلئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کیواسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانُہٗ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو دس برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی)

হাদীস-৩ ঃ একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে এতেকাফ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল এবং সালাম করিয়া চুপচাপ বসিয়া পড়িল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান দেখিতেছি! লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই! নিশ্চয়

আমি খুবই চিন্তিত ও পেরেশান। কেননা অমুক ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই কবরওয়ালার ইয্যতের কসম! ঐ ঋণ আদায় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য তাহার নিকট সুপারিশ করিব? লোকটি বলিল, আপনি যাহা ভাল মনে করেন। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ জুতা পরিয়া মসজিদের বাহিরে আসিলেন। লোকটি বলিল, আপনি কি এতেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, ভুলি নাই। তবে খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি এই কবরওয়ালার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট শুনিয়াছি (এই কথা বলিবার সময়) ইবনে আব্বাসের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল— তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে চলাফেরা করিবে এবং চেষ্টা করিবে, উহা তাহার জন্য দশ বছর এতেকাফ করার চাইতেও উত্তম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। যাহার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইতেও অধিক। (একদিনের এতেকাফের ফযীলতই যখন এইরূপ তখন দশবছরের এতেকাফের ফযীলত কি পরিমাণ হইবে!)

(তাবারানী, বাইহাকী, হাকিম, তারগীব)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের দ্বারা দুইটি বিষয় বুঝা যাইতেছে। এক. একদিনের এতেকাফের সওয়াব হইল, আল্লাহ তায়ালা এতেকাফকারী ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। আর প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী। আর একদিনের অধিক যত বেশীদিনের এতেকাফ হইবে উহার সওয়াবও তত বেশী বাড়িয়া যাইবে। আল্লামা শারানী (রহঃ) 'কাশফুল গুম্মাহ' কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন এতেকাফ করিবে, সে দুই হজ্জ ও দুই উমরার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়া হয় এমন মসজিদে মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত এতেকাফ করিবে এবং এই সময় কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বুঝা যায় তাহা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর

তাহা হইল, কোন মুসলমানের জরুরত পুরা করা। যাহাকে দশ বৎসরের এতেকাফের চাইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। এই জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নিজের এতেকাফের কোন পরওয়াই করেন নাই। কারণ, পরবর্তী সময়ে কাজা আদায় করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হইতে পারে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি ভগ্ন হৃদয়ের যে কদর হয় তাহা অন্য কোন জিনিসেরই হয় না। এইজন্যই হাদীস শরীফে মজলুমের বদ–দোয়ার ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত ইহাও বলিয়া দিতেন যে, সাবধান ! মজলুমের বদ–দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

بترس از آه مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

অর্থ ঃ মজলুমের 'আহ্'কে খুবই ভয় কর। কেননা মজলুম যখন দোয়া করে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে কবুলিয়ত আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে।

মাসআলা ঃ এখানে একটি মাসআলার প্রতি লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। তাহা এই যে, এতেকাফ অবস্থায় কোন মুসলমানের উপকারের জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইলেও এতেকাফ ভাঙ্গিয়া যায়। এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া থাকিলে উহা কাজা করাও ওয়াজিব হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন অর্থাৎ প্রস্রাব–পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে মসজিদের বাহিরে যাইতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) অপরের জন্য নিজের এতেকাফ ভঙ্গ করিয়া যে বিরাট কুরবানী করিলেন, এইরূপ কুরবানী কেবল ঐ সমস্ত মহাপুরুষের জন্য শোভা পায় যাহারা অপরের প্রাণ রক্ষার্থে নিজে তৃষ্ণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করেন ; মুখের নিকট পেয়ালা ভর্তি পানি পাইয়াও শুধু এইজন্য পান করেন না যে, তাহার পার্শ্বেই অপর এক আহত ভাই তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে ; এই পানি আগে তাহারই প্রয়োজন বেশী।

অবশ্য এখানে এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর এই এতেকাফ নফল এতেকাফ ছিল। তাহা হইলে বিষয়টি সহজ হইয়া যায়। কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

এখানে পরিশিষ্টরূপে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া এই কিতাব সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই হাদীসে বিভিন্ন প্রকার ফাযায়েল এরশাদ হইয়াছে।

(۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اَنَّهُ سَمِعَ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُبَخَّرُ وَتُزَيَّنُ
مِنَ الْحَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ لِدُخُوْلِ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَاِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ
مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ
مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا
الْمُثِيْرَةُ فَتَصْفِقُ وَرَقُ اَشْجَارِ
الْجِنَانِ وَحَلَقُ الْمَصَارِيْعِ فَيُسْمَعُ
لِذٰلِكَ طَنِيْنٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ
اَحْسَنَ مِنْهُ فَتَبْرُزُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ
حَتّٰى يَقِفْنَ بَيْنَ شُرَفِ الْجَنَّةِ
فَيُنَادِيْنَ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ اِلَى
اللّٰهِ فَيُزَوِّجَهُ ثُمَّ يَقُلْنَ الْحُوْرُ
الْعِيْنُ يَا رِضْوَانَ الْجَنَّةِ مَا هٰذِهِ
اللَّيْلَةُ فَيُجِيْبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ
يَقُوْلُ هٰذِهٖ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ
لِلصَّائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا رِضْوَانُ
افْتَحْ اَبْوَابَ الْجِنَانِ وَيَا مَالِكُ
اَغْلِقْ اَبْوَابَ الْجَحِيْمِ عَنِ
الصَّائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ

ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے
حضورؐ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت
کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی
دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے
آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ
کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی
پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے
ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے
(جس کے جھونکوں کی وجہ سے) جنت کے
درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے
بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آویز سریلی
آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے
اچھی آواز کبھی نہیں سنی پس خوشنما آنکھوں
والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت
کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر
آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں ہم سے منگنی کرنیوالا تاکہ حق تعالیٰ شانہٗ
اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں
جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں
کہ یہ کیسی رات ہے وہ لبیک کہکر جواب
دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات
ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ و
سلم کی امت کیلئے (آج) کھول دیئے گئے۔
حضورؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ رضوان سے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا
جِبْرَئِيْلُ اهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ
فَاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ
وَغُلَّهُمْ بِالْاَغْلَالِ ثُمَّ
اقْذِفْهُمْ فِى الْبِحَارِ حَتّٰى
لَا يُفْسِدُوْا عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ
حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِيَامَهُمْ قَالَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ
وَجَلَّ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُّنَادِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ سُؤْلَهٗ
هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاَتُوْبَ عَلَيْهِ
هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ مَنْ
يُّقْرِضُ الْمَلِىَّ غَيْرَ الْعَدُوْمِ وَ
الْوَفِىَّ غَيْرَ الظَّلُوْمِ قَالَ وَلِلّٰهِ
عَزَّوَجَلَّ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ اَلْفُ اَلْفِ
عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ
اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَاِذَا كَانَ اٰخِرُ
يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَعْتَقَ
اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا
اَعْتَقَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ
وَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَاْمُرُ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جِبْرَئِيْلَ فَيَهْبِطُ
فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ وَ
مَعَهُمْ لِوَاءٌ اَخْضَرُ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ

فرمادیتے ہیں کہ جنّت کے دروازے کھول دے
اور مالک (جہنّم کے داروغہ) سے فرمادیتے ہیں،
کہ احمد صلّی اللہ علیہ وسلّم کی اُمّت کے روزہ
داروں پر جہنّم کے دروازے بند کردے اور
جبرئیلؑ کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور
سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں
طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے
محبوب محمّد صلّی اللہ علیہ وسلّم کی اُمّت کے روزوں
کو خراب نہ کریں۔ نبیؐ کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم
نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ
رمضان کی ہر رات میں ایک مُنادی کو
حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے
کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اُسکی توبہ
قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا
کہ میں اُس کی مغفرت کروں، کون ہے
جو غنی کو قرض دے ایسا غنی جو نادار نہیں،
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی
نہیں کرتا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ
شانہٗ رمضان شریف میں روزانہ افطار
کیوقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنّم
سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنّم کے
مُستحق ہوچکے تھے اور جب رمضان کا
آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے
آج تک جسقدر لوگ جہنّم سے آزاد کئے
گئے تھے اُن کے برابر اُس ایک دن میں

عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهٗ مِائَةُ
جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا
اِلَّا فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَنْشُرُهُمَا
فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ
اِلَى الْمَغْرِبِ فَيَحُثُّ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ الْمَلٰئِكَةَ فِىْ هٰذِهِ
اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُوْنَ عَلٰى كُلِّ
قَائِمٍ وَّقَاعِدٍ وَّمُصَلٍّ وَّذَاكِرٍ
وَيُصَافِحُوْنَهُمْ وَيُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى
دُعَائِهِمْ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَاِذَا
طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِىْ جِبْرَئِيْلُ مَعَاشِرَ
الْمَلٰئِكَةِ الرَّحِيْلَ الرَّحِيْلَ فَيَقُوْلُوْنَ
يَا جِبْرَئِيْلُ فَمَا صَنَعَ اللّٰهُ فِىْ
حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ نَظَرَ
اللّٰهُ اِلَيْهِمْ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا
عَنْهُمْ اِلَّا اَرْبَعَةً فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ مُدْمِنُ
خَمْرٍ وَّعَاقٌّ لِّوَالِدَيْهِ وَقَاطِعُ
رَحِمٍ وَّمُشَاحِنٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
مَا الْمُشَاحِنُ قَالَ هُوَ الْمُصَارِمُ
فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ
تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ فَاِذَا
كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللّٰهُ
عَزَّ وَجَلَّ الْمَلٰئِكَةَ فِىْ كُلِّ
بِلَادٍ فَيَهْبِطُوْنَ اِلَى الْاَرْضِ

آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب قدر
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ حضرت جبرئیلؑ
کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک
بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اُترتے ہیں
اُن کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے
جس کو کعبہ کے اُوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت
جبرئیل علیہ السّلام کے سَو بازو ہیں جن میں
سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے
ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک
پھیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبرئیلؑ
فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان
آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ
رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں
اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین
کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔
جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرئیلؑ آواز
دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب
کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ
السّلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے
مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا
معاملہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ
سب کو مُعاف فرما دیا۔ صحابہ رضؓ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں۔ ارشاد
ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو

فَيَقُوْمُوْنَ عَلٰى اَفْوَاهِ السِّكَكِ
فَيُنَادُوْنَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ
خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا الْجِنَّ وَ
وَالْاِنْسَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اُخْرُجُوْا اِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ يُعْطِي
الْجَزِيْلَ وَيَعْفُوْ عَنِ الْعَظِيْمِ فَاِذَا
بَرَزُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ فَيَقُوْلُ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ مَا جَزَاءُ
الْاَجِيْرِ اِذَا عَمِلَ عَمَلَهٗ قَالَ
فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ اِلٰهَنَا وَسَيِّدَنَا
جَزَاؤُهٗ اَنْ تُوَفِّيَهٗ اَجْرَهٗ قَالَ
فَيَقُوْلُ فَاِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلٰئِكَتِيْ
اَنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ
صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ
قِيَامِهِمْ رِضَائِيْ وَمَغْفِرَتِيْ وَ
يَقُوْلُ يَا عِبَادِيْ سَلُوْنِيْ فَوَعِزَّتِيْ
وَجَلَالِيْ لَا تَسْئَلُوْنِي الْيَوْمَ شَيْئًا
فِيْ جَمْعِكُمْ لِاٰخِرَتِكُمْ اِلَّا
اَعْطَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ اِلَّا
نَظَرْتُ لَكُمْ فَوَعِزَّتِيْ لَاَسْتُرَنَّ
عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُوْنِيْ
وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا اُخْزِيْكُمْ
وَلَا اَفْضَحُكُمْ بَيْنَ اَصْحَابِ
الْحُدُوْدِ وَانْصَرِفُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ
قَدْ اَرْضَيْتُمُوْنِيْ وَرَضِيْتُ عَنْكُمْ
فَتَفْرَحُ الْمَلٰئِكَةُ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا

دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنیوالا
ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور
ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ
رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنیوالا
ہو۔ پھر جب عیدُ الفطر کی رات ہوتی ہے
تو اُس کا نام (آسمانوں پر) لَیْلَۃُ الْجَائِزَہ (انعام
کی رات) سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانُہٗ فرشتوں کو تمام
شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اُتر کر تمام
گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان
کے سوا ہر مخلوق سُنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمدؐ
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی اُمت اس کریم ربّ کی
(درگاہ) کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے
والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو مُعاف
فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف
نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانُہٗ فرشتوں سے دریافت
فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اُس مزدور کا جو اپنا کام
پورا کر چکا ہو، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے
معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے
کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے،
تو حق تعالیٰ شانُہٗ اِرشاد فرماتے ہیں کہ اے
فرشتو میں تمھیں گواہ بناتا ہوں میں نے اُن
کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں
اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے
خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو

يُعْطِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اِذَا
اَفْطَرُوْا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔
(كذا في الترغيب وقال رواه ابو
الشيخ بن حبان في كتاب الثواب
والبيهقي و اللفظ له وليس في اسناده
من اجمع على ضعفه قلت قال
السيوطي في التدريب قد التزم
البيهقي ان لا يخرج في تصانيفه حديثا
يعلمه موضوعا الخ وذكر القاري
في المرقاة بعض طرق الحديث ثم قال
فاختلاف طرق الحديث يدل
على ان له اصلا اه)

مجھ سے مانگو۔ میری عزت کی قسم میرے جلال
کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے
اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے
عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال
کروگے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر
کرونگا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم
میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر
ستاری کرتا رہوں گا (اور اُن کو چھپاتا رہونگا)
میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم
میں تمہیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے
رُسوا اور فضیحت نہ کرونگا۔ بس اب بخشے
بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے
راضی کردیا اور میں تم سے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجر وثواب کو دیکھ کر جو اس اُمت کو افطار
کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کِھل جاتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

হাদীস-৪ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন—তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে বেহেশতকে অপূর্ব খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া হয়। বছরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উহাকে রমযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়। যখন রমযানের প্রথম রাত্রি হয় তখন আরশের তলদেশ হইতে 'মুসীরাহ' নামক এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হয়। যাহার দোলায় বেহেশতের বৃক্ষলতার পাতা-পল্লব ও দরজার কড়াসমূহ দুলিতে থাকে। যদ্দ্বারা এমন এক মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সুর সৃষ্টি হয় যে, কোন শ্রোতা ইতিপূর্বে এইরূপ সুমধুর সুর কখনও শ্রবণ করে নাই। তখন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ নিজ নিজ প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে, এমন কেউ আছে কি? যে আমাদেরকে পাইবার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদিগকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। অতঃপর ঐ হুরগণ বেহেশতের দারোগা রেদওয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, ইহা কোন্ রাত্রি? রেদওয়ান লাব্বাইক বলিয়া জওয়াব দেন যে, ইহা

রমযানের প্রথম রাত্রি। আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা রেদওয়ানকে বলেন, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দাও এবং দোযখের দারোগা মালেককে বলেন, আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযাদার উম্মতের জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দাও। জিবরাঈল (আঃ)কে হুকুম করেন, জমিনের বুকে যাও এবং পাপিষ্ঠ শয়তানদিগকে বন্দী কর এবং গলায় বেড়ী পরাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। যাহাতে আমার মাহবূব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রোযা নষ্ট করিতে না পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক রাত্রে একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম করেন, যেন তিনবার এই ঘোষণা দেয় যে, আছে কোন প্রার্থনাকারী? যাহাকে আমি দান করিব। আছে কোন তওবাকারী? যাহার তওবা আমি কবূল করিব। আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী? যাহাকে আমি ক্ষমা করিব। কে আছে, যে করজ দিবে এমন ধনবানকে, যে নিঃস্ব নয়, যে পরিপূর্ণরূপে করজ পরিশোধ করিয়া দেয় এবং বিন্দুমাত্রও কমি করে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশ লক্ষ লোককে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করেন যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর যখন রমযানের শেষ দিন আসে তখন পহেলা রমযান হইতে শেষ পর্যন্ত যত লোক জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়াছে তাহাদের সকলের সমপরিমাণ লোককে একদিনে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা কদরের রাত্রিতে জিবরাঈল (আঃ)কে হুকুম করেন, তিনি ফেরেশতাদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া জমিনে অবতরণ করেন। তাহাদের সহিত সবুজ ঝাণ্ডা থাকে, যাহা কাবা শরীফের উপর স্থাপন করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর একশত ডানার মধ্যে সেই রাত্রে মাত্র দুইটি ডানা প্রসারিত করেন যাহা পূর্ব পশ্চিমকে ঘিরিয়া ফেলে। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণকে হুকুম করেন—তাহারা যেন আজ রাত্রে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া যিকির কিংবা নামায রত প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করেন, তাহাদের সহিত মুসাফাহা করেন এবং তাহাদের দোয়ার সহিত আমীন আমীন বলিতে থাকেন। সকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। সকাল বেলা হযরত জিবরাঈল (আঃ) সকলকে ডাকিয়া বলেন, হে ফেরেশতাগণ! এইবার সকলেই ফিরিয়া চল। তখন

ফেরেশতাগণ হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তায়ালা আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জরুরত ও প্রয়োজন সম্পর্কে কি ফয়সালা করিয়াছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং চার ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই চার ব্যক্তি কাহারা? এরশাদ হইল, প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মদ পান করে। দ্বিতীয় মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। তৃতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। চতুর্থ বিদ্বেষ পোষণকারী, যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত্র হয় তখন আসমানে উহাকে পুরস্কারের রাত্র বলিয়া নামকরণ করা হয়। ঈদের দিন সকালে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে প্রত্যেক শহরে পাঠাইয়া দেন। তাহারা জমিনে অবতরণ করিয়া সমস্ত অলিগলি ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া যান এবং এমন আওয়াজে যাহা জিন ও মানব ব্যতীত সকল মখলুকই শুনিতে পায়—ডাকিতে থাকেন যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত! পরম দয়াময় পরওয়ারদিগারের দরবারে চল। যিনি অপরিসীম দাতা ও বড় হইতে বড় অপরাধ ক্ষমাকারী। অতঃপর লোকেরা যখন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, যে মজদুর তাহার কাজ পুরা করিয়াছে সে উহার বিনিময়ে কি পাইতে পারে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের মাবূদ আমাদের মালিক! তাহার বিনিময় ইহাই যে, তাহাকে পুরাপুরি পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাদিগকে রমযানের রোযা ও তারাবীর বদলায় আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করিলাম। অতঃপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আমার বান্দারা! আমার কাছে চাও। আমার ইয্‌যত ও বুযুর্গীর কসম, আজকের দিনে ঈদের এই জামাআতে তোমরা আখেরাতের ব্যাপারে যাহা কিছু চাহিবে আমি দান করিব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যাহা চাহিবে উহাতে তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গলজনক হইবে তাহাই দান করিব। আমার ইয্‌যতের কসম! যতক্ষণ তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ততক্ষণ আমি তোমাদের অপরাধসমূহ গোপন করিতে থাকিব। আমার ইযযত ও বুযুর্গীর কসম! আমি তোমাদিগকে অপরাধী (অর্থাৎ কাফের)দের সম্মুখে লজ্জিত করিব না। সুতরাং তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমরা আমাকে

রাজী করিয়াছ, আমিও তোমাদের প্রতি রাজী হইয়া গেলাম। ফেরেশতাগণ ঈদের দিন উম্মতের এই আজর ও সওয়াবকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। (তারগীব ঃ বাইহাকী) (হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া নিন, আমীন)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের অধিকাংশ বিষয় কিতাবের বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, বেশ কিছু মাহরূম লোক রমযানের সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ পড়িয়াছিল, যেমন পূর্বের হাদীস দ্বারা জানা গিয়াছে। আবার তাহাদিগকে ঈদের এই ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে আত্মকলহকারী ও মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানও রহিয়াছে। তাহাদেরকে কেহ জিজ্ঞাসা করুক যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোমরা নিজের জন্য কোন্ ঠিকানা তালাশ করিয়া লইয়াছ? আফসোস তোমাদের উপর এবং তোমাদের সেই মান–সম্মানের উপর, যাহা হাসিল করিবার অবাস্তব খেয়ালে তোমরা আল্লাহর রাসূলের বদদোয়া মাথায় লইতেছ। জিবরাঈল (আঃ)এর বদদোয়া বহন করিতেছ। আল্লাহর ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আজ না হয় তোমরা নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াই দিলে আর নিজের গোঁফ উঁচা করিয়াই লইলে কিন্তু ইহা কতদিন থাকিবে? কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের প্রতি লানত করিতেছেন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা তোমাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করিতেছেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও মাগফিরাত হইতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন। অতএব, একটু চিন্তা কর এবং ক্ষান্ত হও। এখনও সময় আছে ক্ষতিপূরণ সম্ভব। সকালের পথহারা পথিক বিকালে ঘরে পৌঁছিয়া গেলে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু কাল যখন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে তোমাকে হাজিরি দিতে হইবে তখন মান–সম্মান, প্রভাব–প্রতিপত্তি কিছুই কাজে আসিবে না। সেখানে শুধু তোমার আমলেরই মূল্য হইবে। তোমার প্রত্যেকটি কাজ সেখানে লিখিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিজের হকসমূহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট হইলে উহার বদলা না দেওয়াইয়া ছাড়িবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল লইয়া উঠিবে ; নামায,

রোযা, সদকা সব নেক আমলই তাহার সাথে থাকিবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও বা অপবাদ দিয়াছিল, অথবা কাহাকেও মারপিট করিয়াছিল। তখন এই সকল দাবীদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী তাহার নেক আমলসমূহ হইতে উসুল করিয়া লইয়া যাইবে। এইভাবে যখন তাহার সমস্ত নেক আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন দাবীদারগণ নিজেদের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া যাইবে। তখন সে এই সমস্ত গোনাহ মাথায় লইয়া জাহান্নামে চালিয়া যাইবে। বিশাল নেক আমলের অধিকারী হইয়াও তখন তাহার যে দুঃখজনক পরিণতি হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وہ مایوسِ تمنّا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے
کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے

অর্থাৎ, জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের পরিশ্রমকে পণ্ড হইতে দেখিয়া হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আকাশ পানে চাহিবে না তো কি করিবে?

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, এই কিতাবে গোনা-মাফীর কয়েকটি স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু বিষয় আছে, যাহা গোনা-মাফীর কারণ হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, একবার যখন গোনাহ মাফ হইয়া যায় তখন পুনরায় আবার গোনাহ মাফ হওয়ার অর্থ কি? ইহার জওয়াব এই যে, মাগফেরাত ও গোনা-মাফীর নিয়ম হইল, আল্লাহর মাগফেরাত যখন বান্দার প্রতি রুজু হয় তখন তাহার কোন গোনাহ থাকিলে উহাকে মিটাইয়া দেয়। আর যদি কোন গোনাহ না থাকে তবে সেই পরিমাণ আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিষয় হইল, উপরোক্ত হাদীসে এবং পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্যেও কয়েক জায়গায় এই কথা আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার সময় ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, কিয়ামতের আদালতের বিষয়গুলি নিয়মনীতির উপর রাখা হইয়াছে। নবীদের নিকট হইতে তাহাদের তবলীগের ব্যাপারেও সাক্ষী তলব করা হইবে। বহু হাদীসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং আমি যে পৌঁছাইয়াছি, সে বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাকিও।

বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন

হযরত নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি কি নবুওয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন? আমার হুকুম আহকাম পৌঁছাইয়াছিলেন? তিনি আরজ করিবেন, হাঁ, পৌঁছাইয়াছিলাম। অতঃপর তাঁহার উম্মতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি কি হুকুম–আহকাম পৌঁছাইয়াছিলেন? তাহার উম্মত বলিবে مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ

অর্থ ঃ আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে, না কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসিয়াছে। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১৯)

তখন হযরত নূহ (আঃ)কে বলা হইবে, আপনার সাক্ষী পেশ করুন। তিনি তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার উম্মতকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিবেন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা হইবে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে জেরা করা হইবে এবং বলা হইবে যে, নূহ (আঃ) তাহার উম্মতকে আহকাম পৌঁছাইয়াছেন তাহা তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন উম্মতে মুহাম্মদী আরজ করিবে যে, আমাদের রাসূল এই খবর দিয়াছেন ; আমাদের নবীর উপর যে সত্য কিতাব নাযিল হইয়াছিল উহাতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য নবীর উম্মতের সঙ্গেও এরূপ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

অর্থ ঃ এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী উম্মতরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হইতে পার।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৪৩)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন চার প্রকার সাক্ষী হইবে ঃ

প্রথম সাক্ষী ফেরেশতাগণ, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আলোচনা করা হইয়াছে—

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

(সূরা ইনফিতার, আয়াত ঃ ৯০)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ ۝

(সূরা ক্বাফ, আয়াত ঃ ১৮/২১)

দ্বিতীয় সাক্ষী আম্বিয়ায়ে কেরাম, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে

এরশাদ হইয়াছে— وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

(সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১১৭)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪১)

তৃতীয় সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মদী। যাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে—

وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ○

(সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৬৯)

চতুর্থ সাক্ষী মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

(সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৪)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

(সূরা ইয়াছীন, আয়াত ঃ ৬৫)

সংক্ষেপকরণের উদ্দেশ্যে তরজমা লেখা হইল না। তবে সারকথা হইল, আয়াতের শুরুতে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে কেয়ামতের দিন তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ বিষয় হইল এই হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, 'আমি কাফেরদের সম্মুখে তোমাদিগকে লজ্জিত করিব না।' ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অসীম দয়া ও অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের অবস্থার উপর তাঁহার গায়রত যে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাহাদের গোনাহ কিয়ামত দিবসেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং গোপন করিয়া রাখা হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক একজন মুমিনকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিবেন, যাহাতে আর কেহ দেখিতে না পায়। অতঃপর তাহার যাবতীয় অন্যায় অপরাধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি লইবেন। সে তখন নিজের গোনাহের বিশাল স্তূপ এবং নিজের স্বীকারোক্তির কথা চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে যে, আমার ধ্বংসের সময় অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তখন এরশাদ হইবে, আমি দুনিয়াতেও তোমার অপরাধ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আজ এখানেও সেইগুলি গোপন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর তাহার নেক আমলের দপ্তর তাহাকে দিয়া দেওয়া হইবে।

এইরূপ আরও অসংখ্য রেওয়ায়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়

যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশকারী এবং পাবন্দির সহিত তাঁহার হুকুম-আহকাম পালনকারীর গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই বিষয়টি বুঝিয়া লওয়া উচিত, যাহারা আল্লাহওয়ালাদের কোন ভুল-ত্রুটির কারণে তাহাদের গীবতে লিপ্ত হইয়া যায় তাহারা যেন এই বিষয়টি মনে রাখে যে, হয়ত কিয়ামতের দিন নেক আমলসমূহের বরকতে তাহাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে আর তোমাদের আমলনামা গীবতের দপ্তর হইয়া নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন।

পঞ্চম যে জরুরী বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল, ঈদের রাত্রটিকে পুরস্কারের রাত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। এই রাত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই এই রাত্রিরও বিশেষ কদর করা উচিত। সাধারণ লোক তো দূরের কথা অনেক খাছ লোকও রমযানের ক্লান্তির পর সেই রাত্রে সুখের নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়ে। অথচ ইহাও বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার রাত্র। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া এবাদতে মগ্ন হইবে, তাহার অন্তর সেইদিন মরিবে না যেদিন সকল অন্তর মরিয়া যাইবে। অর্থাৎ, ফেৎনা-ফাসাদের সময় যখন মানুষের অন্তরের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা ছাইয়া যাইবে তখন তাহার অন্তর সতেজ ও জিন্দা থাকিবে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, এই দিনের দ্বারা শিংগায় ফুৎকারের দিনকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, সেই দিন সকল আত্মা বেহুঁশ হইলেও তাহার আত্মা বেহুঁশ হইবে না।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে পাঁচটি রাত্র জাগ্রত থাকিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। সেই রাত্রগুলি হইল—যিলহজ্জের আট, নয় ও দশ তারিখের রাত্র, ঈদুল ফিতির ও পনরই শাবানের রাত্র।

ফুকাহায়ে কেরামও দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকাকে সুন্নত লিখিয়াছেন। 'মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ' কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর অভিমত লেখা হইয়াছে যে, পাঁচটি রাত্রে দোয়া কবূল হয়। জুমআর রাত্রে, দুই ঈদের রাত্রে, রজবের প্রথম রাত্রে এবং শাবানের পনর তারিখ অর্থাৎ শবে বরাতে।

তাম্বীহ ঃ কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, রমযান মাসে জুমআর রাত্রগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা উচিত। কেননা জুমআর দিন ও উহার রাত্রটি খুবই বরকতময়। হাদীস শরীফেও উহার বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে শুধু জুমআর রাত্রকে এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নিষিদ্ধতাও বর্ণিত আছে। তাই উত্তম হইল, উহার সহিত আরও এক দুই রাত্র মিলাইয়া লওয়া।

পরিশেষে পাঠকদের খেদমতে আবেদন এই যে, রমযানের বিশেষ সময়গুলিতে আপনারা যখন নিজেদের জন্য দোয়া করিবেন তখন এই অধম গোনাহগারকেও আপনাদের দোয়ায় শামিল করিয়া লইবেন। হইতে পারে পরম দয়ালু মাওলা পাক আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ার বরকতে আমাকেও আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত দ্বারা আপ্লুত করিবেন।

مُناجات

گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہِ جہاں　　پر ترے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں
کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے

کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ　　دیکھ مت میرے عمل، کر لُطف پر اپنے نگاہ
یارب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے

چرخِ عصیاں سر پہ ہے زیرِ قدم بحرِ الم　　چار سُو ہے فوجِ غم، کر جلد اب بہرِ کرم
کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے

ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے　　اور تکیہ زُہد کا ہے زاہدوں کے واسطے
ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے

نَے فقیری چاہتا ہوں، نَے امیری کی طلب　　نَے عبادت نَے ورع نَے خواہشِ علم و اَدب
دردِ دل، پر چاہیئے مجھ کو خدا کے واسطے

عقل و ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار　　کی عطا تُو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار
بخش وہ نعمت جو کام آئے سدا کے واسطے

حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا　　کر مری امداد اللہ، وقت ہے امداد کا
اپنے لطف و رحمتِ بے انتہا کے واسطے

گو میں ہوں اک بندۂ عاصی غلامِ پُر قصور　　جُرم میرا حوصلہ ہے، نام ہے تیرا غفور
تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے ربِّ شکور　　اَنْتَ شَافٍ اَنْتَ كَافٍ فِي مُهِمَّاتِ الْاُمُوْرِ
اَنْتَ حَسْبِيْ اَنْتَ رَبِّيْ اَنْتَ لِيْ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

‘হে সারা জাহানের বাদশাহ! আমি যদিও বদকার ও নালায়েক; কিন্তু তুমিই বল, তোমার দরজা ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়? আমি অসহায়ের জন্য তুমি ছাড়া আর কে আছে।

হে আমার রব! নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। আমার আমল তুমি দেখিও না। আমার উপর দয়া, দান ও অনুগ্রহের জন্য তোমার রহমতের প্রতি দৃষ্টি কর।

মাথার উপর গোনাহের আসমান, পায়ের নীচে দুঃখের সাগর, চারিদিকে দুশ্চিন্তার সৈনিক দল। এখন দয়া করিয়া অতি শীঘ্র এই বিপদগ্রস্তের নাজাতের কোন ব্যবস্থা করিয়া দাও।

এবাদতকারীদের জন্য এবাদতের ভরসা রহিয়াছে এবং যাহেদগণের জন্য যুহ্‌দের ভরসা রহিয়াছে। আর আমি হাত-পাবিহীন পঙ্গুর লাঠি হইল শুধু আহ্ ও আফসোস।

ফকীরি চাই না, আমীরি চাই না, এবাদত চাই না, পরহেজগারী চাই না এবং এলেম ও আদবের খাহেশও আমার নাই। আমি চাই শুধু আল্লাহর জন্য অন্তরের দরদ ও জ্বালা।

বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা আরও অসংখ্য পার্থিব নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়াছ। এখন হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে ঐ নেয়ামত দান কর যাহা চিরকালের জন্য কাজে আসে।

আমি হতভাগ্যের দুরবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ! তোমার অসীম দয়া ও মেহেরবানীর দোহাই—সাহায্যের সময় আসিয়া গিয়াছে; আমাকে সাহায্য কর।

হে মহান প্রতিদানকারী! যদিও আমি গোনাহগার বান্দা, দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ গোলাম; অপরাধ করা আমার দুঃসাহস কিন্তু তোমার নাম গাফুর; যেমনই হই না কেন আমি তো তোমারই। তুমি আরোগ্য দানকারী, তুমি যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি আমার রব, তুমি আমার জন্য কতই না উত্তম সাহায্যকারী।’

মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী
মাজাহিরে উলূম, সাহারানপুর
২৭শে রমযান রাত্র ১৩৪৯ হিঃ

পস্তী কা
ওয়াহেদ এলাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ভূমিকা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ)এর বিশেষ অনুরাগ ও গভীর আগ্রহে এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে উম্মতের তাওয়াজ্জুহ, বরকত ও সক্রিয় চেষ্টা-সাধনায় কিছুকাল যাবত দ্বীনের তবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কাজ বিশেষ নিয়মে একাধারে চলিয়া আসিতেছে, যাহা সম্পর্কে সচেতন মহল ভালভাবে অবগত আছেন।

আমার মত বে-এলেম ও গোনাহগারের প্রতি ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের হুকুম হইয়াছে যে, তবলীগের এই পদ্ধতি এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে ও বুঝাইতে সহজ হয় এবং উপকারিতাও ব্যাপক হইয়া যায়।

নির্দেশ পালনার্থে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যাহা ঐ সমস্ত নেক ব্যক্তিবর্গের এলেম ও জ্ঞান সমুদ্রের কয়েকটি ফোঁটা মাত্র এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর ঐ বাগানের কয়েকটি গুচ্ছ মাত্র যাহা অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। যদি ইহাতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে ইহা আমার দুর্বল লেখনী ও অজ্ঞতার কারণে হইয়াছে। মেহেরবানী ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে উহা সংশোধন করিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমার বদ আমল ও গোনাহসমূহ গোপন রাখুন এবং আমাকে ও আপনাদিগকে ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় নেক আমল ও নেক আখলাকের তওফীক দান করুন, আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত এবং তাঁহার মনোনীত দ্বীনের প্রচার ও তাঁহার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণের তওফীক দান করিয়া সম্মানিত করুন, আমীন।

আরজ-গুজার
বুযুর্গানের পদধুলি
মুহাম্মদ এহ্‌তেশামুল হাসান
১৮ রবীউসসানী ঃ ১৩৫৮

মাদরাসা কাশিফুল-উলূম
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া
দিল্লী (ভারত)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۵

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ -

আজ হইতে প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে দুনিয়া যখন কুফর ও গোমরাহী, মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন মক্কার প্রস্তরময় পর্বতমালা হইতে সত্য ও হেদায়াতের চন্দ্র উদিত হয় এবং পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ—এক কথায় দুনিয়ার সকল প্রান্তকে স্বীয় নূর দ্বারা আলোকিত করে এবং তেইশ বছরের সময়ের মধ্যে মানবজাতিকে উন্নতির ঐ স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়, যাহার নজীর পেশ করিতে গোটা জগতের ইতিহাস অক্ষম। সত্য, হেদায়াত, কল্যাণ ও কামিয়াবীর এমনি মশাল মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেয় যাহার আলোতে মুসলমানগণ উন্নতির রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শত শত বৎসর ধরিয়া এমন জাঁকজমকের সহিত দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করে যে, সকল বিরোধী শক্তিকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ইহা একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি পুরাতন কাহিনী যাহার বারবার আলোচনা না সান্ত্বনাদায়ক, আর না কোনরূপ উপকারী ও লাভজনক। কারণ বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলী স্বয়ং আমাদের অতীত ইতিহাস ও আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কৃতিত্বের উপর কলঙ্কের দাগ লাগাইতেছে।

মুসলমানদের তের শত বৎসরের জীবনকে যখন ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় তখন জানা যায় যে, আমরা ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব, শান ও শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির একমাত্র মালিক ও একচ্ছত্র অধিকারী ছিলাম। কিন্তু যখন ইতিহাসের পাতা হইতে নজর সরাইয়া বর্তমান অবস্থার উপর

দৃষ্টিপাত করা হয় তখন আমাদিগকে চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত জাতি হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। না আছে শক্তি–সামর্থ্য, না আছে ধন–দৌলত, না আছে শান-শওকত, না আছে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালবাসা, না স্বভাব ভাল, না আখলাক ভাল, না আমল ভাল, না আচার–আচরণ ভাল—সব ধরনের অকল্যাণ আমাদের মধ্যে, সব ধরনের কল্যাণ হইতে আমরা বহু দূরে। বিধর্মীরা আমাদের এই দুরবস্থার উপর আনন্দ বোধ করে, প্রকাশ্যে আমাদের দুর্নাম গাওয়া হয় এবং আমাদেরকে লইয়া উপহাস করা হয়।

এখানেই শেষ নয় বরং স্বয়ং আমাদের কলিজার টুকরা নব্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত যুবকগণ ইসলামের পূত–পবিত্র বিধানসমূহকে উপহাস করে। কথায় কথায় দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং এই পবিত্র শরীয়তকে আমলের অযোগ্য, অনর্থক ও বেকার মনে করে। অবাক হইতে হয় যে জাতি একদা পিপাসা মিটাইয়াছে, আজ তাহারা কেন পিপাসার্ত! যে জাতি দুনিয়াকে সভ্যতা ও সামাজিকতার সবক পড়াইয়াছে আজ তাহারা কেন অসামাজিক ও অসভ্য?

জাতির দিশারীগণ আজ হইতে অনেক আগেই আমাদের দুরবস্থাকে অনুধাবন করিয়াছেন এবং নানাভাবে আমাদের সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু (কবির ভাষায়)—

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

"চিকিৎসা যতই করা হইল রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।"

বর্তমান অবস্থা যখন অধিকতর শোচনীয় পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অতীতের তুলনায় ভবিষ্যত আরও বেশী বিপজ্জনক ও অন্ধকারময় দেখা যাইতেছে তখন আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এবং সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করা এক অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আমাদিগকে অবশ্যই ঐ সকল কারণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে, যে সকল কারণে আমরা এই অপমান ও লাঞ্ছনার আজাবে পতিত হইয়াছি। আমাদের এই অবনতি ও অধঃপতনের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয় এবং উহা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ অনুপযোগী ও বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে আমাদের পথপ্রদর্শকগণকেও নৈরাশ্য ও হতাশায় নিমজ্জিত দেখা যাইতেছে।

বাস্তব সত্য হইল এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের রোগ নির্ণয়ই

সঠিকরূপে হয় নাই। যে সমস্ত কারণ বর্ণনা করা হয় উহা প্রকৃত রোগ নহে বরং রোগের উপসর্গ মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত রোগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া না হইবে এবং রোগের মূল উৎসের সংশোধন ও চিকিৎসা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপসর্গের সংশোধন ও চিকিৎসা অসম্ভব ও অবাস্তব। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত রোগের সঠিক নির্ণয় ও উহার সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানিয়া না লইব ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের ব্যাপারে আমাদের মতামত ব্যক্ত করা মারাত্মক ভুল হইবে।

আমাদের দাবী হইল, আমাদের শরীয়ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ খোদায়ী বিধান, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কামিয়াবীর জিম্মাদার। অতএব কোন কারণ নাই যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের রোগ নির্ণয় করিব এবং নিজেরাই উহার চিকিৎসা শুরু করিয়া দিব। বরং আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, কুরআনে হাকীম হইতে আমাদের মূল রোগ নির্ণয় করি এবং হক ও হেদায়াতের মারকাজ এই কুরআন হইতেই সেই রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি জানিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করি। আর কুরআনে হাকীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্তের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান, সেহেতু কোন কারণ নাই যে, এই নাজুক পরিস্থিতিতে কুরআন আমাদের পথপ্রদর্শন করিতে অপারগ হইবে।

যমীন ও আসমানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার সত্য ওয়াদা রহিয়াছে যে, পৃথিবীর বাদশাহী ও খেলাফত মুমিন বান্দাদের জন্য।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ (نور-ع۷)

اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم
میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح
کئے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, অবশ্যই তাহাদিগকে যমীনের খলীফা বানাইবেন। (নূর, আয়াত-৫৫)

আর ইহাও সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, মুমিনগণ সর্বদা কাফেরদের উপর বিজয়ী থাকিবে এবং কাফেরদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ
لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ (فتح ع۳)

اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر
بھاگتے. پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار.

অর্থ ঃ আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে অবশ্যই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত এবং তাহারা কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইত না। (ফাত্‌হ, আয়াত-২২)

আর মুমিনদের মদদ ও সাহায্য আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় রহিয়াছে এবং তাহারাই সর্বদা উন্নত শির ও মর্যাদাশীল থাকিবে।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الروم۔ ع ۵) اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی ۔

অর্থঃ আর মুমিনদিগকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।(রুম, আয়াত-৪৭)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ (آل عمران ع ۱۴) اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہوگے اگر تم پورے مومن رہے ۔

অর্থ ঃ তোমরা হিম্মতহারা হইও না ; দুঃখিত হইও না, তোমরাই বিজয়ী থাকিবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও। (আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৯)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (منافقون ع ۲) اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول ﷺ کی اور مسلمانوں کی ۔

অর্থ ঃ আর ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূলের ও মুমিনদের। (মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইজ্জত, শান-শওকত, উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তাহাদের ঈমানী গুণাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত যদি তাহাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসূলের সহিত মজবুত থাকে (যাহা ঈমানের উদ্দেশ্য) তবে সবকিছুই তাহাদের। আর খোদা না করুন যদি এই সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা পয়দা হইয়া গিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ ধ্বংস, অপমান ও জিল্লতি রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ٥ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٥ (سورۃ عصر)

قسم ہے زمانہ کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے ۔

অর্থ ঃ যমানার কসম ! মানবজাতি বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে

রহিয়াছে ; কিন্তু যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অপরকে পাবন্দী করার উপদেশ দিতে থাকে। (সূরা আছর)

আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইজ্জত ও সম্মানের চরমে পৌছিয়াছিলেন আর আমরা অপমান ও জিল্লতীর শেষ সীমায় পৌছিয়াছি। অতএব বুঝা গেল যে, তাঁহারা পরিপূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত ছিলেন আর আমরা এই মহান নেয়ামত হইতে বঞ্চিত। যেমন সত্য সংবাদদাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর দিয়াছেন—

سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ ـ (مشكوٰة)

یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے ۔

অর্থ ঃ অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যে, ইসলামের শুধু নাম বাকী থাকিবে আর কুরআনের শুধু লিখিত হরফ বাকী থাকিবে। (মিশকাত)

এখন গভীরভাবে চিন্তার বিষয় এই যে, সত্যিই যদি আমরা ঐপ্রকৃত ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি যাহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পছন্দনীয় এবং যাহার সহিত আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও কামিয়াবী সম্পর্কযুক্ত। তবে কি উপায় রহিয়াছে যাহা অবলম্বন করিলে আমরা সেই হারানো নেয়ামত ফিরিয়া পাইতে পারি আর ঐ সকল কারণই বা কি? যদ্দরুন ইসলামের রূহ আমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে আর আমরা প্রাণহীন দেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি।

যখন আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করা হয় এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের কারণ তালাশ করা হয়, তখন জানা যায় যে, এই উম্মতকে একটি অতি উঁচু ও মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল যাহার কারণে তাহাদিগকে খাইরুল উমাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মতের সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহুর যাত ও ছিফাতের পরিচয় লাভ করা। আর ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতিকে সর্বপ্রকার খারাবী ও অপবিত্রতা হইতে পাক-সাফ করিয়া যাবতীয় কল্যাণ ও গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত না করা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হাজারো রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা দানের জন্য সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হইয়াছে এবং এই সুসংবাদ শুনানো হইয়াছে—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

অর্থ ঃ আজ তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করিয়া দিলাম।

(মায়েদা, আয়াত-৩)

এখন যেহেতু উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সর্বপ্রকার ভাল-মন্দ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, কাজেই রিসালত ও নবুওতের ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অতীতে যে কাজ নবী ও রাসূলগণের দ্বারা লওয়া হইতেছিল তাহা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۔
(آل عمران ۔ ع ۱۲)

اے اُمّتِ محمدیہ! تم افضل اُمّت ہو تم
کو لوگوں کے نفع کے لئے بھیجا گیا ہے۔
تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو
اور بُری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

অর্থ ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে—তোমরা সৎকাজসমূহকে মানুষের মাঝে প্রসার কর এবং অসৎ কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। (আলি ইমরান, আয়াত-১১০)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (آل عمران ع ۱۱)

اور چاہیئے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ
لوگوں کو خیر کی طرف بُلائے اور بھلی باتوں
کا حکم کرے، اور بُری باتوں سے منع کرے
اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو
اس کام کو کرتے ہیں۔

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন জামাত থাকা চাই, যাহারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং ভাল কাজের হুকুম করে ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে—এই কাজ যাহারা করে, একমাত্র তাহারাই কামিয়াব।

(আলি ইমরান, আয়াত-১০৪)

প্রথম আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে যে, তোমরা সৎকাজের প্রসার করিয়া থাক এবং অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া থাক। দ্বিতীয় আয়াতে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, কামিয়াবী ও সফলতা একমাত্র ঐ সকল লোকদের জন্যই যাহারা এই কাজ করিতেছে।

আর শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই কাজ না করা লা'নত ও অভিশাপের কারণ। এরশাদ হইতেছে—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

(مائده-ع ١١)

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤدؑ اور عیسٰی بن مریمؑ کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انھوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے جو بُرا کام انھوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے واقعی ان کا یہ فعل بے شک بُرا تھا۔

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর লানত করা হইয়াছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের জবানে। আর এই লানত এই কারণে করা হইল যে, তাহারা হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সীমা লংঘন করিয়াছে। যে মন্দ কাজ তাহারা করিত, উহা হইতে বিরত হইত না। তাহাদের এই কাজ নিঃসন্দেহে মন্দ ছিল।

(মায়েদা, আয়াত-৭৮, ৭৯)

নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা উপরোক্ত শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট হইয়া যায়—

(١) وفى السنن والمسند من حديث عبد الله بن مسعودؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ اِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ فِيْهِمْ بِالْخَطِيْئَةِ جَاءَهُ النَّاهِىْ تَعْزِيْرًا فَقَالَ يَا هٰذَا اِتَّقِ اللهَ فَاِذَا

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی اُمتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اُٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا گویا کل اس کو گناہ

كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالِسَهُ وَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلٰى خَطِيْئَةٍ بِالْاَمْسِ فَلَمَّا رَاٰى عَزَّوَجَلَّ ذٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ السَّفِيْهِ وَلَتَاْطُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ ـ

کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب حق عزّ وجلّ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کردیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسٰی بن مریم علیہما السّلام کی زبانی ان پر لعنت کی اور یہ اس لئے کہ انھوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بُری باتوں سے منع کرو اور چاہیئے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو و اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کردیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی اُمتوں پر لعنت ہوئی۔

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি গোনাহ করিত, তখন বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি তাহাকে ধমকাইত এবং বলিত যে, আল্লাহকে ভয় কর। কিন্তু পরের দিনই সে তাহার সহিত উঠাবসা ও খাওয়া–দাওয়া করিত যেন গতকাল তাহাকে গোনাহ করিতে দেখেই নাই। যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই আচরণ দেখিলেন তখন একের অন্তরকে অপরের সহিত মিলাইয়া দিলেন এবং তাহাদের নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)এর জবানে তাহাদের উপর লা'নত করিলেন। আর ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিয়াছে এবং সীমা লংঘন করিয়াছে। ঐ পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতের হাতে মুহাম্মদের জান! তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বেওকুফ ও মূর্খ লোকের হাত ধরিয়া হক কথার উপর তাহাকে বাধ্য কর। যদি এইরূপ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরগুলিকেও একে অপরের সহিত মিলাইয়া দিবেন। ফলে তোমাদের উপরও লা'নত বর্ষিত হইবে যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর লা'নত বর্ষিত হইয়াছে।

(٢) وفي سنن ابي داؤد وابن ماجة
عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ
يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ
عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ
إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا

حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی
جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے
اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی
تو اُن پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا
عذاب بھیج دیتے ہیں یعنی دنیا ہی میں
ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

(২) হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন দল বা কওমের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোনাহ করে এবং সেই কওম বা দলের লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বাধা প্রদান করে না ; তবে তাহাদের উপর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আজাব পাঠাইয়া দেন অর্থাৎ দুনিয়াতেই তাহাদিগকে বিভিন্ন ধরনের মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(٣) وروى الاصبهاني عن انسؓ
اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَ تَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ
وَالنِّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا
قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْاِسْتِخْفَافُ
بِحَقِّهَا قَالَ يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِيْ
اللهِ فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ۔ (ترغیب)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ
کلمہ لا الٰہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو
نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا
دُور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق
سے بے پروائی نہ برتی جائے صحابہؓ نے
عرض کیا اس کے حقوق کی بے پروائی کیا
ہے؟ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ
کی نافرمانی کھلے طور پر کی جاتے پھر نہ ان کا انکار کیا جاتے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جاتے۔

(৩) হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার পৌছাইতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব ও বালা–মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ সে উহার হক আদায় হইতে গাফেল ও উদাসীন না হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ

করিলেন, উহার হক আদায়ে উদাসীনতা কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী প্রকাশ্যে হইতে থাকা সত্ত্বেও উহাকে নিষেধ না করা এবং উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা না করা।

(৪) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَضَرَهُ
شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا
فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ
فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَ
اَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ مُرُوْا
بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلَا اُجِيْبَ لَكُمْ
وَتَسْاَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ
فَلَا اَنْصُرَكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى
نَزَلَ (ترغيب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف
لائے تو میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص
اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات
پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی
اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے
گئے میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ
کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں حضور اقدسؐ
منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد وثنا کے
بعد فرمایا ” لوگو! اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی
باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو
مبادا وہ وقت آجائے کہ تم دعا مانگو اور
میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ
سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں حضور اقدسؐ نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے
اور منبر سے اتر گئے۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার নূরানী চেহারার উপর এক বিশেষ আলামত দেখিয়া অনুভব করিলাম যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও সহিত কথা বলিলেন না এবং ওজু করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। আমি মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। যেন যাহা কিছু এরশাদ করেন শুনিতে পাই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং হামদ ও ছানার পর ফরমাইলেন ঃ 'হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ তোমরা

সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ কর নতুবা ঐ সময় আসিয়া পড়িবে যে, তোমরা দোয়া করিবে আর আমি উহা কবুল করিব না, আর তোমরা আমার নিকট সওয়াল করিবে আর আমি উহা পূরণ করিব না আর তোমরা আমার নিকট সাহায্য চাহিবে আমি তোমাদের সাহায্য করিব না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই কয়টি কথা বলিলেন এবং মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন।

(৫) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِیَ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْیِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِیْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ.
(كذا فى الدر عن الحكيم الترمذى)

حضرت ابو ہریرہ رضـ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری اُمّت دنیا کو قابلِ وقعت وعظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت وہیبت اُن کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سبّ وشتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جلّ شانُہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় ও মর্যাদার উপযুক্ত মনে করিতে লাগিবে তখন ইসলামের বড়ত্ব ও মর্যাদা তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন পরস্পর একে অপরকে গালিগালাজ শুরু করিবে তখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহের উপর চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও গজবের কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী যখন এই কাজ ছাড়িয়া দিবে তখন তাহাদিগকে কঠিন মুসীবত, দুঃখ-যাতনা, অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে লিপ্ত করা হইবে এবং সর্বপ্রকার গায়েবী মদদ ও সাহায্য হইতে মাহরূম হইয়া যাইবে। আর এই সবকিছু এইজন্য হইবে যে, তাহারা

নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে চিনিতে পারে নাই এবং যে কাজ পুরা করা তাহাদের জিম্মাদারী ছিল সেই ব্যাপারে তাহারা গাফেল রহিয়াছে। এই কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়াকে দুর্বল ও নিস্তেজ ঈমানের আলামত বলিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ
فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ۔ (مسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে তবে সে যেন নিজের হাত দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহার শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহারও শক্তি না রাখে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, আর উহার এই শেষ অবস্থাটি ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর।

সুতরাং শেষ অবস্থাটি যেমন ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর হইল তেমনি প্রথম অবস্থাটি পূর্ণ দাওয়াত ও পূর্ণ ঈমানের স্তর হইল।

ইহা হইতে আরো স্পষ্ট হাদীস হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

مَا مِنْ نَّبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَّقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (مسلم)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নীতি এই যে, প্রত্যেক নবী আপন সঙ্গী ও যোগ্য অনুসারীদের এক জামাত রাখিয়া যান। এই জামাত নবীর সুন্নতকে কায়েম রাখে, এবং যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করে, অর্থাৎ শরীয়তে ইলাহীকে নবী যে অবস্থায় এবং যেরূপে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে অবিকল হেফাজত করে এবং উহাতে সামান্যতমও পরিবর্তন আসিতে দেয় না। কিন্তু উহার পর খারাবী ও ফেতনা-ফাসাদের যমানা আসে এবং এমন লোক পয়দা হয় যাহারা নবীর তরীকা ও আদর্শ হইতে সরিয়া যায়।

তাহাদের কার্যকলাপ তাহাদের দাবীর বিপরীত হয়, তাহারা এমন সব কাজ করিয়া থাকে যাহা শরীয়তে হুকুম করা হয় নাই, সুতরাং এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হক ও সুন্নতকে কায়েম করার লক্ষ্যে নিজের হাতের দ্বারা কাজ নিল সে মুমিন, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারিল না কিন্তু জবানের দ্বারা কাজ নিল সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি ইহাও করিতে পারিল না কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস ও নিয়তের মজবুতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিল সেও মুমিন ; কিন্তু এই শেষ স্তরের পর ঈমানের আর কোন স্তর নাই—এখানেই ঈমানের সীমানা শেষ হইয়া যায়। এমনকি ইহার পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকিতে পারে না।

এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ইমাম গায্যালী (রহঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ দ্বীনের এমন একটি শক্তিশালী স্তম্ভ, যাহার সহিত দ্বীনের সমস্ত কাজ সম্পর্কযুক্ত। এই কাজকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। খোদা না করুন যদি এই কাজকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ইহার এলেম ও আমলকে পরিত্যাগ করা হয় তবে নাউযুবিল্লাহ নবুওত বেকার সাব্যস্ত হইবে, সততা যাহা মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া যাইবে, অলসতা ব্যাপক হইয়া যাইবে, গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রশস্ত রাস্তাসমূহ খুলিয়া যাইবে, সারা দুনিয়া অজ্ঞতায় ডুবিয়া যাইবে, সমস্ত কাজ-কর্মে খারাবী আসিয়া যাইবে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ শুরু হইয়া যাইবে, সমাজ খারাপ হইয়া যাইবে, মখলুক ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস ও বরবাদী তখন বুঝে আসিবে যখন হাশরের দিন খোদায়ে পাকের সামনে হাজির হইতে হইবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

আফসোস, শত আফসোস যে আশংকা ছিল, উহাই সামনে আসিয়া গেল, আর মনে যে খটকা ছিল উহাই চোখে দেখিতে হইল—আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সেই সতেজ স্তম্ভের (দাওয়াতের) এলেম ও আমলের নিদর্শনসমূহ মিটিয়া গিয়াছে, উহার হাকীকত ও জাহেরী আমলের বরকতসমূহ খতম হইয়া গিয়াছে। অন্তরে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণা জমিয়া গিয়াছে, আল্লাহর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নফসের খাহেশাতের অনুসরণে মানুষ জীবজন্তুর মত নির্ভীক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জমিনের বুকে এইরূপ সত্যবাদী মুমিন পাওয়া শুধু কঠিন ও

দুর্লভই নহে বরং বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি হক ও সত্য প্রকাশের কারণে কাহারো তিরস্কার সহ্য করিবেন।

যদি কোন সাহসী মুমিন বান্দা এই ধ্বংস ও বরবাদীকে দূর করার এবং এই সুন্নতকে জিন্দা করার চেষ্টা করে, এই মোবারক দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং এই সুন্নতকে জিন্দা করার লক্ষ্যে হাতা গুটাইয়া ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে সকল মখলুকের মধ্যে এক বিশিষ্ট মর্যাদা ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইবে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে ভাষায় এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের সতর্ক ও সজাগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপারে আমাদের উদাসীন হওয়ার কয়েকটি কারণ বুঝে আসে।

প্রথম কারণ ঃ আমরা এই দায়িত্বকে ওলামায়ে কেরামের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি অথচ এই সম্পর্কিত কুরআনের সম্বোধনসমূহ ব্যাপক যাহা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রহঃ)দের জীবনী ইহার যথার্থ প্রমাণ।

তবলীগের দায়িত্ব এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধকে আলেমদের সহিত খাছ করিয়া নেওয়া অতঃপর তাহাদের উপর ভরসা করিয়া এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মারাত্মক অজ্ঞতা ও বোকামী। ওলামায়ে কেরামের কাজ হইল সত্যপথ বাতলাইয়া দেওয়া এবং সরল পথ দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করাইয়া নেওয়া এবং মানুষকে ঐ পথে চালানোর দায়িত্ব অন্যদের কাজ। যেমন নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে—

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ
عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ
عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهٖ
وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ
مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى

بیشک تم سب کے سب نگہبان ہو اور
تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال
کئے جاؤ گے پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان
ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال
کیا جاوے گا اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان
ہے اور اس سے اُن کے بارے میں سوال
کیا جاوے گا اور عورت اپنے خاوند کے

مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ۔ (بخاری ومسلم)

گھر اور اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیّت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং তোমরা সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে। সুতরাং বাদশাহ জনগণের উপর জিম্মাদার—সে নিজ প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে। গৃহকর্তা তাহার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে জিম্মাদার—তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর ঘর ও সন্তান-সন্ততির জিম্মাদার—এই সবের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। গোলাম তাহার মনিবের সম্পদের জিম্মাদার—সে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। অতএব, তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

উপরোক্ত বিষয়টিকে আরেক হাদীসে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ (مسلم)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ (صحابہ رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا کس کے لئے۔ فرمایا اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দ্বীন হইলই হিত কামনা। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কাহার জন্য? ফরমাইলেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম তথা আমীর ও অনুসরণীয়দের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

যদি তর্কের খাতিরে মানিয়াও লওয়া হয় যে, ইহা ওলামায়ে কেরামেরই কাজ, তবুও বর্তমান সময়ের চাহিদা ইহাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই কাজে লাগিয়া যাইবে এবং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের হেফাজতের জন্য কোমর বাঁধিয়া লইবে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ আমরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি আমরা

আমাদের ঈমানের উপর মজবুত থাকি তবে অন্যের গোমরাহী আমাদের জন্য কোন ক্ষতিকারক হইবে না। যেমন কুরআন শরীফে আসিয়াছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (مائده۔ ع ۱۴)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (بیان القرآن)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিজেদের চিন্তা কর, যখন তোমরা সঠিক পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট তাহার কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। (মায়েদা ঃ আয়াত-১০৪)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অর্থ ইহা নহে যাহা বাহ্যতঃ বুঝা যাইতেছে। কেননা এইরূপ অর্থ আল্লাহ পাকের হেকমত ও শরীয়তের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। ইসলামী শরীয়ত সম্মিলিত জিন্দেগী। সম্মিলিত এসলাহ ও সম্মিলিত উন্নতিকে মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মতকে এক দেহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে যে, এক অঙ্গ ব্যথিত হইলে উহার কারণে সমস্ত দেহ অস্থির হইয়া যায়।

আসল কথা হইল, মানবজাতি যতই উন্নতি করুক এবং উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া যাক তাহাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই থাকিবে যাহারা পথ ছাড়িয়া গোমরাহীতে লিপ্ত হইবে। অতএব, উক্ত আয়াতে মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, যখন তোমরা হেদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তখন ঐ সকল লোকদের কারণে তোমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই যাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

অধিকন্তু প্রকৃত হেদায়াত তো ইহাই যে, মানুষ শরীয়তে মুহাম্মদীকে উহার সমস্ত হুকুম-আহকাম সহকারে কবুল করিবে। আর আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহের মধ্য হইতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও একটি হুকুম।

আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর এই এরশাদের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন—

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رض قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت یاأیہا،

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ
فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ
اِذَا رَاَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ
اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهٖ۔

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ
مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ پیش کرتے ہو
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ
خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں
تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان
لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرمادے۔

অর্থ ঃ হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পেশ করিতেছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাইতে শুনিয়াছি, যখন মানুষ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখে এবং উহা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তখন অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে স্বীয় আজাবে লিপ্ত করিবেন।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণও উক্ত আয়াতের অর্থ ইহাই করিয়াছেন। ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলিতেছেন যে, এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরামগণের সহীহ অভিমত এই যে, যখন তোমরা ঐ কাজকে পুরা করিবে যাহার প্রতি তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এখন অন্যের অপরাধ তোমাদের কোন ক্ষতি করিবে না—যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

(অর্থাৎ—কেহ অপরের বোঝা বহন করিবে না।) অতএব আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার যেহেতু আল্লাহর আদেশ করা হুকুমসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত হুকুম পুরা করিল কিন্তু নসীহত শ্রবণকারী ইহার উপর আমল করিল না—এমতাবস্থায় উপদেশদাতার উপর আল্লাহর কোন অসন্তুষ্টি নাই। কারণ সে তাহার ওয়াজিব কর্তব্য অর্থাৎ আমর–বিল মারুফ ও নাহী আনিল–মুনকার আদায় করিয়াছে ; অন্যের কবূল তাহার জিম্মায় নহে।

তৃতীয় কারণ এই যে, সাধারণ ও খাছ লোক, আলেম ও জাহেল প্রত্যেকেই এসলাহ ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এখন মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব ও কঠিন ব্যাপার। যখন কাহারও সম্মুখে উম্মতের কোন

সংশোধনমূলক কর্মসূচী পেশ করা হয় তখন ইহাই জবাব পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের তরক্কী এখন কি করিয়া সম্ভব, যখন তাহাদের নিকট না আছে রাজত্ব ও বাদশাহী, না আছে মাল-দৌলত, না আছে যুদ্ধের সরঞ্জাম, না আছে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি, না আছে বাহুবল, না আছে পরস্পর ঐক্য ও একতা।

বিশেষ করিয়া দ্বীনদার শ্রেণী তো নিজেদের ধারণা মোতাবেক ইহা ফয়সালা করিয়া লইয়াছে যে, এখন চতুর্দশ শতাব্দী ; নবুওয়তের জমানা হইতে বহু দূরে, এখন মুসলমানদের অবনতি একটি অনিবার্য বিষয়। অতএব উহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক ও বেকার।

এই কথা সত্য যে, নবুওয়তের যুগ হইতে যত বেশী দূরত্ব হইবে প্রকৃত ইসলামের আলো ততই ম্লান হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনো এই নহে যে, শরীয়তকে টিকাইয়া রাখা ও দ্বীনে মোহাম্মদীর হেফাজতের জন্য কোনরূপ চেষ্টা ও মেহনত করিতে হইবে না। কেননা যদি ইহাই হইত এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও খোদা না করুন যদি ইহাই বুঝিয়া লইতেন, তবে আজ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছিবার কোন পথ ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতি যখন বিপরীতমুখী তখন সময়ের গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বেশী হিম্মত ও মজবুতীর সহিত এই কাজকে লইয়া খাড়া হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, যে দ্বীনের ভিত্তি একমাত্র আমল ও মেহনতের উপর ছিল আজ উহার অনুসারীগণ আমল হইতে একেবারে খালি। অথচ কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন জায়গায় আমল ও মেহনতের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, একজন এবাদতকারী যে সারারাত্রি নফলে মগ্ন থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকিরে মশগুল থাকে সে কখনো ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে না, যে অন্যের সংশোধন ও হেদায়াতের ফিকিরে অস্থির থাকে।

কুরআনে করীম বিভিন্ন জায়গায় 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তাকীদ করিয়াছে এবং মোজাহেদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বকে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ
اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے
گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ
کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد
کریں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ

عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (نساء، ع ١٣)

بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر بیٹھنے والوں کے۔ اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجرِ عظیم دیا ہے یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت، رحمت والے ہیں۔

অর্থ ঃ যে সকল মুসলমান কোনরকম অসুবিধা ছাড়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছে, আর যাহারা নিজেদের জানমাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করিতেছে—এই উভয় দল কখনো সমান হইতে পারে না। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোককে অনেক মর্যাদাশীল করিয়াছেন, যাহারা জান-মাল দিয়া জিহাদ করে এবং সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা অতি উত্তম বাসস্থানের ওয়াদা করিয়াছেন। জিহাদকারীদেরকে ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় অনেক বড় পুরস্কার দান করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা অনেক উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত হাসিল করিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (নিসা, আয়াত-৯৫, ৯৬)

যদিও উপরোক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোকে বুঝানো হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং কুফর ও শিরক পরাজিত হয় ; কিন্তু যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা সেই মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তথাপি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া আমাদের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা ও মেহনত সম্ভব উহাতে কখনই কমি করা চাই না। আমাদের এই মামুলী চেষ্টা ও মেহনত আমাদিগকে ধীরে ধীরে আগে বাড়াইয়া দিবে।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ ঃ যাহারা আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা ও মেহনত করে আমি তাহাদের জন্য আমার পথসমূহ খুলিয়া দেই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে মোহাম্মদীকে টিকাইয়া রাখার ও হেফাজতের ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বীনের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য আমাদের আমল ও চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের খাতিরে যে পরিমাণ

অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন সেই পরিমাণ সুফলও তাহারা দেখিয়াছেন এবং গায়েবী মদদ দ্বারা তাহারা সম্মানিত হইয়াছেন। আমরাও তাহাদের নাম লইয়া থাকি—এখনো যদি আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও দ্বীনকে প্রচার করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই, তবে নিঃসন্দেহে আমরাও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও গায়েবী মদদ দ্বারা সম্মানিত হইব।

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া যাও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখিবেন।

চতুর্থ কারণ এই যে, আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেরাই যখন সঠিকভাবে আমল করি না এবং এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের উপযুক্তও নহি, কাজেই অন্যদেরকে কোন্ মুখে আমরা নসীহত করিব। এরূপ মনে করা নফসের প্রকাশ্য ধোকা। যখন একটি কাজ করিতে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমাদের প্রতি উহা করার হুকুম করা হইয়াছে তখন আমাদের জন্য এই ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া কাজ শুরু করিয়া দেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ এই চেষ্টা ও মেহনতই আমাদের পরিপক্কতা, মজবুতী ও দৃঢ়তার কারণ হইবে। এইভাবে করিতে করিতে একদিন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য নসীব হইবে। ইহা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাজে চেষ্টা ও মেহনত করিব আর তিনি রহমান ও রহীম আমাদের দিকে রহমতের নজর করিবেন না। নিম্নের হাদীস শরীফে আমার কথার প্রতি সমর্থন রহিয়াছে—

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتّٰى نَعْمَلَ بِهِ كُلِّهِ وَلَا نَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ - (رواه الطبراني في الصغير الاوسط)

حضرت انس رض سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں، حضور اقدس ص نے ارشاد فرمایا. نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সৎকাজ নিজেরা পুরাপুরি পালন না করা পর্যন্ত সৎকাজের আদেশ করিব না এবং অন্যায় কাজ হইতে নিজেরা পুরাপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইরূপ নহে ; বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে যদিও নিজেরা সকল প্রকার সৎকাজের পাবন্দী না করিতে পার এবং মন্দকাজে অন্যদেরকে বাধা প্রদান করিবে যদিও নিজেরা মন্দকাজ হইতে পুরাপুরি বাঁচিতে না পার।

পঞ্চম কারণ এই যে, আমরা মনে করিতেছি যে, বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি মাদ্রাসা কায়েম হওয়া, ওলামায়ে কেরামগণের ওয়াজ–নসীহত, খানকাসমূহ আবাদ হওয়া, দ্বীনী কিতাবসমূহ লেখা, বিভিন্ন দ্বীনী পত্র–পত্রিকা প্রকাশ—এইসব কাজ আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের শাখাসমূহ। এইগুলি দ্বারা উক্ত দায়িত্ব আদায় হইতেছে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম থাকা ও টিকিয়া থাকা একান্ত জরুরী ; এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, দ্বীনের কমবেশী ঝলক যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা এইসব প্রতিষ্ঠানের বদৌলতেই দেখা যাইতেছে। তবুও গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এইসব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নহে এবং এইগুলিকে যথেষ্ট মনে করা আমাদের প্রকাশ্য ভুল। কেননা, এইসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমরা তখনই উপকৃত হইতে পারিব যখন আমাদের অন্তরে দ্বীনের শওক ও তলব থাকিবে এবং দ্বীনের প্রতি আমাদের ভক্তি ও আজমত থাকিবে। আজ হইতে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি শওক ও তলব ছিল। তখন ঈমানের ঝলক দেখা যাইত। এইজন্য এইসব প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজ অমুসলিম জাতিসমূহের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের ইসলামী জযবাকে একেবারে শেষ করিয়া দিয়াছে। তলব ও আগ্রহের পরিবর্তে আজ আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা দেখা যাইতেছে। এহেন অবস্থায় আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, আমরা সুনির্দিষ্ট কোন মেহনত আরম্ভ করি। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের সহিত সম্পর্ক, শওক ও আগ্রহ পয়দা হয় এবং তাহাদের ঘুমন্ত জযবা পুনরায় জাগিয়া উঠে। তখন আমরা ঐ সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দ্বারা উহার শান অনুযায়ী উপকৃত হইতে পারিব। অন্যথায় এইভাবে যদি দ্বীনের প্রতি

অনিহা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা ঐগুলি টিকাইয়া রাখাও মুশকিল নজরে আসিতেছে।

ষষ্ঠ কারণ এই যে, আমরা যখন দ্বীনের দাওয়াত লইয়া অন্যদের নিকট যাই, তখন তাহারা দুর্ব্যবহার করে, কঠোর ভাষায় জবাব দেয় এবং আমাদের সহিত অপমানকর আচরণ করে।

কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই কাজ আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্ব এবং এইরূপ কষ্ট ও মুসীবতে পতিত হওয়া এই কাজের বৈশিষ্ট্য আর আম্বিয়ায়ে কেরাম এই রাস্তায় অনেক গুণ বেশী দুঃখ–কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ (حجر ع ١)

ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে আগেকার লোকদের মধ্যে পয়গাম্বর প্রেরণ করিয়াছি এবং এমন কোন রসূল তাহাদের নিকট আসে নাই যাহার সহিত তাহারা বিদ্রূপ করে নাই। (হিজ্‌র, আয়াত–১০, ১১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ‘হকের দাওয়াতের রাস্তায় আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে অন্য কোন নবীকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই।’

সুতরাং উভয় জাহানের সরদার এবং আমাদের মনিব যখন এই সমস্ত মুসীবত ও কষ্ট ধৈর্যসহকারে বরদাশত করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুসারী, তাঁহারই কাজ লইয়া দাঁড়াইয়াছি, আমাদেরও এই সকল মুসীবতের কারণে পেরেশান হওয়া চাই না এবং ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করা উচিত।

উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনা হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের আসল রোগ হইল, আমাদের দ্বীনের রূহ ও হাকিকী ঈমান দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আমাদের দ্বীনী জযবা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের ঈমানী শক্তি খতম হইয়া গিয়াছে। আসল ঈমানের মধ্যেই যখন অবনতি আসিয়া গিয়াছে তখন উহার সহিত যত গুণাবলী ও কল্যাণ সম্পর্কযুক্ত ছিল সেইগুলির অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং জরুরী ছিল। এই

দুর্বলতা ও অবনতির কারণ হইল ঐ আসল বস্তুকে ছাড়িয়া দেওয়া, যাহার উপর সম্পূর্ণ দ্বীনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আর উহা হইল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। আর এ কথা সত্য যে, কোন জাতি ঐ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত জাতির ব্যক্তিবর্গ সৎগুণে গুণান্বিত না হয়।

সুতরাং আমাদের রোগের চিকিৎসা ইহাই যে, আমরা তবলীগের দায়িত্ব লইয়া এমনভাবে দাঁড়াই যাহাতে আমাদের ঈমানী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইসলামী জয্বা জাগিয়া উঠে, আমরা খোদা ও রাসূলকে চিনিতে পারি এবং খোদায়ী হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিতে পারি। আর ইহার জন্য আমাদিগকে ঐ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে যে পন্থা সাইয়্যিদুল আম্বিয়া হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরিকদের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

بے شک تمھارے لئے رسول اللہ میں اچھی پیروی ہے۔

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে। (আহ্যাব, আয়াত–২১)

এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ

لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا

অর্থ ঃ এই উম্মতে–মুহাম্মদিয়ার শেষের দিকে যে সমস্ত লোক আসিবে তাহাদের সংশোধন ঐ পর্যন্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত তাহারা প্রথম যুগের সংশোধনের পন্থা গ্রহণ না করিবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের দাওয়াত লইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি একা ছিলেন, তাঁহার কোন সাথী ও সমর্থনকারী ছিল না। দুনিয়াবী কোন শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার কওমের লোকদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চরমে পৌছিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হক কথা শুনা এবং মানার জন্য কেহই তৈয়ার ছিল না। বিশেষতঃ যে কালেমায়ে হকের তবলীগ করার জন্য তিনি খাড়া হইয়াছিলেন সমস্ত কওমের অন্তর উহার প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণা ছিল। এহেন অবস্থায় এমন কোন্ শক্তি ছিল যাহার বদৌলতে একজন সহায় সম্বলহীন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন মানুষ কওমের সকলকে নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। এখন চিন্তা করুন—উহা কি জিনিস ছিল যাহার প্রতি

তিনি মখলুককে আহবান করিলেন। আর যে ব্যক্তি ঐ জিনিসকে পাইয়া গেল সে চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া রহিল। সমগ্র দুনিয়াবাসী জানে যে, উহা শুধুমাত্র একটি ছবক ছিল, যাহা তাঁহার মূল লক্ষ্যবস্তু ও উদ্দেশ্য ছিল যাহা তিনি মানুষের সামনে পেশ করিলেন—

اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط (آلِ عمران ع ٧)

بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

অর্থ ঃ আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত না করি, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রব সাব্যস্ত না করে।

(আলি ইমরান, আয়াত-৬৪)

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর এবাদত এবং আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এক আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি কর্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা হইতে সরিয়া অন্যমুখী হইবে না—

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط (اعراف ع ١)

تم لوگ اس کا اِتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اِتباع مت کرو۔

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে, তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও অনুসরণ করিও না। (আ'রাফ, আয়াত-৩)

ইহাই ছিল ঐ আসল তালীম যাহার প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁহাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ

اے محمد! بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے اور ان

هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○ (نحل۔ ع ۱٦)

کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو، بیشک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি লোকদিগকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন হেকমত ও উত্তম উপদেশের সহিত এবং তাহাদের সহিত উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব্ ঐ ব্যক্তিকে ভালভাবে জানেন, যে তাহার রাস্তা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনিই ভালভাবে জানেন যাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে। (নাহ্ল, আয়াত–১২৫)

আর ইহাই ছিল ঐ রাজপথ যাহা তাঁহার জন্য এবং তাঁহার অনুসারীদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছিল—

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ط وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (یوسف۔ ع ۱۲)

کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

অর্থ ঃ বলিয়া দিন, ইহাই আমার পথ, আহবান করি আল্লাহর দিকে জানিয়া বুঝিয়া, আমি এবং আমার যত অনুসারী রহিয়াছে তাহারাও। আর আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(ইউসুফ, আয়াত–১০৮)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (حم سجدہ۔ ع ۴)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

অর্থ ঃ সেই ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হা–মীম সিজদা, আয়াত–৩৩)

সুতরাং আল্লাহ পাকের দিকে তাঁহার মখলুককে ডাকা, পথহারাদিগকে সঠিক পথ দেখানো এবং গোমরাহদিগকে হেদায়াতের রাস্তা দেখানো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উদ্দেশ্য ও

প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ ও উহার মূলে পানি সিঞ্চনের জন্য হাজার হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে—

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
فَاعْبُدُوْنِ ۝ (الانبياء-ع٢)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول
مگر اس کی جانب یہی وحی بھیجتے تھے کہ کوئی
معبود نہیں بجز میرے، پس میری بندگی کرو۔

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহার প্রতি এই ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। (আম্বিয়া, আয়াত-২৫)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনের প্রতিটি পুণ্যময় মুহূর্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর উহা হইল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহুর যাত ও ছিফাতের উপর একীন করা। ইহাই হইল ঈমান ও ইসলামের মূলকথা। আর এইজন্যই মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

অর্থ ঃ আমি জ্বিন ও ইনছানকে শুধুমাত্র এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা বান্দা হইয়া জীবন যাপন করে। (যারিয়াত, আয়াত-৫৬)

এখন যেহেতু জীবনের মাকসাদ স্পষ্ট হইয়া গেল এবং আসল রোগ ও উহার চিকিৎসার তরীকা জানা হইয়া গেল, কাজেই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিতে এখন আর কোন অসুবিধা হইবে না এবং এই লক্ষ্যে চিকিৎসার যে কোন তরীকাই গ্রহণ করা হইবে—ইনশাআল্লাহ উপকারী ও ফলদায়ক হইবে।

আমরা আমাদের দুর্বল জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মুসলমানদের কামিয়াবী ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি কর্ম পদ্ধতি ঠিক করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে যাহাকে ইসলামী জিন্দেগী অথবা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জিন্দেগীর নমুনা বলা যাইতে পারে। যাহার সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের খেদমতে পেশ করা হইল ঃ—

সর্বপ্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, প্রতিটি মুসলমান সর্বপ্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর কালেমা

বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার প্রসার ও খোদায়ী হুকুম–আহকামের প্রচলন ও উহাকে শক্তিশালী করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে এবং এই কথার দৃঢ় ওয়াদা করিবে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুম মান্য করিব এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবার চেষ্টা করিব। কখনই আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিব না। অতঃপর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলির উপর আমল করিবে ঃ

(১) কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঠিক উচ্চারণের সহিত মুখস্থ করা। উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝা ও অন্তরে গাঁথিয়া নেওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের পুরা জীবনকে তদনুযায়ী গড়িয়া তোলার ফিকির করা।

(২) নামাযের পাবন্দী করা এবং নামাযের আদব ও শর্তসমূহের প্রতি খেয়াল রাখিয়া খুশু–খুযুর সহিত নামায আদায় করা। নামাযের প্রতিটি রোকন আদায়ের সময় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতার ধ্যান করা। মোটকথা, সর্বদা এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকা যেন নামায এমনভাবে আদায় হয়—যাহা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে পেশ হওয়ার উপযুক্ত হয়। এইরূপ নামাযের চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর দরবারে তওফীক চাহিবে। যদি নামাযের নিয়ম জানা না থাকে তবে উহা শিখিবে এবং নামাযে যাহা কিছু পড়া হয় তাহা মুখস্থ করিবে।

(৩) কুরআনে করীমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আন্তরিক মহব্বত পয়দা করিতে হইবে, যাহার দুইটি তরীকা রহিয়াছে ঃ

(ক) রোজানা কিছু সময় আদব ও এহতেরামের সহিত অর্থের প্রতি ধ্যান করিয়া তেলাওয়াত করা। আলেম না হইলে এবং অর্থ বুঝিতে না পারিলে অর্থ বুঝা ছাড়াই তেলাওয়াত করিবে এবং মনে করিবে যে, আমার কামিয়াবী ও উন্নতি ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু শব্দ তেলাওয়াতও বড় সৌভাগ্য ও খায়ের–বরকতের কারণ। আর শব্দও যদি তেলাওয়াত করিতে না পারে তবে রোজানা কিছু সময় কুরআন শিক্ষার কাজে ব্যয় করা।

(খ) নিজের আওলাদ এবং মহল্লা ও এলাকার ছেলেমেয়েদের কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ফিকির করা এবং সকল ক্ষেত্রে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৪) কিছু সময় আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরে–ফিকিরে অতিবাহিত করা। ওজীফা হিসাবে কিছু পাঠ করার জন্য সুন্নতের অনুসারী তরীকতের কোন

শায়খের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। তা না হইলে ছুওম কালেমা অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হাম্‌দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল-আজীম, দরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়িবে। অর্থের প্রতি খেয়াল রাখিয়া ও দিল লাগাইয়া প্রত্যেকটি রোজানা সকাল-সন্ধ্যা এক তসবীহ (১০০ বার) করিয়া পাঠ করিবে। হাদীস শরীফে এই তসবীহ পাঠের বিরাট ফযীলত আসিয়াছে।

(৫) প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করা। তাহার সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির আচরণ করা। মুসলমান হওয়ার কারণে তাহার আদব ও সম্মান করা। কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টের কারণ হইতে পারে এমন কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পাবন্দি সহকারে নিজে পালন করিবে এবং প্রত্যেক মুসলমান ভাইও যেন উহা পালন করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করিবে। আর ইহার পন্থা হইল এই যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজেও কিছু সময় ফারেগ করিবে অন্যদেরকেও তরগীব দিয়া দ্বীনের খেদমত ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তৈয়ার করিবে।

যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস-সালাম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিভিন্ন রকম মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই কাজে নিজেদের জীবন ব্যয় করিয়াছেন এবং উহার জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান কুরবান করিয়াছেন, সেই দ্বীনের প্রচার ও হেফাজতের জন্য কিছু সময় বাহির না করা বড় দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির কারণ। আর ইহাই সেই মহান দায়িত্ব যাহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে আজ আমরা ধ্বংস ও বরবাদ হইতেছি।

আগেকার দিনে মুসলমান হওয়ার অর্থ ইহা বুঝা হইত যে, নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য কুরবান করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি এই কাজে গাফলতি করিত তাহাকে বড় নাদান মনে করা হইত। কিন্তু আফসোস যে, আজ আমরা মুসলমান হিসাবে পরিচিত এবং চোখের সামনে দ্বীনের কাজ মিটিতেছে দেখিতেছি, তবুও সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও হেফাজতের জন্য চেষ্টা করা হইতে দূরে সরিয়া থাকি। মোটকথা, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যাহা মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও আসল কাজ ছিল এবং যাহার সহিত আমাদের উভয় জাহানের কামিয়াবী

ও উন্নতি জড়িত ছিল এবং যাহা ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা লাঞ্ছিত ও বেইজ্জত হইতেছি ; এখন পুনরায় আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ কাজকে আমাদের জীবনের অঙ্গ ও আসল কাজ বানানো উচিত। যাহাতে আল্লাহর রহমত পুনরায় জোশে আসিয়া যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও সুখ নসীব হয়। ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম বাদ দিয়া শুধু এই কাজেই লাগিয়া যাইবে। বরং উদ্দেশ্য হইল, দুনিয়ার অন্যান্য জরুরত যেমন মানুষের সাথে লাগিয়াই থাকে এবং সেইগুলিকে পুরা করা হয়, তেমনি এই কাজকেও জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া ইহার জন্য সময় বাহির করা হয়। কিছু লোক যখন এই কাজের জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা নিজ মহল্লায়, মাসে তিন দিন আশ-পাশ এলাকায়, বছরে এক চিল্লা দূরবর্তী এলাকায় এই কাজ করিবে এবং চেষ্টা করিবে—ধনী হউক বা গরীব, ব্যবসায়ী হউক বা চাকুরীজীবী, জমিদার হউক বা কৃষক, আলেম হউক বা গায়ের আলেম প্রত্যেক মুসলমান যেন এই কাজে শরীক হইয়া যায় এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করিয়া চলে।

কাজ করার তরীকা ঃ কমপক্ষে দশজনের জামাত তাবলীগের জন্য বাহির হইবে। সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইবে। অতঃপর সকলেই মসজিদে জমা হইবে এবং ওজু করিয়া দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে (যদি মকরূহ ওয়াক্ত না হয়)। নামাযের পর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিবে। আল্লাহ তায়ালার মদদ, নুসরত এবং কামিয়াবী ও তওফীক চাহিবে। নিজেদের মজবুতি ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করিবে। দোয়ার পর ধীরস্থির ও শান্তভাবে যিকির করিতে করিতে রওনা হইবে এবং কোনরূপ বেহুদা কথা বলিবে না। যেখানে তবলীগ করিতে হইবে সেইখানে পৌছিয়া সকলে মিলিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং পুরা মহল্লায় বা গ্রামে গাশ্‌ত করিয়া লোকদেরকে জমা করিবে। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে নামায পড়াইবে অতঃপর উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি পাবন্দি সহকারে পালন করার ওয়াদা লইবে এবং এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার জন্য তৈয়ার করিবে। আর এই সকল লোকের সহিত তাহাদের বাড়ীর দরওয়াজায় পৌছিয়া স্ত্রীলোকদেরকেও নামায পড়াইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এই বিষয়গুলি পালন করার জন্য তাকীদ করিবে।

যেই সকল লোক এই কাজ করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তাহাদের একটি জামাত বানাইয়া দিবে এবং তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে

আমীর বানাইয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা কাজ শুরু করাইয়া দিবে এবং তাহাদের কাজের দেখাশুনা করিবে। তবলীগ করনেওয়ালা প্রত্যেক ব্যক্তি আমীরকে মানিয়া চলিবে আর আমীরের উচিত সাথীদের খেদমত করা, আরাম পৌঁছানো, হিম্মত বাড়ানো এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন ক্রটি না করা এবং যে সব কাজে পরামর্শ দরকার সেই সব কাজে সকলের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া সেই অনুযায়ী আমল করা।

তবলীগের আদব

এই কাজ আল্লাহ তায়ালার এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এবং সকল নবীদের প্রতিনিধিত্ব। বস্তুতঃ কাজ যত বড় হয় সেই অনুপাতে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য অন্যকে হেদায়াত করা নহে বরং নিজের সংশোধন ও দাসত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করা ও তাঁহার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিল করা। অতএব, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়া উহার উপর আমল করা চাই ঃ

(১) নিজের সমস্ত খরচ যথা খানা-পিনা, ভাড়া ইত্যাদি যথাসম্ভব নিজে বহন করিবে। আর সম্ভব হইলে গরীব সাথীদের উপরও খরচ করিবে।

(২) নিজের সাথীদের এবং এই পবিত্র কাজ যাহারা করিতেছে তাহাদের খেদমত ও সহযোগিতাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করিবে এবং তাহাদের আদব ও সম্মান করিতে ক্রটি করিবে না।

(৩) সাধারণ মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত আচরণ করিবে। নম্রতা ও খোশামোদের সহিত কথাবার্তা বলিবে। কোন মুসলমানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে না। বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরামকে ইজ্জত ও সম্মান করিতে কমি করিবে না। আমাদের উপর কুরআন ও হাদীসের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরাম যেমন জরুরী, তেমনি সেই সকল পবিত্র ব্যক্তিদের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরামও আমাদের উপর জরুরী, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আপন সর্বোচ্চ নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। হক্কানী ওলামায়ে কেরামকে অসম্মান ও হেয় করা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনকে হেয় করার সমতুল্য। যাহা আল্লাহ তায়ালার নারাজী ও গজবের কারণ হয়।

(৪) অবসর সময়গুলিকে মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া-ফাসাদ, খেল-তামাশা

ইত্যাদি মন্দ কাজে ব্যয় না করিয়া দ্বীনি কিতাবাদি পাঠে এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতে বসিয়া কাটাইবে; ইহাতে আল্লাহ ও রাসূলের কথা জানা হইবে। বিশেষ করিয়া তবলীগের দিনগুলিতে বেহুদা কথা ও কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অবসর সময়গুলিকে আল্লাহর স্মরণ, যিকির-ফিকির, দরূদ-এস্তেগফার এবং নিজে শিখা ও অন্যকে শিখানোর কাজে ব্যয় করিবে।

(৫) জায়েয তরীকায় হালাল রুজি কামাই করিবে এবং মিতব্যয়িতার সহিত তাহা খরচ করিবে। পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শরীয়তসম্মত হক আদায় করিবে।

(৬) মতবিরোধপূর্ণ কোন মাসআলা এবং খুটিনাটি কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইবে না বরং আসল তওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং দ্বীনের আরকান তথা ফরজ বিষয়সমূহের তবলীগ করিবে।

(৭) নিজের সমস্ত কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম এখলাসের সহিত করিবে। কেননা খাঁটি নিয়ত ও এখলাসের সহিত সামান্য আমলও খায়র-বরকত ও সুফলের কারণ হয়। আর এখলাস ব্যতীত আমল না দুনিয়াতে কোন উপকারে আসে, না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে। কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলসমূহের মধ্যে শুধু ঐ আমলকে কবুল করিয়া থাকেন যাহা খালেছভাবে তাঁহার জন্যই করা হইয়াছে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং তোমাদের মাল-দৌলত দেখেন না বরং তোমাদের দিল এবং তোমাদের আমলকে দেখেন। কাজেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল জিনিস হইল এই কাজকে এখলাসের সাথে করা। রিয়া ও লোকদেখানো মনোভাব যেন ইহাতে না থাকে। যে পরিমাণ এখলাস থাকিবে সেই পরিমাণ কাজের মধ্যে তরক্কী ও উন্নতি হইবে।

এই মূলনীতিগুলির সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের সামনে আসিয়া গিয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় এই যে, বর্তমান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পেরেশানী ও

অশান্তির মধ্যে উক্ত কাজ আমাদিগকে কি পরিমাণ পথ দেখাইতে পারিবে এবং কি পরিমাণ আমাদের সমস্যা দূর করিতে পারিবে। ইহার জন্য পুনরায় আমাদিগকে কুরআনে করীমের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কুরআনে করীম আমাদের এই চেষ্টা–মেহনতকে 'লাভজনক ব্যবসা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে এবং ইহার প্রতি এইভাবে উৎসাহিত করিয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (صف ع٢)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچالے. تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اللہ تعالے تمہارے گناہ معاف کردے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے. یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی. اور آپ مؤمنین کو بشارت دے دیجئے

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে রক্ষা করিবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁহার রাসূলের উপর এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে আপন মাল ও জান দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝিতে পার। আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নীচে নহরসমূহ জারি থাকিবে। আর উত্তম বাসস্থানসমূহে যাহা চিরস্থায়ী বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে। ইহা বিরাট সাফল্য। আরও একটি জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর—উহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর আপনি (হে নবী !) মুমিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া দিন। (সূরা ছফ, আয়াত–১০–১৩)

এই আয়াতে একটি ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার প্রথম

লাভ হইল উহা যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে নাজাত দানকারী। সেই ব্যবসা এই যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং আল্লাহর রাস্তায় আপন জান-মাল দ্বারা জিহাদ করি। ইহা এমন কাজ যাহা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক ; যদি আমাদের মধ্যে সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনাও থাকিয়া থাকে। এই মামুলী কাজের বিনিময়ে আমরা কি পরিমাণ লাভবান হইব—আমাদের সমস্ত গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি একেবারে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং আখেরাতে বড় বড় নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে। এতটুকু হইলেও ইহা অনেক বড় কামিয়াবী ও মর্যাদার বিষয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুও আমাদিগকে দেওয়া হইবে। আর তাহা হইল দুনিয়ার উন্নতি, সাহায্য ও সফলতা এবং শত্রুর উপর বিজয় ও রাজত্ব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট দুইটি জিনিস চাহিয়াছেন। প্রথমটি হইল, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনি। আর দ্বিতীয়টি হইল, নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করি। ইহার বিনিময়ে তিনি আমাদেরকে দুইটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিয়াছেন। আখেরাতে জান্নাত ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি। আর দুনিয়াতে সাহায্য ও কামিয়াবী। প্রথম যে জিনিস আমাদের নিকট চাওয়া হইয়াছে উহা হইল ঈমান। আর এই কথা স্পষ্ট যে, আমাদের এই চেষ্টা-মেহনতের উদ্দেশ্যও ইহাই যে, প্রকৃত ঈমানের দৌলত আমাদের নসীব হইয়া যায়। দ্বিতীয় জিনিস যাহা আমাদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে উহা হইল জেহাদ। জেহাদের আসল যদিও কাফেরদের সহিত যুদ্ধ ও মোকাবিলা করা তথাপি জেহাদের মূল লক্ষ্য হইল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁহার হুকুম-আহকাম পূর্ণভাবে চালু করা। আর ইহাই আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য।

অতএব বুঝা গেল যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সুন্দর ও সুখময় হওয়া এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করা যেমন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ও দ্বীনের রাস্তায় চেষ্টা-মেহনত করার উপর নির্ভরশীল, তেমনি দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করা ও দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ দ্বারা ফায়েদা হাসিল করাও ইহার উপর নির্ভরশীল যে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-মেহনতকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি।

আর যখন আমরা এই কাজকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিব অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিব এবং আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা ও মেহনত

করিয়া নিজেদেরকে নেক আমল দ্বারা গড়িয়া তুলিব তখন আমরা সারা দুনিয়ার বাদশাহী ও খেলাফতের উপযুক্ত হইতে পারিব এবং আমাদেরকে সালতানাত ও হুকুমত দেওয়া হইবে—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ؕ (نور- ع ٧)

تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا بشرطیکہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک کریں۔

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের সহিত আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন, তাহাদিগকে জমিনে হুকুমত দান করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে হুকুমত দান করিয়াছেন। যে দ্বীনকে তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন উহাকে তাহাদের জন্য মজবুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতিকে তিনি আমানের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। তবে শর্ত এই যে, আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং কাহাকেও আমার সহিত শরীক করিবে না। (নূর, আয়াত-৫৫)

এই আয়াতে পুরা উম্মতের সহিত ঈমান ও নেক আমলের উপর হুকুমত দান করার ওয়াদা করা হইয়াছে। যাহার বাস্তব প্রকাশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে শুরু করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানা পর্যন্ত একাধারে ঘটিয়াছে। যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় ইসলামের পতাকাতলে চলিয়া আসে। পরবর্তী যমানায় একাধারে না হইলেও বিভিন্ন সময়ে নেককার বাদশাহ ও খলীফাগণের বেলায় এই ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটিতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○ ونحوه (بیان القرآن)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হইবে। (মায়েদা, আয়াত-৫৬)

সুতরাং জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ ও ইজ্জত-সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিতে হইলে ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে, আমরা এই তরীকায় মজবুতির সহিত কাজ করিতে থাকি এবং আমাদের ইনফেরাদি ও ইজতেমায়ী সর্বপ্রকার শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেই—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا (اٰل عمران) تم سب دین کو مضبوط پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت بنو

অর্থাৎ—তোমরা সকলেই দ্বীনকে মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধর ; পরস্পর খণ্ড-বিখণ্ড হইও না। (আলি-ইমরান, আয়াত-১০৩)

ইহা একটি সংক্ষিপ্ত 'নেজামে আমল' বা কর্মপদ্ধতি যাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিন্দেগী এবং আমাদের পূর্ববর্তী আদর্শবান বুযুর্গানে দ্বীনের জিন্দেগীর নমুনা। 'মেওয়াত' এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবত এই কর্মপদ্ধতির অনুসরণে মেহনত চলিতেছে। এই ভাঙ্গাচুরা মেহনতের ওসীলায় সেই এলাকাবাসী দিন দিন উন্নতি করিয়া যাইতেছে। এই কাজের বরকত ও কল্যাণ সেই এলাকায় এমনভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে, যাহা স্বচক্ষে দেখার সহিত সম্পর্ক রাখে। যদি সকল মুসলমান মিলিতভাবে এই জীবন পদ্ধতিকে এখতিয়ার করিয়া নেয় তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা এই যে, তাহাদের সকল মুসীবত ও মুশকিল দূর হইয়া যাইবে, তাহারা ইজ্জত-সম্মান ও সুখের জিন্দেগী লাভ করিবে এবং নিজেদের হারানো শান-শওকত ও মান-মর্যাদা পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইবে—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (منافقون)

অর্থ ঃ ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের জন্য। (মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

আমি আমার উদ্দেশ্যকে যথাসাধ্য গুটাইয়া পরিস্কারভাবে পেশ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা শুধুমাত্র কতকগুলি প্রস্তাবেরই সমষ্টি নহে বরং একটি বাস্তব কাজের নকশা। যাহা আল্লাহর মকবুল বান্দা (আমার পরম শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) লইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই পবিত্র কাজের জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করিয়াছেন। কাজেই আপনার জন্য জরুরী হইল যে, এই সামঞ্জস্যহীন লাইন কয়টি পড়িয়া ও বুঝিয়াই যথেষ্ট মনে করিবেন না বরং এই কাজকে শিখুন, এই

পদ্ধতির বাস্তব নমুনা দেখিয়া উহা হইতে ছবক হাসিল করুন এবং নিজের জীবনকে এই ছাঁচে গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করুন।

শুধু এই দিকে মনোযোগী করাই আমার উদ্দেশ্য ; কাজেই এখানেই শেষ করিলাম—

پھول کچھ میں نے چُنے ہیں ان کے دامن کیلئے

میری قسمت سے الٰہی پائیں یہ رنگ قبول

অর্থ ঃ তাঁহার আঁচলে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি কিছু ফুল বাছিয়া লইয়াছি। আমার কিসমত–গুণে হে মাওলা! উহা যেন কবুলিয়াতের সৌভাগ্য লাভ করে।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۔